শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

উজ্জ্বল ভারত

CALCUTT

756.3
.02617

“আমি বিশ্বনাগরিক।”

“নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।”

—শ্রীনিত্যগোপাল—

"……মানুষ এক কথায় তাহার আত্মা ও আবেষ্টনের সমন্বয়। আবেষ্টন না বদলাইয়া, আবেষ্টন জয় না করিয়া, আবেষ্টনকে নূতন করিয়া সৃষ্টি না করিয়া যাহারা শুধু আত্মা বা ভিতর লইয়া থাকে, তাহাদের জীবন কতদূর অগ্রসর হইয়া শেষে পিছাইয়া যাওয়া অনিবার্য। আবেষ্টনকে জয় করিতে করিতে চলিতে হইবে। প্রথমে তো প্রেরণা পাবই, কিন্তু সেই প্রেরণাদ্বারা তাহার সবখানি আবেষ্টনকে জয় করিতে মানুষ চায়। আবেষ্টন যেমন তেমন থাকিবে, অথচ ভিতরে ভিতরে পুরুষোত্তম জন্মিবেন, ইহা হয় না। মানুষ যে কিছুদিন পরে শুকাইয়া যায় তাহার কারণ আবেষ্টনকে জয় না করার ফলে আবেষ্টন rigid হইয়া যায়, তখন আবেষ্টনের চাপ সে আর সামাল দিতে পারে না। মানুষ তো আত্মা ও আবেষ্টনের সমন্বয়েই পুরুষোত্তম। আবেষ্টনকে জয় করার পন্থাই হইল বিপ্লব। আবেষ্টনকে তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে— (১) লৌকিক আবেষ্টন, (২) বৈদিক আবেষ্টন, (৩) স্বকীয় আবেষ্টন। ব্রজগোপীগণের জীবনে পুরুষোত্তমের সঙ্গে আবেষ্টনের সংঘর্ষ সৃষ্টি হইয়াছিল। না হইয়া উপায় নাই। অতীতের সব লৌকিক সংস্কার, বৈদিক সংস্কার ও স্বকীয় সংস্কার নূতন প্রেরণাকে অস্বীকার করিবেই। কিন্তু নূতন প্রেরণাকে বরণ করিয়াছে যে তাহাকে খুব চতুরতার সহিত আবেষ্টনের সঙ্গে বিপ্লব করিয়া, আবেষ্টন ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্বদা জাগরুক থাকিতে হইবে। জয় করা যখনই বন্ধ হইল, তখনই অন্ধকার জমিয়া উঠিয়া প্রাণ-সাধককে অন্ধ করিয়া দিবে। ……"

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

উজ্জ্বলভারত

—ষোড়শ বর্ষ—

১৩৬৯ মাঘ—১৩৭০ পৌষ, ১৯৬৩

বর্ষসূচী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদিকা

শ্রীরেণু মিত্র

CALCUTTA

উজ্জ্বলভারত
নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রাম বাগুইআটি
পোঃ অশ্বিনীনগর
২৪ পরগণা

উজ্জ্বলভারত

ষোড়শ বর্ষ

১৩৬৯ মাঘ—১৩৭০ পৌষ, ১৯৬৩

অমর সুরসাধক বীঠোফেন ... ২২৬
শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন
অনিঃশেষ (কবিতা) ... ৩২০
শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্তী
আধুনিক ছোট গল্প ... ১৩৩
শ্রীঅনিলকুমার সমাদ্দার
আমাদের কথা ... ১
আমাদের দুর্গোৎসব ... ২৪৫
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
উজ্জ্বল ভারত (কবিতা) ... ১০৯
শ্রীসুধীর গুপ্ত
উত্তর শতবার্ষিকীপর্বে রবীন্দ্রচর্চা ... ১২৪
শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু
ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও নাটক—গিরিশচন্দ্র ... ২৬৮
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য
এই সব অন্ধকার (কবিতা) ... ২৮০
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
একটি অমর সাহিত্য : মঙ্গল ... ১০৪
শ্রীকেশবকুমার ভট্টাচার্য
একটি বৃক্ষ : অনেক প্রাণ (কবিতা) ... ২৭৭
শ্রীগোপাল ভৌমিক
এবারসন ... ২৪৮
জনাব রেজাউল করীম
এস পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ (কবিতা) ... ২৭২
শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত
ওঁ শ্রীনিত্যগোপালায় ... ৬৪
শ্রীবিষ্ণুপদ রায়
কবি ভারতচন্দ্র ... ৬
শ্রীমধুসূদন দাস
কবি-শিক্ষা ... ৩২
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কর্ণ সুবর্ণ ... ১৪
শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়
কি দিয়ে পূজি মা (কবিতা) ... ২৫২
শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ
খাদ্য ... ৫০
শ্রীউমাশঙ্কর চট্টরাজ
গানাৎ পরতরং নহি ... ২৬১
শ্রীসন্তোষকুমার দে
গ্রন্থ-পরিচয় : পথের টানে ... ১৩৪
চৈত্রের বারান্দায় (কবিতা) ... ১৫৩
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
ছোট্ট প্রণাম ... ৩৪০
শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী
জয় নিত্যগোপাল ... ৭৯
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
জাগে অনুরাগে (কবিতা) ... ২৮৭
শ্রীবিভা সরকার
জীবনচরিতের মূলতত্ত্ব ... ২৪৯
শ্রীমণি বাগচী
জীবন-সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দ ... ২১২
শ্রীপ্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ঠাকুর বৃন্দাবনচন্দ্রের দোলযাত্রা ... ৬৮
৺নিত্যগোপাল চক্রবর্তী

ভবমূর্ত্তরে ... ৮৯
শ্রীপ্রতিভা রায়
দিশারা (কবিতা) ... ৫৩
শ্রীভারতী
দামাল ছেলে (কবিতা) ... ২৬১
শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়
দেবীসূক্ত ... ২১৮
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
দেশপ্রেম ... ২৩০
শ্রীতরুণ মজুমদার
দেশাত্মবোধের প্রেরণা ও বাংলা নাটক ... ২৭১
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
নারী-জাগরণ ... ৯
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
নিত্যগোপাল ও তাঁহার প্রচার ... ৬৪
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
নিত্যগোপাল ও তাঁহার প্রচার ... ৬৪
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
নিত্যগোপাল-প্রণতি ... ৮৮
পঁচিশে বৈশাখ (কবিতা) ... ১৩৬
শ্রীনাজনীল দাশ
পদচিহ্ন (কবিতা) ... ৩০২
শ্রীসনাতন মণ্ডল
পাঠ্যক্রমে সমাজ-বিদ্যা ... ১৭, ৩৭
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত
প্যাথেটিক ফ্যালাসি (Pathetic Fallacy) ... ২০৪
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বিটি, ডি এসই
প্রার্থনাকালীন ভাষণ ... ৩, ২৭, ৭৩, ৯৩, ১২১,
১৪৪, ১৬৯, ১৯৩, ২৪৯, ২৮১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত ৩০৮, ৩৪৯
বসুধারা (কবিতা) ... ২৫২
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
বাইশে শ্রাবণ ... ১৭২
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়
বাংলাদেশ ও বাঙালী ... ২২৩
শ্রীভারতী
বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র — ১৪৮
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত
বিবেকানন্দ (কবিতা) ... ১৩৬
শ্রীদিবাকর ঘোষ
বিবেকানন্দ (কবিতা) ... ১৫
শ্রীজগন্নাথ সাহা
ভক্তিবাদের গূঢ়মর্ম ... ৩০৫
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
ভাবনার কথা ... ২৩০
শ্রীনলিনীরঞ্জন গুপ্ত
মরণোন্মুখ বাঙালীর বাঁচিবার পথ ... ১৭
শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্ত্তী
মাতৃবন্দনা — ২১
শ্রীনিত্যগোপাল
মাতৃমাধুর্য্যশতকম্ ... ২১
৺শ. চ. ঠাকুর
মায়ের কথা ... ২২
শ্রীইন্দু মিত্র
মীরা (কবিতা) ... ২
শ্রীসুধীর গুপ্ত
যবনিকার ওপারে ... ১
শ্রীশিখা সরকার
যাত্রাশেষ (কবিতা) ... ১
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
রবীন্দ্র প্রতিভার একদিক ... ১
জনাব রেজাউল করিম
রবীন্দ্র সঙ্গীত সাথী অমলা চৌধুরী ... ২
শ্রীবাসুদেব রায়
রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১২৯, ১৮২, ২
(বরিশাল হিতৈষী থেকে)
শ্রীতারামোহন সেন

রূপময় (কবিতা) ... ২১১
শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য
শক্তি দাও (কবিতা) ... ১০৪
শ্রীবিভূপদ রায়
শরৎ ও শারদীয়া ... ১৫০
শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত
শ্রদ্ধাঞ্জলি ... ৩৩৮
শ্রীবিভূপদ রায়
শ্রীচৈতন্যজীবনের শেষ অধ্যায় ... ২৩৭
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে .. ৩১৯
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ... ৩৩১
শ্রীবেণু মিত্র
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ... ১৯৬
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত ভাষণ হইতে
শ্রীনিত্যগোপাল ... ৫৭
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ... ৬০
শ্রীবেণু মিত্র
মৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী—(১৩৫১-৫২)
১৯, ৪২, ৮০, ১১০, ১৩৭, ১৫৫,
১৭৮, ২০৪, ২৭০, ২৯৭, ৩২১, ৩৫০
রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্মরণে (কবিতা) ... ১৭৭
শ্রীসুধীর গুপ্ত
ল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৩১১, ৩৫১
শ্রীসন্তোষকুমার গুহ
সমাজ-বিদ্যার কথা ... ৭৬,১৯৬
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত
সর্বেশ্বর (কবিতা) ... ৬১
শ্রীশ্যামাপদ সেন
সহজ সুন্দর (কবিতা) ... ২৬৩
শ্রীশান্তশীল দাশ
সাময়িকী : বিবেকানন্দ ও তাঁহার পর ... ২৭
নেতাজী সুভাষ ... ৪৪
নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ
২৬শে জানুয়ারী
রবীন্দ্রনাথ ও আমরা ... ১১৭
অস্পৃশ্যতা ... ১৫০
গুরুপূর্ণিমা
নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ সংবাদ ... ১৮
সত্য অসত্য .. ২১৪
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জন্মোৎসব ... ৩৬০
সমাধান (কবিতা) ... ২৬৭
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়
সাহিত্যে বৈতরূপ ... ২৪৩
শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস
সবার মাঝেই তাঁহার রূপ (কবিতা) ... ৩১৯
শ্রীঅমিয়মোহন বসু
স্বর্গের সিঁড়ি (একাঙ্কিকা) ... ২৫৪
শ্রীমন্মথ রায়
স্বামী বিবেকানন্দের মহনীয়তা ... ২৮৮
শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম দাশুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

বিজ্ঞপ্তি

উজ্জ্বলভারতের ষোড়শ বর্ষ আরম্ভ হইল। গ্রাহকদিগের নিকট নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন শীঘ্রই ষোড়শ বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দেন।

ইতি
কার্য্যাধ্যক্ষ, উজ্জ্বলভারত
গ্রাম : বাগুইআটি
পোঃ : অশ্বিনীনগর
২৪ পরগণা

তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি
আমাদের পাথেয় হউক

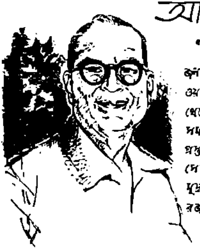

"কঠোর শ্রম ও ধৈর্যের দ্বারা কি লাভ করা যায় তার জন্য যদি কোন উদাহরণের প্রয়োজন হয় আমি সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের নাম উল্লেখ করবো। ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বিরাট কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিদেশে প্রস্তুত সবচেয়ে সেরা কালির যে গুণগত উৎকর্ষ সুলেখা সেই গুণের অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে সাহায্য করছে। আজকে তাঁদের এই রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

বিধান চন্দ্র রায়

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

সূচীপত্র : মাঘ, ১৩৬৯. ১৮৮৪

১। আমাদের কথা ... ১
২। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (১৮) ... ৩
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
৩। কবি ভারত চন্দ্র ... ৬
শ্রীমধুসূদন দাস
৪। নারী-জাগরণ ... ৯
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
৫। বিবেকানন্দ (কবিতা) ... ১০
শ্রীজগন্নাথ সাহা
৬। বর্ণ সুবর্ণ ... ১৪
অধ্যাপক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়
৭। পাঠক্রমে সমাজ-বিদ্যা ... ১৭
অধ্যাপক সুবোধকুমার সেনগুপ্ত
৮। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫১) ১৯
৯। সাময়িকী : বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরু ... ২১

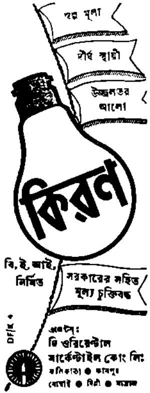

স্বল্প মূল্য
দীর্ঘ স্থায়ী
উজ্জ্বলতর আলো
কিরণ
বি, ই, আই, নির্মিত
সরকারের সহিত মূল্য চুক্তিবদ্ধ
DF/K 4
এজেন্ট্‌স:
দি ওরিয়েন্টাল
মার্কেন্টাইল কোং লিঃ
কলিকাতা ● কানপুর
বোম্বাই ● দিল্লী ● মাদ্রাজ

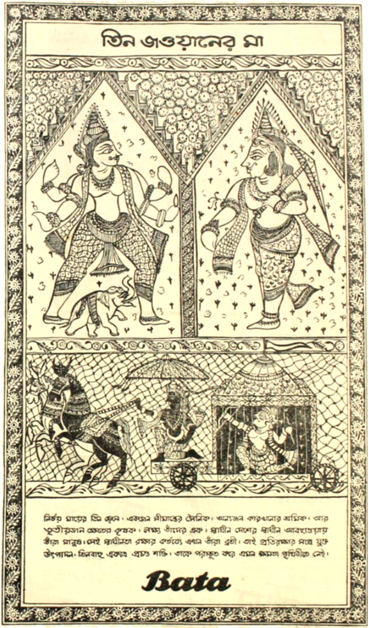

তিন জওয়ানের মা

নির্ভয় মায়ের তিন ছেলে। একজন সীমান্তের সৈনিক। অন্যজন কারখানার শ্রমিক। আর তৃতীয়জন ক্ষেতের কৃষক। লক্ষ্য তাঁদের এক। স্বাধীন দেশের স্বাধীন আবহাওয়ায় তাঁরা মানুষ। সেই স্বাধীনতা রক্ষার কর্তব্যে এখন তাঁরা ব্রতী। তাই প্রতিরক্ষার সঙ্গে যুক্ত উৎপাদন। তিনবাহু একত্রে প্রচণ্ড শক্তি। তাকে পরাভূত করে এমন ক্ষমতা পৃথিবীতে নেই।

Bata

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৭·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·১৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১·০০	পকেট গীতা	২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·২০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·১৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি.

বিদ্যাসাগর	১·২১	বঙ্কিমের গল্প	১·১৫

ছাত্রছাত্রীদের নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী **:** ১২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। ॥ গড়িয়াহাট মার্কেট ॥

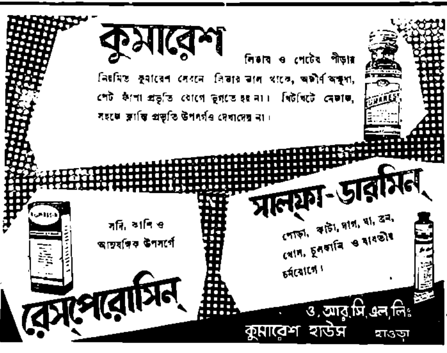

কুমারেশ

লিভার ও পেটের পীড়ায়

নিয়মিত কুমারেশ সেবনে লিভার ভাল থাকে, অজীর্ণ অম্বলা, পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে ভুগতে হয় না। খিটখিটে মেজাজ, সহজে ক্লান্তি প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয় না।

রেসপেরোসিন

সর্দি, কাশি ও আনুষঙ্গিক উপসর্গে

সালফা-ডারমিন

পোড়া, কাটা, দাগ, ঘা, ব্রন, খোস, চুলকানি ও যাবতীয় চর্মরোগে।

ও. আর. সি. এল. লিঃ
কুমারেশ হাউস হাওড়া

CUTTA

উজ্জ্বলভারত

মাঘ, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

আমাদের কথা।

'উজ্জ্বলভারত' পত্রিকার ষোড়শ বর্ষ আরম্ভ হইল। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'উজ্জ্বলভারত' মাসিক পত্রিকা তাঁহার হাতে প্রায় এগার বৎসর চলিয়াছে, তিনি প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন আজ পাঁচ বৎসর হইতে চলিল—তবু তাঁহারই প্রেরণায় এতদিন পর্যন্ত উজ্জ্বলভারত চলিয়াছে, ভবিষ্যতেও চলিবে। আজ ইহার ষোড়শ বর্ষারম্ভ দিনে যে উদ্দেশ্য লইয়া, যে প্রেরণাতে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ 'উজ্জ্বলভারত' প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য ও প্রেরণাকে স্মরণ করি। তাহার পূর্বে স্মরণ করি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে, যাঁহার জীবন এবং তত্ত্বেরই প্রকাশ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তথা উজ্জ্বলভারত। 'আমি ব্রহ্ম' এ কথা ভারতবর্ষ বলিতে চাহিয়াছে সমাধির স্তরে—জাগ্রত ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র-জীবনে নয়। জাগ্রতের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রমীয় ব্যবস্থামত ব্রাহ্মণ চাড়ালের পার্থক্যকর ভেদবাদ ভারতবর্ষ ঐ ব্রহ্মজ্ঞানসাধনার সঙ্গে সঙ্গে চালাইয়া আসিয়াছে। জাগ্রত জীবনে যে ভারতবর্ষে সর্বভারতীয়ত্ব-বোধেরই চেতনা ছিল না, সেই ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল আজ হইতে প্রায় আশী বৎসর পূর্বে ঘোষণা করিলেন 'আমি বিশ্বনাগরিক'। কেবল ঘোষণা করিলেন না—শাস্ত্র দিয়া জাগ্রতের ক্ষেত্রের আমি বিশ্বনাগরিক এবং সমাধি ক্ষেত্রের আমি ব্রহ্ম এই দুইকে মিলাইয়া গেলেন। এই শ্রীনিত্যগোপালকে আজ উজ্জ্বলভারতের এই ষোড়শ বর্ষারম্ভ দিনে স্মরণ করি, ধ্যান করি—তাঁহাকে তত্ত্বতঃ আত্মসাৎ করিতে প্রয়াস পাই। শ্রীনিত্যগোপালের এই জীবন-বোধকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে যথানীতি দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী রূপ দিলেন মহাত্মা গান্ধী সাহিত্যের ক্ষেত্রে রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই এই দু মহাজীবনকেও আমাদের এই বার্ষিক যাত্রারম্ভকালে প্রণ হৃদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তার পর বার বার প্রণ হই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের শ্রীচরণতলে যাঁহার পরোক্ষ অবিশেষ প্রত্যক্ষ অবস্থিতি উজ্জ্বলভারত তথা নবভারত আশ্রমকে পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আ সর্বশেষে সমস্ত প্রাণ দিয়া স্মরণ করি দূরের কাছের ছোট বড় সেই সব মানুষদের—গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখ পত্রদাতা, পরামর্শদাতা, শুভজিজ্ঞাসাকারী সেই সব মানু দের যাহাদের মধ্য দিয়া ঐ জীবন-বোধকে আস্বাদ করিতে করিতে এই পনেরো বৎসরের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, এবং আরও বহু পনেরো বৎসর অতিক্রম করিবার বাসনা রাখি।

উজ্জ্বলভারত প্রকাশের পিছনের উদ্দেশ্য ও অন্তরের কি ছিল?—শ্রীনিত্যগোপালের আমি ব্রহ্ম ও আমি বি নাগরিক এই উভয়সংযুক্ত আপাত বা প্রচলিত বিপরী বোধের জড় ও অজড়, চৈতন্য ও অচৈতন্য, দ্বৈত ও অদ্বৈ সমন্বিত সর্ব সমন্বয়ের সামগ্রিক জীবন-বোধকে ও তাহ চলার পথকে মানুষের সামনে উপস্থিত করাই উজ্জ্বলভার প্রকাশের পিছনের কথা। ১৯১৯-এ বেদান্তের অখ ভাষ্য রচনা করিবার সময়ই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ উপল করিয়াছিলেন যে খণ্ডিত জীবন-চেতনার দিন চলি গিয়াছে,—'সে যুগ হয়েছে বাসি'। এখন আসিয়া

আসিতেছে সর্ব মানুষকে প্রাণের মধ্যে স্থান দিয়া গ্রহণ করার দিন। বুদ্ধিরই বহিঃপ্রকাশ হইতেছে পুরুষ-কৌলীন্য, কুল-কৌলীন্য, ধন-কৌলীন্য, শিক্ষা-কৌলীন্য ইত্যাদি—আজ এর কোন কৌলীন্য দিয়াই মানুষের বিচার নাই। আজকের মানুষ আগে মানুষ—তারপর সে নর কিংবা নারী, সে কুলীন কিংবা চাড়াল, সে ধনিক কিংবা শ্রমিক, সে শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত, সে চোর ডাকাত কিংবা ভালমানুষ সে বিচার। পৈতা-দাড়ী, টিকি-টিকটিকিও যেমন আজকের দিনের পথ চলার নিশানা দিবে না, তেমনি ধনেরই হোক বা অস্ত্রেরই হোক কোনটার শক্তি দিয়াই আজকের মানুষকে দাবাইয়া রাখা চলিবে না। ইহারই এক নাম মহাপ্রাণ নীতি বা পঞ্চশীল। ভারতবর্ষের মাথায় বা হৃদয়ে ইহার উৎপত্তি হইলেও সমস্ত পৃথিবী—কি ধনতন্ত্রবাদী, কি কম্যুনিস্ট—আজ ইহার চেতন বা অচেতন সমর্থক, যাহারাই জগৎ এক নিমেষে নিঃশেষ হইয়া যাইবার অস্ত্র হাতে লইয়া বসিয়াও বিশ্বের শক্তি-গোষ্ঠি ইহারই জপ করিতে বাধ্য হইতেছে, যেমন জড়বাদী চীনকে রাশিয়া বুঝাইতে চাহিতেছে অস্ত্রের খোঁচায় তত্ত্ব প্রচারের দিন চলিয়া গিয়াছে—পুনরায় বলি 'সে যুগ হয়েছে বাসি'। এই জীবন-বোধকে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেই ১৩১৯ হইতে তাঁহার সমস্ত জীবন দিয়া, সমস্ত তপস্যা দিয়া প্রকাশ করিতেছেন—ইহারই উজ্জ্বলভারত। এইরূপ একটী ব্যাপকতম গভীরতম জীবন-বোধের ধারক বলিয়াই ধনহীন জনহীন উজ্জ্বলভারত আজও চলিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিবে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলিলেন 'পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা' আর চলিবে না, তখন তিনি বুদ্ধিপ্রধান সভ্যতার সকল দিয়া বেচাকেনা যে বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহারই কথা বলিলেন। তাহা হইলে মানুষ দাঁড়াইবে কোন্খানে? তাহাও তিনি বলিয়া দিতেছেন. '...একদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ'। প্রাণের চারিদিকে বুদ্ধির পাষাণ-প্রাচীর—কিন্তু

'মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!'

এই প্রাণ কি করিবে?

'আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কী জানি কী হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান—'

—বিশ্বজগতের প্রাণ আজ জাগিয়া উঠিয়াছে—প্রাণ-সাগরের মহাসঙ্গীত আজ মানুষের কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। মানুষের সভ্যতাকে আজ ইহারই উপর দাঁড়াইতে হইবে—শ্রীনিত্যগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দ উপনিষদুক্ত এই সর্বজ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণকে দার্শনিক ভাষায় দার্শনিক কাঠামোয় প্রকাশন করিয়া গেলেন, প্রকাশন করিয়া গেলেন তাঁহাদের সমস্ত জীবন ও রচনা দিয়া—উজ্জ্বলভারত এই প্রাণেরই ধারক ও বাহক।

উজ্জ্বলভারতের এই ষোড়শ বর্ষারম্ভ ক্ষণে আজ এই প্রাণকে স্মরণ করি, বরণ করি—যে প্রাণ বিশ্বের অস্তিত্ব রক্ষার মূলেই শুধু থাকিবে না—তার সমস্ত কালচার সৃষ্টি হইবে আজ এই প্রাণকে ঘিরিয়াই। এই প্রাণ সকলকে লইয়া বলিবে 'আমরা আনন্দিত হইয়া আছি'। সমস্ত বিশ্বের লোক একদিন এই কথা বলিয়া ধন্য হইবে—সেদিন দূরে নয়।

'উজ্জ্বলভারত' এই প্রাণোপাসনাকে বহন করিয়া চলিতে আজ সকলের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা কামনা করে—চারিদিকের বাধার পাষাণ ঠেলিয়া চলিবার সময় সে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলিবে, 'আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো, তাইতে তোমার বাণী বাজে ঝরনা ঝরানো'। শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ জয়যুক্ত হউন, বিশ্বের মানব যে যেখানে আছে জয়যুক্ত হউক।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(১৮)

২৫, ৬, ৫৬।…গোরা…তুমি বাংলাকে…গড়িয়া গেলে, তুমি বাংলার স্রষ্টা, তোমার সাঙ্গপাঙ্গ লইয়া, গদাধরকে লইয়া নবীন বাংলা গড়িয়া গেলে।…বাংলার সাহিত্য, বাংলার হরিবোল, বাঙালীর ভাবুকতা…চোখের জল, রসসাহিত্য—সব তোমার দান। তোমার নিত্যগোপালরূপে তুমি আজ এক নূতন রূপে গড়িবে। তুমি বাংলাকে আজ বিশ্বজনীনরূপে গড়িবার লাগি নিত্যগোপালরূপে—শচীদুলাল এবং গৌরীদুলাল নিত্যগোপালরূপে আসিয়াছ। …আবার দেখিতেছি তুমিই কৃষ্ণ-গোপাল…। তোমার মন্ত্র সমানে—ভারতবর্ষকে সমান মন্ত্রে, সমানী আকূতিতে, সমান সমিতিতে গড়িয়া তুলিতে আসিয়াছ। নিত্যগোপাল, সমন্বয় মন্ত্রে প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে দীক্ষা দিয়া গেলে—দিয়া গেলে I am a cosmopolitan আমি বিশ্বনাগরিক-রূপ মহামন্ত্র। যাহা ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে হরিবোল, আজ তাহাই বিশ্বনাগরিকতা—ঘরে ঘরে জনে জনে এই মন্ত্র শুনানোই আমার সাধনা। নিত্যগোপাল, যে দায়িত্ব আমার এই দুর্বল স্কন্ধে সঁপিয়াছ, তাহা পূরণ করিবার মত শক্তি দাও।…আজ বিশ্বই আমার গৃহ—নরনারায়ণ আশ্রম এই সাধনাই গ্রহণ করুক। কত খুঁজিয়াছি—এই মন্ত্র শুনাইতে কত মানুষ খুঁজিয়াছি—দু মুঠো অন্ন ও একটু স্থানের জন্য নরনারায়ণ আশ্রম গঠিত হয় নাই—এক বিরাট কাজ লইয়া, তোমার পা শিরে লইয়া, আমি বিশ্বনাগরিক এই পতাকা লইয়া বাহির হইয়াছি।…বিশ্ব তোমার খেলাঘর—বিশ্বের নরনারী তোমার প্রকাশ। সকলে ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত—একার কোন প্রশ্ন নাই—একা বাঁচিবার, একা থাকিবার কোন প্রশ্ন নাই, সম্ভাবনা নাই—সমান মন্ত্র, সমান সমিতি লইয়া দাঁড়াইব—এই মন্ত্র সকলকে শুনাইব—এই মন্ত্র শুনাইবার এক উদগ্র লালসা লইয়া ছুটিয়াছি।…তোমার দেওয়া বাক্যে তোমার মন্ত্র বলিব—বলিবার সাধ মেটে নাই—কেহ শোনে নাই…তোমার কথা ছাড়া গ্রাম্যবার্ত্তা কহিব না। মূক থাকিতে পারিতাম বোবা হইয়া জনম কাটাইতে পারিতাম। তোমার দেওয়া বাক্যের যেন অপব্যবহার না হয়—ফালতু কথায় ব্যয়ি না হয়…তোমারই গান গাহিব—তোমারই কথা সহ কণ্ঠে বলিব। তোমারই নাম লইতে লইতে, নিত্যগোপাল তোমারই কথা কহিতে কহিতে জীবনের শেষ দিন যে শেষ হইয়া যায়। আমার বাক্য তোমাতে আর তোমাকে দিয়াই যেন শেষ হয়। জগন্নাথ বিশ্বনাগরি নিত্যগোপাল, ধরায় ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরায় মানুষ হো বিশ্ব মানুষ।

ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্ত্তয়ে…।…ভগবান অর্জুনকে বলেছিলে 'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি' আমার সঙ্গে যোগ রেখে কর্ম্ম ক নয়তো কর্ম্মের টান সামাল দিতে পারবে না।… ক বহির্মুখী, জ্ঞান ভক্তি অন্তর্মুখী; জ্ঞানভক্তি বাইরে থে ভিতরে আনে, কর্ম্ম ভিতর থেকে বাইরে নেয়…। এ বাইর আর ভিতর—এই দুটোকে মেলান খুব শক্ত—তা প্রাচীনেরা জ্ঞানপথের পথিকদের জন্য কর্ম্ম নিষিদ্ধ ক দিয়েছেন…শঙ্করও কর্ম্ম ছেড়েছেন। সমস্ত প্রচলি বেদান্ত কর্ম্মত্যাগের নির্দ্দেশ দিয়েছে—এতে একদি শুকিয়ে যায়, মানুষ স্বার্থপর হয়, সেবাবুদ্ধি থাকে ন সাগরের জল নিয়ে নদী ঢেলে দেবে জনপদে, আবার ফি সাগরে মিশবে।…অভিমন্যু ঢুকতে জানতেন, বের হ জানতেন না—সংসারী সংসারে ঢুকতে জানে, সেখ থেকে আর বের হতে পারে না।…এতদিন ভারতবর্ষ কি

জানত, বাইর জানত না। এখন আবার শুধু বাইর জানে, ভিতর জানে না। আর গুরুজন বলে কিছু নেই, নেতা বলে কিছু নেই—; শুধু বহির্মুখীনভাবে ঘুরোবে না, ঘর আর বাইর-এর সামঞ্জস্য করতে হবে। ঘর বাদ দিলে বাইর বিপদ আনে, আবার বাইর বাদ দিলেও শুধু ঘর বিপদ আনবে। আশ্রম এ দুটোর কথা মান দিয়ে চলবে·····বাইরের টান সামাল দিয়ে থাকতে হবে। আমাকে সামনে না রাখলে বাইরের টান সামাল দিতে পারবে না। চক্রান্তে পড়বে—তোমাদের নিয়ে টানাটানি করবে, আমার কাছে কেউ আসবে না। সুযোগ নেওয়ার লোকের অভাব নেই। আশ্রমের স্বার্থ বোঝা শক্ত।··· তোমাদের কাঁচাবয়সীর সুযোগ নিতে মানুষ চেষ্টা করবে... ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বামিজীর কাছে জিজ্ঞাসা না করে করতে পারবো না এ কথা বলতে হবে। এ না হলে টান সামলাতে পারবে না। কেউ জানে মানুষ কি রকম করে আঘাত করে। আত্মরক্ষা কি করে করতে হয় তা তোমরা জান না। সব সময় আমারই দোহাই দেবে। আমার সঙ্গে আলোচনা করে সব কাজ করতে হবে। শঙ্কর বললেন, সংসার ছেড়ে দাও, স্ত্রী পুত্র সব ব্রহ্ম পোষণ করবে ইত্যাদি। সাধারণতঃ এই-ই হয়ে আসছে···।

আমি একমাত্র এর উল্টানে চলেছি। কিন্তু এ পথ বড় শক্ত পথ। এত বড় শক্ত পথে সর্বদা আমাতে যুক্ত থাকবে। কর্ম করলে আমি থাকি না, আমি থাকলে কর্ম থাকে না; কিন্তু Mary and Martha at the same time করতে হবে। যশোদা কৃষ্ণকে নিজ হাতে গরু দুইয়ে দুধ খাওয়ান। দুর্বল রক্ষা করতে হবে, গুরুকে মানতে হবে, সাক্ষাৎ গুরুর নির্দেশ মেনে কাজ করবে। স্বরূপের সেবা জ্ঞানমূলক, ভক্তিমূলক, প্রত্যক্ষ সেবা স্বরূপের সেবা, পরোক্ষ সেবা কর্মমূলক, বিশ্বরূপের সেবা। স্বরূপের সেবা বিশ্বরূপের সেবা একসঙ্গেই চালাতে হবে; এই দুইকে একই সঙ্গে চালাইতে হইবে।...

২৮. ৬. ৫৭। কূর্মরূপে তুমি ধরণীকে ধরিয়া আছ··· তোমার পিঠে ধরণীর আঘাতে আঘাতে ক্ষত হইয়া গিয়াছে, তুমি সেই ক্ষতে সর্বদাই ব্যথা পাইতেছ, তবু তুমি প্রতিবাদ কর নাই, প্রতিঘাত কর নাই, ধরণীকে ছাড়িয়াও দেও নাই। ওগো কূর্মরূপী নিত্যগোপাল,···যে নূতন সৃষ্টি গড়িয়া উঠিল, কে ধারণ করিবে? যুগে যুগে তোমার ঐ পৃষ্ঠ ক্ষতবিক্ষত, ধৈর্যমূর্তি, আমায় অসীম ধৈর্য দাও, সকল সহিবার মত ধৈর্য দাও, সহিষ্ণুতা দাও, আঘাত পাইয়াও প্রতি আঘাত না করিবার মত মনোবল দাও। নিত্যগোপাল, তুমি বীর, তুমি ধীর···ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে···ধরণী ধারণে কি ব্যথা তুমি জান... ধরণী ধারণকিণ চক্র গরিষ্ঠে—ধৈর্য দাও। মানুষকে বুকে ধারণ করিবার ব্যথা তুমি যুগে যুগে ভোগ করিয়াছ—যাহাদের বুকে ধারণ করিয়াছ তাহারাই আঘাত করিয়াছে,—প্রতি আঘাত কর নাই। নিজের সৃষ্ট জিনিষ যখন বেদনা দেয়, তখন সেই অপরিসীম বেদনা সহিবার মত ধৈর্য দাও, বীর্য দাও, ক্ষমা দাও, সহনশীলতা দাও। আমার নিত্যগোপাল, তোমারই বুকে নবীন বিশ্ব গড়িয়া উঠুক—আমরা অন্যায় করিয়াছি, তবু তুমি বুকে করিয়া রাখিয়াছ—

আমি অধম অকৃতি বলেও তো মোরে
কম করে কিছু দাও নি!
যা দিয়েছ তার অযোগ্য ভাবিয়া
কেড়েও তো কিছু নাও নি—

আমার নিত্যগোপাল, আমার মস্তক দেহ মন প্রাণ তোমার চরণে লুটাইয়া পড়ুক—ওগো আমার সহনশীলতার সাগর, আমার ধৈর্যের সাগর—অবাধ্য হইয়া তোমার নির্দেশ যাহারা অমান্য করিতেছে, তবু তুমি তাহাদের ক্ষমা করিয়া চলিয়াছ—তোমার একান্তভক্ত এই দেহের অবমাননা করি না যেন।···আমার জীবনের ভিত্তিভূমি তুমি—একা চলিয়াছি, শত আঘাতেও আহাউহ্ করিবার বুঝি বা কেউ নাই—তুমি আছ—নিত্যগোপাল, আমার নারায়ণ, ভৃগু তোমার সহিষ্ণুতা দেখিবার জন্য তোমার বুকে লাথি দিয়াছিলেন, তুমি প্রতিদানে লাথি দাও নাই—তুমি বুকেই ধারণ করিয়াছ—নারায়ণ, নিত্যগোপাল—ধরায় ধূলি হউক ব্রজ-ধূলি, ধরায় মানুষ হোক ব্রজ-মানুষ—।

সন্ধ্যা—রামকৃষ্ণদেব দুটী আমির কথা বলেছেন—একটী

পাকা আমি, একটা কাঁচা আমি। জীবের আমি কাঁচা আমি, শিবের আমি পাকা। পাকা আমি থেকে গাছ হয়, কাঁচা আমি থেকে হয় না। অথচ কাঁচা আমি পাকা আমিরই অংশ—পাকা আমির স্পর্শে কাঁচা আমি পরিণত হতে পারে। পাকা আম মানে যে গাছের আম সে গাছের মত আর একটা গাছ সৃষ্টি করবার যোগ্যতা লাভ হয়েছে যেদিন, সেইদিন আম পাকল, সেইদিন আম মুক্ত হল। কাঁচা আমে গাছ হয় না—কাঁচা আমিতে সৃষ্টি হয় না। এই তত্ত্ব বরিশালে জগদীশ আশ্রমে থাকা কালীন আমার ঘরের উত্তর দিকে যে আমগাছটী ছিল সেই গাছটী থেকে আমার হয়েছে। সেই গাছটীকে আমি ভালবাসতাম। সেই গাছটী আমায় এই শিক্ষা দিয়াছে। মুক্ত হতে চাও? তাহলে সমস্ত বিশ্বটাকে নিজের মধ্যে নাও। আমরা স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে থাকি, আমাদের কাঁচা আমি নিয়েই দিন যাপন করি; শিব কৃষ্ণ এরা বিশ্বেশ্বর, আমি বিশ্বেশ্বর নই, কিন্তু হতে হবে।…আমি সব করতে সংসারে আসি নি—আমার রক্তারক্তিময় জীবন। কাঁচা আমির খেয়াল থাকবে না। ছেলের আমি কাঁচা আমি কেননা অপর ভাইয়ের স্বার্থকে সে নিজ স্বার্থ বলে মনে করে না; বাবার আমি পাকা আমি, কেননা সকল সন্তানকে একই রকম করে দেখেন… সমস্বার্থ। যারা আমি বলতে শুধু নিজেকে বোঝে, তাদের আমি কাঁচা আমি, আর আমি বলতে যারা বিশ্বকে বোঝে তাদের আমি পাকা। পাকা আমি হলে যা কিছু ছেড়ে এসেছি, তা আবার পাওয়া যাবে। পাকা আমি লাভ করার ত্রিমুখী সাধনার কথা বলছি—এক গুরুর কাছে শরণাগত হতে হবে, আর এক ভাইবোনেদের কাছে, সঙ্ঘের কাছে শরণাগত হতে হবে। একবার ভগবানের কাছে নিজেকে বলি দিতে হবে, আর একবার সঙ্ঘের কাছে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—শ্রীনিত্যগোপালং শরণং গচ্ছামি, শ্রীনিত্যগোপাল-ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, শ্রীনিত্যগোপাল-সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। তখনই লাভ হবে পাকা আমি। তোমরা একটা নূতন পথে এসেছ, সেখানে ঠিকমত চল, আমি প্রাণ ভরে ভালবাসব। এক নবীন সৃষ্টির প্রাক্কালে এসে দাঁড়িয়েছ, আমার প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে চল। চল আমরা অভিসারে, কৃষ্ণসাগর-সঙ্গমে যাই, শাখানদী গুরুনদীর সঙ্গে মিশে সাগরে যেতে হবে। আমি আজো পর্য্যন্ত ভগবানকে কেউ পাই নি; তোমাদের অহংকার মরুক, শিবের সত্তা আমি তোমাদের লাভ হউক। নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল।

২১, ৬ [তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা গানটী করেন।] নিত্যগোপাল আমার জীবনের ধ্রুবতারা, উত্তাল তরঙ্গায়িত সংসার সমুদ্রে আমার দিশারী। আমার ধ্রুবতারা, আমি তোমারই পানে চাহিয়া রহিব। যখন চন্দ্র ডুবিয়া যাইবে, সূর্য্য অস্তমিত হইবে, তারা নিভিয়া যাইবে…সেই অকূল সমুদ্রে শুধু পথ নির্দেশক তুমি নিত্যগোপাল—আমার শিব-পথের, ব্রহ্ম-পথের নির্দেশক। আমি তোমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিব। যে পথে চলিয়া গিয়াছ, যে ছন্দে কাজ করিয়া গিয়াছ, সেই পথে সেই ছন্দে আমি চলিব—তথাগত শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ তথাগত—সত্যং শিবং সুন্দরম্, আমার অচ্যুতম্—তুমি অচ্যুত…সকল বাধা বিপত্তির মাঝে তুমি অচ্যুত…তুমি অজানার পথে অন্ধকারে ধ্রুবতারা…। কেউ আমায় অনুমোদন করে নাই, তবু চলিয়াছি—পথ বহিয়া চলিয়াছি—পথের মাঝে বসিয়াছি, তবু চলা ছাড়ি নাই।…তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে…তোমার সেই করুণা-ছলছল আঁখি সদা মনে পড়িতেছে,…যাহা চাই নাই তাহা দিয়াছ, যাহা কল্পনায় ছিল, তাহা বাস্তবে পরিণত করিয়াছ! কোথায় ডুবিয়া যাইতে পারিতাম, ভাসিয়া যাইতে পারিতাম! সকল অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছি…'পরং যখন যেখানে আছ, আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি'…পথের বাঁকে বাঁকে তুমি দাঁড়াইয়া ছিলে, পথের মোড়ে মোড়ে যেখানে বিপদের সম্ভাবনা ছিল, সেখানেই তুমি ছিলে। সকলের প্রচলিত পথ, জানাশুনা পথ তো আমার ছিল না। তোমার সেই আঙ্গুল নাড়িয়া নাড়িয়া কথা বলা মনে পড়ে! তোমার স্নেহে অঙ্কিত হৃদয় লইয়া যেথা আমি যাই না কেন—ব্রাহ্মণের গৃহে বা চণ্ডালের গৃহে, অশুচির গৃহে বা শুচির গৃহে—তুমি আছ। ক্রমশঃ

কবি ভারতচন্দ্র

॥ শ্রীমধুসূদন দাশ ॥

কবি ভারতচন্দ্রের স্থান বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এক হিসাবে তাঁর হতেই বাংলা কাব্যে নবযুগের আরম্ভ। ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজ সভার কবি। সেই কারণে তাঁর কাব্য সমাজের উচ্চ স্তরের জন্য রচিত হয়েছিল। সকল দেশের সকল সাহিত্যের ভিতর একটা মূলগত ঐক্য দেখতে পাই। আমাদের বাংলা সাহিত্যেরও তেমনি বীজাঙ্কুর ছিল লোকসাহিত্যে। ভারতচন্দ্র সেই সাহিত্যকে অভিজাত করে তুলেছিলেন। বাস্তবিক কবি হিসাবে তিনি ছিলেন শব্দশিল্পী। শব্দ শিল্পের অনুপম নিদর্শন হিসাবে তাঁর অন্নদামঙ্গল সত্যই অপূর্ব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'রাজকণ্ঠের মণিমালার মত যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য'—ভারতচন্দ্রের এই শিল্প নিপুণতার অন্যতম কারণ তাঁর বহু ভাষা-জ্ঞান। সংস্কৃত, ফারসী এবং হিন্দি ভাষায় তিনি সবিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। ছন্দেও ভারতচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকর। তাঁর পূর্বে গোবিন্দদাস কবিরাজ এদিক দিয়া কিছু কৃতিত্বের অধিকারী। কিন্তু মনে হয় ভারতচন্দ্র সকলের উপরে। নূতন ছন্দ প্রবর্তন তো বটেই এমন কি পুরাতন পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দগুলিও তাঁর হাতে অপূর্ব লালিত্য লাভ করেছে। পরবর্তী কবিদের উপর ভারতচন্দ্রের প্রভাব অপরিসীম। ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত একরকম তাঁর শিষ্য ছিলেন। এমন কি মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যেও তাঁর প্রভাব লক্ষিত হয়। এই সব কারণে রায় গুণাকর বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কবি।

ভারতচন্দ্র যে সময় কাব্য রচনা করেছিলেন, তা এমন একটা সময়, যে সময়ে বাঙালীর সামনে নূতন কিছু দেখা যাচ্ছে না, পুরাতনকেও আর আঁকড়ে রাখা চলছে না। মধ্যযুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, অথচ নূতন যুগেরও আগমনধ্বনি শোনা যাচ্ছে না। এই বিরাট শূন্যতার মধ্যে কবি ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব। ১৭১২ সালে তাঁর জন্ম ও ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু। তাঁর জীবিত কালে পলাশীর প্রান্তরে এত বড়ো একটা যুদ্ধ সংঘটিত হলো। বাঙলার স্বাধীনতা লোপ পেলো। কিন্তু এই পট পরিবর্তনের কোন উল্লেখ কবি করলেন না।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে থেকে এতবড়ো একটা বিরাট প্রতিভার গতিবেগ রুদ্ধ হয়ে গেল। ইতিহাসের যথাযথ পথকে তিনি অগ্রাহ্য করলেন। তিনি সাময়িক যুগের কথা কোথাও স্পষ্ট ভাবে বললেন না। কেবল পুরাণ ও সংহিতার পথ বেয়ে চললেন। একটা অপূর্ব কবিত্ব-শক্তির উন্মেষের পথ হারিয়ে গেল কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার কোলাহলে।

ভারতচন্দ্রের পর আর যে সব কবিরা কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের সাহিত্য-প্রচেষ্টা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায় যে তাঁরা ভারতচন্দ্রের পথ অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের style তাঁরা বুঝলেন না। শুধু সেই যুগধর্মানুযায়ী ঝিমিয়ে পড়া বাঙালীর প্রাণে পুরাতন সংগীতই শুনালেন। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোন স্বাক্ষর রেখে যেতে পারলেন না।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে এমন কতকগুলি উক্তি আছে, যা আজও আমাদের মুখে মুখে প্রবচনের মতো রয়েছে।

অন্নদামঙ্গল কাব্য ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। সমগ্র কাব্যটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, দেবী অন্নপূর্ণার রূপ, ব্যাসের কাশী নির্মাণ, হরিহরের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে এসে বর্ধমানে ভবানন্দ মজুমদারের কাছে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী শুনছেন। আর তৃতীয় ভাগে ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা।

আমার মনে হয় ভারতচন্দ্র প্রথম ভাগে দেব-দেবীর বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষ করে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের অনুসরণ করেছেন। শিব যখন দক্ষযজ্ঞ নাশের জন্য যাত্রা করেছেন তখন সেই রুদ্র শিবের মূর্তিটি ভারতচন্দ্র সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন।

মহারুদ্ররূপে মহাদেবের সাজে
ভভম্ ভভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।

* * *

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে
আরে রে দক্ষ দেরে সতীরে।

আবার যখন তূণক ছন্দে দক্ষ যজ্ঞ নাশের বর্ণনা দিচ্ছেন, তখন—

ভূতনাথ ভূতনাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।

এর মধ্যে একটা ভীষণতার প্রকাশ পেয়েছে। তাই দেখি—

ভূত ভাগ পায় লাগ লাথি কিল মারিছে।

তখন মনে হয় ভারতচন্দ্র পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনায় একেবারে তন্ময় হয়ে যাননি। মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা ঘটিয়ে বর্ণনার গুরুত্বকে অনেকটা লঘু করে দিয়েছেন। গৌরীর সঙ্গে বিবাহ হবে শিবের। বৃদ্ধ শিব বর সেজে এসেছেন। কিন্তু বুড়ো জামাইকে দেখে মেনকা আর সুখে বাঁচেন না। তিনি কেঁদে বলে ফেললেন—

আই আই ওই বুড়ো কি গৌরীর বর লো।
বিয়ের বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো।
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের হার।
কেমন করে ওমা উমা করবে বুড়ার ঘর লো।

আবার নারদের চরিত্রটি অদ্ভুতভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নবে নবে বাজায়ে নারদ মুনি হাসে।

ভুবনেশ্বর শিব সত্যিই যে পাগল নন, এ জেনেও তাঁর কাব্যে শিব ত্রুটি বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। সব চাইতে বিকৃত চরিত্র হচ্ছে মহাকাব্যকার ব্যাসদেবের। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্যাসদেবের ব্যাসত্ব লোপ পেয়ে একটা ভণ্ডামির চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতচন্দ্র ছিলেন নাগরিক কবি। নাগর ভাব তাঁর কাব্যের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। এই জন্যই অনেক ইউরোপিয় কবি চসারের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেন। ভারতচন্দ্রের হাতে বাংলা ছন্দ নবরূপ লাভ করেছে। বোধহয় তিনটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকায় তাঁর কাব্যের ভাষা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে থাকবে। ভাষার প্রসাদগুণ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন—

বম্ বম্ ভম্ ভম্ বাজে গাল।
ভিমি ভিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে।
তাধিয়া তাধিয়া দিয়া পিশাচ নাচিছে।
দূর হতে শোনা যায় মহেশ্বরের শিঙ্গা।
শিব এলো বলে যত রব চিঙ্গা।
কেহ বলে ওই এলো শিব বুড়ো কাপ।
কেহ বলে বুড়োটা খেলাও দেখি সাপ।

ভাষা ও ছন্দ-কুশলী কবি কাব্যকে বাঁচিয়ে তুলেছেন বটে, কিন্তু সার্থক রস সৃষ্টি করতে পারেন নি। ভারতচন্দ্রের কাব্যের একটা মাত্র অপ্রধান চরিত্রে মানুষের সংবাদ কিছুটা পেয়েছি। এই মানুষটী আমাদের দরিদ্র সমাজের শুধু নয় সকল দেশের দরিদ্র শ্রেণীর মনের আকুলতাটুকু প্রকাশ করে গেছেন। এই মানুষটী হচ্ছে ঈশ্বরী পাটুনী। ঈশ্বরী পাটুনী দরিদ্র মানুষ। খেয়া পারাপার করার মাঝি। কাজেই একা একটা নারীকে খেয়া পার করতে তার মনে ভয় হয়। তাই সে কুণ্ঠিত ভাবে বলে—

একা দেখি কুলবধূ—কে বট আপনি
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফেরে কার।

অন্নদা তখন নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি—
জানতো স্বামীর নাম নাহি লয় নারী।

তারপর শুরু হলো পরিচয় দেবার পালা। এইখানে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের অনুকরণে আত্মার পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।

এই উক্তি পরোক্ষ ভাবে শিবের প্রশংসাও বটে, আবার কুলীন কন্যার বিবাহিত জীবনের দুঃখও বটে। তাই—

পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।

দেবী তাঁর রাঙা চরণ দুখানি রেখেছেন নৌকার সেঁউতির উপর। তাঁর পাদস্পর্শে তা সোনা হয়ে গেল। পাটুনী প্রণাম করে বর প্রার্থনা করেছেন—

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের মঞ্চকে ঈশ্বরী পাটুনী কিছুক্ষণের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সমস্ত জাতির প্রাণের কথাটা বলে গেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আমাদের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে। এক নূতন সাহিত্যাদর্শনও তখন থেকে গৃহীত হ'তে থাকে। আশ্চর্য হলে তথাপি স্বীকার করতে হয় যে কবি ভারতচন্দ্র বাংলা কাব্যের একজন শ্রেষ্ঠ কলাকার। মাইকেলেরও তিনি সমাদর লাভ করেছেন শুধু দুটি মাত্র সনেটে (অন্নপূর্ণার ঝাঁপি ও ঈশ্বরী পাটুনী)। মাইকেলের ছন্দোবদ্ধ পদের সুরে ভারতচন্দ্রের অত্যোধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন,—'রাজসভা-কবি রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য'। ভারতচন্দ্রের যেখানে কৃতিত্ব সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়। আলাওলের ক্লাসিক ও শ্রেষ্ঠ রচনার রীতির পরিণতি ভারতচন্দ্রের। বাংলা ছন্দের এমন যাদুকর তাঁর পূর্বে কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি। এক গোবিন্দদাস কবিরাজের সঙ্গে তাঁর কিছুটা তুলনা করা চলে। তাঁর অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ জন্মেছেন। কিন্তু তাঁরা জন্মেছেন একটা সম্পূর্ণ নূতন যুগে। অনেক উত্তরাধিকারীর সৌভাগ্যলাভ তাঁদের ঘটেছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র কারও উত্তরাধিকারী হতে পারেন নি। হয়তো তিনি মুকুন্দরামের পথ অনুসরণ করেছেন, কিন্তু একক চেষ্টার ফলে তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। যেমন তাঁর শব্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার, তেমনি তাঁরা অভ্রান্ত পদ চয়ন। এর দৃষ্টান্ত নানা ভাবে দিয়ে শেষ করা যায় না। বাংলা শব্দভাণ্ডারের দ্বার ফার্সি ও হিন্দির জন্য আলাওল প্রমুখ কবিরা উন্মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো তাঁরা ফার্সি ও হিন্দিকে এমন ভাবে দুহাতে গ্রহণ করতে পারেন নি। অথচ ভারতচন্দ্র প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শব্দকে গ্রহণ করেছেন যাচাই করে, বাছাই করে ও ওজন করে। প্রত্যেকটি ফার্সি ও হিন্দি শব্দের স্থান হয়েছে লালিত্যগুণের জন্য।

এই কারণে ভারতচন্দ্র একজন সুরকার ও শ্রেষ্ঠ কবি। তাই বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের স্থান অপরিসীম।

নারী-জাগরণ

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ॥

[১৩৫৪ সনের ২৪শে নভেম্বর নবদ্বীপ বঙ্গবাসী স্কুলে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ প্রতিভা রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত]

গোবিন্দবাবুর একান্ত ইচ্ছায় আজ আমি মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আজিকার বলিবার বিষয় শ্রীনিত্যগোপাল ও নারী জাগরণ। এ দেশের শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মকে, চৈতন্যকে, এককে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত, মায়া অনাদি কিন্তু অনন্ত নহেন। একদিন মায়ার রাজ্য ছাড়িয়া ব্রহ্মে পৌঁছাইতে হইবে, যতদিন সে অবস্থা না আসিতেছে ততদিনই মানুষ মায়ার রাজ্যে থাকিতেছে, যেদিন ব্রহ্মজ্ঞান হইবে সেদিন দূরছাই বলিয়া মায়াকে তাড়াইয়া দিব—ইহাই এদেশের শাস্ত্রের গোড়ার কথা—ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই সমাজ গঠিত। তাই তথাকথিত হিন্দু সমাজে মেয়েদের কোন নিজস্ব মূল্য নাই। ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ মায়ার স্বাতন্ত্র্য না থাকায় পুরুষ-কৌলীন্যের উপর বর্ত্তমান সমাজ গঠিত। শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্ম ও মায়ার সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন—ব্রহ্ম যেমন অনাদি অনন্ত, মায়াও তেমনি অনাদি অনন্ত। ...পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে...ব্রহ্মেরই একদিক ব্রহ্ম অন্য দিক মায়া। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন, পূর্ণ শব্দের দ্বারা ইহা বুঝা যায় না যে পূর্ণের বাহিরে আর কিছু নাই—পূর্ণ মানে নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ ...।...মায়াকে অস্বীকার করিলে মায়া অস্বীকৃত হইবে না, তাহারও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, তাহারও যে ব্রহ্মময়ী রূপ রহিয়াছে, এখন তাহাকে কেমন করিয়া হজম করিতে হইবে—ইহাই দেখিতে হইবে। ইহার আদর্শ রহিয়াছে বৃন্দাবনে। বর্ত্তমান নারী-প্রগতির মূলে রহিয়াছে রাধারাণীর ধাক্কা—যত অবহেলিত লাঞ্ছিতদের তিনিই ডাক দিয়াছেন, ওঠ, জাগ। সীতা-চরিত্রই ভারতবর্ষে শেষ নারী-চরিত্র নয়, যেখানে সীতা পাতাল প্রবেশ করিলেন, সেখানে রাধা ফুটিয়া উঠিলেন; রাধাই শেষ নারী-চরিত্র। সীতা পাতাল প্রবেশ করিলেন কেন? বার বার শ্রীরাম তাঁহার সতীত্বের পরীক্ষা চাহিলেন...দেবতাগণ পিতৃপুরুষগণ আসিয়া সীত নিষ্পাপ প্রমাণ দিলেন, তখন অগ্নি পরীক্ষা করিয় অযোধ্যায় লইলেন। কিছুদিন পরে সন্তান হইবার পরে আবার পরীক্ষা। তখন সীতা বলিলেন, আর না, পৃথিবী দ্বিধা হও—বার বার কতবার পরীক্ষা দেওয়া যায়? সীতার পাতালে প্রবেশ শ্রীরামের কার্য্যের প্রতিবাদ নিশ্চয়ই। এখানে উঠিলেন শ্রীরাধা স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা রূপ লইয়া—বলিলেন, আমি ক্লীব স্বামীর ঘর করিব না, আ পুরুষোত্তমের খোঁজে ঘরের বাহির হইব। বর্ত্তমান যুগে ঘর-ছাড়া মেয়েদের একমাত্র বান্ধব শ্রীরাধারাণী। এদে গৌরী দানের ব্যবস্থা ছিল। ১০-১২ বৎসর বয়স হইলে তো একটা স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা মানুষের হয়, সে বুদ্ধি জন্মিবার পূর্ব্বেই বিবাহ দিয়া স্বামী পরম গুরু, তাহা পাদোদক খাওয়াই নারী-জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া ম মেয়েদের সতী বানাইয়া রাখিয়াছিলেন। মনু-বাক্য—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার অধী যৌবনে স্বামীর, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন—স্ত্রীলোকের কো স্বাধীনতা নাই। রাতদুপুরে স্বামী মদ খাইয়া আসিলে কোনও প্রশ্ন করিবার অধিকার নারীর ছিল না—কি আজ কি তাহা পারিবে, না পারা উচিত? আজ পুরুষ যোগ্য হইতে হইবে, নারীকেও যোগ্য হইতে হইবে, তবে হইবে মিলন। স্বাধীন পুরুষের সঙ্গে স্বাধীন প্রকৃতি স্বাধীন মিলনের চিত্রই বৃন্দাবনে রহিয়াছে। এদেশে মেয়েদের অস্তিত্ব পুরুষের মাঝে মুছিয়া ফেলিয়া সমা গড়িয়াছিল, এখন তো সে সমাজ ভাঙিয়া চুরমার হই

গিয়াছে। এখন কি করিবে? নারীকে ঘরের কোণে রাখিয়া পুরুষেরা বাহিরে এক রূপে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, আজ নির্য্যাতিতা প্রকৃতি রাধারাণীর ধাক্কায় পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে; এখন আগেকার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হইবে কেমন করিয়া? নারী ছিলকা মোহিনী বাতকা বাঘিনী—তার রক্ত শোষে—. দুনিয়া সব বাউরা হো গয়া ঘর ঘর বাঘিনী পোষে—এ-ও তো আমাদের দেশের গান ছিল। আজ যে সমস্ত বাঘিনী ঘর ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এখন উপায় হইবে কি?—আজ মেয়েরা কোথায় নাই?—স্কুলে কলেজে হাসপাতালে পুলিশে মহীশূরে ট্রামে বাসে ঘরে বাইরে সর্বত্র বাঘিনীরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে—এইবার পুরুষেরা সামাল দাও। একথা তো মিথ্যা নয় নারী পুরুষ একত্র হইলে অনর্থ হয়, তাই শাস্ত্রে লিখিয়াছে মা মেয়ে ভগিনী কাহারও সহিত নির্জনে একত্রে বসিতে নাই, বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম পণ্ডিতের মনও আকর্ষণ করে। কোন্ সাহসে তবে আজ ২২।২৪ বৎসরের ছেলেমেয়েকে একত্রে স্কুল কলেজে পাঠাইতেছেন? আমি অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা যে ছেলেমেয়েদের এই বিপজ্জনক অবস্থায় পাঠাইতেছেন, ছেলেমেয়েদেরকে আত্মরক্ষার কি মন্ত্র শিখাইয়া দিয়াছেন? বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং বিপদ হইতেছেও। কোনও অভিভাবক চান না যে তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা বিপদে পড়ুক—কিন্তু বর্ণাশ্রমীয় চিন্তাধারায় তাঁহাদের সামনে কোন পথ নাই। আর কি মেয়েদের স্কুল কলেজ ছাড়াইয়া ঘরে ঢুকানো যাইবে? যাইবেও না, যাওয়া উচিতও নয়। এখন একমাত্র বান্ধব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যিনি প্রকৃতির সকল অঙ্গ স্পর্শ করিলেও অনঙ্গ যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে জীবনে বরণ না করিতে পারিলে বর্ত্তমান বিশ্ব কামের আগুনে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। মেয়েদের কানে পুরুষোত্তম পুরুষোত্তম এই জপ করিবার মন্ত্র শিখাইয়া দিন। কাপুরুষের নিকট যেন তাহারা আত্মসমর্পণ না করে। ছেলেদেরও শিখাইয়া দিন তাহারা যেন পুরুষোত্তম হয়, কাপুরুষের পর্য্যায়ে যেন তাহারা যাইয়া না পড়ে। মেয়েরা রাস্তায় বাহির হইয়াছে ইহাতে দোষ নাই, কিন্তু তাহারা যদি আত্মসম্মান-বোধ হারাইয়া কাপুরুষের পাল্লায় পড়িয়া লাঞ্ছনা ভোগ করে, সেইটা হইবে দোষের কথা। মেয়েদের এই দৃঢ় সংকল্প লওয়া উচিত যে কোন কাপুরুষের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া লাঞ্ছিত হইব না, যদি পুরুষোত্তম পাই তবেই তাহার নিকট জীবন সমর্পণ করিব। নারীরও যে নর-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, নারীও যে মানুষ, কেবল পুরুষের মর্য্যাদাতেই যে তাহার মর্য্যাদা নয়, নারীরও যে নিজস্ব মর্য্যাদা আছে—এই বোধ নারীর মধ্যে জাগ্রত করিতে হইবে। কৃষ্ণের মত কেহ যদি বরণ করিয়া লয়, তবেই তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করা যায়। নারীরা যখন খুব সহজ হইয়া পড়ে তখন যেমন তেমন করিয়া নারীকে ভোগের পুতুল সাজাইয়া পুরুষ ভোগ করিয়া থাকে। বৃন্দাবনে শ্রীরাধা ইহারই প্রতিবাদ।...স্বাধীন-ভর্তৃকা রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাকে ভজনা করিয়াই রাধা-সঙ্গ হইয়াছিলেন, ভিক্ষা নহে। ক্লীবত্ব মানে অযোগ্যতা। যে পুরুষেরা মেয়েদের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের খোরাক দিতে পারে না, তাহারাই তো পতি হওয়ার অযোগ্য, ক্লীব। কে আজ মেয়েদের মর্য্যাদা দিতে পারিতেছে, কে তাহাদের সর্বকোষের খোরাক দিতে পারিতেছে? এই যে পাকিস্থানে মেয়েরা মুসলমান কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইল, কয়জন স্বামী পিতা ভাই তাহাদের রক্ষার জন্য জীবন দিয়াছে? পুরুষেরা তো মেয়েদের ভার লইয়াছিল। মেয়েদের ঘরের কোণে রাখিয়া কোনো শিক্ষা না দিয়া তাহাদের অধীনে রাখিয়াছিল, যখন তাহাদের রক্ষা করিতে পারিবে না, তখন তাহাদের আত্মরক্ষার ভার তাহাদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত ছিল, তাহাদের হাতে আত্মরক্ষার অস্ত্র দেওয়া উচিত ছিল। নিজেদের হাতে এতখানি ভার রাখা কি সঙ্গত হইয়াছিল? অথচ আজ যখন তাহারা ধর্ষিত হইল, তখন তাহাদিগকে ঘরে লইবার মত সাহস, মনের বল তাহাদের নাই? ভোগের পথে কেহ কাহাকেও পাইবে না। ভোগের পথে লক্ষ্মীকে পাইতে গিয়া রাবণ ধ্বংস হইয়াছে, এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি সব মরিয়াছে। সীতা রামের; রুক্মিণীকে কৃষ্ণই

পাইয়াছেন, শিশুপাল পায় নাই। [illegible] নিজের গোপীকে চাহিয়াছিল, পায় নাই। গোপী সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে, স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥

—ইহাই প্রকৃতির—শক্তির—চ্যালেঞ্জ। আমাকে, শক্তিকে জয় না করিয়া আমাকে ভোগ করিতে পারিবে না। একজন পুরুষ প্রকৃতির এই ঘোষণাকে মানিয়া লইয়া সকল আক্রমণকে দমন করিয়া মদনমোহন হইয়াছেন। রাসলীলায় তো ইহারই চিত্র। বিশ্বরূপ না হইয়া মদন মোহন হওয়া যায় না।...বৃন্দাবন পরকীয় দেশ—সেখানে প্রত্যেকে স্বাধীন স্বতন্ত্র থাকিয়া প্রত্যেকে অপরের অধীন, অপরের হাত ধরাধরি করিয়া সঙ্ঘ গঠন করিয়া আছে। ব্রজগোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের পরকীয় সম্বন্ধ, কৃষ্ণ যশোদা-নন্দের পরকীয় পুত্র। এইরূপ পরকীয় করিয়া অর্থাৎ অপরকে স্বাধীন রাখিয়া, তাহার স্বতন্ত্র মর্যাদা ও সত্তা রক্ষা করিয়া, তাহাকে অপরের মাঝে নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া না দিয়া স্ত্রীকে স্বামীর, স্বামীকে স্ত্রীর, পুত্রকে পিতার, পিতাকে পুত্রের, বন্ধুকে বন্ধুর পাইতে হইবে, নহিলে কেহ কাহারও সত্যিকারের পাইবে না। তুমি ভোগ করিবার কে? তোমার ছেলে, তোমার স্ত্রী বিশ্ব সম্পত্তি। কার ধন তুমি একলা ভোগ করিবে? তোমার স্ত্রী শুধু তোমার নয়, সে তোমার পরিবারের, তোমার সমাজের, তোমার বিশ্বের। এতখানি বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে তাহাকে রাখিয়া তবেই তুমি ভোগ করিতে পার। কে আমি? আমার এই ৭২ বৎসর বয়স। লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন খাইয়া, স্নেহ প্রীতি লইয়া আমি পুরুষোত্তমানন্দ। আজ বাবা যদি বলেন আমি যাহা দিয়াছি তাহা ফিরাইয়া দাও, মা যদি বলেন, পাড়াপ্রতিবেশী যদি বলেন যাহা দিয়াছি ফিরাইয়া দাও, তাহলে আমার থাকে কি? কৃষক যদি বলে তাহার অন্ন ফিরাইয়া দিতে, রাজমিস্ত্রী যদি বলে তাহার ঘরে থাকিতে পারিবে না, তাহা হইলে আমি থাকি কোথায়? কিন্তু সর্ব মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা মানুষ মনে রাখে না। এই অকৃতজ্ঞতায় ভারতবর্ষ মরিতে বসিয়াছে। তাই প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, আমি একা মুক্তি চাই না, সকলের যেদিন মুক্তি হইবে, সেইদিন আমি মুক্ত হইব। ইহাই ভাগবত ধর্ম।

সকলকে বাদ দিয়া পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বকে বাদ দিয়া কেবল নিজেরই ভোগে লাগাইবার অথবা নিজেরই ত্যাগের পথে চলিবার প্রচেষ্টাই কাম। পিতামাতা পরিবার সমাজ বাদ দিয়া স্ত্রীকে লইয়া লক্ষ্ণৌ যাইয়া ভাবিতেছ বাঁচিলাম, স্ত্রী আর তুমি মাঝে কেহ নাই—সেইখানেই মরণের বীজ ঢাকিয়া আনিয়াছ। কোন্ কৌশলে ভোগ করিয়া ভোগ না করা হয়, কোন্ পথে ত্যাগ ভোগপথ-বাধা হইয়া না দাঁড়ায়, তাহা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিশ্বকে শিখিতে হইবে। ব্রজে সহস্র নারী পরিবেষ্টিত হইয়াও কেমন করিয়া তিনি অখণ্ড আত্মারাম অর্থাৎ আত্মক্রীড় ছিলেন, সেই কৌশল শিখিতে হইবে। গোপালতাপনী উপনিষদ্ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কথং কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী? একদিন ব্রজগোপীগণ দুর্বাসা মুনিকে পারণ করাইবার জন্য দধি দুগ্ধ নব মাখন লইয়া মথুরায় রওনা হইয়াছেন—যমুনায় নৌকা নাই, প্রবল তরঙ্গ; কেমন করিয়া পার হইবেন? তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পার হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যমুনাকে যাইয়া বল যে শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও স্ত্রী-সঙ্গ না করিয়া থাকেন, তবে হে যমুনা, পথ দাও। গোপীগণ আশ্চর্য হইলেন, তবু কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস করিয়া যমুনাকে যাইয়া তাহাই বলিলেন। যমুনা পথ দিল, গোপীগণ মথুরা যাইয়া দুর্বাসাকে যথোপযুক্তভাবে আহার করাইল দুর্বাসা সমস্তই খাইয়া শেষ করিলেন। ফিরিবার সময় আবার সেই পথের প্রশ্ন। তখন গোপীরা দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা ফিরিব কিরূপে? দুর্বাসা বলিলেন, যমুনাকে যাইয়া বল দুর্বাসা যদি কোনদিন কি না খাইয়া থাকেন, তবে যমুনা আমাদের পথ দাও। গোপীরা এবারেও আশ্চর্য হইলেন। তবু দুর্বাসার কথায় কাজ করিয়া পথ পাইলেন। তখন তাঁহারা গান্ধর্বিব শ্রীরাধাকে অগ্রে লইয়া যাইয়া দুর্বাসাকে প্রশ্ন করিল 'কথং কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী', 'কথং দুর্বাসা অনাহারী মুনি'

তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে দুর্বাসা বলিলেন, 'যো কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি, যোঽকামেন কামান্ কাময়তে স অকামী ভবতি'। যে কাম দিয়া কাম কামনা করে সে কামী, যে অকাম দিয়া কাম কামনা করে, সে অকামী হয়। ঘটনাকে ঘটনা দিয়াই বিচার করা যায় না—বিচার করিতে হয় তাহার পশ্চাতের মনোবৃত্তি দিয়া। লোভী যে মনোবৃত্তি লইয়া খায়, নির্লোভ সে মনোবৃত্তি লইয়া খায় না, অথচ দেহরক্ষার জন্য নির্লোভ ব্যক্তিও খাইয়া বাঁচিয়া আছে। মনের স্তরে মানুষ হয় খায়, নয় খায় না; হয় সংসার করে, নয় সংসার করে না—দুই পথেই মানুষের মৃত্যু। মধ্যম পথ হইতেছে প্রাণের পথ—সেই প্রাণের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের নিকটই শিখিতে হইবে কেমন করিয়া সকল কর্ম করিয়াও কর্মে লিপ্ত না হইয়া থাকা যায়, খাইয়াও না খাওয়া হয়। ভারতবর্ষ এই প্রাণের পথ ধরিয়াই আজ গৌরবান্বিত হইবে। এই পথই ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে—সে কোনও ব্লকে যোগ দিবে না, সে আমেরিকার দিকেও নয়, রাশিয়ার দিকেও না—এইখানেই সে বাঁচিবে। পাকিস্থান মরিবে হিন্দু-বিদ্বেষে, তাহার বুদ্ধি মরণের বুদ্ধি—ভস্মলোচনের গল্পের মত। ভস্মলোচন তো শিবের আরাধনা করিয়া ভোলা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া বর লইয়াছে যাহার মাথায় সে হাত দিবে, তাহার মাথাই পুড়িয়া যাইবে। বর পাইয়া ভস্মলোচন বলে, তবে ঠাকুর তোমার মাথায় হাত দিয়া বর পরীক্ষা করিয়া দেখি। শিব বোকা মানুষ—তিনি আত্মরক্ষার জন্য দৌড় দিলেন—দৌড়াইয়া বিষ্ণুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু দুষ্ট ঠাকুর। তিনি বলিলেন, ভস্মলোচন, দেখ দেখ, তোমার মাথায় পাখী মলত্যাগ করিয়াছে। ভস্মলোচন তাড়াতাড়ি নিজের মাথায় হাত দিয়া পুড়িয়া মরিল! পাকিস্থানেরও সে অবস্থা। হিন্দু-বিদ্বেষের উপর যাহার ভিত্তি, তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য...সেইরূপ মেয়েরা যেন পুরুষ-বিদ্বেষকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা না চায়। পুরুষ-বিদ্বেষে স্বাধীনতা তাহাদের থাকিবে না। কোনটাতে তীব্র আসক্তি, আর অপর কোনটাতে বিদ্বেষ মনের স্তরের কাজ—হয় সংসারে আসক্তি, বৈরাগ্যে বিদ্বেষ, নয় বৈরাগ্যে আসক্তি, সংসারে বিদ্বেষ—কোনও এক পথেই জীবনের সমস্যার সমাধান হইবে না। রাধারাণী তাই বলিলেন, এ কূলে ও কূলে দুকূলে গোকুলে আপনা বলিব কায়, শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়। আমার সংসারের কূলে, সন্ন্যাসের কূলে কেহই আপনার বলিয়া নাই, মধ্যমপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ—তাই তাঁহার শীতল চরণে আশ্রয় লইলাম। ভারতবর্ষ শুধু জননী জননী বলিয়া চেঁচাইয়াছে, পাশ্চাত্য রমণীরূপে মুগ্ধ—কাহারও নিকট জীবনের সমস্যার সমাধান হয় নাই, মীমাংসা পায় নাই—অবস্থা আরও জটিল হইয়াছে। নারী শুধু রমণীও নয়, শুধু জননীও নয়—সে দুই-ই। ভারতবর্ষ শুধু জননীরূপের সেবা করিতে যাইয়া আজ পাশ্চাত্যের রমণীদের ধাক্কায় পড়িয়া চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, সে তাহার স্থিতি হারাইয়া ফেলিয়াছে—এই যে নাচগান শিক্ষা ইহা তো রমণীত্বেরই প্রকাশ, আজ মেয়েরা আর জননী হইতে চায় না। জননীত্ব সাধনার কত বড় ব্যর্থতা এটা। একদিকে অতিরিক্ত জোর দেওয়াতেই এই বিপদ ঘটিয়াছে। আগে রমণী, তাহার পর জননী, রমণী না হইয়া তো কেহ জননী হইতে পারে না। তাই আজ চাই সার্থক রমণীত্ব, সার্থক জননীত্ব। শিবদুর্গার দেশ ভারতবর্ষ—সেখানে সার্থক রমণীত্ব ও জননীত্বের আদর্শ। মেয়েদের আজ সেই আদর্শ লইতে হইবে। বিশ্বরূপ নারী বিশ্বরূপ পুরুষের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ প্রাণখোলা মিলনের উপর সমাজ গড়িতে হইবে। মেয়েদের ভজনার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, ভোগের দৃষ্টিতে নয়—নারী নারায়ণী, নারী ব্রহ্ম-মহিষী। মেয়েরা যে শুধু ভোগের জিনিষ নয়, পূজার জিনিষ—এই কথা নিজেরা বোঝ, পুরুষদের বুঝাইয়া দাও। আমার সারা জীবনের সাধনা নারীর ব্রহ্মময়ী রূপ দেখা। আমার রাধারাণী চিন্ময়ী নয়, আমার রাধারাণী মৃন্ময়ী। আমি এই মাটির জগতের মেয়েদের মধ্যে রাধারাণীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, লক্ষ লক্ষ মেয়ের সঙ্গে মিশিয়াছি, প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছি—কেহ আসে নাই। আমার ইচ্ছা ছিল কংগ্রেসের পতাকা মেয়েদের হাত দিয়া আসুক। আমিই সর্ব্ব প্রথম মেয়েদিগকে রাস্তায় নামাইয়াছিলাম। শ্রীনিত্য-

গোপাল-জীবন ও দর্শন অনুসরণ করিয়া আমি প্রস্থানত্রয়ের যে নূতন ভাষ্য লিখিয়াছি, সেখানে মেয়েদের মর্যাদাপূর্ণ আসন রচনা করিয়াছি, মেয়েদের মর্যাদাহানীকর এক কলমও লিখি নাই, লিখিব না। আমি সন্ন্যাসী হইয়া আমার স্ত্রীকে সঙ্গে রাখিয়াছি। একদিন সাহানগর রোড আশ্রমে রামকৃষ্ণ মিশনের এক ভক্তমহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বাবা, আপনি সন্ন্যাসী, আর আপনার আশ্রমে যিনি আছেন তিনি নাকি আপনার স্ত্রী? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আমি আমার স্ত্রীকে ইচ্ছা করিয়াই রাখিয়াছি এইজন্য যে, আপনারা প্রশ্ন করিবেন আমি উত্তর দিব; আমি প্রমাণ করিব স্ত্রী হইয়া তিনি আমার মালাঝোলা কাড়িয়া লন নাই, আমার ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের পথে বাধা হন নাই, তিনি প্রমাণ করিবেন স্বামীর ভগবৎ পথে তিনি বাধা তো হয়েনই নাই বরং সাহায্য করিয়াছেন। উনি আমার গুরু, তাই সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছি। আজ তোমরা নিজেদের স্ব স্থানে স্থিত হইয়া স্ব জ্যোতিতে জগন্ময়ীরূপে বিশ্বের সামনে ফুটিয়া উঠ—ইহাই আমার প্রার্থনা। নিত্যগোপাল তোমাদের এই গৌরবের স্থান দিয়া গিয়াছেন, তোমরা যদি তাহা না লও আমি আর কি করিব? তোমাদের কাছে আমার এই আকুতি রহিল, তোমরা মানুষ হও। শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন।

বিবেকানন্দ

॥ শ্রীজগন্নাথ সাহা ॥

শতেক বর্ষ পূর্ব আজিকে উদিল ভারতে বিবেকানন্দ
বাংলার মাটি করিয়া পুণ্য বিশ্ব জগত করিয়া ধন্য।

• • • •

বাঙালী তরুণ নরেন দত্ত কণ্ঠে ধ্বনিল সুর উদাত্ত
বিশ্ব সভায় দাঁড়ায়ে ঘোষিল মহাভারতের ধর্ম-তত্ত্ব
কর্ম জ্ঞানের মাধুরী ছানিয়া প্রচার করিল বেদের ধর্ম
বিস্মিত করি বিশ্ব জগত ধ্বনিত হইল ধ্যানের মর্ম
জননী ললাটে জয়টীকা দিল তরুণ তাপস বিবেকানন্দ
কর্ম ভক্তি জ্ঞানের যোগীরে বক্ষে ধরিয়া জননী ধন্য।

• • • •

শ্রীরামকৃষ্ণের মানস পুত্র দুরন্ত শিশু নরেন দত্ত
পাষাণী মায়ের বক্ষ চিরিয়া ক্ষীর ধারা পানে হইল মত্ত
সমন্বয়ের দীক্ষা লভিয়া কম্বু কণ্ঠে ঘোষিল বাণী
বহু সাধকের বহু সাধনায় বহু ভাবধারা আনিল টানি
এই ভারতের মহানতীর্থে মহাপুরোহিত বিবেকানন্দ
মতের পথের মিলন মন্ত্রে আনিল বিশ্বে মিলনানন্দ।

• • • •

জীবেরে পূজিয়া শিবের আসনে মেথর মুচিরে করিয়া শুচি
ত্যাগেরে বাঁধিয়া ভোগের বাঁধনে আত্মাহুতির যজ্ঞ রচি
বীর্যহীন জাতিরে ডাকিয়া কহিল দেশ জননীর তোমরা বলি
সীতাসাবিত্রী ভোলা মহেশের মহান আদর্শ যেয়োনা ভুলি
তাঁর জনমের শততম দিনে অর্ঘ্য বহিয়া আমরা ধন্য
জয় ভারতের সনাতন শিখা জয়তু স্বামী বিবেকানন্দ।

কর্ণ সুবর্ণ

।। অধ্যাপক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ।।

আমাদের এই যে বাংলা দেশ এর অনেক সহরের নাম আমরা জানি—ইহার রাজধানী কলকাতা সহর; কিন্তু কলকাতা সহরও আর চিরকাল এইরকম বড় সহর ছিল না। কি বল কলকাতা সহর কি বরাবরই এই রকম জাঁকজমকের সহর ছিল? বুড়ো পণ্ডিত মশাইদের অথবা বাবা কাকা বা ঠাকুরদাদের জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারা যাবে যে কলকাতা মাত্র সেদিন এত বড় হয়েছে—এমনকি ৩০ ৪০ বছর আগেও কলকাতা এত বড় ছিল না। তখনও সেখানে সন্ধ্যে বেলা শেয়াল ডাকত, পথের আলো ছিল টিমটিমে আর রাস্তা ফুটপাথ সবই ছিল মেটে। আরো কিছু আগে কলকাতায় ইলেকট্রিক ট্রাম চলতো না, তখন ছিল ঘোড়ায় টানা ট্রাম। ঘোড়ায় টানা মফস্বলের রেওয়াজ এই সেদিন অবধিও ছিল। আরো ৭০।৮০ বছর আগেও যে কলকাতা ছিল তার চেহারা ছিল আরো আলাদা; ছোট ছোট গ্রাম সুতানুটি গোবিন্দপুর হোগলপুড়ে। এই গেল এখনকার রাজধানী কলকাতার কথা।

কিন্তু মাত্র শ'দুই বছর আগেও কলকাতার চেয়েও বড় সহর ছিল ঢাকা। তখন সেইটাই ছিল বাংলার রাজধানী। আরো কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলার রাজধানী। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর নামেই মুর্শিদাবাদের নামকরণ হয়। এখনও মুর্শিদাবাদের নবাবদের খুব খাতির, কিন্তু মুর্শিদাবাদ এখন রাজধানী নয়—সেখানে রাত্রে সাপ ও বাঘের ভয় আছে—রাস্তায় সেখানে জোনাকীর আলো! এত গেল মাত্র ২।৩ বা ৪'শ বছর আগের কথা, কিন্তু আজ আরো অনেক আগেকার বাংলা দেশের সহরের বিষয় জানাবার চেষ্টা করবো।

হাজার দেড় হাজার বছর আগেকার কথা, তখনকার বাংলা দেশের কি অবস্থা ছিল—কেমন ছিল তখনকার গ্রাম আর কি ছিল তাদের নাম—এই সব জানতে সকলেরই নিশ্চয় খুব আগ্রহ হয়। সেই সব নগরের কোন চিহ্নই আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে দুচার জায়গায় হয়ত সামান্য কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। সেই সব চিহ্ন আর সেই হাজার দেড় হাজার বছর আগের বিদেশীয় বণিক ও চৈনিক পরিব্রাজকদের লেখা মিলিয়ে আমরা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পেয়ে থাকি। সেই কালের বাংলা দেশের অনেক সহরের নাম আর এখন নেই, অনেক বদলে গেছে, লোকেও তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুলে গেছে। বাংলা দেশের ভুলে যাওয়া এমনি কয়েকটি জায়গার বিষয় এখন আলোচনা করা হবে।

তার প্রথমটি হচ্ছে কর্ণ সুবর্ণ বা কান সোনা। কর্ণ সুবর্ণকে চলতি ভাষায় কান সোনা বলা হয়। কর্ণ সুবর্ণ ঠিক কোথায় মানে কোন্ জায়গার নাম ছিল সে সম্বন্ধে সকলে ঠিক এক মত না হলেও কর্ণ সুবর্ণ যে বাংলা দেশেরই এক অংশ এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈত নেই। হাজার দেড়হাজার বছর আগে বা আরো আগে এই বাংলা দেশের কি কি অংশ কি কি নামে পরিচিত ছিল অনেকের হয়ত জানা নেই। স্বাধীন হবার আগের বাংলা দেশের ৫টি ডিভিসনের নাম হয়ত অনেকে জানো। ভূগোল ক্লাশে প্রেসিডেন্সি বর্ধমান রাজসাহী ঢাকা ও ও চট্টগ্রাম বিভাগের কথা সকলেই জানো। আবার এদের ভেতর হাওড়া হুগলী চব্বিশপরগণা মুর্শিদাবাদ মালদহ জলপাইগুড়ি দিনাজপুর রংপুর ইত্যাদি আরো অনেক জেলার নামও সবাই জানে। এর মধ্যে আবার পাকিস্তান এ নানা অংশ চলে গেছে।

পুরাণো বাংলা দেশের কয়েকটা ভাগের নাম অনেকেরই জানা নেই। বাংলা দেশ ও তার আশে পাশের দেশের নাম হয়ত কেউ কেউ শুনে থাকবেন। এর মধ্যে অঙ্গ বঙ্গ

কলিঙ্গ কামরূপ তীরভুক্তি মগধ সমতট ডাবক ; এগুলি ইতিহাসের ছাত্রদের জানা নিশ্চয়ই। বাংলাদেশের মধ্যে আবার গৌড় পুণ্ড্রবর্ধন কর্ণ সুবর্ণ তাম্রলিপ্তি ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। এই সব নামের চলন ছিল প্রায় হাজার দেড় হাজার বছর আগের বাংলা দেশে। এর মধ্যে অনেক জায়গার আধুনিক নাম ও পৌরাণিক নাম ঠিক কোন জায়গায় তা ঠিক করা হয়ে গেছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেছে। যেমন আজকালকার মালদহ অঞ্চলই সেকালের গৌড়, আজকালকার তমলুক ছিল সেকালের তাম্রলিপ্তি, সেকালের তীরভুক্তি ছিল এখনকার ত্রিহুত।

কিন্তু অনেক জায়গায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও আমাদের হাতে আসেনি। কর্ণ সুবর্ণ জায়গাটি এই জাতীয়। ঠিক কোন জায়গাটির ছিল কর্ণ সুবর্ণ নাম, কতখানি ছিল তার আয়তন, কি করে তার নাম গেল বদলে এর সঠিক কোন বৃত্তান্ত আজও ঐতিহাসিকরা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারেনি।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী মানে প্রায় বারশ বছর আগে গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণ সুবর্ণ। অনেকে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের সন্নিকটে ভাগিরথীর পশ্চিম কূলে দক্ষিণ রাঢ় দেশস্থ রাঙা মাটির সঙ্গে কর্ণ সুবর্ণের সনাক্ত করতে চেষ্টা করেন। এই কর্ণ সুবর্ণের মধ্যেই আবার পুণ্ড্র বর্ধন ভুক্তির খানিক অংশ মিশে আছে—পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি উত্তর বঙ্গ অঞ্চল বলে বিদিত। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ সেকালে আলাদা নামে পরিচিত ছিল—বঙ্গ সমতট এই ছিল তার নাম।

মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের নাম তোমাদের ইতিহাসে তোমরা সবাই পড়েছ। এঁর সময়কার যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতেও এই বাংলাদেশের ও তার চতুষ্পার্শ্বের দেশের নাম পাওয়া গেছে। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিসেনের লেখা এই প্রশস্তিতে দেড় হাজার বছর আগেও মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য কত বড় ছিল, কেমন ছিল তার আয়তন, কি ছিল তখনকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশ ও প্রদেশের নাম তা পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে মাত্র একটি উল্লেখ করা হচ্ছে—এতে বাংলাদেশের ও আশেপাশের দেশের নাম আছে সমতট ডাবক কামরূপ নেপাল কর্তৃপুরাদি প্রত্যন্তঃ নৃপতিভি মালব আর্জুনায়ন যৌধেয় মাদ্রক আভির প্রার্জুন সনকানিক কাক খর পরিকাদিভিশ্চ সর্ব্বকরদান ইত্যাদি।

মহারাজ সমুদ্রগুপ্তকে সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন রাজারাও কর দান করে সন্তুষ্ট রাখতেন। সেই সীমান্ত প্রদেশের মধ্যে সমতট ডাবক কামরূপ নেপাল ইত্যাদিতে আজকালকার বাংলাদেশ ও তার পারিপার্শ্বিক বাংলা দেশের কথা বলা হয়েছে।

গুপ্ত রাজাদের অনেক পরের কথা—মহারাজ শশাঙ্ক তখন গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করে আছেন। এঁর সময়েই হিউয়াং চুয়াং এদেশে এসেছিলেন। এবং এঁর লেখ থেকেই আমরা জানতে পারি যে পূর্বভারতে মহারাজ শশাঙ্ক তখন দিগ্বিজয় করে গৌড়াধিপতি বলে খ্যাতি লা করেছিলেন। এঁর রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণ সুবর্ণ। শশাঙ্ক প্রথমে কর্ণ সুবর্ণে নিজ প্রভাব বিস্তার কে ক্রমে ক্রমে উত্তরে পুণ্ড্রবর্ধন ও দক্ষিণে গঞ্জা ব রোহিতাশ্ব গিরি ও পশ্চিমে কাশী বা বারাণসী অব নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। রোহিতাশ্বগি আজকালকার রোটাসগড়ে। দক্ষিণেও ইনি ওড়্রা উড়িষ্যার দক্ষিণস্থিত গঞ্জাম অবধি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। মহারাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধী ছিলেন। এ জায়গায় চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়াং চুয়াং বলে গেছেন পূর্ব্ব ভারতের কর্ণ সুবর্ণাধিপতি শশাঙ্ক অন্যায় ভা হর্ষবর্ধনের ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে নিহত করেন। শশাঙ্কে পর কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্মন কর্ণ সুবর্ণ অধিকা করেন এই খবর আমরা শ্রীহট্টের নিধনপুরে প্রাপ্ত তা শাসন থেকে পেয়ে থাকি।

অনেকের মতে মহারাজ হর্ষবর্ধন ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্কে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য জয় করেন। সমসাময়িক ম মুদ্রায় আমরা শশাঙ্কের পরাজয়ের উল্লেখ পেয়ে থাকি আসাম বা কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্মন বেশিদিন কর্ণ সুব রাজত্ব করতে পারেন নি। প্রায় এক শতাব্দী পরে পা

রাজাদের অধীনে বঙ্গ ও মগধ এক বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। হিউয়াং চুয়াং-এর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে আমাদের তখনকার বাংলাদেশ ৫টি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত ছিল। তাদের নাম ছিল কজঙ্গল, পুণ্ড্র বর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি কর্ণ সুবর্ণ। এর মধ্যে কর্ণ সুবর্ণ বাদ বাকী সব কটাই সম্ভবতঃ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কারণে চৈনিক পরিব্রাজক আর এদের রাজাদের নাম করেন নি।

বাঙলাদেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এখন যাকে রাজমহল অঞ্চল বলা হয় তখন তার নাম ছিল কজঙ্গল। এখানকার জমি ছিল নীচু ও স্যাঁৎসেঁতে, এতে ধান হত প্রচুর। শীতের চেয়ে গরমই ছিল বেশী। এখানকার লোকেরা ছিল বিদ্বান ও স্পষ্ট বক্তা। উত্তর বঙ্গ তখনকার পুণ্ড্র বর্দ্ধন—বসতি ছিল খুব ঘন নানা রকম ফল ও ফুলে পরিপূর্ণ ছিল এই প্রান্তর। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ছাড়াও অনেক জৈনদের বাস ছিল। এখন পাকিস্তান হলেও পূর্ব্ব বঙ্গের তখনকার নাম ছিল সমতট। সমুদ্রের কাছে এখানে দিগম্বর নির্গ্রন্থ জৈন বৌদ্ধ স্থাবর ও ব্রাহ্মণ সকলেই থাকতেন। সেকালের বাংলাদেশের ব্যবসার বড় কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্তি—আজকালকার তমলুক। এখন তমলুক জলের ধার থেকে অনেক দূর হলেও সেকালে তাম্রলিপ্তি ঠিক জলের ওপরেই ছিল।

শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ সুবর্ণে অনেক লোকের বাস ছিল। এদেশে লোকের ধনদৌলত ছিল অনেক, এরা বুদ্ধিমান ও বিদ্বান রূপে খ্যাতি ছিল। এদের চরিত্রও ছিল মধুর। এখানে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি অনেক লোক বসবাস করতেন।

রাজধানী কর্ণ সুবর্ণের পাশেই বড় বৌদ্ধ মঠ ছিল। এই মঠের নাম চৈনিক পরিব্রাজক লিখেছেন লো তো-মো চি। এই মঠ অতি সুন্দর ও অতি বিখ্যাত, এতে অনেক বিদ্বান ও ভিক্ষুরা বসবাস করতেন। এই লো তো-মো চিকেই রক্ত মৃত্তিকা বা রাঙামাটি বলা হয়। রাঙামাটি কোথায় তা তোমাদের গোড়াতেই বলেছি। হিউয়াং সং-এর মতে কি—লো—না—সু—ফ—ল—না—বা। কিরণ সুবর্ণ বা কর্ণ সুবর্ণের রাজধানী ছিল তমলুক বা তাম্রলিপ্তি থেকে সাত শো লি উত্তর পশ্চিমে। সাতশো লি মানে প্রায় ১১৭ মাইল।

এ হিসাবে অবশ্য কর্ণ সুবর্ণ ঠিক মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটির সঙ্গে খাপ খায় না, তবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খনন আরো কিছু না এগোলে এবিষয়ে সঠিক ভাবে কিছু বলতে পারব না। সে যাই হোক, কর্ণ সুবর্ণ মুর্শিদাবাদেই হোক বা অন্য কোন জেলাতেই হোক কর্ণ সুবর্ণ যে এককালে বাংলাদেশের রাজধানী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব আর একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা। সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ কোন্ দিকে নির্দেশ ? যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যেদিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যেদিকে বিশ্বমানব।'

—রবীন্দ্রনাথ

পাঠক্রমে সমাজ-বিদ্যা

॥ অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত ॥

কিছুদিন হইল ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে সমাজবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সমাজবিদ্যা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকেই হইয়াছে, কিন্তু ভারতের উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে সমাজবিদ্যার অন্তর্ভুক্তি মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশে হইয়াছে। আমাদের দেশে আজ সমাজ জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন আনয়ন আবশ্যক। বিভিন্ন পাঠ্যক্রম সম্বলিত নূতন নূতন বিদ্যালয় মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ মত স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত বিদ্যালয়ের নূতন নূতন পাঠ্যক্রম ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিকোণ প্রসারিত করিবে এবং ছাত্রছাত্রীরা ভারতের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়িয়া উঠিবে, এই আশায় পাঠ্যক্রমের মধ্যে যে বিষয় ভবিষ্যৎ ছাত্র-সমাজকে উপযুক্ত নাগরিক রূপে গড়িয়া তুলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমাজবিদ্যা এইরূপ একটি পাঠ্যক্রম যাহার মধ্যে গঠনমূলক সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। সমাজবিদ্যা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এমনই একটি বিষয় যাহাতে অতীত ও বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে বিশদরূপে ধারণা দেওয়া সম্ভব এবং সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন করা বিষয়ে উহা যথাসম্ভব সাহায্য করিবে বলিয়া মনে করা হয়। এই কারণেই বিশেষ করিয়া সমাজ বিদ্যা পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

সমাজবিদ্যা পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইলেও এই বিষয় সম্বন্ধে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা রহিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন সমাজবিদ্যা সমাজের সমস্যা সম্বন্ধীয়, আবার কেহ কেহ মনে করেন বিজ্ঞান ভূগোল পৌর বিজ্ঞান ইত্যাদির যোগফল সমাজবিদ্যা। অনেক শিক্ষকেরও সমাজবিদ্যা বলিতে কি বুঝায় তাহা জানা নাই। তাঁহারা মনে করেন, এক টুকরা বিজ্ঞান, কিছু ভূগোল, কিছু পৌরবিজ্ঞান, কিছু সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা করাই হইতেছে সমাজবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইত্যাদির হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহার মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবেশিত নাই। সমাজবিদ্যা হইতেছে উপরোক্ত বিষয়গুলির সমন্বয় এবং উহা বর্তমান ও অতীতের আবেষ্টনীকে পরিপূর্ণভাবে ছাত্র ছাত্রীর দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। সমাজ বিদ্যাকে বলিতে পারা যায় যে উহা মনুষ্য সমাজের সংগঠন ও ক্রমোন্নতির সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সমাজ গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে যুক্ত। ইহার ভিতর ইতিহাস ভূগোল বা পৌরবিজ্ঞান বিচ্ছিন্নভাবে নাই, কিন্তু উহাদের অন্তর্নিহিত রেশ সর্বত্র বিদ্যমান। অল্প কথায় বলা যায় যে মানুষ এবং তাহার আবেষ্টনীর সঙ্গে সম্পর্কই সমাজবিদ্যা। যদি ইহা ধরা যায়, তাহা হইলে সমাজবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য বিষয় সমন্বিত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? মানুষের বস্তু উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতি এবং মানুষের নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে পৌর কর্তব্যের কথা আসে। মানুষের জীবনে সাফল্য ও অসাফল্যের কথা ইতিহাস এবং মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সংস্পর্শ ই ভূগোল। মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মনুষ্য সমাজকে উন্নত করিয়াছে। সভ্যতার ইতিহাসে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। ভূগোল তখনই সমাজবিদ্যা যখন মানুষের সঙ্গে ঐখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পরস্পরের সক্রিয় সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে সমাজবিদ্যার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী রহিয়াছে। সমাজবিদ্যা ছাত্র-

ছাত্রীর কাছে নূতন ভাবে দেখা দেয়, উহাদের দৃষ্টি সম্প্রসারিত করে। ছাত্র যে সময়ে যে স্থান বা যে সমাজে আছে, সেই সময় স্থান বা সমাজের সঙ্গে বর্তমান ও অতীতের যে সম্বন্ধ তাহা সমাজবিদ্যা বিশ্লেষণ করিয়া দেয়, স্থানীয় এবং দূরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে অন্যান্য কৃষ্টি ও সভ্যতার নরনারীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। সমাজবিদ্যা এক কথায় বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক এবং মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক। ইহা ছাড়া সমাজবিদ্যার পাঠ্যক্রম বিস্তৃত অর্থে একটী মূল জ্ঞানের অভিজ্ঞতার ও অন্তর্নিহিত বৃত্তির খোঁজ দেয় যাহার চারিদিকে অন্যান্য বিষয় বস্তু শিক্ষাদান করা চলে।

সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু আমরা শুধু বর্তমান আবেষ্টনী হইতে সংগ্রহ করিতে পারি না, যদিও আবেষ্টনীই আমাদের শিক্ষণীয় হয়। যদি আবেষ্টনী বলিতে অতীত ও বর্তমানের বিষয়বস্তু বুঝায়, তাহা হইলে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু আবেষ্টনী হইতে সংগ্রহ করিতে আমাদের আপত্তি নাই। অবশ্য এই বিষয় পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু বিজ্ঞান ভূগোল পৌরবিজ্ঞান অর্থনীতি সমাজ-তত্ত্ব ইত্যাদি হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে, যদিও সমস্ত জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিয়াই সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু রচিত হইবে। Encyclopeadia of Eudcational Research গ্রন্থের সমাজবিদ্যা সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে লিখিত আছে যে, পাঠ্যক্রম রচনাকারীরা অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, কারণ সেগুলি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন আসে না। কিন্তু শিক্ষার্থীরা যে বিষয় মনোযোগ দিয়া আগ্রহ সহকারে শিক্ষা করিবে তাহা হইতেছে জীবন কেন্দ্রিক সমস্যা, আগ্রহের কেন্দ্র ইত্যাদি। যে সমস্ত সমস্যা শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করে, সেইগুলিই শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করিতে সচেষ্ট হয়। সাধারণ ভাবে গবেষণা করিয়া জানা গিয়াছে যে পৃথক পৃথক বিষয়বস্তু হইতে যে জ্ঞান আহরণ করা যায়, সেই জ্ঞান আহরণের মধ্যে শিক্ষার্থীরা যেমন রস খুঁজিয়া পায় না, যে রস তাহারা একত্রিত এবং সমন্বিত বিষয় হইতে খুঁজিয়া পায়। তাহা ছাড়া ইহাও পরীক্ষিত হইয়াছে যে শিক্ষার্থীরা পৃথকীকৃত পাঠ গ্রহণ হইতে সমন্বিত পাঠ গ্রহণে ভাল ফল প্রদর্শন করিয়াছে। এই কারণে ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনও সমাজবিদ্যার সমন্বিত শিক্ষাদানের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

সমাজ বিদ্যার সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক দিক বিচার করিতে গেলে দেখিতে হয় ইহারা মানুষের প্রয়োজন মোচনের কতটা সাহায্য করে। মনস্তত্ত্ববিদেরা বর্তমানে আর মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর সম পর্যায়ে ফেলেন না অর্থাৎ মানুষকে সহজাত প্রবৃত্তির দাস বলিয়া বলেন না। তাঁহারা মনে করেন যে মানুষের বিভিন্ন আচার ব্যবহার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি সমস্তই শিক্ষণীয়। ইহা প্রকৃতই আশার কথা, কারণ যেহেতু সকল বিষয়ই শিক্ষণীয়, সেই হেতু বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহার পাঠ্যক্রম রচনারও প্রয়োজন, যাহাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ঐ সমস্ত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিয়া মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মিটাইতে পারে এবং জীবনকে উচ্চ স্তরে লইয়া যাইতে পারে।

(চলিবে)

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫১—

(২৪)

সকালে আফিসে যাই। ১০টায় অবিনাশ ঘোষ আসে, সে প্রায় ১২টায় যায়।…রেণু কলিকাতা আর্য্যস্থান হইতে বিজ্ঞাপন লইয়া ২টার পূর্ব্বে আসে। মেঘ মেঘে। ৩টার পর রেণু যায়, তখনও টিপটিপ বৃষ্টি। আমার শরীরটা ভার, চিন্‌চিন্ বাতের বেদনা। দুপুরে স্নান করি নাই। আমি ও প্রতিভা ৭টার পর যাই, তখন বৃষ্টি খুব কম, তখনও রাসবিহারীর মোড়ে বেশ জল, জল ছপ্‌ছপ্ করিয়া যাই। রবীন্দ্রনাথের 'তিন সঙ্গী' উপন্যাস রেণু পড়িয়া শুনায়। প্রবন্ধ লিখিবার মত কিছু নাই। আমি রেণু-প্রতিভাকে বলিতেছিলাম, 'তোমরা মরিলে তোমাদের আপনজনেরা, বন্ধুরা খুব দুঃখ পাইবে, কিন্তু পুরুষোত্তমানন্দ নয়। সকলেই তাহাদের অন্তরে অন্তরে আমার দশা দেখিয়া একটা কিছু 'বেশ হয়েছে'র তৃপ্তিও পাইবে। নীহার মস্তকে শুধু দুঃখই দিয়া যায় নাই, জব্দ করিয়া গিয়াছে। তাই তাহার এত দুঃখ, এত অসহায় অবস্থা। এক দল গিয়াছে, অপর আসিয়াছে; পূর্ব্বের দল তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। নরনারায়ণ নূতন নূতন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন; কিন্তু প্রত্যেকেই ভাবিয়াছে আমাদের ছাড়া উনি যেন এক পা চলিতে না পারে। অথচ চলিয়া তো আসিয়াছি, পা ভাঙিয়া একেবারে বসিয়া তো পড়ি নাই। লেখা বইগুলি ছাপাইয়া যাইতে পারিলেই সার্থক; প্রতিষ্ঠান গড়া হয়ত হইবে না। ইহাদের একটা স্থান করিয়া দিতে পারিলেই যে বাঁচি। আমি সঙ্ঘে কোনও আচার রাখি নাই বলিয়া—সাধনের সংস্কারও নয়—দল গড়িতেছে না। একটা কিছু 'বিশেষত্ব' না থাকিলে শুধু নির্ব্বিশেষে সঙ্ঘ গড়িতে পারে না। আচারও যে সত্য। রেণু-প্রতিভার কিছু কিছু সাধনের আচার রাখা দরকার; নচেৎ তাহারাও কিছু গড়িতে পারিবে না। সকালে বা সন্ধ্যায় বা ২বেলা প্রার্থনা, একত্র বসিয়া পাঠ-আলোচনা, একত্র খাওয়া ইত্যাদি অনুষ্ঠান যেমন প্রাণবর্দ্ধক, তেমনি লোকসংগ্রাহক এদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। প্রায় ১০টায় রেণুর চ'র লইয়া বাসি পায়ে আসি। বাসি পায়েই গিয়াছি।…

১৭ই জুন

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা

সকালে ৭টার পর রেণু আসে বাতাসা লইয়া। ে পত্রিকা হইতে 'পাকিস্থানের আত্মরক্ষা' বিষয়ক প্রবন্ধ পড়ি শুনায়। ৮টার পর জয়া আসে মালা, আম, সন্দে রসগোল্লা, নিমকী লইয়া। পরিমাণ কম নয়। গুরু পূ করে প্রতিভা রেণু জয়া। মস্তকে ভাগা হয়। সে- প্রণাম করে। কোলের মধ্যে কাঁদিতে থাকে। উঠি আসিয়া পূজা করে। মস্তকে মঠে যাওয়ার কথা পুনঃ পু অনুরোধ করিলেও সে যায় না।…আমি প্রতিভা, জয়া রেণু একত্র হইয়া মঠে যাই। সেখানে ঘণ্টা দুই থাকি চলিয়া আসি।…আমি ৪।০টার পরে মঠে যাই; বাইর ইচ্ছা হইল।…১২টার কিছু পরে বীরেন ব্যানার্জীর ভাগ মোহিনীমোহন মুখার্জী (বিষ্ণুপুর) আসেন; তিনি ২০ ব্রহ্মসূত্র ৩০, উপনিষৎ ২৲, কেন ১৲, নারী প্রগতি জন্মকথা ১।০ দিয়া কিনিয়া নেন। উজ্জলভারতের বিজ্ঞা দেখিয়া বেশ আগ্রহ নিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্বের উজ্জ ভারতের সংখ্যাগুলিও নিবেন। তিনি মনোযোগ দি পড়েন দেখিলাম। পত্রিকা ভাল লাগে। ভাল খাব যেমন সব শেষে মানুষ খায়, তেমনি নাকি আমার প্র সব শেষে পড়েন। মহৎ অতিক্রম করিলে মনস্তত্ত্বগততা কেমন করিয়া মানুষের আয়ু ও শ্রী নষ্ট হয়, এই মনস্ তিনি জানেন। মাতৃষীর দৃষ্টি আছে বলিলাম…।

১৮ই জুন

সকালে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রকলা' সম্বন্ধে পুস্তক পরিচয় লিখিবার পত্তন করি ও ঐ বইখানার কিছুটা আবার পড়ি। সুহৃৎবাবু ১৲ টাকা অগ্রদূতদের দিয়া গেল। 'সমগ্র দৃষ্টি' সম্বন্ধে সুহৃৎবাবু বলেন, উহা তত্ত্বতঃ ঠিক, কিন্তু গ্রহণ করিবে কয় জন? বেণু আর্যাসনে ছাপার ত্রুটি সম্বন্ধে জানাইয়া আসে। প্রেসে যায়, পরে এখানে আসে। কাহারও সঙ্গে সন্ধি না করিয়া নিজের পথে চলিবার ফলে চারিদিকের আবেষ্টনের মধ্যে যে বিষম আক্রমণমূলক প্রতিক্রিয়া চলিতেছে সারা জীবন, তাহাতে যে আমি frustrated আজিও হই নাই, আজিও যে দাঁড়াইয়া আছি, তাহা শুধু ঠাকুরের স্নেহ বশতঃ। আমি কোথায় তলাইয়া যাইতে পারিতাম। বহুদূর সম্ভব সকলের দুঃখে সমভাগী হইতে চাহিয়াছি, ৯ দিন উপবাস করিয়া দুর্ভিক্ষের বক্তৃতা দিয়াছি, এখানে ছেলেপুলেদের খাওয়ার কষ্টের ভিতর রাখিয়া বাহিরে tour-এ ভাল খাইতে বেদনা বোধ করিয়াছি, তবুও তো শেষ সমাধান মিলিতেছে না। বাস্তব জীবনের মাঝে আদর্শকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছি। এড়াইয়া তো চলি নাই। আর ভাতের সঙ্গে দুই খানি রুটী খাই, বউমাও তো তাই খায়। তাহাদিগকে ফেলিয়া পেট ভরা ভাত খাইতে পারি নাই, আর রেশনের যে পরিমাণ তাহাতে দুই বেলা ভাত পাইব কোথায়? কাহার ভাত খাইব? অথচ···। দক্ষিণ কলিকাতা কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সাব-এজেন্ট অফিসে আসেন, প্রায় ২ ঘণ্টা থাকেন। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যিক) আসেন, ১ ঘণ্টা থাকেন। তাঁহাকে দিয়া 'সমগ্র দৃষ্টি' ও ব্রহ্মসূত্রের ভূমিকা পড়াইয়া লই। তিনি আবার আগামী সপ্তাহের শনিবার আসিবেন। সাব-এজেন্ট কমলালয়ের কাছে বিজ্ঞাপনের জন্য ১টা চিঠি ও কয়েকজন গ্রাহকের নাম দেন। প্রায় ১০টায় আসি।···

১২শে জুলাই

···'গীতামৃত' নামে একখানি নূতন বইয়ের কথা বীরেনবাবু বলিলেন, আনন্দবাজারে ১০ই জুলাই তাহার সমালোচনা বাহির হইয়াছে। সমালোচনা পড়া হইল। ভক্তিযোগ দুর্বলের জন্য, জ্ঞানযোগের সাধনা ও নির্গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বর্তমানে অসম্ভব। তবে কলিযুগে ভক্তিযোগও সত্য—ইহা নাকি সেই বইতে আছে। কলিতে যদি জ্ঞানযোগ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা না থাকে, তবে শঙ্কর প্রবর্তিত অদ্বৈত সম্প্রদায় ও সাধনার কোন স্থান আছে কি? তিনি তো কলিযুগের লোক। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম কোনও একটি দ্বারাই কি মানুষ পূর্ণ হয়? সাধনার আরম্ভ অবশ্য যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। বই নিজের চোখে না দেখিলে ঠিক বুঝা যাইতেছে না। মহাভারত হইতে অশ্বত্থামার উক্তি (পিতা দ্রোণের মারা যাওয়ার পরের) বড়ই মর্মগ্রাহী। পুত্র যদি পিতার, শিষ্য যদি গুরুর মর্যাদা রক্ষা না করে, তবে পিতারা আর কি পুত্র চাহিবে, গুরুরা আর কি শিষ্য চাহিবে? আমারও তো ঐ একই কথা। নিত্যগোপালের প্রতিষ্ঠা যদি করিয়া যাইতে না পারি, তবে অনর্থকই তিনি আমাকে স্নেহ করিয়াছেন। কেন আমি তাঁহার শিষ্য হইলাম যদি না তাঁহার কথা বিশ্বময় ছড়াইয়া দিতে পারিলাম?···

২০ জুলাই

সকালে 'রবীন্দ্র-চিত্রকলা' লেখা একরূপ শেষ করি। ···রাইহরণবাবু আসেন। কিছু পরে আসে যতীনদাশগুপ্ত। অখিল নিয়োগীর দশচক্রে উপন্যাস দিয়া অপ্রীতিকর আলোচনা হয়। সে বলে উজ্জ্বলভারতের কল্যাণ করার আগ্রহকে আপনারা লাথি মারিয়াছেন, slap দিয়াছেন। অখিল নিয়োগীর লেখা বাহির হইলে গ্রাহক সংখ্যা বাড়িত। স্পষ্ট সত্য কিন্তু আমাদের যে কোনও লেখককে কিছু দিবার মত সামর্থ্য নাই, ১২ মাস বলিয়া এক বোকা লোক ঠকিয়া ঠকিয়া শেষে পরের মাথায় কাঠাল ভাঙিতে শিখিল—ইহাতে কোনও construction কিছু নাই বলিয়া আমরা ছাপাইতে অপারগ। যতীন ইহা কিছুতেই বুঝিতে রাজী নয়। সে দুঃখ পাইয়া গিয়াছে। ৫৲ টাকা হাওলাত নিয়াছে। আগামী মঙ্গলবার দিবে। দুর্গম পথের যাত্রী আমরা, ইহা সহ্য করিতেই হইবে। সভায় বড় বড় নাম জুড়িয়া দিয়া যে আমরা বড় হইতে

পারিব না, আমরা যে নিজের যোগ্যতায় বড় হইয়া বড়দের আকর্ষণ না করিতে পারিলে অচল হইব—ইহা নবীন বুঝিবে কেন? প্রায় ১০টায় আমি ও প্রতিভা আশ্রমে ফিরি।…

২১শে জুলাই

সকালে 'চিত্রকলা' পুস্তক পরিচয় শেষ করি। আশ্বিন, কার্ত্তিকের গীতায় অপ্রযুক্ত ভাষ্য দেখি। আজ আর রুটি প্রস্তুত হয় নাই; আমি অর্দ্ধেক ভাত পাইয়াছি। কালই যখন আবার রুটী খাইতে হইবে, তখন একদিনের জন্য পুরা ভাত খাওয়ার অর্থ কি? রুটী যে না-হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা খাওয়ার সময় আমি জানিতাম না। আমি মনে করিয়াছি রুটী পরে হইবে। পরে যদি হইবে, তবে আমাকে কিছু পরে দিলেই তো হইত। আধ পেটা খাওয়া জীবনে বোধহয় এই প্রথম।…কিছু পরেই ধীরেন শাস্ত্রী যান, তিনি রামকৃষ্ণ ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন; ঢুকিতে পারেন নাই। কিছু পরেই মোহিনীমোহন মুখার্জী যান। তিনি পত্রিকায় খুব বেশী প্রচার কামনা করেন। এজন্য উদ্বাস্তুদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের যোগসূত্র স্থাপন করিবার উপায় হিসাবে উজ্জ্বলভারতের দুই একটী পৃষ্ঠা রাখিতে বলেন, যাহার মধ্যে উদ্বাস্তুদের নাম, বৃত্তির পরিচয় থাকিবে এবং যাহা দেখিয়া এ দেশের সাধারণ মানুষ উদ্বাস্তুদিগকে পুনর্বসিত করিতে পারে। প্রস্তাব ভাবিয়া দেখিবার।…

২২শে জুলাই

সকালে 'গীতাভাষ্য' দেখি অনেকটা। রেণু অনিল ঘোষ, নলিনী ঘোষ, ও. সি. গাঙ্গুলী প্রেস, বাসন্তী বাইন্ডিং, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী যায়. এখানে আসে তিনটার পর।…উজ্জ্বলভারতকে আশ্রয় করিয়াই দাঁড়াইতে হইবে, ছড়াইয়া পড়িতে হইবে। রাত্রি প্রায় ১০টায় আশ্রমে ফিরি।…

২৩শে জুলাই

প্রার্থনার পর ডাইরী লিখিয়া বাসে বেহালা যাই… বেহালা হইতে আসিয়া রেণুর এখানে প্রায় ১ ঘণ্টা উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করি …প্রায় ১০টায় আশ্রমে ফিরি।

২৪শে জুলাই

প্রার্থনা আরম্ভ হইবার পূর্বেই বলাইদেব শর্মা আসেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় আধ ঘণ্টা আমার জীবনসাধনা ও পুরুষোত্তম তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কৃষ্ণ-জীবনে দৈবী সম্পদ ও আসুরী সম্পদের সমন্বয়, আর্য্য-অনার্য্য সমন্বয়। আমি চাই দার্শনিকদের রাসলীলা দর্শন। তাহারই ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিবে ভারতের ভবিষ্যৎ। কলিযুগের সব বৈষ্ণবীদের সমর সঙ্গীতে গড়িয়া তুলিতে আসিয়াছেন রাধা; শ্রীকৃষ্ণই সবার কম্যুনিষ্ট—communist of all communists। বলাই চলিয়া গেলে স প্রার্থনা করি ও ডাইরী লিখি। প্রতিভা প্ল্যাস্টার লাগাইবার জন্য প্রার্থনার পরই চলিয়া যায়। আমি পরে যাই… ১২টার পর ফিরি তখন টিপটিপ বৃষ্টি হইতেছিল। যাওয়ার সময়ও ঐরূপ বৃষ্টি হয়, পথে একবার দাঁড়াই। রে গ্রাহকদের পত্রিকা আজ ডাকে দেয়। পরে শ্রীক লাইব্রেরীতে ৩ সেট ব্রহ্মসূত্র দিয়া আসে। রাইটার্ বিল্ডিংএ যায়। দিবা বাসায় যায়, এখানে আর আ না। আমি ও প্রতিভা ৪॥০টায় আফিসে যাই, তখ সবেমাত্র রেণু আসিল। এখানে খাওয়ারও আমার ব কষ্ট হয়, দৃষ্টি দিবার কেহ নাই। এমন তো কোন দিন খাইতে ভালবাসি নাই। বাবুর্চী 'বাড়া ভা দিয়াছিল। পেট ভরিয়া খাওয়াও হয় নাই। উমাদি কাছে এই সব বলি। কাজের জন্য তাহারও অবসর নাই বাকী পত্রিকাগুলি সব ঠিক করা হয়। মোহিনী মুখা আসেন ৯টার কিছু আগে।…প্রতিভা কাল বাঁশবেড়ি যাইবে। প্রাণটা কেমন লাগিতেছিল। আমার ক অসুবিধাও হইবে। উপায় তো নাই। কুমুদের দিব একটা পোস্টকার্ড রেণু দেয়। এ সংসারে কাম-ক্রোধা কামবন্ধন আবাহন অসম্ভব, ব্রহ্মধামই সেই স্থান যেখা

কামক্রোধাদির ভাগবতরূপ আস্বাদন সম্ভব : এখানেই সেই স্থান যেখানে কাম ক্রোধাদির ভাগবতরূপ আস্বাদন হইয়াছিল। কৃষ্ণ-কাম, কৃষ্ণ-ক্রোধ, কৃষ্ণ-লোভ যেখানে সেখানে স্ফুরিত হয় না। যার তার ননী কৃষ্ণ চুরি করেন নাই, যার তার কাপড় নিয়া টানাটানি করেন নাই। সর্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা ভাগবত ছন্দ।

২৫শে জুলাই

…দুপুরে যখন খাইতে বসি, তখন কমল আসে। সে থাকিতে থাকিতেই যতীনবাবু আসেন। তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের 'কর্মজীবনে বেদান্ত' সম্পর্কে বিষয় আলোচিত হয়—'গিরিধারী'র অর্থ লইয়া। শঙ্কর শক্তিহীন ব্রহ্ম পর্যন্ত স্থাপন করিয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণ পরাশক্তি ও ব্রহ্মের সমন্বয় পর্যন্ত করিয়াছেন, বর্তমান যুগে নিত্যগোপাল অপরাশক্তির সঙ্গে, অবিদ্যার সঙ্গে ব্রহ্মের সমন্বয় করিয়াছেন, অবতারবাদই স্থাপন করিয়াছেন।…।

২৬শে জুলাই

সকালে গীতারহস্যের পাণ্ডুলিপি দেখি। বেণু ২টার সময় আসে, ৪টায় জেনারেল প্রিন্টিং এ ২ কপি ব্রহ্মসূত্র (২য় খণ্ড) দিয়া আসে।…ছয়টায় আমি একা অফিসে যাই। কিছু পরেই মালতী ও প্রণতি আসে। তাহার পরেই আসে বেণু। কিছু পরেই ধীরেন ব্যানার্জি… বরিশালের খালাপুরের রমণীমোহন বিশ্বাস (উদ্বাস্তু) ও অজিত মুখার্জী (যশোহর হইতে উদ্বাস্তু) আসে বীরনগরে অনুষ্ঠিত ৯ই, ১০ই, ১১ই সেপ্টেম্বরের সভায় যোগদানের জন্য সেখানকার জেনারেল সেক্রেটারী ইউ, সি, সরকারের অনুরোধ পত্র লইয়া। যাইবার ইচ্ছা পত্রদ্বারা জানাইয়া দেই। ২০ হাজার লোক হইবে। জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছি; সম্ভব হইলে মাঝে মাঝে যুক্ত থাকা উচিত। উঁহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হয়।… আমি ও বেণু ৯।০টায় আশ্রমে আসি। বেণু আজ ঠাকুর ঘরে শোয়। ধীরেনবাবুর কাছে শুনিলাম গীতামৃতের লেখক 'শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে' শ্লোক লইয়া বিপন্ন হইয়াছেন। পুরুষোত্তমবুদ্ধি না থাকিলে ঐ শ্লোকটী বিপদের কথা বটে। মাটির জগতের কথা বড় না হইলে 'অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেয়ঃ, ধ্যান হইতে কর্মফলত্যাগ শ্রেয়ঃ এবং ত্যাগ হইতে শান্তি'-র যাথার্থ্য কিছুতেই সঙ্গত হয় না। অখণ্ড-তত্ত্ব যে গীতার সব কিছু জটিলতার সমাধান দিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২৭শে জুলাই

সকালের প্রার্থনায় বেণু যোগদান করে। প্রথম জলে lqiuid no ১ দিয়া চোখের ওষুধ প্রস্তুত করিয়া চোখে দেয়। দুই ১০০৲ টাকা দেয়। বেণু প্রায় ৮টায় যায়। সকালে গীতা ভাষ্যের পাণ্ডুলিপি দেখি। বেণু বরেন রায়ের বাসায় যায়, ৫টাকা নিয়া আসে। কুমুদের পোষ্টকার্ড আসে…। ৫।০টায় অফিসে যাইতে দীনেশ রায়ের বাসার প্রায় উল্টাদিকে এক টীনের ঘরের বস্তিতে আগুন লাগিয়াছে দেখিতে পাই। ভিড়ের মধ্যে আমরা প্রবেশ করি। ধাক্কা লাগায় পড়িয়া যাই, বেদনা পাই না। বেণু ও আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি। শেষে আমি যখন একা অফিসের দিকে রওনা হই, পিছন হইতে বেণু আসিয়া যোগদান করে। সে-ও ছাতা ব্যাগশুদ্ধ পড়িয়া গিয়াছিল। - মহেন্দ্রবাবু আসিয়া উজ্জ্বলভারত ১০ কপি ২০% কমিশন বাদে কিনিয়া নেয়। । …চাউল ফুরাইয়াছে, অথচ কিনিবার কোনও বন্দোবস্ত নাই। এই বে-বন্দোবস্ত চিরদিন আমাকে পীড়া দিয়াছে। 'To take time by the fore lock'-নীতিই আমি বুঝি; সময়ের আগ থাকিয়া কাজ না করিয়া সময়ের পিছু চলিয়া সময়ের নাগ পাওয়া যাইবে না। কালের পিছনে পড়িলে আর রক্ষা নাই। পুরুষোত্তম সব সময়েই কালের সামনে। পুরুষোত্তম-জীবনই কালজয়ী জীবন।

২৮শে জুলাই

বেণু ৭টার পর এখান হইতে যায়। মাখনবাবু ও বীণা রায় আসে তাহার ওখানে। ১।০টার পর আবার এখানে

আসে। এতকাল পর্যন্ত এ দেশের মানুষেরা সমস্ত ঘটনাকে এড়াইয়া, প্রকৃতিকে এড়াইয়া দুঃখ সহ্য করিয়াছে, ঘটনার পিছনে পড়িয়া ঘটনার চাপ সহ্য করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে, সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু ঘটনার সামনে, প্রকৃতির সামনে, কালের সামনে গিয়া উহাদিগকে গড়িয়া তোলা যে যায়, প্রকৃতিকে গড়িয়া তুলিয়া সুখদুঃখের রূপ যে বদলান যায়, পড়িয়া মার খাওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, অসহায় অবস্থা কাটিয়া যায়, নূতন সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর হওয়া যায়, এ কথা পুরুষোত্তম না থাকিলে কে শুনাইত? কালাতীত কর্ম, কালাতীত জ্ঞানের খোঁজ পাইয়াছি বলিয়াই তো কোনও কালে আটকাইয়া যাইব না, অনন্ত কালেও কর্ম ফুরাইবে না, সব কালকে গড়িয়া তুলিব। সংসারের পেছনে না পড়িয়া, সংসারের সামনে গিয়া সংসারের চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে না পারিলে কিসের মুক্তি? ইহাই বর্তমান যুগের মুক্তি। পুরুষোত্তমই কালবিজয়ী, ব্রহ্ম-পরমাত্মাও বুঝি কালভয়ে ভীত। পুরুষোত্তমই শুধু কালকে গড়িয়া তোলেন। কলিকালও তাই পুরুষোত্তমে দিবা কাল। কোন্ ব্রহ্ম কালকে গড়িয়া তুলিয়াছেন? ৫॥০টার পর আমি ও রেণু আফিসে যাই।

২৯শে জুলাই

রেণু এখন হইতেই পোস্টাফিসে…দেখেন নিজের ওপাশে যায়, দেখা হয় না। চিঠি দিয়া আসে প্রবন্ধের জন্য। মহেশ লাইব্রেরী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারে ও কপি করিয়া টাইপ কেন দিয়া আসে……কিছু পরেই অমিত মুখার্জি আসে। তাহাকে 'যে ফেরে নি' ও 'খাঁচার কান্না' পড়িতে দেওয়া হয়। সে গ্রাহক হইল……'যো মাং পশ্যতি'-র উপর একটা প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। জড়-নিশ্চল অহঙ্কার লইয়া সামনে দাঁড়াইয়া জয় করিতে চাহিয়াছে, এদেশের জনগণ পিছনে পড়িয়া এড়াইয়া প্রকৃতিকে ফাঁকি দিতে চাহিয়াছে; প্রকৃতিও ফাঁকি দিয়াছে, কোনও অবস্থাতেই লাভ হয় নাই। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এই পশ্চাদপসরণের ফলে ক্লীব হইয়াছে, মুসলমান হইয়াছে। পুরুষোত্তমই শুধু সামনে দাঁড়াইয়া প্রকৃতিকে জয় করিতে পারেন, পরিপাক করিতে পারেন। ১০টার পর আমি ও রেণু আসি।

৩০শে জুলাই

…সাহিত্যিক শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তাঁহাকে 'যে ফেরেনি' ও 'ভারতীয় প্রগতির পটভূমিকা' পড়িয়া শুনাই। আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অনেকটা আলোচনা হয়।…সকলের যাওয়াই ১০টার মধ্যে শেষ হইয়াছে। অনর্থক ইলেকট্রিক খরচায় কোনও লাভ আছে? কাহাকেও শৃঙ্খলার ভিতর, কোনও সংগঠনের ভিতর আনিতে পারিলাম না। সকলেই গা ছাড়িয়া চলিতে চায়। ইহাতে ভরাডুবি নিশ্চিত। আসুরী সম্পদের উপাসক অসুরের মতও চলিবে না, দৈবী সম্পদের উপাসক দেবগণের মতও প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার চলিবে না। প্রকৃতির সামনে দাঁড়াইতেও হইবে, কিন্তু ব্যাপকতম পুরুষোত্তমকে লইয়া প্রকৃতিকে গ্রাস করিবার জন্য, জয় করিবার জন্য। ভোগেও প্রকৃতি অপরাজিতা, ত্যাগেও অপরাজিতা। ভোগ ত্যাগ সমন্বিত জীবনের পথেই প্রকৃতি পরাজিতা ও অপরাজিতা দুই-ই। ইনিই ব্রহ্মের মাতৃবী তত্ত্ব, পার্বতী; আর ইহারই উপাসনার দিন আসিয়াছে।

৩১শে জুলা

…সারা জীবন ঘটনার সামনে গিয়া ঘটনাকে গড়িয় তুলিয়াছি, ঘটনার পিছনে পড়িয়া ঘটনার চাপে জর্জরিত হই নাই! ব্রজমোহন বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া প দাঁড়ানো, তাহার পর ব্রহ্মসূত্র লইয়া আবার ঝাঁপ দেওয় কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান, সেখানে যখন সামনে দিক closed হইল, বরিশালে স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ কলিকাতায় গোয়াবাগান গোষ্ঠী গঠন, পরে স্বরাজসেবক সঙ্ঘ ছাড়িয়া কাঁকুড়গাছি ও পরে মহানারায়ণ আশ্র সেখানেও পথ যখন closed হইল তখন রেণু-প্রতিভাকে লইয়া আবার উজ্জ্বলভারত ও গ্রন্থাবলী প্রকাশন। এখন

তো ঘটনার সামনে ঠিক ঠিক দাঁড়াইতে পারিতেছি না। এই ঠেলাঠেলিতেই তো আমার বিষাদ। ঘটনাকে পরিপাক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না, অথচ এই পথেই আবার বাহির হইয়া যাইব ইহা স্থির। প্রকৃতির ভিতরেই বাহির হইয়া যাইবার একটা রাস্তা আছে। সেই যোগমায়া দ্বারাই তো চিরকাল আমাকে আগাইয়া নিয়া আসিয়াছে। ইনিই শ্রীদুর্গা। প্রণতি আসে; একটী পয়সাও তাহার ১০০ নম্বর ট্রেনিং এর মধ্যে সে রাখে নাই। ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। কর্মশালা সংবাদে আলোচনা করেন, যাহা গত সোমবার পাঠ হইয়াছে। আগামী সোমবার 'ধর্মব্যাখ্যা' আলোচনা হইবে—কি সত্য, কি মিথ্যা ইত্যাদি। ৯টায় আমি চলিয়া আসি। রেণুর শরীরটা ভাল না, সে আসে না। প্রতিভার একটা পোস্টকার্ড আসে।

১লা আগষ্ট

রেণুর শরীর কেমন আছে জানিবার জন্য আফিসের দিকে যাইতে দেখি সে আসিতেছে। একত্র হইয়া ফিরিয়া আসি। সে ১১টার পর এখান হইতে যায়। পেটটা তাহার ভাল নয়। দুপুরে বিশ্রামের পর কর্পোরেশনে গণেন্দ্র ঘোষের ওখানে যায়। তাহাকে সহ চন্দ্রশেখরবাবু (দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার)…। সুধাংশুর ওখানে যায়।…আমি মানুষের সঙ্গে পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপন করি বলিয়া কোন মানুষের সম্বন্ধেই—তা যতই অতীতকালের হউক—বিস্মৃত হই না। সব আমার জীবনে তাজা থাকে, যতই পুরাণো তা হউক না কেন। সব স্মৃতি আমার জীবনে বর্তমান, তাই তো বাঁচিয়া আছি। দুঃখও তাহাতে পাই। সমস্ত যেন সঙ্গে টানিয়া নিয়া চলিয়াছি। আমার জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছি। তাই আমি এত অস্থির! যাহার সঙ্গেই সম্পর্ক হইয়াছে তাহাকে যেমন তেমন না রাখিয়া পরম পুরুষোত্তম হাতে গড়িয়া তুলিয়া সঙ্গে লইয়া ছুটিতে চাহিয়াছি—কী যে বেদনা আমার বুকে, কাহাকে তাহা বলিব? কোনও মানুষকে ছাড়ি নাই, অন্যায় করি নাই—ইহাই আমার অপরাধ। সকলের সঙ্গে প্রাণখোলা যুক্ত থাকিয়াও আমি ছিলাম সকলের অতীত, তাই আমি আটকাইয়া যাই না। কেহ তো আমাকে তাহার মুঠার ভিতর রাখিতে পারে নাই, তাই আমি অভিযুক্ত। সর্বত্র আমার উপর vote of censure; বরিশাল কংগ্রেসেও, সংসারেও। ৯টায় আফিস হইতে ফিরি। রাস্তায় বেশ বৃষ্টি নামে, ভিজিয়াই আসি। গায়ের চাদরটা শুকাইতে দেই। নবযাপী কাপড় ছাড়িতে বলে। কাপড়টা তেমন ভিজে নাই।…

২রা আগষ্ট

সকালে আফিসে যাই রেণুর শরীর কেমন আছে বলিবার জন্য। শরীর তেমন ভাল না। সে ও আমি বাহির হই ৭টার পর। সে দেবেন মিত্রের বাসায় যায়, আমি আশ্রমে চলিয়া আসি। গীতার ভাষ্য দেখি।…কত মানুষ আমার জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার বিষয় কিছু লিখিবার জন্য রেণু বলে। সে বেদনার কাহিনী লিখিয়া ফল? বেদনায় বুক ভরা, তবুও তো আজও চলিয়াছি, বসিয়া পড়ি নাই। আজও সামনের দিকে আগাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। কাহাকেও ছাড়ি নাই, অথচ কেহই সঙ্গে নাই, বেশ এক অবস্থা।…

৩রা আগষ্ট

সকালে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত গীতাভাষ্য দেখি। রেণু সকালে সুহৃৎবাবু ও প্রিয়রঞ্জন বাবুর ওখানে যায়। তাঁহারা প্রবন্ধ দিবেন।…পথে বৃষ্টি নামে, এক দোকানে রাসবিহারীর মোড়ে দাঁড়াই। ৫টার পূর্বেই পৌছি। কিন্তু খগেন ঘোষ আসেন না। তাঁহার আসার কথা ছিল ৫টায় গীতার আলোচনার জন্য এইরূপ কথা রেণুর সঙ্গে হইয়াছিল…শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আসে…। গীতাভাষ্যের 'হে ইষ্ট আমার' অংশ তাহাকে পড়িয়া শুনানো হয়।…রেণু প্রায় ১০টায় আসে…। 'আমার কেউ নাই' বলিয়া—বিকালে খুব কাঁদে। সে এখানের কাহাকেও আপন মনে

করে না, অথচ যাইবারও কোন পথ নাই। নিরুপায়। কি একটা চিন্তার বিকৃতি আসিয়াছে। মানুষ বুদ্ধির দোষে নিজ স্থান হারায়, সব আপনার জনকেও পর করিয়া দেয়; আবেষ্টনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। তাই 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ' বাণীর যে কি সার্থকতা, তাহা বলা যায় না।···

৪ঠা আগষ্ট

সকাল ৭॥০টার পর রেণু এখান হইতে যায়।···রেণু 'যো মাং ভক্তি সংগ্রামে' প্রবন্ধ শেষ করিয়া আনে, পড়িয়া শুনায়। ভাল হইয়াছে।—এর সম্বন্ধে উষাদিদীর সঙ্গে কথা হয়। আমার উপরই তাহার যত রাগ। আমি স্বার্থের জন্য তাহার ওখানে গিয়াছি ইত্যাদি।···আমি যখন—হইতে দূরে, lost to her, তখন আমার স্থলাভিষিক্ত কেহ কেহ তাহাকে জড়াইয়া না ধরিলে সে আশ্রয়হীন হইয়া পড়িবে। কি যে বেদনা তাহার জন্য! আমাকে না পাইলে সে বাঁচিবে কেমন করিয়া? কোথায় আশ্রয়? কে তাহার আপন জন?···

৫ই আগষ্ট

সকালে একবার অফিসে যাই, রেণু কেমন আছে জানিয়া আসি। সে ৯টার পর 'পবিত্র ভাণ্ডারে' যাইবে। ···রবীন্দ্রনাথের 'পাগলা নবর' পত্রের মর্ম রেণু আমাকে পড়িয়া শুনায়। উহাতে error of omission আছে। ···সারা জীবন সুখে দুঃখে সমভাবে টিকিয়া থাকিবার জন্য minimum necessity-র মধ্য দিয়া আসিয়াছি। তাই আজও অক্ষত আছি, আমার ভবিষ্যৎ আছে, কর্ম আছে। —মত চলিলে কবে দুঃখের চাপে ভাঙ্গিয়া যাইতাম। সুখ-দুঃখ দুই-ই বরণ করিয়াছি, তাই পথে আটকাই নাই। আজও তো খাওয়ায় দাওয়ায় সেই দুঃখ চলিতেছে। চাহিয়াছি একটি স্নেহ-দৃষ্টি। আর কিছু নয়। সেই স্নেহ-দৃষ্টি নিত্যগোপালের রহিয়াছে, নইলে কোথায় চলিয়া যাইতাম, হারাইয়া যাইতাম। আমার 'আহা, উহুঁ' করিবার যো-ও নাই।···

৬ই আগষ্ট

সকালে একবার অফিসে যাই, ৭॥০ টার পর ফিরি। রেণু···ব্যাঙ্ক পোষ্টাফিস···মেট্রোপলিটান, হিন্দুস্থান, আর্যাস্থান···হইতে এখানে আসে। রেজাউল করীমের প্রবন্ধটা আবার পড়া হয়।···

৭ই আগষ্ট

সকালে আমি ও প্রতিভা লেক মার্কেটে যাই এখানের দৈনন্দিন বাজার করিতে।···

৮ই আগষ্ট

···চুনী মিত্র একখানি দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থ বাহির করিয়াছে, তাহার বিজ্ঞাপন দিবার জন্য পাঠাইয়াছে, কমিশন চাহিয়াছে। সেই বিজ্ঞাপনের মধ্যে আছে যে ভূমিকায় পুরুষোত্তমানন্দের ঋণ স্বীকার করিয়াছে।···

৯ই আগষ্ট

রেণু এখানে ৯টায় আসে, বৈদ্যনাথ কাগজ নিতে আসিবে তাহার জন্য।···দুপুরে মনসাবাবুর কাছে··· ডি, কে, কুমার···এখানে আসে প্রায় ৪টায়। ৫॥০টায় আমরা বাহির হই। সন্ধ্যার পর চিদানন্দ আসে, তাহার পর ধীরেন ব্যানার্জী।···তাহার পর আসেন একজন সাধু একটী 'নারীকল্যাণ সম্বন্ধে কর্তব্য' প্রবন্ধ লইয়া।···

১০ই আগষ্ট

সকালে বেহালার জন্য রওনা হই।···ভাবুকতা জগৎ চলে না। 'স্বকার্যম্ উদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ'।···

১১ই আগ

খুব সকালে অফিসে যাই, ৭॥০টার মধ্যেই ফিরি। রেণু পবিত্রবান্ধব ভাণ্ডারে চন্দ্রশেখরবাবুর ওখানে যায় সেখানে ২ জন গ্রাহক হয়। একজন হেমাঙ্গ বরাট।···

১২ই আগ

…মালতী… আসে। তাহাকে…প্রাণ খুলিয়া আলো চলাফেরা ও আলাপ আলোচনার কথা বলা হয়। আমি সকল কথা বলিবার অধিকার দিয়াই দিয়াছি। কাহাকেও তো সরাইয়া রাখি নাই।…

১৩ই আগষ্ট

…হেমাঙ্গপদ বাবু আসেন। রেণুকে বলিয়াছেন, 'সত্যই আপনার লেখা ভাল। সব বইগুলি উল্টাইয়া দেখিলাম, একটা চিন্তাধারা আছে, যাহা সাধারণ লেখা হইতে স্বতন্ত্র'। ১২টার পর রেণু এখানে আসে। আবার ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। সব দুর্যোগে তিনি পথ দিয়াছেন। আজও কি দিবেন না? এখানের সব দায়িত্ব নিয়া, আবার পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া, 'পুরুষোত্তম গ্রন্থ প্রকাশ' তহবিল খুলিয়া ছুটিবার জন্য প্রাণ চায়।…

১৪ই আগস্ট

…যে পরিস্থিতি ঘটিয়াছে, তাহা পরিপাক করিতে সময় লাগিতেছে।…সমস্ত ব্যাপারটার যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়, অগ্রগমন বজায় থাকে এবং ভবিষ্যৎ মিলনের পথ খোলা থাকে, তবেই বুঝিব এই সমাধান organic ইত্যাদি। এখানের ঘর নেওয়াটা এখন ইহাদেরও প্রয়োজন, শুধু আমারই না। আমি যে কত বড় সাহস লইয়া এই সমাধান দিলাম, ইহা না লইলে নিত্যব্রতরা যে অকূল পাথারে পড়িত, তাহা বুঝিতে উষাদিদীকে বলি। স্বীকৃতি না পাইলে কোনও মানুষই কাজ করিয়া আগাইতে পারে না।…

১৫ই আগস্ট

সকালে সাময়িকী "কাহার সঙ্গে যুদ্ধ" লিখি,…। হেমাঙ্গপদবাবু আসেন, যান ১ ঘণ্টা পর। তাহার সঙ্গে 'গিরিধারী' প্রসঙ্গ, কবির বর্ণনায় ও কৃষ্ণের বর্ণনায় 'কথং কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী', বর্তমানের মেয়েদের বাহির হইয়া পড়া ও ছেলেদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সমস্যা, আমার জীবনে রাধারাণীর প্রকাশের কথা, নিত্যগোপালের 'পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান ইত্যাদি বাণী, 'শরৎ, যখন যেখানে আছ আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি' বাণীর আবেগময়ী আলোচনা হয়। বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে।…

১৭ই আগস্ট

…গত কল্যকার আনন্দবাজারে ডাঃ জাকির হোসেন (আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার) প্রমুখ ১৪ জন মুসলমান নেতা নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি ডাঃ গ্রাহামের নিকট যে স্মারকলিপি দিয়াছে, তাহা মুসলমান সমাজের সম্মান রক্ষা করিয়াছে, পাকিস্থানের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে। অনেক দিন পূর্বেই উহা বাহির হওয়া উচিত ছিল।…সারা জীবন ঝাঁপ দিয়াই কূল পাইয়াছি, এবারও ঝাঁপ দিলাম, কূল পাইব। 'ভয় কি? টেনে তুলব'—ইহাই আমার পিছনে সর্বদা প্রেরণা ও সাহস যোগাইতেছে।…

১৮ই আগস্ট

সকালে একবার আফিসে যাই, এক ঘণ্টা থাকি।… আবেষ্টন যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যে ব্যবস্থা করা হইল, তাহাই সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং তাহাকে স্বীকার করিলে আমাদের আগাইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে।…

১৯শে আগস্ট

…যাহাদের জীবনে অগ্রগতি নাই, ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবার কোনও প্রেরণা নাই, তাহারা নারীর আকর্ষণ কি করিয়া সামলাইবে? নরনারীর আকর্ষণ সব নিরুৎসাহ করিয়া দেয়, পঙ্গু করিয়া দেয়, সব কিছু বীর্য, সব কিছু আগুন কাড়িয়া নেয়। 'মেনকা মোহিনী' ইত্যাদির মধ্যেও একটা অর্থ আছে। পুরুষোত্তম-দর্শন ও পুরুষোত্তম-জীবনই একমাত্র এই বিপদ হইতে রক্ষায় সমর্থ। ৩৷৹টায় আশ্রমে ফিরি।

২১শে আগস্ট

ক্রমশঃ

সাময়িকী

বিবেকানন্দ ও তাহার পর ঃ স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ জন্মক্ষণে তাঁহাকে আমাদের ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম নিবেদন করি। সেদিন বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষের যে আবেষ্টনে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে আবেষ্টনকে আজ স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না বলিয়াই বিবেকানন্দকে বুঝিতে পারাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেদিনের দেশব্যাপী অশিক্ষা, কুসংস্কার, গতিহীন স্থানুত্ব আজ বোধহয় কল্পনাতীত। অবশ্য বিবেকানন্দ যে-ভারত দেখিতে চাহিয়াছিলেন সে ভারত যে আজও ঠিক সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নয় বলিলেই বেশী শুদ্ধ হয়, তবু সেদিন যে অবস্থায় যে আবেষ্টনে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে তাঁহাকে কাজ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, সে অবস্থা হইতে বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ বা বিশ্ব অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে আবেষ্টন বদলাইয়াছে সত্য, কিন্তু সত্যিকারের কতটুকু আমরা বদলাইয়াছি বা কতটুকু আমরা হইয়াছি? বিবেকানন্দ যখন বলেন, 'আর্য্যামির জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মামি। যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে আছে', তখন তাঁহার সেই দিনের বলাকে আজ পর্যন্ত আমরা কতটুকু বাস্তব করিয়াছি, এবং যতটুকু করিয়াছি তাহার স্থায়িত্ব কতখানি, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কিংবা তিনি যখন বলিলেন, 'ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব, পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের।...এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও সংমিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য...।' তখন সে সংমিলন বা সংমিশ্রণ কতখানি জীবন্ত হইয়াছে সে প্র যেমন করা উচিত, তেমনি এ সংমিলন বা সংমিশ্রণ কে হয় না, এ প্রশ্নও আসিয়া যায়। এই প্রশ্নও আসে আমরা আজ 'মামি' তে পরিণত হইলাম কেন? চলমা শ্মশান বলিয়া যাহাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করিয়াছেন তাহাদের কেহ ঘৃণা করিয়াছিলেন? ঘৃণা করিও ন বলিলেই কি ঘৃণা করা বন্ধ হইবে? ঘৃণা করিতে নিষে তো বিবেকানন্দই প্রথম করেন নাই, ইতিহাস বড় স্পষ্ট সাক্ষ্য রাখিয়াছে তাহাতে বলা যায় ভগবান বু জাতিভেদকে শক্ত আঘাত হানিয়াছিলেন। তারপ ক্রমে ক্রমে প্রাণ লইয়া অবতীর্ণ হইয়া নানক কবী গৌরাঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীনগণ এবং বর্তমান কালের পাশ্চাত্ত সভ্যতা, রামমোহন হইতে ব্রাহ্ম সমাজ, বিবেকান কংগ্রেস প্রভৃতি অনেকেই জাতিভেদের প্রতি তীব্র আঘা হানিয়াছিলেন। সর্বশেষে জাতীয় সংবিধান আইনবা ইহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন—এত সমস্তের পরেও মনে জিজ্ঞাসা রহিয়া যায়—ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমভ্রষ্টদের অব হইতে তথা সামাজিক ব্যবস্থা হইতে জাতিভেদ প্রথা দূ হইয়াছে কি না। এই চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন এব জাতির নিকট, বর্ণাশ্রমধারা আষ্টে পৃষ্ঠে জড়ি ভারতীয়ের নিকট নূতন কথাটা সোজাসুজি বলিতে পার সেদিন মস্তবড় কথা ছিল। বিবেকানন্দ যখন বলিলে আর্যামির জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণ কর, আসলে তোমরা হইতেছ দশহাজার বৎসরের মামি—জীবন বলিয়া যদি কিছু বর্তমান ভারতে থাকে, ত হইলে তোমরা যাহাদের চলমান শ্মশান বলিতেছ তাহাদে মধ্যেই আছে—এ কথা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করিতে পারাই সেদিন সত্যিই অনেকখানি কথা ছিল। বিবেকান তাঁহার অতি অল্পায়ু জীবন দিয়া সেদিন সমস্ত দেশে

দুঃসংস্কারকে যে ভাবে আঘাত হানিয়াছিলেন, আজও তাহার অনুরণন জাতির জীবনে চলিতেছে। আজ বিবেকানন্দ-শতবর্ষ জন্মক্ষণে জাতিকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, আমরা 'মমি' না হইয়া জীবন্ত মানুষ, জীবন্ত জাতি হইতে পারি কিরূপে এবং যাহাদের ঘৃণা করিতেছিলাম, মানুষ বলিয়া গণ্য করি নাই তাহাদের ঘৃণা না করিতে পারি কোন্ মনোবৃত্তিতে?

যে ব্যবস্থায় সমাজ-জীবন স্থাণু হইয়া আসিয়া থামিতে পর্যবসিত হইয়াছিল এবং সামাজিক যে ব্যবস্থায় একদলকে ছোট করিয়া রাখিতে পারা সম্ভব হইয়াছিল, তাহার পিছনে একটা চিন্তাধারা আছে। ব্যবস্থাগুলিকে বদলাইতে চাহিলে সে চিন্তাধারাটা বদলান প্রয়োজন—গোড়ার চিন্তাধারার বদল না করিয়া লইলে, মূলের পরিবর্তন না ঘটাইলে স্থায়ী ফল লাভের কোন আশা নাই। সে চিন্তাটা, সে দর্শনটা কি?

অধ্যাত্মবাদ বলিতে আমরা ভারতীয়েরা বুঝি বাস্তব জীবনের গতিশীলতাকে বন্ধ করিয়া দিয়া, জীবনের বেগ-বর্ধকে কমাইয়া আনিয়া আনিয়া পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের বাহিরে লড়াইহীন কুণ্ঠাহীন গোলোকবৈকুণ্ঠে অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা। ইহাই ভারতবর্ষের পরমার্থ। এই চিন্তাধারারই অবশ্যম্ভাবী ফল বাস্তব জীবনের 'মমি' অবস্থা, মৃত অবস্থা। আজ বাঁচিয়া উঠিতে হইলে, জীবিতের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে গতিকে, বাস্তব জীবনকেও স্থিতির মত সমমূল্যে সম মর্যাদায় স্বীকার করিয়া, গ্রহণ করিয়া স্থিতিলাভ করিতে হইবে। গতিশীল বাস্তব জীবনকে পূর্ণ মর্যাদায় স্বীকার না করিলে জীবন্ত অবস্থা লাভের সম্ভাবনা নাই, আবার জীবনের এই গতিধর্মকেই একমাত্র করিয়া দেখিলেও জীবনকে ভূতের নৃত্য হইয়া পড়া হইতে বাঁচান যায় না। প্রয়োজন উভয়ের সম মান ও সম মর্যাদা স্বীকার করিয়া 'মাত্রা'র মধ্যে উহাদিগকে বাঁধিয়া লওয়া—ইহাই আজিকার দিনের সাধ্য। স্বধর্মে কাজ করে বলিয়াই চণ্ডালকে যে অমানুষ, অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলাম, জাতিভেদের পঙ্কিলতায় সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনকে যে অধঃপাতের অতলে নামাইয়া দিয়াছিলাম, তাহারও হাত হইতে তখনই স্থায়ী মুক্তি পাওয়া যাইবে কিংবা বর্ণগুণের সংমিশ্রণ তখনই সম্ভব হইবে যখন সাত্ত্বিকতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধরিয়া রাজসিকতা তামসিকতাকে সিঁড়ির পর পর নীচের দিকে চিরন্তন ব্যবস্থা হিসাবে স্থাপন করিব না। কোন একটা অবস্থাকে দেশ কাল পাত্র নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধরিয়া লইলে অপরগুলি যথোপযুক্ত মান না পাইয়া সমাজ বা ব্যক্তি-জীবনকে বিপর্যস্ত করিবেই—এ কথাটা হিসাব-নিকাশের দিনে আজ বুঝিতেই হইবে। কাহাকেও অস্বীকার করা যাইবে না—বিধাতার রাজ্যে প্রত্যেকে থাকা চলিবে সমভাবে, অথচ প্রত্যেকের একটা মাত্রা আছে, কেহই নিজের মাত্রাকে ছাড়াইয়া অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে না—এই ভাবে চলিলেই জীবিত থাকা সম্ভব। চিন্তাধারার, দার্শনিকতার এই স্তরেই বিবেকানন্দের পরে বিবেকানন্দের বক্তব্য স্থায়ী ফল লাভ করিবে। তাঁহার বক্তব্যের পিছনের এই দার্শনিক কাঠামোসহ আজ তাঁহার বক্তব্যকে জনসাধারণ তথা চিন্তাশীলদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে। সত্য-প্রকাশ কালাপেক্ষা রাখে—স্তরে স্তরে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ—দর্শনের এই পরিবর্তিত চিন্তাধারাসহ বিবেকানন্দকে উপস্থিত করিবেন শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ। শতবর্ষ জন্মক্ষণে আমরা যাহাতে তাঁহাকে জীবনে আয়ত্ত করিতে পারি সে শক্তি প্রার্থনা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে পুনরায় বার বার শতবার আমাদের প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীবেনু মিত্র কর্তৃক নবনারায়ণ আশ্রম, পোঃ অবিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

বিজ্ঞপ্তি

উজ্জ্বলভারতের ষোড়শ বর্ষ আরম্ভ হইল। গ্রাহকদিগের নিকট নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন শীঘ্রই ষোড়শ বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দেন।

ইতি
কার্য্যাধ্যক্ষ, উজ্জ্বলভারত
গ্রাম : বাগুইআটি
পো: : অশ্বিনীনগর
২৪ পরগণা

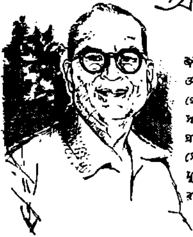

তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি আমাদের পাথেয় হউক

"কর্মের শ্রম ও ধৈর্যের দ্বারা কি লাভ করা যায় তার জন্য যদি কোন উদাহরণের প্রয়োজন হয় আমি সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের নাম উল্লেখ করবো। ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বিরাট কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিদেশে প্রস্তুত সবচেয়ে সেরা কালির যে গুণগত উৎকর্ষ সুলেখা সেই গুণের অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে সাহায্য করছে। আজকে তাদের এই রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

বিধানচন্দ্র রায়

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

কর্ম্মদক্ষতা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ব্যাঙ্কিং-এর যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

হেড অফিস :

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

শাখাসমূহ

মিশন রো (কলিকাতা)	খড়্গপুর
উত্তর কলিকাতা	কোচবিহার
দক্ষিণ কলিকাতা	আলিপুরদুয়ার

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিপ্লবী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

বিদ্যাসাগর	২·২৫	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ** ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী **:** ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। । গড়িয়াহাট মার্কেট ।

সূচীপত্র : ফাল্গুন, ১৩৬৯, ১৮৮৪

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (১৯) ... ২৯
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রবর

২। কবি শিক্ষা ... ৩২
শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৩। পাঠ্যক্রমে সমাজ-বিদ্যা ... ৩৭
সুবোধকুমার সেনগুপ্ত

৪। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫১) ৪২

৫। গল্প ... ৫০
শ্রীউমাশঙ্কর চট্টরাজ

৬। ত্রিধারা (কবিতা) ... ৫৩
শ্রীভারতী

৭। সাবিত্রী : নেতাজী সুভাষ, ... ৫৪
নবনারায়ণে আইন সভা, ২২শে জানুয়ারী

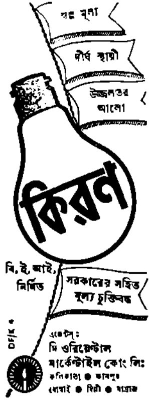
স্বল্প মূল্য
দীর্ঘ স্থায়ী
উজ্জ্বলতর আলো
কিরণ
বি, ই, আই, নির্দিষ্ট
সরকারের সহিত মূল্য চুক্তিবদ্ধ
DF/K 4
এজেন্টস্ :
দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোং লিঃ
কলিকাতা ● কানপুর
বোম্বাই ● দিল্লী ● মাদ্রাজ

"পুরুষোত্তম cult-এ প্রত্যেক অণুটিও এক একটি কেন্দ্র—কি কথাই না তোমার গোপাল বলিয়া গিয়াছেন? 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ।' এতদিন অল্পের কোন self-centered হইবার যোগ্যতা ছিল না। অল্প সার্থক অধিকের মধ্যে নিভিয়া গিয়া—এই হাইপথেসিসের—অনুমানের—উপর সব সমাজ গড়া। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু সেই মানুষও যে বৃন্দাবনে গিয়া তরুগুল্মলতাজন্ম কামনা করিবে, তাহা কে জানিত বা বিশ্বাস করিত? কৃষ্ণসখা উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়া এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। একটা hierarchy করিয়া একটিকে রাখিয়াছে সিঁড়ির ঊর্দ্ধ ধাপে কুলীন করিয়া, আরগুলিকে পর পর নীচে নামাইয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে কিছুদিন চলিল বেশ। কিন্তু উচ্চ স্তরের চাপে নিম্নের সবগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিল, তখনই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ছোটরা, নীচের দল, সব বড়দের, উঁচুদের সমকক্ষতার দাবী করিল। ভাগবত বলিলেন, বড় ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে পুরুষোত্তমের direct ও equal relation। গায়ত্রী জপ ও মুচির জুতাসেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটী কুলীন হইবে এবং অপরটী অকুলীন হইবে? ঘর ঝাঁট না দিলে যখন ঠাকুর-পূজাই হয় না, তখন ঠাকুরের কাছে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও পূজা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? কে কুলীন, কে অকুলীন?……যদি কৌশলপূর্বক প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সত্ত্ব হইতেও পুরুষোত্তম যতদূর, রজস্তম হইতেও পুরুষোত্তম ততদূর।……এতদিনের সাধনা সব minus-এর সাধনা, নেতি নেতি। কৃষ্ণের সাধনা positive। সবকে রাখিয়া সবকে হজম করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।…… ছোটরাও যে অন্তরে অন্তরে পুরুষোত্তম, একথা তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিয়াছে।…… তাই আজ নোতুন করিয়া শাস্ত্র দিতে হইবে। New Social Order, New Religious Order সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে না পুরুষোত্তম মিলিবে?……"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

UNIVER

উজ্জ্বলভারত

ফাল্গুন, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(১৯)

…তোমার ভাগবত লইয়া আমি বেদান্তে মিশি যাচি, তা আমি করি নাই, সকলের ভিতর তোমাকে খুঁজিয়াছি। সতী তোমার পদসেবা করিয়াছে, রাসেশ্বরী তোমার চরণ স্পর্শ করিয়াছে। তুমি নির্বিকার, নিরঞ্জন! আমার নিরঞ্জন সর্বাবস্থার অতীত। তুমি এমন আমায় ভালবাস, তোমায় ছাড়িয়া যাইতে বুক আমার কাঁদিয়া উঠে। সকলেই আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে…তুমি আছ, তুমি আছ। রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে?—আমার আদরের ডাক ফুরাইয়া গিয়াছে, যেমন আদরে তুমি কাছে রাখিতে চাহিতে, সে আদর আর কে করিবে?…তোমার স্নেহের ধন বটুক—নিত্যগোপাল, আমি তোমার কাছে কাছে রহিব। আমার তুমি, আমার দেহমনপ্রাণ তোমায়—আমি তোমার, আমি তোমার বিশ্বের…।

সন্ধ্যা—…গীতায় ভগবান অর্জুনকে সংসারে কি ভাবে চলতে হবে তা বলবার জন্য দুটো শ্লোক বলেছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ৩।১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ৩।১১

প্রজাপতি যজ্ঞের (sacrifice, আত্মনিবেদন) সঙ্গে প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। যখনই প্রজা সৃষ্টি করেছেন, তখনই যজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সঙ্গেই প্রজাদের কানে কানে প্রাণে প্রাণে বলেছেন, এই যজ্ঞ করে তু বাড়বে, যজ্ঞ তোমাদের ইষ্টকাম দোহন করবে, এ যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের ভাবনা করো, তা হলে দেবতারা তোমাদের ভাবনা করবে—পরস্পর পরস্পরের এ ভাবনার মধ্য দিয়ে তোমরা পরম শ্রেয় লাভ করবে।.. আহুতি না দিলে কিছু পাবে না, নিজেকে না দিলে কি পাবে না—ভূতযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ…পঞ্চযজ্ঞ। এ যে আজ বন্যা তার মানে মানুষ যজ্ঞ ভুলেছে বলে বায়ু জ মাটির সঙ্গে বিরোধ চলছে। বায়ু এক দেবতা, জ এক দেবতা, এমনি…। দেবতারা যজ্ঞের প্রাণ গ্রহ করেন। যজ্ঞ করলেই, সেবা করলেই, একে অপরে জন্য মরতে পারলেই পরম মঙ্গল লাভ করা যায়। ম সন্তানের জন্য মরবে, সন্তান মায়ের জন্য, গুরু শিষ্যে জন্য, শিষ্য গুরুর জন্য.. এক তরফা হবে না—আমাদে সব পারস্পরিক…। তিলের মধ্যে যেমন তেল থাকে সেই রকম দেবতা সর্বভূতের মধ্যে আছেন—মন্থন ক ভগবানকে বের করতে হবে—দুধের মধ্যে মাখনকে যেমন মন্থন করে বের করে নিতে হয়, তেমনি ভগবানকে বের করে নিতে হয় পারস্পরিক ভাবনাদ্বারা।…কি, পড়তাম মেট্রোপলিটান কলেজে—এখানকার অধ্যাপ এন্, এন্ ঘোষ এক দিন বললেন—তোমার হাতে একটা রসগোল্লা, আমার হাতে একটা—তোমারটা তুমি খেলে আমারটা আমি—এটা ভোগ, তোমারটা আমি খেলা

আমারটা তুমি দেখে—এটা ত্যাগ। খাওয়া দুই জায়গাতেই হল, কিন্তু দ্বিতীয়টা বড় হয়ে গেল।···নিজেরটা ফিটফাট অন্যেরটার দিকে দৃষ্টি নেই, ময়লা—এটা বড় নয়। তুমি আমার ভাবনা ভাববে, আমি তোমার ভাবনা ভাবব, ভগবান জীবের সম্মান দেবে, জীব ভগবানের সম্মান দেবে, বড় ছোটর, ছোট বড়র...। এ যেখানে হয় না—যেখানে তুমি বলবে আমি আছি, আমি বলব আমি আছি—সেখানেও এখন দুই ধারার মধ্যে লড়াই...সেখানে পুরুষোত্তম নাই। তার থেকে তুমি বল তুমি আছ, আমি বলি তুমি আছ এইটে মধুরতর। অথচ খুব কঠিন—কেননা জীবের ক্ষুদ্র অহং কেবলই জানে যে আমার থাকতে হবে সেটা আমাকেই বলতে হবে; তুমি আছ বলতে তার অহংকার পারে না।...তোমার প্রশংসা তুমি করতে যেয়ো না—তুমি অপরের প্রশংসা কর, অপরে তোমার প্রশংসা করবে। ...যাঁরা ধর্ম প্রবর্তক তাঁরা এক তরফা বড় করে—যীশু মানুষের জন্য বড় করে গেছেন—আমার জীবনও এই ভাবেই কেটেছে—আমি তোমাদের মাঝে বিলীন হয়ে বাঁচতে চাই।···সত্যব্রতকে বলেছিলাম হয় তুমি আমার অনুসরণ কর, আমাতে লয় হও, নয় আমি তোমার অনুসরণ করি, তোমার কথা মত চলি।···তোমাদের সম্পর্কেও আমার সেই কথা।

২৮. ৬. ৪৩...গৌর হরি বোল...গৌর একাধারে রাধাশ্যাম—পুরুষ প্রকৃতি একাধারে···অদ্বৈততার ঘন আস্বাদন···একাত্মতার পরিপূর্ণ আস্বাদন...গৌর তুমি উপনিষদের সেই মন্ত্র আস্বাদিলে···যে নিজের বাহিরে সকল দেখে, সকল তাহাতে পর্যবসিত করে। বাঙালীর ঘরের দেবতা, বাঙলার ঘরের ঠাকুর গৌর···যাহা আমার বাহিরে তাহাই আমার প্রকৃতি···সকল বাহিরকে ঘরে আনিবার সাধনা গৌরের···রাধাকৃষ্ণ একতনু হইয়া বাঙলার ঘরে···যাহা অন্তরে তাহা পুরুষ—গৌরগোপাল শচী দুলাল, সকল বাহিরকে তুমি আমি বলিয়া পরিপাক করিলে—কিছুই বাহিরে রাখিলে না...। আমার এই তত্ত্ব প্রদান করিয়া আমায় উন্মাদ করিলে—সারা জীবন যাহা কিছু পাইয়াছি বুকের মাঝে পুরিয়া লইতে চাহিয়াছি—স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব সকলের মাঝে তোমাকে খুঁজিয়াছি—গৌর আমার একাত্মতার ঘনবিগ্রহ, আমার নিত্যগোপাল! নিত্যগোপাল, একাত্মতার, এক-হৃদয়তার, এক-প্রাণতার সাধনা দিয়া আমায় পাগল করিয়া গেলে, সংসারের বাহির করিয়া দিলে। নিত্যগোপাল দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয়-মূর্তি, এক-বহু সমন্বয়মূর্তি; বহু কেমন করিয়া এক হয়, এক কেমন করিয়া বহু হয়, তোমার জীবনে তাহা ব্যাখ্যাত, আস্বাদিত। সকল পরিচ্ছিন্নতা সকল অপরিচ্ছিন্নতা ভুলিয়া বহু কেমন করিয়া এক হয় সেই ঐক্যের মন্ত্র—সাকারবাদী আকারবাদী কোন্ বাহুস্পর্শে এক হয় সেই মহা মন্ত্র শুনাইয়া গেলে, তাহাই আমাকে দিয়া গেলে। দল গড়ি নাই, সকলের সঙ্গে সম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি। অনৈক্য—মতের কাটাকাটি, পথের কাটাকাটি আমায় বেদনাতুর করে। নিত্যগোপাল, তোমার এই মহা ঐক্যের কথা যেন মানুষকে শুনাইয়া যাইতে পারি—কিন্তু ধীরে ধীরে দেহের সকল শক্তি বিদায় লইতেছে, কতটুকু আর পারিব!··· সমচিত্ততা, সমান মন্ত্র, সমান আকূতি মানুষ লাভ করুক, তুমি মূর্ত হও—আমি তোমার—আমার সমান মন্ত্র হউক, বিশ্বের সঙ্গে সমান চিত্ত হউক। তোমায় পাইয়া সকলকে বুকে লইয়া তোমার বুকে ঢলিয়া পড়িব···। অদ্বৈতের আস্বাদনে এক-প্রাণতার আস্বাদনে ধরার ধূলি হউক ব্রজধূলি···গড়িয়া উঠুক এক মানুষ। নিত্যগোপাল, তুমি ব্রহ্ম-মানুষ, একপ্রাণতার তুমি ঘনরূপ—নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল—সমানী সমিতি গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম—বুকে বুকে মিলাইয়া, একের হৃদয়ের সঙ্গে অন্যের হৃদয় মিলাইয়া সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়া ছিলাম···আমার প্রাণ নিত্যগোপাল—বঙ্গের বুকে সমান সমিতি গড়িয়া উঠুক···নিত্যগোপাল...।

সন্ধ্যা—ওঁ নমো···। আমরা বর্তমানে যে আবেষ্টনের মধ্য দিয়ে চলেছি, যে দুর্যোগের মধ্য দিয়ে চলেছি তার মধ্যে কিভাবে চলতে হয় তা ভাগবতে কৃষ্ণ দিয়েছেন।... শুকদেব বলছেন,

> প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
> মন্দা সুমন্দমতয়ঃ মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ। ভাগবত

মানুষের স্বাস্থ্য নাই—সমস্ত সমাজেরই স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে,—দেহেরও মনেরও; সমাজ বলেও আর আর কিছু নাই—ঝগড়া বিরোধেরও অন্ত নাই, অন্ত নাই উপদ্রবের—মানুষ উদভ্রান্ত চূড়ান্তভাবেই। উপায়? উপায় কৃষ্ণলীলা শোন। কৃষ্ণ কেবল আধ্যাত্মিক দেবতা নয়—যত রকমের সমস্যা হতে পারে সব সমস্যা নিয়েই কৃষ্ণ এসেছিলেন, সব সমস্যার সমাধানই দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবনে রাজনৈতিক আবেষ্টনও ছিল—সে দিক দিয়েও তিনি সমাধান দিয়েছেন।…জীবনী শক্তির সঞ্চার দ্বারা সমস্যার সমাধান করতে হবে—পেটে অগ্নি থাকলে সব কিছুই হজম হবে। চতুর্দিকে রোগ ঢুকেছে। জীবনীশক্তি বাড়াও—Grow from within। যোগেশ বললেন—Tit for tat—কিন্তু এতে হবে না।… কৃষ্ণলীলার কালীয় দমন উপাখ্যান-এর ব্যাখ্যা আমার মুখে হয়তো কেউ কেউ শুনে থাকবেন। এ এমনই উপযুক্ত একটা পথের কথা বলে যা আমার খুব ভাল লাগে।… খল প্রকৃতি মানুষ বা জাতির সঙ্গে কিরকম করে ব্যবহার করতে হবে—তারই কথা আছে কালীয় দমন উপাখ্যানে।…সাগরের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হলে নদী বাঁচে না।… God is a practical necessity…। জীবন সব সময়েরই জীবন…। ক্রম, বড় না হলে কেউ বাঁচবে কি করে?…চ্যাঁচরামি করে বড় হওয়া যায় না। জীব তুমি শিবের সঙ্গে যুক্ত থেকো—বিশ্বরূপ তুমি বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত থেকো..প্রজাপতি বললেন, যজ্ঞের মধ্য দিয়ে বড় হও অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হও।…ভারতবর্ষ পরাধীন হয়েছে জাতীয়তা-বোধ না থাকায়, সঙ্ঘবদ্ধ হতে না পেরে—এত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সে মিলতে পারল না—অথচ সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি ছাড়া কলিযুগে মানুষের আর কোন শক্তিই নাই।…একত্র না হলে, মিলিত না হলে ভাতও জুটবে না। রিফিউজীরা এসেছেন, সমান মন সমান সমিতি না হলে, সঙ্ঘবদ্ধ না হলে, মিলিত না হলে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।…সুপারিন্টেন্ডেন্ট শচীনবাবু ও আর যাঁরা এসেছেন তাঁদের নরনারায়ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে আমি সাদর সম্ভাষণ জানাই।

২১. ৩. ৫৬…বিপ্লবের পথে আমার জাতিকুলশীল সকলই গিয়াছে। বিপ্লবের গুরু নৈর্বাণী নৈঃস্বী বিপ্লবময়ী আমার শ্রীরাধা—তুমি আমার জীবনে প্রবেশ করায় আমার জীবন কেমন হইয়া গিয়াছে,—আমি তো এমন ছিলাম না! শ্রীরাধা, তোমারই মত আমাকে গড়িয়া তোল—যদি ভাঙিয়াছ, তবে জাতিকুলশীল ছাড়াইয়া বিশ্বের মাঝে আমাকে গড়িয়া তোল। শ্রীরাধা আমার স্বরূপ—আমি তোমার মাঝে আমায় খুঁজিয়া পাইয়াছি। আমি তোমায় পাইয়া আমায় চিনিয়াছি…শ্রীরাধা কৃষ্ণ-জীবাতু—বিশ্বের আরাধ্যা।…নিত্যগোপাল, আমার জীবনের সকল পাওয়া তোমারই মাঝে পাইয়াছি—আমি জানিতাম না শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব কি, গৌরতত্ত্ব কি—তোমার জীবনের মাঝেই আমি সকল তত্ত্ব পাইয়াছি—তুমি আমার জীবনের মধ্য দিয়া শিখাইয়াছ।…নিত্যগোপাল সারা জীবনের সাথী তুমি, আমার আশ্রয় তুমি…আমার মনের অবলম্বন আমার বুদ্ধির অবলম্বন তুমি…।

সন্ধ্যা…। আরতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ভগবানকে আপনার করা, ভগবানের কাছে নিকটে উপস্থিত করা—দাঁড়াও আমার আঁখির আগে—তিনি যখন আমার জীবনে রূপরসগন্ধস্পর্শের মধ্যে উপস্থিত হলেন, এই সব ক্ষেত্র যখন তাঁর দ্বারা ভাবিত হল, তিনি যখন অন্তঃপ্রবিষ্ট হলেন আমার মধ্যে—তখনই আমার চরম সার্থকতা। ইহাই আরতির অর্থ। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ ভূত দ্বারা তাঁকে প্রকাশিত করতে হয়। অর্থ হচ্ছে এই পঞ্চভূতে তিনি প্রবিষ্ট—আমার ভিতরের এই পঞ্চতত্ত্ব দিয়ে আমার সব দিয়ে তাঁকে প্রকাশ করব। অহংকার দিয়ে তো তাঁকে প্রকাশ করা যায় না—দুটো process এক আহুতি দেওয়া, দ্বিতীয় সেই শরণাগত আমার কিছু দিয়ে তাঁকে প্রকাশ করা।… কৃষ্ণকে বিশ্ব ধরব, আর তাঁর জগৎকে বলব মায়া, একটা ফাঁদ—এ চলে?

ক্রমশঃ

কবি শিক্ষা

।। শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । এম এ, বি টি ; ডি এল্‌ট ।।

কাব্য সৃষ্টির ব্যাপারটা একটা অনুশীলন-সাধ্য ব্যাপার নয়। তার জন্য প্রথমতঃ চাই কবির আন্তর প্রেরণা, তার পর সেটা প্রকাশের জন্য চাই কাব্য-প্রতিভা। নিছক শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা, বা অনুশীলনের দ্বারা প্রথম শ্রেণীর কবি হওয়া যায় না ; আর কাব্য-কলা তত্ত্ব পাঠ করেই ভাল কাব্য তৈরী করা যায় না। তা সত্ত্বেও কবিকে কবিকৃতির ব্যবহারিক পথ-নির্দ্দেশ দেবার জন্য কলা-বিদ্যা হিসাবে কাব্য-কলার সৃষ্টি হয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশেই। গ্রীসের এ্যারিস্টটল্ হোরেস্ প্রভৃতির "আর্স্ পোয়েটিকা"র কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। ভারতবর্ষেও ক্ষেমেন্দ্র রাজশেখর অরিসিংহ অমর সিংহ দেবেশ্বর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ভাবেই "কবিশিক্ষা" বা কাব্য কলা তত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থাদি লিখেছেন, আর পরোক্ষ ভাবে বহু সাহিত্যিকই ভাল সাহিত্য সৃষ্টির একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁদের রচনার ফাঁকে ফাঁকে। কাব্য তত্ত্বের সঙ্গেও প্রসঙ্গতঃ অনেকেই কাব্য কলা তত্ত্ব সম্বন্ধেও ব্যবহারিক পথ-নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

ক্ষেমেন্দ্র

ক্ষেমেন্দ্রের "ঔচিত্য বিচার চর্চা" এবং "কবি কণ্ঠাভরণ" গ্রন্থ দুটিকে আমরা ভারতীয় কাব্য-কলা-তত্ত্বের গ্রন্থ হিসাবেই ধরে নিতে পারি। ঔচিত্য সম্বন্ধে আনন্দ বর্দ্ধনের বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন "অনৌচিত্যাদৃতে নান্যৎ রসভঙ্গস্য কারণম্।"

প্রসিদ্ধৌচিত্য বন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা। ৩।১৪ (বৃত্তি)

অর্থাৎ অনৌচিত্য ছাড়া রসভঙ্গের আর কারণ নেই। প্রসিদ্ধ ঔচিত্যানুযায়ী রচনা রসের শ্রেষ্ঠ গুপ্ত রহস্য স্বরূপ।"

আনন্দ বর্দ্ধন ক্ষেমেন্দ্রের গুরু ছিলেন। তিনি গুরুর এই উক্তিটিকে ভিত্তি করেই গড়ে তুলেছিলেন তাঁর "ঔচিত্যবাদ"। আমরা জানি ক্ষেমেন্দ্রের পূর্ব্ব সুধীদের মধ্যে আনন্দ বর্দ্ধন ছাড়া আরও অনেকেই ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করেছিলেন। সেই সব আলোচনার সূত্র ধরে তিনি আরও অনেক দূর অগ্রসর হলেন এবং সাহিত্য রচনার ব্যবহারিক তত্ত্ব হিসাবে "ঔচিত্যবাদের" প্রতিষ্ঠা করেন।

ক্ষেমেন্দ্রের মতে এই ঔচিত্যের প্রয়োজন শুধু রসের সার্থকতা সৃষ্টির জন্যই নয়। পদে বাক্যে প্রবন্ধে অর্থে অলঙ্কারে রসে ক্রিয়া কারকে লিঙ্গে বচনে বিশেষণে কালে দেশে কুলে সমস্ত বিষয়েই ঔচিত্যের কথা ভাবতে হবে। যে কোনও ব্যাপারেই ঔচিত্যের হানি হলে কাব্যেরও হানি হবে। ক্ষেমেন্দ্র বহু কবির কাব্য থেকে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্যটি বুঝিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এই ঔচিত্য বিচারটা সাহিত্য-সমীক্ষার একটা ভাল মাপ কাঠির কাজ করবে। ঔচিত্যের ব্যবহারিক নির্দ্দেশটা অকবিকে কবি করে তুলতে পারবে না বটে, তবে কবিকে তাঁর সম্ভাব্য ভুল ভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন রেখে তাঁকে একটা পথ-নির্দ্দেশ দিতে পারবে।

এই জিনিসটার প্রয়োজন ছিল। অবশ্য ক্ষেমেন্দ্রের পূর্ব্বে বহু আলঙ্কারিকই দোষ ও গুণের আলোচনা প্রসঙ্গে ঔচিত্যের কথাই প্রকারান্তরে বলেছিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা ও সূত্রের অনমনীয় নির্দ্দেশে অন্ধভাবে চলেছেন অনেক কবি এবং ভুলও করেছেন রচনার ক্ষেত্রে। ঔচিত্যের বিচারে সাবধানে চললে সেই সব ভুলগুলি হতো না। তাই ক্ষেমেন্দ্রের "ঔচিত্য বিচার চর্চা" পরবর্ত্তী কালের কবিদের একটা পথ-নির্দ্দেশ দিতে পারবে।

ক্ষেমেন্দ্রের আলোচনা এই টুকুই আমাদের বুঝিয়ে দেবে যে কাব্যের রচনাটা নিছক অলঙ্কার গুণ রীতি বা রসের সংযোজনা দিয়ে হয় না, সেটা হয় অলঙ্কার প্রভৃতির ঔচিত্যের বিচারে। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এটা একটা প্রয়োজনীয় তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে আমরা যদি সজাগ

না থাকি, তাহলে "প্রস্থান-পন্থ" মতবাদে আমাদের বুদ্ধিটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে এবং সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে আমরা শুধু technique-এর অনুসরণ করেই কর্ত্তব্য শেষ করবো। কবি-কৃতির ক্ষেত্রে এটা অপরাধ। রবীন্দ্রনাথ অন্য প্রসঙ্গে এই অপরাধের কথা বলেছেন "শুধু অক্ষি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ"। এক হিসাবে এটা ঔচিত্যেরই বাণী। সমালোচনার ক্ষেত্রেও এটা একটা মস্ত বড় অপরাধ। এটা সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির মতই সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে তোলে। ক্ষেমেন্দ্র এই অপরাধ করেন নি। তিনি নির্মম বিচারে বড় বড় কবিদেরও দোষ ত্রুটি দেখিয়েছেন ঔচিত্যের মাপ কাঠি দিয়ে। অমরু কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রখ্যাত কবিদেরও তিনি ক্ষমা করেন নি।

কবি-শিক্ষা সম্বন্ধে ক্ষেমেন্দ্রের আর একটি গ্রন্থের নাম হচ্ছে "কবি কণ্ঠাভরণ"। এই গ্রন্থে ক্ষেমেন্দ্র কাব্য প্রেরণার জন্য দুটি শক্তির উল্লেখ করেছেন, একটি হচ্ছে "দৈব প্রযত্ন" আর একটি হচ্ছে "পৌরুষ" বা কবির ব্যক্তিগত চেষ্টা। এই ব্যক্তিগত চেষ্টার দিক দিয়ে তিন রকমের সাহিত্যিক আছেন। একদল একটু চেষ্টা করলেই সাহিত্যিক হতে পারেন (অল্পপ্রযত্ন সাধ্য), আর একদল আছেন যাদের প্রচুর চেষ্টা করে সাহিত্যিক হতে হয় (কৃচ্ছ্র সাধ্য), আর একদল আছেন যারা শত চেষ্টা করেও সাহিত্যিক হতে পারেন না (অসাধ্য)। এই ভাবে সাহিত্য কর্মীদের শ্রেণী বিভাগ করে ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন কাব্য শক্তিটা অতি অল্প সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তিরাই পেয়ে থাকেন।

ক্ষেমেন্দ্র সাহিত্যিক চৌর্য্য নিয়েও আলোচনা করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে খুব বেশী সংখ্যক আলঙ্কারিক আলোচনা করেন নি। ধ্বন্যালোকের চতুর্থ উদ্যোতে এই সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা হয়েছে আর বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়েছে রাজশেখরের গ্রন্থে।

যাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চুরি করেন, ক্ষেমেন্দ্র তাঁদের পাঁচটি দলে ভাগ করেছেন। একদল অন্য কবির ভাব বা চিন্তাধারা গ্রহণ করেন (ছায়োপজীবী), আর একদল গ্রহণ করেন পদ বা পদাংশ (পদক, পদ-উপজীবী), আর একদল গ্রহণ করেন সমগ্র শ্লোক (শ্লোকোপজীবী), আর একদল আছেন যাঁরা গ্রহণ করেন সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত গল্প কাহিনী প্রভৃতি (ভুবনোপজীবী)। ক্ষেমেন্দ্রের মতে শেষোক্ত দলের চুরিটা চুরি হিসাবে গণ্য নয়।

যাঁরা কবি হতে চান, তাঁদের শিক্ষা দীক্ষা ও আচরণ নিয়মের জন্য নিয়মাবলী দিয়ে ক্ষেমেন্দ্র বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

কাব্যের চমৎকারিতার উৎস কোথায় সেটা নিয়েও ক্ষেমেন্দ্র নানা ভাবে আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন কবির লেখা থেকে প্রচুর উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কাব্যের শব্দ গুণ অর্থ ও রসগত দোষ সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা আছে এই গ্রন্থে।

ভাল সাহিত্যিক হতে হ'লে সাহিত্যিকদের কোন কোন বিষয়ে ভাল ভাবে পড়াশুনা দরকার, তার একট দীর্ঘ তালিকা তিনি দিয়ে দেন।

অরিসিংহ অমরচন্দ্র ও দেবেশ্বর : কবিশিক্ষা আলোচনা প্রসঙ্গে অরিসিংহ ও অমরচন্দ্রের "কাব্য কল্পল বৃত্তি"র নামও উল্লেখযোগ্য।

তবে এই গ্রন্থটিতে কবি-শিক্ষা বা কাব্য কলা তত্ত্বের আলোচনার চেয়ে কবিতা রচনা তত্ত্বের আলোচনাটা বেশী হয়েছে। কারণ কাব্য জিনিসটা ঠিক অনুশীলন সা জিনিস নয়। চেষ্টা করে উপযুক্ত ছন্দ গতি যতি উপ অনুপ্রাস প্রভৃতি দ্বারা কবিতা তৈরী করা যায়, কিন্তু কা তৈরী করা যায় না। সত্যিকারের কাব্য সৃষ্টির জ প্রতিভার দরকার হয়। এই কবি-প্রতিভাটা কোনও গ্র পাঠ করে আয়ত্ত করা যায় না। তবে কবিতা রচনা কৌশলটা গ্রন্থাদি পাঠ করে খানিকটা আয়ত্ত করা যায় তাই অরিসিংহ তাঁর গ্রন্থে কবিতা রচনার কৌশল নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থটি যেন ছ অলঙ্কার প্রভৃতির অভিধানের কাজ করে।

এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার আলোচ করেছেন ছন্দ সিদ্ধির (prosody) তত্ত্ব। এই পরিচ্ছেদে মধ্যে আছে পাঁচটি উপবিভাগ। তাতে আলোচিত হয়ে অনুষ্টুপ ছন্দের কথা, সাধারণ ছন্দ যতি প্রভৃতির ক

ছন্দ পূরণের কৌশল স্তুতি নিন্দা যুক্তি জিজ্ঞাসা প্রভৃতির রচনা কৌশল, আর শেষ ভাগে আছে বর্ণনা মূলক কবিতার ব্যবহারিক নির্দেশ অর্থাৎ রাজা রাজসভা মন্ত্রী সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্র মৃগয়া গ্রাম অথবা নগর প্রভৃতি বর্ণনার পথ-নির্দেশ।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটির নাম হচ্ছে "শব্দসিদ্ধি" এর মধ্যে আলোচিত হয়েছে সমাস অনুপ্রাস লক্ষণা ব্যঞ্জনা প্রভৃতি।

পরের পরিচ্ছেদটির নাম "শ্লেষ সিদ্ধি"। এতে আলোচিত হয়েছে নানা রকমের দ্ব্যর্থ বোধক শব্দের এবং কৌশল প্রহেলিকা প্রভৃতি।

গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদটির নাম "অর্থসিদ্ধি"। তাতে আলোচিত হয়েছে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের উপাদানের দীর্ঘ তালিকা। যেমন নায়িকার এক ধরনের বর্ণনার জন্য কখনও উল্লেখ করতে হবে বিম্ব ফলের, কখনও বা প্রবালের, কখনও বা নব কিশলয়ের ইত্যাদি। এই সব ready made উপমা থেকে অকবিরাও কবিতা লিখতে সুবিধা পাবে।

কেশবের "অলঙ্কার শেখর" এবং দেবেশ্বরের "কবি কল্পলতা" প্রভৃতিও এই জাতীয় গ্রন্থ।

রাজশেখর: রাজশেখরের কাব্য মীমাংসা একাধারে কাব্যতত্ত্বও বটে, আবার কাব্য কলা তত্ত্ব বা কবিশিক্ষা জাতীয় গ্রন্থও বটে। এই গ্রন্থটিতে কোনও একটা বিশিষ্ট প্রস্থানের মতবাদ প্রতিপাদিত হয় নি। তবে এতে এমন অনেক কথা আছে, যেটা সব সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের কাছেই মূল্যবান্। এতে ১৮টি অধিকরণ ছিল। বর্তমানে শুধু প্রথম অধিকরণটি পাওয়া যায়। তার নাম "কবি রহস্য"। এই প্রথম অধিকরণটি হচ্ছে মূল গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র। এই ভূমিকাটিও ১৮টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

কাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজশেখর একটা চমৎকার কাল্পনিক কাহিনী দিয়েছেন। রাজশেখর বলেছেন কাব্য হচ্ছে সপ্তম বেদাঙ্গ এবং কাব্য না জানলে বেদও জানা যায় না। রাজশেখরের মতে শ্রীকণ্ঠ এই শাস্ত্রটি তার ৬৪ জন শিষ্যকে প্রথম শিক্ষা দেন। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন "কাব্যপুরুষ"। প্রজাপতির নির্দেশে ইনিই পৃথিবীতে কাব্য বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য সহস্রাক্ষ প্রভৃতি ১৭ জন শিষ্যকে তৈরী করেন। এঁরা আঠারোটি অধিকরণে এঁদের প্রাপ্ত বিদ্যাকে লিপিবদ্ধ করেন। রাজশেখর বলেন এই ১৮টি অধিকরণ অনেকদিন আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি তাঁর "কাব্যমীমাংসায়" সেই লুপ্তপ্রায় বিদ্যাগুলি একত্র করতে চেয়েছিলেন। এই গ্রন্থেরই প্রথম অধিকরণটি হচ্ছে "কবিরহস্য" সংক্রান্ত। রাজশেখরের মতে "কাব্যপুরুষ" থেকেই জগতে প্রথম কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে, ইনিই হচ্ছেন কাব্যের প্রতিষ্ঠাতা দেবতা। ইনি সরস্বতীর পুত্র। সরস্বতী হিমালয়ে তপস্যা করে এই কাব্য পুরুষকে পুত্র রূপে লাভ করেছিলেন। এই পুত্রের যোগ্য পত্নী হচ্ছেন "সাহিত্য-বিদ্যা"। কাব্য-পুরুষের শরীর হচ্ছে শব্দার্থ, সংস্কৃত মুখ, প্রাকৃত বাহু, সমতা প্রসাদ মাধুর্য প্রভৃতি গুণ, অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার, রস হচ্ছে আত্মা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাজশেখর বলেছেন "বাঙ্ময়" বা সাহিত্যের দুটো ভাগ; একটা হচ্ছে "শাস্ত্র", আর একটা হচ্ছে "কাব্য"। শাস্ত্রের মধ্যে আছে দৈবী শাস্ত্র, আর মানুষী শাস্ত্র। দৈবী শাস্ত্র হচ্ছে বেদ উপনিষদ্ ও ছটি বেদাঙ্গ (অলঙ্কার শাস্ত্র সপ্তম); আর মানুষী শাস্ত্র হচ্ছে পুরাণ ইতিহাস মীমাংসা স্মৃতি প্রভৃতি।

এর পর তিনি সূত্র বৃত্তি ভাষ্য সমীক্ষা টীকা পঞ্জিকা কারিকা বৃত্তি প্রভৃতির আলোচনা করে প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্য বিদ্যার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। রাজশেখরের সাহিত্য সংজ্ঞা হচ্ছে "গুণবৎ অলঙ্কৃতং বাক্যং কাব্যম্"।

এর পর তৃতীয় পরিচ্ছেদে কাব্য পুরুষ সম্বন্ধে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী বর্ণনার পর চতুর্থ পরিচ্ছেদে রাজশেখর আলোচনা করেছেন বিদ্যার পাত্র ছাত্রদের সম্বন্ধে। ছাত্র আছে দু রকমের, "বুদ্ধিমৎ" ও "অর্দ্ধবুদ্ধি"। অর্দ্ধবুদ্ধিদের মধ্যে আবার আছে "অল্পধী বুদ্ধি" ও "দুর্বুদ্ধি"।

এই প্রসঙ্গে তিনি "প্রতিভা" (poetic genius), ব্যুৎপত্তি (culture) এবং অভ্যাস সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। প্রতিভাটা আবার সৃষ্টিমূলক বা "কারয়িত্রী" (creative) এবং বুদ্ধিমূলক বা "ভাবয়িত্রী" (discriminative) এই দু রকমের হয়। রাজশেখর বলেন সৃষ্টিমূলক প্রতিভা আবার তিন রকমের—যথা (১) "সহজ" অর্থাৎ যেটা জন্মগত ব্যাপার, (২) "আহার্যা" বা আগন্তুক (adventitious) এবং "ঔপদেশিক" অর্থাৎ যেটা উপদেশের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

বুদ্ধিমূলক (ভাবয়িত্রী) প্রতিভারও শ্রেণীবিভাগ আছে। এক দল হচ্ছে "অরোচকিন্"; এদের প্রতিভা আছে, কিন্তু সেটাকে উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত করলে তবেই সেটা প্রকাশ পায়। আর একটা শ্রেণী হচ্ছে "সতৃণাভ্যবহারিন্" (feeding on grass)। এঁরা হচ্ছেন শক্তিহীন নীচ লোকের দল। তৃতীয় দল হচ্ছে "মৎসরিন্" (the envious), আর চতুর্থ দল হচ্ছে "তত্ত্বাভিনিবেশিনঃ"। এঁরাই হচ্ছেন যথার্থ পণ্ডিত। তবে এঁদের সংখ্যা খুবই কম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে রাজশেখর বিস্তৃত ভাবে কবিদের শ্রেণী বিভাগ করেছেন। মোটামুটি কবিরা হচ্ছেন তিন শ্রেণীর "শাস্ত্র কবি", "কাব্য কবি" ও "উভয় কবি"।

শাস্ত্র-কবিরা শাস্ত্রও লিখতে পারেন, অথবা শাস্ত্রের মধ্যে কাব্যের মাধুর্য্য আবার কাব্যের মধ্যে শাস্ত্রের তত্ত্ব সৃষ্টি করতে পারেন।

কাব্য-কবিরা আটটি উপবিভাগে বিভক্ত; রচনা কবি শব্দ কবি অর্থ কবি অলঙ্কার কবি উক্তি কবি রস কবি মার্গ কবি এবং শাস্ত্রার্থ কবি।

এর পর আছে দশটি পর্য্যায়ের কথা। এই দশটি পর্য্যায় বা স্তরগুলি অতিক্রম করবার পর কবিরা "কবিরাজ" এই পদবীতে উন্নীত হন। রাজশেখর নিজেকে "কবিরাজ" বলে উল্লেখ করেছেন। এই পদবীটি "মহাকবি" পদবীর চেয়ে উচ্চতর স্তর হলেও এটি সর্বোচ্চ স্তরের জিনিস নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাজশেখর শব্দ বাক্য গুণ অলঙ্কার প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পূর্ব্ব-সূরীদের মধ্যে রাজশেখর খানিকটা পক্ষপাত দেখিয়েছেন বামনের প্রতি। তাঁর আলোচনা থেকে মনে হয় রসবাদ ও রীতিবাদের দিকেই তাঁর প্রবণতা ছিল। ধ্বনি তত্ত্বটা তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদে তিনি বামন বর্ণিত তিনটি রীতির উল্লেখ করার পরই নূতন ভাবে রচনা শৈলীর শ্রেণী বিভাগ করেছেন। সেটা সাহিত্যিক শৈলীর হিসাবে নয়, সেটা হয়েছে ব্রাহ্ম শৈব শাক্ত প্রভৃতি ধর্মীয় হিসাবে। উচ্চারণ কৌশল কাকু প্রভৃতিরও আলোচনা হয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে কাব্যের সহায়ক আনুষঙ্গিক জিনিসগুলির অর্থাৎ ভামহ বামন প্রভৃতির অলঙ্কার শাস্ত্র, শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস মহাকাব্য পুরাণ প্রভৃতি পাঠের উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া ৬৪টি কলা, বিভিন্ন দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতিরও পাঠের প্রয়োজন বর্ণিত হয়েছে কবির কাব্যসৃষ্টির উপকরণ-সমৃদ্ধির জন্য।

নবম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে কাব্যের সম্ভাব্য বিষয়-বস্তুর কথা, প্রধানতঃ বিভিন্ন কাব্যের অবলম্বন বিভাগের তত্ত্ব।

দশম পরিচ্ছেদে আছে "কবিচর্য্যা" অর্থাৎ কবিদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা প্রণালী। এই কবিচর্য্যায় কবিদের যে ভোগ বিলাসের কথা বলা হয়েছে, তাতে রাজ মহারাজাদেরও হার মানতে হবে। এতে বর্ণিত হয়েছে কবির বাসভবন, উদ্যান বাটিকা, ছয় ঋতুর উপযোগী বিভি রকমের বাস গৃহ, পুষ্করিণী, চক্রবাক্ সারস কলহংস ক্রৌ শুক শারী হরিণ ময়ূর প্রভৃতির ব্যবস্থা, স্নানের জন্য ধা যন্ত্র, নানা জাতীয় গন্ধদ্রব্য অনুলেপন প্রভৃতি, পোষাক পরিচ্ছদ, দাস দাসীর বর্ণনা, কবির কাব্যের ব্যক্তিগত অনুলেখকদের পোষাক পরিচ্ছদ শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সম্ব সুদীর্ঘ আলোচনা। এ ছাড়া বর্ণিত হয়েছে কবির দৈনন্দি জীবন যাত্রার কর্মসূচী, কাজ ও বিশ্রামের বিভাগের কথা কবি সম্বন্ধে রাজার পৃষ্ঠপোষকতার কর্ত্তব্যের কথা, প্রভৃতি

একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে হরণ ব সাহিত্যিক চুরির কথা। তিনি বলেছেন এমন কবি নে যে চুরি করে না, এমন বণিক নেই যে চোর নয়, তবে ধরা না পড়ে চুরি করবার কৌশলটা জানে, সেই খ্যা লাভ করে।

নাস্তি অচৌর্ কবি জনো, নাস্তি অচৌর বণিক জনো।
স নন্দতি বিনা বাচ্যম যো জানাতি নিগুহিতুম্।

যে ব্যক্তি অপরের ভাব প্রভৃতি নিছক অনুলেখন (copy) করে, সে নিন্দার্হ। কিন্তু যে ব্যক্তি অপরের লেখার মধ্য থেকে নতুন কিছু দেখতে পান, কিংবা পুরাণ লেখাকে নূতন ভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন, তিনি হচ্ছেন মহা কবি।

শব্দার্থোক্তিষু যঃ পশ্যেৎ ইহ কিঞ্চন নূতনম্।
উল্লিখেৎ কিঞ্চন প্রাচ্যম্ মন্যতাম্ স মহাকবিঃ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রাজশেখর ৩২ প্রকারের চুরির কথা আলোচনা করেছেন এবং নানা উদাহরণ প্রসঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছেন কি ভাবে এই হরণগুলি কবিকে সাহায্য করে।

এর পর ১৪দশ থেকে ১৬শ পরিচ্ছেদে "কবি সময়" বা কবি সমাজে প্রচলিত বিধি নিষেধ (established poetic conventions) প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। তাতে বৃক্ষ লতা ফুল পাতা দেশ লোক জন প্রকৃতি সম্বন্ধে কবি-প্রসিদ্ধ বর্ণনার নির্দেশ দেওয়া আছে। সেই বাঁধা ধরা পথে বর্ণনা না করলে কাব্য দোষযুক্ত হয়ে পড়ে। যেমন হাসি বর্ণনায় সব সময়ে শ্বেত বর্ণের উল্লেখ করা চাই, কীর্তির বিশেষণও শ্বেত হবে। ক্রোধ অনুরাগ রক্ত বর্ণ হবে, অশোক গাছে ফল হয় না, বসন্তে মালতী ফুল হয় না, বর্ষায় হংসেরা মানস সরোবরে গমন করে, চকোরী চাঁদের ছটা পান করে, ইত্যাদি বলা হয়েছে।

এর পর ১৭দশ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে ভূগোল (দেশ বিভাগ) আর ১৮দশ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে ঋতু বর্ণনা (কাল বিভাগ)।

দেশ বিভাগে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের পাহাড় পর্বত নদী হ্রদ উৎপন্ন দ্রব্য দেশের অধিবাসীদের বর্ণনা, তাদের দেহের গঠন, গায়ের রং প্রভৃতি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে (কাল বিভাগে) আলোচিত হয়েছে কোন ঋতুতে কোন ফল হয়, কোন ফুল ফোটে, জল বায়ু কি রকম থাকে, কোন কোন রকমের পশু পক্ষীর আবির্ভাব হয় ইত্যাদি।

ডাঃ সুশীল দে দেখিয়েছেন রাজশেখরের কাব্য মীমাংসার এই সমস্ত আলোচনাগুলি ঠিক অলঙ্কার শাস্ত্রের জিনিস নয়। আর অলঙ্কার শাস্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত জিনিসগুলি সাধারণতঃ আলোচিত হয়, এই গ্রন্থটিতে তা আলোচিত হয় নি বললেও চলে। বিপরীত পক্ষে এটাও লক্ষণীয় যে রাজশেখরের এই গ্রন্থে যে সব জিনিসগুলি বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে, সেগুলিও রাজশেখরের পূর্ব্ব সূরীদের মধ্যে এমন কি ভামহের মত নিষ্ঠাবান্ লেখকের লেখার মধ্যেও কিছু কিছু আলোচিত হয়ে ছিল। তাই মনে হয় অলঙ্কার শাস্ত্র ছাড়া কাব্যের "কলা তত্ত্ব" বা "কবি শিক্ষা" হিসাবে অন্যতর একটা শাস্ত্র ধারা গড়ে উঠছিল। সেই নূতন শাস্ত্র ধারাটির মধ্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের কিছু কিছু তত্ত্ব সাধারণ ভাবে আলোচিত হলেও তার মূল বক্তব্যটা ছিল কাব্য রচনায় ব্যবহারিক নির্দেশ। এই ব্যবহারিক শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে রাজশেখরের "কাব্য মীমাংসা"। এতে সহজ সুন্দর ও সংহত ভাষায় কাব্য কলার কৌশলগুলি আলোচিত হয়েছে এবং সেই আলোচনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রাজশেখরের সুনির্ব্বাচিত ও বৈচিত্র্যময় উদ্ধৃতি মালায়।

সাধারণ অলঙ্কার গ্রন্থের মধ্যে এই জিনিসটি পাওয়া যায় না।

পাঠ্যক্রমে সমাজ-বিদ্যা

॥ শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

জীবনে প্রয়োজনের দিক হইতে সমাজ-বিদ্যার পাঠ্যক্রম রচনা করা প্রয়োজন। মানুষের জীবনে কি কি প্রয়োজন, এবং বিদ্যালয় কিভাবে সেই সমস্ত প্রয়োজনবোধের মিটাইতে সক্ষম তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। Flemming তাঁহার The Social Phychology of Education নামক পুস্তকে এই প্রয়োজনবোধগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: (ক) নিরাপত্তার প্রয়োজন (খ) জীবনে ঝুঁকি লইবার প্রয়োজন ও (গ) ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন।

এই প্রয়োজনগুলির মধ্যে নিরাপত্তার প্রয়োজন সর্বাধিক। মানুষ শুধু অভাব-মুক্ত হইলেই হয় না, তাহার প্রয়োজন আরও বেশী, সে নিরাপদ অবস্থায় আছে ইহাই জীবন ধারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। যে সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে সে রহিয়াছে, সেই সামাজিক আবেষ্টনী যাহাতে তাহাকে রক্ষা করে, তাহার জীবন যাপনে সাহায্য করে সেই দিকে দৃষ্টি দিবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। নিজের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের মধ্য দিয়াই অপরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করা সম্ভব। তাহা হইলেই তাহার জীবনে নিরাপত্তাও আসিবে, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। ঝুঁকি লইবার প্রয়োজন হইতেছে মানুষের নূতন কিছু করিবার ইচ্ছা, নূতন জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা। জীবনের এই প্রয়োজনটি নিরাপত্তার প্রয়োজনের একটি অংশ বিশেষ হইলেও ইহাকে পৃথক করিয়া দেখা হইতেছে এই কারণে যে এই প্রয়োজনটি মানুষের জীবনকে গতিশীল করিয়া রাখে। মানুষের জীবন স্থিতিশীল নয়, যদি স্থিতিশীল হইত তাহা হইলে তাহার জীবনের কোনই মূল্য থাকিত না। যেহেতু গতিশীল, সেইহেতু তাঁহার মনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাহাকে নূতনের পথে লইয়া চলিতেছে, তাহার কাছে নিত্য নূতন জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত হইতেছে। নিত্য নূতনের আকর্ষণই মানুষের অগ্রগতি সূচিত করে। তৃতীয় প্রয়োজনও মানুষের জীবনে অকিঞ্চিৎকর নয়। প্রত্যেক মানুষই তাহার জীবনের ছাপ রাখিয়া যাইতে চায়। সে যে মনুষ্যসমাজের একজন, তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য মনুষ্যসমাজে রহিয়াছে, ইহা সততঃই তাহার মনে হয়। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ মানুষকে সমাজের উন্নতিকল্পে কর্মে প্রেরণা দান করে। সমাজকে উন্নীত করিবার জন্য তাহার যাহা কিছু কর্তব্য, তাহা সে চিন্তা করিয়া স্থির করে এবং সেই ভাবে সে কর্ম-সম্পাদনও করিয়া থাকে। মানুষ সামাজিক জীব, সে একলা বাস করিতে পারে না, স সে তাহার একলার ভাব ও চিন্তা নিয়া থাকিতে পারে না সমাজের উন্নতির মধ্য দিয়া সে নিজের মনের সন্তোষ লা করে।

ব্যক্তি বিশেষের এই তিনটি প্রয়োজন অত্যন্ত বিশেষত্ব পূর্ণ একথা বলাই বাহুল্য। এই তিনটি প্রয়োজন যি মানুষ তাহার জীবনে না মিটাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার জীবনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, এব প্রতিক্রিয়াগুলি তাহার জীবনকে অধোগামী করিতে পারে। হয়ত সে সমাজ-জীবন হইতে একেবারে সরিয় দাঁড়ায় এবং সে নির্বিরোধী জীবনের মধ্যে গুটাইয় থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে, কিংবা স অসামাজিক কার্যাবলী করিয়া সমাজ-বহির্ভূত হইয়া যাইতে পারে। দুইই মনুষ্য জীবনের সুষ্ঠু জীবন যাপনে পরিপন্থী। অতএব মনুষ্য জীবনের এই প্রয়োজনগু সমাজ-জীবনকে যেভাবে উন্নীত করিতে পারে, সেই দি হইতে মানুষ যাহাতে জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে পা

সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ এই প্রয়োজনগুলি মিটাইতে সক্ষম হইত গৃহ ও সমাজের মাধ্যমে। গৃহ এবং সমাজ ছিল শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ। পূর্বে গৃহ ছিল বিভিন্ন রূপে কর্মের কেন্দ্র, এবং উহাকে উত্তম শিক্ষালয় বলিলেও আপত্তি ছিল না। পিতা হয়ত অনেক কিছু কাজে দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন, মাতাও হয়ত অনেক কিছু কাজ জানেন; তাঁহারা সর্বদা নানারকম কাজ সম্পাদন করিতেছেন; তাঁহাদের শিশুরা পিতামাতাকে নানা কাজ করিতে দেখিয়া সেই সমস্ত কাজ ধীরে ধীরে শিখিয়া লইতেছে। তাহা ছাড়া শুধু কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়া তাহারা তাহাদের প্রয়োজনগুলি মিটাইতেও সক্ষম হইতেছে। তাহা ছাড়া তাহাদের আছে গ্রাম্য সমাজ। সমাজের বয়স্কদের জীবন যাপন পদ্ধতি, বিভিন্ন শিশুদের আচার আচরণ ইত্যাদি দেখিয়াও তাহারা শিক্ষা লাভ করিতেছে। গ্রামের উৎসব, আনন্দ, পূজা পার্বণ ইত্যাদিও তাহাদিগকে কম শিক্ষা দান করিতেছে না। বস্তুতঃ পক্ষে ঐ জীবন যাপনই ছিল তখন শিক্ষা। শিশুরা যাহা শিক্ষা করিত, তাহার সমূহ ফলও তাহারা পাইত, তাহারা পাইত অন্যের অনুমোদন ও স্বীকৃতি। দেখা যাইত যে ১২:১৪ বৎসর বয়সের পূর্বেই আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শিক্ষা না করা সত্ত্বেও নিজের আগ্রহ ঔৎসুক্য ইচ্ছা ইত্যাদি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে দক্ষতা ও কৌশল অর্জন করিয়াছে। সে সমাজের একটি স্থান অধিকার করিয়াছে এবং দলের মধ্যে তাহার ব্যক্তিত্ব প্রকট করিয়াছে। সে এমন একটি পট-ভূমিকা অর্জন করিয়াছে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া সে নিজের ও সমাজের মধ্যে তাহার স্থান কোথায় তাহা নিরূপণ করিয়া লয়।

কিন্তু বর্তমান যুগের সঙ্গে ঐ সময়ের সম্বন্ধ কোথায়? শিশু পূর্বে নিজ গৃহ হইতেই অনেক জ্ঞান অর্জন করিত। পিতা ছিলেন তাহার শিক্ষক। কিন্তু আজ পিতা কোথায়? পিতা আজ আর গৃহে থাকিয়া তাহার শিক্ষার আবেষ্টন তৈয়ারী করিতেছেন না। পিতা আজ নানা কর্মে ব্যস্ত। পিতা এমন জায়গায় কর্ম সম্পাদন করিতেছেন, যেখানে শিশু পিতাকে অনুসরণ করিতে যাইয়া পিতার কর্ম লক্ষ্য করিতেছে না, শিক্ষাও লাভ করিতেছে না। তাহা ছাড়া শিশু সমাজের কাছেই বা শিক্ষা করিবে কি? পরিবার ও সমাজের মধ্যে ব্যবধান নিত্য নূতন রচিত হইতেছে; উৎসব, আনন্দ ইত্যাদি যাহা গ্রামের মধ্যেই সন্নিহিত ছিল, তাহা আজ সমাজের বাহিরে সিনেমা, সার্কাস, থিয়েটার ইত্যাদিতে পর্যবসিত হইয়াছে। ফলে শিশু আজ সমাজ ও গৃহ হইতে বিচ্যুত; গৃহ-কেন্দ্র ও সমাজ-কেন্দ্র যাহা শিশুর কাছে ছিল শিক্ষার আধার, তাহা আজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই কারণেই শিশুকে শিক্ষা দানের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হইয়াছে। শিশু যাহাতে বিদ্যালয় হইতে তাহার সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনগুলি মিটাইতে পারে তাহারই জন্য বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। বিদ্যালয়ে অবস্থান কালে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ জাগরিত করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই জানিয়াছি ছাত্রছাত্রীদের সুসমঞ্জস বৃদ্ধির জন্য নিরাপত্তাবোধের প্রয়োজন কতটুকু। বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ও যোগাযোগ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি করিবে। এই নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি করণ হইতেই ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান অর্জন হইবে, ভালবাসা বৃদ্ধি পাইবে, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিবার ক্ষমতা জন্মিবে। আবেষ্টনী সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাহার সঙ্গে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগ ছাত্রছাত্রীদিগকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবে, তাহারা হইবে সুনাগরিক, বিশ্বনাগরিক। মানুষের মনোবৃত্তি গড়িবার এই পন্থাকে অবলম্বন করিতে হইলে যে বস্তুর দরকার তাহা হইতেছে সমাজ-বিদ্যা, শুধু পঠনে নয়, হাতে কলমে তাহাকে অর্জন করিতে হইবে।

আমরা এই স্থানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্তমান ভারতীয় জীবনের আলেখ্য গ্রহণ করিয়া দেখিব যাহাতে আমাদের জীবনের সেই সমস্ত মূল্যবান তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি যেগুলি ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম রচনায় সাহায্য করিয়া থাকে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলেই স্বীকার করেন যে শিক্ষা মানুষকে উপযুক্তভাবে

জীবনধারণ করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। সমাজ-বিদ্যা মানুষের সমস্যার সহিত সম্বন্ধিত, অতএব শিক্ষার যে কোন পরিকল্পনায় সমাজ-বিদ্যার স্থান অত্যন্ত উচ্চে। বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে আর এমন একটি বিষয় নাই, যাহা সমাজ-বিদ্যার মত ব্যবহারিক জ্ঞানের মাধ্যমে জীবনের সমস্যার সমাধানের পথ প্রদর্শন করিতে পারে। সমাজ-বিদ্যার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট একটি বিষয় নয়। ইহা বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার এবং পক্ষান্তরে ইহা এমনই একটি সাধারণ মনোভাবের সৃষ্টি করে, যাহাতে ব্যক্তি বিশেষের ও সমাজের উভয়েরই প্রকৃত উন্নতি হয়। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী বিশেষ বিষয় যথা ইতিহাস, ভূগোল, পৌরতত্ব ইত্যাদি শিক্ষা করে না, কিন্তু প্রত্যেক বিষয় হইতে একটা নীতি শিক্ষা করে, যে নীতির মধ্যে সকল বিষয়েরই যোগাযোগ রহিয়াছে এবং প্রয়োজনবোধে সে তাহার নিজস্ব সমস্যার সমাধানে সেই নীতি প্রয়োগ করিতে পারে। অতএব আমরা দেখিতে পাই শিক্ষার পাঠ্যক্রমের বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন ঘটে। অদ্যকার যুবকের সমস্যা ভবিষ্যতের বয়স্কদের সমস্যার মতই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যাঁহারা পাঠ্যক্রম রচনা করিবেন তাঁহাদিগকে সমাজ ও সমাজের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে এবং পরিবর্তনের পটভূমিকায় পাঠ্যক্রমকে রচনাও করিতে হইবে।

আমরা বর্তমানে ভারতীয়দের জীবনধারা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাই, ভারতীয় জীবনে একটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য রহিয়াছে, তাহা ছাড়া রহিয়াছে সুষ্ঠু জীবন যাপনের উপযুক্ত পরিবেশের অভাব। তাহা ছাড়া আর একটি বিশেষ বিষয় হইতেছে আমাদের জনসাধারণ বর্তমান জীবনকেই ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইতেছে না। জীবন ধারণের জন্য সর্বদাই তাহাদের তাড়া ও পরিশ্রম। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ভারত বহু জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি। ভারত যুদ্ধের জন্য বহু অর্থনৈতিক অসুবিধা ভোগ করিয়াছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে নিপীড়িত হইয়াছে, ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থার চরম দুর্দশা আসিয়াছে। ক্রমে ভারত পাইয়াছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা পাইয়া ভারত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে নাই, ভারতবাসী শুধু ঐ বিরাট পরিবর্তনের নীরব দ্রষ্টা নহে। ভারতকে জগৎ সভ্যতায় স্থান করিয়া লইতে হইবে। ভারত নানা দিক দিয়া অগ্রসর হইতেছে, ভারত কারিগরী ক্ষেত্রেও পিছাইয়া থাকে নাই, কৃষির ক্ষেত্রেও নয়। ভারতবাসীর দৃষ্টি কোণের পরিবর্তন হইতেছে। শুধু ভারতেরই নয়, পৃথিবীর নানা দেশে কতই না পরিবর্তন হইতেছে, আণবিক যুগে গত মহাযুদ্ধে আণবিক বোমার বিধ্বংসী ক্ষমতা যেমন পরিলক্ষিত হইয়াছে, তেমনই বিভিন্ন ঔষধের রোগ উপশমকারী ক্ষমতাকেও উপেক্ষা করা হয় নাই। বিমান চালনার ফলে যে সকল স্থানগুলির মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেক, আজ সেই ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে, আজ কেহই দূরে নয়, সকলেই প্রতিবেশী। মানুষকে আবিষ্কার নূতন ব্যবস্থার পট ভূমিকায় নিজেকে মানাইয়া লইতে হইতেছে। ভারতবাসীকেও তাহাই করিতে হইতেছে। যে ভারত তিন দিক সমুদ্র বেষ্টিত হইয়া এবং একদিকে উচ্চ পর্বত বেষ্টিত হইয়া ছিল, সেই ভারতকে আজ চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইতে হইতেছে। ভারত কোন গোষ্ঠিতে যোগদান করে নাই, নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। আমাদের আদর্শে আঘাত করিতে চীনেরা উদ্যত, এই অবস্থায় আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়া আমাদের অস্তিত্ব ও সম্মান বজায় রাখবার জন্য উদ্যোগী হইতে হইতেছে।

তাহাছাড়া এদিকে যেমন আমাদের কৃষি-প্রধান ভারত শিল্পের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তেমনি আবার আমাদের দেশেই লোক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভারতের বিভিন্ন সমস্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহরাঞ্চল বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্প-কাজ করিবার জন্য বহু লোক গ্রাম হইতে আসিয়া সহরে সমবেত হইয়াছে। পরিবার জীবনের মধ্যেও পরিবর্তন আসিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। কৃষি-প্রধান গ্রাম্য জীবনে পরিবার-বর্গের মধ্যে একটা একত্ব বোধ ছিল, পিতাকে অবলম্বন

করিয়া সভ্যতারও বৃদ্ধি পাইত, কিন্তু বর্তমানে শিল্পের অগ্রগতিতে শিশু পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া শিল্পকার্যে যোগদান করিয়াছে, পরিবার রহিয়া গিয়াছে গ্রামে। পক্ষান্তরে শিল্পকার্যে শিশু শ্রমিকদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষারও প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। ফলে শুধু বিশেষ শিক্ষা পাইয়া মানুষ সমগ্র জীবন হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। নানা প্রকার অপপ্রচার এবং জীবন যাপন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ মানুষের জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া নিজের ও সমাজের প্রয়োজন ও সমস্যা সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করিতেছে। ফলে, নৈরাশ্য, অবিশ্বাস ও স্বার্থপরতা সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিতেছে।

বর্তমান সমাজের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষকের কাছে নানারূপ প্রশ্নের উদয় হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সমাজ-বিজ্ঞানের অবদান কি হইবে? বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান জটিল পরিবার ও সমাজের অর্থনৈতিক আদর্শে গঠিত এবং তাহারা আমাদের বৃহৎ কৃষ্টি ও সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ। তাহারা কিভাবে আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়া আমাদের সমাজ-জীবনকে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া জীবনকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে, ইহাই হইতেছে সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষকের নিকট সমস্যা।

দেশের বর্তমান সভ্যতার উন্নতির মাপকাঠিতে জীবনে আরও সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে শিক্ষাগত কি কি উন্নতি পরিকল্পনা করা যায় ইহাই আমাদের নিকট সমস্যা। যাঁহারাই আজ দেশের শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করিতেছেন, তাঁহাদের নিকটই ইহা সমস্যার আকারে দেখা দিয়াছে। সকলেই এই বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিতেছেন এবং সুষ্ঠু জীবন যাপনের উপযুক্ত পরিপূরক হিসাবে যাহা খুঁজিয়া বাহির করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে মিল প্রকাশ করা যাইতেছে। আমরা জীবনের মূল প্রয়োজনকে যদি আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখি তাহা হইলে আমাদের পাঠ্যক্রম রচনায় উহারা যথেষ্ট সাহায্য করিবে। সমাজ-বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম রচনায় আমাদের প্রয়োজন, শিক্ষার্থীদিগকে নিম্নলিখিত জ্ঞান দান করা বা তাহাদের মনোভাব সৃষ্টি করা—বিশ্বনাগরিকতা, পৌরকর্তব্য, অর্থনৈতিক বিচার-বুদ্ধি, সমাজগত ও পরিবারগত বন্ধন ইত্যাদি। উপরে উক্ত বিষয়গুলি ভালভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, কিভাবে এইগুলি সমাজ-বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম রচনায় সাহায্য করিয়া থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার মধ্যে একটু অস্বাভাবিকতা দেখা যাইতে পারে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রী নিজের আবেষ্টনী লইয়াই ব্যস্ত, তাহাকে সমগ্র পৃথিবীর খবর লইতে হইলে তাহাকে তাহার সরল পথের বাহিরে যাইতে হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে নিকটতম আবেষ্টনী সব সময়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। মহাশূন্যে ভ্রমণ, আণবিক বিস্ফোরণকে আমরা আর দূরে সরাইয়া রাখিতে পারি না, অতএব নিকটতম আবেষ্টনের গণ্ডী ধীরে ধীরে বৃহত্তর হইতেছে। অতএব দূর আর আমাদের কাছে অবাস্তব নয়। ভালভাবে জীবনে বাস করিতে হইলে বর্তমানে প্রয়োজন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা। এই বুঝিতে পারার মধ্যে অপরের জন্য কিছুটা মমত্ববোধ থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ একে যেন অন্যের সভ্যতা কৃষ্টিগত অভিজ্ঞতাকে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে, এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে। একের প্রতি অপরের এই সহানুভূতির মনোভাব প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও গড়িয়া উঠিতে পারে যদি শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি ও মনে মনে উপলব্ধি করিবার শক্তি থাকে। তবেই আমরা সকল লোকের মধ্যে যে সব সমস্যা সাধারণ তাহা বুঝিতে পারিব, তবেই আমাদের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাইবে। আজ বিজ্ঞানের অবদানের ফলে কোন দেশই আর দূরে নয়, অতএব আমাদের মনে আন্তর্জাতিকতাবোধ বৃদ্ধি করিতে হইবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আন্তর্জাতিকতাবোধকে ঊর্ধ্বে স্থান দিতে গিয়া আমাদের জাতীয় আদর্শগত স্বার্থ যেন কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয়। সুনাগরিক হওয়াই আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য

এবং পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করিতে হইলে আন্তর্জাতিক মনোভাব সৃষ্টি করা একান্তভাবে প্রয়োজন। সমাজ-বিদ্যার মাধ্যমে এই জ্ঞান দুইটী আয়ত্ত করা যাইতে পারে। সমাজবিদ্যা আমাদের বর্ত্তমান ও অতীতের আবেষ্টনীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সঙ্গে আবেষ্টনীর সম্পর্ক সম্বন্ধ সূচিত করিতেছে, অতএব এই শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের জীবনের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে পারে।

সমাজ-বিদ্যার পাঠক্রম আরও একটি বিষয়ের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। আমরা শান্তিতে শুধু বাস করিতে চাই না, আমরা আমাদের দেশের মধ্যে সুনাগরিক রূপে বাস করিয়া নিজস্ব মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চাই। সমাজ-বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সেই মর্য্যাদা লাভ করিতে পারি। আমাদের আবেষ্টনী সমাজ, আমাদের আবেষ্টনী আমাদের সরকার এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। আমাদের গণতন্ত্রে আমাদের নাগরিক হিসাবে কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে। পৌর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান বা সুনাগরিক বলিতে আমরা ভোটাভুটি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইতে আরও বেশী বুঝিয়া থাকি। আমাদের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনতন্ত্র, রাজ্য শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হয়, বুঝাইতে হয় কেন শাসনতন্ত্রগুলি এই ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে এবং কি ভাবে এইগুলি আমাদের গণতান্ত্রিক নীতি সূচনা করিয়াছে। আমাদের প্রয়োজন সমস্ত সরকারী প্রচেষ্টাগুলির সঙ্গে সমাজের কি সম্পর্ক তাহা জানা, সমাজে তাহাদের স্থান কি এবং সামাজিক প্রয়োজনে তাহাদের পরিবর্ত্তন কি ভাবে সাধিত হইতেছে তাহা জানা। প্রত্যেক নাগরিকের জানা প্রয়োজন যে আমাদের সরকার এবং বিভিন্ন জাতীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ও ব্যক্তির প্রয়োজনেই উহা গঠিত। সমাজ বিদ্যার পাঠে এই সমস্ত বিষয়গুলি জানা যায়; তাহা ছাড়া বর্ত্তমান ও অতীতের আবেষ্টনীর সুসমঞ্জস বিশ্লেষণের ভিতর দিয়াই মানুষ সমাজে তাহার যথাবিহিত স্থান উপলব্ধি করিতে পারে, সে সুনাগরিক হয়।

অর্থ নৈতিক বিচার বুদ্ধিও আমাদের জীবনে অত্যধিক প্রয়োজন। এই বিচার-বুদ্ধি লাভও সমাজ-বিদ্যার মাধ্যমে হইয়া থাকে। সমাজ-বিদ্যা পাঠে বিচার বিশ্লেষণ করিবার শক্তি আয়ত্ত হয়, ফলে অর্থ নৈতিক বিচার বুদ্ধিও জাগ্রত হয়। বলা বাহুল্য সমাজে আমাদের স্থানই অর্থ নৈতিক বিচার দ্বারা প্রভাবান্বিত।

সমাজগত ও পরিবারগত বন্ধন আমাদের জীবনকে বহুলভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে। সমাজ-বিদ্যার মাধ্যমে আমরা উহার বিশ্লেষণ ভালভাবে করিতে পারি। কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের দেশের সমাজ ও পরিবারগত বন্ধনের জন্য সমাজ-বিদ্যার সাহায্য লইতে হইত না, ভারতবাসী সমাজ ও পরিবারগত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পরিবারগত বাঁধন অত্যন্ত শক্ত ছিল। সমাজ-ব্যবস্থা কিছুদিন পূর্ব্বেও বিকেন্দ্রীকৃত ছিল। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীকৃত সমাজে পরিবারের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে, ফলে মানুষের সমাজে, জীবনে বিচ্ছিন্নতার ভাব দেখা দিয়াছে। গণতান্ত্রিক জীবন যাপন করিতে হইলে সমগ্র দলের মঙ্গল সাধন প্রয়োজন। পরিবারগত সমস্যায় অংশ গ্রহণ করার ভিতর দিয়া দায়িত্ব-বোধ বৃদ্ধি পায়, শুধু তাহাই নয় ব্যক্তিসমূহের মানসিক স্বাস্থ্যও তাহাতে উন্নীত হয়, কারণ ঐক্যের মধ্যে আছে নিরাপত্তা। পরিবার জীবনে যদি সন্তোষ ও আনন্দ থাকে, তাহা হইলে অনেক মানসিক উত্তেজনার শান্তি হয় এবং অনেক অস্বাস্থ্যকর মনোবৃত্তিরও উপশম হয়। সমাজ-বিদ্যা পাঠের মধ্য দিয়া সমাজের মধ্যে এইরূপ সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হইতে পারে। বর্ত্তমান ও অতীতের আবেষ্টনীর বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া যে শিক্ষা পাওয়া যাইবে, সে শিক্ষা হইবে সহযোগিতার শিক্ষা। অতএব সমাজগত ও পরিবারগত সহযোগিতার জন্য আমাদের সমাজ-বিদ্যার কাছে ঋণী থাকিতে হয়।

(চলবে)

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫১—

…সকালে উঠিয়া বেহালা যাই—ট্রামে ও রিকসায়। …রেণু ১।০টার পর বাহির হয়, সেলস্ প্রমোশন, ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতিতে যায়। ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। তাঁহার সঙ্গে মহাভারতীয় কথা হয়—সেই শ্লোকটী বেশ ভাল লাগিল যাহাতে বলা হইয়াছে যে কর্ণকে বধ করিয়াছেন শুধু অর্জ্জুন নন—অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, কুন্তী, পরশুরাম, ধরিত্রী, ব্রাহ্মণ ও দৈব্য। প্রতি ঘটনার এইরূপ বহু কর্ত্তা—ইহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। হরিদাসীর একটি চিঠি আসে।…

২২শে আগষ্ট

সকালে আফিসে গিয়া রেণুকে দিয়া যতীন বসু, চুণি মিত্র ও মোহিনী মুখার্জির নিকট চিঠি লিখাইয়া ডাক বাক্সে দিয়া দেই।…রেণু হেরম্ববাবু, ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া ৪।।০টার পর ফেরে।… প্রতিভা বাগান লাগানর কাজ সুরু করে। আমি একটী উজ্জ্বলভারত নিয়া হরিদাসীর ওখানে যাই। সেখানে তাহাকে দিয়া 'কলিকাল ও শ্রীকৃষ্ণ' পড়াইয়া শুনি…মালতী-প্রণতি বাঁশবেড়িয়া গিয়াছিল…ব্যাণ্ডেল হইতে আমার জন্য ছোলাকাবলী কিনিয়া আনে। কিছু খাই। একদিন পয়সার অসুবিধার জন্য ২ পয়সার ছোলাকাবলীও কিনি নাই। একটি পয়সাও তো যেমন তেমন করিয়া খরচ করি নাই, যতদূর পারিয়াছি যেমন তেমন করিয়া জীবনেরও অপচয় করি নাই। যতদূর কম খাইলে পরিলে জীবন চলে, তাহা দিয়াই তো চালাইয়াছি। তুকারাম সকালে বলিল, তাহার স্টুডিওর জন্য ঘর দরকার। আমি আমি আর কি বলিব? সারাদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। …আমার মত দুঃখ বেদনাতুর মানুষের কাছে না আসাই ভাল। কি যে বেদনা সারা জীবন নীরবে বহন করিয়া চলিয়াছি, তাহা ঠাকুর জানেন। ঠাকুরের জীবন মন্থন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন, ঠাকুরকে তো তাহা জানান হইয়াছিল। তিনি তো তাহা স্বীকারই করিয়াছেন। তিনি কি ফাঁকি দিয়াছেন? নিশ্চয়ই নয়। ৯।০টার পর আশ্রমে ফিরি। না খাইয়া ঘুমাইয়া থাকি।

২৩শে আগষ্ট

সকালে ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল ভাবে কাঁদি। তিনি আসিলেন আমার জীবনের দুয়ারে, আমি তো কিছুই করিতে পারি নাই। কি যে আমার বেদনা! ঠাকুর এত বড় দায় আমার উপর চাপাইয়া গিয়াছেন, অথচ সে দায় বহন করিয়া উঠিতে পারিতেছি কই? 'আমার স্বামী, আমার ইহকাল পরকাল, সখা, সাথী, বন্ধু, শরণ, সুহৃৎ।' 'ছেঁড়া কাপড়ার পুটুলী' গানটা গাই। 'পথে ঘাটে বলে লোকে পাগলিনী যায়, কেহ হাসে কেহ মোরে ধূলা দেয় গায়।' শিশু-গোপালদের সেবার জন্য দুইটী টাকা প্রতিভার মারফত উষাদিদীর কাছে দেই। …কাল ১১টার পর রেণু ও সত্যব্রত কলিকাতা প্রেসে ও বাক্স তৈয়ার করার দোকানে গিয়া যাহা হয় স্থির করিবে। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি।

২৪শে আগষ্ট

সকালে কিছুটা গীতাভাষ্য দেখি। সত্যব্রত ১১টার পর রেণুর ওখানে যায়। তাহারা প্রথমে ঢাকেশ্বরী পেপার ডিপো, পরে বালজী বাইণ্ডিং, পরে বাক্স তৈরী করার

দোকানে যায়। আগামী সোমবার যাহা হয় ঠিক করিয়া ordar দিবে।... আজ সকলেই কিছু কিছু কম ভাত খাইয়াছে। প্রথমতঃ পেটভরা না খাওয়া, কালো বাজারে কেনা, তদুপরি শৃঙ্খলার অভাব—ইহা সংসার জীবনের পক্ষে অপরাধ। আমি তো শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রাণপণ করি। খাইতে বসিয়া গত রাত্রিতে বউদের 'To take time by the fore lock' বাক্যটি ব্যাখ্যা করিয়া বলি।...প্রতিভা মন্টুর হাত মালিশ করিয়া পরে যায়।...কাগজে যতীশ দাশগুপ্তের কবিতা ছাপা হয় নাই বলিয়া সে চটিয়া কবিতা চাহিয়াছে। কি যে মানুষের অবস্থা। এমন কিছুনা-কে ধরিয়া মানুষ এমন করিয়া সম্পর্কের অবমাননা করে। আবার ইহাদের কি অশোভন। অথচ ইহারাই সাহিত্য রচনা করে। ৯টার পর আমি ও প্রতিভা আসি।...

২৫শে আগষ্ট

সকালে 'শনিবারের চিঠি' হইতে পরমহংস সম্বন্ধে সমসাময়িক অভিমত (ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা) পাঠ করি। রেণু এম্, পি, গুহ ও সুহৃৎবাবুর ওখানে যায়।...কমল আসে ১০টায়।...সকালে আনন্দবাজার হইতে 'নারী ও উচ্চ শিক্ষা' সম্বন্ধীয় মেয়েদের লেখা প্রবন্ধ কয়েকটি দেখি। একটি ডাক্তার মেয়ে উচ্চ শিক্ষাকে অনেকটা দায়ী করিয়াছেন; একজন বলিয়াছেন উচ্চ শিক্ষা দোষের নয়, দায়ী আবেষ্টন; অপর একটি মেয়ে বলিয়াছেন, উচ্চ শিক্ষা দায়ী নয়, দায়ী মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র। রেণুকে এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ আমাদের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়া লিখিতে বলা হয়। প্রচলিত শিক্ষামাত্রই, বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষা কর্মবিমুখ করিয়াছে কি পুরুষ, কি স্ত্রীকে। বিশেষতঃ মেয়েরা ছিল প্রাণপ্রধান, তাহাদের স্বকর্ম হইতেছে 'প্রাণ'। এই প্রাণকে ভিত্তি করিয়া মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। পুরুষেরা যাত্রা করিবে প্রজ্ঞা হইতে, পৌছিবে প্রাণে; আর মেয়েরা যাত্রা করিবে প্রাণ হইতে, পৌছিবে প্রজ্ঞায়। একই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া নরনারীকে দেখাতেই গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে। নারী 'স্বধর্ম' ত্যাগ করিয়াছে; সেই জন্যই মেয়েদের অবস্থাই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে পুরুষের চেয়েও বেশী। একে তো মেয়েরা সতত প্রাণবশী, তদুপরি তাহারা আবার বুদ্ধির সাধনারই ব্রতী। তাই মেয়েরা সমগ্র দৃষ্টি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে, পরিবার জীবনে তাই তাহাদের এত [illegible]!...

২৬শে আগষ্ট

সকালে 'ভারত ও যুগসঙ্কট' বইখানার শেষের দিকের কিছুটা পড়ি, শনিবারের চিঠি হইতে 'অরবিন্দের দৃষ্টিতে বাঙলা ও বাঙালী' প্রবন্ধটী পড়ি। রেণু সর্বাঙ্গপুর ও পদাপীপাড়ায় ২টি ভি পি করিয়া আসে। দুপুরে বাথগেট, নলিনীবাবু, সেফ্‌ডিপজিট ভল্ট প্রভৃতিতে যায়, এখানে আসে ৩টার পর। জ্বর হইয়াছে...।...মোহিনী মুখার্জি আসেন তাহার এক ভাই তরুণ তপন মুখার্জিকে লইয়া। তাহার সঙ্গে প্রাণধর্মের কথা হয়। উপনিষদের প্রাণ-উপাসনা, প্রকৃতিকে জয় করিতে করিতে আগাইয়া যাওয়া, কোনও দিনই একান্ত ভাবে প্রকৃতির জয় না হওয়া, একান্ত ত্যাগ ও ভোগে প্রকৃতির সঙ্গে জড়াইয়া পড়া, কাম-ক্রোধাদির ভাগবত রূপ ইত্যাদি আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'জাগিয়া উঠিল প্রাণ' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা মোহিনীবাবু পড়েন।...যতীশ আবার এক চিঠি লেখে গায়ের ঝাল মিটাইয়া। রেণুর সঙ্গে শচীন সম্প ও সুধীর দাশগুপ্তের দেখা...।

২৭শে আগষ্ট

সকালে রেণুকে দেখিতে যাই। শরীরের উত্তাপ কম বটে, কিন্তু মাথার উদ্বেগ বেশ।...যেখানের কোনও দাবীদার নাই, যে বস্তুর উপর মানুষের লোভ নাই, তাহাই আমার স্থান ও খাদ্য। ইহাই তো আমার সারা জীবনের কাহিনী। আলিপুর জেলে যখন ছিলাম, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট-সেল-এ প্রথমে স্থান হইলেও ডাক্তার অন্য কোথাও ভাল স্থানে নিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যাই নাই। যখন দেখিলাম যে ভাল একটি 'সেল'

লইয়া বসন্ত-মজুমদার মহাশয় ও অপর একজন ভদ্রলোকের মধ্যে কেমন অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটিয়া যায়, তখন ভাল জায়গায় থাকিবার সাধ আমার আর রহিল না। কাড়াকাড়ির মধ্যে আমি নাই। কাড়াকাড়ি না করিয়া যদি বিশেষ কিছু গড়িয়া তোলার কৌশল থাকে, তবে তাহাই আমার। Law of Excluded Middle-এর ধারা আমার জীবন মানে না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার তাহারও সঙ্গেই নাই। ১১॥০টার বেণুর ওখানে যাই, বাড়ি ৮॥০টার পর ফিরি।…সন্ধ্যার পর দেবানন্দ আসে, তাহার কাছে মঠের অনেক কথা শুনি।…

২৮শে আগষ্ট

সকালে বেণুকে দেখিতে যাই,…২॥০টার পর আফিসে যাই। ৪টায় যতীন চ্যাটার্জি আসেন…তাঁহার কাছে ইরাণের ইতিহাস, মোগলদের প্রাচীন কথা, হিজরী, ফসলী, সনাৎ, সংবৎ প্রভৃতির অর্থ শুনি। হজরত মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়নের তারিখ হইতেই 'হিজরী'-র গণনা সুরু। 'মহাজরিণ' শব্দ হইতেই হিজরী। হিজরীই পরে আকবরের সময় ফসলী হয়। হিজরী চান্দ্রমাস অবলম্বনে, ফসলী সৌর মাস অবলম্বনে। ফসলের সুবিধার জন্য হিজরীকে রূপান্তরিত করা হয় বলিয়াই উহার নাম ফসলী।…বলিয়া ছিলাম যে, ফাঁকি দিয়া থাকিতে থাকিতে প্রকৃতির উপর ফাঁকি দিয়া কাজ করিবার একটা ছাপ পড়ে। ফাঁকি দেওয়াই তো বর্তমান যুগের বিষম বিপদ।…

২৯শে আগষ্ট

…সাহিত্যের উপাদান বর্তমানে কি হইবে, সে জন্য র্তমানের সমস্যা ধর্ষিতা নারী, যুবক যুবতীর অবাধ মিলনের বিপদ, প্রতীকারের জন্য 'কথং কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' াক্যের সার্থকতা কোথায়, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা য়।…

৩০শে আগষ্ট

…বেণু আজ ভাত খায়। বেণু এখানে আসে ৩টার পর পোষ্টাফিস ও ব্যাঙ্ক হইয়া।…

৩১শে আগষ্ট

…দায়িত্ব নিবে না, অথচ কর্তৃত্ব করিবে, dictation দিবে, ইহা হয় না। দায়িত্ব এড়াইলেই দায়িত্ব যায় না। বাহিরে ২০০৲।২৫০৲ টাকায় ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে আবার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিব, উষাদিদী নিত্যব্রতরা সঙ্গে যাইবে। সেখান হইতে আবার অভিযান সুরু করিব। জোড়াতালি দিয়া, এখানে একটা ঘর, গোলাম মহম্মদে একটা ঘর, এমন করিয়া কোনও বড় কাজ হয় না। এখানে যদি সব দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব আমার উপর ছাড়িয়া দেয়, আশ্রমের কাজ পুরা চালাইতে পারি, তবে নূতন বাড়ী না পাওয়া পর্যন্ত এখানে থাকিব। ইহাদের মধ্যে মন কষাকষি করিয়া থাকিব না।…যদি বাকী টাকার কোনও মীমাংসা না হয়, তবে তো উপবাস করা ছাড়া আর পথ থাকে না। টাকা পাইব কোথায়? ইহাদিগকে তো উপবাসী রাখা চলিবে না। আমি উপবাস করিব। তখন যাহা হয় মীমাংসা হইবে। বেণু এখানে আসে ২টায়। আমরা আফিসে যাই ৫॥০টার পর। ফিরি ৯টায়। প্রতিভা কাল আফিসে যাইবে স্থির হইয়াছে।

১লা সেপ্টেম্বর

আজ সকালে প্রতিভা আফিসে যায়, সেখানেই রান্না করিয়া খাইবে। আমার বাহিরে যাওয়া স্থির।…আমি সকলের কাছেই অভিযুক্ত।…আফিসে নলিনী দত্ত, মাখনবাবু এবং ১টার পর হেমাঙ্গবাবু আসেন।…আমি ও বেণু পূর্বে আফিসে যাই, প্রতিভা মন্মথ হাত ম্যানেজ করিয়া পরে যায়।…আবার আমাকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়ের মধ্যে ঝাঁপ দিতে হইবে। সামনের ২।৩ বৎসরের মধ্যে আমাকে যে অনেক কিছু করিতে হইবে—বইগুলি ছাপানো ও প্রচার করা, একটা আন্দোলন তুলিবার লোক আমার যে পাইয়াছে সেজন্য আমার বাহির হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

২রা সেপ্টেম্বর

সকাল ৮টার পর আফিসে যাই, সেখানেই দই-চিঁড়া খাই। একা আমি বাহির হইবই, সঙ্গে যে যাইবে, তাহাকে লইয়াই থাকিব। টানাটানি কাহাকেও আমি করিব না। গত পরশু মন্ত্র ঘরে মন্ত্রর সামনে ঊষাদিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সে আমার সঙ্গে যাইবে কি না, সে সময়ে সে বলিল যাইবে। রাত্রিতে আবার জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, মন সুস্থ হইলে যাইব। মনে সুস্থ হইবে, সুস্থ হইলেই মন একা থাকিতে পারিবে কি না—এই সব প্রশ্ন যখন উঠিবে তখন তাহার যাওয়া সম্ভবপর হইবে না মনে হয়। মাঝে মাঝে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারিবে। সকালে প্রার্থনার সময় এ স্থানের কাছে বিদায় নিয়াছি, ইহাদের কল্যাণ কামনা করিয়াছি, আশীর্বাদ করিয়াছি। সারাটা প্রার্থনাই চোখের জলে করিয়াছি। অজানার পথে আবার ঝাঁপ দিলাম। জীবনটাই তো এই ভাবে চলিয়াছে। চাকরী ছাড়িয়া প্রথম ঝাঁপ, কূল পাইলাম; আবার বেদনা বুকে লইয়া দ্বিতীয় ঝাঁপ, সেই ঝাঁপ দেওয়ার মাঝে কংগ্রেস পাইলাম। কংগ্রেস ছাড়িয়া আবার ঝাঁপ দিলাম; পাইলাম 'স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ' ও কলিকাতায় 'গৌরাঙ্গগোষ্ঠী'। আবার ঝাঁপ দিলাম, গেলাম বৃন্দাবন। তাহার পর কাঁকুড়গাছি, পরে সাহানগর রোডে নরনারায়ণ আশ্রম। এই প্রায় ৬২ বৎসর বয়সে আবার ঝাঁপ দিব 'জয় নিতাইগোপাল' বলিয়া। সামনে ঐ বাণী 'ভয় কি, টেনে তুলব'। প্রতিভা আসে ২টার পর, রেণু ৪টার পর। আমি রেণু আগে যাই, প্রতিভা ম্যানেজ করিয়া পরে আসে। সন্ধ্যার পর হেমাঙ্গবাবু আসেন।…কমল এক পোস্টকার্ড লিখে। বলাই দেব শর্মা পূজার প্রবন্ধের জন্য চিঠি দেয়। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি। প্রতিভা মোড় পর্যন্ত সঙ্গে আসে। আজ আর এখানের জন্য কোনও দায়িত্ব নাই, হালকা বোধ করিতেছি। বুদ্ধের চোখ উঠিয়াছে, তাহার চোখে পেনিসিলিন ১ ও ২ দেই।

৩রা সেপ্টেম্বর

…বাহির হওয়া স্থিরই। না হইলে জীবনে আর কিছু করা যাইবে না। অথচ অনেক কিছু বলিবার ও করিবার রহিয়া যাইবে। বইগুলিও পরে বাহির হইলেই ছাপান সম্ভব হইবে। সেবানন্দকে সঙ্গে নিবার কথা ভাবিতেছি। আমার প্রতি আমার সন্তানদের যদি প্রীতি থাকিত, তবে কিছু আর্থিক সাহায্য করিতে পারিত। কিন্তু চাইব না তো কিছু। মায়ের কাছেই চাই নাই নিজের জন্য। পথে দাঁড়াইয়া যদি চাইতে হয় বিশ্বের কাছেই যাইব, তাহার ভিতর ছেলেরাও থাকিতে পারে। আবার আমি বিশ্বের মাঝে হারাইয়া যাইব।…দুপুরে খাইতে বসিয়া নন্দরাণীকে জীবনে চলার কৌশল সম্বন্ধে কিছু বলি। ছোটখাট বিষয় নিয়া কথা দুটি না করিতে বলি। 'গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে। ভাল না খাইবে ভাল না পরিবে। অমানী মানদ হয়ে কৃষ্ণ নাম লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে'। সুখ নিয়া, খাওয়াদাওয়া নিয়া আলোচনা করাই 'গ্রাম্যবার্ত্তা'। ইহা কি গৃহীর কি সন্ন্যাসীর কাহারই বাঞ্ছনীয় নয়। ছেলে-পুলেকে টফি, লজেন্স, পাউডার চিনাইতে নাই। ইত্যাদি। ঊষাদিদির জীবনের সমস্যাটার কথাও বলি। ৯টার পর একা ফিরি।

৪ঠা সেপ্টেম্বর

সকালে বলাই দেবশর্মার পত্রিকা 'আর্য্য'র জন্য 'আত্মভূমি' প্রবন্ধ লিখি এবং নকলের জন্য আফিসে প্রতিভার কাছে দিয়া আসি। রেণু আজ ১০টার পর বাহির হইয়া হিন্দুস্থান, আর্যস্থান, ন্যাশনাল সেভিংস, ক্রিমিয়ার, সুবোধবাবু, সুধাংশুবাবু, বিনু প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া প্রায় ৬টায় ফেরে। এখানে আর আর আসে না। প্রতিভা কেমন আফিসে ঘুরিয়া এখানে আসে ৩টায়।…দূরে থাকাই ভাল। ভাল থাকুক, কল্যাণ হউক। কল্যাণ যে চায় না, কল্যাণের যে অর্থ বোঝে না, কল্যাণের জন্য যে শরণাগত নয়, তাহার কল্যাণ করা সম্ভব নয়। সেই জন্যই যাকে তাকে গীতা দেওয়া নিষেধ করা হইয়াছে। তবুও ভগবান প্রেমিক, প্রাণের দায়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া যান, সেজন্য লাঞ্ছনাও কম পান না।

যাহাদের জন্য হাটে হাঁড়ি ভাঙেন, তাহারাই অত্যাচার করে বেশী। সেদিনও 'vested interest'-ওয়ালারা, আধিকবিক দল পরীক্ষা করিলেও চিনিয়া ছিলেন আগে। ...বেণুর ছাতি লইয়া ৯টার পর ফিরি, নিজেদের জন্য চীনাবাদাম আনি।...

৫ই সেপ্টেম্বর

সকাল ৮।০ টার পর বেণু আসে তাহার ছাতি নিতে; এখানে প্রায় ১১টা পর্যন্ত দ্বিতীয় বর্ষের প্রুফ দেখে। ১টার পর বাহির হইয়া যতীনবাবুর বাসায় গিয়া page filler-এর জন্য একটা কবিতা নিয়া কলিকাতা এম, পি, সরকার প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া ৫টায় ফেরে।...আজ বেণুর পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন। সাত্বিক ব্রাহ্মণকে খাওয়াইলে মৃত আত্মার তৃপ্তি বিধান হয়। বেণু রাবড়ী, কচুরি ও মিষ্টি দ্বারা আমার সেবা করায়। কিছু পরেই মালতী আসে।...সকলের প্রাণ পাইলে আশ্রম গড়িতে আর কি লাগে? প্রাণে টাকা আনে, সব হয়। প্রাণময়ী রাধারাণীকে আশ্রয় করিয়াই তো পুরুষোত্তম বিশ্বে শ্রীক্ষেত্র রচনা করিলেন। রাত্রি ৯টার পর আশ্রমে ফিরি। United Observation Committee of Govt. Relief and Rehabilitation, ৫৩ মীর্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে তাহাদের বাস্তহারা সম্মেলনের তারিখ আগামী ২৬, ২৭, ও ২৮শে অক্টোবর বলিয়া এক চিঠি আসিয়াছে।

৬ই সেপ্টেম্বর

আজ প্রতিভা পোস্টাফিস ও ব্যাঙ্কে যায়। বেণু কলিকাতা ঘুরিয়া ৩টার পর এখানে আসে। বেণু প্রতিভার লেখা আমার 'আত্মতুষ্টি' প্রবন্ধটা আবার নকল করিয়া বলাই দেবশর্মার নিকট পাঠাইয়া দেয়। আমরা ৬টার পূর্বে অফিসে যাই। কিছু পরে যতীনবাবু আসেন। ...তাঁহার নিকট আমার জীবনের মোটামুটি 'আগাইয়া চলিবার' ভাবনার কথা বলি। তিনি বিনা টাকায় 'উজ্জলভারত' চালাইবার দুঃসাহসের কথা বলেন। আমাকে আবার ঝাঁপ দিতেই হইবে। আমার পাগল প্রাণ বুঝ মানে না। বেণুর dedicated life-কে তিনি খুব আদর করেন। কমল আসে যখন আমি যতীনবাবুর কাছে জীবন-কথা ও দর্শন আলোচনা করিতে থাকি। কমলের সঙ্গেও তাহার লেখা চিঠি সম্বন্ধে কথা হয়। কাহারও বিষয়ে যদি কাহারও প্রশ্ন জাগে, তাহা তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিলেই শুধু জানা সম্ভব। অন্যে কি জানে অন্যের কথা? ভগবানকে জানিতে হইলে ভগবানের কাছেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমি স্বামীগিরি, গুরুগিরি, বাবাগিরি করি নাই। আমাকে ত্যাগ করিবার অধিকারও মানুষের আছে। ১৪৪ ধারা আমি কাহারও উপর দেই নাই। আমার দুয়ার সকলের জন্য অবারিত; ভাল লাগিবে আসিবে, ভাল না লাগে দুনিয়ায় লোক আছে, ভাল মানুষ খুঁজিয়া লও। 'ছেড়েই বাঁধ দাগে'—ইহাই আমি বুঝি। বাঁধিয়া রাখিতে আমি চাই না, জানিও না। অফিসে যাওয়ার পর প্রুফাদে আসা হয় ও অনেক সময় লাগে।...

৭ই সেপ্টেম্বর

...কিছু পরেই প্রণতি আসে। তাহাকে আশ্রম করার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহারও মত আছে। সে যাহা পারে করিবে।...ঠাকুরের নাম করিতে বলিলাম। আরও কিছু পরে শান্তি চট্টোপাধ্যায় ও যতীশ দাশগুপ্ত আসে। আধ ঘণ্টার উপর থাকে। আমার জীবন শুদ্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত; ঊষাদিদির কাছে শুদ্ধ রাখিয়া জীবনের অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছি। এই দিক দিয়া সে আমার গুরু। কোনও দিন তো কাজ ছাড়া করি নাই। পথে পাইবার জন্য তাহাকেও পথে দাঁড় করাইয়াছিলাম, লবণ আইন অমান্যের সময় ৮০ মাইল পদব্রজে গিয়াছিলাম, লক্ষ লক্ষ লোকের মা করিবার জন্য পথে বাহির করিয়াছিলাম। কোনও দিন তো কামের দৃষ্টিতে দেখি নাই। কাড়াকাড়িতেই কামের প্রকাশ। কাহাকেও তো তাহার মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া গ্রাস করি নাই। আমাকে ত্যাগ করিবার স্বাধীনতাও মানুষের

স্বীকার করিয়াছি। গুরুগিরি, বাবাগিরি, স্বামীগিরি জীবনে করি নাই। তাই আমি আজিও কাহারও মুঠার ভিতরে পড়ি নাই। ৯টার পর একা আশ্রমে ফিরি।··· কাল রাধাষ্টমী। রাধারাণীকে ১৲ টাকার মিষ্টি ভোগ দেওয়া হইবে। রেণুকে মিষ্টি কিনিয়া দিতে বলা হইল।

৮ই সেপ্টেম্বর

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

সকালে প্রার্থনান্তে উষাদিদির কাছে 'কি চক্ষে আমি তাঁহাকে সারা জীবন দেখিয়াছি', আমি যে তাঁহাকে বৃন্দাবনে গিয়াও দূরে থাকি নাই, সেখান হইতেও খোঁজ-খবর নিয়াছি, টাকা পাঠাইয়াছি, বাঙলায় আসার পর সন্ন্যাসী হইয়াও বরিশাল কাউনিয়ায় বাসায় তাঁহার কাছে যাইতে দ্বিধা করি নাই, ইত্যাদি আলোচনা করি। তাঁহার ঋণে তাঁহার কাছে আমি কেনা। অতীত জীবনের প্রতিষ্ঠা শুধু তাঁহারই হৃদয়ের উপর।

৯ই সেপ্টেম্বর

সকালে বাহির হই না।...নীলু না আসিলে রেণু প্রতিভাকে লইয়া নূতন কোনও স্থানে যাওয়া কি বুদ্ধির কার্য হইবে? রেণু আরও বিব্রত হইবে। এখানকার সব কাজ তো যেমন তেমন থাকিবেই, আরও নূতন দায়িত্ব ও কাজ জুটিবে। নীলু না আসিলে এই ভাবেই চলিবে, পরে ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে দেখা যাইবে।···

১০ই সেপ্টেম্বর

শরীরটা ভাল নয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না, বারবার হয়। কিন্তু মোট পরিমাণ তো কম বলিয়া মনে হয় না। রেণু ও প্রতিভা দুই জনই সর্দি জ্বরে কাতর বলিয়া কেহই আজ আর এখানে আসে নাই। অথচ আমি সে খবর জানি নাই। আমি ৫টার আগে যাই, গিয়া শুনি। আমার মাথাটা আজ বৈকালেই একটু ঘুরিতেছিল। প্রস্রাবের জন্য? না কোনও পুষ্টিকর কিছু না খাওয়ার জন্য? দুধ তো আজ একমাস খাই না। রুটী খাই সকালে, দুপুরে ২ খানা এবং রাত্রিতে সব। রেণু আজ আর বাহির হইতে পারে নাই। নীলুকে সেখানের চাকরী নিবার জন্য বলিয়া দিব কিনা মনে হইতেছিল। বাহির আমার হওয়া ছাড়া গতি নাই। বাহির না হইলে সর্বতোভাবে আমার মরণ—অন্তরে বাহিরে।···

১১ই সেপ্টেম্বর

সকালে প্রার্থনায় যাই না, উষাদিদি একাই প্রার্থন করে। প্রস্রাবের উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এক চিঠি দিয় নিত্যব্রতকে ধীরেন ডাক্তারের নিকট পাঠাই। পে রেণুদের খবর দিয়া যাইতে বলি। রেণু আসে। ১০টা ধীরেনের ব্যবস্থামত ঔষধ খাই। রেণু ১১টার পর বাসায় যায়। যতীনবাবুকে অসুখের কথা জানাই প্রতিভাসহ ১টার পর আসে। দুপুরে খই-ভাত কচলাইয় ডাক্তারের ঘোল-ভাত কচলাইয়া সরবৎ মত খাই জলীয় খাইতে বলিয়াছে—বার্লি, ইসপগুল, চিড়ার মণ্ড একটু কম মনে হয়। ৪টার পর হইতে স্পেসিফিক ১ ৪ বার খাই। তাহাতে যেন জ্বালাটা কম মনে হয়।·

১২ই সেপ্টেম্

নিত্যব্রত ডাক্তারের ওখানে যায়।···রেণু ৮টার আ যায় ১১টার পর। আবার প্রতিভাসহ তাহার দিদ লইয়া আসে ২টার মধ্যে। বৈকালের দিকে প্রস্রাবে উদ্বেগ বাড়ে। বোমাকবাবু আসেন। তাহার সঙ্গে বা রাধারাণীর বালিকামূর্তিতে ব্রজবাসী বৈষ্ণবকে দর্শ দিয়া বর্ষাণে রাখিবার ব্যবস্থা, আমার শ্রীজীর মন্দিরে ধ ও মালাপ্রাপ্তির কথা বলি। সন্ধ্যার আগ হইতেই উদ্ বাড়ে।...

১৩ই সেপ্টে

...প্রস্রাবের উদ্বেগ একই প্রকার প্রায়। ১ ঘণ্ মধ্যে করিলে উদ্বেগ কম হয়। রাত ৯টার পর Nat s + Nat p 6x এবং Mag phos 6x + Ferr Ph

6x alternatively ৪ বার করিয়া খাই ভোর ৭টা পর্যন্ত। ইহাতে বোধহয় উপকার হইবে।…

১৩ই সেপ্টেম্বর

সকালে নিত্যব্রত রেণুর বাসা হইয়া ধীরেন ডাক্তারের ওখানে যায়। ঐ ঔষধ খাইতে ও পাউডারটী খাইতে বলে। ··বৈকালে অরুণ ও যতীন চট্টোপাধ্যায় আসে।··· ধীরেনের ঔষধও খাই। বায়োকেমিক তো শান্ত, উহা সব ঔষধের সঙ্গে চলিতে পারে।···রেণু তাহার বাসায় শয্যাগত। রেণুর জন্য প্রতিভার মারফত sp. ১ ও ১০ পাঠাইয়া দেই।…

১৪ই সেপ্টেম্বর

নিত্যব্রত ধীরেনের ওখানে যায়। ধীরেন আর কাহাকেও দেখাইতে বলে। ঔষধে তেমন উপকার দেখা যাইতেছিল না।···তাহার ঔষধ আজ আর খাই না। বায়োকেমিক…খাই। নিত্যব্রত অরুণকে বৈকালে একবার দেখা করিবার জন্য বলিয়া আসে। বৈকালে ৪টার পর সে আসে। কাল ৫টায় চুনীবাবুর ওখানে যাইব এরূপ স্থির হয়।···রাত্রি ১২টা ও ২টায় প্রস্রাবে কষ্ট হয়। তখন সকালেই চুনীবাবুকে আনাইবার কথা হয়।··

১৬ই সেপ্টেম্বর

সকালে নিত্যব্রত অরুণের কাছে গিয়া যাহাতে এ বেলাই ডাক্তারকে আনা যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে বলা হয়। ৯টার পূর্ব্বে চুনীবাবু ডাক্তার ও অরুণ আসে। …ঔষধ ব্যবস্থা করেন…। রেণু আজ কয়েকদিন পর আসে ১০টায়। অন্না আসে ৪টার পর, তখন হেমাঙ্গবাবু কিছু মুশাম্বী লইয়া আসেন। তাহার সঙ্গে এক ঘণ্টা ছিদ্রকুম্ভে জল আনিতে আমার দশা হওয়ার কথা বলি। ঠাকুর কোনও দিন আমাকে 'নিশ্চিন্ত' ভূমি দিলেন না। নিশ্চিন্ত হইব, তখনই তাহা সরাইয়া নেন। আমাকে শূন্যে ঝাঁপ দিয়াই চলিতে হইবে। সম্ভব হইলে আমার দিকে 'দৃষ্টি' রাখিতে বলি, দৃষ্টি থাকিলে টাকা আসিবে। বৃন্দাবনের প্রাণস্পর্শই শ্রীকৃষ্ণকে সর্বত্র 'রাজা' করিয়া রাখিয়াছিল।…

১৭ই সেপ্টেম্বর

…বৈকালে যতীনবাবু আসেন। তাঁহার কাছে আমার নরনারায়ণ আশ্রমের creed এবং আমি কেমন করিয়া সব জটিলতার মধ্যে 'অনুপ্রবিশ্য,' অবগাহন করিয়া ব্রহ্মবস্তুকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি, তাহা বর্ণনা করি। যতীনবাবু সন্ধ্যার পর পর্যন্ত থাকেন।…

১৮ই সেপ্টেম্বর

…চুনীবাবুর ওখানে যায়। ঐ ঔষধই চলিবে, অনেক দিনের রোগ।…আজও রাত্রিতে ৩ বার উঠিয়াছি ও প্রস্রাব করিয়াছি, কিন্তু তেমন জ্বালা হয় নাই।…রেণুকে বাহিরে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে হইবে, কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনকে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে তাহা বলা হয়। প্রতিভাকেও বিকালে বলিয়াছি। অভিযোগকারীর কখনও আত্মতৃপ্তি নাই, আমি সমালোচনা করি, অভিযোগ করি না। মানুষের মনও যে বদলায়, কেমন করিয়া আমি চলিলে যে তাহার মন বদলায়, ইহার জন্য আলোচনা প্রয়োজন। অভিযোগের পিছনে আছে বিদ্বেষ এবং giveness-এর ধারণা।…

২০শে সেপ্টেম্বর

···প্রস্রাবের অবস্থা আজ অনেক ভাল।···

২১শে সেপ্টেম্বর

···কোনও উদ্বেগেরই কোন মূল্য নাই। ইহাদের মধ্য হইতে বাহির হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ নাই। যতদূর পারিয়াছি অযাচিতভাবে যাহা ইহাদের কল্যাণকর বুঝাইতে চাহিয়াছি, পারি নাই। আর নয়। উষাদিদীকেও বলি। মানুষ যদি সংসার হইতে 'অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্' না থাকে, তবে সংসার পাইয়া

বসিবেই। আমি উষাদিদিকে কত বলিয়াছি তাহার নিজের জন্য কিছু সাধন ভজন রাখিতে, আমার কাছে আসিয়া বসিতে। এই ভাবে সে কতকটা সময় কাটাইতে পারিত, যাহার উপর অন্যেরা হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। এখন সকলেই জানে যে সকল শক্তি দিয়া, সকল সময় দিয়া সে সংসারের কাজ করিতে পারে। তাহার আর কোনও কাজ না থাকিলেও চলে। যমুনা যদি জানিত যে প্রতিভার নিজস্ব কোনও কাজ নাই, তবে কি সে বাপ-বেড়িয়া না গিয়া থাকিতে পারিত? সংসারের বাহিরের জন্য মানুষ কিছু সময়, কিছু শক্তি না রাখিলে সে সংসারের টান সামলাইতে পারিবে না। সংসার 'তাহার হাড় খাবে, মাস খাবে, শেষে চামড়া দিয়া ডুগডুগি বাজাবে'। বৈকালের দিকে প্রস্রাবের উদ্বেগটা একটু বাড়ে, জ্বালা হয়…।

২২শে সেপ্টেম্বর

…রাত্রিতে উদ্বেগ আরও বাড়ে…

২৩শে সেপ্টেম্বর

…ডাক্তারের নিকট ফোন করে…। আমি এই বাধায় আটকাইয়া যাইব না, আমাকে যে আগাইতেই হইবে। কংগ্রেসে দ্রুতগতির চাপে কোনও রোগ মাথা তুলিতে সাহস পায় নাই। আমাকে আবার দৌড় দিতেই হইবে।…যতীনবাবুর কাছে শুনিলাম মহানির্বাণ মঠের কাছে একটা উদাসী মঠ আছে। সেখানে একদিন যাইবার ইচ্ছা রহিল। যতীনবাবু সেখানে যান, শিখ গুরুদ্বারেও যান; মুসলমানের সঙ্গে যে হিন্দুদের cultural লড়াই, তাহা আলোচিত হয়।…

২৫শে সেপ্টেম্বর

রাত্রিতে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় সকালে প্রতিভা রেণুর ওখানে যায়। রেণু অরুণের কাছে যায়। রেণু ও অরুণ চুণীবাবুর কাছে যায়।…আমি জীবনে কাহারও উপর অবিচার করি নাই; যতদূর পারিয়াছি তাহাদের সকল ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়াছি। ইহা আমার প্রকৃতিসিদ্ধ—'তমেবাগ্রপ্রাদবিশৎ'—পুরুষোত্তমের এই প্রেরণাই আমার জীবনে কাজ করিয়াছে। কাহারও কাছে কিছু চাহি নাই।…

২৬শে সেপ্টেম্বর

সকালে প্রতিভা রেণুকে আমার অবস্থা জানাইয়া আসে। সে এখানে আসে ৮টায়। প্রুফগুলি ঠিক করিয়া ১০টার পর প্রেসে যায়।…রেণু আবার আসে ১টার পর, প্রুফ ঠিক করে। বৈদ্যনাথ ২টায় আসিয়া সেগুলি নিয়া যায়। রেণু ৩টায় প্রিমিয়ারে যায়, লিলি ও লক্ষ্মী দির ব্লক নিয়া প্রেসে দিয়া আসে। আশুতোষবাবুর ওখানে যায়…। রেণু এখানে আসে সন্ধ্যার পর। কিছু পরে দিবসায় যায়। রোববার ৩৩ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন হইল আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়াছে। এবং রেণুর পক্ষে ইহা আশাতিরিক্ত।…গীতার অভিনব ভাষ্য প্রচারে 'নিমিত্ত' হইবার জন্য বীরেনবাবুকে আজও বলি এই পথেই 'রবীন্দ্র গীতা প্রচার' সার্থক হইতে পারে।

২৭শে সেপ্টেম্বর

…প্রস্রাবের উদ্বেগ একরূপ নাই বলিলেই হয়।… একক্রমে ৩ ঘণ্টা আর প্রায় ৪ সপ্তাহ ঘুমাই নাই আমার কনিষ্ঠ, সত্যব্রতর জন্ম, ঠাকুরের উক্তি—'শরৎবাবুর একটি সুপুত্র হইয়াছে', ঠাকুরের মুখের প্রসাদ দিয়া অন্নপ্রাশন ইত্যাদির কথা মনে হয়।…

২৮শে সেপ্টেম্বর

সকাল হইতেই আজ উদ্বেগ একটু বাড়ে।… আবার অসুখটা intermitant। একদিন ভাল, পরের দিন খারাপ।…

২৯শে সেপ্টেম্বর

ক্রমশ

খাদ্য

।। শ্রীউমাশঙ্কর চট্টোরাজ ।।

খাদ্য হলো শরীর পুষ্টির উপাদান। এটি প্রাণীর অত্যাবশ্যকীয় এবং অপরিহার্য্য। এই খাদ্য মানুষের কর্ম শক্তির প্রধান উৎস। অপর পক্ষে এই খাদ্যের অভাব মানুষের জীবন-সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন করে দেয়। খাদ্যাভাবে জীবন ধারণ ভীতিজনক। এর অভাব পূরণ করার জন্য মানুষ সতত প্রচেষ্টিত। এই খাদ্য ত সকলের সমান নয়। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রকার।

আমরা বাঙালী; আমাদের আহার্য্য আমাদের পরিবেশ ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রার উপর নির্ভর করে। বাংলার প্রকৃতি সর্ব্ব সুফল সম্পদে ভরা। বছরের ছটি ঋতুতে বাংলা প্রকৃতি নানা রংএ ভরে ওঠে। সেই প্রকৃতিতে যেন সব সময় অন্নপূর্ণা বিরাজ করে। শস্যে শ্যামলা বাংলা ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা। কিন্তু তবুও বাংলায় খাদ্যের অভাব হয় কেন? বাঙালীর দিকে তাকালে একটা শূন্যতা লক্ষ্য হয়। কিসের এই শূন্যতা, কেন এই অভাব?

সোনার দেশের সব দান করে শেষে নিজে হয় নিঃস্ব। তাই হয়েছে বাঙালীর। বাংলার স্বর্ণযুগের সমাজের লোকে কত মানুষ দিয়েছে হানা। বাঙালী মহেশ্বরের কাছে তাদের আবেদন প্রার্থনা সকল। সে তা পূরণ করে নিজে হয়েছে নিঃস্ব। বাঙালীর গোষ্ঠীজীবন দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে, লোক সংখ্যা বাড়ছে। এর দুটো কারণ, একটা হলো উৎপাদন বৃদ্ধি আর দ্বিতীয় কারণ হিসাবে [illegible] ভ্রূণকেও বাদ দেওয়া চলে না। বাংলার মাটির উৎপাদনই বাঙালীর খাদ্য। আবাদী জমি বাংলার পূর্ব্বে যা ছিল কিছু পরিবর্ত্তিত হলেও বর্ত্তমানেও প্রায় তাই আছে। কিন্তু আবাদী জমির অনুপাতে লোকসংখ্যার অনুপাতে কম বলে মনে হয়। তাই মাটির উপাদানে এদেশের মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হচ্ছে না। বাংলার মাটিতে সাধারণতঃ দুই প্রকার ফসল হয়। খারিফ আর রবি। খারিফ শস্য বলতে ধান জাতীয় ফসল বুঝায়। এগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছুটা ব্যাপক ভাবে হয়। আর রবি শস্য শীতের প্রারম্ভে লোকালয়ের আওতায় হয়। রবি শস্যের উৎপাদন অতি অল্প। এই দুটি ফসল উৎপাদন করে বাংলার কৃষক মাটির নিকট ছুটি লয়। একদিন ছিল যেদিন ৩ মাসের পরিশ্রমে ১২টি মাস বাংলার অভাব মেটানো যেতো। কিন্তু আজ সেদিন নাই। নানা ভাবে কয়েকটি সময়ে উৎপাদন চাই, তবেই আজকের অভাব মিটতে পারে।

আজ উৎপাদন অপেক্ষা চাহিদা অনেক বেশী। আগের দিনে মানুষ অমৃতের সন্ধানী ছিল, মিতাচারী ছিল। সেদিন মানুষ পরিমিত আহার করতো। খাদ্য গ্রহণ ইচ্ছাকে সাধারণতঃ ক্ষুধা বলা হয়। এই ক্ষুধা দুই রকম। দুষ্ট ক্ষুধা আর শান্ত ক্ষুধা। প্রথম প্রকার ক্ষুধার উদ্রেক হয় ব্যভিচার কর্ম্মের ফলে। পশ্চিমের অনুকরণে আজ আমরা আড়ষ্ট হয়ে পড়েছি, iutoxication-এ নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছি। অধিকাংশ লোক 'নেশার' বশীভূত। এর ফলে খাদ্য গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে কিন্তু এই খাদ্য ত একপ্রকার 'নেশার' পরিপূরক হয়। সারাটি জীবনের আনন্দের অফুরন্ত উৎসকে বাতিল করে মানুষ আজ ক্ষণিক আনন্দের ভোগে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে। কর্ম শক্তির যেন কিছু হ্রাস হয়েছে। অপরদিকে শান্ত ক্ষুধার ফলে শরীর ধারণের জন্য মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে। এখানে দেখা যায় মানুষ মিতাচারী, কর্মঠ ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে হয় প্রাচীন মতে খাদ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাত্বিক আর তামসিক। আর একটা হলো রাজসিক। কিন্তু এগুলি প্রাণীর খাদ্য গ্রহণের

দক্ষতার উপর নির্ভর করে। একটি ছোট্ট উদাহরণ দ্বারা এটি ব্যক্ত করা যেতে পারে। একটি ছোট চড়ুই পাখী সামান্যই খায়, কিন্তু পশুরাজ সিংহ নিত্য উচ্চ ক্যালরি সম্বলিত মাংস গ্রহণ করে। কিন্তু চড়ুই পাখীটির আসক্তি পশুরাজ সিংহ অপেক্ষা ৩৬৪ গুণ বেশী। এখানে কোন্ খাদ্যটি কার কাছে সাত্ত্বিক?

আমরা মহান্ আর্যজাতির সন্তান সন্ততি। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ছিলেন অমৃতের সন্ধানী। খাদ্য কণিকামাত্র গ্রহণে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হতেন। তাঁদের যেমন ছিল সৌম্য আনন। চিত্ত ছিল শুদ্ধ। তাঁরা মানব কল্যাণে ব্যয় করতেন। আজ আমরা সেই মহান্ চিন্তাধারাকে বাতিল করে চাণক্যনীতির ক্ষোভে যেমন নিয়োগ করেছি। সেই সুদূর অতীতে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত আবিষ্কার করেছিলেন:

আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি
খস্থং গুরু স্বাভীমুখং স্বশক্ত্যা সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে।

এদের মত নিউটন একদিন "Law of Gravitation" আবিষ্কার করেছিলেন। আরও দেখা যায় ভাস্করাচার্য, সিদ্ধান্ত শিরোমণীর মত করে Tohan Keplar আবিষ্কার করলেন From the rotatory motion of planets round the sun the orbit of a planet is not circular but is slightly elliptical। আলোচনায় মূল বক্তব্য হ'তে এগুলি হয়ত অপ্রাসঙ্গিক, তবে এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে একথা বলা চলে সেদিনের মিতাচারী যেমন-পরিপুষ্ট মানুষের চিন্তা শক্তি কত প্রবল ও সূক্ষ্ম ছিল। কিন্তু আজ তা কোথায় হারিয়ে গেছে। এর একটা কারণ খাদ্য। শরীরটা যদি না পুষ্ট হলো, মনটা যদি না সতেজ হলো তবে চিন্তা শক্তি আসবে কোথা থেকে। সুতরাং এই অভাব মেটানোর জন্য কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

শরীরের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে নবীন পদ্ধতি খাদ্যকে আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। যে-গুলিকে ভিটামিন বলে। এগুলির মধ্যে তাপমূল্য (calorific value) কার কত সেটি দেখা দরকার। এই calorie বলতে আমরা কি বুঝি। 1 gm জলকে 1° c উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপ লাগে তাকে 1 ক্যালোরী বলে: (c. g. s) মানে থেকে এই ক্যালোরী কি ভাবে মাপা হয়। খাদ্যের তাপ সঞ্চার করবার ক্ষমতাকেই বলে খাদ্যের তাপমূল্য (calorific value of food)। এককের ওজনের জল বা এক কিলোগ্রাম জলকে তাপমান যন্ত্রের 1° ডিগ্রী উষ্ণতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপকে এক বড় ক্যালোরী বলে। আরও ব্যাপক ভাবে বলতে গেলে এক সের কার্বোহাইড্রেটকে মানব দেহের উষ্ণতা 98.4c-কে স্থির রেখে হজম করতে যে পরিমাণ তাপ লাগে তাকে 1 ক্যালোরী বলে। কত ক্যালোরী মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন? সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রতি ২৪ ঘণ্টায় দৈহিক ওজনের প্রতি পাউণ্ডে ১১ ক্যালোরী প্রয়োজন। যার ওজন ১৯৯ পাঃ, তার ২১৮৯ ক্যালোরীর প্রয়োজন। এই ক্যালোরী আমরা পাই কোন্ খাদ্য হতে? সমস্ত খাদ্যই কম বেশী calorie দিতে পারে। তার মধ্যে স্নেহজাতীয় খাদ্য, ঘি বাদাম, মাখন, মাছ, ডিম ইত্যাদি হতে বেশী পাওয়া যায়।

এখন কথা হলো এই তাপের প্রয়োজন কি? এ প্রকারে আমাদের দেহ যন্ত্র অচল হতে থাকে। বাষ্পী এঞ্জিনে কয়লা বা কার্বন হতে তাপ প্রস্তুত করা হয় আমাদের শরীরেও ঐ রকম কিছু একটা হয়। আমর নানা খাদ্যের মধ্যে দিয়ে acid গ্রহণ করি। এই aci এবং কার্বোহাইড্রেটের নানা রাসায়নিক বিক্রিয়া মৃদু তাপ সৃষ্টি হয়। একটি ছোট্ট পরীক্ষা দ্বারা এ সত্যটি প্রমাণ করা যেতে পারে। চিনি, ডাল, আট চাল এগুলি যে কোন একটি কিছু কাচ পাত্রে নিয়ে এক বিশুদ্ধ acid ঢেলে দিলে ধীরে ধীরে কার্বন বেরি আসে। এই রকম গম, চাল, আলু, চিনি ইত্যা জাতীয় উপাদান হতে কার্বন বেশী পাওয়া যা বাঙ্গালীরা বাংলার মাটির উৎপাদন হতে দৈনন্দিন আহার্য্য সংগ্রহ করে। বাংলার প্রধান উৎপাদন ধান

আমরা তাই সাধারণতঃ ভাত বেশী খাই। এর জন্য মাছ দুধের প্রাচুর্য্য দরকার। কিন্তু আজকের দিনে প্রাচুর্য্যও নাই বরং স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। তা ছাড়া এর একটা দোষ আছে। এই দোষটি বলতে গিয়ে লর্ড ক্লাইভের একটি কথার সাহায্য নেওয়া যায়। লর্ড ক্লাইভ মির্জাফরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে গিয়ে, খাওয়ার শেষে আসনে বসে বলে ছিলেন "সাহেব আমার বড় ঘুম আসছে, হাত ধোয়াও জলদিকর, বিছানা লাগাও"। এর আর একটি দৃষ্টান্ত বাংলার শিল্প অঞ্চলগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়। এই শিল্প অঞ্চলে বাঙালী মজুর অপেক্ষা বিদেশী মজুরের ভূমিকা বেশী। বাংলার অগণিত মানুষের তুলনায় খাদ্য উৎপাদনে চাহিদা মিটে না। সংবাদপত্রে দেখা যায় সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলার ব্যবসায়ীরা যখন ৸৹ আনা সের চাল বিক্রি করে, তখন লণ্ডনের ব্যবসায়ীরা ৷৹ আনা সের চাল বিক্রি করতে পারে না। এর কারণ একই জিনিষের প্রতি আমাদের চাহিদা বেশী। অথচ এর calorific value কম, গ্রহণের আধিক্যে পরিপাক যন্ত্রের ক্ষতি হয়, মানুষকে অলস প্রকৃতির করে তোলে। অন্যথায় গম, তেল, ফল, মাছ, মাংস, ডিম, সব্‌জি ইত্যাদিতে প্রচুর ক্যালোরী পাওয়া যায়। খাদ্যের তাপ-মূল্যের দিকে বিচার করলে দেখা যায় ৪ আউন্স চাল ৩ আউন্স তেলের সমান। ১২ আউন্স দুধের ক্যালোরীমান ২১০, ৩ আউন্স তেলের ৭৮০। সুতরাং আমাদের আহার্য্য একটির দিকে কেন্দ্রীভূত না করে, বিভিন্নের মধ্যে, প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে, প্রয়োজন মিটানোর দক্ষতাকে বিচার করে স্থির করা উচিত।

আজকাল পরীক্ষাগারে খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে। এই খাদ্যে যাতে মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে সেজন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চলছে। সস্তা ও সরলতা নাই বলেও চলে। সব জায়গায় ভেজালের আবির্ভাব হয়েছে। ভেজাল খাদ্য মানুষের জীবনে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট করছে। বিভিন্ন ভেজাল নানা খাদ্যে ছদ্মবেশে বসে আছে। দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে জমির উর্ব্বরতা কমে যাচ্ছে। এই হ্রাসের অনুপাত Law of Diminishing return হ'তে স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে শিল্পের কথাও বলতে হয়। কৃষি ও শিল্প পরস্পরের অনুপূরক। দেশে যদি যথোপযুক্ত শিল্প সম্প্রসারণ ঘটানো যায় তাহলে জমির উপর অত্যধিক চাপ স্বাভাবিক ভাবেই কমে যাবে। অন্যদিকে জনসাধারণের আয়ের পথ প্রশস্ত হবে: সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। পৃথিবীতে কত দেশ বিজ্ঞানসম্মত কৃষি প্রণালীতে শস্যের ফলন বহুগুণে বাড়িয়েছে। সেদিকে আমাদের এখনো দৃষ্টিপাত নাই। এবিষয়ে আজও আমরা মধ্য যুগে। বাংলা দেশে কৃষি সংক্রান্ত পরীক্ষাগার, পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকেন্দ্র, কৃষি শিক্ষা বিদ্যালয়ের একান্ত অভাব। উপযুক্ত সার, ভাল বীজ এবং জলসেচনের সুব্যবস্থা বিশেষ নাই বলা চলে। এগুলির দিকে নজর দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি বলা চলে মাটির প্রতি যার দরদ আছে তাকে অধিকার দিতে হবে। এবিষয়ে ফ্লাউড্‌ কমিশনের সুপারিশকে স্বীকার করতে হ'বে। চাষীকে মাটি দিতে হবে।

ত্রিধারা

॥ শ্রীভারতী ॥

(১)

সকাল আটটায় নীচে নানা
বয়, বাবুর্চি খানসামা ;
মিহিসুরে নীরস বচন
মোটর সোফার, পিক্‌নিক ও ভ্রমণ।
রুজ পাউডার শাড়ির চমক্
ছেলের কান্না আয়ার ধমক্ ;
ঘুমন্ত খোকার চোখে জল
পার্টি ক্লাব, টেনিস্ বল্।
খুকীর মুখে ময়লা হাত
ফিরছে গাড়ী গভীর রাত।
প্রচুর সম্বিধ্, সমারোহ
ধাঁধায় চক্ষু আনে মোহ।
আলেয়া পিয়াসী নিঃস্ব মন
কাঁদে তারে হারায় কাঞ্চন
প্রবল গ্রীষ্ম প্রখর তাপ
কিছুটা গর্ব কিছু বা সন্তাপ ॥

(২)

হেমন্তের স্বর্ণ দিন
শ্যাম স্নিগ্ধ গ্লানিহীন ;
আননে মাধুরী লেখা—
ঊষাকালে নিত্য দেখা।
ঐশ্বর্যের পূর্ণ ঘট
মা-জননী, আঁকা পট।
শাকে ভাতে ঝোলে ডালে
পাতে পাতে স্নেহ ঢালে।
বাঁহাতে জড়ানো চাঁদ
কি মধু মায়ার ফাঁদ ;
সাথী হয়ে খেলা পড়া
ভাবীকালের মানুষ গড়া।
অবসরে হাতে পুঁথি
লক্ষ্মী এবং সরস্বতী।
কখনো ওঠা কখনো পড়া
জীবন দোলায় সহজে চড়া।
দিনের শেষের প্রণাম খানি
ঘোচায় তার ঘোচায় গ্লানি।

(৩)

বর্ষার ধারা চালাবেয়া জল
থামেনা কমেনা অঢেল ঢল্।
নুনে লঙ্কায় পান্তার ভোজ
বেকার স্বামী কাজের খোঁজ!
কুড়ানো কাঠ বিকানো ঘর
শুকনো বুকে খোকার আদর
গভীর চুমা চোখ সজল
খোকার হাসি বালির জল।
ছেঁড়া শাড়ি চুল আবাঁধা
মুড়ি ভাজা বিড়ি বাঁধা।
টিম্‌টিমে আলো ঘুমন্ত খোকা
হতাশ স্বামী চাউনি বোকা।
সময় গুণে ত্রিযামা নিশা
আগে ও পিছে মেলেনা দিশা ;
আঁখির কোণে তবুও আলো
যাবেই সরে এ ঘোর কালো
আসিছে ঐ বাসন্তী ভোর
স্থলে জলে বাজে যে সুর ॥

সাময়িকী

নেতাজী সুভাষ ঃ 'সংকল্পময়ঃ পুরুষঃ'—পুরুষ সংকল্পময়। সৎ সংকল্পে যে দৃঢ়—সেই জীবনে সার্থক। এমনই সংকল্প-দৃঢ় সার্থক মানুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। আজ নেতাজী সুভাষের এই জন্মদিনে তাঁহার বহু গুণাবলীর মধ্যে এইটিকে আমরা ধ্যান করিব, আমরা দৃঢ়-সংকল্প হইয়া সার্থক হইব। আজিকার দিনের মানুষের মধ্যের মস্ত বড় ত্রুটি হইল তাহারা শিথিল-প্রযত্নই যে শুধু তাহা নয়, সংকল্পেও তাহারা শিথিল। আদর্শ যত বড়ই হউক, তাহাতে দৃঢ়-সংকল্প না হইলে কোন অনুষ্ঠানই সার্থক হয় না—দৃঢ়-সংকল্প হইয়া দৃঢ় প্রযত্ন করিয়া যাইতে হইবে। আদর্শ একটু ছোটখাট হইলেও দৃঢ় সংকল্প ও দৃঢ় প্রযত্নের দ্বারা মানুষ কৃতার্থ হইতে পারে। এ কথাটা জাতির মর্মমূলে প্রবেশ করানই আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। বড় বড় লোকের জন্ম দিন পালন করিতে গিয়া হুজুগই বেশী হইয়া যাইতেছে—তাঁহাদের জীবনের অনুশীলন কতটুকু হইতেছে? নেতাজী ছিলেন সংকল্পের দৃঢ় মূর্তি। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতেই হইবে—এই ছিল তাঁহার সংকল্প। সে সংকল্পের কাছে কোনো বাধাই তাঁহার নিকট বাধা ছিল না। যেখানে দুর্দিনের অন্ধকার, সেখানেও তাঁহার সংকল্প-দৃঢ়তা আলো দেখিতে পাইয়াছে, পথ বাহির করিয়া লইয়াছে। অন্তরীণ সুভাষচন্দ্র যেদিন দুর্ধর্ষ বৃটিশ সরকারকে বোকা বানাইয়া নিরুদ্দেশ হইলেন এবং পরে আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী লইয়া ছুটিয়া উঠিলেন—সেদিন মানুষ দেখিল যে সংকল্পের দৃঢ়তাতে মানুষ কি না করিতে পারে। নেতাজীর জীবন হইতে আমরা সকলে এইটে শিখিব। সেদিনের দুর্দিন আজ নাই—ইহা যেমন এক হিসাবে সত্য, আবার জাতির আজিকার প্রয়োজন আরও গভীর—ইহাও সত্য। বিদেশী শাসনমুক্ত জাতির দায়িত্ব আজ কত বাড়িয়া গিয়াছে—অথচ ভারতবাসী জাতীয় চেতনা-বোধে এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের নিকট হইতে আমাদিগকে জাতীয়তা-বোধ শিখিতে হইবে, সংকল্পের দৃঢ়তা শিখিতে হইবে অন্য আর কিছু যদি না-ও শিখি। আজ তাঁহার জন্মদিনে তাঁহার নিকট হইতে এই আশীর্বাদ ভিক্ষা করি যে আমরা যেন দৃঢ়-সংকল্প হই, আমরা যেন জাতির স্বার্থের নিকট ব্যক্তি-স্বার্থ বলি দিতে পারি।

নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ সংবাদ ঃ বর্ধমান, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের ৯ই মাঘ (১৮৮৪ শকাব্দ, ৩রা মাঘ) সরস্বতী পূজার দিন নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের এক বৎসর পূর্ণ হইল। গত বৎসর এই সরস্বতী পূজার দিন বিদ্যালয় আরম্ভ করা হইয়াছিল। গত বৎসর ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করান হইয়াছিল—উহাতে ৮২ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইয়াছিল। তৎপরে এ বৎসর সরস্বতী পূজার দিন পর্যন্ত ৬১ জন ভর্তি হইয়াছিল এবং তৎপরে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আরও ৮ জন ভর্তি হইয়াছে। সরস্বতী পূজার দিন প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও সেলাই প্রতিযোগিতা ও সেলাই প্রদর্শনী এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইয়া ছিল। সেলাইর তিন ভাগে—ছাটকাট, উল ও এমব্রয়ডারী—৬টী পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। আবৃত্তিতেও তিনটী ভাগ করা হইয়াছিল; ৬ হইতে ৮ বৎসর, ৯ হইতে ১৪, ১৫ হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত। তিন ভাগে ৬টী পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থাগার এবং সেলাইর লেডী অ্যাবোর্ণ বিভাগ ও সাধারণ বিভাগের কাজ ভালমতই চলিতেছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজও ভালভাবেই হইতেছে। আমরা সকল দিকে আরও অগ্রগতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিব এবং এজন্য সকলের আরও সহযোগিতা কামনা করি।

২৬শে জানুয়ারী ঃ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ বিদেশী শাসন মুক্ত হইয়াছিল, ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষ তাহার সংবিধান রচনা

করিয়া প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তাই বছর বছর এই ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের আত্মবিশ্লেষণের দিন। আত্মবিশ্লেষণ ব্যক্তি ও জাতির অগ্রগতির এক মাত্র উপায়। অথচ আজ বিজ্ঞাপন-প্রধান দিনে কেবল কি করিয়াছি, তাহারই ফিরিস্তি—কি করিতে পারি নাই সে কথা কেবল ধামা-চাপাই পড়ে—আত্মবিশ্লেষণ কিছুই হয় কি? এই কয় বৎসরে ভারতবর্ষ অনেক করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু অনেক করেও নাই—সে কথাও তো সত্য। করে নাই যাহা তাহা হইল সে জাতির জীবনের ভিত্তি তৈরী করে নাই—যে জাতির জাতীয়তা বোধ বলিয়া কোন বালাই ছিল না, যে জাতি সহস্র সহস্র বৎসর পার্থিব জীবনকে মায়ামোহ বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, যে জাতি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধক হইয়াও বাস্তব জীবনে ব্যক্তি-স্বার্থের উপরে উঠিতে পারে নাই, সংসারকে মিথ্যা বলিয়াও যে জাতি বাস্তব জীবনে ঘোরতর বিষয়ী, সংসারী, ক্ষুদ্রচেতা বলিয়া প্রমাণ দেয়—তাহার জীবনের মূল ভিত্তিই রচিত হয় নাই। ভারতবর্ষ তাহার সংবিধানটী সুন্দর করিয়াই রচনা করিয়াছিল—কিন্তু সে সংবিধানকে রূপ দিতে হইলে জাতির ব্যক্তি-মানসের যে পরিচয় থাকা লাগে, ব্যক্তি-মানস সে উন্নীত স্তর আজও লাভ করে নাই। ভারতবর্ষের সংবিধানকে বাস্তব করিতে হইলে জাতিকে গোড়া হইতে অনেক কথা বুঝিতে হইবে। ২৬শে জানুয়ারী আত্মবিশ্লেষণের দিন বলিয়া সেই গোড়ার কথাগুলি কি তাহা অনুধাবনেরও দিন। খুব মোটা দুইটী বিষয়ের কথা উল্লেখ করি—ভারতীয় সমাজে নারী ও শূদ্রের যে স্থা ছিল স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নারী ও শূদ্রের কি সে স্থান? আকাশ পাতাল পার্থক্য। ধর্মীয় চিন্তাধারা-প্র ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাপকেরা নারীর কোন স্বাত স্বীকার করেন নাই যদিও অত্যন্ত পূজা করিয়াই ঘোষ করিয়া গিয়াছেন; তেমনই স্বীকার করেন নাই তাঁহা শূদ্র জাতির মানুষ হিসাবে কোন স্বীকৃতি। সমাজ-ব্য আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত চরাচরকে ব্রহ্ম বলিয়া মানিলেও ব্যবহারে স্তরে, সামাজিক সম্পর্কে শূদ্র মনুষ্য পদবাচ্যই নয় স চলে—কেবল তাহাই নয়, তাহার ছায়া পর্যন্ত অস্পৃশ্য। এ ভারতীয় সমাজের সামনে স্বাধীন ভারতের সংবি মানুষ মাত্রেরই সমান অধিকার ও সমান দায়িত্ব ঘোষ করিয়া বসিলেন—স্ত্রীশূদ্রের সঙ্গে কুল-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ একাসনে বসাইয়া দিলেন। ভারতবর্ষ কেমন কর ইহাকে গ্রহণ করিবে? অযোগ্যকে যোগ্য না বানাই শুধু অধিকার দিয়া দিলেই কি তাহা কল্যাণকর হইবে সামাজিক ভেদবাদে যাহারা অভ্যস্ত, তাহারা আসমু হিমাচলের এক-জাতীয়তার এক স্বার্থ ভাবিবে এত সহ কেমন করিয়া? এইভাবে দেখান যায় স্বাধীন ভারতে সংবিধান রচিত হইয়াছে বটে ভালই, কিন্তু ইহার ভূমিকায় ভারতবাসীর যে মানসিক স্তর, তাহা নিতা বেখাপ—অতএব গোড়া হইতে জাতির চিন্তাধারার অদ পরিবর্তন প্রয়োজন—আজ ২৬শে জানুয়ারী তাহা হিসাব নিকাশের দিন।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইন্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

UJJWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
2.	Periodicity of its publication	...	Monthly.
3.	Printer's Name	...	Renu Mitra M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
4.	Publisher's Name	...	Renu Mitra M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
5.	Editor's Name	...	Renu Mitra M. A.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	...	Renu Mitra M. A. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.

I, Renu Mitra, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 19th February, 1962.

Sd. Renu Mitra,
Signature of the Publisher.

সূচীপত্র : চৈত্র, ১৩৬৯, ১৮৮৫

১। শ্রীনিত্যগোপাল ... ৪৭
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
২। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ... ৫০
শ্রীরেণু মিত্র
৩। নিত্যগোপাল ও তাঁহার প্রচার ... ৬৪
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
৪। ঔ শ্রীনিত্যগোপালায় ... ৬৫
শ্রীবিভূপদ রায়
৫। সর্বেশ্বর ... ৬৭
শ্রীতারাপদ সেন
৬। ঠাকুর বৃন্দাবনচন্দ্রের দোলযাত্রা ... ৬৮
৺নিত্যগোপাল চক্রবর্তী
৭। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (২০) ... ৭৩
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
৮। সমাজ-বিজ্ঞানের কথা ... ৭৪
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত
৯। জয় নিত্যগোপাল ... ৭৯
শ্রীসুনীল ঘোষ
১০। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫১) ৮০
১১। নিত্যগোপাল-প্রশস্তি ... ৮৮
১২। গুরু-দর্শনে ... ৮৯
শ্রীপ্রতিভা রায়

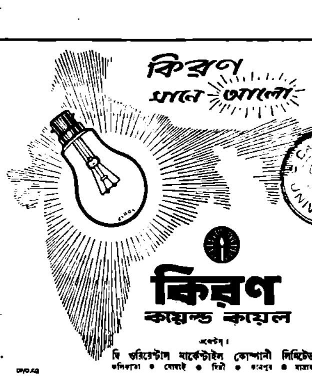

এজেন্ট্‌স।
দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোম্পানী লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • কানপুর • মাদ্রাজ

CALCUTTA UNIVERSITY

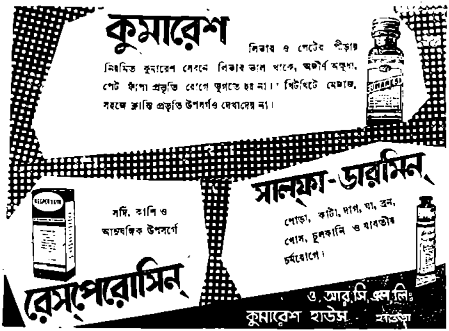

কুমারেশ

লিভার ও পেটের পীড়ায়

নিয়মিত কুমারেশ সেবনে লিভার ভাল থাকে, অজীর্ণ অম্বল, পেট ফাঁপা প্রভৃতি রোগে ভুগতে হয় না। খিটখিটে মেজাজ, সহজে ক্লান্তি প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয় না।

সালফা-ডারমিন

পোড়া, কাটা, দাগ, ঘা, ব্রন, খোস, চুলকানি ও যাবতীয় চর্মরোগে।

সর্দি, কাশি ও আনুষঙ্গিক উপসর্গে

রেসপেরোসিন

ও, আর, সি, এল, লিঃ
কুমারেশ হাউস - হাওড়া

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৭০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

বিদ্যাসাগর	২·২৫	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ** ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ । । গড়িয়াহাট মার্কেট ।

গরমে ছিমছাম বাটার স্যাণ্ডাল

গরমের [illegible] সবচেয়ে [illegible] স্যাণ্ডাল। [illegible]
[illegible] থেকে বাঁচাবে, [illegible]
প্রিয় এই বাটার স্যাণ্ডাল। [illegible] উৎকৃষ্ট উপাদানে বাটার স্যাণ্ডাল।

বিজ্ঞপ্তি

গত মাঘ ১৩৬৯ হইতে উজ্জ্বলভারতের ষোড়শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। গ্রাহকদিগের নিকট নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন শীঘ্রই ষোড়শ বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দেন।

ইতি
কার্য্যাধ্যক্ষ, উজ্জ্বলভারত
গ্রাম : বাগুইআটি
পো: : অশ্বিনীনগর
২৪ পরগণা

তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি আমাদের পাথেয় হউক

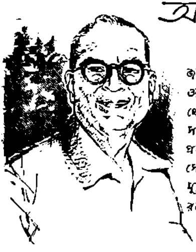

"কঠোর শ্রম ও ধৈর্যের দ্বারা কি লাভ করা যায় তার জন্য যদি কোন উদাহরণের প্রয়োজন হয় আমি সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের নাম উল্লেখ করবো। ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বিরাট কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিদেশে প্রস্তুত সবচেয়ে সেরা কালির যে গুণগত উৎকর্ষ সুলেখা সেই গুণের অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে সাহায্য করছে। আজকে তাঁদের এই রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

উজ্জ্বলভারত

চৈত্র, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা॥

শ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(১৩৩১ বঙ্গাব্দের 'উজ্জ্বলভারত' পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত)

বিশ্বের সকল জটিল কুটিল সমস্যার একমাত্র সহজ সরল সমাধান ওগো উজ্জ্বলরাগমূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল আমার, আজ এই ভাঙা বিশ্বের ভাঙা সকল সম্প্রদায়ের হয়ে দাঁড়িয়ে তোমার ব্রহ্মপুত্র-সেবিত, অন্নপূর্ণা-আশিসিত কামাখ্যা অদ্রীর হৃদয় আলো-করা অখণ্ড গৌরী-হৃদয়ের মূর্তিকে আমরা বার বার অভিনন্দন করছি। বিশ্ব ভেঙে গুড়ো গুড়ো হয়ে গিয়েছে। তার অঙ্গ ভাঙা, তার কণ্ঠ ভাঙা, তার প্রাণ ভাঙা, তার মন ভাঙা, তার জ্ঞান ভাঙা, তার আনন্দ ভাঙা। কে এই সকল ভাঙাকে জোড়া দেবে? কার সে সামর্থ্য আছে? ভাঙা কণ্ঠের ভাঙা গান শুনতে শুনতে বিশ্ব যে-দিন প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, সেদিন সকল ভাঙনকে এক করে ভাঙা পুরুষকে ভাঙা প্রকৃতির সঙ্গে অদ্বৈত রসের ভাবনা দিয়ে এক করে তুমিই গৌর সাজে এসেছিলে। তোমার সে আগমনকেও আমরা ব্যর্থ করেছি। যে বিধিমার্গ সকল ভাঙনের নট, যার তালে নেচে বিশ্ব বেতাল ছাড়া আর কিছুই হয় না, যার সুরে সুর মেশালে বিশ্ব মানবের ধারও ধারে না, সেই বিধিমার্গের বিরুদ্ধে বিপ্লববাদ প্রচার করে তুমি শ্রীগৌরসুন্দর মূর্তিতে বিশ্বকে সুস্থ করতে চেয়েছিলে, বিশ্ব তখন সুস্থও হয়েছিল; কিন্তু তুমি যেতে না যেতে সেই বিধিমার্গ তোমার প্রচারিত বিপ্লবমার্গকেই গ্রাস করল। বিধিমার্গ এমনি করে বিশ্বকে ভেঙেছে যে আজ constituency-র আর অভাব নেই; হিন্দুর জন্য স্বতন্ত্র, মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র, খৃষ্টানের জন্য স্বতন্ত্র, ধার্মিকের জন্য স্বতন্ত্র, জ্ঞানীর জন্য স্বতন্ত্র, যোগীর জন্য স্বতন্ত্র, ভক্তের জন্য স্বতন্ত্র, শাক্তের জন্য স্বতন্ত্র, বৈষ্ণবের জন্য স্বতন্ত্র, বৌদ্ধের জন্য স্বতন্ত্র। এই সব অসংখ্য স্বতন্ত্র constituency-র চাপে পড়ে প্রাণ বেচারার মারা যাবার উপক্রম। আজ এই প্রাণ সংশয়ের দিনে একই constituency-র বুকে ঢুকে যে যার বৈচিত্র্য নিয়ে রস আহরণ করে যে যার মত পুষ্ট হবার আদর্শ তোমার ঐ সমন্বয়-মূর্তি দেখে আমরা সকল জগৎকে অভেদ প্রাণে তোমার শ্রীচরণে মিলিয়ে দেবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছি। ওগো মরণ, ওগো জীবন, ওগো জীবন-মরণের অতী বঁধু আমার, তোমাকে আমরা সকল রক্ত স্পন্দনের মা পেতে চাই।

আইনের পথে মানুষ স্বেচ্ছাচারে। আইন যখন বাড়ে তখন সে নিজেকে সর্ব্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র করেই রাখতে চায়। খেতে আইন, শুতে আইন, কাজ করতে আইন, কো কিছু জানতে হলে আইন, ধর্মে আইন, রাজনীতিতে আইন, আইন আইন সর্ব্বত্র আইন; আইন ছাড়া আর কিছু নেই। মানুষ যখন আইনের হাতে বন্দী অথচ আইনের খেয়াল পূরণ করবার সামর্থ্যও তার থাকে না, আইন যখন এভাবে মানুষকে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পথে ঘাটে, নগরে প্রান্তরে, ধর্মে কর্মে জ্ঞানে যোগে রাজনীতিতে একেবারে বন্দী করে ফেলে, তখন ঐ আইন আবার প্রতি পদক্ষেপে law and order ভাঙবার হুমকি দেখিয়ে নির্যাতীত করে রাখে। আইন যখ

অনন্ত, মানুষের তখন আইনের চোখে দুরাচার হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এই অবস্থাই রাগমার্গের অবতরণ যুগে যুগে সম্ভব হয়ে ছিল। বন্ধন যখন ওঠে পূজোপাটে, বন্ধন যখন বসে জ্ঞানে ভক্তিতে, বন্ধন যখন পথে ঘাটে, বন্ধন যখন বিবাহে অন্নপ্রাশনে, তখন মানুষের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মহাপ্রভু এই বিপ্লবের গুরু, তিনিই ধরার বুকে সর্ব্বপ্রথম অহিংস বিপ্লবসাধন রাগমার্গের প্রবর্ত্তক। সকল আইনের দর্প চূর্ণ করতে, মানুষের প্রাণকে বন্দী করে রাখবার সকল প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করতেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই বিশ্বে রাগমার্গ প্রচার করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা এই বিপ্লববাদী ঠাকুরকে, এই বিপ্লববাদময় ধর্মকে, এই বিপ্লববাদ সংরক্ষক ধর্ম সম্প্রদায়কে এমন করে যেন শাবকের মত নিরীহ শান্ত শিষ্ট করে রেখেছি যে, আইনের সকল রকমের অত্যাচার এর সামনে অনুষ্ঠিত হলেও এখন আর এর গর্জ্জন করবার সামর্থ্য নেই। গর্জ্জন করবার ক্ষমতা হারিয়ে মহাপ্রভুর ধর্ম, মহাপ্রভুর সমাজ মহাপ্রভুর বড় আদরের বিশ্বে তেজস্বীদের কারও প্রাণ স্পর্শ করতে পারছে না। এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য বাস্তব গৌরকে বিশ্বসমক্ষে তেজস্বী, বীর্য্যবান মূর্ত্তিতে স্থাপন করবার জন্য, মহাপ্রভুর জীবন্ত ধর্মকে সকল অত্যাচারের যম রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এলেন সর্ব্ব ধর্ম সমন্বয়াচার্য্য, অবধূতপ্রবর জীবনধন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল। আগ্নেয়গিরি যে আগ্নেয়গিরিই আছে এই মহাতত্ত্ব প্রচার করতে ঠাকুর এসেছেন। গৌরসুন্দর নিত্যসুন্দরের উদ্গীথ গৌরসুন্দরও তাই নিত্যসুন্দর রূপে উদ্ভাসিত। ঠাকুর, তোমায় নমস্কার, বার বার নমস্কার।

যেখানে বিধি সেখানেই সাধন। যেখানে সাধন সেখানেই সাম্প্রদায়িকতা। যতদিন বিধি ততদিন সাধন। যতদিন সাধন, ততদিন সাম্প্রদায়িকতা। বিধি শেষ হলে সাধন হয়। সাধন শেষ হলে সাম্প্রদায়িকতা শেষ হয়, সাম্প্রদায়িকতার শেষ হলেই সমন্বয় রসের আস্বাদন হয়। সহজ জীবনের সাক্ষাৎকার লাভ না হলে সমন্বয় রস আস্বাদিত হয় না। যতক্ষণ আমার কাম কর্ম, ততক্ষণ আস্বাদন কোথায়? আস্বাদন করতে হলে সব কাম কর্ম, সব সাধন ভজন চুকিয়ে নিতে হয়। ভাবনা থাকতে রসনা তৃপ্ত হয় না। ভাবনা যখন শেষ, রসনার তখন আরম্ভ। গৌরসুন্দর এসেছিলেন বিশ্ব প্রকৃতির সকল কাম, সকল কর্মকে নিরোধ করবার পথ চিনিয়ে দিতে, বিশ্ব প্রকৃতির সহজ সরল সুবৃত্তির সহিত জীবের পরিচয় জমাতে; নিত্যসুন্দর এসেছেন অকাম ও সর্ব্বকাম প্রাণে বিশ্ব প্রকৃতির সকল সুষমা ভোগ করবার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে। কাম ও কর্মের শেষ না হলে নিত্যগোপাল-তত্ত্ব বোঝবার সামর্থ্য হবে না, সে যে শুধুই আস্বাদন, আস্বাদন স্বরূপ। তাকে ভাবতে গেলে ভাবা যায় না, তার কোন উটকো লক্ষণ নেই। সে এত সহজ সরল যে তাকে বোঝাতে গেলে কঠিন হয়, তাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়। সে যে নিতান্তই সহজ, নিতান্তই অনুপম। কোন জিজ্ঞাসা থাকতে আস্বাদন হয় না, সকল জিজ্ঞাসা যখন ফুরিয়ে যায় তখনই রসরাজ মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার। গৌর পেলে জিজ্ঞাসার কিছু থাকে না, গৌর পেলে কাম থাকে না কর্ম থাকে না, তখন শুধুই রস, শুধুই রস। কি, কেন, কোথায় প্রভৃতি তত্ত্ব প্রশ্ন যখন আর মাথা উঁচু করে না, তখনই নিত্যগোপাল-রস-আস্বাদন। জীবনে যখন কোন প্রয়োজন থাকে না, সকল প্রয়োজনের অভাব যখন হয়ে যায়, তখন সেই প্রয়োজনের অভাব যে যে ধারায় ফুটে বেরোয়, সেই পথই আস্বাদনের পথ। জগতের সব আস্বাদনই বিনা প্রয়োজনেই হয়ে থাকে। আস্বাদন তাই অহৈতুক, অব্যবহিত। ওগো ঠাকুর, তোমাকে দিয়ে গৌরসুন্দরকে পেয়েছি, আবার গৌরসুন্দরকে দিয়ে তোমায় পাচ্ছি; তুমি গৌরসুন্দরকে চিনিয়ে দিয়েছ, গৌরসুন্দর তোমায় চিনিয়ে দিচ্ছেন। যে কাম আগে আজও তার কুল কিনারা পেলাম না। তুমি গৌরসুন্দরের প্রচারক, বিশ্বের সকল কাম, সকল কর্ম, সকল সাধনা কেড়ে নেবার মূর্ত্তি ধারণ করে কোন্ কৌশলে গৌর অবতরণ করেছিলেন, তুমি তাই বিশ্বকে জানিয়ে দিচ্ছ, সকল দিক দিয়ে গৌরসুন্দর আবার তোমায় অসাম্প্রদায়িক রস আস্বাদনকে বিশ্বের প্রাণে ভরে দিচ্ছেন। কোন্ সাধনে পুত্র মায়ের

স্তন পান করে, ভাই-বোনের সঙ্গে পাড়ার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলে বেড়ায়? আবার কোন্ সাধনেই বা পুত্র যৌবনে স্বামী হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে রস আস্বাদনে মত্ত হয়? সাধনা থাকলেই হয় মায়ের সাধনা, নয় ত বা স্ত্রীর সাধনা। যার সাধন নেই, তার পূর্ব্বাপর নেই, অন্তর বাহির নেই। জীবনের ক্ষেত্রে কে আগে, কে পরে? কোন্‌টি ছাড়ব, কোন্‌টি নেব, এ বিচার কে করবে? জীবন যে কোন সম্প্রদায়ের আইনে বন্দী হয় না। জীবন মায়ের কাছে পুত্রাকারে, ভাইয়ের কাছে বোনের আকারে, বোনের কাছে ভাইয়ের আকারে, স্ত্রীর কাছে স্বামীর আকারে, স্বামীর কাছে স্ত্রীর আকারে ফুটে উঠে। জীবনের কোন্ আকার সত্য বলতে পার কি? আবার জীবনে কোন আকার নেই তাই বা বলতে পার কি? নিত্যগোপাল হচ্ছেন মূর্তিমান এই জীবন-প্রবাহ। কোনো সাধনে তাঁর জীবন বাঁধা পড়ে নি, সাধু-অসাধুর মাপকাঠিতে তাঁর জীবন মাপা যাবে না। নিত্যগোপাল সব চেয়ে সহজ, সব চেয়ে কঠিন; আমরা আজ সেই সহজ-কঠিন ঠাকুরের শ্রীচরণে বার বার লুণ্ঠিত হচ্ছি।

ওগো প্রাণবল্লভ সহজ সরল ঠাকুর আমার, আজ বিশ্বে তোমার প্রয়োজন বড় বেশী অনুভব করছি। বিশ্ব আজ আইনের অত্যাচারে জর্জরিত, জীবনের সকল স্পন্দন মৃতপ্রায়, এই দুরবস্থার মাঝে তুমি নিজে এসে তোমার প্রাণ-প্রিয়তম গৌরহরিকে প্রচার কর। সহজ সরল হবার পথ খুলে যাক। মানুষ যতই সাধনার জন্য কোমর বাঁধছে, ব্যাপার ততই জটিলতর হয়ে উঠছে। সাধনা করতে গিয়ে বন্ধন কেটে যাওয়া ত দূরের, বন্ধন বরং দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সর্ব্বত্র আজ চিকিৎসা-বিভ্রাট, সাধন-বিভ্রাট। মানুষ আজ সব মতবাদ শিখেছে, তাই কখনও সে কর্মী, কখনও বা জ্ঞানী, কখনও বা ভক্ত, কতটুকু বা হোমিওপ্যাথি, কতটুকু বা এ্যালোপ্যাথি। এই সব করার মাঝে যে প্রকাণ্ড একটা তামসিক না-করা রয়েছে, এর হাত থেকে কে রক্ষা করবে? মানুষ আজ সব সম্প্রদায়ের সব কথা শিখেছে, সে আজ তাই তার্কিক, নাস্তিক। তার বিশেষ কোন সম্প্রদায় থাকলেও তাঁকে সেখানে দাঁড় করিয়ে কিছু শেখান যেত, কিন্তু বিশেষ কোন সম্প্রদায় নেই অথচ প্রাণের সহিত কোনো পরিচয় না থাকার জন্য সেই অসাম্প্রদায়িক হবার ছলে উচ্ছৃঙ্খল হয়েই যাচ্ছে। একদিকে সঙ্কীর্ণতা, অন্য দিকে উচ্ছৃঙ্খলতা—এই দুই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবার মত উজ্জ্বল জীবন তোমাতেই দেখছি, তাই আজ তোমার জীবন অবলম্বনে বাংলায় আবার বিপ্লব আনতে চাই, যে বিপ্লব সঙ্কীর্ণতা ভাঙবে অথচ উচ্ছৃঙ্খল করবে না, উচ্ছৃঙ্খলতা ভাঙবে, অথচ সঙ্কীর্ণতা আনবে না। তুমি একাধারে সম্প্রদায় ও অসম্প্রদায়, শৃঙ্খলা ও বিপ্লব। সকলেরই আজ বাঁচবার লালসা জাগ্রত হয়েছে, ধর্ম্ম রাজনীতি কেউ কারও চরণে আত্মাহুতি দিতে রাজী নয়। তুমি সকলের সকল বজায় রেখে সকলকে সকলের প্রাণে স্থান চিনিয়ে দাও। এ যুগ যে মরণের যুগ, অমরণের যুগ। সকলেই সকলের মাঝে মরে বাঁচবে, বেঁচে মরবে। এই বাঁচামরার ঘনীভূত জীবন তুমি, তুমিই আমার বল ভরসা, তুমিই আমার বিশ্বের আচার ও প্রচার, তুমিই আমার সাধনা সিদ্ধি; তোমাকে আর কি বলিব? 'শুধু জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণবঁধু হইও তুমি।' বন্দেমাতরম্।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীরেণুমিত্র ॥

ওঁ নমো তত্ত্বমূর্ত্তয়ে ভক্ত-ভগবতে নিত্যগোপালায়
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায়
ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায় ।

কত মানুষই জন্মান, শ্রীনিত্যগোপালও জন্মেছিলেন, সমস্ত মানুষই চলে যান, তিনিও স্থূল পঞ্চেন্দ্রিয়ের অন্তরালে চলে গেছেন। কত মানুষকেই সকলে ক্রমে ভুলে যায়, কিন্তু শ্রীনিত্যগোপালকে মানুষ ক্রমে ভুলে না গিয়ে মনে করছে—একটু একটু করে মনে করছে। চলে গেছেন শ্রীনিত্যগোপাল সে-ও আজ বাহাত্তর বৎসর হল। কিন্তু যে চল্লিশটী বৎসর জীবিত ছিলেন, সে সময়টাতে যেমন জনসমাজ থেকে নিজেকে কেবলই গোপন করেছেন, তেমনি ঠিক তার উল্টোরকমভাবে দীর্ঘদিন পরে জনসমাজের কাছে যে ফুটে উঠবেন তারও ব্যবস্থা করে গেছেন। তাই যতই দিন যাচ্ছে, ততই তিনি একটু একটু করে প্রকাশিত হচ্ছেন। অর্থাৎ যে সময়ে তিনি এসেছিলেন সে সময়ে তাঁকে বুঝতে পারা যায় চতুর্দিকের আবেষ্টন এমন ছিল না। আজ তাঁর এই ১০৮ বৎসর বাদে জ্ঞানে বিজ্ঞানে বাস্তব অভিজ্ঞতায় মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এই আবেষ্টনই তাঁর তত্ত্বমূর্ত্তিকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত। তাই তিনি একটু একটু করে ফুটে উঠছেন। তিনি ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছেন এই সবে আট নয় বৎসরও পুরো হয় নি। শ্রীনিত্যগোপাল এসেছিলেন, সর্বোপাধিমুক্ত একটি রকমের মুক্ত জীবন যাপন করে চলে গেছেন; রেখে গেছেন সেই জীবন যাপনের রকমখানি আর কতকগুলি বই-এ কতকগুলি অপূর্ব নূতন রকম কথা, যে কথাগুলি যেদিন তিনি লিখেছিলেন সেদিন তো ভারতবর্ষের লোক জানতই না, আর পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা তথা মার্ক্সবাদের মধ্য দিয়ে এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-দর্শনের মধ্য দিয়ে অনেক কথা শুনেছে বটে, তবু সবখানি কথা আজও শোনে নি। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ সব কথা কোনো সন্ন্যাসীর মুখ থেকে, কোন সমাধিস্থ পুরুষের কাছ থেকে, তথাকথিত ধর্মক্ষেত্র থেকে শোনে নি। এদানীং কালে কোনো নির্বিকল্প সমাধিস্থ পুরুষ এমন স্পষ্ট ভাষায় বলেন নি 'পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান, পূর্ণজ্ঞানের এক পাশ আত্মজ্ঞান, সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান'। আমরা ব্যক্তি-জীবন, সমাজ-জীবন, রাষ্ট্র-জীবনকে রেখে ছিলাম একধারে, আর আধ্যাত্মিক জীবনকে রেখেছিলাম আর এক ধারে। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য আমরা ভারতবর্ষীয় সাধু মহাপুরুষদের দ্বারস্থ হই, আর বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য পাশ্চাত্যের মার্ক্স প্রভৃতি মনীষীদের দ্বারস্থ হই। শ্রীনিত্যগোপালের সামগ্রিক জীবনের মধ্যে নির্বিকল্প সমাধিও পাওয়া যাবে, বাস্তব জীবনের সমস্যায় চলার পথের নিশানাও পাওয়া যাবে কিংবা পাওয়া যাবে বাস্তব জীবনের মধ্যেই নির্বিকল্প সমাধি রূপ। তাঁর কাছে দুই ক্ষেত্রের জন্য দুটো আলাদা নীতি বা আইন নয়—একই নীতি দিয়েই দুই ক্ষেত্রের চলার পথ-নির্দেশ। বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতি পদক্ষেপে পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হবার কাঙালপনা ঘোচাবার জন্যেই তিনি লিখলেন পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান ইত্যাদি। আমরা জানতাম জড় বস্তু ছোট, হেয়; জড় বস্তু নিয়ে জ্ঞানার্জন করে যায়। মহান্ অজড় বস্তুর অনুভবের সন্ধানী নয়—অথচ নিত্যগোপাল একই নিশ্বাসে লিখলেন সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান। গীতা উপনিষদের শ্লোক বা মন্ত্রের সঙ্গে ঠিকই মেলে, মেলে না গীতা-উপনিষদের জড় মিথ্যাবাদের ভাষ্যের সাথে। জড় অজড় সমন্বয়ের পূর্ণজ্ঞানের কথাই বললেন উপনিষদ্ তাঁর এই মন্ত্রে—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।

বস্তুকে নিয়ে ব্যাপার অনেক—এ হয় মানুষকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলতে চায়, নয়তো গতির উদ্দাম আবর্তনে সমস্ত স্থিতি নষ্ট করে দিতে চায়—এই জন্যই ভারতবর্ষের একদল একে বৃহত্তর জীবন যাপনের একেবারে অযোগ্য বলে বাদ দিয়ে রেখে ছিল। বস্তুকে নিয়ে অনেক গবেষণা করেও পাশ্চাত্যের বস্তুনিষ্ঠ অন্তহীন শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যেই এর পরিসমাপ্তি টেনেছে। কিন্তু বৃহত্তর জীবনের অযোগ্য এ হল কেন? সে কি এর অন্তর্নিহিত নিজস্ব দোষে, না একে দেখবার বা ব্যবহার করবার দোষে? শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যেও তো একে অতিক্রম করে আর একের আধিপত্য বিস্তারের অন্তহীন প্রয়াস—এতে সামগ্রিকতার প্রশান্তি কোথায়? শ্রীনিত্যগোপালের মধ্যে এই সব প্রশ্নেরই জবাব আছে। পাশ্চাত্য দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারায় এর সমর্থন আছে।

মানুষের চিন্তাধারা স্বতঃসিদ্ধ বলে যা ধরে নিয়ে রওনা হয়েছিল—কি এদেশে কি ওদেশে—আজকের এই সব প্রশ্নের জবাব বুঝতে হলে সেই ধরে নেওয়া স্বতঃসিদ্ধেতেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার দরকার। নিত্যগোপাল সেই স্বতঃসিদ্ধেতেই বদলে দিলেন বলেই প্রথমেই লিখলেন সেই সর্ব অন্ত ও অনন্ত সম্বন্ধে জ্ঞানেই পূর্ণজ্ঞানের সংবাদ কিংবা অনন্ত যে পূর্ণ সে সংবাদ। এ রকম আরও অনেক সূত্র দিলেন তিনি যা ভারতীয় দর্শন-জগতে কিংবা জনসাধারণের অভ্যস্ত চিন্তায় এত বেশীরকম আশ্চর্যজনক যে আজও তা চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারে নি। ভারতীয় রক্তে স্থিতিশীলতা এত বেশী যে ধর্মের ক্ষেত্রের শেষ সত্য আমাদের মুনিঋষিরা বলেই গেছেন, নূতন করে ভাবনার কোন প্রয়োজন নেই এ রকম করে আজও অনেকেই ভাবেন। আবার বিশেষ মতবাদকেই একমাত্র সত্য ধরার মনোবৃত্তিও এ দেশে খুব প্রকট ছিল বলেই ধর্মের ক্ষেত্রেও ঘৃণা বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নূতন তত্ত্বকে গ্রহণ করার সুবিধা বেশী কেননা সেটা মুখ্যতঃই বুদ্ধিগম্য। তাই এ্যারিস্টটেলিয়ান লজিক বদলে নিতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধা হয় নি, যা হলে না হলে দর্শনের উপলব্ধি জগতে শ্রীনিত্যগোপালের এই নূতন স্বতঃসিদ্ধকে বুঝে নিতে। শ্রীনিত্যগোপালের কথাকে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বুঝে দেখবার যথেষ্ট অবকা থাকলেও উপলব্ধি এর অনেকখানি সত্যই বটে। পাশ্চাত্য জগতে পরস্পরবিপরীতের সহাবস্থানকে নিষিদ্ধ কর দিয়েছিল এ্যারিস্টটেলের যে Law of Exclude middle তাতে ছিল, 'Everything must be A o not-A, whatever A may be'। দার্শনিক-বৈজ্ঞানি জেমস্‌ জিনস্‌ এর কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে লিখছে 'The scientist, on the otherhand, knowin that everthing will generally possess som A-ness and some not A-ness, is very litt concerned as to whether an object classed as A or not-A. What he wants know is how much A-ness it possesses' [illegible] কোন বস্তুই যে কেবলমাত্র একই রকম ধর্মযুক্ত দিয়ে তৈরী নয়, দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ যে বিপরী বস্তুর সঙ্গেই তার অস্তিত্ব, বস্তুধর্ম যে কেবলমাত্র বিপরী ধর্মীই (antagonistic) নয়, তারা যে একই সঙ্গে পরস্পর পরিপূরকও (complementary)—বৈজ্ঞানিকে এ আবিষ্কার লিপিবদ্ধ করতেই শ্রীনিত্যগোপাল পরস্প বিপরীতের সমন্বয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে লিখেছিলে 'নিত্য অনিত্য সমন্বয় বা আত্মা অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞ অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার সমন্বয়। জড় অজ সমন্বয়। চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত অদ্বৈত সমন্ব সর্ব সমন্বয়'। বস্তু-ধর্মকে একান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী নেওয়ারই ফল এদেশীয় জড়ের মিথ্যাবাদ, বর্ণাশ্রমীদে সত্ত্ব রজো তমোগুণের পরস্পরকে অতিক্রম করে আ প্রতিষ্ঠার সমাজ-ব্যবস্থা কিংবা ওদেশীয় মার্ক্সবাদে অন্তহীন শ্রেণী সংগ্রাম। কিন্তু শ্রীনিত্যগোপালে সামগ্রিকতাকে বুঝতে দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক দুই [illegible] সিদ্ধান্তকে মিলিয়ে বুঝতে হবে। তিনি উ

Matter & Light গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, পদার্থ বিদ্যার মত অন্যত্রও মানব মন সব সময় দু রকম মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে যারা একই সময়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং পরস্পর পরিপূরক।...এর যে কোন একটাকে চরমে টেনে একান্ত করে তুললে তা বাস্তবের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। বাস্তবের প্রকৃত ব্যাখ্যা পেতে হলে এই দুইয়ের অতি সূক্ষ্ম ও প্রায় অবর্ণনীয় সংযোগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শ্রীনিত্যগোপালের সামগ্রিক সমন্বয়কে বুঝতে 'human mind'-এর 'two tendencies atonce antagonistic and complementary'-র এই 'subtle and almost indefinable fusion' বোঝা দরকার হয়ে পড়ে। এইখানেই জড়কে একান্ত হেয় বা ছোট করে কিংবা মায়ামোহ মনে করে দূরে রাখবার বা অজড়কে বড় বা পরমার্থ করে একান্ত করে ধরবার এক মনোবৃত্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়. আর এইখানেই অন্তহীন শ্রেণী সংগ্রামই মনুষ্য সভ্যতার শেষ সমাধান মনে করবার অনমনীয়তা থেকেও রেহাই মেলে। কাকে ছোট বলব, কাকে বড় বলব? মৃত্যু উত্তীর্ণ না হলে অমৃত মিলবে না যদি তবে মৃত্যু উত্তীর্ণ হওয়ার অবস্থাটা ছোট হল কিসে? শ্রীনিত্যগোপালের জড় ও অজড়, জ্ঞান ও অজ্ঞানের পূর্ণতার ব্যাখ্যানায় দেহ-জগতের মৃত্যু অতিক্রম করবার জ্ঞান আর দেহাতীত জগতের অমৃত আস্বাদনের জ্ঞান সমন্বিত হলেই জীবনে পূর্ণ-জ্ঞান লাভ-প্রয়াস সার্থক। ছোটও যদি হয়, তবু উপনিষদই লিখছেন, তিনিও তো একই সঙ্গে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'। শ্রীনিত্যগোপাল এই কথাই ভাষান্তরে লিখেছিলেন, 'অল্প অতিও পূর্ণ, অধিক অতিও পূর্ণ. অল্প অতিও অধিক হইতে পারে, পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, পরিমিত সচ্চিদানন্দও অপরিমিত হইতে পারে' ইত্যাদি। এরই ব্যাখ্যা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখছেন, 'পুরুষোত্তম অংশে প্রত্যেক অণুটিও এক একটি কেন্দ্র...। এত দিন অন্যের কোন self-centered হইবার যোগ্যতা ছিল না। অল্প সার্থক হইত অধিকের মধ্যে মিশিয়া গিয়া...' ভাগবত বলিলেন, বড় ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে পুরুষোত্তমের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। গায়ত্রী জপ ও মুচির জুতা সেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটী কুলীন হইবে এবং অপরটী অকুলীন হইবে? ঘর ঝাঁট না দিলে যখন ঠাকুর পূজাই হয় না, তখন ঠাকুরের কাছে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও পূজা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? কে কুলীন, কে অকুলীন'। জিজ্ঞাসু মন শান্ত হল—ঘরের ঠাকুরের কাছেই আত্মক্ষেত্র আর অনাত্মক্ষেত্রের সমাধান পাওয়া যাবে—শ্রীনিত্যগোপালে সেই সমাধান দিব্য, উজ্জল হয়ে আছে।

এই কারণেই সকল উপাধির মুক্তি—উপাধি মানে যা দিয়ে আমার চেতন অচেতন সত্তা আটকা পড়ে যায়। বস্তুধর্মের—যার মধ্যে মানসিকতার ধর্মও রয়েছে—উভয় দিককে সমান মূল্য ও মর্যাদা দিতে পারলে কোথাও আটকা পড়বার সম্ভাবনা বহুলাংশেই কমে যায়। তখন মুক্তিকে একটা বিশেষ রকম করে গড়ে তুলবার দরকার হয় না, ঘটনাকে বাদ দিয়েও তখন মুক্তিকে পেতে হয় না—অনন্ত ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে পুরুষোত্তম-স্থিতি বজায় রেখে চলতে পারাই তখন মুক্তি। এই মুক্তি বা এই জীবন-চেতনা নিয়ে এলেন শ্রীনিত্যগোপাল। মানুষ নানা সময়ে নানা রকম করে জীবনটাকে গণ্ডীবদ্ধ করে এর নানা রূপ দিয়ে নিয়েছিল, আজ সেই বিশিষ্ট কোন রকমের মধ্যে মানুষের জীবন আটকে থাকতে চাইছে না প্রকৃতিরই আহ্বানে—তবু পুরান ভাঙা, সংস্কারমুক্ত হওয়া খুব সহজ নয়; তাই নিত্যগোপালকে বুঝতে এত অসুবিধা, এত দেরী। তাই একশত আট বৎসর আগে তিনি জন্মেছিলেন বটে, তবু জনসাধারণের কাছে তাঁর বয়স সবে সাত আট বৎসরই মাত্র—তাঁর প্রকাশ অতি ধীরে, অতি মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে। সকল উপাধির বাইরে মানুষের মানুষী সত্তার সামগ্রিক প্রকাশই তাঁর ধর্ম, সে মানুষী সত্তা চাপা পড়ে ছিল যুগ যুগান্তের কাল ধরে নানা সংস্কারে—সংস্কারের সে অচলায়তন ভেঙে মুক্ত প্রাণপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগবেই।

সহজ মানুষ শ্রীনিত্যগোপালের আড়াই বৎসর বয়স

থেকেই নির্বিকল্প সমাধি হতো। তাঁর ছাপান্ন বৎসরের জীবনে এ রকম সমাধি বৃত্তি বা সহস্রবার হয়েছে, কিন্তু এই সমাধিকেও তিনি শেষ বা পরমার্থ বলে মনে করতেন না। লিখেছেন, 'সকল প্রকার অবস্থাই মায়িক। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমি আছি এ বোধও থাকে না, কিন্তু সে অবস্থাও মায়িক। সকল প্রকার সমাধি অবস্থাও মায়িক, নির্ব্বাণ প্রাপ্তিও মায়িক। যা কিছু হয়, যা কিছু ঘটে, তাহাই মায়িক। নির্ব্বাণও একটী ঘটনা, সুতরাং তাহাকেও অমায়িক বলা যায় না'। নির্বাণও মায়িক—ভারতবর্ষের মানুষের কাছে এটা আশ্চর্য্য কথা। ভারতবর্ষের লোক জানে নির্বাণের চেয়ে বড় চাওয়া কিছুই নাই। নিভে যেতে পারলেই সে বাঁচে—তাই তো তার পরিবার সমাজ রাষ্ট্র জীবনে এত ব্যর্থতা! শ্রীনিত্যগোপাল এমন অদ্ভুত নূতন কথা, অদ্ভুত উপাধি-মুক্ত নূতন জীবন-চেতনার কথাই শোনাতে এসেছেন। তিনি জগতের ঘরে সমাধির প্রশান্তিকে এনে মানুষের ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনকে পরিশুদ্ধ করে মহান্ ও সত্য করবার পথ দেখিয়ে গেছেন। ভগবানের সৃষ্ট রূপরসগন্ধ শব্দস্পর্শময় এই জগৎটা ও তার মানুষগুলি তাদের সমস্ত সৌন্দর্য অসৌন্দর্য নিয়েও যে সবশুদ্ধ সুন্দরই, সৌন্দর্য অসৌন্দর্য সব রকম বৃত্তি দিয়ে দিয়ে মানুষ সুন্দর হয়ে ফুটে উঠবে, না অসুন্দর হবে, বিধাতা যে সে স্বাধীনতা মানুষকে দিয়ে বসে রয়েছেন, জগৎ ও তার স্রষ্টার সৌন্দর্য আস্বাদন যে এর বাইরেই নেই, এরই মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে, কেবল তাকে বের করে নিতে জানতে হয়—এই নূতন সংবাদ নিয়ে এসে শ্রীনিত্যগোপাল আমাদের পরম বান্ধব। আমরা এ সংসারে মানুষের মত সকলে মিলে মিশে বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই যেন সহজ ভাবে—এক নয়, সকলে মিলে—বড় ছোট, কুলীন অকুলীন, শিক্ষি অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন সকলে মিলে সকলে খেয়ে ব সকলে না খেয়ে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এক পরিবারের ম বাস করতে চাই—তারই নির্দেশ দিতে শ্রীনিত্যগোপা বললেন, 'আমি বিশ্বনাগরিক'। সকলে এক পরিবারে মত না বাঁচতে শিখলে, সকলে বিশ্বনাগরিক হয়ে ব্যাপ গভীর বিস্তৃত জীবন যাপন না করলে বিশ্বকে, জড় সত্য বলা বা পরস্পর বিপরীতকে সমান মূল্য দিয়ে চা কিছুতেই সম্ভব হবে না। যখনই ব্যাপক গভীর জীব নিয়ে সকলে মিলে মিশে থাকবার কৌশল আয়ত্ত কর পারব, তখনই আসক্তি বিদ্বেষ থেকে মুক্তি পেতে পার আসক্তি বিদ্বেষ থেকে মুক্তিই মুক্তি—তখনই বিশ্ব বন্ধন-ঘটনা থেকে মুক্তি মুক্তি নয়। শ্রীনিত্যগোপাল তাই কে আধ্যাত্মিকতার ঠাকুর নন, ভারতের ভাবের ব্যক্তি পরিব সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্ব জীবনে সুস্থ মাত্রাপূর্ণ মর্যাদা জীবন যাপন করবার পথ-কৌশল দিবার ঠাকুর শ্রীনি গোপাল। তাই সর্বসাধারণের হয়ে তিনি অসাধারণ, ক মানুষেরই মত জন্মেও তিনি সকল মানুষের বাইরে যুগের সমস্যা ও সমাধানকে বহন করেই তিনি যুগাতী অপরিচিত এই পরম সুন্দর পরম কল্যাণময় দেব-মা বিশ্ব-মানুষকে আজ তাঁর এই ১০২-তম জন্ম আবির্ভা বে আমরা সকল সত্তার প্রণতি জানাই; তিনি ফু টুন, প্রকাশিত হয়ে সমস্যা-বিক্ষুব্ধ মানুষের চিত্ত-দাহ শান্ত করে সর্বাঙ্গীণ জীবনে সুন্দর করে তুলুন—প্রার্থনা জানাই।

নিত্যগোপাল ও তাঁহার প্রচার *

।। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ।।

ওঁ নমো ভক্ত ভগবতে নিত্যগোপালায়

বরিশাল
৩নং বগুড়া রোড

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার শরীর নাকি একটু অসুস্থ, বর্ত্তমানে কেমন আছেন জানাইবেন। ঠাকুরের প্রচার ঠাকুরই করিবেন। যাঁহার প্রচার সমাজের ধর্ম্ম ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন, তাহা একদিনে হঠাৎ হুজুগে হওয়া সম্ভব নয়, বরং হুজুগে তাঁহার দেরী হইবে। তত্ত্বের দিক দিয়া ঠাকুরকে আগে প্রচার না করিলে তিনি প্রচারিত হইতে পারেন না, যে হেতু ভগবান চিরদিনই তত্ত্বের ঘনীভূত অবস্থা; তবে ভক্তভাবে জগতের সামনে প্রচারিত করা যাইতে পারে। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—সমাজের সামনে তাঁহার ভক্ত-জীবনটী উপস্থিত করা এবং তৎসঙ্গে তাঁহার প্রচারিত তত্ত্বটী (যাহার পরিণতিতে উহা ঘন হইয়া মূর্ত্তি ধারণ করিবে) বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করা। এই ভাবে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে উতলা না হইয়া কার্য্য করিয়া গেলে শীঘ্রই তাঁহার তত্ত্ব বেশ উন্মুক্ত হইবে। নিত্যগোপালের আকার, সাকার ও নিরাকার তিনটী রূপ, তিনিই ত লিখিয়াছেন। জগতের সকলেই এই তিনটী আস্বাদন করিবে তাহা অসম্ভব, কোন প্রমাণ নাই। জগৎ তত্ত্ব-মূর্ত্তিটী বুঝিলেই যথেষ্ট; আর তত্ত্ব ভাবটী না বুঝিয়া উপায়ও নাই যেহেতু উহা সৃষ্টির সহিত জড়িত। আকার ভাবটী অতি অল্প কয়েকটী ভাগ্যবান সাধক বুঝিবেন; সাকার ভাব নিয়া হৈ চৈ করিলে কার্য্য পণ্ড হইবার সম্ভাবনা বেশী। তাই তত্ত্ব নিত্যগোপাল ও ভক্ত নিত্যগোপালই আমার সমধিক প্রিয়; ঐ দুই ভাবের পশ্চাতে রহিয়াছেন ভগবান নিত্যগোপাল। যাক, যাহা তাঁহার ইচ্ছা তাহা পূর্ণ হইবে। জগৎ তাঁহার প্রেম-রসে ভরপুর (তাঁহাকে নাই বা মানিল) দেখিলেই কৃতার্থ। আমরা বর্ত্তমানে ভালই আছি।

সেবক
শরৎ

---

*স্বামী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ কর্তৃক তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺শরৎ কুমার ঘোষ (শ্রীমৎ প্রেমানন্দ অবধূত)-কে ১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনমাসে লিখিত হইয়াছিল।

ওঁ শ্রীনিত্যগোপালায়

॥ শ্রীবিষ্ণুপদ রায় ॥

আজ আমাদের পরম আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ১০৭ তম জন্ম দিবসকে কেন্দ্র করিয়া আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। তাঁহার হেম বরণ দেহখানি এই মন্দিরের নিম্নদেশে রহিয়াছে। তিনি আজ রক্ত মাংসের শরীরে উপস্থিত নাই তথাপি তাঁহার অত্যদ্ভুত সমন্বিত যুগান্তকারী জীবন ও দর্শন দিকে দিকে উদ্ভাসিত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন,

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

"হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপকারিগণের ক্ষেত্র হইতে অপসারণ এবং ধর্মকে যথাযথরূপে স্থাপনের জন্য যুগে যুগে সম্ভূত হই।" সত্য সত্যই তিনি যুগে যুগে আসিয়াছেন, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, যীশু নানান রূপে নানান রকম সৃষ্টি করিতে আশ্রয় করিয়া যুগোপযোগী জীবন ও দর্শন লইয়া:— আবার তিনি আসিয়াছেন। কেন আসিয়াছেন? কি তাঁহার মিশন? কি তাঁহার বক্তব্য মত ও পথ, তাহারই দুই একটি কথা এখানে বলিব।

বিশ্ববিদিত শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আপনারা সকলেই জানেন। এই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যগোপাল একই সমন্বয় ধর্মকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর বুকে অবতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমন্বয় ধর্মের প্রথম পর্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পর্ব রাখিয়া গিয়াছেন শ্রীনিত্যগোপালের জন্য। এই শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় প্রীতি ও ভালবাসা। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন শ্রীনিত্যগোপালকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন 'তুইও এসেছিস আমিও এসেছি' অর্থাৎ এতদিনের মনের ঘরের দ্বিধাবিভক্ত সাধনাকে প্রাণের ঘরে আসীন করিবার জন্য তাহাদের যুগল অবতরণ ধরার ধূলিতে পরিণত করিবার জন্য ধরার মানুষকে ব্রহ্ম মানুষে পরিণত করিবার জন্য। তাঁহারা দুই জন আসিয়াছেন।

শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন আজিকার ও ভবিষ্যতের মানুষের জীবন-দর্শন লইয়া। যে জীবন-দর্শন বর্তমানের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ মানুষের সম্মুখে দেখাইবে সহজ সরল পথ। মানুষ এতদিন যে সংসারকে হেয় পদবাচ্য বিবেচিত করিয়াছে, যাহাকে মায়া, অলীক স্বপ্নবৎ বলিয়া মূল্যহীন করিয়াছে—শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন সেই সব হেয়, লাঞ্ছিত মায়ার জগৎকে ব্রহ্ম-সংসার রূপে, নিত্য বৃন্দাবন-রূপে গড়িবার পরম প্রয়োজনে, হীন প্রভাশক্তি নারী শক্তিকে ব্রহ্মমূল্যে মহীয়সী করিতে। 'সংসার কারাগার'-বাদ আজ বিশ্বের বুক হইতে অপহৃত হইতে চলিয়াছে। জেমস্ জিনস্ লিখিয়াছেন:—"The old physics showed us a universe which looked more like a prison than a dwelling place. The new physics shows us a universe which looks as though it might conceivably form a suitable dwelling place for free men and not a mere shelter for brutes—a home in which it may at least be possible for us to mould our desires and live life of endeavour and achievement." Physics and Philosophy —শ্রীনিত্যগোপাল আজ হইতে প্রায় সত্তর আশী বৎসর পূর্বে যে দার্শনিক তত্ত্ব দ্বারা মানবীয় চিন্তাধারায় পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন—সেই তত্ত্বই আজ রাষ্ট্রে, পরিবারে সমাজে, ব্যক্তি-মানসে, নর-নারীতে ও জড়-জগতে

আকাশ-মাটিতে, ধনিক শ্রমিক প্রভৃতি বিপরীত ধর্মী বিষয়গুলির মধ্যে সমন্বয়ের উজ্জ্বল জ্যোতিতে পরিলক্ষিত হইতেছে। নর-নারী, রাজা-প্রজা, ধনিক-শ্রমিক কেহই আর self centered থাকিয়া বাঁচিতে পারিবেন না। একই শরীরের হাত, পা, কান, চোখ মুখ বাদ দিয়া যেমন শরীর হয় না—তেমনি ধনিক-শ্রমিক, নর-নারী, রাজা-প্রজা, উচ্চ-নীচ এদের প্রাণখোলা মিলন ছাড়া 'One world' অথবা suitable dwelling place এর সৃষ্টি হয় না। আজ মিলনের যুগ, সমন্বয়ের যুগ। একটি যুগ অতীত হইয়াছে, আজ আমরা একটা নূতন যুগের দ্বার দেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আজ চাই শ্রীনিত্যগোপালদেবের I am a cosmopolitan এর সাধনা, বিশ্বনাগরিকত্বের সাধনা। আজিকার দিনে প্রতিটি মানুষ হইবে বিশ্বমানব, প্রতিটি সংসার হইবে বিশ্বসংসার, প্রতিটি সমাজ হইবে বিশ্বসমাজ, প্রতিটি রাষ্ট্র হইবে বিশ্বরাষ্ট্র। হাতের ব্যথা যেমন শুধু হাতেরই না—উহা সমগ্র দেহের—তেমনি জগদ্বাসী যেদিন জগতের কোন একটি রাষ্ট্রের, বা সমাজের পতনে বা নিধনে নিজেদেরই নিধন বা পতন মনে করিবেন, অন্তরে অনুভব করিবেন, চোখের জল ফেলিবেন সেইদিনই হইবে শোষণ-মুক্ত দিব্য বিশ্ব, সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র।

বিশ্বসংসারে একান্ত মায়া অথবা একান্ত ব্রহ্ম বলিয়া কিছু নাই। যেখানেই rigidity সেই খানেই মৃত্যু। ইংরেজ একদিন একান্ত করিয়া ভারতবর্ষকে ভোগ করিতে চাহিয়াছিল—পারে নাই। জমিদার চাহিয়াছিল প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া একান্ত ভাবে নিজেকে পুষ্ট করিতে—পারে নাই। পুরুষ চাহিয়াছিল নারী শক্তিকে শোষণ করিয়া পুরুষপ্রধান সমাজ বজায় রাখিতে—পারে নাই, একান্ত করিয়া জগতে কেহই ভোগ বা শোষণ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। কবি বলিতেছেন—

কেন ঝরে গেল ফুল ?
আমি প্রাণপণে তারে চেয়েছিনু নিরাকুল
তাই ঝরে গেল ফুল।
কেন মরে গেল নদী ?
আমি বাঁধ বাঁধি তারে
চেয়েছিনু নিরবধি
তাই মরে গেল নদী।

এই বিশ্বে একান্ত ভাবে যে কোন একটি বস্তুই সত্য বাস্তব নহে। অতীতের ভাল মন্দের, সুখ-দুঃখের valuation-এ বর্তমান জগৎ আর চলিবে না আবার বর্তমানের মাত্রাহীন উচ্ছৃঙ্খলতাতেও সমাজ-জীবন সুস্থ হইবে না—আজ চাই সমন্বয়, মাত্রাবোধ। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তিবাদ আজ যেমন বাস্তবের দুনিয়ায় বাতেল হইতে চলিয়াছে, তেমনি জড়বাদী একান্ত বিশ্বকেন্দ্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ভ্রম নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে সন্দেহ নাই। উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন :—

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥

যাহা এখানে তাহাই ওখানে, যাহা সেখানে তাহাই এখানে। যে এই সংসারে অনেকের ন্যায় দর্শন করে, সে মরণেরও মরণ ক্লৈব্য প্রাপ্ত হয়।

জড় বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুর মধ্যে যে ভগবান ছদ্মবেশে বিরাজ করিতেছেন এই বিরাট রহস্য ভারতবর্ষ একদিন ভুলিয়া গিয়াছিল—তাই তাহাকে ইংরেজের হাতে দুই শত বৎসর লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। এক-চক্ষু হরিণের মত যেদিন সে আকাশের ভগবানকে সর্বস্ব বলিয়া ধ্যানমগ্ন হইতে চাহিয়াছিল—জড়বাদী ইংরেজ সেই লাঞ্ছিত পরিত্যক্ত ভারতকে গ্রাস করিতে সুযোগ পাইয়াছিল। শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন একই সময়ে জড়াজড় সমন্বিত মায়াব্রহ্ম সমন্বিত এক যুগান্তকারী দর্শন ও জীবন লইয়া। তিনি ট্যাঁকে টাকা রাখার সঙ্গে নির্বিকল্প সমাধির সাধনা কি করিয়া হয় তাহা জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

শ্রীনিত্যগোপাল প্রাণপুরুষ। তিনি আসিয়াছেন সর্বধর্ম প্রভৃতি বাদের সংমিশ্রন করিবার জন্য। বুদ্ধির শাণিত অস্ত্রে বিশ্ব বিপদাপন্ন। বুদ্ধি সব সময়েই ভেদের সৃষ্টি করে, ইহা বুদ্ধির সহজাত বৃত্তি। বুদ্ধির দ্বারা One world—এক-বিশ্ব—পরিকল্পনা সম্ভব নহে। তাই

প্রাণের স্পন্দন, প্রাণের ক্ষেত্রে সবাই এক এই প্রাণ-তত্ত্ব। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
ভাঙরে হৃদয়, ভাঙরে বাঁধন
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন
লহরীর পর লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর।

এই মহা প্রাণের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রাণ-দর্শনই বর্তমান জগতে উদ্ভাসিত হইবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছে। অতীতের, বর্তমানের, ভবিষ্যতের সমস্ত উচ্চ-নীচভাব সবই আজ প্রাণের বিপুল তরঙ্গাবর্তে ভাসিয়া চুরমার হইয়া যাইবে—সেই দিন দূরে নয়, এই আসিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই প্রাণ-দর্শন, সমতা দর্শনই যে এক মাত্র পথ দেখাইবে তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। বুদ্ধির কারসাজি খানখান হইয়াছে,—খানখান হইয়া যাইবেও। যেখানে ইতর ভদ্রে ভেদ, কুলীন-অকুলীনে ভেদ, ধনিক-শ্রমিকে ভেদ, ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে ভেদ সেই খানেই পাপ, সেই খানেই নরক। যেখানে যাহাকেই আমরা হেয় বা ঘৃণিত মনে করি না কেন উঁহাতেই যে শ্রীভগবানকেই হেয় করা হয়—এই বোধ আসিবার জন্য আজ সমাজ-দেহে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রবল মহোদধি জলে তাঁহার সমতা-ধ প্রাণ-প্রচুর জীবন ও দর্শন দ্বারা আমাদের আপ্যায়িত করুন আজিকার দিনে ইহাই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

সর্বেশ্বর

॥ শ্রীশ্যামাপদ সেন ॥

ফিরে ফিরে তুমি মোর মনের গোপনে দিয়ে দেখা,—
যাও সরি' না' চিনিয়া প্রাণে আঁকি একি হাস্যরেখা!
উপমা যাহার খুঁজি পুষ্পপর্ণে উষার আকাশে,—
সরিৎ-সমুদ্র-নৃত্যে পূর্ণিমার উজ্জ্বল উল্লাসে;
অপূর্ব প্রীতির ভাষা নয়নের সান্ত্বনা-প্লাবিতে,—
আনন্দ সত্তার সুর অন্তকণ্ঠে বেদের ধ্বনিতে;
বিশ্বজীবনের মাঝে আছে মিশি' যে বৈরাগ্য-রাগ;
তাপস শ্রাবণ দীপ্তি ভরি' তোলে বিচ্ছেদ-বিষাদ;
শিশুর সরল বোলে, প্রেয়সীর রমণীয়তায়,—
স্বর্গের স্বপ্ন যথা জাগে মাতৃস্নেহে বসুধায়;
কল্যাণ কঠোর রূপ প্রস্ফুরিত যে গুরু-আদেশে,
মুহূর্তে দহিছে যার অগ্নিশিখা আনন্দ-আবেশে!
সমস্ত মহিমা আর সমস্ত মাধুর্য এক করি,'—
তুমিই কি চিত্তে মোর সর্বক্ষণ বিহর শ্রীহরি?

ঠাকুর বৃন্দাবনচন্দ্রের দোলযাত্রা

॥ ৺নিত্যগোপাল চক্রবর্তী ॥

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য ৺নিত্যগোপাল চক্রবর্তী ১০ বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে লেখা তাঁহার এই রচনাটি প্রকাশ করিতে আমরা নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। মাত্র বৎসর দুই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের কৃপাকণা সান্নিধ্য লাভের ফলে তিনি ভক্তির সোপান লাভ করিয়া আপনার জীবন কেমন পূর্ণ করিয়াছিলেন, আমাদের পক্ষে তাহা পথ-প্রদর্শক হউক।
—সঃ উজ্জীবন।

ব্রজের ঠাকুরটীর বাঁশীর গান শুনে সে যুগের ব্রজগোপীরা নাকি ঘর-সংসার স্বামী পুত্র সব ভুলে—কুলশীল সব বিসর্জন দিয়ে ঠাকুরের শ্রীপাদমূলে পৌঁছে ছিলেন এবং আত্ম সমর্পণ, সর্বস্ব সমর্পণ করে নিজেরা ধন্য হয়েছিলেন—ঠাকুরকেও সার্থক করেছিলেন। এ কথা কম বেশী করে নানা ভাবে আমরা সকলেই শুনেছি। সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি বেদব্যাস তাঁহার প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে এই বৃন্দাবনের মধুর লীলা বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবন লীলার উপর পূর্বে অনেকেই কটাক্ষ করতেন বিশেষ ভাবেই, আজও যত্র তত্র করেন কিন্তু বেশ করে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এতে কটাক্ষপাত করার কিছুই নাই। যে গ্রন্থের রচয়িতা স্বয়ং বেদব্যাস ও চির কুমার ও চির ব্রহ্মচারী শুকদেব যে গ্রন্থের পাঠক ও বক্তা সে গ্রন্থ সম্বন্ধে সন্দেহের কিছুই থাকতে পারে না। ব্যাসদেব মহাভারতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা বর্ণনা করেছেন। এ পর্যন্ত লীলা-শাস্ত্রকে দার্শনিক ভাবে লোক চক্ষুর সামনে না ধরার ফলে সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি যুক্তি গ্রন্থই প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে লোক-সমাজে পরিচিত হয়ে পড়েছে। লোকে লীলাশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগই পায় নাই। আজ লীলা-শাস্ত্রকে গৌণ করার ফলে সমাজ ও দেশ সব মরুভূমে পরিণত হতে চলেছে। যুক্তি পর্বত আজ ভোগের স্রোতে পরিণত হ'তে চলেছে। লীলাশাস্ত্র হচ্ছে জীবন-শাস্ত্র, পোষণ-শাস্ত্র। ইহার দেবতা পোষণ-দেবতা পুরুষোত্তম বাবা গোবিন্দ নিত্যনিবাসী ইহারাই। যুক্তি-শাস্ত্র বিশ্বের সব কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু সঙ্গে নিয়ে চলেছে গোলোক বৈকুণ্ঠে; তার ফলে বিশ্ব আজ নরক সদৃশ ম্লান হয়ে উঠেছে। যেমন করে সহরের মাহাত্ম্য কথা শুনতে শুনতে দলে দলে লোক গ্রাম ত্যাগ করে সহরে সরে পড়ায় গ্রাম আজ নরক সদৃশ হয়ে পড়েছে, গ্রামের যা কিছু ভাল শ্রেষ্ঠ মানুষ, অর্থ, শক্তি সব আজ নাগরিক সভ্যতার খোরাক যোগাচ্ছে—যাদের কোন উপায় নাই যাঁরা ম্যালেরিয়া জর্জরিত সেই নিরুপায় লোকগুলি অনন্যোপায় হয়ে গ্রামে ধুঁকে ধুঁকে মরছে—তেমনি আজ কোটী কোটী বৎসর হতে মুক্তিবাদকে প্রধান বা মুখ্য করে রাখার ফলে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মানুষ ধরাকে পদদলিত করে ধরায় থেকে পড়েই দলে দলে মোক্ষলাভের জন্যে বৈকুণ্ঠ বাসের জন্য ছুটছে—তাই ধরার অবস্থা আজ শোচনীয়। সেই নির্মল চৈতন্য দেশের তুলনায় ধরা পচা গলা মাটির দেশ আজ কুলির দেশ, ধরার মানুষ আজ কুলি, মুটে মজুরে পরিণত হয়েছে। আজ ধরাকে বাঁচতে চাইলে চাই লীলা শাস্ত্রের মূর্ত্ত রহস্য মানুষের সম্মুখে উজ্জ্বল ভাবে ধরা। আজ মানুষকে শিখতে হবে যে ওরে তোরা দলে দলে কোথায় ছুটে ছুটে যাচ্ছিস্—দ্যাখ্ যুগে যুগে গোলোক বৈকুণ্ঠের ঠাকুর কেমন করে জগতের কোন বাস্তব অভাব টানে নিজের ঐশ্বর্য্য বীর্য্য সমস্ত হারিয়ে কাঙাল হয়ে এসে তোদের এই পচা গলা ধরার ধুলা মেখে ধন্য হন্। মুক্তি বা মোক্ষই যদি সব, ধরা যদি কিছুই না, যদি মিথ্যাই হয়, ধরার রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ যদি বাঁধনের কারণই হয়, তবে স্বয়ং মুক্তিনাথ মুক্তিপুর সেই সাধের বৈকুণ্ঠ ছেড়ে কেন ধরায় এসে হাসেন কাঁদেন, কেন ধরার জীবের মত কাঙাল হয়ে ধরার জীবকে কাঁধে করেন, কাঁধে চড়েন? এর উত্তরে যুক্তি শাস্ত্র নীরব! তার গৌরব তার গর্বের শেষ এইখানেই! তাই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই লীলা-

শাস্ত্রের ব্যাপক ভাবে আলোচনায়। বিশ্বের মানুষ বুঝুক—বিশ্বেশ্বরকে পাওয়ার জন্য বিশ্ব ছাড়িয়া বিশ্বাতীত দেশে ছুটিবার চেষ্টার কোনো প্রয়োজনই নাই। এখানেই বিশ্বেশ্বরকে পাওয়া যাইবে—অবশ্যই যাইবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজের দিব্য জন্ম কর্ম কাহিনী, তাঁহার অবতরণের কাহিনী তাঁহার প্রিয়সখা ও ইষ্ট পার্থকে অপার গভীর স্বরে শুনিয়েছেন। এই ধরার মাঝে বৃন্দাবন তাঁর নাকি খুব প্রিয় স্থান। তাই তিনি বলেছেন, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি। এইবার আমরা ব্রহ্মের মানব শরীর ধারণ করে আচরণের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে আলোচনা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করবো।

আমরা ব্রহ্মচর্য্য এই কথাটি আগেই শুনেছি। ব্রহ্মচর্য্যের কথা আমরা যে ভাবে শুনেছি ব্রহ্মচর্য্য তা মোটেই নয়। ব্রহ্মচর্য্য বা ব্রহ্মচর্য্যা দুইটি কথা একই বটে. ব্রহ্ম মানব শরীর ধরে যা যা আচরণ করেন, যেমন যেমন আচরণ করেন তাই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্ম মানব শরীর নিয়ে এই ধরায় জীবগণের মধ্যে নেমে আসেন তখনই যখন নাকি ধরার লোক ঠিক ঠিক ভাবে যেমন ভাবে চল্‌তে পারে না যেমন করে চল্‌লে তাদের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ সহজ ভাবেই লাভ হতে পারে। অন্য কথায় বলতে গেলে এই বলা যায় বিশ্বে যখন সর্ব্ব প্রকার বিপ্লব উপস্থিত হয়, যখন মানুষের বুদ্ধি সেই বিপ্লবের মধ্যে বেঁচে থাকবার জন্য এগিয়ে যাবার কোন রণনীতি খুঁজে পায় না, তখন ঠাকুর মানব শরীর নিয়ে এসে নিজে আচরণ করে সেই বিপ্লবের মধ্যে থেকে কেমন করে বাঁচা যায় সেই পথ মানুষের সামনে ধরেন—বিশ্ব রক্ষা পায়। ব্রহ্মের সেই যে আচরণ, সেই আচরণই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের আর এক অর্থ করা যায়—যার মানে এই হয় যে—স্বাধীন ভাবে, স্বরূপ ও বিশ্বরূপে বিচরণ করবার যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হয়। ব্রহ্ম অর্থ বিরাট—ব্রহ্ম অর্থ প্রকৃতি। সে বিচরণের নীতি ব্রহ্মই জগৎকে দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই জন্য তাঁর সেই আচরণের নামও ব্রহ্মচর্য্য। আজ আমরা এখানে দোলের বিষয় বর্ণনা করতে বসেছি। আমরা বৎসর বৎসর তো ভারতে দোল অনুষ্ঠান করি কিন্তু তত্ত্বতঃ না জানার জন্য আমাদের দোল কো পরিণত হতে চলেছে। দোলও ব্রহ্মের আচরণে নামান্তর। কোটী কোটী বৎসর হইতে বিশ্বের প্রজ্ঞাবাদী দল, মায়াবাদীর দল প্রকৃতিকে অস্পৃশ্যা, ঘৃণ্যা ব অভিহিত ক'রে তাঁকে ব্রহ্ম হ'তে পৃথক করে ফেলেছে প্রকৃতিকে মিথ্যা মায়াময়ী বন্ধনের হেতু বলে বর্ণনা ক করে কেবল ব্রহ্মে স্থিত হতে চেয়েছে। এক সঙ্গে সহ ভাবে ব্রহ্ম হতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হতে ব্রহ্মে বিচ করায় কৌশল না জানার ফলে বিশ্ব আজ খণ্ড বিখণ্ড খণ্ড হ'তে চলেছে। কেবল ব্রহ্মে বিচরণ যে সমস্যা সে বোধ কি বিশ্বের আছে? সেই মহামায়াপ্রিয় নিষ্কি ক'রে বিশ্ববাসীকে দিব্য ব্রহ্মচর্য্য মন্ত্রে দীক্ষা দিবার জ কালকে সাথে রাখিয়া ভিতরে পুরুষ ও বাহিরে ক' মূর্তি সমন্বিত ব্রহ্ম নারায়ণ ধরায় আসলেন দ্বাপরের শে যুগে যুগে ব্রহ্মের নিকট প্রকৃতি, পুরুষের নিকট না আত্মার নিকট অনাত্মা লাঞ্ছিতা, ঘৃণিতা, অবহেলিতা এ পরিচিত হয়ে কেবল চোখের জল ফেলছিলেন—প্রকৃ সেই বহু দিন বহু যুগ সঞ্চিত বুকের ব্যথা ঘুচাতে ও চো জল মুছাতে নেমে এলেন সেই নিখিল বৈকুণ্ঠ ঠা কাঙালের বেশে রাখালের বেশে ধরার বুকে বৃন্দাব নিলেন বাসস্থান। বৃন্দাবনে মা যশোদার কোলে ব বসে শিখলেন ভালবাসা, সেই ভালবাসার বাঁশী বাঁ বাঁশীতে বাজিয়ে বাজিয়ে অত্যাচারিতা, লাঞ্ছিতা ব্র গোপীদেরকে টেনে ঘরের বাহির করলেন। নিজে টে বুকে নিলেন। তাদের চোখের জল দিলেন নিজের হা মুছিয়ে, তাদের সঙ্গে খেললেন দোললীলা—পায়ে ধ দিলেন মান—করলেন কলঙ্ক ভঞ্জন; পায়ের উপর নিয়ে মোহন চূড়া রেখে, বাঁশী রেখে দিলেন তাদের মহা মা ঘুচালেন অপমান। নিজে কোটাল-দ্বারবান গো রাধাকে রাণী সাজিয়ে তাঁর কোটালী করলেন—কুঞ্জে দ্বারে দিলেন পাহারা। দোল লীলা ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্মানের অপূর্ব মধুর মোহন লীলা। ঠাকুর যে যু এসেছিলেন ব্রজ রাখাল রূপে, সে যুগে সমাজে নারী অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। সেই সময়ই যুগ সভ

নারীর কি অপমান সহ্য করতে হয়েছিল, মনে করলে গা উঠে শিউরে। আজই কি সে অপমানের কলঙ্ক দূর হয়েছে। নারীর অবস্থা সেদিনও যা আজও তাই। নারী সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সেবা করে পুরুষের কাছে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কি পায়! কিছুই তো পায় না। পুরুষ নাকি নারীকে রাণীর মত সম্মান দেয় বহু পুরুষের মুখে শুনতে পাই। ধৃষ্টতা আর কাকে বলে। পুরুষ নিজের স্বার্থের বশে নারীকে করে রেখেছে বোবা, তার পায়ে দিয়েছে শিকল, হাতে দিয়েছে লোহার বেড়ি। নারীর সর্ব্বস্ব সে ডাকাতের মত করেছে লুণ্ঠন। নারীরও সে বোধ নাই যে সে পুরুষের কাছে কতখানি অপমানিত লাঞ্ছিতা হচ্ছে দিনের পর দিন। আজকাল সতীত্বের মাপকাঠী হচ্ছে নারী কতখানি পুরুষের বশীভূত অর্থাৎ কতখানি সে তার প্রবৃত্তি পুরুষের সাহায্যকারিণী ইহারই ওজনের উপরে। শ্রীকৃষ্ণ সে কালের ব্রজগোপীদের ভালবেসে দেখালেন প্রকৃত ভালবাসা কি ও কাকে বলে। শ্রীকৃষ্ণ সে যুগের বৃন্দাবনের কতগুলি অবলা ভালবাসার ব্রজ গোপীকে গর্জ্জন করার মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—ব্রজগোপীগণ, সংসারে তোমরা ভালবাসা দিতেও পার নাই, পাও-ও নাই। কি ভাবে তা দিতে ও পেতে হয়, শেখ আমার কাছ থেকে। সংসারের সেবা তো করতে হবেই। আত্মীয় স্বজন স্বামী পুত্র এ সকলের সেবা করতে হবেই। তোমাদের আমি এদের সেবা না করার মন্ত্র দিতে ঘরের বাইরে টেনে আনি নাই। আমি জগৎ মিথ্যা কে কার এ কথা শিখাতে তোমাদিগকে এ যমুনা তীরে বাঁশীর গানে টেনে আনি নাই। আমার বাঁশীর গান তোমাদের বিশ্বের সেবা কৌশলই শিখাবে। কিন্তু সেবা করতে হলে তো শুধু ভালমানুষ হ'লে চলবেনা। তোমাদের যে একাধারে বৈষ্ণবী ক্ষত্রাণী দুইই হতে হবে। অন্যায় দেখলে চোখও রাঙাতে হবে, আবার কোমলতা দ্বারাও সকলের চিত্ত বশ করতে হবে। সেই কৌশলই তো আমার কাছ থেকে শিখতে হবে। আমি তোমাদিগকে সংসার-সর্পের দাঁত ভাঙ্গার মন্ত্র শিখাবো। আমি প্রেমের বাঁশী বাজিয়ে তোমাদিগকে ঘরের বাহির করেছি বটে কিন্তু আবার ঘরে পাঠাবো। আমার সঙ্গ ছেড়ে তোমরা ঘরে যেতে চাইবে না তাও জানি, কিন্তু আমি তো তোমাদিগকে ছাড়বো না। আমি যে স্বরূপ বিশ্বরূপ সমন্বিত পুরুষোত্তম। দুই ভাবে আমার পূজা না করলে আমার পূজাই—সেবাই হয় না। আমাকে বাদ দিয়া বিশ্বকে, বিশ্বকে বাদ দিয়া শুধু আমাকে ভালবাসা তো ভালবাসা নয়। সে তো আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি মদনই। বিশ্বের অংশ তোমাদিগকে ভালবেসে আমি মোহন হইব, আমাকে বিশ্বকে ভালবেসে তোমরা মদনমোহিনী হবে। আজ মদনানলে বিশ্ব দগ্ধ হতে চলেছে, আমি এই মদনাগ্নি দূর করে প্রেমের প্লাবনে—প্রাণের বানে বিশ্ব পূর্ণ করতে চাই। তোমরা ব্রহ্মচারিণী রূপে আমার সহায় হও, আমিও ধন্য, তোমরাও ধন্য হইবে।

সে যুগে নারী-প্রকৃতির উপর কি ভাবে জুলুম চল্‌তো একটা উদাহরণে তা বুঝা যাবে। রাধা বৃষভানু নন্দিনী। তাঁর বিয়ে হয়েছিল একটা নপুংসকের সঙ্গে। তাঁর সেই স্বামী চাইতেন সর্ব্বদা তাঁকে চোখে চোখে রেখে সতী করে রাখতে। সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থাও এমন ছিল না যে এ অত্যাচারের প্রতিকার সম্ভব হয়। সে যুগের কোনোও নারী পুরুষই অন্তঃপুরের নারীর বুকের গোপন ব্যথা ও গোপন চোখের জলের খোঁজ নেয় নি, কোনো নারী পুরুষই সে যুগে এর বিরুদ্ধে সিংহের মত গর্জ্জন ক'রে ওঠেনি। রাধা নিরুপায় হয়ে বুকের ব্যথা বুকে চেপে চোখের জল নিজের হাতে মুছেই হয়ত গোপনে গোপনে তাঁর হৃদয় দেবতার নিকট এর প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলেন। ব্রজের ঠাকুর কিন্তু রাধার এই গোপন চোখের জল ও গোপন বুকের ব্যথায় স্থির থাকতে পারেন নাই। তাই তিনি যমুনাতীরে কদমতলায় দাঁড়িয়ে তাঁর মোহন বেণুতে বিপ্লবের সৃষ্টি করে দলিতা লাঞ্ছিতা রাধাকে রায়ানের অন্তঃপুর থেকে টেনে বের করে ছিলেন। এই বিপ্লবময় ঠাকুর রাধাকে রাস্তায় বের করে এনে তাঁর চোখের জল বুকের ব্যথা ঘুচিয়ে তাঁর পার্শ্বে রাণীর আসন দিয়েছিলেন। গোপ রায়ানের ঘর হ'তে বের হয়ে

নায়িকা আজ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আদরে আদরিণী, ঠাকুরের সোহাগে সোহাগিনী হয়ে, কুলত্যক্তা, সমাজ বর্জিতা, লোক চক্ষে অসতী বলে পরিচিতা হয়েও আজ বিশ্বের মাঝে মহাসতী, গর্বিতা, গৌরবিণী। চেয়ে দেখ বিশ্বের নীতিবাদীর দল, সৎ পুরুষোত্তম ক্রবানীতিবিৎ শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে জীবন লাভ করলে কেমন করে তোমাদের মাপকাঠীর অপতিত মানুষও গৌরবান্বিত ও সার্থক হয় দেখ। শ্রীশ্রীরাধারাণীর পুণ্য মধুর উজ্জ্বল পদরেণুর পরশে বিশ্বের ভারতের প্রতি ধূলি কণা আজ দিব্য ও উজ্জ্বল। দোললীলা ভারতের মহা উৎসবের চিহ্ন স্বরূপ হয়ে আছে সেই সম্পত্তি গৌরব বহন করেই। না হবেই কেন? এই দিন অনাদৃতা বিশ্ব-প্রকৃতি ব্রহ্মের সহাসন—সমান আসন—লাভ করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিশ্বের দাবাগ্নি নির্বাপিতা করেছিলেন—প্রেম যমুনায় সুশীতল বারি ছিটিয়ে সমগ্র জগৎ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এই মহা মধুর দোললীলায় সহায়কারিণী হয়েছিলেন বৃন্দাবনের কয়েকটী অবলা সরলা লাঞ্ছিতা অবহেলিতা গোপনারী। যারা বিশ্বের এই জীবন যাপনের ফলে সমাজে সেই সময়ে ত্যক্তা কুল কলঙ্কিনী বলে অভিহিতা হয়েছিলেন। আজ ভারতের সমস্ত নর নারী সেই সব গোপনারীর চরণ ধূলিকণা শিরে তুলে নেবার জন্য ব্যাকুল। তখনকার দিনে তো জ্ঞানী-বিজ্ঞান-যোগী-তপস্বী কোন লোকেরই অভাব ছিল না, কেউ তো সেদিন ঠাকুরের এই বিশ্ব প্রকৃতির মানদানের উৎসবে যোগ দেন নাই। সকলেই বোধ হয় সেদিন নীতির নেশায় নাক সিট্‌কাইয়া যোগ-ধ্যানে বসিয়া আড় চোখে কৃষ্ণ-লীলা দেখছিলেন। কেমন করে যে বৃন্দাবনের গোপ পল্লীর কয়েকটী নারী ঠাকুরকে চিনিয়া এই মহালীলার সহায়তা করে ছিলেন ভাবলে বিস্মিত হয়ে যাই। বিশ্বের ঠাকুর কিন্তু ইহাদের কাছেই নিজকে ধরা দিয়াছিলেন। বেদবিৎ-জ্ঞানী-যোগী ইহারা তো সকলেই প্রকৃতি-সঙ্গকে দূরে সরিয়ে দিয়ে গা বাঁচিয়ে জ্ঞান মানুষটীর মত ব্রহ্ম-লোক, গোলোক বৈকুণ্ঠে পলায়নের জন্য চুপে চুপে সুযোগ খুঁজছিলেন—তাঁদের চোখে আড়াল দিয়ে হুই, ঠাকুর সাধের গোলোক বৈকুণ্ঠ ছে বিশ্বের দুর্ভাগ্যের সুযোগে কয়েকটী ব্রজ গোপী যা যে তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন, সেই তত্ত্বের আস্বাদ লাভের জন্য বিশ্ব ব্যাকুলভাবে সমুখের দিকে ছুটেছে দিশে যে এত দুঃখ কষ্ট শত বাধা বিপদ সে তো বৃন্দাবনের তত্ত্বের মধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠিত হইবার জ ছুটাছুটির ফল। বিশ্ব বুঝেছে যে ঐ তত্ত্বের মধ্যে সমাহি হওয়া ছাড়া তার আর বাঁচিবার, শান্তি লাভ করিব উপায় নাই। সেই কোন্ দ্বাপরের শেষে কলি দ্বাপরের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে যমুনা তীরে ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ যে যে প্রেমের বাঁশী বাজিয়ে প্রকৃতিকে মান দেওয়ার কথা প্রকৃতিকে ব্রহ্মের ঘরে আসন দেওয়ার কথা শুনিয়ে ছিলেন—নিজে আচরণ করে শিখিয়েছিলেন, বিশ্ব আজও সে সুর ভুলে নাই, সে দৃশ্য আজও তার মন থে মুছে যায় নি। শ্রীকৃষ্ণের সেই বাঁশীর গানের বাণীর প্রতিষ্ঠা দেখতে যুগে যুগে এসেছেন বুদ্ধ-শঙ্কর-রামানু বল্লভ-শ্রীচৈতন্য-রামকৃষ্ণ ও ঠাকুর নিত্যগোপাল। দি দিকে ঐ শোনো বাঁশী বেজে উঠেছে—ঐ শোনো আ মোহন বেণু রাধা রাধা ডাকে। আজ আর রাধা প্র আর শ্রীগোবিন্দ পুরুষ পৃথক থাকবেন না। আজ এ জড়াজড়ি করে এক হবেন। রাধারাণী সেই পেয়েছিলেন—বঁধুর উঠতে উঠতে শুতে শু সোহাগে জড়ায়ে রং—আজ তাঁর সেই বাসনা সা হবে। আজ প্রকৃতি পুরুষের পার্শ্বে আসন পেয়ে হ্লাদি শক্তিতে পরিণত হবেন, মায়া হবেন আজ যোগমা আজ আনন্দের প্লাবনে বিশ্ব ভেসে ডুবে যাবে।

রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহন।
অন্যথা বিশ্ব মোহোহপি স্বয়ং মদনমোহিত॥

আমরা রাধারাণীকে অস্পৃশ্যা, অশোচ্যা বলে ঘৃণা ব করে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পাশ থেকে সরিয়ে নির্বাসন করে রাখ চেয়েছি—তাতেই ঠাকুর মদনানলে দগ্ধ হয়ে হয়ে বিশ্ব

বন্ধ করে ফেলেছেন। যতই আমরা বিশ্ব সমাজ পরিবার জাতিকে বাদ দিয়ে নারায়ণ সেবা করতে চলেছি, তখনই ঠাকুর নারায়ণ মদন মোহন রূপ লুকিয়ে আমাদের কাছে মদনের মূর্তিতে ধরা দিয়াছেন। যখন জাতি পরিবার সমাজ বিশ্ব সকলকে নারায়ণের পার্শ্বে বসিয়ে স্বরূপে বিশ্বরূপে পূজো করি, সেই পূজোই হয় তাঁর মদন মোহন রূপের পূজা। আমরা যখন বিশ্বের সব কিছু বাদ রেখে নারায়ণ সেবা করতে যাই তখন আমরা মদনেরই সেবা করতে ছুটে যাই। যারা বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের মধ্যে শুধু নারায়ণের ধ্যান করে, তারা বুঝতে পারে না কেমন করে তারা মদনেরই উপাসনা করছে। আবার পরম ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে স্বরূপকে দূরে রেখে বিশ্ব সেবার পথে ছুটেছে যারা তারাও বুঝতে পারে না কেমন করে তারা কামের কবলে পড়বার জন্য ছুটে যাচ্ছে। তাই একই জীবনে স্বরূপ বিশ্বরূপের সামঞ্জস্যপূর্ণ সেবা-উপাসনা। তাহাই জগৎ সেবা, রাধা গোবিন্দ উপাসনা। দোলতত্ত্ব এই রাধা গোবিন্দ উপাসনার দার্শনিক ব্যাখ্যা। রাধার চাইতে গোবিন্দ বা গোবিন্দের বামে রাধা না থাকার যে রূপ তাহা কাম ও মদনের রূপ। আর রাধা-গোবিন্দ, বিশ্ব-ব্রহ্ম, অন্যোন্য-আত্মা প্রকৃতি-পুরুষ যেখানে সমন্বিত, একটী অপরটীর সঙ্গে বিজড়িত—দুইটী মিলিয়া পূর্ণ একটী সেইটীই সেই মদনমোহন বা যোগমায়া তত্ত্ব। ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করলেই দুইটার সামঞ্জস্য মিলে না। দুইটীর নিজস্ব পৃথক স্বাধীন সত্তা স্বীকার করলেই তো সব বিপদ দূর হয়ে যায়। আর বিশ্ব কি নাই, মিথ্যা বল্লেই মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে নাকি? যে সব মায়াবাদী সন্ন্যাসী ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বলে চক্ষু বুজে বসে থাকেন, পেটে জ্বালা ধরলে তাঁরা কি এই মিথ্যা জগতের মিথ্যা সংসারের নিকট চাউল ভিক্ষা করতে আসেন না? কেন? কোন জিনিষকে মিথ্যা বল্লে সে মিথ্যা হয়ে যায় না, আমার জীবনের একটী অঙ্গকৃতির দিকই খুন হয়ে যায়। খুন হয়ে গিয়েও যদি চুকে যেত আপত্তি ছিল না, কিন্তু যেটা খুন হয়ে গিয়েছে ব'লে ধারণা করে আমরা বসে থাকি, অজ্ঞাত সারে আমার জীবনের সেই দিকটীই যে কোন দিন খাই খাই করে উঠবে কে জানে! ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার যোগ করে ব্রহ্মের পার্শ্বে মায়ার আসন দিয়ে মায়াকে রাণী সাজিয়ে গোবিন্দ উজ্জ্বল মধুর যোগমায়া তত্ত্ব বিশ্ববাসীর সম্মুখে ধরিলেন ও কয়েকটী ব্রজ গোপীকে এই লীলা প্রচারের সহায়ক করিয়া বিশ্ব জনের সামনে তাঁহার প্রকৃতির সঙ্গে একাসনে বসিয়া দোল খাওয়ার বার্ত্তা প্রচার করিলেন। ইহাই দোল-লীলার গূঢ় তত্ত্ব। বিশ্ব রাধা গোবিন্দের এই দোল লীলা দেখিবার জন্য উৎকর্ণ ও সজাগ হইয়া আছে। এই দোললীলা যে দিন ভারতের বুকে ঘরে ঘরে অভিনীত হইবে, প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে দিন গাছে গাছে ফুল ফুটে উঠবে, আকাশে চাঁদ উঠবে, ময়ূর ময়ূরী নাচবে, শুক সারী বোল তুলিবে, আবিরে কুমকুমে ভারতের আকাশ বাতাস লাল হয়ে যাবে। ভারতের নদীর নীল জল সেদিন লাল হইয়া যাইবে, সবুজ গাছ পালা আনন্দে শিহরিয়া উঠবে, কূলে কূলে কলনিনাদ উঠবে, প্রেম যমুনা সেদিন রাধা গোবিন্দকে বক্ষে নিয়ে কলস্বরে ছুটবে, জগৎ থেকে কামনা যাবে নিভে—প্রেম ও প্রাণের প্লাবনে সমস্ত জগৎ ভেসে যাবে। জয় জগদীশ হরে—জয় রাধা রাণীর জয়।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(২০)

কৃষ্ণ-বিশ্বাস আর বিশ্ব-বিশ্বাস এই দুটো এক সঙ্গে হলেই প্রতিটি সত্য।…তুমি বলবে মা, আর বলবে মা চক্রান্ত করে জাল ফেলেছেন? কোন্ মা সন্তানকে ধরে ফেলবার জন্য জাল ফেলে?…এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বড় আনন্দে যেখানে সব ওলোটপালট হয়ে যায়, সেখানে আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি জাল ফেলবেন,—এ কি একটা কথা হল? আসলে এই বিশ্বটা তাঁর পাতা ফাঁদ নয়—তাঁর আনন্দ-ক্ষেত্র সেইটে বুঝতে হবে। জেমস্ জিনস্ লিখছেন, 'Old Physics showed us a universe which looked more like a prison than a dwelling place. The new physics shows us a universe which looks as though it might conceivably form a suitable dwelling place for free men, and not a mere shelter for brutes—a home in which it may at least be possible for us to mould events to our desires and live lives of endeavour and achievement'। এতদিন শিখেছি এটা বিদেশ, এটা dwelling place নয়—এটা কৃষ্ণ-বিশ্বাসের কথা নয়। আর শিখতে হবে এ সংসারটা not a mere shelter for brutes, এটাকে endeavour দ্বারা, প্রচেষ্টা দ্বারা নূতন করে গড়ে তোলা যায়, suitable dwelling place for free men করে সৃষ্টি করা যায়। বিশ্বকে কি করে ব্রহ্মলোকে গড়ে তোলা যায়?—বিশ্বাস, বিশ্বাস।…এতদিন বলেছি কেড়ে লও কেড়ে লও আমাকে কাঁদাবে—সবই তো কেড়ে নিয়েছেন—সম্পদ, স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য, সম্মান—সবই তো ভারতবাসীর গিয়েছিল—গোলোকে গেলেই তো হত সোনার চাঁদ গোলোক মেলে নি—কয়েক শ বৎসরের পরাধীনতা অসম্মান দিয়েছিল। এইখানে মর্যাদা দিয়ে জীবন যাপন না করলে গোলোকে যাওয়া যায় না।…পাশ্চাত্য জগৎ ভগবান করে না, কিন্তু সংসারটাকে তারা বিশ্বাস করে তাই তারা গুছিয়ে সংসার করে।…আমরা বিশ্বাস করি না, তাই আমাদের শৃঙ্খলা নাই, কেননা আমরা জগৎটাকেই সত্য বলি না।…সংসারে আমাদের থাকতে হবে এটা ভাবি নি,… চুপচাপ সরে যাব করবার চেষ্টা nonmaterialistic জাত আমরা, আমাদের নেই দলবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে হওয়াকে আমরা পশুবৃত্তি বলে জেনেছি … এতদিন matter dead ছিল কি তাই তাকে re-arrangement করা যায় না বলে জানতাম—আইনস্টাইন বললেন matter living জিনস্ বললেন, এটাকে বদলে বদলযোগ্য করা যায় … স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা যে ভাগবত, divine—এ বললেন কৃষ্ণ—বস্তুতঃ এটা বোঝা নয়, মিথ্যা নয়—ব্যবহার-কৌশলের দোষে মিথ্যা হয়ে গেছে।…জগতে সংসার এতবড় একটা যন্ত্র—এ যন্ত্র চালাবার কৌশল না শিখে তুমি ঢুকবে এর মধ্যে? যে কোন যন্ত্র চালাতে গেলেই তা চালাবার কৌশল আগে শিখতে হয়, আর এত বড় একটা সংসার চালাবার কৌশল না শিখে তুমি সংসার করবে? স্ত্রীপুত্র যা-ই হোক ব্যবহার করবার কৌশল না শিখে ঢুকবে কেন? মাত্রা শিখতে হবে—রাসপঞ্চাধ্যায়ে শুকদেব বলছেন পরীক্ষিতকে, সংসারে ঢুকতে হলে মাত্রা-বোধ চাই। পুরুষোত্তম-জীবন যাপনে এই একটী মাত্র কথা—মাত্রা বোধ। কাম-সম্পর্ক

করে জাগতে হয় সেটা কৃষ্ণ শিখিয়ে গেছেন।

এই কৌশল নূতন করে শেখাবার জন্য নিত্যগোপাল জড় ও অজড় দুইয়ের মিলন আনলেন।...যোগেশ্বর বা ধনুর্দ্ধর—কোন একটা মানুষকে রক্ষা করতে পারবে না—গীতা এই দুইয়ের মিলন-সংবাদ—কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ। সেইটাই morality···শৃঙ্খলা শেখ, কথা কম কও। শৃঙ্খলা ছাড়া কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সম্ভব নয়—এ পথ ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—দুর্গম পথ···। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যাম্ উপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ। ব্রহ্মবিদ্যার উপাসক ভারতবর্ষ অবিদ্যার উপাসক ইংরেজের জুতোর ফিতে খোলে কেন?...ভণ্ডামী সবাপেক্ষা বেশী অপরাধ। সীতাহরণ করা রাবণের ধর্ম্ম—সে জাতে রাক্ষস—কিন্তু সে ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করল কেন?...in spirit কীর্ত্তন আরতি করতে হবে—শুধু form-এ নয়।...টাকা হয় বিলিয়ে দাও, decentralisation-ই কল্কির কথা। এই জীবন-তত্ত্বই নিত্যগোপাল আমার চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, আমাকে বিশ্বাস করিয়েছেন.. পারস্পরিক বিশ্বাস যাতে বাড়ে—তাই-ই ভাগবত ধর্ম···।

৩০. ৯. ৪৬—নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল, আমার প্রাণের প্রাণ, মনের মন, বিশ্বের গুরু, বিশ্বের নাথ—বর্ত্তমান যুগের সকল সমস্যার সমাধান তুমি, তুমিই সমাধান—সমন্বয়-মূর্ত্তি। তুমি সেতু—পরস্পরবিবদমানের মধ্যে তুমি সেতু। তুমি পরিণাক করিয়াছ—যাহারা এতদিন মিশিতে পারে নাই, তোমার মোহন বাহুস্পর্শে তাহাদের তুমি মিলাইয়াছ। তুমি মোহন, তুমি মনোমোহন, তুমি মোহনিয়া, তুমি মদনমোহন, বিশ্বমোহন গোপীমোহন, আমার প্রাণমোহন। জটিলা কুটিলা তোমায় মোহন বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, জীবনের সকল জটিলতা কুটিলতাও তুমি···তুমি সুন্দর, তুমি মনোহর, তুমি বান্ধব—আমার আমার নিত্যগোপাল—সর্ব্বাশ্রিতজনশরণসুহৃৎস্বামী—আমি তোমারই মাঝে মজিব—আমার আমি তোমারই মাঝে মিলাইব...আমার দেহ তোমার দেহ এক হউক, তোমার প্রাণ আমার প্রাণ এক হউক, তোমার মন আমার মন এক হউক, তুমি যাহাতে আনন্দ পাও, তাহাতেই আমার আনন্দ হউক, আমি তোমারই মতন হইব—তুমি যাহা চাও আমার জীবনে, আমি তাহাই হইয়া তোমারই চরণ তলে পড়িয়া রহিব। আমার রাজরাজেশ্বর, আমার ভিখারী রাজা, আমার হৃদয়ের রাজা, আমার নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল···। ধরায় ধূলি হউক ব্রজ-ধূলি, ধরায় মানুষ হউক বিশ্ব-মানুষ।

সন্ধ্যা—ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্ত্তয়ে...। নবনারায়ণ আশ্রম কোন্ পথ ধরে চলবে এ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। পথ ভুল হলে বিপদ অনিবার্য—এ পথ খুব পিচ্ছিল পথ।·· ব্রিজকে বিদেশেও ব্রিজসেতু—এ পার ওপার যোগ করে যে সে সেতু, আইলকেও সেতু বলে। দুটি জমির সীমানায় দাঁড়িয়ে যে দুটো জমিকে দুটো করে রাখে, চিহ্নিত করে রাখে—তাকে আইল বলে—এটাকে কৃষ্ণ ভেঙে দিতে এসেছেন। অর্থাৎ আমার জমি নিয়ে আর তাদের জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি ঘুচিয়ে কেমন করে একই জমিতে সকলে মিলে মিশে থাকতে পারে, সেই ধর্ম্ম কৃষ্ণ এনেছেন। তাই তিনি প্রাণবল্লভ—প্রাণ ভাগাভাগি পছন্দ করে না—দলাদলি প্রাণ চায় না—একত্র থাকব, দুজনের জিনিষের ভাগ না করে চিহ্নিত না করেই একত্র থাকব।···সংসারে পিতাপুত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে আইল বেঁধে দলাদলি করে চলেছে। এতে সময়ে কুলোয় না—অর্থে কুলোয় না—সামর্থ্যে কুলোয় না—পাঁচ ঘর পৃথক পাঁচ বৌ নিয়ে—এই দৈনন্দিনতার আইল ভেঙে দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, সব ভগবানের—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।' ভগবানকে বেদখল করে তুমি তাঁর বিশ্বের থেকে ভাগ করে নিয়ে নিতে চাও?... [illegible] ধারার জন্য তিনি আইল ভেঙে দিলেন। আইল আছে, অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা থাকবে, কিন্তু দুই জন গোপীর মাঝে কৃষ্ণ এবং প্রত্যেকে তাঁকে ধরে আছে···। হাতের সঙ্গে পায়ের ঝগড়া নাই—রক্ত সমস্ত দেহের—শুধু হাতেরও নয়, শুধু পায়েরও নয়। তেমনি জমি বিশ্বের, তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে গেলে তাই তোমার

মরণের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। রাবণ লক্ষ্মীকে ঘরে রাখতে পারল না—রাবণের ঘরে সীতা লক্ষ্মী, কিন্তু রাবণের ঘরে তিনিই লঙ্কা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। প্রাণ ছাড়া এ পথে বাঁচার কেউ নেই—বুদ্ধির ক্ষেত্রে কারো ভাষা কেউ বোঝে না—কিন্তু একটা ভাষা আছে, সেটা প্রাণের ভাষা, ভগবানের ভাষা, সেটা সবাই বুঝবে।...বুদ্ধিমান দল করে বেঁচে থাকতে চায়, বুদ্ধির এই divide and rule বর্তমান জগতে ব্যর্থ হয়ে গেছে—অবশ্য বুদ্ধির একটা চেষ্টা সর্বদাই তাই চালাতে যায় বটে—দুই বিড়ালের ঝগড়ায় বানরের সুবিধার ব্যবস্থা···সমান ভাগ হবে কেউ না-পাওয়ার মধ্য দিয়ে—তাই সাবধান, বুদ্ধিকে সারথী রাখলে এই অবস্থায় পড়তেই হবে—মনোধর্ম, অহংকারের ধর্ম পরিত্যাগ কর...প্রাণ সর্বপ্লবী—নিষেধ করে রাখলে পারে না—রক্ত সারা দেহে ছুটাছুটি করে—এটা প্রাণধর্ম।···যতক্ষণ তুমি একা, তখন তুমি মরলে, যখন তুমি পরিবারের তখন একটু বাঁচলে, যখন তুমি সমাজের তখন আরও খানিকটা বাঁচলে, যখন তুমি বিশ্বের তখন তুমি নিশ্চিন্ত··· একলা বাঁচতে যেয়ো না...প্রাণধর্ম গ্রহণ কর—নরনারায়ণ আশ্রমের ধর্ম প্রাণধর্ম···।

১লা জুলাই ১৯৫৬—১৭ই আষাঢ় ১৩৬৩।···জয় নিত্যগোপাল, ব্রহ্ম-মায়ার সমন্বয়কারী নিত্যগোপাল... বিশ্ব তুমি মানিয়া লইলে ব্রহ্মেরই মত সমান মূল্যে—জীবনের জটিলতা কুটিলতাকে তুমি জড়াইলে ব্রহ্মের সঙ্গে···বঙ্কিম পথে চলিবার কৌশল তুমি আবিষ্কার করিলে···বহু ছাড়িয়া একের ধ্যান দিতে, প্রকৃতি ছাড়িয়া ব্রহ্মের ধ্যান দিতে তুমি আস নাই···তুমি ইহাদের সমন্বয় করিলে...সকল ছাড়িয়া সরল হইবার পথ তুমি দাও নাই··· এতদিন বহুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া একের ধ্যান করিয়া আসিয়াছে—আজিকার পথ বিশ্ব-ধ্যান ও আত্ম-ধ্যান একত্র বুঝিতে হইবে—ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ইহা এক নূতন পথ।···প্রকৃতি বাদ দিলে আপাততঃ বুঝিতে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু তাহাকে যে বাদ দিল, ফাঁকি দিল, সূক্ষ্মতর পথে সে আত্মপ্রকাশ করিবে।...ভগবান বলিলেন জটিলতা আমার সৃষ্টির এক অর্দ্ধেক; আমার সৃষ্টির এক অর্দ্ধেক তুমি লইলে, সেখানেই তুমি মরণের বীজ রোপিলে। সকলকে লইয়া পথ প্রথমতঃ অসুবিধাজনক মনে হয়, কিন্তু সেই পথেই বিশ্বের সকলের সহযোগিতা আশীর্বাদ পাইবে... আমি যে আত্মা···আমি প্রাণে সরল হইব...বুদ্ধির সরলতায় সকলকে বাদ দেওয়ার পথ··· সকলকে লইয়া চলার পথই ব্রহ্ম পথ।...দুর্যোধনকে মেনে নিয়ে, দুর্যোধনের মুখোমুখি হয়ে সেখানে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে···তাই কেউ নেই আমার···প্রাণের পথ is always complex···প্রাণের পথ বঙ্কিম।···তুমি ত্রিভঙ্গ...তিনটি ভঙ্গিতে—দুটো দুষ্ট দর্শনের ত্রিভঙ্গকে মেনে নিয়ে ইহাদের ঐক্য তুমি দিয়াছ—সেইভাবে তুমি ত্রিভঙ্গ।···সকলের স্বার্থকে মেনে নিয়ে নিঃস্বার্থ হওয়ার সংবাদ দিয়াছ···নিত্যগোপাল, আমার জীবনে তোমার আশীর্বাদ সার্থক হউক। জগতের হরি, হরির জগৎ—আবেষ্টনকে বাদ দিয়া কোন সুখ আমি ভোগ করব না—বসনে ভূষণে উৎসবে বিশ্বের সঙ্গে এক হতে হবে··· নিত্যগোপাল, তুমি সেই খোলা খাটটার উপর ব থাকতে, তার উপর মাদুর পর্যন্ত বিছান ছিল না...এক ফোটা পর্যন্ত তুমি সকলকে না দিয়ে খাও নি।···দেহের প্রয়োজন, আত্মার প্রয়োজন যেখানে এক হয়ে যা সেইখানে আমায় নিয়ো—আত্মাকে বাদ দিয়ে দেহ আমি নিতে পারব না, দেহকে বাদ দিয়ে আত্মাও আ মানব না—ত্যাগ ভোগ যেখানে এক আমাকে সেই প দেখাও।···বিশ্বকে আতর মাখিয়ে যদি আতর মাখ পারি, তবেই আতর মাখব, নয়তো সে আতর যেন আ মাখি না···বুদ্ধি নয়ে আমার প্রাণ তোমার মধ্যে জাগ হোক···ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হো ব্রহ্ম-মানুষ···।

ক্রমশ

সমাজ-বিদ্যার কথা

(পূর্বানুবৃত্তি)

।। শ্রীসুবোধ কুমার সেনগুপ্ত ।।

সমাজ-বিদ্যা কি ?

সমাজই ব্যক্তির জীবনের পটভূমি। ব্যক্তির জীবন নানা ভাবে সমাজ-কর্তৃক প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য জীবনকে সুগঠিত করা যেন সেই জীবন নিজেও সুখী হইতে পারে ও পারিপার্শ্বিক সমাজকেও সমৃদ্ধ ও সুষম করিতে পারে। ইহার জন্য সার্থক ভাবে সমাজের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার শিক্ষা প্রয়োজন। আবার শুধু সমাজের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়াই ব্যক্তি-জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না—তাহা হইলে প্রত্যেকে সমাজের যে দোষ ত্রুটি রহিয়াছে তাহা মানিয়া লইবে এবং ফলে সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলি স্থায়িত্ব লাভ করিবে, তাহার সংস্কার ও অগ্রগতি ঘটিবে না। সুতরাং ব্যক্তির সমাজের প্রতি আনুগত্যের সহিত সমাজের প্রতি কল্যাণবোধ ও তাহার সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টাশীলতা থাকাও সুশিক্ষার লক্ষণ। সমাজের দোষ ত্রুটি সংশোধন করিতে হইলে সেই দোষগুলির স্বরূপ, তাহার উদ্ভবের হেতু ও তাহা সংশোধনের সুষ্ঠু উপায়গুলি জানা প্রয়োজন এবং সংস্কারকের সংস্কার ক্ষমতার পরিমাণ বিষয়ে সচেতনতাও প্রয়োজন। তাহা না হইলে সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে ও ঐ ব্যর্থ প্রচেষ্টা ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের মধ্যে অহেতুক তিক্ততা ও হতাশা আনিবে। সুতরাং শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত—সমাজকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করিবার ক্ষমতা প্রদান। সমাজ-বিদ্যা এই বিষয়ক জ্ঞান।

সমাজ পরিবর্তনশীল সজীব পদার্থ। দেশ ও কালে ইহা পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। তাই সমাজ সম্বন্ধে সঠিক ধারণালাভের জন্য ইহার সহিত বাস্তব পরিচিতি প্রয়োজন। এই বাস্তব পরিচিতি লাভের জন্য সমাজের বাহিরে অবস্থান করিয়া পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নহে—কারণ সমাজের একজন হইয়া তবেই সমাজকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। তাই সমাজ-বিদ্যা নিছক পুঁথিগত বিদ্যা হিসাবে অর্জন করা সম্ভব নহে—সক্রিয় ভাবেই ইহা অর্জন করিতে হয়।

সমাজ-বিদ্যার সমধর্মী অন্যান্য জ্ঞান ও তাহাদের সহিত সমাজ বিদ্যার সম্পর্ক—

ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলির সহিত সমাজ বিদ্যার গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে—কিন্তু তথাপি সমাজ-বিদ্যা ঐ-গুলির সমষ্টি মনে করিলে ভুল হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে—সমাজ-বিদ্যা বাস্তবাশ্রয়ী ও প্রয়োগধর্মী জ্ঞান। উপরোক্ত বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানাশ্রয়ী তত্ত্বধর্মী জ্ঞান। সমাজ বিদ্যা উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি শিক্ষার্থীর অনুরাগ ও আগ্রহ বৃদ্ধির সহায়ক হয় ও বিষয়গুলির বিষয় বস্তু অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট ও প্রাণবন্ত করিয়া তোলে। সেই জন্য সমাজ-বিদ্যা উপরোক্ত বিষয়গুলির সহায়ক জ্ঞান রূপে গণ্য হইবার যোগ্য। আবার কোনও সমাজকে সঠিক ভাবে জানিতে হইলে সেই সমাজের পশ্চাৎভূমি ভাল ভাবে জানা দরকার অর্থাৎ তাহার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমি জানা প্রয়োজন। তাই ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান সমাজ-বিদ্যার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। মানুষ লইয়া সমাজ এবং মানুষ একটি পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিতেছে। নৃতত্ত্ব এই এই পরিবর্তন সমূহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝিতে সহায়তা করে। তাই নৃতত্ত্বও সমাজ-বিদ্যার সহায়ক বিষয়। সমাজ-তত্ত্ব নৃবিজ্ঞানের একটি বিশেষ দিক-- নৃতত্ত্বের সহিত ইহার গভীর সম্পর্ক। তাই সমাজ-তত্ত্ব সমাজ-বিদ্যার একটি অত্যন্ত সহায়ক বিষয়। কিন্তু সমাজ-তত্ত্ব আর সমাজ-বিদ্যা

এক বিষয় নহে। সমাজ-তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক তত্ত্ব-প্রধান বিষয়। ইহা বিভিন্ন স্থানের ও কালের সমাজ-ব্যবস্থা হইতে সাধারণ বিধি নির্দ্ধারণের গুরুত্ব প্রদান করে—বিশেষ সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ঐ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যার সহায়ক রূপেও গণ্য করে। কিন্তু সমাজ-বিদ্যা ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহকে অধিকতর প্রয়োজনশীল দৃষ্টিতে অনুধাবন করে ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়া অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইবার প্রচেষ্টা করে। তাই সমাজ-বিদ্যা সমাজ তত্ত্বের মত তত্ত্ব প্রধান নহে—ইহা প্রয়োগ প্রধান। অবশ্য সমাজ-তত্ত্বের জ্ঞান সমাজ-পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিকাশ সহায়ক হয় এবং সমাজ-বিদ্যা সমাজ-তত্ত্বকে অধিকতর বাস্তবধর্ম্মী করে। সুতরাং বিষয় দুই পরস্পরের অনুপূরক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় হিসাবে সমাজ-বিদ্যা প্রবর্ত্তনের যৌক্তিকতা—

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে বয়সের শিশুরা আসে সেই বয়সে তাহাদের সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাভাবিক কৌতূহলের উদ্রেক হয়। তাহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে যদি বিষয়টির সঠিক জ্ঞান আহরণে সুযোগ লাভ করে, তাহা হইলে ঐ কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া আনন্দও যেমন পাইবে, সমাজকে সঠিক আলোকে দেখিতে শিখিয়া সমাজের সৎ নাগরিকের ভূমিকা গ্রহণের যোগ্যতাও তেমনি লাভ করিবে। কিন্তু বিদ্যালয়ে শুদ্ধ পদ্ধতিতে সঠিক জ্ঞান না পাইলে তাহারা অন্য অনভিপ্রেত স্থান হইতে সমাজ বিষয়ে বিকৃত জ্ঞান লাভ করিবে ও সমাজের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্যে সচেতন না হইয়া সমাজের প্রতি অনভিপ্রেত মনোভাব ও আচরণ করিতে শিখিবে। বর্ত্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি, ভিন্ন গোষ্ঠী ও অঞ্চলের লোকের প্রতি বিরূপ ধারণা ও মনোভাব, সমাজের সমস্যা সমূহের প্রতি অনবহিতি ও সহানুভূতি হীনতা, সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন উৎকৃষ্ট কার্য্যক্রমের প্রতি অবহেলা ও অসহযোগিতা দৃষ্ট হয়। ইহার প্রধান কারণ তাঁহাদের সমাজের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে অবহিতির অভাব এবং এই অভাবের জন্য দায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় সমাজ-বিদ্যার অনুপস্থিতি। তাই বর্ত্তমানে প্রগতিশীল দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে সমাজ-বিদ্যাকে অবশ্য পঠনীয় করা হইয়াছে। সেই ধারা অনুসারে আমাদের দেশেও সমাজ-বিদ্যাকে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিভুক্ত করা হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়।

সমাজ-বিদ্যা শিখিবার শিক্ষার্থীর যে শুধু সমাজ সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টি-ভঙ্গী ও কর্ত্তব্য চেতনার বিকাশই হইবে তাহা নহে। সমাজ-বিদ্যা শিখিতে গিয়া শিক্ষার্থী ইতিহাস ভূগোল নৃতত্ত্ব সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইবে এবং ঐ প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলি যে কত সহায়ক তাহা বুঝিতে পারিয়া ঐ বিষয়গুলির প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিবে। শুধু তাহাই নহে ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলি নিছক পুঁথিগত ভাবে শিখিলে ঐ শিক্ষা বাস্তব ভিত্তিক না হওয়ায় শিক্ষার্থীর ধারণা অস্পষ্ট থাকিয়া যায়—অনেক বিদ্যাই মুখস্থ বিদ্যা মাত্র থাকে। কিন্তু সমাজ-বিদ্যা শিখিবার সময় শিক্ষার্থী নিজ যে সব বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমস্যার সম্মুখীন হইবে তাহার অনেকগুলিই ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞানকে অধিকতর বাস্তব ভিত্তি প্রদান করে—তাই ঐ বিষয়গুলির ধারণা সুস্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যোগায়।

বর্ত্তমানে শিক্ষা অত্যন্ত বেশী বিষয়াক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রতিটি বিষয় অন্যান্য বিষয়ের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু বিষয়গুলি জীবনের বাস্তব পটভূমি হইতে গৃহীত বলিয়া তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ বিচ্ছিন্ন নহে। একটি বিষয়ের সহিত অন্যান্য অনেকগুলি বিষয়ের যোগ আছে। যেমন ইতিহাসের প্রকৃত জ্ঞানের জন্য ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রয়োজন এবং ভূগোল বুঝিতে হইলে বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের সমাজ কাঠামো অর্থনীতি প্রভৃতিও বুঝিতে হয় অথচ ইতিহাস ভূগোল সমাজ-তত্ত্ব পৌর-বিজ্ঞান অর্থ

বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্তমানে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক ভাবেই শেখানো হয়। ইহার জন্য অনেক সময়েই এক বিষয়ের জ্ঞানের অপূর্ণতা অন্য বিষয়ের জ্ঞানকেও পঙ্গু করে। সকল বিষয়ের জ্ঞান পাইলেও তাহারা কোনও একটি মিলন-ভূমির অভাবে সংশ্লেষিত হইবার সুযোগ পায় না; সেই জ্ঞানগুলি জীবনের বহু বহু ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে না পারিয়া শুধু তথ্য তত্ত্বের ভার মাত্র হইয়া থাকে। সমাজ-বিদ্যা বিষয়টি ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয় সমূহের জ্ঞানের সংশ্লেষণ ঘটাইয়া জীবনকে জীবন্ত ও প্রয়োগ ধর্মী করিয়া তুলিবে।

সমাজ বিদ্যার পাঠ্যক্রম কিরূপ হইবে ?—

পূর্বের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে সমাজ-বিদ্যা পুঁথিগতজ্ঞান মাত্র নহে, ইহা জীবন্ত সমাজের বাস্তব ঘটনার সহিত বুদ্ধি ও কর্মগত সংযুক্তি। কিন্তু ইহাকে শুধুই সমাজের সহিত সাক্ষাৎ পরিচিতি মনে করিলেও ভুল হইবে। সমাজের ঘটনাগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করিবার জন্য যথেষ্ট তাত্ত্বিক জ্ঞানেরও অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং সমাজ-বিদ্যায় একাধারে বাস্তব সমাজ-সত্তার সহিত পরিচিতি ও তাহার সহিত সক্রিয় সংযুক্তির যেমন প্রয়োজন রহিয়াছে তেমনিই ঐ ঘটনা সমূহের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য নানা তথ্য ও তত্ত্বের প্রয়োজন রহিয়াছে। সর্বোপরি এই দুই ধরণের শিক্ষাধারার বিচ্ছিন্ন অগ্রগতির পরিবর্তে উভয়ের সাঙ্গীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে।

সামাজিক ঘটনা ও সমস্যাগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীগণ দুই ভাবে লাভ করিতে পারেন—এক পর্যবেক্ষক হিসাবে, দুই সক্রিয় সম্পর্ক-স্থাপনের মধ্য দিয়া। এই দুইটি পাঠ্যক্রমে রাখা প্রয়োজন। অবশ্য নিছক পর্যবেক্ষণের অপেক্ষা অল্প অথবা অধিক ভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণই শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসেবে গণ্য হইবার যোগ্য। যেমন কোনও উৎসবানুষ্ঠান খেলা প্রভৃতিতে গিয়া নিছক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা অপেক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান অথবা খেলা বা উৎসবানুষ্ঠানটির উন্নতি সাধন করিবার উদ্দেশ্য তাহার বিভিন্ন দিকগুলির তথ্যানুসন্ধান করিতে যাওয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে অধিকতর আগ্রহের সৃষ্টি করিবে এবং তাহাদের পর্যবেক্ষণও অধিকতর গভীরতা লাভ করিবে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে শুধু পর্যবেক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। তবে ঐরূপ পর্যবেক্ষণের পূর্বে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য ও পর্যবেক্ষণ লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলি চয়ন ও তালিকাভুক্ত করণের জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক পূর্ব-প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। এই জন্য পর্যবেক্ষণের পূর্বে শিক্ষকের সহিত আলোচনা ও নানা পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষার্থীকে মন প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে এবং সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা করিতে হইবে। সক্রিয় অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে তো পরিকল্পনার অধিকতর প্রয়োজন হইবে। পর্যবেক্ষণ অথবা সক্রিয় অংশ গ্রহণ কালে যে সব তথ্য সংগৃহীত হইবে সেইগুলিকে বিশ্লেষণ পূর্বক তাহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার মধ্যে দিয়া তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভিত্তি রচিত হইবে। এই জন্য সমাজ-বিদ্যার পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর সমাজ পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই রচনা করিতে হইবে। যে সব সামাজিক অভিজ্ঞতা সমস্যা ও কাজ-কর্ম সেই অঞ্চলের শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ-লভ্য, সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাঠ্যক্রম রচিত করিতে হইবে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া এই ভাবে তাত্ত্বিক শিক্ষার বিষয়গুলিকে সাজাইয়া যে শিক্ষাক্রম রচিত হয় তাহাকে বলা হয় পরিবেশমুখী শিক্ষাক্রম। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সহিত তাহাদের গ্রহণ ক্ষমতা ও দৃষ্টি ভঙ্গী যতই বিকাশ লাভ করিবে ততই একই ধরণের ঘটনা বা সমস্যাকে আরো গভীরতর তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভিত্তিরূপে ইহাতে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং সমাজ-বিদ্যার শিক্ষা-সূচিকে খানিকটা স্থিতিস্থাপক রূপ দেওয়া প্রয়োজন—যেন বিশেষ পরিবেশের বাস্তব সমাজ অভিজ্ঞতা ও সমস্যাবলীকেই তাত্ত্বিক শিক্ষার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার সুযোগ থাকে। অবশ্য এইরূপ স্থিতিস্থাপকতার মধ্যেও কিছু মূলগত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে অপরিবর্তনীয় অবশ্য শিক্ষণীয় রূপে গ্রহণ করার প্রয়োজন থাকিবে এবং শিক্ষক ঐগুলি শিক্ষা দিবার জন্য যতদূর পারেন বাস্তব অভিজ্ঞতা চেষ্টা করিয়া

খুঁজিয়া লইবেন অথবা ঐগুলি শিক্ষা দিবার ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়াই অন্য উপযুক্ত পদ্ধতির অনুসন্ধান করিবেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা উচিত যে যদিও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শিক্ষাক্রমে সমাজ-বিদ্যার উপযোগিতার কথা বলা হইয়াছে—তথাপি ইহার আরম্ভ প্রাথমিক শিক্ষা-স্তর হইতেই হওয়া উচিত—এবং প্রাথমিক স্তরে সমাজ-বিদ্যার শিক্ষা বাস্তব ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। সুখের বিষয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সমাজ-বিদ্যাকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়—এবং এখানে সমাজ-বিদ্যাকে একটি পৃথক বিষয় হিসেবে না দেখিয়া সমাজকে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসাবেই গণ্য করা যায়। ইহাতে শিশুরা সমাজ-পর্যবেক্ষণ ও সমাজের সহিত সক্রিয় সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়া শুধু সমাজ সংক্রান্ত জ্ঞানই নহে, নানা মৌলিক জ্ঞান ও আচার আচরণ রুচি-বোধ সহযোগিতা সৌন্দর্যবোধ সেবাপরায়ণতা ন্যায়বোধ প্রভৃতির শিক্ষালাভ করে। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়া যে শিশু যাইবে তাহার পক্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সমাজ-বিদ্যার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকিবে ও তাহার পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলি এই বিষয় শিক্ষায় অত্যন্ত সহায়ক হইবে।

জয় নিত্যগোপাল

॥ শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ ॥

মৈত্রী করুণার মূর্ত্ত রূপেতে
হইলে উদয় ভবে।
সাধনা তোমার,—প্রেম ভালবাসা
সার্থক হইয়া রবে ॥
মানব সেবায় ধর্ম্ম প্রচারি
তব চিত্ত সুমহান্
নব কল্যাণ কীর্ত্তি রাখিতে
হয়েছিল আগুয়ান।
প্রেম ও সেবা মানবের চিতে
দিয়াছ দীক্ষা বিশ্বের হিতে
জ্ঞান ও ধর্ম্মে জন কল্যাণে
করেছ সমন্বয়।
জড় ও জীবের আত্মার মিলন
শিক্ষা ও সেবায় প্রেম আলিঙ্গন
দিব্যজ্যোতির মহান বিকাশে
ঘুচাইলে সংশয়।
জড় ও জীবের প্রকৃতি মাঝারে
ঘটালে সমন্বয়।
পুরুষ-প্রকৃতি—যুগল মূর্ত্তির
তুমি যে সমন্বয়।
ধর্ম্ম কর্ম্মের সাম্য বাঁধনে
জ্ঞানের আলোকে চিত্ত গগনে
দিব্য যে পরিচয়
উচ্চ-নীচের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া
ধনী-নির্ধনে ঐক্য গড়িয়া
আনিলে সমন্বয়।
প্রেমের প্রসার সবার মানসে
সমাজ-সেবায় অকুণ্ঠ প্রয়াসে
ধর্ম্ম নিষ্ঠা বিবিধ বিধানে
(তোমার) শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫১—

(২৫)

সকাল ৮।০টার পর রেণু আসিয়া ডাক্তারের কাছে ফোন করে। ডাক্তার আগের ওষুধ আরও দুই দিন খাইতে বলে। ৪০০ পত্রিকা ও স্কুল কলেজগুলির সং রেণু একটা রিক্সা করিয়া পোষ্টাফিসে দিয়া আসে। সেখান হইতে হৃষীকেশ বাবুদের ওখান হইতে কাগজ কেনে। কাগজ বাসন্তী বাইণ্ডিং-এ পাঠাইয়া দিয়া আসে। সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেক লইয়া অমল হোম, মন্মথবাবুদের পত্রিকা দিয়া, গভর্ণমেন্টের বিল দিয়া ১টার পর বাসায় আসে। খাইয়াই এখানে আসে।...পত্রিকাগুলি এইরূপ শেষ করিয়া ৪টার পর রেণু ও প্রতিভা রিক্সা করিয়া ৫টার পূর্ব্বে এখানে আসে। আজ শরীরের অবস্থা মোটের উপর ভাল। রেণু সন্ধ্যার পর অফিসে যায়।... এখানে আমাকে দিয়া ইহাদের কোনও প্রয়োজন নাই। আমারও নাই। অথচ কয়েকটী মানুষের জন্য আমি এখনও প্রয়োজনীয় এবং তাহাদের দিয়াও আমার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহাদের নিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে নামা আমার পক্ষে সম্ভব। যতদিন পর্য্যন্ত ভাবিতাম আমার দ্বারা ইহাদের বিন্দুমাত্র কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, ততদিন ছিলাম, আমার এখানের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। নূতন করিয়া আবার যাত্রা সুরু করিতে হইবে। আমাকে দিয়া বিশ্বের প্রয়োজন আছে আজও বিশ্বাস করি। বিশ্ব লইয়াই থাকিব। তার পর যদি ইহাদের পক্ষে আমি আবার কোনও দিন প্রয়োজনীয় হই, তখন ইহারাই আমার কাছে যাইবে। তখন পাইতে পারিব। ইহার পূর্ব্বে নয়।...

১লা অক্টোবর

...শরীরটা একরূপ চলিতেছে। প্রেসারে কিছুটা উদ্বেগ আছে। সন্তোষ অধিকারী আসে। তাহাকে দিয়া 'যো মাং জয়তি সংগ্রামে' প্রবন্ধটি পড়াইয়া শুনি।... চতুর্দ্দিকের ঘটনা যেরূপ জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে স্বতন্ত্র স্থান করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও সম্মানজনক ও অগ্রগতি-যুক্ত পথ নাই। আমার মতে গীতার অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের সঙ্গে পার্থক্য কোথায় তাহার তুলনামূলক প্রবন্ধ লেখা প্রয়োজন। লিখিব ভাবিতেছি। একটী মানুষ প্রাণ দিয়া খাটিলে কতদূর খাটিতে পারে, কতখানি কর্ম্মশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারে, রেণুর দিকে চাহিলে তাহা মনে হয়। কর্ম্ম না করিয়া মানুষ যে কত শক্তির অপচয় করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রেণুর শরীর ভাল থাকিলে আরও চতুর্গুণ খাটিতে পারিত।...

২রা অক্টোবর

...প্রতিভাকে বলি—সারাজীবন আমি শরণাগত হইতেই চাহিয়াছি। স্ত্রী পুত্র কন্যার ভিতর স্থান খুঁজিয়াছি। তাহাদের ভিতর দিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়াছি। আমার ভিতরে কাহাকেও ঢুকিবার কথা বলি নাই, আমিই তাহাদের মধ্যে ঢুকিতে চাহিয়াছি। 'আজ আমি তোমাদের শরণাগত'—আমি প্রতিভার হাত ধরিয়া বলি। আমার সকল দায়িত্ব বহন করিবে তো? হয় তো আমি রাগ করিব। কিন্তু আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসি ইহা মনে রাখিও। আমি কাহারও অনাদর করি নাই। তোমাদেরও করিব না। 'তুমি, রেণু, নীলু একদেহ, এক প্রাণ হইয়া থাকিও। শরীরের কোনও এক অঙ্গে কাঁটা বিঁধিলে যেমন অপর অঙ্গ উহুঁ করিয়া উঠে,

তোমাদের যেন তেমন হয়। রক্ষাব্যূহ রচনা করিও। 'শিশু-শিক্ষায় কবির স্থান' প্রবন্ধটি প্রতিভাকে দিয়া পড়াইয়া শুনি।

৩রা অক্টোবর

অনেক দিন পর আজি সকালে ঠাকুর ঘরে বসি। ৯টায় বরিশালের সুধীর সেন আসে, ১ ঘণ্টা থাকে। তাহার সঙ্গে বরিশালের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ তাহার আলোচনা হয়।···তাহারও তো অপেক্ষায় চলি নাই। আমার জন্ত মানুষ খাটে, আমার জন্য আমার কাছে মানুষ আসে, ইহা আমার ভাল লাগে না। কিছুদিন এই ভাবে গেলে ডাকিয়াও কাহাকে পাইব না। নিজের মধ্যে নিজে থাকাই শান্তি। বেণু মাখনবাবুকে লইয়া এস্প্ল্যানেড ইস্টে পত্রিকা দিবার কথা বলে। তাহার এত কাজ, আমার শরীরের এই অবস্থা, যতটুকু সময় সে পায়, ততটুকু সময় আমার কাছে থাকিলে আমি একটু শান্তি পাই।···যতীন দাশগুপ্ত গতকাল আসিয়াছিল, সে বলিয়াছে, এবারের পত্রিকা কিছু হয় নাই। এত বিজ্ঞাপন পাওয়া এই পত্রিকার পক্ষে অন্যায়। আগামী মাসে আর পাওয়া যাইবে না। প্রতিভা মন্মথ রায়ের লেখা ভাঙা-গড়া আগাগোড়া পড়িয়া শুনায়। বেশ লাগিল। সুদর্শনার অশুচি বলিয়া প্রণাম না-করার কথা, শ্রীকৃষ্ণও বলিলেন, আমিও প্রণাম পাইবার যোগ্য নই, আমিও তো তোমাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। বেশ হইয়াছে।

৪ঠা অক্টোবর

সকালে বেণু আসে, ডাক্তারের নিকট ফোন করে।··· কলিকাতা হিন্দুস্থান, ইস্টরেলওয়ে, বাথগেট হইয়া ঔষধ লইয়া ৬টার পূর্বে আসে।···

৫ই অক্টোবর

আজ অধিবাসের প্রার্থনা হয়। অধিকার দিয়া বাস করাইবার দিন আজ। মাকে, পরাপ্রকৃতিকে সকল অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে, সেখানে বাস করিতে দিতে হইবে। তিনি দুর্গা, পুরুষোত্তমগতি প্রদায়িনী। অধিবাস হইতেছে 'প্রস্তুতি'। যাহা-কিছু তিন দিন বসিয়া করিতে হইবে, তাহার জন্ত আগেই প্রস্তুত হইতে হইবে। সব কিছুরই অধিবাস আছে—বিবাহেও। বেণু বেলা হইলে আসে। ১২টার পর অমল হোমের কাছে যায়।···

৬ই অক্টোবর

আজ মধুকৈটভ বিনাশিনী মহাকালীর পূজা। মধু কৈটভ অর্থাৎ সকল স্থূল ও সকল সূক্ষ্ম দেহ হইতে নবীন পৃথিবী সৃষ্টি হউক, মা, তোমার আবির্ভাবে। তুমি বিপ্লব-মূর্তি; তোমার পদাঘাতে সকল জীর্ণ বর্ণ, জীর্ণ আধার নব রূপে গড়িয়া উঠুক। সারা জীবন তোমার ঐ বিপ্লবের সেবা করিয়া আসিয়াছি। কিছু পরেই বেণু আসে।···-কে বেশ শান্ত ভাবে সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, রাস্তায় মেয়েরা বাহির হইয়া আজ বিপন্ন ঘরের রক্ষাব্যূহ তাহারা ছাড়িয়াছে, পুরুষদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। নরনারীর সহজ আকর্ষণ আছেই; নরনারী সামলাইবে কি করিয়া যদি না তাহাদের জীবনে পুরুষোত্তম প্রকাশিত হন। বাহির হইয়া কেমন করিয়া নিরাপদে ঘরে ফিরিয়া যায়, তাহারই experiment আমি করিতেছি।···যেদিন কোন মেয়ে রাস্তায় বাহির হইল, সেই দিনই সে impersonal।···আজ বৈকালে প্রভাবের উদ্বেগ বাড়ে।—

৭ই অক্টোবর

আজ সঙ্ঘ-স্বরূপিনী মহালক্ষ্মীর পূজা। সকল পরিবার, সকল সমাজ, সকল রাষ্ট্র, সকল বিশ্ব মহালক্ষ্মী পাদস্পর্শে নবীনরূপে উদ্ভাসিত হউক, দিকে দিকে পুরুষোত্তম-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠুক, আমার সঙ্ঘ-জীবন সার্থক হউক। সঙ্ঘ গড়িবার জন্ত সারা জীবন প্রাণপাত করিয়াছি। পারি নাই। আমার আকাঙ্ক্ষা সফল কর দিব্য সঙ্ঘ গড়িয়া তোল। প্রার্থনার কিছু পরেই বেণু আসে। আজ সকালে ব্রহ্মসূত্রের ঈশকেনোপনিষদ

সূত্রটী বেণু পড়ে। আমি মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করি। প্রতিভাও ছিল।…সন্ধ্যার পর 'তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ' সূত্র পাঠ হয়।…মানুষের প্রতীক্ষায় সারা জীবন কাটাইয়াছি। মানিয়া বুঝিব, না বুঝিয়া মানিব? এতদিন মানিয়া বুঝিয়াছে, আজ মানুষ বুঝিয়া মানিতে চায়। সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া মানা বা বুঝা কোনটাতেই শেষ সমাধান হইবে না। চাই গুরু নিজে যুগল হইয়া মানা বা বুঝা। তাহাতে মানাও হয়, বুঝাও বজায় থাকে—অর্দ্ধ নারীশ্বর। মানা বা বুঝা তো পৃথক পৃথক ব্যাপার নয়, একটা সমগ্র সত্তার দুই দিক মাত্র। গুরুর দৃষ্টি যখন ব্যাপক, তিনি যখন স্নেহশীল, মর্য্যাদাদাতা, আমার বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করাই যখন তাঁহার ব্রত, তখন কেন আমি তাঁহাকে মানিয়া বুঝিব না? পাশে গিয়া দাঁড়াইলে মানা ও বুঝা এক সঙ্গে সম্ভব হয়। 'পুরুষোত্তমোঽহমস্মি'।…অভাবের সাধনার কথা আলোচনা হয়। দাঁত থাকিবার কালীন দাঁত না থাকায় সাধনা গ্রহণ করিতে হয়।…

৮ই অক্টোবর

আজ শুম্ভনিশুম্ভ বিঘাতিনী মহাসরস্বতীর পূজা। সকল 'অহং'-কে, মধ্য-পতিতকে দিয়া পুরুষোত্তমোঽহং-এ গড়িয়া তুলিবার সাধনা এই পূজায়। বেণু আসে ৭টার পর। ব্রহ্মসূত্র পাঠ হয়। ১১টার পর যায়।…বিমলবাবু চাকুলিয়া হইতে আসে।…আগামী ১১ই বেণু ৮॥০টার পর চাকুলিয়া যাইবে ধীরেনবাবু ও বিমলাকে সঙ্গে করিয়া সেলিমপুরের সেই বাসা দেখিতে।…'অভাবের সাধনা'। কোনও বস্তু বর্ত্তমান থাকিতে তাহার অভাবে কি কি পরিণতি ঘটিবে ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে থাকা কালীন সম্বন্ধ যথারূপে পরিচালিত হয় না। কেননা, কোনও বস্তুর থাকা ও না-থাকা যুগপৎ সত্য। প্রত্যেক বস্তু যে নশ্বর। আমি বর্ত্তমান না থাকিলে বেণুর উপর চতুর্দ্দিক হইতে কতখানি চাপ পড়িবে, ইহা বুঝিলে তবে না বর্ত্তমানে পথ চলার ধারা স্থির হইবে? চলিয়া যাওয়ার পর উপলব্ধি করিলে তখন আর কি ফল হইবে? —আজ-কে সময়মত অর্থাৎ ১২টার পূর্ব্বে স্নান করিতে বলে…। দুর্ভাবনাবোধ দেরীতে হইলেও শুভ লক্ষণ। দুর্ভাবনা আনিতে গিয়াই তো আমার এই অবস্থা।…

৯ই অক্টোবর

আজ বিজয়া। অপরা প্রকৃতিকে পরা প্রকৃতিতে গড়িয়া তুলিয়া মা দুর্গা, তুমি বিজয়া। আজ দেহ প্রাণ মন বিজ্ঞান ও আনন্দ সচ্চিদানন্দ তত্ত্বতে গড়িয়া তুলিয়া তুমি বিজয়া। প্রার্থনা বেশ ভাল লাগিল, 'বেহবৎস প্রযুক্ত' ইত্যাদিও পাঠ করি। প্রার্থনার পর দেখি বরিশালের হরপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তি বসিয়া আছেন। তিনি আমার ঘরে আসেন, আধঘণ্টা মত থাকেন। বেণু ১২টার পর যায়। ব্রহ্মসূত্র পাঠ হয়। বৈকালেও পাঠ হয়।…দুর্গা সম্বন্ধে প্রণতি মালতী ও সুধাংশুর কাছে আলোচনা হয়। আমার সারা জীবন শ্রীদুর্গাকে কেন্দ্র করিয়া। তিনিই আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার কৃপায়ই শ্রীকৃষ্ণ পাইয়াছি, যেমন ব্রজগোপীরা পাইয়াছিলেন। ঠাকুর ঘরে যাইয়া আলোচনা করি শিবের সংসার আমি করিতে চাহিয়াছি, সঙ্ঘ গড়িতে চাহিয়াছি, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত চাহিব। তিন পুত্র, তিন বধু, এক কন্যা ও জামাতা লইয়া চলিয়াছিলাম। জামাতা খসিয়া পড়িল। তবুও 'we are seven'-এর মত চলিব। নীহার আশ্রমেই থাকিবে। আমি তাহার সেবা ভুলিব না। বেণু রসগোল্লা ও অমৃতী নিয়া আসে। এই পয়সা খরচের জন্য তিরস্কার করি। সে আর আমাকে উহা না দিয়া—কে দিয়াছে। আমি তো খাইব না বলি নাই। এই দিনে (বিজয়া) এক জনে কিছু আনিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে কি দুঃখ হয় আমি জানি। সুরেনের ঘি-ভাতও তো খাইয়াছিলাম। আমাকে না দিয়া—কে খাওয়ানো আর উপর মহা অবিচার। বরং পচিয়া যাইত, তবুও আমার জিনিষ আর কাহাকেও দিবার অধিকার নাই। প্রণতির একটী সন্দেশ তো খাইয়াছিলাম। বেণুরও খাইতাম। কিন্তু গোলমালে ভুলিয়া গিয়াছি।… বেণু ১০টার পর এখানে আসে।…

১০ই অক্টোবর

…বেণু ব্রহ্মসূত্র পাঠ আরম্ভ করে। আমি ব্যাখ্যা করি। বেণু ৮-৪০-এ ডাকুরিয়া চলিয়া যায়।…পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বর্তমান যুগের একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া আলোচনা করা হয়। 'বিক্রীড়িতং ব্রহ্মবৃত্তিঃ' শ্লোকটী শেষে আস্বাদিত হয়। চোখের জলেই ব্যাখ্যা হয়।…উদ্বেগ বাড়ে। বাম দিকের কিডনীর ওখানটায় নড়িলে চড়িলে উঠিতে বসিতে একটা বেদনা বোধ হয়। ডাক্তারকে ফোনে জানান হয়। গরম জলের সেক দিতে বলেন। যতীনবাবু আসেন প্রায় ৭টায়। তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হয়। তাঁহাকে বিশেষ ভাবে বাড়ী দেখিতে বলা হয়।…

১১ই অক্টোবর

…ব্রহ্মসূত্র পাঠ আরম্ভ হয়।…কমলাকে বালীগঞ্জের সরোজনলিনী বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কথা বলি। আর এখানে সপ্তাহে ২ দিন আসিয়া বেণু বা আমার কাছে পড়া দেখিয়া নিতে বলি।…আজ উদ্বেগটা বেশী। নরেনবাবু আসেন। প্রায় ১০টা থাকেন। 'জনসঙ্ঘে' যোগ দিয়াছেন বলিলেন। বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কংগ্রেসের সঙ্গে fight দিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কম্যুনিজম যাহাতে সব অধিকার করিবার সুযোগ না পায়, তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে বলি।…

১২ই অক্টোবর

বেণু সকালে আসে। 'বাধাচ্চ নানুমানাপেক্ষ' সূত্রটী পড়ে। একটি দুইটী সূত্র রোজ পড়িলেও বৎসরে পুস্তক শেষ হয়। আলোচনা হয় কামের দিব্য রূপ সম্বন্ধে।…নীলু আমাকে ফল খাইবার জন্য ৫৲ টাকা পাঠাইয়াছে…কত অসুবিধার মধ্য দিয়া নীলু এই টাকা পাঠায়। নিতে বেদনাও বোধ করি, আনন্দও পাই। ঠাকুর, তুমি সাক্ষী থাকিও। আমার জন্য যে যাহা কিছু করে, তাহা যেন ছাইয়ে ঘি-ঢালা মত হয় না। সার্থক হউক, বেণু ২৫৲ টাকার উপর, হেমাঙ্গবাবু ২।৩ বার অনেক ফল, প্রণতি মালতী ২বার, বকুলা ১বার, সুধাংশু ৫৲ টাকা, মনু ১০৲ টাকা, হরিদাসী ১৲ (প্রতি মাসে ৫৲), প্রতিভা কিছু, মাখনবাবু ৫৲ টাকা, ধীরেনবাবু কিছু ফল—কত মানুষ করিতেছে। সত্যব্রত ডাক্তার বাবদ ১৬৲ টাকা দিয়াছে। এখানে তো রোজই দই, দুধ খরচ হইতেছে। যাহার কিছু নাই, তাহাকে এমন করিয়া পরের জন্য কেন দুয়ারে দুয়ারে ঘুরাইবে? কাহারও তো কিছু নাই। আমার জন্য ইহারা যেন বিপন্ন না হয়। দেখিও ঠাকুর, আমি রাজরাজেশ্বরীর সন্তান, ভিখারী নই। কোথায় ডাক্তার খুঁজিব?…প্রায় সন্ধ্যায় ধীরেনবাবু আসেন মায়ের বানানো কিছু মিষ্টি লইয়া। ধীরেন চৌধুরীও আসে। অনেক কথা হয়। প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড দেখাইব ভাবিয়াছিলাম। কথায় কথায় ভুলিয়া গেলাম। ইহারাও কেহ স্মরণ করিল না। সকলেই ভাবুক।…

১৩ই অক্টোবর

…এর নাকি কলা খাইলেই বমি হয়। কিন্তু আজ খাওয়াইলাম, বমি তো হয় নাই। উহা সংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। খাওয়াদাওয়ায় সহজ হওয়া ভাল। আমি সেই ছাগ শিশু ও কুকুরের ব্যাপারটা বলি। তারপর ব্রহ্মসূত্র পাঠ হয়, 'অস্মিন্ অস্য চ তদ্যোগং শাস্তি' ও পরের সূত্রটী পাঠ হয়।…আমি ও প্রতিভা ৭টায় আফিসে যাই—কত দিন পর। আজ প্রস্রাবটা অনেক সহজ হইয়াছে। মায়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। আফিস হইতে ৮টায় ফিরি।…বাহির তো হইতেই হইবে, নচেৎ কাজ তো কিছুতেই গুছানো ও আগাইয়া নেওয়া সম্ভব হইবে না। 'রেশনিং ও কালো বাজার' প্রবন্ধটীর সংস্কার করি। প্রতিভা 'ভাঙাগড়া' নকল করিতেছে।…বেণুকে বিশ্রাম দিয়া কাজ করিতে বলা হইল; একনাগাড়ে কাজ করিলে উহার খাড়া শরীর সামলাইতে পারে না।…বিশ্রাম করিয়া করিয়া শ্রম করিবে—তবেই শরীর ঠিক থাকিবে। তাহার উপরই তো সব নির্ভর। তাহার শরীর রক্ষা করিতেই হইবে।

১৪ই অক্টোবর

…হেমাঙ্গবাবু 'শেষপ্রশ্ন' (বেণুর লেখা) পড়িয়াছেন

তিনি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। লিখিবার সময় শরৎচন্দ্রের মনে ছিল কিনা সন্দেহ। তবে এইরূপ ব্যাখ্যা যে উহার হয়, ইহাও নিঃসন্দেহ। 'ঘরে-বাইরে'র সমালোচনাও রবীন্দ্রনাথ পড়িয়া খুশী হইতেন।···তাহার পর ব্রহ্মসূত্র পাঠ হয়—'ভেদব্যপদেশাচ্চ অন্যঃ' ও পরের সূত্রটী।···

১৫ই অক্টোবর

গত ৪টা হইতে ঠাকুর ঘরে বসিয়া আসিতেছি। রেণু ৭।০টার পর আসে। ব্রহ্মসূত্র হইতে ৫টি সূত্র পাঠ হয়। ইহার পর পোস্টাফিস ও ব্যাঙ্ক হইয়া বার্মা শেলে যায়।···

১৬ই অক্টোবর

রেণু ৮টায় আসে। ব্রহ্মসূত্র পাঠ হয়—'ভূতাদিপাদ' ইত্যাদি ৫টা সূত্র।

১৭ই অক্টোবর

...আজ প্রথম অধ্যায়ের ১ম পাদ সমাপ্ত হয়। রেণু... কলিকাতা যায় ১০ টার পর। সুনীল দাস পার্ক ষ্ট্রিটে বাড়ীর কথা বলে······আমার বাহির হওয়া ছাড়া উপায় নাই। এখানে আমার গর্ভ-যন্ত্রণা। অথচ আমি তো দলের মানুষ নই। ইহাদিগকে নিয়া ঠাকুরের সেবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। শেষ পর্যন্ত ইহাদের মধ্যে থাকিয়াই পারিব, ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু ইহারা যে পারিল না, বসিয়া পড়িল। অনেকদিন পূর্বেই অবশ্য ইহা তাহারা জানাইয়াছিল। তবুও শেষ চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার যে বসিয়া পড়িলে চলিবে না, আগাইতে হইবে। ঠাকুর আমাকে বসিতে দিলেন কই? রেণু প্রতিভাদের সঙ্গে বাহির হইব। শেষ পর্য্যন্ত ইহারাও ছাড়িয়া যাইবে না তো? ঠাকুর জানেন, আর জানে ইহারা। আমি বাহির হইব ঠাকুরের শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া। অন্ধকারে বরাবরই তো ঝাঁপ দিয়াছি, ডুবিয়া তো যাই নাই। আলো, পথ পাইয়াছি। আজও পাইব। আফিস হইতে ৬টার পূর্ব্বে আসি।...

১৮ই অক্টোবর

সকাল ৭টার মধ্যে রেণু আসে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ আরম্ভ হয়—'সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ' সূত্রটীই আলোচিত হয়। আবার ১টার পরই রেণু আসে।...মাখনবাবু আসে। বিকালেই যতীশ দাশগুপ্ত আসে।···বাড়ী ভাড়ার কথা রেণু মাখনবাবুকে বলে। আমার কাছে উহার উল্লেখ করায় আমি উজ্জল ভারত সম্বন্ধে তাহার সেবার উল্লেখ করি। আমার পুত্রেরা যাহা করে নাই, সে তাহা করিয়াছে।...মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিলাম ১০০৲ টাকা বাড়ী ভাড়া দিলেও সর্ব্বসাকুল্যে খরচ ৪৫০।৪৭৫৲ এর বেশী হয় না। যতদূর মনে হয় এই বৎসর ঐ টাকাই পাওয়া গিয়াছে। আর কিছু চেষ্টা করিলে নীলু আসার পর উৎরাইয়া যাইব সন্দেহ নাই। হিসাবের মধ্যেই প্রায় পাওয়া যায়। বেহিসাবী হিসাব তো আছেই। ৮টায় ফিরি।···

১৯শে অক্টোবর

রেণু আজ সকালেই আসে। ব্রহ্মসূত্রের 'বিবক্ষিত গুণোপপত্তেশ্চ' সূত্রটী পাঠ হয়। এখান হইতে কলিকাতা হিন্দুস্থান ও ন্যাশনাল ইনসিওরেন্সে···। অদ্য সকালে তাহার সঙ্গে বাড়ী দেখিতে যাওয়ার কথা ছিল।··কৃষ্ণনগর হইতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবে। কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হইয়া কংগ্রেসকে হটাইয়া দিলে কম্যুনিষ্ট পার্টিকেই পথ করিয়া দেওয়া হইবে কিনা ইহা একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি। যাহারা চিরদিন অন্যায়ভাবে কংগ্রেসকে বিপন্ন করিতে চাহিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে হাত মিলাইবার নৈতিক অধিকার আছে কিনা ভাবিয়া দেখা উচিত। ইলেকশনে জেতা বা কংগ্রেসকে হারানোটা বড় কথা নয়। বড় কথা 'সত্য' যাহা, তাহাই করা। এই পথে এ দেশে ইংরেজ আসিয়াছে। আবারও সেই পথ?...সুহৃৎবাবু ও কনক আসে।···মনোরঞ্জনবাবু আসে।...মাখনবাবু আসে।···এখান হইতে অসন্তোষ বা ঝগড়া লইয়া বাহির হইয়া যাওয়া কোনও রকমে সঙ্গত নয়, নিত্যব্রতকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া তাহার যাওয়ার কোন অধিকার নাই। তাহার সম্বল নাই,

সাধুদেরও যদি পড়িয়া যায় তাহার কি আশ্রয় থাকিবে? ১০টায় শুই …

২০শে অক্টোবর

বেণু সকালেই আসে। ব্রহ্মসূত্র পাঠ হয়—'অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ'—সূত্র ১।২।৩।…লিউই-ডানের 'এশিয়া' পত্রিকায় গান্ধীজী সম্বন্ধে লেখা (যাহা অমৃত বাজার পত্রিকায় বাহির হইয়াছে) পড়িয়া শুনান। লেখাটী বেশ। রবিবার ধর্মালোচনা, সোম হইতে শনি পর্যন্ত 'বিষয়'—জীবনের এইরূপ ভাগাভাগি চলে না। 'ন তু পৃথগ্ ব্যাপার এব করণীয়ঃ'—আলোচনা হয়। বিশ্বরূপ ও স্বরূপের সমন্বয়েই সত্য। স্ত্রীর পক্ষে ভোর হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত স্বামীর বিশ্বরূপের সেবা, ৯টার পর যখন 'সর্বভূতানাং নিশা' তখন স্বরূপের সেবা। এইরূপ চক্রাকারে সেবা অনাদি অনন্ত চলিবে। বিশ্বনাথের সেবা ঠিক ঠিক করিলে কষ্টসাধ্য ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ধ্যান সমাধি আপনি আসে। প্রকৃতির বুক চিরিয়া ধ্যানের পথে সমাধি আনা যে কি ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। সমস্ত প্রকৃতি তখন বাধা দেয় বিপরীত দিক হইতে। প্রকৃতি যে মানুষের organic এই মহা তত্ত্ব ইহার মধ্যে অস্বীকৃত হইয়াছে। 'জয়শ্রী' হইতে অতীনবাবু লিখিত 'সমন্বয়'টি ধীরেনবাবু পড়েন, মাখনবাবু উপস্থিত ছিলেন।…

২১শে অক্টোবর

…ব্রহ্মসূত্র পাঠ করে।…যতীনবাবু আসেন, তাঁহার লেখা ও ছাপা-হওয়া 'বাপজী' গ্রন্থটী দেন, সমালোচনা লিখিতে বলেন। তাঁহার প্রচেষ্টার একটা বর্তমান যুগের উপযোগিতা আছে। তাঁহার লেখার ভিতরে প্রজ্ঞা ও প্রাণধর্মের সমন্বয় আছে। তাঁহার লেখা প্রাণধর্মকে কেন্দ্র করিয়া।…

২২শে অক্টোবর

…ব্রহ্মসূত্রের 'সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ' ইত্যাদি কয়েকটী সূত্রের আজ পাঠ ও আলোচনা হয়। যেগুলি ছিল 'বিপু', তাহাই পুরুষোত্তমদর্শন ও জীবনে অদ্বৈতবাদের ঘনীভূত আস্বাদন। কাম দুইয়ের ভিতর মোহবশতঃ পার্থক্য করিয়া ঝগড়া। কিন্তু সেই কাম যখন পরস্পরের মধ্যে অদ্বৈতানুভূতি শুধু আনিয়াই দেয় না, বরং তাহাকে আরও জমাইয়া তোলে, তখনই তাহা হয় প্রেমের কাম। ক্রোধাদি সম্বন্ধেও ইহা। বেণু 'মনে মনে এক কবি মানি'-র উপর কার্তিক দাসের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করে। প্রচলিত ধ্যানে আছে বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক আনিয়া ভিতরে যাওয়া ও মন স্থির করা। কিন্তু বর্তমানের activity method বলে, মনকে খেলা দিয়া স্থির করা; বাহিরের সঙ্গে অন্তরের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া যে ধ্যান, তাহাই প্রেমের ধ্যান। তাই ব্রহ্মোপাসীগণ যোগেশ্বরদের মত শুধু হৃদয়েই ধ্যান চান নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন বহির্জগৎকে পরিপাক করিয়া ধ্যান।…কিছু পরে অরুণ (নন্দী) এখান হইতে আফিসে যায়। তাহার সঙ্গে আবার অনুভব সম্বন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক সাহিত্যিকদের পার্থক্য কোথায়, তাহার আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, মেঘ দেখিয়া ময়ূরের মত তাঁহার হৃদয় নাচে। আধুনিকরা মেঘ দেখিয়া উদ্বাস্তুদের দুর্দশার কথা ভাবেন। রবীন্দ্রনাথ romantic; কিন্তু আধুনিকরা যখন সাঁওতাল রমণীর বর্ণনায় বিভোর, তখনও তাহা রোমান্টিক-ই হয়। যাহা রবীন্দ্রনাথের যুগে ছিল real, আজ তাহা রোমান্টিক; যে যুগের যে attitude, তাহা লইয়া যে আলোচনা, তাহাই তখনকার real।…দশগ্রামের গোপাল দাস অধিকারী সেখানে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য আমাকে যাইতে অনুরোধ করিয়া লোক পাঠায় ও চিঠি দেয়। বর্তমানে সম্ভব নয় বলি।

২৩শে অক্টোবর

…ব্রহ্মসূত্রের 'বিশেষণাচ্চ' সূত্রটী পাঠ হয়।…বিধু কমলা বুক ডিপো, মণিবাবু, ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন, জেনারেল প্রিন্টার্স, পরে প্রেস হইয়া প্রায় ৬টায় বেণু ফেরে।…বিধু একটা ঘরের খোঁজ দিয়াছে…।

২৪শে অক্টোবর

…'অন্তর উপপত্তেঃ' (১।২।১৩) সূত্রটী পাঠ ও আলোচনা হয়।…রামচন্দ্রের হয় গোটা অযোধ্যা পাওয়া নয় গোটা হারানো ছাড়া গতি নাই।…বিরাটের ক্ষেত্রে কোনও কাজ না রাখিয়া ছোট ক্ষেত্রে ঢুকিলে ইহাই হয়। ভগবান গোলোকে থাকিয়াই জগতে থাকেন। তাই তিনি অমর।…কাল সকালে সুনীল দাসের কথামত বাড়ী দেখিতে যাইবে তাহাকে সঙ্গে লইয়া। প্রতিভাও যাইবে। 'আমি বৃন্দাবন ভালবাসি; তোমরা বৃন্দাবন রচনা করিয়া রাখিও। আমি সেখানে বিহার করিব। আমাকে আবদ্ধ রাখিও। দেখিও আমার যেন আর বাহির হইবার কথাও মনে না হয়। আমি বড় শ্রান্ত, তাপিত'—ইহা উঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছি।…

২৫শে অক্টোবর

…২টার পর ব্রহ্মসূত্র পাঠ হয়।…অমলদিদির স্থানে আমরা গেলে চলিবে না, তাহাতে সকলকে নিয়া অসুবিধায় পড়িতে পারি। ইহারাও আমাকে নিয়া বিপন্ন হইতে পারে। যেমন তেমন করিয়া যেখানে সেখানে জড়াজড়ি করিয়া থাকা আমাদের পক্ষে মানায় না। জীবনে পিছনে তো সরি নাই।…যেখানে মানুষ freely চলিতে পারে, গায়ে গা না লাগাইয়া চলিতে পারে, তেমন জায়গাতেই যাইতে হইবে। এখন ছোট জায়গায় গেলে বিপন্ন হইতে পারি। এদিকেই একটা ঘর দেখিতে বলি।…

২৬শে অক্টোবর

…জিতেন গুহ ও সুনীল দত্ত আসে। সোমবার অশ্বিনীবাবুর তিরোভাবে শ্মশানের আলোচনা সভায় যোগদানের কথা বলে। তাহাদিগকে ব্রহ্মসূত্রের কিয়দংশ পড়িতে দেওয়া হয়—Whitehead-এর It is as true to say অংশটী। আমাদের বক্তব্য বলি। জিতেনকে তাহার লাইব্রেরীর জন্য একখানি ব্রহ্মসূত্র কিনিতে সুনীল দত্ত বলে, আমিও বলি। রেণু ব্যাঙ্ক, পোষ্টাফিস, সি সি কোং, আর্যস্থান, বাগচী বাইণ্ডিং, প্রেস ঘুরিয়া এখানে আসে প্রায় ৩টায়।…তরুণ শঙ্কর ভাদুড়ী (যে 'সমগ্র দৃষ্টি' পড়িবার জন্য নিয়াছিল, উহার সমালোচনা করিবে বলিয়াছিল) আসে, ১ ঘণ্টার বেশী থাকে। তাহার সঙ্গে নানা আলোচনা হয়। মাধববাবু আসেন।

২৭শে অক্টোবর

…ব্রহ্মসূত্রের 'অন্তর্যামী' সূত্রটী পাঠ হয়।.. র কিছু নিশ্চিত অবস্থা না থাকায় তাহার সঙ্গে কোনও আলোচনা করিয়া লাভ নাই। সে কিছু স্থির করিয়া বলিতে বা করিতে পারিবে না। সব তাহার অনিশ্চিত। আমার ঘরের কথাও বলিলাম। কুঠিঘাটার ঐ পারে মাসিক ৫০৲ টাকায় বড় ২টী কোঠা পাওয়া যাইতে পারে। দেখিতে বলিলাম। রেণু খেয়া পার হইতেও রাজী আছে।…কি জানি কেন হঠাৎ দেবেন্দ্র দাসগুপ্ত আসিয়া হাজির। কিছুক্ষণ থাকার পর চলিয়া যায়। তাহার কাছে ব্রহ্মসূত্র হইতে Whitehead-এর 'It it as true'—অংশ পড়িয়া শুনাই। ব্রহ্মসূত্র কেনার কথাও বলি।…চুণী মিত্রের লেখা বই হইতে 'Maya' প্রবন্ধটী আমি কিছুটা পড়ি। বাকীটা রেণু শুনায়।…

২৮শে অক্টোবর

অশ্বিনীকুমার ও মহীম শিশুদেবের তিরোভাব দিবস …বেশ বৃষ্টি। কেওড়াতলার সভা আরম্ভ হইতে পারে নাই। সেখানে সতীন গুহ, অতীন চক্রবর্তী, সুনীল দত্ত, জিতেন গুহ, ধনেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কিছু পরে বৃষ্টির মধ্যেই আসি।…

২৯শে অক্টোবর

…ব্রহ্মসূত্রের 'অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ'—সূত্র পর্যন্ত পাঠ ও আলোচনা হয়। যতদিন পর্যন্ত পুরুষোত্তম-মানুষ না আসে, ততদিন পর্যন্ত রাধার মত চক্ষু মুদিয়া থাকাই তো কর্তব্য, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিরোধই তো সার্থক, সেই মানুষ আসিলেও কি হাত পা গুটাইয়া থাকিতে হইবে? তাঁহার সহিত তো প্রাণ খুলিয়া কথা বলা যায়,

সকল কিছু খুলিয়া, আবরণমুক্ত করিয়া যেখানো সার্থক হয়।…তিনি যখন আসিবেন, তখন যেন সঙ্কোচ না আসে, জড়তা না আসে। যেমু নলিনী মজুমদার এখানে …বাজারে ইউনিয়নে, বীরুর দোকানে…প্রেসে…।

৩০শে অক্টোবর

…হেমন্তবাবু আসেন বলা গোসাঞী আসেন। কিছু পরেই যান। ব্রহ্মসূত্রের 'অপোপক্ষাদাৎ চ' (১।২।১৩) সূত্রটি ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে বৈশ্বানর বিদ্যার অংশও পাঠ হয়। আদর্শ ও প্রয়োজন—truth-in-itself এবং truth-for-us এই দুইয়ের সমন্বয়ই তো জীবন। এই জীবন লাভ করিতে হইলে এই সব পথের কাঁটা তো নিজেই হইবে, উৎরাইতেও হইবে। নিছক আদর্শবাদ তো পুরুষোত্তমে নাই, তবে এই পথে চলিতে যতখানি শরণাগতি, আত্ম বিলুপ্তি প্রয়োজন, ততখানি না থাকিলে এ পথে বিপদ আসিবে। তবে বাহিরের কোনও বাধেই যোগ দেওয়া চলিবে না, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। আমার বিশ্বাসের কোনও প্রশ্ন উঠে না। বিশ্বাস করি বলিয়াই এই বিপজ্জনক পথে চলিবার কথা বলি। কিন্তু যে চলিবে তাহার তো পরিপূর্ণ আত্মসত্তা আমার উপর থাকা চাই। প্রশ্ন শুধু সেইখানে। কর্মক্ষেত্রে বিশ্বাস আসে পথ চলিবার ছন্দ ও ফল দেখিয়া।…আমি জীবের মত কথা কাটাকাটির পথে অনভিজ্ঞ, আমি চাই আর স্নেহের প্রলেপ এমন লোকদের কাছে যাহারা আমার হাতের মার খাইয়াও হাসিতে পারে। 'দেও দুঃখ দেও তাপ সকলি সহিব আমি, তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী'। দুঃখ যখন জীবনের আস্বাদন হয় তখন তাহা সহা যায়। ভগবান এক হাতে মৃত্যু অপর হাতে অমৃত দেন।…

৩১শে অক্টোবর

…ব্রহ্মসূত্রের 'স্মর্যমাণং' ও 'শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ' (১।২।২৬) সূত্র ২টী পাঠ হয়। পাঠের পরেই মাখনবাবু আসে। জীবন পথে চলিতে গেলে, ঘটনাকে আয়ত্তে আনিতে হইলে কখনও কর্ম, কখনও জ্ঞান, কখনও বা ভক্তির প্রয়োজন হয়। মহাপ্রভু গদাধরের সঙ্গে আলোচনা কালে 'প্রাণ টানে কি করি কি করি' বাক্যদ্বারা ব্যথার প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পথে আনিলেন, যুক্তি বিচার দ্বারা নয়। কোনও একটী পথই একান্ত ভাবে কার্যকরী হয় না।…

১লা নভেম্বর

…পাঠের মধ্যেই মহেন্দ্র দত্ত ও শ্রীপতিবাবু আসেন। ব্রাহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ৮॥০টার পর মহেন্দ্র আসিয়া বিদায় করিয়া নিয়া যাইবে। আলোচনা ভাল লাগে। মৃত্যু আনন্দ-প্রদায়ী। নচিকেতা মৃত্যুর কাছ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান বর নিয়াছিলেন, আর অর্জুনও মৃত্যুর সামনে দাঁড়াইয়া আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া ছিলেন, তাই প্রাতে কঠোপনিষৎ ও গীতা পাঠ হয়।…মধ্যে নারী ভাব ও পুরুষভাব সমভাবে জাগ্রত হইয়াছে, কিন্তু এখনও সামঞ্জস্য হয় নাই। সামঞ্জস্য হইলে তাহারা বড় হইবে। যখন আমি কিছু বলি, তখন তাহাদের নারীর মত শুনিতে হয়। আমার তিরস্কার সহিয়া যাইতে হয় যেমন শিশুদের অত্যাচার মা তৃপ্তির সহিত সহ্য করে। আবার যখন আমি মান করিয়া কিছু খাইতে না চাই, তখন সরিয়া না দাঁড়াইয়া আমাকে নানা রকম করিয়া খাওয়ানো যায়। পুরুষ পুরুষ থাকিয়া নারী হইবে, নারী নারী থাকিয়া পুরুষ হইবে। কাহারও স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পর ধর্ম আপন করা উচিত না। স্বধর্মই বল হইলে সবল হয়। যখন পুরুষ হওয়া দরকার, তখন পুরুষ, আর যখন নারী হওয়া প্রয়োজন, তখন নারীই হইতে হয়।…

৩রা নভেম্বর

নিত্যগোপাল-প্রশস্তি

জয় জয় জয় নিত্যগোপাল হে যুগ-সূর্য জয়।
অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব অবধূত হে জয় জয়
মহামিলনের বাণী সুমহান,
ধরার মাঝারে করে গেলে দান,
চির শাশ্বত সে অমৃতবাণী সর্ব্ব সমন্বয়
জয় জয় জয় হে মহাজীবন অবধূত হে জয় জয়।

কর্ম্ম জ্ঞানের ভেদের দ্বন্দ্ব করে গেলে সমাধান,
সর্ব জাতির মিলনে বিশ্ব হল মহা গরীয়ান।
মহাযোগী মহা সমন্বয়ে তব
লভিল বিশ্ব জ্ঞান অভিনব;
তব অখণ্ড মিলন বীণায় ধ্বনি জাগে মধুময়
জয় জয় জয় হে মহাজীবন অবধূত হে জয় জয়॥

বিশ্ব তোমার মহামঠ, তুমি বিশ্ব-নাগরিক,
গৃহী সন্ন্যাসী তোমাতে অভেদ তুমি যে সার্বত্রিক;
সব বিপরীতে মিলে গেছে আজ,
জাগিছে বিশ্বে প্রাণের সমাজ,
ব্রহ্ম আমি জগৎ আমি আমি যে সর্বময়
জয় জয় জয় হে মহাজীবন অবধূত হে জয় জয়॥

তত্ত্ব মূর্ত্তিরে

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

এই জগৎ মিথ্যা ও মায়া এই চিন্তা ধারায় পুষ্ট মন আমার শ্রীনিত্যগোপালের চরণ তলে আসিয়া কেমন করিয়া কখন বদলাইয়া গেল ভাবিয়া অবাক হইয়া যাই। এখন শুধু ভাবি কি আশ্চর্য্য এই জগৎ! আরও আশ্চর্য্য এই জগতের স্রষ্টা। এই সৃষ্টি এবং স্রষ্টার কথা যখন ভাবি তখনই আমার আমি-র অহংকার হইয়া পড়ে শিথিল। কে আমি? কি আমার যোগ্যতা! আমি যে স্রষ্টার শিশু সন্তান, আমার সামনে বিশ্ব রহস্যের পুঁথির পাতা যতই কালের হাওয়ায় উল্টাইয়া যাইতেছে, ততই শিশু আমি মুগ্ধ নয়নে তাকাইয়া ভাবিতেছি কোথায় ইহার শেষ? কে গড়িল এই মধুর অপূর্ব সৃষ্টি? এই জগতের হাসি কান্না বিরহ মিলন ইহার ভিতর কি যে এক আবেশ রহিয়াছে, মধুরতা রহিয়াছে ভাবিয়া পাই না। জন্ম মৃত্যুর আসা যাওয়ার খেলা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি তবু তো এই সুন্দর জগৎ ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। প্রতিনিয়তই মনে হয় ইহার নূতন নূতন রূপ দেখি, এই সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার মুখ দেখি, স্রষ্টার সৃষ্টি-তত্ত্ব আস্বাদন করি। যাহারা আমার জীবনে এই মধুরতার আস্বাদন আনিয়া দিয়াছেন, এই সৃষ্টি-তত্ত্বের অপূর্ব মিলনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া মানব জীবনের সার্থকতার পথে ডাক দিয়া গিয়াছেন, সেই পুরুষোত্তমানন্দ ও তত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপালকে আমার সকল সত্তা নিংড়াইয়া দিয়া প্রণাম জানাইতেছি।

জড়াজড় সমস্যা ছোট একটি কথা শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়া গেলেন, কিন্তু ইহার ভিতর রহিয়া গিয়াছে বিশ্ব রহস্যের সমস্ত তত্ত্ব। সেই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীনিত্যগোপালকে বলিয়া গেলেন তত্ত্বমূর্ত্তিরে ভক্ত ভগবন্তে। শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন তত্ত্ব মূর্ত্তি। জড়দেহধারী ভক্ত এবং অখণ্ড চৈতন্যের সমন্বয় বিধান হইয়াছিল সেই জীবন খানিতে। ভক্তরূপী ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন সকল আড়ম্বর মুক্ত সহজ সরল মানুষ ভগবান। তাঁহারই কৃপায় তাঁহাকে যে ভালবাসিতে পারিবে তাহার জীবনেই এই বিশ্ব রহস্যের গভীর তত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। তিনি ছিলেন একখানি মূর্ত্ত প্রাণ-বিগ্রহ। আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন সেই প্রাণ-সাধনা। আড়াই বৎসর বয়সে যে পুরুষের নির্বিকল্প সমাধি হইয়াছিল, যিনি জীবনের অধিকাংশ সময়ই সমাধিস্থ অবস্থায় কাটাইয়াছেন, তিনিই আবার এই জগতের প্রত্যেক ঘটনায়, প্রতি বস্তুর ক্রম-মূল্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সকল প্রকার মানুষকে কেমন করিয়া সাদরে কাছে টানিয়া লইয়াছেন, সবার প্রতি ছিল তাঁহার কি মধুর ভালবাসা। তাঁহার শিষ্য দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) একদিন তাঁহাকে বলিলেন আমি আর উঁহাদের সহিত থাকিতে পারি না (দানীবাবুর অমৃত নামে একটি দাস বিধবা রক্ষিতা ছিল এবং তাহার একটি মেয়েও হইয়াছিল)। দানী বাবুর কথা শুনিয়া নিত্যগোপাল বলিলেন, দানী, সে কি হয়, উঁহাদের দেখিবে কে? কি মহান প্রাণের পরিচয়! কি তাঁহার সাহস! কি তাঁহার প্রাণ। ইহা কোন মহাপুরুষে সম্ভব নয়, তিনি অবতার বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে। তিনি অমৃতকে কোলে করিয়াছেন, তাহার হাতে খাইয়াছেন। জগন্নী মঠে এক দিন ছানার পোলোয়া হইবে। তাঁহার শিষ্য শরৎ কুমার ঘোষ ছানা খান না। নিত্যগোপাল তাঁহার এক শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন— চুনি, আজ ছানার পোলোয়া হইবে, শরৎ যে ছানা খায় না, কি হইবে? চুনি বলিলেন, আমি শরৎকে বলিব যে সে যদি না খায় আপনি কষ্ট পাইবেন, ইহা জানিলেই সে খাইবে। সত্যই একথা শুনিয়া শরৎকুমার বলিয়াছিলেন ঠাকুর যেন কষ্ট না পান আমি ছানার পোলোয়া খাইব।

এই ছোট ঘটনাটির ভিতর দিয়া বুঝা গেল, কি মায়ের প্রাণ লইয়া তিনি শিষ্যদিগকে ভালবাসিতেন। শরৎকুমার একবার হুগলী মঠে আসিয়া আর যাইতে চান না। শ্রীনিত্যগোপাল বলেন—সে কি হয়, তোমার মনে তো আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, তুমি না গেলে অপরাধ হইবে। আর একবার হুগলী মঠে শরৎকুমারের বাবার অসুখ বলিয়া বাড়ী হইতে পত্র আসে, তবু তিনি যান না, নিত্যগোপাল এক শিষ্যকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন শরতের বাবার অসুখ সে এখানে বসিয়া কি করে? আর যদি সে না যায় তাহাকে যেন মঠ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তিনি এমনি করিয়া এই সংসারের প্রত্যেকের, প্রত্যেক সম্পর্কের মূল্য প্রদান করিবার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এক ভক্তের একদিন বারনারীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই ঠাকুরের কথা মনে পড়ে। ঠাকুর অমৃতি খাইতে ভালবাসিতেন, সেই বাড়ীর সেই কাপড়েই এক ঠোঙা অমৃতি কিনিয়া হুগলী মঠে নিত্যগোপালের দরজায় আসিয়া বলিলেন, আসিব? ঠাকুর ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলে তিনি বলিলেন আমি বেশ্যা বাড়ীর কাপড় পরিয়া আসিয়াছি ঘরে কি ঢুকিব? তখন ঠাকুরের মুখ একটু গম্ভীর হইল, তবু তিনি তাহাকে ঢুকিতে বলিলেন। ঠাকুর অপর শিষ্যকে অমৃতির ঠোঙা লইতে বলায় তিনি ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া নিত্যগোপাল নিজেই ঠোঙা হইতে একখানি অমৃতি লইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি শুচি অশুচি কিছুই দেখিলেন না; তিনি দেখিলেন ভক্তের অমৃতি খাওয়াইবার আকাঙ্ক্ষা এবং দুষ্কর্ম করিয়া বলিবার মত সৎ সাহস। বলাবাহুল্য, সেই দিনের পর আর কখনও বারনারীর বাড়ী যাইবার প্রবৃত্তি হয় নাই।

"কাশীধামে প্রিয়নাথবাবু নিত্যগোপালকে বন্ধুর মত ভাল বাসিতেন। এক জন সমাধিস্থ পুরুষ যে আবার বন্ধু হইতে পারেন, ইহা নিত্যগোপালকে দেখিয়া জানিলাম। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে দরদ, যে দৃষ্টি, বন্ধুর দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে বন্ধুর যে কর্ত্তব্য, প্রিয়নাথ সম্বন্ধে নিত্যগোপালের সেই দৃষ্টি সেই দরদ ছিল এবং এমন ভাবেই ছিল যাহা কোন সংসারের বন্ধুর নিকট হইতে কেহ পাইবার আশা করিতে পারেন না। প্রিয়বাবুর সংসার কষ্টে চলিত। একদিন নিত্যগোপাল তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে প্রিয়বাবু যেন ঠাকুরের কাছে একটা কাঠের বাক্স রাখেন এবং যখন যাহা উপার্জ্জন করিবেন তাহা যেন তাঁহার কাছে আনিয়া দেন, প্রিয়বাবু দরকার মত চাহিয়া লইবেন—কখনও হিসাব চাহিতে পারিবেন না। বহু ঘটনার মত এই ছোট্ট ঘটনাটির মধ্যে এক সঙ্গে নিত্যগোপালের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বন্ধুর প্রয়োজনকে তিনি বুঝিতে পারেন, সে প্রয়োজনকে মিটাইবার জন্য নিজের বিভূতিকেও প্রয়োগ করেন। একজন সমাধিস্থ পুরুষের পক্ষে ইহা যে কী অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব কথা—তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে বিরাট প্রাণের প্রয়োজন হয়।"

"এই মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন মানুষটীর দৃষ্টি সব দিকে ছিল। প্রমথবাবুর মাথা গরম, তাঁহাকে বাতাসার সরবৎ দিতে বলিলেন, কোন ভক্তের স্ত্রীর কাপড় নাই—তাঁহার জন্য কাপড় দিয়া দিলেন। একদিন এক ভক্ত হুগলী হইতে চলিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর সে সময় ভাবস্থ ছিলেন। ভক্তটী আশ্রম হইতে চলিয়া আসিবার কিছু পরেই ঠাকুর আত্মস্থ হইয়া সেই ভক্তটীর নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সাথে তাহার পথে খাওয়ার জন্য কিছু দেওয়া হইয়াছে কিনা। হয় নাই জানিয়া দুঃখ পাইলেন, তখনই কিছু খাবার আর একজন ভক্তকে দিয়া ষ্টীমার ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। ষ্টীমার তখন ছাড়ে ছাড়ে—কোনমতে খাবারটা ভক্তের নিকট পৌঁছান সম্ভব হইয়াছিল।"

এই প্রাণের স্পর্শকণাটুকু যাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে এবং জুটিবে তাহার জীবনেই বিশ্বের শুভ প্রকাশিত হইবে, ইহাই জীবন দিয়া পুরুষোত্তমানন্দ আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল তত্ত্বমূর্ত্তি। তাঁহার তত্ত্ব না জানিলে তাঁহাকে জানা হইবে না, তাঁহাকে তত্ত্বতঃ না জানিলে সত্যিকার ভালবাসাও যাইবে না। তিনি বলিয়া গেলেন "এই বিশ্বই আমার মহামঠ", "আমি বিশ

নাগরিক। এই বিশ্বের বুকেই যে বিশ্বনাথের নিত্য খেলা ঘর, নিত্য স্থিতি ভূমি, এই জগৎই যে জগন্নাথকে বুকে ধারণ করিয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই বিশ্বরূপ তাঁহার কৃপায় না বুঝিলে এই জড় জগৎ তো মধুর হইবে না, জড়ের বুকে অজড়ের আস্বাদনও সম্ভব হইবে না। আবার তিনিই বলিয়াছেন "এই সংসার অতি ভীষণ স্থান"। এই সংসার তো সত্যই ভীষণ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিয়াছেন—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। সংসারের তত্ত্বটি জানিয়া সংসার করার কৌশলটি শিখিয়া লইয়া তবে সংসার করিতে হইবে। সংসারী লোকের চাইতেও সংসার গুছাইয়া প্রত্যেকটি বস্তুর ঠিক মূল্য দিয়া সংসার করিতে হইবে কিন্তু কোন কিছুতে আসক্তি অর্থাৎ আটকা পড়িবে না। ইহাই অবধূতের চলার পথ। এই তত্ত্বই দিবার জন্য পুরুষোত্তম নিত্যগোপাল ধরার বুকে অবতরণ করিয়াছিলেন।

তিনি তো শুধু আত্ম জ্ঞান লাভের কথাই বলেন নাই, আত্ম জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞানের একশাখা বলিয়াছেন, সমস্ত জড় এবং অজড়, অধ্যাত্ম জ্ঞান ও বাস্তবের সম্বন্ধে জ্ঞানকেই পূর্ণ জ্ঞান বলিয়াছেন। এই জগতের সত্য বাস্তব স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই তো জগৎটা মধুর হইবে? নতুবা প্রতিনিয়ত বিশ্বের পরিবর্ত্তনের ধাক্কায় মানুষ তো ভীত হইবেই। এই জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে জগতাতীত ভগবান ওতপ্রোতঃ হইয়া মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছেন, এই জ্ঞানের স্ফুরণ হইলেই তো এই জগত মধুর বৃন্দাবনে পরিণত হয়, তখনই এ ধরার ধূলি ব্রজময়, ভক্ত তখন বিশ্বের মাঝে প্রাণ প্রিয়তমের মুখচ্ছবি দেখিয়া সকলকে বুকে জড়াইয়া ধরে। কি মধুর আস্বাদন!

শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন একাধারে ভক্ত ভগবান। তিনি নিজের স্বরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—"শ্রীনিত্যগোপাল পরম রূপবান। চম্পক এবং গলিত স্বর্ণের ন্যায় তাঁহার সুন্দর কান্তি। তাঁহার মুখপদ্ম হইতে আনন্দ স্ফুরিত হইতেছে। তাঁহার মুখ মণ্ডলে কোটি কোটি প্রভাকর বিনিন্দিত তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য। তাঁহার নিরুপম মহাভাবের তুলনা নাই তিনি জ্ঞানের জ্ঞানানন্দ। সমস্ত দিব্য ভাবই তাঁহা হইতে বিকশিত হইয়া থাকে। তাঁহার নলিন নয়নদ্বয়ে কমনীয় জ্যোতিঃ বিলসিত রহিয়াছে। তিনিই সত্য নির্ব্বাণের কারণ। তাঁহার কৃপায় কত পতিত জীব পরম ভক্ত হইয়াছে। তাঁহার দিব্য বিভূতি নিচয়ের মধ্যে পরাভক্তিও একটা বিভূতি। তিনি যে পরম প্রেমিক সর্ব্ব জীবে তাঁহার প্রেম আছে। তিনি পরম দয়াল তাঁহার অহৈতুকী দয়া। তিনি নিত্যানন্দ ব্রহ্ম সনাতন সমস্ত বিধি নিষেধ তাঁহার কিঙ্কর স্বরূপ। তিনি সর্ব্ব শক্তিমান।* তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই"।

শ্রীবেণু মিত্র কর্ত্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইন্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

"পুরুষোত্তম cult-এ প্রত্যেক অণুটিও এক একটি কেন্দ্র—কি কথাই না তোমার গোপাল বলিয়া গিয়াছেন? 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ।' এতদিন অল্পের কোন self-centered হইবার যোগ্যতা ছিল না। অল্প সার্থক অধিকের মধ্যে নিভিয়া গিয়া—এই হাইপথেসিসের—অনুমানের—উপর সব সমাজ গড়া। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু সেই মানুষও যে বৃন্দাবনে গিয়া তরুগুল্মলতাজন্ম কামনা করিবে, তাহা কে জানিত বা বিশ্বাস করিত! কৃষ্ণসখা উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়া এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। একটা hierarchy করিয়া একটিকে রাখিয়াছে সিঁড়ির উচ্চ ধাপে কুলীন করিয়া, আরগুলিকে পর পর নীচে নামাইয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে কিছুদিন চলিল বেশ। কিন্তু উচ্চ স্তরের চাপে নিম্নের সবগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিল, তখনই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ছোটরা, নীচের দল, সব বড়দের, উঁচুদের সমকক্ষতার দাবী করিল। ভাগবত বলিলেন, বড় ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে পুরুষোত্তমের direct ও equal relation। গায়ত্রী জপ ও মুচির জুতাসেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটা কুলীন হইবে এবং অপরটা অকুলীন হইবে? ঘর ঝাঁট না দিলে যখন ঠাকুর-পূজাই হয় না, তখন ঠাকুরের কাছে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও পূজা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? কে কুলীন, কে অকুলীন?……যদি কৌশলপূর্বক প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সত্ত্ব হইতেও পুরুষোত্তম যতদূর, রজস্তম হইতেও পুরুষোত্তম ততদূর।……এতদিনের সাধনা সব minus-এর সাধনা, নেতি নেতি। কৃষ্ণের সাধনা positive। সবকে রাখিয়া সবকে হজম করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।…… ছোটরাও যে অন্তরে অন্তরে পুরুষোত্তম, একথা তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিয়াছে।…… তাই আজ নোতুন করিয়া শাস্ত্র দিতে হইবে। New Social Order, New Religious Order সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে না পুরুষোত্তম মিলিবে?……"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

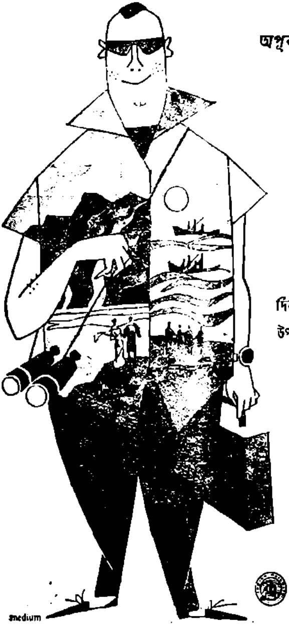

অপূর্ব রান্না

আর বাড়ীর মতো

স্বাচ্ছন্দ্য

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের হোটেল

দিনযাপনের প্রতিটি মুহূর্ত পুরোপুরি উপভোগ করতে হলে

রাঁচী

হোটেল

স্থান সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ
পূর্ব রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের
নিকট আবেদন করুন
টেলিফোন নং রাঁচী [illegible]

পুরী

হোটেল

স্থান সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ
পূর্ব রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের নিকট
আবেদন করুন টেলিফোন নং পুরী [illegible]

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

সূচীপত্র : বৈশাখ, ১৩৭০, ১৮৮৫

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (২১) ... ৯৩
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত

২। সমাজ-বিজ্ঞান কথা (৪) ... ৯৮
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত

৩। শক্তিদাও (কবিতা) ... ১০৪
শ্রীবিভূপদ রায়

৪। একটি অমর সাহিত্য : ভজন ... ১০৫
শ্রীকেশবকুমার ভট্টাচার্য

৫। উজ্জ্বল ভারত (কবিতা) ... ১০৯
শ্রীসুনীথ গুপ্ত

৬। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫২) ১১০

৭। মানবিকী—রবীন্দ্রনাথ ও আমরা ... ১১৮

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই
বিশুদ্ধ
মাখন ও ঘৃত
★
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
সরকার ডেয়ারী
ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক
৩২ ভূপেন বসু এভিনিউ
কলিকাতা ৪

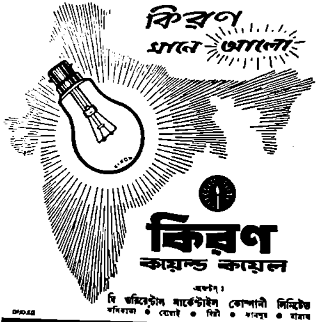

কিরণ
কয়েল্ড কয়েল
এজেন্ট্‌স :
দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোম্পানী লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • কানপুর • মাদ্রাজ

বিজ্ঞপ্তি

গত মাঘ ১৩৬৯ হইতে উজ্জলভারতের ষোড়শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। গ্রাহকদিগের নিকট নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন শীঘ্রই ষোড়শ বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দেন।

ইতি
কার্য্যাধ্যক্ষ, উজ্জলভারত
গ্রাম : বাগুইআটি
পোঃ : অশ্বিনীনগর
২৪ পরগণা

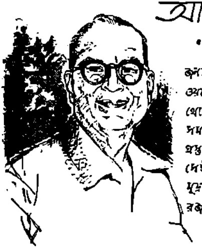

তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি আমাদের পাথেয় হউক

"কঠোর শ্রম ও ধৈর্যের দ্বারা কি লাভ করা যায় তার জন্য যদি কোন উদাহরণের প্রয়োজন হয় আমি সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের নাম উল্লেখ করবো। ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বিরাট কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিদেশে প্রস্তুত সবচেয়ে সেরা কালির যে গুণগত উৎকর্ষ সুলেখা সেই গুণের অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে সাহায্য করছে। আজকে তাদের এই রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

বিধানচন্দ্র রায়

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

নববর্ষের শুভেচ্ছা

গ্রহণ করুন।

বার্মা-শেল

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·১৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

বিদ্যাসাগর	২·২৫	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ** ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী **:** ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। । গড়িয়াহাট মার্কেট ।

CALCUTTA

উজ্জ্বলভারত

বৈশাখ, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(২১)

সন্ধ্যা—কিছুকাল পূর্বে আজকের আলোচনায় মনের স্তর ও প্রাণের স্তরের কথা বলেছি—আমার সমস্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যায় এ দুটো রয়েছে। যারা এখানে আছ, তারা এ দুটো সম্বন্ধে জান এবং কে কোন্ স্তরে আছ তার সন্ধান কর। নিজেরা বুঝতে পারবে না—যারা এগোবে, তাদের কাছে উপস্থিত হব।...যারা গোপন করে, তারা প্রাণের স্তরের না,—ব্রজগোপী উলঙ্গ প্রাণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। উলঙ্গ প্রাণ মানে কোন কিছু গোপন না রেখে উপস্থিত হওয়া। সকল বিশ্বকে প্রাণের স্তরে যেতে হবে—একদল লোক আমার শিক্ষাদীক্ষার এই প্রাণের স্তরের অধিকারী হও—এ আমি চেয়েছিলাম।...বাইরের দিক থেকে তারা মনের স্তর হারিয়েছে, কিন্তু...প্রাণ খুলে কেউ তো আমার বুকের কাছে এসে দাঁড়ালে না ... যারা চলে গেছে তারা আজও আমার বুকের মধ্যে আছে, তাদের উপর আমার প্রাণের দৃষ্টি রয়েছে।...প্রাণ মানুষকে দুঃখ দিতে পারেনা—আমার মত এত লাজুক, এত পরের দুঃখে কাতর—অপরকে আঘাত করার ইচ্ছা আমার এতটুকু নেই—তবু আমাকে যে তোমাদের রোষ ধরতে হয় তার কারণ আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমাদের এই নূতন পথে অজ্ঞতা দূর করবার দায়িত্ব রয়েছে আমার... নিত্যগোপাল আমাকে যা দিয়েছেন, সেই আশীর্বাদ তোমাদের হোক—আমার এই ছাড়া আর কি আছে? আমরা দরিদ্র, কিন্তু নিত্যগোপালের আশীর্বাদ আমরা পেয়েছি...।

সন্ধ্যা। নিত্যগোপালের আহ্বানে তাঁর প্রেরণা চালিত হয়ে একদিন পথে বেরিয়েছিলাম—বুদ্ধের কিন্তু একটা পরিকল্পনা ছিল কিছু গড়া এবং সেই প্রতিষ্ঠা তাঁর পীঠস্থান হবে। তাঁর নির্দেশে জীবন চালিয়ে এসে তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি।...তিনি এক ইচ্ছা করেছেন, একটা কিছু গড়তে চেয়েছেন—এম আসেন নি—সেই ইচ্ছাকে আমি বয়ে নিয়ে চলেছি—সে ইচ্ছাই অতি ক্ষুদ্র হলেও এখানে ফুটে উঠেছে। তোমাদে কাছে আমার বক্তব্য—যদি কিছু করতে চা থাকতে যদি চাও—আমার ইচ্ছার কাছে ছেড়ে দা নিজেকে...তিনি তন্ময় হবেন, তাঁতে তিনি অর্পিত হ হবেন—তিনিই কিছু করতে পারবেন।...হাত পা নাড়লে কর্ম হয় না—তাঁর ইচ্ছাকে ফোটানই কর্ম।...ভগব জীবকে না মানার স্বাধীনতা দিয়েছেন—কিন্তু তাতেই না মানতে হবে—তা তো কথা নেই।...মানতে হ হবেই।...ভগবান যা কি কথা বলছেন, আর মানুষ যা শুনছে, কি করছে। মূল গায়েন বলছে পার্ব্বতীসু লম্বোদর, দোহাররা গাইছে পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর।" আমরা ভগবানকে এমনি করেই ব্যর্থ করে দিচ্ছি...তোম পার্ব্বতীসুত লম্বোদর গাইতে শেষ...বুঝি চালিও না

নিত্যগোপালের বুদ্ধির কাছে মাথা যদি নত না কর, কোথায় দাঁড়াবে?…অনেক ঝড় ঠেলে এসেছি—ভুলই যদি আমার কিছু হয়, তবে সেই ভুলকে নিয়েই তো আমি এই ১৭ বৎসর পর্যন্ত চলে এসে এই বাগুইআটী এসেছি।… আমার ভুল যদি থাকেই, মেনে নিলেই আমাদের কল্যাণ। …নিত্যগোপালের ধারায় আমি ভেসে যাই—যদি তোমরা থাকতে চাও—সেই ধারায় ভেসে চলতে হবে।…বেদান্তের ভাষ্য লিখিবার সাহস আমার হইয়াছে নিত্যগোপালের অহৈতুক আশীর্ব্বাদে।…এই বেদান্ত ভাষ্য সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত…তোমাদের তা মেনে নিতে হবে—আন্দোলন করব আমি, অথচ তুমি বুদ্ধি চালাবে?…নিত্যগোপালের সঙ্গে বুদ্ধি নিয়ে যারা লড়াই করেছে, তাদের সরে যেতে হয়েছে—তোমাদের যেন আমার কাছ থেকে সরে যেতে না হয়…।

৪, ৭, ৫৬।…শ্রীধারা বিশ্বের প্রাণধারা…তুমি ছুটিয়াছ। নিত্যগোপাল, তুমি জান আমার জীবনের সার্থকতা কোথায়?…কোন আকাশ কুসুম কল্পনা লইয়া বাহির হই নাই—পরিকল্পনা আছে—কিন্তু অন্ধকারে একা পথ চলিয়াছি…সেদিন যাহারা সঙ্গে ছিল আজ তাহারা সঙ্গে নাই—নিত্য নূতন আবেষ্টনে নূতন সঙ্গী লইয়া চলিয়াছি। …সর্ব্ব পথ সমন্বয়ে তোমার এই ব্রহ্ম পথ…এই পথে চলিবার অধিকার দিয়াছ…লক্ষ লক্ষ বৎসরের সকল পথ আজ মিলিয়াছে এই ব্রহ্মপথের মাঝে, সকল সাধন ধারা যুগ যুগান্ত পরে আজ সম্মিলিত, সমন্বিত…এই পথে সকল পথের সন্ধান পাইয়াছি…বিশ্বের সকলকে বুকের মাঝে পাইয়াছি—বিশ্বের অনন্ত পথের খবর পাইয়াছি—নিত্যগোপাল, তোমার চরণ তলে সকল পথ সম্মিলিত—যে অধিকার আমায় দিয়াছ, সে অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার মত আমায় গড়িয়া তোল—তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি…তোমাদের প্রার্থনা হউক আমার সকল দেহ মন প্রাণে সরল কর, এক কর—দেহ মন প্রাণ একমুখো হউক, তোমার পানে সংযত হউক…। নিত্যগোপাল, সকল প্রাণ দিয়া আমি শরণাগত …দিন যায়—জীবনের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া চাই তোমায় বুকে চাপিয়া ধরিতে…সকল ভুলিয়া তোমায় লইয়া রহিতে…তোমার আমি, আমার তুমি…আমি তোমার হইয়া রহিব, তুমি কায়া, আমি ছায়া—ছায়ার মত আমি তোমায় ঘিরিয়া রহিব, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা মুছিয়া যাউক, আমার স্বতন্ত্র সত্তার বিলোপ হউক—তুমি আছ আমি নাই—আমার না থাকার মধ্যে তুমি থাক…তুমি ছাড়া আমার কেউ নাই। তুমি আমায় ছদ্মবেশী করিয়াছ …ইহা লইয়া আমি সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছি।…অসম্ভব তুমি সম্ভব করিতে পার… আমি সকল রকমে দীন…তোমার আবির্ভাবকে আমি কেমন করিয়া মানুষের কাছে প্রকাশ করিব…আমার তো কোন শক্তি নাই…আমি তোমার উপর ভার দিয়া চলিয়াছি…আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল—আমি কিছু বুঝি না।…বড় দুঃখী সংসারের লোক—মন লইয়া তাহারা বিব্রত—নিজেদের মৃত্যু নিজেরা ডাকিয়া আনে। নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল।

৫, ৭, ৫৬।…নিত্যগোপাল…আমার প্রাণগোপাল …আমার মদনগোপাল…ব্রহ্মগোপাল…তোমার জীবনে ত্রিধারার সমন্বয়—কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি—তোমারই চরণে ভক্তি গঙ্গার জন্ম…তোমারই চরণ তলে ত্রিবেণী সঙ্গম…তোমার চরণের স্পর্শ আমাকে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী—ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান বিদ্যা—দিয়া গিয়াছে—তাহাই আমি বহন করিব।… এতাবৎ কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি মিলে নাই, মিশে নাই—তুমি স্থাপন করিলে অবিরোধ—ব্রহ্ম-জীবন ত্রিধারার প্রকাশ বলিয়া আখ্যা দিলে…এই তিন সাগরে আমি স্নান করিব—কর্ম্ম-সাগরে ভক্তি-সাগরে, জ্ঞান-সাগরে। আমি তোমারই মাঝে লীন হইব—তুমি শুধু ফুটিবে আমার জীবনে—তুমি সামনে ফুটিয়া ওঠ।… আমার রূপ কুৎসিৎ, বীভৎস—এ রূপ আমি দেখিতে চাই না—তুমি সুন্দর, তুমি শিব, তুমি পূর্ণ নিত্যগোপাল…। তোমার রূপে গুণে আমি রূপবান গুণবান হইব। তোমার রূপে বিশ্ব রূপবান—'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'—তোমার রূপে চন্দ্রসূর্য্য বিভাসিত—তোমার আমি সুন্দর—যা কিছু তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন তাহাই কুৎসিৎ…তোমার সৌন্দর্য্যে অবগাহন করিয়া আমি

মধুময় হইব—তুমি মধুর, তুমি মধুর···আমার নিত্যগোপাল, আমার জিহ্বায় তুমি নৃত্য কর—আমার সকল দেহমন-প্রাণে তুমি বিরাজ কর—জগন্নাথ জগন্নাথ আমার প্রাণনাথ—রক্তাক্ত ধরা তোমায় ডাকে—উলঙ্গ হইয়া তোমার কাছে দাঁড়াইব—আমার দোষগুণ ভালমন্দ আমার জীবন-মরণ লইয়া তোমার কাছে দাঁড়াইব—আমার সকল আবরণ, সকল উপাধি, আমার সকল বসন তুমি কাড়িয়া লও—যে বসন দিয়া আমি আমারে ঢাকিয়া রাখিয়াছি, তাহা তুমি কাড়িয়া লও—তুমি বসন-চোর—আমার স্বামী, আমার দেবতা। তুমি আমি, আমি তুমি···ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ!

সন্ধ্যা—...। বাবার কাছ থেকে ছেলেবেলায় এক গল্প শুনেছিলাম—খুব অর্থদ্যোতক গল্পটা—এক সওদাগরের নৌকাডুবি হয়—কিছু টাকা কড়ি নিয়ে ব্যবসায়ে বেরিয়েছিল, সব গিয়ে অল্প কিছু আছে। সদাগর শুনলেন, গৃহদেবতাদের [illegible]—দধিবামন ঠাকুর সেবা করে আসে···ভক্তকে এক লাখ টাকা দেবে—সওদাগর দাও মারবার জন্য ওৎ পেতে রইল···শেষ পর্যন্ত দধিবামন সওদাগরের ঘাড় ভেঙেই ব্রাহ্মণকে টাকাটা দিলেন।···কথা হচ্ছে এই, স্বোপার্জিত না করে কিছু নিয়ো না—ব্রাহ্মণ পেয়েছে তার তপস্যার মধ্য দিয়ে, উপার্জন করেছে ব্রাহ্মণ, তা তুমি ফাঁকি দিয়ে নেবে?···ভগবানকে যারা অনন্য বলে জানে, ভগবান তাঁদের যেন—অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং পর্য্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্—সুধার বীণ গৌর গম্ভী—সবাই নিত্যাভিযুক্ত···তাঁদের ভগবান দেখেন।···শিশু থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবাইকে এই কথাই বলতে হবে—যা তুমি সৃষ্টি কর নি, তা তুমি গ্রহণ করো না।···চুরী কাকে বলে? চুরী প্রচলিত definition-এ হচ্ছে পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরী করা হয়। এর দোষ ছাড়িয়ে গিয়ে শিশুর মধ্যে আপন পর ভেদ বুদ্ধি জন্মাতে হচ্ছে য পচাতে আত্মকারণাৎ স্তেন এব সঃ···। বিজয়কৃষ্ণের জীবন ছিল স্বোপার্জিত জীবন—যা তিনি নিজে অর্জন করেন নি, তা তিনি গ্রহণ করতেন না। এ বিষয়ে তাঁর একটা গল্প আছে—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ—কষ্টে তার দিন চলে। স্ত্রী বলল, যাও রাজার কাছে যাও—কিছু নিয়ে এসো। অনেক বলার পর ব্রাহ্মণ গেল রাজার কাছে—গিয়ে বলল, মহারাজ আমাকে কিছু দাও—কিন্তু যা তোমার স্বোপার্জিত তার থেকেই দিয়ো, পরের জিনিষ দিয়ো না। কথা শুনে রাজা ভাবনায় পড়লেন—কী তিনি সারা জীবনে নিজে সৃষ্টি করেছেন? সবই তাঁর পিতার কাছ থেকে পাওয়া। ভেবে না পেয়ে রাজা ব্রাহ্মণকে তিনদিন পরে আসতে বললেন। ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়ে রাজা অনেক ভাবলেন। নিজের উপার্জন তো কিছুই নাই। ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন রাজা কিছু উপার্জন করবেন বলে। কোন কাজই তে জানেন না। ঘুরতে ঘুরতে এক কামারশালায় গি কাজ চাইলেন। কামার তাঁকে লোহা পিটবার কা দিল। রাজা তা পারবেন কেন? ২।৩ ঘা দিতে কামার বুঝল এ লোক সুবিধার নয়—তিন কড়ি দি বিদায় দিল কামার। তিন দিন পরে ব্রাহ্মণকে স্বোপার্জি সেই তিন কড়ি দিয়ে রাজা বললেন, এ ছাড়া আর তে কিছুই স্বোপার্জিত নেই। ব্রাহ্মণ মহানন্দে ঐ তিন কড় নিয়ে ব্রাহ্মণীকে দিলে ব্রাহ্মণী রাগ করে তা ফেলে দি আস্তাকুড়ে। কিছুদিন পরে স্বোপার্জিত সেই কড়ি থেকে হীরের গাছ হল।...নিজে উপার্জন করলে তার মূ এতখানিই হয়—মানুষ তা জানে না বলেই কড়িটাকে বড় করে দেখে। তাই বলি নিজে উপার্জন কর। পিতার দায়স্বত্বকেও বিজয়কৃষ্ণ স্বোপার্জিত না ক গ্রহণ করেন নি—যেহেতু গৃহ-দেবতা তাই তিনি পূজা-এমন করে নিতে পারেন নি বিজয়কৃষ্ণ। নিজের জীব সৃষ্টি করতে করতে বড় হতে হয়। সৃষ্টি কর, সৃষ্টি কর···নরনারায়ণ আশ্রম এই কথাটাই কহিতে চায়—আম সৃষ্টি করব···।···

ক্রম

সমাজ-বিদ্যার কথা

॥ শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত ॥

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সমাজবিদ্যা শিক্ষাদান পদ্ধতি কিরূপ হইবে ?

সকল শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলি যদি লিপিবদ্ধ করি তাহা হইলে নিম্ন তালিকাটি প্রস্তুত হয় :—

(১) বক্তৃতা ও পাঠ্য পুস্তক সাহায্যে শিক্ষাদান।

(২) সমস্যা পর্য্যালোচনা ও পরিকল্পিত ভাবে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি।

(৩) পরিচালিত ও নিয়মিত পাঠ দ্বারা বিষয়বস্তু আয়ত্তকরণ পদ্ধতি।

(৪) সমবেত ভাবে আলোচনা পদ্ধতি।

(৫) পরীক্ষাগার পদ্ধতি।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে প্রথমে উল্লেখিত পদ্ধতিটিতে শিক্ষকই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর নিকট বক্তৃতা সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্যগুলি পাঠ্য পুস্তকের যে অংশে আছে তাহার নির্দেশ প্রদান করেন। শিক্ষার্থী প্রধানতঃ পাঠ্য পুস্তকের উপর নির্ভর করে—শিক্ষক পাঠ্য পুস্তককে যতদূর সম্ভব সহজ-বোধ্য করিয়া দেন। তাহা ছাড়া তাহার বক্তৃতা কৌশল ভাল হইলে শিক্ষার্থী কিছুটা পাঠ্য বিষয়ে আগ্রহীও হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত প্রাচীন এবং ইহাকে একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে সমাজ-বিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা নহে—শিক্ষার্থীর সমাজের প্রতি জীবন্ত আগ্রহ সঞ্চার ও নিজদিগকে সক্রিয় নাগরিক রূপে প্রস্তুত করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই জন্য যে পদ্ধতিতে তাহারা সক্রিয় ভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতে ও পরস্পর সহযোগিতা করিতে পারে তাহাই সমাজ-বিদ্যা শিক্ষাদানের সর্ব্বোত্তম পদ্ধতি রূপে গণ্য হইবার যোগ্য। সেই বিচারে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিটি অনুপযোগী রূপে গণ্য হইবার যোগ্য। তাই অন্য পদ্ধতিগুলি সাহায্যে যতদূর সম্ভব শিক্ষা দিতে হইবে এবং পাঠ্যক্রম সমাপ্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তবেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে।

(২) সমস্যা পর্য্যালোচনা ও পরিকল্পিত ভাবে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি। ইহা ডিউই অনুসৃত সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Project method)-র অনুরূপ পদ্ধতি। শিক্ষার্থী প্রথমে সমাজের কোনও বাস্তব সমস্যার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিয়া তাহা পর্য্যালোচনা করিবে ও সমস্যাটিকে বিভিন্ন এককে বিশ্লেষণ করিবে। তৎপরে তাহারা ঐ এক একটি একক অবলম্বন করিয়া পৃথক ভাবে পর্য্যালোচনা করিবে ও যদি আয়ত্তসাধ্য হয় তবে তাহার সমাধান উদ্দেশ্যে কাজ করিবে। পর্য্যালোচনা ও সমাধান জন্য উদ্ভূত বাস্তব প্রয়োজন হইতে তাহারা নানা তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণ করিবে—ঐ জ্ঞান আহরণের জন্য দলগত আলোচনা, পরিচালিত ও পরিকল্পিত পাঠ, পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধান প্রভৃতি অন্য পদ্ধতিগুলি এই জন্য অনুসৃত হইবে। সুতরাং এই পদ্ধতির সহিত ইহার পরে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই পদ্ধতি অত্যন্ত গণতান্ত্রিক ও বাস্তবাশ্রয়ী; সুতরাং সমাজ-বিদ্যা শিক্ষার ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু এই পদ্ধতির সুষ্ঠু অনুসরণের ব্যাপারে শিক্ষকের মানসিক ও বৌদ্ধিক প্রস্তুতি সর্ব্বাধিক প্রয়োজন।

তৃতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ পরিকল্পিত ও পরিচালিত পাঠ ব্যবস্থাদ্বারা বিষয়বস্তু আয়ত্ত করা পদ্ধতি ডালটনের

পরিকল্পনা (Dalton Plan)-র অনুরূপ। দ্বিতীয় পদ্ধতির সহায়ক হিসাবে ইহার ব্যবহার এই পদ্ধতিকে অধিকতর প্রাণবন্ত করে। কিন্তু পৃথক ভাবেই এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হইতে পারে। পাঠ্য বিষয়কে প্রাণবন্ত করার জন্য পাঠ্য বস্তুর অংশ হিসাবে যে সব বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় থাকিবে সেইগুলি পরীক্ষাগারে অথবা বাস্তব সমাজ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে অধিকতর উপলব্ধির ব্যবস্থা রাখা যায়।

চতুর্থ পদ্ধতি : সমবেত ভাবে আলোচনা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোনও একটি বাস্তব সমাজ-সমস্যা অথবা বাস্তব ঘটনা লইয়া শ্রেণীতে সমবেত আলোচনা করা হইবে। আলোচ্য বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হইবে এবং আলোচনার সময় বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ করা হইবে বা তাঁহাদের নির্দেশনায় বিভিন্ন পুস্তকাদির অংশ বিশেষ পাঠ করা হইবে। ঐরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য বিভিন্ন চিত্র প্রদীপনাদি ব্যবহার করিলে বিষয়-বস্তু প্রাণবন্ত হইবে।

পঞ্চম পদ্ধতি অর্থাৎ পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীগণ কোনও সমাজ-সমস্যা বা ঘটনা পর্যালোচনা করার জন্য পরীক্ষাগারে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট পুস্তক প্রদীপন তথ্যাবলী ও উপকরণাদি ব্যবহার করিবে ও তাহাদের পর্যালোচনার বিবরণী রচনা করার মাধ্যমে উদ্দীষ্ট সমাজ-সংক্রান্ত জ্ঞান ও সিদ্ধান্তটি অধিগত করিবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীগণ নিজ প্রচেষ্টাতেই জ্ঞান আহরণ করিবে, শিক্ষক কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবেন মাত্র। ইহার জন্য সু-সজ্জিত পরীক্ষাগারের রক্ষিত নানা শিক্ষোপকরণের প্রয়োজন খুবই বেশী।

উপরে সংক্ষেপে বর্ণিত দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম পদ্ধতিগুলির মধ্যে যে খুবই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা সহজেই দেখা যায়। এই পদ্ধতি চতুষ্টয়ের মূল কথা হইতেছে শিক্ষার্থী এখানে নিষ্ক্রিয় শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে না— তাহারা শিক্ষাকার্যে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষণীয় বিষয়টি অধিকতর সজীব ভাবে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সুযোগ পায় বলিয়া তাহারা উহার সম্বন্ধে অনেক বেশী আগ্রহী হয়। তৃতীয়তঃ শিক্ষা কার্যে তাহারা পরস্পরের সহযোগিতার ভিত্তিতে অগ্রসর হয় ও এই জন্য শিক্ষালাভের সাথে সাথে তাহারা নিজেরাও একটি উন্নত সমাজ জীবনের অংশীদার হইয়া উঠে। শিক্ষণীয় বিষয়টির জ্ঞানার্জন ছাড়াও তাহাদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা, বুদ্ধি বিবেচনা, প্রকাশ ক্ষমতা প্রভৃতি জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত হইবার সুযোগ ঘটে এবং নূতন নূতন সমাজ সমস্যা ও সমাজ-সত্যের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়ে ও তাহারা ঐগুলির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গমে আগ্রহী হইয়া উঠে ফলে শিক্ষা আর পুঁথিনর্ভর থাকে না, তাহা জীব অভিজ্ঞতার রূপ ধারণ করে—শিক্ষার্থীর সত্তাকার বিকা ঘটায়। কিন্তু এই পদ্ধতি চতুষ্টয়ের সার্থকতা নির্ভ করে উপযুক্ত শিক্ষক ও উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক উপকর সমূহের উপর।

শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সমূহ : শিক্ষা সহায় উপকরণ সমূহের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে শিক্ষণীয় বিষয়ের সহি বাস্তব ভাবে পরিচিত করিয়া ঐ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সাহায্য করা। আমরা কোনও বাস্তব বিষ ধারণা লাভের জন্য সাধারণতঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায গ্রহণ করি। কিন্তু এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয়ই বাস্তব বিষয় ধারণা লাভের অধিক সহায়ক ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্বাদেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য ক্ষমতা সাক্ষা সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ে সীমিত—তাই এই তিনটি ইন্দ্রিয় ধার লাভের ক্ষেত্রে তেমন প্রযুক্ত হইতে পারে না—অবশ্য যখ হইতে পারে তখন তাহাদের সাহায্যও অবশ্যই গ্রহণীয় কিন্তু ইহার জন্য শিক্ষার্থীর যাহা বিষয়ে অবহিত হই হয়—কারণ ইহারা সরাসরি ভাবে শিক্ষার্থীর দেহের সহি শিক্ষাবস্তুর সংযোগ সাধন করে ও শিক্ষাবস্তুর সহি শিক্ষার্থীর দৈহিক সংযোগ অবাঞ্ছনীয় হইলে ঐ ইন্দ্রিয়গ্রা উপকরণ ব্যবহার পরিহার করিতে হয়। এই জন্য আমর প্রধানতঃ শিক্ষাদান সহায়ক যে সব উপকরণ গ্রহণ ক সেগুলি 'শ্রবণ-দর্শন সহায়' উপকরণ (Audio-visual Ajds) নামে কথিত হয়। আমরা সমাজ-বিদ্যা শিক্ষা

জন্য নিম্নলিখিত ধরণের 'শ্রবণ-ঈক্ষণসহায়' উপকরণ গ্রহণ করিতে পারি। ঐ উপকরণগুলি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হইবে আমরা যে জগতে ও যে সমাজে বাস করি তৎ সম্বন্ধে বাস্তব সম্মত ধারণা লাভে সহায়তা প্রদান করা। অবশ্য মাত্র ঐ audio-visual aid দ্বারাই ঐ সব সমাজ-সত্য ও সমাজ-সমস্যার সম্যক উপলব্ধি হইবে না—তাহার জন্য যথেষ্ট তাত্ত্বিক ও মৌলিক জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকিবে। কিন্তু ঐ aidগুলি উক্ত তাত্ত্বিক ও মৌলিক জ্ঞানগুলি অর্জনের অনুপ্রেরণা যোগাইবে এবং জ্ঞানগুলির বাস্তব ভিত্তি রূপে কাজ করিবে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শিক্ষার্থী বাস্তব সমাজ পর্যবেক্ষণ ও সমাজ সমস্যা হইতেই তো ঐরূপ অনুপ্রেরণা ও বাস্তব ভিত্তি পাইতে পারে, সুতরাং ঐরূপ aids-এর প্রয়োজন সমাজ-বিদ্যায় জরুরী হইবে কেন? এখানে মনে রাখিতে হইবে সমাজ সজীব, সুতরাং পরিবর্তনশীল। তাহাকে যে কোনও দিন পর্যবেক্ষণ করিলেই তাহার সকল বিশেষ অবস্থা ও সমস্যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ বাস্তব পর্যবেক্ষণে গিয়া অনেক সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা সমস্যা দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে। এই জন্য বাস্তব সমাজ পর্যবেক্ষণ ও সমাজ সমীক্ষা দ্বারাই সমাজ-বিদ্যার বাস্তব ভিত্তি রচিত হওয়া সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হইবে না। সেই ক্ষেত্রে ঐ aidগুলি সহায়ক হইবে—তাহারা সমাজের বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ বিশেষ সমস্যাকে শিক্ষার্থীর নিকট সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবে। দ্বিতীয়তঃ ঐগুলি শিক্ষার্থীকে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে ও বেশীবার বিশেষ বিশেষ সমাজ সমস্যা ও সমাজ সত্যের প্রত্যক্ষীকরণে সহায়তা প্রদান করিবে এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ দিবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বাস্তব সমাজ পর্যবেক্ষণ ও সমাজ সমস্যাকে ইহার দ্বারা তুচ্ছ বা অপ্রয়োজনীয় মনে করা হইতেছে না। সমাজ-বিদ্যা শিক্ষায় ঐরূপ বাস্তব aidগুলি তাহার পরিপূরক ব্যবস্থা মাত্র—বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা পটভূমিতেই aidগুলি অভিষ্ট ফল প্রদান করে। বস্তুতঃ বাস্তব সমাজ পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষাকে আমরা সর্বাপেক্ষা বড় teaching aid রূপেই গণ্য করিব।

কয়েকটি শ্রবণেক্ষণ সহায় পরিচিতি: আমরা শিক্ষাকার্যে নিম্নলিখিত সহায়গুলিকে দর্শনেন্দ্রিয় সহায় উপকরণরূপে ব্যবহার করিতে পারি:—

(১) ব্লাক বোর্ড বা চক বোর্ড। (২) প্রদীপনাদি আটকাইবার জন্য বোর্ড। (৩) মানচিত্র। (৪) চার্ট। (৫) গ্রাফ। (৬) রেখা চিত্র। (৭) চিত্র। (৮) পোস্টার বা প্রচার চিত্র। (৯) কার্টুন বা ভঙ্গীচিত্র। (১০) গ্লোব। (১১) মডেল। (১২) নমুনা। (১৩) বাস্তব দ্রব্য। (১৪) তালিকাদি। (১৫) ফিল্ম। (১৬) ফিল্মের ফিতা। (১৭) স্লাইড।

শেষোক্ত তিনটি উপকরণ সাহায্যে পর্দায় স্থির বা গতিশীল চিত্র প্রক্ষেপ করা যায়। উহার জন্য প্রক্ষেপক যন্ত্র প্রয়োজন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে আতস কাঁচযুক্ত (magnifying glass) বাক্সে ফিল্ম আটকাইয়া উহার পরিবর্ধিত চিত্র ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে দেখিতে দেওয়া যায়। ইহার ব্যবস্থা কম অর্থব্যয় সাপেক্ষ।

শ্রবণেন্দ্রিয় সহায়ক উপকরণ হিসাবে গ্রামোফোন, রেডিও এবং টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করা যায়। শ্রবণ-দর্শনেন্দ্রিয় সহায় উপকরণ হিসাবে সবাক চলচ্চিত্র টেলিভিশন ও অভিনয় গণ্য হইবার যোগ্য। দ্বিতীয়টির প্রচলন এখনো এদেশে ঘটে নাই। প্রথমটীও তেমন সহজপ্রাপ্য নহে, তবুও ইহা ক্রমেই সহজ লভ্য হইয়া উঠিতেছে। তৃতীয়টীর যথেষ্ট সুযোগ আছে।

উপকরণের ব্যবহার বিষয়ে সতর্কতা: উপকরণগুলি ব্যবহার করিবার সময় ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সেগুলি শিক্ষালাভ সহায়ক উপকরণ—ইহাদের দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানাগ্রহ উদ্দীপ্ত করা ও জ্ঞানের বাস্তব ভিত্তি প্রদান করাই ইহাদের ব্যবহারের লক্ষ্য। উপকরণগুলি নিছক আনন্দ লাভের উপায় বা সহজ কৌতূহল নিবৃত্তির উপায় রূপে ব্যবহৃত হইলে উহাদের উক্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। এই উদ্দেশ্য পূর্তির সহায়ক রূপে উপকরণগুলি ব্যবহার করিতে গেলে নিম্ন বিষয়গুলির প্রতি অবহিতি প্রয়োজন:—

১। উপকরণ নির্বাচন করিবার পূর্বে বিভিন্ন স্তরের পাঠ্য বিষয়, তাহার উদ্দেশ্য কি—উপকরণগুলি ঐ উদ্দেশ্য পূর্তির কি সহায়তা প্রদান করিতেছে তাহা প্রণিধান করিতে হইবে। অপ্রয়োজনীয় উপকরণ পাঠ্য বিষয় হইতে মনকে প্রক্ষিপ্ত করিতে পারে।

২। উপকরণগুলি অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু নিছক কৌতূহল নিবৃত্তি এইগুলির ব্যবহারের উদ্দেশ্য হইতে পারে না—কৌতূহল যেন কোনও বিশেষ বিষয়ে অধিকতর চিন্তা, তথ্য সংগ্রহ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সক্রিয়তা প্রদান করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই জন্য উপকরণ নির্বাচনে যেমন যত্ন নিতে হইবে তেমনি ইহার বাহুল্য পরিবর্জন করিতে হইবে। উপকরণগুলি বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সহায়তা প্রদান করিবে ইহাই কাম্য। উহা শিক্ষণীয় বিষয়ের গভীরতা উপলব্ধির বাধা হইয়া অর্ধস্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি-দ্বারা কৌতূহল চরিতার্থ করিলে পাঠের উদ্দেশ্য বর্জিত হইবে।

৩। উপকরণসমূহ কদাচই পাঠ আলোচনা পর্যালোচনা পর্যবেক্ষণ এবং সমীক্ষার স্থান লইতে পারে না—তাহার সহায়ক ও অঙ্গপূরক ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে মাত্র। এই জন্য পাঠ আলোচনা প্রভৃতির সহায়ক রূপেই সেইগুলি ব্যবহারের পরিকল্পনা রাখিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রেই তাই বাস্তব পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা পাঠ ও আলোচনা উপকরণ ব্যবহারের পূর্বগামী হইবে। তৎপরে উপকরণগুলি ব্যবহারের পর পূর্ব জ্ঞানের সহিত বাস্তব উপকরণগুলি হইতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার সংযোজন মূলক পাঠ আলোচনা প্রভৃতি রাখিতে হইবে। এই ভাবে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে অধিকতর সাহায্য ও সক্রিয় অভিজ্ঞতার ভিত্তি রূপে ব্যবহারের জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অথবা দলগত কাজের ব্যবস্থা রাখিতে পারিলে তাহা অধিকতর শিক্ষা সহায়ক হয়।

৪। উপকরণ-বাহুল্য শিক্ষার্থীর সময়ের অপচয় ঘটায় এবং শিক্ষার্থীর মনকে বিষয়বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে—সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

৫। উপকরণ ব্যবহার কালে শিক্ষার্থীর আগ্রহ এ সামর্থ্যও বিবেচনা করিতে হইবে। যে উপকরণগুলির তাৎপর্য শিক্ষার্থী বুঝিবে না তাহা শিক্ষার্থীর জ্ঞানাগ্রহ সৃষ্টি করে না, শিক্ষণীয় বিষয়কে সুস্পষ্টও করে না। এই জন্য উপকরণ নির্বাচনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতাও বিচা সাপেক্ষ। তাই আমরা উপকরণ নির্বাচনের অ ঐরূপ উপকরণ ব্যবহারের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি ম রাখিব:—

১। ইহার প্রথম উদ্দেশ্য বিষয় বস্তুর প্রতি সচেত করা ও আগ্রহী করিয়া তোলা। ২। ইহার দ্বিতী উদ্দেশ্য বিষয় বস্তুকে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করিয়া তোলা এব তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য বিষয় ও প্রশ্নগুলি সহিত তাহার সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা ৩। বিষয় বস্তুর বিস্তারিত জ্ঞানাংশগুলিকে এক সুসংগঠিত জ্ঞানে সংহত করিতে সাহায্য করা ৪। শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানকে নূতন প্রয়োগ ক্ষেত্রে নি নিজেদের জ্ঞানকে যাচাই করার সুযোগ দান।

কয়েকটি উপকরণের বিশেষ পরিচয়:—

ব্ল্যাকবোর্ড বা চক বোর্ড: শিক্ষাকার্যে ইহা উপযোগিতা সকল শিক্ষকই জানেন। সমাজ-বিদ্যা শিক্ষ দান কার্যে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার রচনায় আলো বিষয়গুলির সম্বন্ধ প্রদর্শনে সহজ চার্ট ও স্কেচ প্রদান ব্যাপা ইহা সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য উপকরণ। রঙিন চক প্রভৃতি সাহায্য লইয়া ইহাতে নানা রকম স্কেচ চার্ট প্রভৃ আঁকিলে বিষয় বস্তুর ধারণা প্রদানে প্রচুর সহায়তা প্রদা করা যায়। শিক্ষকের অঙ্কনে হাত ভাল থাকিলে কার্টু প্রভৃতি সহায়ে বিষয় বস্তুকে মনোজ্ঞ করার জন্যও ইহ ব্যবহার সম্ভব। বোর্ড ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষকের বি অবহিতি প্রয়োজন। প্রথমতঃ সুস্পষ্ট ও সুগঠিত বড় হর ব্যবহার করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ বোর্ডে অনেক লিখি তাহা শিক্ষার্থীর মনোযোগ তেমন আকর্ষণ করে না—এ জন্য বোর্ডের ব্যবহারের পূর্ব পরিকল্পনা থাকা ভাল তৃতীয়তঃ বোর্ডের লেখা যেন নির্ভুল হয় তৎপ্রা অবহিত হওয়া প্রয়োজন। চতুর্থঃ সকলে যেন দি

যাহার বোর্ডের কাজ দেখিতে পায় তৎপ্রতি অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

বুলেটিন বা টাক বোর্ড: ইহা একটি কাষ্ঠ ফলক যাহাতে বিভিন্ন পোষ্টার চার্ট গ্রাফ প্রভৃতি প্রয়োজন মত আঁটিয়া দেওয়া যায়। শ্রেণীর ভিতরে ও বাহিরে এইরূপ বোর্ড করিয়া তাহাতে আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের পোষ্টার, চার্ট প্রভৃতি আটকাইয়া দিলে শিক্ষার্থী সহজে বিষয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তাহা অনুধাবনে সহায়তা লাভ করে। ইহা মনোযোগ আকৃষ্ট করার কাজে, বিশেষ বিষয়ের প্রতি আগ্রহী করার কাজে, শিক্ষকের পক্ষে সহায়তা প্রদানের কাজে, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে আগ্রহ সৃষ্টিতে, শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধান ও আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে ও বিশ্লেষণ ব্যাপারে খুবই সহায়ক হইতে পারে। প্রদর্শিত চার্ট, পোষ্টার ও চিত্রগুলি অবশ্যই সুনির্বাচিত হওয়া উচিত। সেগুলি যুক্তিপূর্ণ পর্য্যায়ে সজ্জিত হওয়া উচিত—যেন বিভিন্ন চিত্র পোষ্টারগুলি হইতে একটী বিশেষ উদ্দিষ্ট ধারণাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। আবার প্রদর্শিত চার্ট ইত্যাদির মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টিও প্রয়োজন—নতুবা উহা এক ঘেয়ে লাগিতে পারে। নূতন পুস্তকাদির পরিচয়, নূতন ঘটনার বিবরণ—যাহা শিক্ষার্থীর পক্ষে সহায়ক হইতে পারে—এইরূপ বুলেটীন বোর্ডে আটকাইয়া দেওয়ার প্রথা খুবই উপযোগী।

ফ্লানেলোগ্রাফ বোর্ড: ইহা কাঠের ফ্রেমে আঁটা এক খণ্ড ফ্লানেল বস্ত্র। কাগজের উপর অঙ্কিত চিত্র, চার্ট প্রভৃতির কোণাগুলিতে শিরিষ কাগজ আটকাইয়া দিলে ঐ চিত্র চার্ট প্রভৃতি সামান্য চাপ দিলেই উক্ত ফ্লানেল বস্ত্র নির্মিত বোর্ডের গায়ে আটকাইয়া থাকে এবং ইচ্ছা মত সহজে তুলিয়া লওয়া যায়। শ্রেণীতে আলোচনা চলা কালে যখন বিভিন্ন চার্ট পোষ্টার চিত্র প্রভৃতি যথা সময়ের জন্য প্রদর্শন করিয়া সরাইয়া লইতে হয় ও তাহার স্থানে পর্য্যায়ক্রমে অন্য চিত্র দেখাইতে হয় অথবা অনেকগুলি-চিত্র প্রভৃতি একটির পর একটি দেখাইবার প্রয়োজন হয় (অথচ সকলগুলি থাকিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় বোধ হয়) তখন ইহা খুবই উপযোগী ব্যবস্থারূপে গণ্য হইবার যোগ্য। বিশেষতঃ কোনও সামাজিক বা প্রাকৃতিক ঘটনার পরিবর্ত্তনশীলতা বিষয়ে শিক্ষার্থীকে বাস্তব ভাবে পরিচিত করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন এই উপকরণের ব্যবহার খুবই সহায়ক বিবেচিত হইবে।

চিত্র:—ইহা অত্যন্ত মূল্যবান ঈক্ষণ-সহায় শিক্ষোপকরণ—কারণ ইহা শিক্ষার্থীকে সর্ব্বাপেক্ষা সহজে বিষয় বস্তুর বাস্তব ভিত্তিক ধারণা প্রদান করিতে পারে। ঐতিহাসিক ব্যক্তির পরিচিতি ঐতিহাসিক ঘটনা ও ভৌগোলিক পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা লাভে ইহা প্রচুর সহায়তা প্রদান করে। চিত্র নির্ব্বাচন ব্যাপারে শিক্ষকের যথেষ্ট বিচার বিবেচনার প্রয়োজন। আলোক চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তব সম্মত চিত্র হইলেও সকল বিষয়ে ইহা সহজ লভ্য নয়। সেক্ষেত্রে এমন চিত্র নির্ব্বাচিত করিতে হইবে যাহা বিষয় বস্তুর বা ঘটনার কোনও বিকৃতি না ঘটায়। চিত্রের আকার এমন হওয়া উচিত যেন তাহা দেখা সহজ হয়।

চিত্র সকল পূর্ব্ব লিখিত বুলেটিন বোর্ড বা ফ্লানেলোগ্রাফ সাহায্যে প্রদর্শিত হইতে পারে অথবা যদি সেগুলির আকার সুবিধাজনক হয় শিক্ষক নিজ সম্মুখে ধরিয়া সরাসরি দেখাইতে পারেন। ছোট চিত্র হইলে প্রজেক্টার সাহায্যে সাদা পর্দায় উহার প্রতিফলিত আলোক চিত্র ফেলিয়া দেখাইতে পারেন। প্রোজেক্টার থাকিলে পুস্তকের চিত্রও ঐভাবে প্রদর্শিত হইতে পারে। এইজন্য প্রোজেক্টার একটি অত্যন্ত উপযোগী ঈক্ষণ সহায় যন্ত্র।

চিত্রের প্রতি সকলেরই স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে। কিন্তু মনে করিতে হইবে শুধু চিত্র প্রদর্শন করিয়া আনন্দ প্রদানই শিক্ষকের উদ্দেশ্য নহে। এইজন্য তিনি তাহার পাঠের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চিত্র প্রদর্শন করিবেন এবং তাহার পাঠে তাহার বক্তব্য ও শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কাজের অংশ বিষয়ে পূর্ব্বেই পরিকল্পনা করিয়া রাখিবেন।

পোষ্টার:—পোষ্টারের সাহায্যে একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়। ইহাতে চিত্র, কার্টুন চিত্র, নক্সা প্রভৃতি থাকে এবং খুব কম শব্দে উহার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়। একটি পোষ্টারে অধিক চিত্র থাকা উচিত নয়।

পোষ্টারের ভাষা সহজবোধ্য ও উহার চিত্র ও লেখা বেশ বলিষ্ঠ হওয়া উচিত। ইহার ডিজাইন, রঙ প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীগণকে পোষ্টার তৈয়ারী করিতে শিক্ষা দেওয়া ভাল—তাহা হইলে তাহারা নিজেদের দলগত পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত পোষ্টার সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারিবে ও উহা করিতে গিয়া তাহাদের জ্ঞান দৃঢ়বদ্ধ হইবার সুযোগ লাভ করিবে। পোষ্টার উক্তরূপ সহায়ক উপকরণ হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে।

কার্টুন চিত্র :—কোন বিশেষ তথ্য বা ধারণা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কার্টুন চিত্রের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। ইহাতে কৌতুকের স্পর্শ থাকায় সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার অঙ্কন পদ্ধতিও অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু কোনও তথ্যকে কার্টুন চিত্র দ্বারা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি ও কল্পনা শক্তির প্রয়োজন হয়। সাময়িক ঘটনাবলী বা কোনও সমাজের সামগ্রিক সমস্যাদি কার্টুন চিত্র সাহায্যে চমৎকার ভাবে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু ইহার ব্যবহার বা নির্মাণ ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে হইবে যেন ইহা বাস্তব সম্বন্ধে ধারণাকে বিকৃত না করে বা বিকৃত রুচির সৃষ্টি না করে। কার্টুন চিত্র দেখিয়া তাহার দ্বারা বর্ণিত বিষয় বুঝিবার মত ক্ষমতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রয়োজন হয় এবং ইহা অঙ্কনের ও উদ্ভাবনের শিক্ষাও শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে সহায়ক হয়। কোনও বিষয়ের সামগ্রিক জীবনকে সুসংহত করার কাজে কার্টুন চিত্র খুবই উপযোগী। দলগত কাজের সিদ্ধান্ত প্রকাশে শিক্ষার্থীগণকে ইহার ব্যবহারে উৎসাহী করা যায়।

চার্ট :—চার্ট বলিতে কোনও একটি বিশেষ ধরণের উপকরণ না বুঝাইয়া অনেক প্রকারের উপকরণ বুঝায়। অনেক চার্টে শুধু মাত্র সুকৌশলে মুদ্রিত ভাষাগত বিবরণ থাকে আবার অনেক চার্টে জ্যামিতিক ও অন্যবিধ নক্সা সাহায্যে স্বল্প ভাষার ব্যবহারে বিষয় বস্তুটি বোঝান হয়। বৃক্ষের চিত্র আঁকিয়া তাহার মূল কাণ্ড ও শাখা প্রশাখার দ্বারা মূল ঘটনা বা সমস্যার সহিত তাহার সহিত যুক্ত অন্যান্য ঘটনা বা বিষয়াবলীর সম্পর্ক বুঝানো যায়। যেমন বন সম্পদ হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও দ্রব্যাদি এই চার্টের সাহায্যে সুন্দর ভাবে দেখানো যায়। শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট নদীর চিত্র সাহায্যে আমরা বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ঘটনাগুলি কেমন ভাবে কোনও মূল ঘটনার সহিত সংযুক্ত হয় তাহা বুঝাইতে পারি। গ্রাম্য জীবনের নানা সমস্যা কিভাবে একত্রিত হইয়া সামগ্রিক গ্রাম্য জীবনকে প্রভাবিত করে তাহা এইভাবে দেখানো যায়।

এক দৃষ্টিতেই দর্শক একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারেন। আর একরূপ গ্রাফ আছে—উহাকে বৃত্ত গ্রাফ (circle graph) বা পাই গ্রাফ (Pie graph' বলে। ইহাতে একটি বৃত্ত আঁকিয়া তাহাকে কেন্দ্র হইতে পরিধি বরাবর ভাগ করিয়া সমগ্রের অংশগুলির তুলনামূলক আয়তন বুঝানো হয়। কোনও দেশের বাজেটে ক অংশ কি খাতে ব্যয় হয়, কোনও দেশের জাতীয় আয়ে কোন অংশ কোন উৎস হইতে আসে, কোন দেশের লো সংখ্যার কত অংশ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ইত্যাদি বিষয় সম্ এইরূপ লেখ-চিত্র দ্বারা প্রকাশ করা সহজ হয়। রেখা সাহায্যে লেখ-চিত্র বা লাইন গ্রাফ (Line graph গণিত ও বিজ্ঞানে সুপরিচিত গ্রাফ পদ্ধতি। ইহাতে দুইটি পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত মূল দিককে দুইটি পরস্প সম্বন্ধিত বিষয় ধরিয়া ঐ মূল দিক হইতে পরিমাণ মা দূরে বিন্দু বসাইয়া উক্ত দুইটি বিষয় কিভাবে একে অপরে উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা বুঝানো যা যেমন বৃষ্টি পাতের পরিমাণ ও খাদ্য শস্যের পরিমাণ দুই মূল দিককে ধরিয়া বিভিন্ন বৎসরে বৃষ্টিপাত ও খাদ্য শস্যে পরিমাণ লইয়া বিন্দুসমূহের সংস্থান নির্ণয় পূর্বক তাহা মধ্য দিয়া line graph উঠিলে উক্ত দুইটি বিষয়ে সম্পর্ক স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। তবে এইরূপ লেখ বুঝিবা জন্য শিক্ষার্থীর কিছুটা পূর্বজ্ঞানের প্রয়োজন। তা জানিলে শিক্ষার্থীগণও তাহাদের দ্বারা আহরিত অনে তথ্য এইরূপ গ্রাফ সাহায্যে সহজে প্রকাশ করি পারিবে। অনেক সময়ে বৃত্তের পরিবর্তে বর্গ ও আয় ক্ষেত্রও এইরূপ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

চিত্র সম্বলিত লেখ Picture graph :—বিষয়বস্

আরো আকর্ষণীয় করার জন্য আমরা গ্রাফের সহিত চিত্র বা প্রতীক চিত্র সংযুক্ত করিতে পারি। যেমন বিভিন্ন বৎসরে মোট উৎপাদিত বস্ত্রর পরিমাণ শুধু মাত্র স্তম্ভ গ্রাফ (Bar graph) সাহায্যে না দেখাইয়া ঐ Bar graphএ ছাপার পর কাপড়কে একটি সমান উচ্চতার কাপড়ের গাঁঠ ধরিয়া ঐ গাঁঠগুলি চার্টে মানচিত্র, নক্সা, গ্রাফ বা লেখ-চিত্র, কার্টুন চিত্র, রেখা চিত্র অথবা সংখ্যা তালিকা দিয়াও বিষয়বস্তু প্রকাশ করা যাইতে পারে।

রেখা চিত্র :—চিত্রের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে এখানে বিষয়টির বাহিরের আকার আকৃতি বুঝাইবার পরিবর্ত্তে তাহার কার্য্য পদ্ধতি বা অন্তর্নিহিত তথ্য বুঝিতে সাহায্য করা হয়। কেমন ভাবে কয়লা উৎপন্ন হয়, কেমন ভাবে মৃত্তিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন ঘটায়, কেমনভাবে ঝড়ের উদ্ভব ঘটে, ষ্টিম ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে, কোন্ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হ'ন এইরূপ বিষয় রেখাচিত্র সহায়ে ভালভাবে প্রকাশিত হইতে পারে।

তালিকা (Tables)—কোনও সমাজ-সত্য ঠিকমত বুঝিবার জন্য তাহার নানা বিষয়ের পরিসংখ্যান যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কোনও সমাজে শিক্ষা বিস্তার কিরূপ তাহা জানিবার জন্য ঐ সমাজের লোক সংখ্যা, সাধারণ শিক্ষিতের সংখ্যা, ম্যাট্রিক পাশের সংখ্যা এইভাবে কতকগুলি সংখ্যা হইতে উক্ত বিষয়ে যে বিস্তারিত জ্ঞান পাওয়া যায়—ভাষাগত বর্ণনাতে তাহা পাওয়া যায় না। ঐরূপ সংখ্যাগুলি তালিকা আকারে প্রকাশ করিলে তাহা উক্ত বিষয়ে তথ্য ও ধারণা লাভের অধিকতর সহায়ক হয়। এইজন্য সমাজ বিদ্যায় তালিকার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। বিভিন্ন বৎসরের তুলনামূলক তালিকাগুলি হইতে আমরা সমাজের অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত হইবার প্রচুর সুযোগ পাই।

লেখ-চিত্র বা গ্রাফ :—তালিকায় যাহা প্রকাশ করা হয় তাহাই আরো অধিকতর বুদ্ধিগ্রাহ্য ও সহজরূপে প্রকাশ করা যায় গ্রাফ বা লেখ-চিত্র সাহায্যে। বার গ্রাফ সাহায্যে বিভিন্ন বৎসরের স্থানের বা শ্রেণীর তুলনামূলক তথ্য খুব সহজে প্রকাশ করা যায়। যেমন কোনও সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতের হার ইহার সাহায্যে প্রকাশ করিলে একটির উপর আর একটি সাজানো আছে দেখাই তবে মোট বস্ত্র উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণীটি আরো আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য হইয়া উঠিবে।

মানচিত্র :—সমাজ-বিদ্যা শিক্ষায় ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট সহায়ক উপকরণ। সমাজ-বিদ্যার সহিত ভূগোলের সম্বন্ধ যে খুবই ঘনিষ্ঠ তাহা বলার প্রয়োজন নাই। ইতিহাস বিষয়টির সহিতও ইহার ঐরূপ নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষায় মানচিত্রের উপযোগিতা যে খুবই বেশী তাহা সর্ব্বজন বিদিত। সুতরাং সমাজ-বিদ্যা শিক্ষায় ইহার স্থান খুবই অধিক। বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, লোকসংখ্যা, আমদানী-রপ্তানী শিল্প, কৃষি, শিক্ষিতের হার, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি মানচিত্র সাহায্যে প্রকাশ করিলে তাহা শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজগ্রাহ্য ও সহজবোধ্য হয়। শিক্ষার্থীগণকে ঐ কৌশলে তাহাদের লব্ধ জ্ঞান ও পর্য্যবেক্ষণ বা সমীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা প্রকাশের শিক্ষা দেওয়া উচিত। মানচিত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি মানচিত্র সাহায্যে বুঝিতে সাহায্য করা হইতেছে সেই বিষয়টি যেন সুস্পষ্ট হয়, তাহা দেখা প্রয়োজন। এই জন্য বিভিন্ন প্রকারের মানচিত্র রাখিতে হইবে ও বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানলাভে সহায়ক মানচিত্র নির্ব্বাচনে সতর্ক হইতে হইবে।

গ্লোব :—বিস্তীর্ণ ভূভাগের ধারণা প্রদানে মানচিত্র সব ক্ষেত্রে উপযোগী নহে। তাছাড়া মহাদেশগুলির আপেক্ষিক অবস্থান বুঝাইতে মানচিত্র সক্ষম হয় না। ইউরোপ উত্তর পূর্ব্ব দিকে ও উত্তর আমেরিকা উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত হইয়াও ঐ দুই দেশের দূরত্ব ঐ আমেরিকা হইতে ভারতের দূরত্ব অপেক্ষা কম কেন তাহা মানচিত্রে বুঝা সম্ভব নহে। আবার মেরুবৃত্ত ও বিষুব রেখা হইতে নিকটে বা দূরে অবস্থিতির জন্য কোনও অঞ্চলের জলবায়ুর যে পরিবর্ত্তন সূচিত হয় তাহা মানচিত্রে ভাল বুঝা যায় না। ঐ সব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য গ্লোব বা ভূগোলক অত্যন্ত মূল্যবান উপকরণ।

মডেল ও প্রদর্শন বস্তুসমূহ :—সমাজ-বিদ্যা শিক্ষার উত্তম সহায়ক উপকরণ হিসাবে মডেল ও প্রদর্শন বস্তুসমূহের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। টেরাকোটা শিল্প, বিভিন্ন ধরণের কাঁথার নক্সা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সমাজে প্রচলিত শিল্প বিষয়ে চিত্র দেখিয়া সম্যক ধারণা করা সম্ভব হয় না। সেইরূপ ক্ষেত্রে কিছু নমুনা সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। আবার বিভিন্ন অঞ্চলের শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখার শস্যাগার, সেচ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ ধরণের গৃহ নির্মাণ কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক ধারণা চিত্র সাহায্যে হইতে পারে না অথবা ঐরূপ বৃহদায়তন বস্তু বহন করা ও সংরক্ষণ সম্ভব নহে। সে ক্ষেত্রে ঐরূপ বস্তুর মডেল তৈয়ারী করিয়া প্রদর্শন করার ব্যবস্থা রাখিলে শিক্ষার্থীকে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে সামগ্রিক বস্তুটির মডেল ও তাহার কিছু কিছু অংশের সংগ্রহ বস্তু একত্রে দেখাইলে ধারণা স্পষ্ট হয়। যেমন কোনও বড় ইমারতের মডেল ও ঐ ইমারতের দেওয়ালের ইটের পোড়া মাটির শিল্প নিদর্শন একত্রে থাকিলে ইমারতটির গঠন শিল্প ও উৎকীর্ণ শিল্প উভয় বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হইবে।

স্লাইড প্রজেক্টার :—ইহাদ্বারা ছোট ছোট কাঁচ খণ্ডের উপরে অঙ্কিত চিত্র অথবা ফটোগ্রাফিক ফিল্মের উপর উৎকীর্ণ আলোকচিত্রকে তীব্র আলোকে আলোকিত করিয়া লেন্সএর সাহায্যে সম্মুখস্থ সাদা পর্দায় বৃহদায়তন আলোকোজ্জ্বল চিত্র ফেলা যায়। সাধারণতঃ বিদ্যুৎ আলোকের সাহায্যে এইরূপ প্রক্ষেপ দ্বারা উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এখনো আমাদের দেশে সর্বত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় না। আর একরকম প্রোজেক্টার আছে যাহাতে কেরোসিন আলোর ব্যবহার চলে। কিন্তু এইগুলির আয়তন অনেকটা বড় বলিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে অসুবিধা হয়। এইরূপ যন্ত্র সাহায্যে শিক্ষার্থীকে নানা সামাজিক ঘটনা সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা প্রদান করা সহজ। বর্তমানে প্লাষ্টিকের পাত সুলভে পাওয়া যায়—তাহার উপর চিত্র আঁকিয়া লইয়া সহজে স্লাইড তৈয়ারী করা সম্ভব।

এপিডায়স্কোপ বা ওপেক প্রজেক্টার :—ইহার সাহায্যে তীব্রভাবে আলোকিত সাধারণ চিত্র প্রথমে আয়নার সাহায্যে প্রতিফলিত করিয়া পরে লেন্স সাহায্যে সাদা পর্দায় ফেলা যায়। পুস্তকে অঙ্কিত চিত্রও এই ভাবে পর্দায় প্রক্ষেপ করা সম্ভব বলিয়া ইহার উপযোগিতা অধিক। কিন্তু ইহার জন্য বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োজন বলিয়া আমাদের দেশে ইহার ব্যবহার এখনো সীমাবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য ছোট জেনারেটার সাহায্যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিয়া এই যন্ত্রের ব্যবহার ব্যবস্থা আছে। তাহা এদেশের পক্ষে উপযোগী।

পোর্টেবল মুভি প্রজেক্টার :—ইহার সাহায্যে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা যায়। ইহা মূল্যবান যন্ত্র কিন্তু ইহা যে খুবই উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক মুভি প্রজেক্টারে শুধু চলচ্চিত্র নহে কথা চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। তাহা খুবই শিক্ষা সহায়ক উপকরণ। সমাজ-বিদ্যায় ইহার উপযোগিতা খুবই বেশী কেননা ইহার দ্বারা বাস্তব সমাজ পরিচিতি জ্ঞান পাওয়া যাইবে।

রেডিও :—ইহা নানা দিক হইতে জন শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ যন্ত্র হইয়া উঠিতেছে। সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক তাহার পাঠের সুবিধা বুঝিয়া বিভিন্ন রেডিও প্রোগ্রাম শোনার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

শক্তি দাও

।। শ্রীবিষ্ণুপদ রায় ।।

শক্তি দাও,
মাগো, আমাকে অটুট প্রত্যয় দাও,
আমাকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করো,
সংকীর্ণ এ মনের অন্ধকার হ'তে
অমাকে বিস্তীর্ণ আলোকে নাও।

আমার একক জীবনের দ্বারে,
ওগো চিন্ময়ী, একবার দাঁড়াও
ভুবনমোহিনী রূপে!
তোমার দিব্য জ্যোতির আলোকে
আমার সর্বাঙ্গ উদ্ভাসিত করো,
দুরন্ত কালবৈশাখী ঝড়ের আঘাতে
জীর্ণ পাতার মত, মাগো, এই সব জরা-জীর্ণ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ যেন
দূর করে দাও।

আকাশ আচ্ছন্ন অন্ধকারে,
সম্মুখে বহু বিঘ্ন, বাধা দুর্নিবার,
পথে আমি একা,
এ রাত্রির অন্ধকারে
মাগো, আমাকে এগিয়ে চলার সাহস দাও।

এই যে জীবনের পথ সর্পিল বন্ধুর,
বহু ঘটনায় পরিকীর্ণ চারিধার,
জানিনা কি আছে সম্মুখে,
আঁধারের স্তর ভেঙে ভেঙে
এগিয়ে চলেছি—
জানিনা কোথায় ভিড়বে জীবনের তরী।

মাগো, এ অন্ধকার রাত্রির বুকে
তুমিই আমার একান্ত সহায়;
আমার জীবনের ধ্রুবতারা;
আমাকে আশ্বাস দাও, শক্তি দাও, সাহস দাও,
মাগো, তোমাতে অনন্ত প্রত্যয় দাও।

একটি অমর সাহিত্য ঃ জঙ্গল

॥ শ্রীকেশবকুমার ভট্টাচার্য্য ॥

আপ্‌টন সিনক্লেয়ারের 'জঙ্গল' (Jungle) একটি মহৎ ও সুবৃহৎ উপন্যাস। মোট পৃষ্ঠা ৪২৩। আমেরিকার শিকাগো শহর ও প্যাকিং টাউন হচ্ছে এর পটভূমি। এর লেখক একজন আমেরিকান। ইনি প্রথম জীবনে অনেক দুঃখ দারিদ্র্যেই জীবন অতিবাহিত করেন। পরে কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করেন। খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ ক'রে বিশ্ব-খ্যাতও হন। আমেরিকান সাহিত্যে এঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং 'জঙ্গল' লিখেই আমেরিকা তথা সমগ্র পৃথিবীতেই অর্জন করেন বিশ্বখ্যাতি। কিন্তু প্রথম জীবনটি ছিল দুঃখ কষ্ট, অভাব, দারিদ্র্যে সমাচ্ছন্ন। যুবক আপ্‌টন ছোটবেলা থেকেই ছিলেন সাহিত্যনিষ্ঠ এবং আশাবাদী। অল্প বয়স থেকেই শিখেছিলেন সব কিছু বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রতে। প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্য মণ্ডিত ক্ষুদ্র প্রিন্সটনের কাছাকাছি অরণ্য ভূমিতে বসবাস করে হয়তো লেখক হ'তে পারতেন কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে যে সৎ সাহিত্য সৃষ্টির অংকুর জেগে উঠলো তা তাঁকে পরবর্তী কালের এক সুমহান প্রতিভা'ধর সাহিত্যিকেই রূপান্তরিত ক'রলো। এই প্রিন্সটন থেকেই নতুন উপন্যাস লেখার বাসনা সার্থক হয়। এখান থেকেই শিকাগোর সাত সপ্তাহব্যাপী ভ্রমণ এবং অবস্থানের সিদ্ধান্ত হয় তাঁর নতুন উপন্যাস 'জঙ্গল' লেখার উপাদান সংগ্রহের জন্যে। প্যাকিং টাউনকে উপজীব্য ক'রে যে গ্রন্থ লিখলেন, সেটি আমেরিকান সাহিত্য এবং ইতিহাসে একটি অতি বিশিষ্ট বস্তু হয়ে চির অমর হ'য়েই গেল। এই সম্বন্ধে 'Literary America' যা লিখেছেন, সেটি হচ্ছে—Young Upton Sinclair was a poverty stricken, would be writer living in the woods near Princeton, N. J. where he took a seven-week trip to Chicago to gather material for the book on 'Packing town that became a milestone in America literature and history.

এই সুমহান উপন্যাসটির রচনা সমাপ্ত হ'লে এ প্রথমেই ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় তৎকালী আমেরিকান সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা 'দি এ্যাপিল্ রিজন্'-এ। এটি প্রকাশিত হ'তে থাকতে থাকতে পাঠক-পাঠিকাগণের মনে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয় অভূতপূর্ব সাড়া জেগে ওঠে। এই মহান্ গ্রন্থটির দৃ ভাবধর ও কাহিনীটি সকলের অন্তর্লোকে সক্রিয় চিন্ত আত্মসমীক্ষণ এবং বিদ্রোহী ভাব-ধারার নব তরঙ্গ-সৃ আনয়ন করে। এই সম্বন্ধে 'Literary Americ যা লিখেছেন, সেটি নিম্নরূপ:—The Jungle, fir serialised in the socialist paper The Appe to Reason, told the fate of immigran living and working in the stockyard are their struggle to find and keep a jo and to bring up a family in the midst brutal exploitation.

এই সুবৃহৎ উপন্যাসের নায়ক হ'চ্ছে ইউরগিস্ রুদ্ এবং এর নায়িকা ওনা লুকোশাইট। এ ছাড়া উল্লে যোগ্য চরিত্র—মেরারিজা (ওনার দিদি), এলজবিয়ে (ওনার মাসী), টামোজিয়াস্ কুসংলেইকা (বেহা বাদক, পরে মেরারিজার প্রণয়ী), ডেডে এ্যান্টেন (ইউরগিসের পিতা), এ্যান্টেনাস্ (ইউরগিসের শিশুপুত্র জোনাস, ভোসিলাস, কোনর (ওনার দেহভো নিপীড়নকারী), কোটিনা (ছোট মেয়ে), জেডি (মাত যুবক), ওস্ট্রিন্ (একজন নামকরা সমাজতন্ত্রী দলে নেতা) শ্রীমান্, লুকাস্ (এঁরাও ঐ দলীয় ব্যক্তি)।

ছাড়া আরও অসংখ্য অজানা অপরাপর চরিত্র ইত্যাদি। এতো ছোট-বড়-মাঝারি চরিত্র নিয়ে বিপুল পরিমাণ ঘটনার উপস্থাপন সংযোগে মূল কথা-বস্তুর লক্ষ্যটি কেন্দ্রায়িত ক'রে এত বিরাট আয়তন উপন্যাস বিশ্ব-সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট। এই উপন্যাসের বিরাটত্ব যতখানি তার চেয়েও বেশী এর মহত্ব, এর সুপবিত্র মানবত্বের অমৃতময়, সুখ, সুন্দর মহাবাণী।

এই গ্রন্থে আমেরিকার 'শিকাগো' এবং 'প্যাকিং টাউন' মূল পটভূমি। সমগ্র প্যাকিং টাউন জুড়েই অসংখ্য মাংস ব্যবসায়ীদের কারখানা, সাব কারখানা, ক্রয় বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনযুক্ত প্রচার বিপনী। নানান্ ধরণের গণ্ডগোল। মলিন হতশ্রী বস্তি অঞ্চল। শ্রমিকদের থাকবার কি কদর্য্য, আলোক বাতাসহীন ব্যারাক! অত্যাচারিত, অনাহার পীড়িত, নির্মম ভাগ্য বিড়ম্বিত শ্রমিকদের কি নিদারুণ, অন্ধকার-রুদ্ধ জীবন! আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ শ্রমিকদের খাদ্য, বাসস্থান, জীবিকা, বস্তি জীবন, তাদের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি গ্রন্থটির পৃষ্ঠায় এতো অনবদ্য নিপুণ ভাষায় ফুটে উঠেছে যার এক কথায় তুলনা নেই। সংক্ষেপে বলা চলে গ্রন্থটি শ্রমিক-জীবন ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মহাকোষ (Eucyclopadea) বিশেষ। অপর পক্ষে, মালিক শ্রেণী পুঁজিপতি (Capitalist) দের সাধারণ দরিদ্র শ্রমিক (labour)দের উপরে অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার এবং পশুবলভ, নির্মম শোষণের অতি সুন্দর, স্পষ্ট ছবি আছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলার মুনাফা লুটছেন এই সব মালিক শ্রেণী। এঁদের স্বার্থ, আরাম, ভোগ, আনন্দ, অহংকার, বিলাসিতার অফুরন্ত তরঙ্গস্রোতে যোগান দিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, দেহের রক্ত নিঙড়ে, সমস্ত শ্রম নিঃশেষিত ক'রে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শুধু প্রাণের ডালি নিবেদন করছেন এই সব হতভাগ্য, অসহায় দরিদ্র শ্রমিক সাধারণ। এঁদের প্রতি সমবেদনা কিম্বা একটুকু সহানুভূতি দেখানোরও কেউ নেই। কেউই চাননা এঁদের জীবন উন্নত হোক, প্রকৃত মানুষ হবার অধিকার নিয়ে এঁরাও বাঁচুক। এঁরাও যে মানুষ! এই সব কারখানার মালিক গোষ্ঠি—এঁরা শুধু চান মুনাফা। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ডলার। এ ছাড়া কিছুই নয়। তাই এঁদের বলা চলে পশুরও অধম, দুষ্কবাজ, মানবতার শত্রু, মানব দ্রোহী। তাই আপ্‌টন সিনক্লেয়ার তাঁর এই মহান, অনুপম, সুবৃহৎ উপন্যাসটির পৃষ্ঠায় যে অসীম দরদ ও মানবতার আকুতি নিয়ে শ্রমিক নরনারীদের মর্মস্পর্শী জীবন-চিত্রটি তুলে ধরেছেন তা বিশ্ববাসীর কাছে চির-উজ্জ্বল হ'য়েই থাকবে। শ্রমিক চরিত্র রূপে তাঁর 'ইউরঘিস্' বিশ্বসাহিত্যে একটি অন্যতম চরিত্রায়ন।

লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে উপন্যাসটি মূলতঃ বর্ণনা-প্রধান। এই বর্ণনাটি এতোই নিখুঁত এবং সুস্পষ্ট যে পাঠকের মনকে মুহূর্তেই বশীভূত করে। শিকাগোর প্যাকিং টাউন, কারখানা অঞ্চল, বস্তি অঞ্চল, শ্রমিক জীবন, ধনী মালিক শ্রেণী, হতভাগ্য অতি দরিদ্র শ্রমিক নর-নারীদের হাসি কান্না, আশা আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদির চিত্রগুলি এতো জলের মতো পাঠকের চোখে স্বচ্ছ হ'য়ে ফুটে ওঠে যে, লেখককে প্রণতি এবং তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। এতে আছে অসংখ্য চরিত্র, অগণিত ঘটনা। যে যে ঘটনাগুলি এই উপন্যাসের মূল ও মুখ্য ঘটনা সেগুলি—(১) স্বভবন ছেড়ে, শান্ত, নির্জন প্রকৃতির কোল থেকে ইউরঘিস রুড্কস্, ওনা, তেতে এ্যান্টেনাস্, মেয়ারিজা, এল্‌জ্‌বিয়েটা প্রভৃতির প্রচুর অর্থোপার্জনের স্পৃহায় সুদূর শিকাগোতে প্যাকিং টাউনে আসা, (২) ইউরঘিস্ ও ওনার বিবাহ (নায়ক-নায়িকার মিলন), (৩) পিতা বৃদ্ধ তেতে এ্যান্টেনাসের মৃত্যু। (৪) ওনা-ইউরঘিসের কারখানায় চাকরী, মেয়ারিজারও চাকরী, (৫) অর্থ দ্বারা ক্রীত বসত বাড়ীটি অতি সুদের আতিশয্যে অধিকারচ্যুত, (৬) ওনার আকস্মিক অকাল মৃত্যু। (৭) ওনা-ইউরঘিসের পুত্র অল্প বালক এ্যান্টেনাসের রাস্তার বর্ষণ সঞ্চিত জলে ডুবে গিয়ে অকাল মৃত্যু (৮) দুর্ভাগা ইউর্‌ঘিস রুড্কসের সংসার ছেড়ে পলায়ন। (৯) তার ভবঘুরে বৃত্তি। (১০) শিকাগো শহরে নিরুপায়

ভিক্ষাবৃত্তি। (১১) শিকাগোর পথে ভ্রাম্যমান ইউর্গিসের সঙ্গে প্রচুর ধনী ও মাতাল যুবক ফ্রেডির সাক্ষাৎকার এবং ঘটনা পরম্পরায় একশো ডলারের নোট প্রাপ্তি। (১২) ইউর্গিসের কারাবরণ ও বিচার। (১৩) মুক্তি পাবার পরে পুনরায় দুর্বৃত্ত ও পাপ জীবনে প্রবেশ। (১৪) পুনরায় জীবনে আসে আকস্মিক পরিবর্তন: শহরের হলঘরের জন সভায় সমাজতন্ত্রী বক্তার বক্তৃতা শ্রবণ। (১৫) পুনরায় শুভ সৎ জীবনে প্রত্যাবর্তন এবং এল্‌জ্‌বিয়েটা-মেরারিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, আলোচনা। এবং সব শেষে উপন্যাসের উপসংহারে (১৬) ইউর্গিসের সমাজতন্ত্রী দলের সভ্য হওয়া, এই দলের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে প্রাণ ঢালা পরিশ্রমদান এবং পরিণামে সাধারণ নির্বাচনে শিকাগো শহরে, প্যাকিং টাউনে, আমেরিকার বহু স্থানেই সমাজতন্ত্রী দলের বিপুল জয়। দরিদ্র হতভাগ্য শ্রমিকগণের ভবিষ্যৎ জীবনে বিপুল সঙ্কটের মধ্যে দিয়েই নতুন আশা, উদ্দীপনা ও আলোর বাণী।

গ্রন্থটির উপজীব্য ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের সময়। তৎকালীন আমেরিকার ধনী সমাজ, তাঁদের অবস্থা, পশুতুল্য ভয়ঙ্কর অত্যাচার, তাঁদের পাপপঙ্কিল, নির্লজ্জ ভোগবিলাস, কদর্য অর্থলালসা এবং অতি দরিদ্র, নিপীড়িত, নিগৃহীত শ্রমিক সমাজের প্রকৃত রূপটি শক্তিমান ঔপন্যাসিক অসামান্য শিল্প-কৃতির গুণেই সাহিত্যে স্থায়ী রূপেই ফুটিয়ে তুলেছেন। সাহিত্য যদি জীবন-সম্পর্কিতই হয় এবং যদি তার কাজ হয় মানুষের মঙ্গল সাধন এবং এই জন্যেই যদি থাকে তার সৃষ্টি হওয়ার সার্থকতা, তবে 'জঙ্গল' তার সব চেয়ে প্রকৃষ্টতমই উদাহরণ। মানব মনের সুপ্রবৃত্তি, সুস্থ সুন্দর জীবনক্ষেত্র, বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-পথকে কি ভাবে সহজ-সাধ্য করা যায় এ বিষয়ে সাহিত্য বহু কাল ধ'রেই সাধন-নিমগ্ন হয়ে তার কাজ ক'রে চলেছে। 'জঙ্গলে' সেই পূতঃ-পবিত্র সাহিত্য কর্মটি একেবারেই সুপরিস্ফুট। সেই কারণেই এই গ্রন্থটি বিশ্বনন্দিত।

তাছাড়া এই গ্রন্থটির আরও একটি মহৎ দিক আছে। সেটি শিকাগোর প্যাকিং টাউনে মাংস তৈরীর কারখানাগুলিতে অতি বড় বর্বর, অমানুষিক ভাবে পাইকারীহারে যে নৃশংসতারেই বিপুল সংখ্যক পশু হত্যা করা হয় তার মর্মস্পর্শী ছবি। এই ছবিগুলি অতি নিপুণ এবং হৃদয়-বিদারক। এখানে প্যাকিং টাউনে নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে যে সমস্ত পশু প্রাণীকে রেলগাড়ী করে আনা হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে, তাদের যে কর জীবন পৈশাচিকরূপেই হত্যাঘরকে নিয়ে গিয়ে বধ করা হয় তার করুণ, হৃদয়স্পর্শী, একেবারেই অনাবরণীয় ছবি মানবতার আবেদনে মর্মান্তুদ ক'রে তুলেছেন। শো শুয়োর, ছাগল, ভেড়ার অসহায় করুণ কান্নায় তাই সব শিকাগো শহরের আকাশ বাতাস নিনাদিত, তাদে ভাষা, উত্তপ্ত রক্তিম রক্ত বন্যায় কারখানাগুলো ভাসে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে যখন তাদের মস্তিষ্কে অতর্কিত লোহার ডাণ্ডা মারা হয়—তারা আকস্মিক মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রচণ্ডতম আঘাতে গগন-বিদীর্ণ কান্নায় কাতর আর্তনা ক'রে ওঠে। তারপর তাদের দেহ বিভিন্ন মেশি নানা ভাবেই কাটছাঁট করা হয়। এর মধ্যে অন থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় অগণিত শ্রমিকের দরক পড়ে। তাই আছে এদের শ্রেণীবিভাগ। গোমাং পশুমাংস টিনের কৌটায় ভর্তি হ'য়ে চ'লে যায় নানা মানুষদের জন্যে এই পৃথিবীরই বিভিন্ন জায়গায়। এ হত্যাকাণ্ড এবং বধ্য ভূমির চিত্রটি লেখক এম্‌নিভাবে বর্ণনা ক'রেছেন, লক্ষ্যণীয়—'North and south far as the eye can reach there stretch a sea of pains. And they were all fill so many cattle no one had ever dream existed in the world. Red cattle, blac white and yellow cattle; old cattle a young cattle, grate bellowing bulls a little calves not an hour born; meek-ey milch cows and fierce long horn Texas steers. The sound of them he was of all the barnyards of the univer …"By to-night," Jokubas answered, "th will all be killed and cut-up." (Upt Sinclair's The Jungle)

এই উপরিউক্ত বর্ণনাটির মধ্যে নিরীহ, নিষ্পাপ পশুগণের জীবনের করুণ আর্তনাদ বধ্যভূমিকে এবং সভ্যতাগর্বী, হত্যাকারী মানব জল্লাদের অপরিসীম কলুষ মহিমাকে একেবারেই মসীলিপ্ত কালিমায় ভরিয়ে দিয়েছে! ভয়াবহ এই হত্যাকাণ্ডটি দেখে তাই মানুষকে মানুষ ব'লেই মনে করা চলে না আর। মনে হবে মানুষ পশুরও অধম, হীনমন্য। পশুরাও কখনও এই রকমের নৃশংস মানব হত্যা ক'রতে পারে না। তাই দৃঢ়কণ্ঠেই, বজ্রনির্ঘোষ ভাষায় সিনক্লেয়ার ব'লেছেন—শিকাগো আমেরিকা—এ আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র নয়, মানবধর্ম এবং অহমিকা—এ সমস্তই নিরর্থক। এ শহর নয়। এ নয় সভ্যতা। এ জঙ্গল। মানব পশুর বাসভূমি। তাছাড়া মানুষকেও এখানে পশুর মত ব্যবহার করা হয়। শ্রমিকেরা মালিকের কাছে গণ্য হয় না মানুষ ব'লে। তাঁরাও ঐ বধ্যভূমিতে আনীত পশুদের সমান। তাই তাঁদের কারখানার অল্প বেতনের চাকরির যাতাকলে, চরম, শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে সম্পূর্ণ পশুর মতোই তিল তিল ক'রে দিনের পর দিন হত্যা করা হয়। পুণ্য মানবতার এতো বিরাট, এতো বড় এই অপমান—এই এতো নিদারুণ, এই কলঙ্করেখা সর্বংসহা মাতা বসুমতী কখনই সইবেন না। কতকগুলি 'মানুষ-নাম-ধারী জানোয়ারের' শুধু লোভে আর হীন স্বার্থের জন্যে মানুষের এই একটা বিরাট অংশেরই এই করুণতম অসহায় জীবন বিনষ্টি—এ কখনই চ'লতে পারে না। এ বিধাতার নয় অভিপ্রেত।

অতি নিপুণ দরদী লেখনীতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন মানুষের দুই রূপ (১) দরিদ্র, হতভাগ্য, লাঞ্ছিত শ্রমিক শ্রেণীর জীবনছবি এবং (২) উৎপীড়ক, অহংকার পুঁজীপতি মালিক শ্রেণীর জীবনরূপ। এই দুই বিপরীত ছবির মধ্যে দিয়েই তিনি পাঠক পাঠিকাদের মনে বিদ্রোহের অগ্নি-কণা উদ্গিরণ করেন। বাংলায় অনূদিত শুদ্ধোধন সেনের 'জঙ্গল' থেকে এই দুই বিপরীত ছবিরই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করলুম—'এই শিকাগো সহরের কথা ধরুন। এখানেই আজ, এই রাত্রে দশ হাজার স্ত্রীলোক ক্ষুধার তাড়নায় দেহ বিক্রী ক'রছে নোংরামির বস্তীবাসে। এই সব মেয়ে আপনাদেরই মায়ের প্রতিমূর্তি, হয়তো আপনাদের বোন, হয় তো মেয়ে। আজ যে শিশুকে বাড়ীতে রেখে এখানে এসেছেন, কাল সকালে যার হাসিতে আত্মহারা হবেন—দেহ বিক্রয় করাই হয় তো তার ভবিষ্যৎ ভাগ্যলিপি। আজ, এই রাত্রে, এই শিকাগোতে দশ হাজার সক্ষম দেহ জোয়ান কাজ কাজ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজ ক'রতে তারা ইচ্ছুক, কিন্তু পাচ্ছে কী? পাচ্ছে ক্ষুধা, দুর্দশা, অপমান; গৃহহীন হতভাগ্যের দল শীতকালের এই ভয়াবহ ঠাণ্ডায় অপেক্ষা ক'রছে বিভীষিকাময় মৃত্যুর। এই, এই রাত্রেই শুধু এই শিকাগোতে এক লক্ষ শিশু এক টুকরো রুটীর জন্যে খুইয়ে ফেলছে নিজেদের শক্তি, ফুঁকে দিচ্ছে তাদের জীবন; আজই লক্ষাধিক মা দারিদ্র্যে দুর্দশায় বিপন্ন ভাবে কাঁদছে কোন অন্ধকার বস্তিতে। কেন? শেষ সাধ্যমত মেহনত ক'রেও সন্তানদের মুখে একটু খাবার দিতে পারছেন না ব'লে। লক্ষের অনেক বেশী বাতিল বৃদ্ধ এই শীতের ঠাণ্ডা রাজপথে অসহায়ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা ক'রছে—এই ভয়ানক মৃত্যু তাদের কাছে আশীর্বাদ, মৃত্যুই তাদের মুক্তি দেবে সকল যন্ত্রণার কবল হ'তে—এদের ললাট-লিপি—অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতা, ব্যাধি, গরম, ঠাণ্ডা, অবসাদ আর মত্ততা ব'য়ে চলা। এবার দৃষ্টি ফেরান আপনারা আমার সঙ্গে এই চিত্রেরই অন্যদিকে। হাজার জন—হয়তো দশহাজার—এরা এই সব গোলামের মালিক, তারা ভোগ ক'রছে এদের মেহনৎ। যা ভোগ ক'রছে, সেটুকু রোজগার করবার জন্য বিন্দুমাত্র পরিশ্রম তারা করে না। ভোগ্যবস্তু পাবার জন্য মুখ ফুটে ব'লতে পর্যন্ত তাদের হয় না।—আপনা হ'তে বিপুল অর্থ আসে তাদের কাছে, অভাব তাদের ভাবনা নয়, ভাবনা কী ভাবে ঐ অর্থ খরচ ক'রবে। তারা বাস করে প্রাসাদে, বিলাসিতার উচ্ছৃঙ্খলতায় মশগুল করে, সে বিলাসিতা উচ্ছৃঙ্খলতা বর্ণনা করবার ভাষা নেই; কল্পনা টলে যায়, তার সামনে মানবাত্মা অস্বস্তি বোধ করে। তারা শত শত ডলার

খরচ করে এক জোড়া জুতো, কি একখানা রুমাল কিম্বা এক জোড়া গার্টারের জন্য; ঘোড়া, মোটর, বজরা, বাড়ী, একটা জোম, বা দেহ সাজাবার ছোট চকচকে এক টুকরো পাথরের জন্য তারা খরচ করে লক্ষ লক্ষ টাকা। চাষী জমি চাষ ক'রছে, খনি-শ্রমিক পৃথিবীর গর্ভ খুঁড়ছে, তাঁতি মাকু চালাচ্ছে, রাজমিস্ত্রী ইঁট পাথর দিয়ে বাড়ী তৈরী ক'রছে, বুদ্ধিমান আবিষ্কার ক'রছে, চতুর পরিচালনা ক'রছে, বিজ্ঞ শাসন ক'রছে, অনুপ্রেরণা-প্রাপ্ত গাইছে—আর এ সব কিছুর ফল, মস্তিষ্ক ও পেশীর শ্রমের উৎপাদন সমবেত করা হয় বিপুল এক স্রোতে, সে স্রোত গিয়ে পড়ে কয়েকজন ধনীর কোলে। সমগ্র সমাজটা তাদের মুঠির মধ্যে।' (পৃষ্ঠা : ৪৯৪-৯৬)। আমরা সুতরাং দেখতে পেলুম এই কাব্যেই তিনি শ্রমিক ও মালিক জীবনের দুটি অতি স্পষ্ট ছবি অঙ্কিত ক'রে পৃথিবীর মূল সমস্যাটির উন্মোচন ক'রেছেন এবং সব শেষে তিনি যেন সমাধানের পথ খুঁজে পাবারও একটা প্রয়াস ক'রেছেন। সেটি সমাজতন্ত্রবাদ। এই মতবাদের সাহায্যেই পুঁজিবাদকে দূর করা যাবে পৃথিবী থেকে। আর এর জন্যেই চাই বিপ্লব। চাই জাগ্রত এক নব আন্দোলন। তাই শ্রমিক শক্তিকে আহ্বান জানিয়ে উদাত্ত কণ্ঠেই তার সেই প্রচণ্ড শক্তির সম্ভাবনার কথা প্রকাশ ক'রে জানালেন—'শ্রমিক শক্তি! অপমানিত, পদদলিত হ'য়ে প'ড়ে আছে তার বিপুল, বিরাট দানবীয় পর্বতপ্রমাণ দেহ নিয়ে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সে অজ্ঞ, তাই পেরেছে শত্রুরা একে অন্ধ ক'রতে, বেঁধে রাখতে। তবু সেই পতিত অন্ধ আবদ্ধ দেহের মধ্যেই দানা দিচ্ছে প্রতিরোধের পথ, আশা লড়ছে তার আক্রমণকারী জাতির বিরুদ্ধে। যেদিন এ দেহ নড়বে, তার নড়ার সঙ্গে শেকলের একটা আঁকড়ি কেটে যাবে, অমনি আশার প্রবাহ বইবে তার বিরাট দেহের প্রান্তস্থিত শিরা উপশিরায়,—তখন? তখন নিমেষের মধ্যে তার স্বপ্ন হবে সম্পাদিত ঘটনা। একবার চমকে উঠবে বই কি! তারপর সে দাঁড়াবে উঠে উন্নত মস্তকে,—ছিঁড়ে যাবে বাঁধনের শেকল,—তার বুকের ওপর চাপান পাথর গড়িয়ে প'ড়বে। সে দাঁড়াবে—আকাশচুম্বী তার উন্নত শির, পৃথিবীব্যাপী তার দেহ, তার শত লক্ষ আনন্দের ধ্বনিতে—(পৃষ্ঠা : ৪৯৯)।

আমাদের বিশ্বসাহিত্যের মহান্ এবং অমর সাহিত্যাগ্র এই 'অঙ্গনে' আপ্‌টন সিনক্লেয়ারের নাম স্বর্ণাক্ষরেই লেখা থাকবে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের বলিষ্ঠ মানবতার আবেদনে হৃদয়স্পর্শী, আশাপূর্ণ প্রখর তেজী মহৎ উপন্যাস রচিত হোক—এই ধরণের শক্তি ও উপযুক্ত প্রতিভা নিয়েই আজকার লেখকবৃন্দ এগিয়ে আসুন।

উজ্জ্বল ভারত

॥ শ্রীসুধীর গুপ্ত ॥

কবে—কবে কবে হবে উজ্জ্বল ভারত ?
কবে ভবে মুগ্ধ হবে তাঁরে সবে হেরি' ?
পূর্ণ হবে মহোৎসবে ভারতের ভেরী
মুখর করিবে কবে সভ্যতার পথ ?
অতীত জীবনে যেথা আছে যা' মহৎ—
মৈত্রী-মাখা—মধুময়, কবে তা'রে ঘেরি'
স্পন্দমান হবে প্রাণ ? কবে বিশ্ব বেড়ি'
চক্রমিবে ভারতের বৈজয়ন্ত-রথ ?
সর্ববিধ বন্ধ হবে প্রেমের প্রাকার
পরম-প্রিয়ের বার্ত্তা করিবে বহন,
প্রেম হবে প্রতি চিত্তে প্রীতি-পিপাসার
লক্ষ-প্রিয়-সঙ্গ-সুধা করিবে সৃজন,
উজ্জ্বল ভারত লক্ষ বক্ষ-বর্ত্তিকায়
সেদিনই নিশ্চিত ভাবে ভরিবে ভুবন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫১—

(২৬)

…সকালে নাক দিয়া কয়েক ফোটা রক্ত পড়ে।… নাকে জলপট্টি রেণু দেয়। থামিয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায় আজ শেষ হয়।…৪টায়…আবার নাক দিয়া কয়েক ফোটা রক্ত পড়ে।…

৪ঠা নভেম্বর

…ইতিমধ্যে নাক দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে…। দুপুরে খাইতে বসিয়াছি, তখনও রক্ত পড়া আরম্ভ হয়।…বরফ দিতে থাকি। হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়।…মানুষ চাই। মানুষ মানুষ করিয়া কত কাঁদিয়াছি; কৈ, পাইলাম না তো।…২টায় উঠি, তখন plug বদলাইবার পরে রক্ত পড়ে।…

৫ই নভেম্বর

সকালে রেণু মঠের কাছে একটি ভাড়া বাড়ী দেখিয়া এখানে আসে।…১১টার পর হেমেশবাবু ও তাহার ডাক্তার আসেন। ব্লাড প্রেসারের ফলেই রক্তপাত, ইহা তাহার মত।…

৬ই নভেম্বর

…৭॥০টার পরই হেরম্ববাবু ও কানাইবাবু ডাক্তার আসেন।…নাক দেখিয়া বলেন, নাকের ভিতরই ঘা হইয়াছে, প্রেসারের জন্য এ রক্তপাত নয়।…ব্রহ্মসূত্র হইতে 'নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং' কথাটি আমার জীবন দিয়া কিরূপে আস্বাদন করিয়াছি, তাহা বলি। আমি তোমাদিগকে আমি বলিয়া জানি ও নমস্কার করিয়া চলিয়াছি। তোমাদের মধ্যে দিয়া তোমাদিগকে, তোমাদের ভাষার আমার ভাষাকে বুঝিতে চাহিয়াছি। তোমাদেরও চেষ্টা করা উচিত আমার মধ্য দিয়া তোমাদিগকে, আমার ভাষায় তোমাদের ভাষা বুঝিতে।… রেণুর সঙ্গে চলার process সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। আমার সঙ্গে থাকিয়া, আমার পাশাপাশি থাকিয়া, এক-হৃদয় লইয়া সমস্ত ঘটনা না দেখিলে যে পথ সামনের দিকে খোলা থাকিবে না, তাহা বারবার স্মরণ করাইয়া দেই। রেণু ৮॥০টার পর যায়।…ননিদার বাসায় অশ্বিনীবাবুর তিরোধান দিবস পালিত হয়, এক ভদ্রলোক আমাকে নিতে আসে। আমি খবর জানি না। খবর না জানিলেও যাইতাম, তবে নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে বলিয়া যাইব না বলিয়া দিলাম। দুর্গামোহনবাবু প্রেমানন্দ স্বামী আসিবেন শুনিলাম। ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। 'মাম্ অনুস্মর, যুধ্য চ' প্রবন্ধটি লিখিয়া আনে। বেশ হইয়াছে। কপি রাখিয়া দিতে বলিলাম…

৭ই নভেম্বর

…কয়েকটা বাড়ীর খোঁজ পায়।…দেখিতে যাইবে। আমার জীবনের সাধনা ও আকূতি যে ইহাদের জীবনের মধ্যেই ঘন করিয়া দেখিতে চাই, আমার ভার যে আজ ইহাদের উপর, তাহা রেণুকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দেই। আমার জীবনে জীবন সম্পূর্ণভাবে না মিলাইলে কিছুতেই জটিলতম পরিস্থিতি হজম করা সম্ভব হইবে না। 'যস্য নাহংকৃতো ভাবঃ বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে', ইহাই হইতেছে হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে'—এর প্রকৃতি মাত্র। নাহংকৃত হইয়া পুরুষোত্তমের আমির মধ্যে আমি মিলাইয়া দিলেই বিষ হজমের মত গুরুতর

পরিস্থিতির পরিপাক হইয়া যায়।…৫ ঘণ্টার উপর আজ ২ মাসের মধ্যেও ঘুমাই নাই। সে সময়ে শরীর সব দিক দিয়া শূন্য মনে হইতেছিল। প্রস্রাবের উপসর্গ নাই, নাকের রক্ত পড়াও বন্ধ হইয়াছে। এইবার হয়ত ভাল হইব। ১২০্ টাকায় বাড়ী ভাড়া করিব এ সব এক জায়গায় থাকিলে কাজ অনেকটা আগাইবে। নীলু আসিলে সে-ও বাঁচিত…

৮ই নভেম্বর

…প্রেস সিণ্ডিকেটে যাই, টি বোর্ড-এর ১০ মাসের জন্য বিজ্ঞাপন পাই, টাটাতেও যাই।…জীবনে চাই বিচার ও বিশ্বাসের সমন্বয়। ভক্ত যেন বিচার শক্তি, শিষ্য করিবেন গুরুতে বিশ্বাস। 'দদামি বুদ্ধিযোগম্'—ইহাই ভগবানের ব্রত। আর ভক্ত থাকিবেন, 'সততযুক্ত', 'ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্'। আগে মাথা পাতিয়া নিতে হয়, পরে বিচার করিতে হয়। আমি কি জানি আমার কিসে কল্যাণ? সদ্গুরু জানেন। তিনি তো আমার কল্যাণকর হইবে না, এমন কিছু বলিতে পারেন না। বালকের মাকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কি? সে কতটুকু তাহার নিজের কল্যাণ জানে? আমি যদি বিচার করিতাম, বুদ্ধি খাটাইয়া প্রার্থনা করিতাম, আমি কি ঠাকুরের কাছে বেদান্তদর্শনের ভাষ্য লিখিবার শক্তি চাহিতে পারিতাম? কি জানিতাম বেদান্তের, কি-ই বা মূল্য ছিল আমার সেই প্রশ্নের? তিনি তাঁহার ব্রত রক্ষা করিবার জন্য আমায় বুদ্ধি-প্রেরণা দিয়াছেন—'ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ'। গুরুর কাজ ধীশক্তির প্রচোদনা; শিষ্যের ধর্ম্ম বিশ্বাস করা। এই ভাবেই বিচার-বিশ্বাসের সমন্বয় সম্ভব। গোড়াতে অস্বীকার করিয়া বিচার করিতে গেলে বিচারের ভুলে জীবন নষ্ট হইবে।…

৯ই নভেম্বর

…ঘটনাকে যথাযথ মূল্য দিয়া যে স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জীবনে পরিপাক করা যায়, সেই স্থান ও জীবন লাভ করিয়া ঘটনার মীমাংসার কথা বলে। নব জীবনে যে 'ঘটনা' আসিয়াছে তাহা God-sent; উহাকে হজম করিতে হইলে 'প্রোজ্ঝিতলোক-দেহ-স্ব' হইতেই হইবে। নূতন সমাজ গঠন করিবার মহাব্রত লইতেই হইবে। লুকাইয়া লুকাইয়া ঘটনাকে যেমন তেমন করিয়া চাপা দিয়া 'মুক্ত' হইতে চাহিলে তাহা পুরুষোত্তম-অনুমোদিত হইবে না। ঘটনাকে বীরের মত face করিতে হইবে, পরিপাক করিতে হইবে। তাহাতে লোকের খেয়াল, দেহের খেয়াল, নিজের খেয়াল যদি অতল জলে ডুবিয়া যায়, যাউক। লোকত্যাগিনী, দেহত্যাগিনী ও স্ব-ত্যাগিনী হইতে হইবে। এজন্য চাই অচল অটল ভগবানে 'বিশ্বাস', ভগবানের দেওয়া ঘটনায় বিশ্বাস, আর গুরুপাদপদ্মে বসিয়া 'বিচার'; চোখ বুজিয়া নিতে হয়, আর চোখ মেলিয়া দেখিতে হয়। চোখ বুজিয়া নেওয়াই বিশ্বাস, চোখ খুলিয়া দেখাই বিচার।

১০ই নভেম্বর

…গীতা ভবনে যাই। আধ ঘণ্টা পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। সভাপতি হন হেমন্তকুমার বসু মহাশয়। প্রথমে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে আচার্য্য জগদীশের স্নেহের কথা উল্লেখ করিয়া আত্মনিবেদন করি। কেমন করিয়া তাঁদের বাড়ী হইতে রাত্রি ১১৷০টার সময় আসিয়া কড়কড়া ভাত খাওয়া উপলক্ষে আচার্য্য জগদীশ তিরস্কার করিতেন ইত্যাদির উল্লেখ করি।…

১১ই নভেম্বর

…পুরুষোত্তম সমগ্র-দৃষ্টি বলিয়া সব-কিছুর আরম্ভ করেন, ভক্ত তাঁহাকে রূপ দান করেন নিজ জীবন দ্বারা। ভক্ত তাই 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী'। পুরুষ যাহা যাহা আরম্ভ করে, প্রকৃতি নিজ জীবনে তাহার রূপ দান করে। পুরুষ দেয় প্রেরণা, প্রকৃতি করে ধারণা। আমি অনেক কিছুই আরম্ভ করিয়াছি, অতি সুন্দর ভাবেই; কিন্তু তাহা রূপায়িত হয় নাই, কেননা ধারণ করিবার কেহ ছিল না। তাই স্নেহ্ প্রতিভাকে বলি—এইবারকার 'আরম্ভ' যেন ধারণ করার ও সাধনার অভাবে নষ্ট না হয়। বহু আগে

সার্থক হয় নাই। এইব্যবস্থায় আবার তোমরা ধারণা করিয়া রূপায়িত কর। আজ রেণুকে জয়েন্ট প্রোপ্রাইটর করিয়া লইবার জন্য ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নিকট আবেদন করা হয়। ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়নে পূর্বেই করিয়া লওয়া হইয়াছে। ৯টার মধ্যে ফিরি।…তৎকালিক সমস্যার সমাধান যে ভাবে ঠাকুর করিয়াছেন তাহা আজ ভাবিয়া পুলকিত হইতেছি। ধন্য তুমি। কাহাকেও আঘাত না করিয়া যথাসম্ভব প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া, সকলের ঋণ স্বীকার করিয়া নিজের আদর্শে স্থিত হইয়া পথ চলিলে বিশ্বের আনুকূল্য মিলিবেই। বিশ্ব যে মানুষের অপর দিক—organically related। মানুষ জোর করিয়া তাহাকে 'পর' মনে করে।…

১২ই নভেম্বর

নরনারায়ণ আশ্রমের জন্মদিন।

সকালে নরনারায়ণদেবের কাছে তাঁহার অযাচিত অবতরণ আমার হৃদয়ের মধ্যে বরণ করিয়া লই, নূতন যাত্রারম্ভের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা চাই। 'নরনারায়ণ' নাম জপ করি। প্রাণের ভিতর ইচ্ছা হইল রেণু-প্রতিভাকে লইয়া হরিদাসীর ওখানে যাই। তখনই রেণুকে সঙ্গে লইয়া বাসে যাই। সেখানে চোখের জলে আমার বেদনার কথা আলোচনা করি।…আফিসে গিয়া রেণু আমার সম্বন্ধে তাহার একটা লেখা শুনায়। আমার সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কেমন করিয়া intertwined হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অতীতের সমস্ত ঘটনার সাহায্যে আলোচনা করা হয়। আমার সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের সমস্ত অতীত ঘটনার একটা ব্যাখ্যা মিলিয়াছে। …শ্রীনিত্যগোপাল জীবনের সব পরস্পর বিরুদ্ধ বৃত্তি-সমূহের একটা সমাধান দিয়াছেন এবং সেই সমাধান আমার জীবনে তিনি ফুটাইয়া তুলিতেছেন। আমার জীবনে সকলেই তাহাদের জীবনের সমাধান পাইবে।…

১৩ই নভেম্বর

…মনে হইতেছিল, যাহারা একদিন ঠাকুরের পদপ্রান্তে আসিয়া ছিলেন, বেদনা পাইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছেন, তাহাদের কি আবার কুড়াইয়া আনিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত করা যায় না? ঠাকুর কি তেমন শক্তি দিবেন? আমার যাহারা রহিল, তাহাদের উপর সে ভার রহিল। রেণুকে একদিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ধীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে বলিলাম। তিনি চক্ষু অপারেশন করিতে কাল যাইবেন। ঠাকুরের জীবনদর্শন ইহাদের সামনে ধরিলে ইহারা জুড়াইয়া যাইবেন। ইহারা একদিন নাকি মঠে কত আনাগোনা করিয়াছেন। আর যান না। কি তাহাদের বা বেদনা, কি-ই বা ঠাকুরের বেদনা! এ বেদনা কি মুছিয়া ফেলা যায় না? সম্প্রদায়টাই সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত খোয়াইয়া ফেলিয়াছে।…

১৪ই নভেম্বর

…সকালে সাময়িকী 'নরনারায়ণ আশ্রম' লিখি। রেণু বাড়ি হইতে কুমারেশে যায়। মালতী পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে। অথচ সে খবরটা সে নিজে আসিয়া দিয়া যাইতে পারিল না। রেণুও তাহাকে ইহা বাতলাইয়া দিতে পারে নাই। শুনিলে যে খুশী হয়, তাহার কাছে কোনও খবর নিজে গিয়া দিয়া আসার ভিতর কেমন করিয়া প্রাণধর্ম আত্মপ্রকাশ করে, তাহা ইহাদের আজও জানা হয় নাই। প্রাণধর্মের আদি, ক, খ ইহাদের পড়ানো উচিত। সে যাক, পাশ হইয়াছে ইহাই ভাল। রেণু ১২টার পর এখানে আসে।…মালতী নিজের ভাবনা নিজেই যখন ভাবে, সে তাহার পিতামাতা ও ভাই বোনদের ভাবনাও যখন নিজেই ভাবে, তখন আমার ভাবিবার অবসর কোথায়? যদিও সে নাকি বলিয়াছে যে আমার জন্য ভাবিবার জন আছেন। আমার ও তাহাদের ভাবনার ধারা স্বতন্ত্র। আমি তাহাদের ভবিষ্যতে 'মানুষ' হওয়ার সঙ্গে বর্ত্তমান সম্ভাবনার সামঞ্জস্য করিয়া ভাবি, তাহারা বর্ত্তমানের উপরই জোর দেয়। যতখানি পারি, আমরা তাহার আনুকূল্য করিব, সে তাহার পথেই চলুক।…

১৫ই নভেম্বর

…রেণু আর এম্ এন্ রায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া ইষ্টার্ণ রেলওয়ের চেক আনে, পরে প্রেসে যায়। এখানে ২টার পর আসিয়া কিছু পরে দীপ্তি রওনা হইয়া হাসপাতালে রাজেনবাবুকে দেখিতে যায়। আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করে,…। প্রতিভা তাহার অতীতের ভাবময় অনুভূতির কথা বলে। সেই ভাব অন্তর্হিত হইল, যখন বাস্তবের ধাক্কা আসিয়া লাগিল। কাজেই ভাব যে ত্রিকাল-অবাধিত নয়, তাহা বুঝা দরকার। ঐ ভাবকে এখন কার্য্য-রূপ দান করিবার আকর্ষণ তো অন্তরেই চলিতেছে। প্রতিভা নিজেই ভীবার বশে যে ঘটনা এড়াইয়া চলার ফলে জীবনের এক দিক শুকাইয়া গিয়াছে। তাই সে সময়ের ভাব দাঁড়ায় নাই। আমি তো তাহারই পূরণের জন্য টানাটানি করিতেছি। আমার সারা জীবনের বেদনা এই যে, কেহ আসিয়া আমার করিয়া আমার কাছে কিছু চাহিল না। আমি ভার বহন করিতে চাই। কিন্তু কে আমায় ভার দিবে? তাই আমিও আমার বেদনার কথা কাহাকেও বলিব না। তোমরা তোমাদের, আমি আমার। তোমরা যদি আগাইয়া না আস, আমি একতরফা কত আর আগাইব?…

১৬ই নভেম্বর

…মানুষ যে কোন অবস্থাতেই finished product নয়, সে যে হইয়াই (becoming) চলিয়াছে, 'সৎ,' তাহার যে একটী ভাগবতী তনু আছে, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, মানুষের দেহ-প্রাণ-মন অনন্ত হওয়ার পথ ধরিয়াই হইয়া চলিয়াছে। নর 'করে,' নারায়ণ 'করেন না'; এই করা না করার সমন্বয়েই বিশ্ব চলিয়াছে। সৎ শব্দ 'অস্' ধাতু শতৃ করিয়াই তো হয়; 'সৎ' অর্থ হইতে হইবে। সৎ অর্থাৎ becoming। সারা জীবন বুঝিবা দেহের যত্ন লওয়া হয় নাই, তাই প্রতিভা-রেণুকে যত্ন লইতে বলি। চাই একটু আগাইয়া আসিয়া কেহ আদর যত্ন করে, যাহা সারা জীবন পাই নাই বুঝি। সুধার কাছ হইতে কিছুটা পাইয়াছিলাম। পাইতে পাইতে সে পলাইল। আমার বুকটা আজিও তাহার জন্য কেমন করে। কাল তাহার লেখা ২।১ খানি চিঠি শুনাইতে প্রতিভাকে বলি। আমি তাহার জন্য অস্থি পাগল। সে তো আমার কাজ করিবে বলিয়াছিল। আমার কাজ আছে, অথচ সে কোথায়?

১৭ই নভেম্ব

আমার জন্মতিথি কৃষ্ণা পঞ্চমী আজ।

সকালে প্রার্থনা করি। নিতাইগোপাল, আমার জ তোমার জন্ম হইয়া ঠিক, তোমার জন্মের বাহি আমার জন্মের কি মূল্য? তোমার জন্মকে দিবারা উদ্ভাসিত করার মধ্যেই রহিয়াছে আমার জন্মের সার্থকতা তোমার ও আমার জন্ম দিবসে নূতন জন্ম প্রদান করুক তোমার পুরুষোত্তম-দর্শন আমার জীবনের ভিতর দি বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হউক। রেণু ৮টার মধ্যেই ফুলে মালা ও কিছু মিষ্টি নিয়া আসে। ঠাকুরকে ভোগ দেও হয়। কিছু পরেই অমল আসিয়া এক জন গ্রাহকের না ৫৲ টাকা দিয়া যায়।…মাখনবাবু আসিয়া প্রণাম করে কিছু আগেই সেবানন্দ আসিয়াছিল।…১১টার হেমাঙ্গবাবু আসেন একটী ঝুড়িতে কলা আপেল মুসম্বি বড় একটা পেঁপে লইয়া। তাহাকে আমার সম্বন্ধে রে লেখাটা পড়িয়া শুনান হয়। প্রায় ১ ঘণ্টা থাকেন।– প্রণতি আসে…সুধাংশু আসে…মালতী আসে। আসে…যতীন চট্টোপাধ্যায় আসেন।…আজ লোকে যাতায়াতে রেণুর সঙ্গে তেমন কথাই হয় নাই। সে আমার দেখাই হয় নাই। দুপুরের পর সতীনাথ আসি ছিল।

১৮ই নভে

…কাল সমস্ত দিনে লোকের আসা-যাওয়ার ভিড় তাহার সঙ্গে একরূপ কোন কথাই হয় নাই। সে তাহার মনে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কিন্তু উপায় না সর্ব্বদা যাহারা কাছে থাকে, তাহাদের সে দিন সরিয় দাঁড়াইতে হয় যেদিন কোনও উপলক্ষে তাহারা আ যাহারা রোজ কাছে থাকেন না। এই ব্যবধানই

অবাবধানকে ছদ্মময় করিয়া তোলে। বেণু এখানে ১১টা পর্য্যন্ত প্রুফ দেখে।…বেণু দীনেশ রায়ের ওখানে যায়।… ধীরেন বানার্জী আসেন। তাহাকে মহাভারতের গল্প লিখিয়া দিতে অনুরোধ করা হয়। বেণুর কালিকায় লেখাটা তাহাকে পড়িতে দেওয়া হয়। একটী লোকের মারফত হেমাম্বরবাবু ৩ জন গ্রাহকের নাম ও ১২৲ টাকা পাঠাইয়া দেন। আর একজনের নাম দিয়াছেন। তাহার নিকট পত্রিকা পাঠাইলে সে টাকা পাঠাইয়া দিবে।…

১৭শে নভেম্বর

…আত্মাস্বাদনের দুইটী স্তর। একটী নিজের জীবনে আমার পুরুষ আমি ও প্রকৃতি আমির রমণ; কিন্তু ইহার পরেও আর একটী স্তর আছে। সে আমার পুরুষ আমির সঙ্গে আমার বাহিরের কোনও পুরুষোত্তম প্রকৃতি-আমির সহিত এবং আমার প্রকৃতি-আমির সঙ্গে সেই পুরুষোত্তম পুরুষ-আমির রমণ। এটী crosswise। দুইটাই পরস্পরসাপেক্ষ। ভাগবত দ্বিতীয় আত্মাস্বাদনের উপর জোর দেন।…উপাধিমুক্ত, ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবদেহের সেবা হইবে।

২১শে নভেম্বর

প্রতিভা ৮টার পর বেণুর ওখানে যায়। আমি যে সাময়িকী 'প্রাচ্য প্রতীচ্য বিরোধে ভারতের মধ্যস্থতা' লিখি, তাহা নকল করার পরই প্রতিভা যায়।…গোলাম মহম্মদ রোড, ল্যান্সডাউন রোড, মনোহর পুকুর ও সতীশ মুখার্জী রোডে ৭২ ঘণ্টা ব্যাপী সাইকেল-রেস দিতেছে কয়েকটী যুবক। বেশ লাগিল। একটী enterprise তো বটে। আমি বলিলাম, পুরুষোত্তম-সাধনায় মত এত বড় enterprise আর দ্বিতীয় নাই। এই পথ দুর্গম। এই enterprise-এ যাহারা কৃতকার্য্য হইবেন, তাহারা জগদ্বরেণ্য। হিমালয়-অভিযানের চেয়েও ইহা দুর্গম। তোমরা নিশ্চয়ই পারিবে। শ্রীনিত্যগোপাল সাক্ষী। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'। যেখানে প্রকৃতি তাহার চরম ও পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহারই নাম পরা প্রকৃতি; আর পুরুষ যেখানে তাহার সকল বৃত্তির চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহাই পর পুরুষ। শ্রীরাধা পরা প্রকৃতি, শ্রীকৃষ্ণ পর পুরুষ। তোমরা পরা প্রকৃতি হও…তোমরা এই বারেই ধন্য হইবে। হইতেই হইবে। না হইলে ছাড়িব না…।

২২শে নভেম্বর

…যতীশ দাসগুপ্ত আবার এক চিঠি দিয়াছে। অবধূত ভাষ্য চলিবে না, আমার এখন কোনও sacrifice নাই,…ইত্যাদি লিখিয়াছে। বলার অধিকার তাহার সবই আছে, কিন্তু এমন অশোভন ভাষায় বলিবার অধিকার কোনও ভদ্রলোকের নাই।

২৩শে নভেম্বর

…আজ পৌষ মাসের জন্য 'নির্বাচনের প্রাক্-কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ পত্তন করি। যজ্ঞেশ্বর সেন (গুণদাবাবুর ভাই) আসেন; অশ্বিনীবাবুর সম্বন্ধে কিছু তাহার নিজের লেখা পড়িয়া শুনান।…আজও সাইকেল রেসের তৃতীয় দিন চলিতেছে। ২৮ জন আরম্ভ করে: রাত্রি ৮টার পর ৫ জন টিকিয়াছে। উহার রিপোর্ট লইতে বলিলাম। মহানির্ব্বাণ মঠ হইতে আমাকে দিয়া কাজ করাইবার ইচ্ছা কি ঠাকুরের আছে? আমার সাহস হয়। মানুষ যদি হই, মেয়েরাই বা থাকিতে পারিবে না কেন? মেয়েরা মেয়েদের মধ্যে পুরুষোত্তমদর্শন প্রতিষ্ঠার জন্য ঘরে ঘরে ছুটাছুটি করিবে, মঠের কাজ করিবে, প্রয়োজন-মত ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশা করিবে। অবাধ মেলামেশা বর্ত্তমান যুগে ঠেকানো তো যাইবে না। অথচ কোন মঠই তো ইহার experiment করিল না। ইহার experiment এর জন্যই কি ঠাকুর মঠে মেয়েদের ডাকেন নাই? মঠে যদি রীতিমত পাঠ আলোচনা বক্তৃতা হয়, ঠাকুর সেবার যাবতীয় ভার যদি ভক্ত ও মহিলাগণ নেন, মঠবাসীদের সেবাশুশ্রূষার ভার যদি মঠ নেয়, তবে কেন অর্থে সামর্থ্যে আগাইয়া যাইবে না, কেন লোকের আস্থা ও প্রীতিভাজন হইবে না? মানুষ

অনর্থক সন্দেহ করে না। এই সব কথা অফিসে সন্ধ্যার পর বেণু-প্রতিভার সঙ্গে আলোচনা হয়। কি জানি কি তাঁহার ইচ্ছা।...মানুষের জীবনে তিনটী দর্শন—মাংস-শরীর, স্বপ্ন-শরীর, সুষুপ্তি শরীর। যাবতীয় ঘটনা এই তিন জায়গায় প্রতিবিম্বিত হয়। এই তিন জায়গার প্রতিবিম্বের সমন্বয় করিয়াই ঘটনা উপলব্ধি করিতে হয়।...যতীশ দাশগুপ্তের চিঠির ইঙ্গিত হইতেছে উজ্জ্বল-ভারতে এমন এমন প্রবন্ধ লেখা যাহাতে অবধূত ভাবের সঙ্গে বর্ত্তমান সাহিত্যের কি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তাহা প্রকাশিত হয়। কলি যুগে ভগবান ঘটনার ভিতর দিয়া কথা বলেন। ঘটনার ভিতরই ভগবানের ইঙ্গিত ধরিতে হয়। তাই পৌষ মাসে বেণুকে 'সাহিত্যের ইঙ্গিত ও উপাদান' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিতে বলি। বর্ত্তমানে আকাশ হইতে দৈববাণী আসে না।

২৪শে নভেম্বর

...সাইকেল রেসে দুইজন টিকিয়াছে—৫ ও ৯ নম্বর। ৫ নং প্রথম হইয়াছে। কালীঘাটের নির্ব্বাচন-প্রার্থী সুরেশ দাস সহ মনোরঞ্জন গুপ্ত আসে, আমাকে কংগ্রেসের পক্ষে বক্তৃতা দিতে বলে। আমার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থার কথা জানাই। আমার দর্শন সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হয়। বর্ত্তমান সমাজ-কাঠামোয় নর-নারীর অবাধ মিলনে যে ব্যভিচার ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা রোধ করা, ধর্ষিতা মেয়েদের স্থান দেওয়া, জারজদের সমাজে আনয়ন করা প্রভৃতি একেবারে অসম্ভব। পুরুষোত্তম-দর্শন ইহার মীমাংসা দিতে পারে। যাওয়ার অব্যবহিত পরেই বেণুর ওখানে হইয়া এখানে হেমাঙ্গবাবু আসেন। ১টা পেঁপে, কয়েকটা কমলা ও আপেল আনেন। তাঁহার কাছে মহাত্মাজীর সঙ্গে আমার জীবনগত সম্বন্ধ, আমার বাড়ীতে তাঁহার যাওয়া, বরিশালে অশ্বিনীবাবুর বাসায় তাঁহার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আমি বলি। তাঁহার নিকট আমার চিঠির বিবরণও বলি। আমি হেমাঙ্গবাবুকে আমাকে God-sent বলি, সে-ও আমার সঙ্গে দেখা হওয়াকে God-sent মনে করে। বেণুর সঙ্গে হেমাঙ্গবাবুর অনেক কথা হয়। এখানে আসে প্রায় ৩টায়। আমরা অফিসে যাই ৬টার পর। মহাত্মাজীকে আমি যে বলিয়াছিলাম, 'I will fight against Gandhi in order to maintain hi Gandhism'—ইহা বেণুর কাছে বলি। দাদা আমা জন্য মহাত্মাজীর কাছে আশীর্বাদ চাহিলে হাসিতে হাসিতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আপনারা ভাই হামারা সাথ লড়া মাংগ্‌তে হায়, হাম কৈসে আশীষ দেবে'। কি স্নেহ সন্ধ্যার পর জবা আসে—৩টি কমলা ও কয়েকটা ক লইয়া।...জড়ের স্তরে যত দেশগত অব্যবধান, আনন্দে স্তরে ততই ব্যবধান বেশী। আবার আনন্দের স্তরে য অব্যবধান, জড়ের স্তরে ততই ব্যবধান বেশী। V এব Λ। অর্থাৎ XX; পুরুষোত্তম স্তরে ইহার সমন্বয় XX V হইতেছে বিদ্রোহীর চিহ্ন, Λ হইতেছে সন্ন্যাসীর চিহ্ন।

২৫শে নভেম্ব

সকালে বেশ মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টি।...প্রতিভা বাজা হইতে বেণুর জন্য ঝিলমিল সোনালী ও সুইফট-এর এ টিন মাখন আনে। বেণুর বুকটায় চিন চিন ব্যথ বড়ই ভয় করে।...আমার কাছে যোগদান করি ইচ্ছুক। সে 'কূপের ব্যাঙ' হইয়া থাকিতে রাজী না সে-ও জীবন চায়, তাই আমার সঙ্গে তাহার চলিবার ইচ্ছ আছে। শ্বশুর মরিলেই সে আসিবে। এখন ছেলেমে দের পড়ায় ও গান শেখায়, তাহাতে ৮।৯৲ টাকা মা পায়।

২৬শে নভে

...মানুষের সব চলন-বলন যে ক্রমে মধুর।...'ত কথামৃতং তপ্তজীবনম্, শ্লোকটী আলোচনা হয়। কৃ ভক্তের কথাও হইবে অমৃত, তপ্তের জীবন। ক্রমে আচার মধুর হইতেও মধুর।...

২৭শে নভে

...কে জীবনের সব কাল মন্দ বলিয়া পথ ঠিক করি

বলি। সময় যাইতেছে। এখনও পথ বহিয়া চলা দরকার। জীবনের সব খুঁটিনাটি বলিয়া সময় যাপন না করিয়া লইলে কোন্ বলে সে পথ চলিবে? মানুষ কি নিজের ভার বহিতে পারে যদি না বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর তাহার সঙ্গে 'এক' হইয়া ভার বহন করে? নদী কি নিজের ভার বহিতে পারে যদি না সাগরের আলিঙ্গন সে পায়? কেহই পারে না।··· আমি আমার জীবনের সবটুকুই তো ইহাদের কাছে সমর্পণ করিয়াছি, ইহারা বিশ্বের মাঝখানে গৌরবোজ্জ্বল মূর্তিতে দাঁড়াইবে এই আশায়। আজ আর কোন কাজ হয় নাই। জীবনের কথা, পথের কথা হইয়াছে। রাত্রি ৮॥০টায় একা আসি। এতদিন প্রতিভা সঙ্গে আসিত। নন্দরাণী মিশ্রির সরবৎ করিয়া রাখে। আমি ভোর ৫টায় ইসপগুল মিশাইয়া খাই।···

২৮শে নভেম্বর

আমি কেমন আছি জানিবার জন্য হেমন্তবাবু আমাদের অফিসে যাওয়ার পর বৈকালে ফোন করে। সকালে অফিসে যাই ওষুধের বাক্স লইয়া। সেখানে খই-দই খাই। বেণুর কি হইতে হইবে, কি হইলে আমার ও তাহার সার্থকতা হয়, তাহারই আলোচনা হৃদয়ের আবেগ লইয়া হয়। বেণুকে মূর্তিমতী প্রকৃতি হইতে হইবে।...পুরুষকে প্রকৃতির ভিতরে প্রকাশিত হইতে হয়, প্রকৃতি পুরুষকে প্রকাশ করে। এই দুইয়ের unification-এর ভিতর দিয়া প্রকাশ ঘন হইয়া উঠে, নির্বিকল্প হয়। সত্যই প্রকৃতি অনাত্মা। প্রকৃতি বহু-প্রসবিনী বলিয়াই অনাত্মা, আর পুরুষ এক বলিয়াই আত্মা। অনাত্মা প্রকৃতি সবার মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থাৎ সম্বন্ধ হইয়াই 'আত্মা'। 'স্বে স্বে অধিকারে নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।' পুরুষ পুরুষত্বকে ঘন করিতে করিতে প্রকৃতি হইবে, প্রকৃতিও প্রকৃতিকে জমাইতে জমাইতে পুরুষ হইবে। 'অধিকার' ঠিক থাকা চাই। পুরুষ প্রকৃতির unification হইলে চতুর্দিকের আবেষ্টনে উৎসবের সাড়া পড়ে। তখনই আবেষ্টন জয় হয়।...সকলের ছোটখাট প্রয়োজন কখনও আমার কাছে এড়ায় না। আমি যে মানুষকে তাহার প্রয়োজন দিয়া ভালবাসি।...যে কমলাটি আমার ঘরে ছিল, বৈকালে দুয়ার খোলা পাইয়া গরু আই তাহা আত্মসাৎ করে। বেশ মিষ্টি।

২৯শে নভেম্বর

সকালে···বেণুর ওখানে যাই।···কৃষ্ণ যশোদার মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। বড় তাড়াটা নেওয়া যায় না। দাবী করিয়া নেবার লোক সংসারে কয়জন কাহার মিলে? মানুষ পাইলে চাহিয়া নেওয়া যায়। বেণু ভবানীপুর স্কুল, হিন্দু স্কুল, সংস্কৃত স্কুল, মণ্ডপ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া আসে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'শেষের পরিচয়', দুইবোন ও চতুরঙ্গ নিয়া আসে।···শেষের পরিচয় বেণু পড়িয়া শোনায়। এই বইখানি নর ও নারীরই শেষের পরিচয়। নারী যে একান্ত 'জননীই' নয়, রমণীও, জননীত্বের আস্বাদনই যে নারীকে পূর্ণ তৃপ্তি দান করে না, জননীত্ব লাভ হইলেও পুরুষকে নারীর রমণীত্বের ক্ষুধা মিটাইবার প্রয়োজনীয়তা থাকে, ব্রজবাবুকেও যে শুধু ব্রজ থাকিলেই চলে না, রেণুর পিতাও থাকিতে হয়, বাঙ্গালীর ঘরে সন্তানের প্রতি নারীর মুগ্ধতা যে রমণীত্বের আস্বাদনের পক্ষে অন্তরায়, নারী-প্রকৃতির এই সব গোপন কথা শরৎচন্দ্র ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। বরিশালের যোগেন শীল (একটী যুবক সাহিত্যিক) ও তাহার বন্ধু আসে আফিসে।···

৩০শে নভেম্বর

বেণু এখানে ৮টার পরই আসে। 'শেষের পরিচয়' পড়ে।···আজ ১২-৩০টার পর খাই। এত দেরীতে খাইলে যে আমার কষ্ট হয়, তাহা বলিবার যো নাই। বলিলেই এ অজুহাত ও অজুহাত। ৩টার পর যতীন চট্টোপাধ্যায় আসেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে ২।১টী কথা হয়—কেমন করিয়া তিনি ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—তিনি বলিয়াছিলেন I am a cosmopolitan।...'

২ দিন আগে mesmerism সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। আমি নাকি বেণুকে mesmerise করিয়াছি। Mesmerism-এ পূর্বের সত্তাকে ঘুমাইয়া এক নূতন সত্তার সম্ভাবনা করিয়া দেয়। ব্রজমোহন স্কুলে যখন শিক্ষক, তখন দেখিয়াছিলাম একটী লোককে 'বিদ্যাসাগর' করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় ২৪ ঘণ্টা সেই ঘোর ছিল। প্রচলিত সন্ন্যাসের মধ্যে কতকটা এই প্রক্রিয়াই রহিয়াছে। আমি তো বেণুর পূর্ব সত্তা, পূর্বের যা কিছু ভাল-মন্দ সমস্ত কিছুই ফেলিয়া নূতন সত্তার গড়িয়া তুলি নাই। এমন একটা কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির আবেষ্টনের মধ্যেই লালন করিয়াছি যাহার মধ্যে অতীত তাহার অতীত রাখিয়াই ক্রম বিবর্তনের পথে অতীতের সব-কিছুর ব্যাখ্যা দান করিয়া বর্তমান হইয়াছে। Continuity তো কাটি নাই। Mesmerism-এ Continuity কাটা পড়ে।

১লা ডিসেম্বর

সকালে বেণুর ওখানে যাই, ৮॥০-টার পর ফিরি।··· তাহার সঙ্গে error of omission বিষয়ে কথা হয়। 'ভ্রান্তি'ও অনন্ত। তবে ভ্রান্তির ক্রমভেদ আছে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তুরীয় ও তুরীয়াতীতেরও ভ্রান্তি আছে বুঝাইবার জন্য 'নমস্তস্যৈ' শ্লোকে ৫ বার 'নমঃ' শব্দের প্রয়োগ আছে। ভ্রান্তি আছে বলিয়াই 'স্তর' আছে। জ্ঞানেরই অপর phase অজ্ঞান। কিংবা জ্ঞানেরই আচ্ছাদন অজ্ঞান। ঠাকুর বলেন, 'নিত্য জ্ঞানও ভাল, নিত্য অজ্ঞানও ভাল'। অসমত্বও ব্রহ্ম। ভ্রান্তিহীন ব্রহ্ম তো closed। উহা কখনও dynamic নয়।··· কমলা ৫টা কমলা নিয়া আসে।···বলিলাম, ঠকাইলে ঠকিবে। স্কুলে ভর্তি হইতে বলিলাম, পরে সেই বই নিয়া মাঝে মাঝে আসিলে বেণু কিংবা আমি পড়া দেখাইয়া দিব। অনেক সময় চলিয়া গিয়াছে। আর দেরী করা উচিত নয়।···সিঁড়িতেই ধীরেন ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা। সঙ্গে গেলেন। 'আনন্দবাজারে' তাঁহার বইয়ের সমালোচনা পড়িয়া শুনান।···

২রা ডিসেম্বর

সকালে ৭॥০-টায় বেণুর ওখানে যাই।···প্রতিভা আসে ৫টায়...। আজ 'দেশের পরিচয়' পাঠ বাড়িতে শেষ হয়।...আমি উহাদের বলি 'মানুষ' হইতে। সংসার অনেক সাধু দেখিয়াছে, অসাধুও দেখিয়াছে, সতী দেখিয়াছে, অসতীও দেখিয়াছে, কিন্তু 'মানুষ' দেখে নাই। এমন মানুষ হইতে হইবে যাহা দেখিয়া সংসার বুঝিবে 'মানুষ' হওয়ার অর্থ কি, এবং মানুষ কেমন করিয়া হইতে হয়। ইহার কম হইলে আমার প্রাণ জুড়াইবে না। তাই তো আমি সুন্দর করিয়া পুতুলের মত গড়িবার জন্য ভর্ৎসনাও করি। কত বেদনায় যে আমি ঐ রূপ করি, তাহা কাহাকে বুঝাইব?···

৩রা ডিসেম্বর

সকালে প্রতিভা সহ আফিসে যাই।···প্রতিভা ১০-টায় পোস্টাফিসে বই দিয়া আসে। কুমুদের কাছে এক টেলিফোন দেওয়া হয়। 'ঠাকুরের কাছে সকলের সমবেত হইয়া কাজের জন্য সব শক্তি ও সময় ব্যয় করিবার সময় আসিয়াছে। তোমার কৃত কর্ম রক্ষা করার জন্য ঠাকুর সচেতন।'···১১টার পর আশ্রমে ফিরি। মালতী আসে ২টায়। সে 'দুইবোন' পড়িতে থাকে। বেণু প্রবন্ধ লিখিতে থাকে।···প্রতিভার সঙ্গে অনেক কথা হয়। সঙ্ঘের ভার—সকলের জীবনের খুঁটিনাটি, দেহের স্বাস্থ্য, অভ্যাগতদের খোঁজখবর নেওয়ার ভার প্রতিভা ছাড়া আর কে নিবে? বেণুর পক্ষে কি উহা সম্ভব? বেণুর এত কাজ যে সে উহা পারিবে না। মালতী প্রভৃতি আসিলে তাহাদের শিক্ষার ভার বেণু নিতে পারে, কিন্তু স্নান [illegible], আবদার আপ্যায়ন, তাহাদের মনের কথা প্রতিভা ছাড়া কে শুনিবে? প্রতিভা আমার জীবনের যত খবর জানে, আর কে জানে?...বেণুর খোঁজখবরও তো প্রতিভারই নিতে হয়।···

৪ঠা ডিসেম্বর

ক্রমশঃ

সাময়িকী

রবীন্দ্রনাথ ও আমরা : বৈশাখী রবীন্দ্র-জন্মবাসরে জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্র-ভাবনাটা একটু ভাবিয়া দেখিতে চাই যদি ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের মানুষ আমরা আরও খানিকটা বেশী পরিমাণে মানুষ হইয়া উঠিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিয়াছেন, নাটক প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রভৃতি অনেক কিছু লিখিয়াছেন, ছবি আঁকিয়াছেন, গান গাহিয়াছেন, প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন—কিন্তু এইখানেই রবীন্দ্রনাথ শেষ হইয়া গেলেন না। প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যুগসন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ দুইয়ের যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়া একটী সামগ্রিক জীবন-চেতনা রাখিয়া গেলেন। এ জীবন-চেতনা আমাদের গীতা-উপনিষদে ছিল—কিন্তু গীতা উপনিষদের যে ভাবধারা ভারতবর্ষের সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে ছিল না। সেই জন্য পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা দিশেহারা হইয়া পড়িয়া ছিলাম। এই যে আমার সামনে বিছানো রূপরস গন্ধস্পর্শে ভরা সুন্দরে অসুন্দরে মেশানো পৃথিবী, ভারতবর্ষ যেখানে ইহাকে বেমালুম অস্বীকার করিয়া ইহার অতীতের সন্ধানে ব্যস্ত ছিল, সেইখানে সে বাস্তব জীবনে মার খাইয়াছে, সেইখানে সে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বাহ্য মন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজেকে খোয়াইয়াছে। কিন্তু ইহাই ভারতবর্ষের সবটুকু কথা ছিল না—উপনিষদ-বেদান্ত-গীতা অস্বীকৃতির ঋণাত্মক জীবন-বোধের কথা বলে নাই, আবার এই যাহা কিছু স্থূল ভাবে আমার বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিধারা দেখিতেছি, বুঝিতেছি তাহাকেই সাজাইয়া গুছাইয়া ভোগ করিয়া জীবন যাপন করার মধ্যেও এই অতল রহস্যময় জীবনকে শেষ করিয়া দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথও গীতা-উপনিষদ-বেদান্তের এই সামগ্রিক দর্শনে, এই সামঞ্জস্যের জীবন-বোধকে তুলিয়া ধরিয়া গিয়াছেন। এই খানেই তিনি অনন্য, অসাধারণ। তিনি রূপের চরম পূজারী হইয়াও অরূপের মধ্যে ডুব দিতে পারেন, এবং অরূপের মধ্যে ডুব দেওয়ার প্রয়োজনকে বিস্মৃত হন না, অস্বীকারও করেন না—তাই এই মাটির পৃথিবীর অতি নগণ্য বস্তুটি যেমন তাঁহাকে উদ্বেলিত করে, একটি তৃণখণ্ড যেমন তাঁহাকে আকর্ষণ করে, তেমনি তৃণখণ্ডকে ধরিয়াই তৃণখণ্ডকে তিনি ছাড়াইয়া যাইতে পারেন—এই জন্যই তিনি অনন্য, অসাধারণ। দুইকে এই ভাবে পাইয়া তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের মিলন সূত্রটী সর্ব সাধারণের কাছে তুলিয়া ধরিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই রবীন্দ্র-জীবন-তত্ত্বকে ভাবনা করা আমাদের বড় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

কবিত্বের ও শিল্পের একটা সহজাত বৃত্তি বস্তুকে সমগ্র করিয়া দেখা—খণ্ড-বোধ তাহার মধ্যে টুকরা টুকরা হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া থাকে না। কম বেশী সব কবি ও শিল্পীর পক্ষে ইহা প্রযোজ্য হইলেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। সেই সঙ্গেই এবং হয়তো এই জন্যই দর্শনের ক্ষেত্রেও সামগ্রিক জীবন-বোধ তাঁহার এমন গভীরভাবে লাভ হইয়াছিল। যদিও এ কথা অসত্য নয় যে 'শঙ্করাচার্যের দেশে দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র সত্যকে যতটা আচ্ছন্ন করেছে ততটা প্রকাশ করে নি,' তবু উপনিষদ ব্রহ্মসূত্র গীতার দেশে দর্শনের জগতে সামগ্রিকতার বোধ ছিল না—সে কথাও সত্য নয়। ভারতবর্ষে কয়েক হাজার বৎসর পর্যন্ত দর্শনের জগতে জীবনের যে-সামগ্রিকতা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, কেননা তাহারা জীবনকে অনুসরণ না করিয়া কতকগুলি প্রচলিত মতামত বা ন্যায়শাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল, সেই সমগ্রতা সমস্ত রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে—সাহিত্য, শিল্পকলা সর্বত্র—রূপদান তো করিয়াছেই, তাঁহার সমগ্র দার্শনিক চিন্তাধারাতেও এই সমগ্রতা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাকে যখন গ্রহণ করি, তখন তাঁহাকে এই সমগ্র রূপে বুঝিলে আমরা অধিকতর আনন্দিত হইব, উপকৃত হইব। কবিত্ব বা শিল্পের আবেদন মানুষের হৃদয়ে, দর্শনের সমগ্রতার

আবেদনও ঐ হৃদয়েই। তাই ঘটনায় ও ভাবে রবীন্দ্রনাথে সমগ্রতার বোধ অতি সুপরিস্ফুট। তাই কবিতায় গানে নাটকে গল্পে প্রবন্ধে আলোচনায় অভিনয়ে চিত্রে দেশ ভ্রমণে প্রভৃতি বহু বহু স্থানে যেমন তাঁহাকে দেখা যাইবে, তেমনি প্রত্যূষের অস্পষ্ট আলোকে তাঁহার প্রাত্যহিক উপাসনা ক্ষেত্রেও তাঁহাকে দেখা যাইবে। আর সে উপাসনা কেবল অভ্যাসের তথাকথিত মন্ত্রোচ্চারণ নহে, গতি ধর্মাত্মক বিচিত্র জীবন সার্থক যে ব্রহ্মবোধের স্থিতির মধ্যে, সে উপাসনা সেই ব্রহ্মের মধ্যে প্রতিদিন অবগাহন, তাঁহার সঙ্গের পরিণয় বন্ধনকে আস্বাদন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় মোটামুটি এ জিনিষটা নাই—আর ভারতীয় সভ্যতা যে ব্রহ্মের ধ্যান করিত, মানুষের জীবনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না—তাই সে ব্রহ্ম-সাধনা ছিল বলা যায় মৃতের সাধনা। এই মাটির পৃথিবীটা রবীন্দ্রনাথের কাছে কতখানি আনন্দের ছিল, তাহা আমরা সবাই জানি—আর সেই ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধকে কি রকম করিয়া রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভাষায় বলি—'…তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো কিছু বাকি নেই, কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদি কালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে: যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব…তাই ঋষি কবি বলেন, এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোহস্য পরমোলোকঃ, এষোহস্য পরম আনন্দঃ। পরিণয় তো সমাপ্তই হ গেছে, সেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেব অনন্ত প্রেমের লীলা। যাকে পাওয়া হয়ে গেছে তাকে নানা রকম করে পাচ্ছি—সুখে দুঃখে বিপদে সম্প লোকে লোকান্তরে। বধূ যখন সেই কথাটা ভা করে বোঝে তখন তার আর কোনো ভাবনা থাকে ন তখন সংসারকে তার স্বামীর সংসার বলে জানে, সং তাকে আর পীড়া দিতে পারে না, সংসারে তার অ ক্লান্তি নেই, সংসারে তার প্রেম। তখন সে জা যিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' হয়ে অন্তরাত্মাকে চিরদিনের গ্রহণ করে আছেন, সংসারে তাঁরই 'আনন্দরূপমমৃ বিভাতি'—সংসারে তাঁরই প্রেমের লীলা। রবীন্দ্রনা মত করিয়া যদি আমরা এই পৃথিবীর মাটিকে ভালবাসি পারিতাম, এবং সেই সঙ্গেই এই দূর-ইন্দ্রিয়েরও, আম পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-বুদ্ধিকেই সর্বস্ব না জানিয়া একটা বি বোধের সঙ্গে নিজের পরিণয়-সম্বন্ধকে আস্বাদন করি পারিতাম, তাহা হইলে আমরা আজ ব্যক্তিগত ভাবে সমষ্টিগত ভাবে যাহা আছি, তাহা অপেক্ষা অনেক ব হইতে, বড় হইতে, শক্তিমান হইতে পারিতাম—অ সে শক্তি আমাদের অহং-প্রসূত ভেদবুদ্ধির সহায়ক হইয়া তাহা বিশ্ব-সেবায় ব্যয়িত হইত। পঁচিশে বৈশা শুভ অবসরে আমরা রবীন্দ্রনাথকে এই ভাবে বুঝি ও পাইবার সাধনা করি।

শ্রীইন্দু মিত্র কর্তৃক নবনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩/১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

"পুরুষোত্তম cult-এ প্রত্যেক অণুটিও এক একটি কেন্দ্র—কি কথাই না তোমার গোপাল বলিয়া গিয়াছেন? 'মম অস্তিও পূর্ণ, অধিক অস্তিও পূর্ণ।' এতদিন অল্পের কোন self-centered হইবার যোগ্যতা ছিল না। অল্প সার্থক অধিকের মধ্যে নিভিয়া গিয়া—এই হাইপথেসিসের—অনুমানের—উপর সব সমাজ গড়া। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু সেই মানুষও যে বৃন্দাবনে গিয়া তরুগুল্মলতাজন্ম কামনা করিবে, তাহা কে জানিত বা বিশ্বাস করিত? কৃষ্ণসখা উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়া এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। একটা hierarchy করিয়া একটিকে রাখিয়াছে সিঁড়ির উর্দ্ধ ধাপে কুলীন করিয়া, আরগুলিকে পর পর নীচে নামাইয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে কিছুদিন চলিল বেশ। কিন্তু উচ্চ স্তরের চাপে নিম্নের সবগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিল, তখনই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ছোটরা, নীচের দল, সব বড়দের, উঁচুদের সমকক্ষতার দাবী করিল। ভাগবত বলিলেন, বড় ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে পুরুষোত্তমের direct ও equal relation। গায়ত্রী জপ ও মুচির জুতাসেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটা কুলীন হইবে এবং অপরটা অকুলীন হইবে? ঘর ঝাঁট না দিলে যখন ঠাকুর-পূজাই হয় না, তখন ঠাকুরের কাছে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও পূজা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? কে কুলীন, কে অকুলীন?……যদি কৌশলপূর্বক প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সত্ব হইতেও পুরুষোত্তম যতদূর, রজস্তম হইতেও পুরুষোত্তম ততদূর।……এতদিনের সাধনা সব minus-এর সাধনা, নেতি নেতি। কৃষ্ণের সাধনা positive। সবকে রাখিয়া সবকে হজম করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।…… ছোটরাও যে অন্তরে অন্তরে পুরুষোত্তম, একথা তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিয়াছে।…… তাই আজ নোতুন করিয়া শাস্ত্র দিতে হইবে। New Social Order, New Religious Order সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে না পুরুষোত্তম মিলিবে?……"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

উজ্জ্বলভারত

জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(২২)

৬, ৭, ৫৬।·· প্রতিটি বস্তুর মাঝে আছে ব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বনাথ—কাহারও সাথে কাহারও পাশাপাশি সম্বন্ধ নাই—দুইটা গোপীর মাঝে আছেন কৃষ্ণ। শ্রীরাধা, এই তত্ত্ব তুমি প্রকাশিলে যে দুই জনের সম্পর্ক direct নয় বিশ্ব ও বিশ্বনাথের মধ্য দিয়া সম্পর্ক।···অন্যকে, নিজকে বিশ্বচরণে নিবেদন না করিয়া কেহ কাহাকেও ভোগ করিতে পারিবে না। শ্রীরাধারও স্বতন্ত্র মূল্য—এইখানেই রস। ভোগে রস নাই, কামে রস নাই, লোভে রস নাই ··যে অন্যকে নিজের ভোগের করিয়া দেখে সে কোনও দিন অন্যকে, নিজেকে পাবে না—যারা নিজের বলিয়া নিজের ভোগে পাইতে চায়, তারা পায় না—সেইটাই মায়া, শঙ্কর সেইটাকেই মায়া বলিয়াছেন· বিশ্ব ও বিশ্বনাথের চরণে মাথা রাখিয়া বস্তুকে গ্রহণ কর। বৃন্দাবনেই মানুষ মানুষকে পায়, পরকীয় সম্বন্ধ অর্থাৎ অপরের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা স্বীকার করিয়া নিলেই একে অন্যকে পাইতে পারে। ·· নিত্যগোপাল, আমি যেন ধ্যান করিয়া কিছু না দেখি—বিশ্বকে মাঝখানে রাখিয়া যেন বস্তুকে দেখি।···অসীমের ভিতরে কারো সাথে কারো বিরোধ নাই—গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে বিরাটের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের। নিত্যগোপাল, যে চিত্র তুমি দেখিয়েছ, সে চিত্র ফুটিয়ে তুলবার জন্য আজও মানুষকে নিয়ে টানাটানি করতে হয়···নিত্যগোপাল, মানুষকে ভালবাসার এই পথে কোথায় নিয়ে এলে? মানুষের প্রাণ নিজের বশে নিতে গিয়ে কি সে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করতে হবে? মানুষকে বৃহ মূল্যে পাইতে চাই বলিয়াই না মানুষকে লইয়া আন টানাটানি। নিজের মধ্যে নিজে পড়ে থাকলে তো এ হতো না।···তুমি যে মানুষের অন্য রূপ আমায় দেখিয়ে কিন্তু সে রূপে মানুষকে আমি পেলাম কই, কতু পেলাম···মানুষের অহমিকা, মানুষের ঔদ্ধত্য আমা আঘাত করেছে—যে মানুষ এক-প্রাণ নয়, এক-মত ন আমার সঙ্গে যে একাত্ম হলো না—তার সেবা-গ্রহণ সে আমাকে দূরে রাখ। অনন্ত না হলে কিছুই আমি গ্র করতে পারি না—অনন্তের সঙ্গে অনন্তের মিলনেই রস তুমি রসিক শেখর। বিরাট বিশ্বের মাঝে আমি বাঁ পড়েছি—আমার সখের জীবন নয়! শঠতার পথ, বক্রের পথ আমার নয়—বুদ্ধির প্যাঁচ দিয়ে আমি চলতে অ না—আমি কাশীর নই—ঠাকুর, আমি তোমার থাকব।

৬. ৭. ৫৯।...মানুষ ভগবানকে ভজনা করবে কে করবে এই জন্যে যে তাতে ভগবানের স্বার্থ থাকুক থাকুক, মানুষেরই স্বার্থ আছে। আমার প্রয়োজ করতে হয়—আমি আমাকেই পাব না যতক্ষণ না অ নিজের ঊর্ধ্বে উঠি।···সাগরের মধ্যে বিলীন হইলেই নিজেকে চেনে, নিজে সার্থক হয়, তাহার অব্যাহত অ

বজায় থাকে।...যে নদী সাগর পর্যন্ত যেতে পারল না, যা বড় একটা নদীতে নিজেকে মেশাতে পারল না—সে কত দিন বেঁচে থাকবে, তার জীবনের কতটুকু থাকবে?···মানুষের জীবনে দুই গতি—ঊর্দ্ধ অধঃ—সাগরের মধ্যে সাগর হয়ে যাওয়া হচ্ছে লয়, নির্ব্বাণ—সাধকদের নির্বাণ; আবার নদীর মধ্যে ফিরে আসা—ব্যক্তি-জীবন—সাগরের স্পর্শ নিয়ে ব্যক্তি-জীবন।···নিজের মধ্যে যদি গঙ্গা নিজেকে ধরে রাখত—গঙ্গা শুকিয়ে যেত। কিন্তু গঙ্গা যে নিজের রূপ ও নামের মোহ পরিত্যাগ করে সাগর হয়ে যায়, তাতেই গঙ্গা অব্যাহত। সাগরের ধর্ম তাকে যে যা দেয়, তা-ই সে অনন্তে ফিরিয়ে দেয়—বড়র স্বভাবই এই।...আমার প্রতিবিম্বকে মালা পরালে ছবির গলায় মালা পরাবে না, দিতে হলে আমার গলায়ই দিতে হবে।...প্রহ্লাদ বললেন, ঠাকুর, তুমি বিম্ব, আমরা প্রতিবিম্ব।···সাগর যদি সরে দাঁড়ায়, নদী বাঁচবে?—নিজেকে দিয়ে দাও, নিজেকে পাবে। তুমি তোমারও পর—তুমি একান্তভাবে তোমার আপন নও।···যতক্ষণ আমি আমার সুখ-দুঃখটুকু নিয়ে চলব, ততক্ষণ আমায় পাব না—পিতার ঘরে উঠলেই আমায় পাব।...সাগরের মধ্য দিয়ে ছাড়া এক নদীর সঙ্গেও আর এক নদীর সাক্ষাৎ হয় না।...তুমি যতক্ষণ তোমার ঊর্দ্ধে না উঠছ, ততক্ষণ কিছুতেই নিজেকে পাবে না।···যা ভগবানকে দেবে, তা শত সুন্দর হয়ে তোমার কাছে আসবে।···শংকরাচার্য বললেন নাম মিথ্যা, বৈষ্ণব বললেন নাম সত্য—যে নাম তুমি ভগবানকে দিয়েছ। তোমার নাম সত্য নয়, ভগবানকে দেওয়া নাম সত্য।...তোমার অহংকারকে ধরে তুমি অহংকারের ওপারে যাবে কি করে? সাগরকে দিয়ে গঙ্গা সাগরকে পাবে, নিজেকে দিয়ে নয়—অহংকার ভগবানে দাও, তোমার অহংকার থাকবে।···এসেছ আমার কাছে, বুদ্ধির খেলা চালিও না, সর্বনাশ হবে; প্রাণ নিয়ে এসো। তাঁর কাছে যা দেবে তা সোনা হয়ে ফিরবে—সোজা হও, বুদ্ধি শুদ্ধ কর। নিত্যগোপাল কল্যাণ করুন···। নিত্যগোপালের কাছে একবার নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হও, পরে অনন্ত কাল জগতে থাকবে।···নিজে নিজে জগতে যেয়ো না, পুড়ে ছাই হবে।...বাঁচতে হলে মর—Die to live—বাঁচতে চাইলে মরবে—মরণ অর্থ স্বার্থ ত্যাগ, অহংকার ত্যাগ, বিচ্ছিন্নতা ত্যাগ...দেহ বলি দাও—মায়ের হাতে মুণ্ড ঝুলুক...তখনই তাঁর আশীর্ব্বাদ পাবে। কালীর কাছে জীবনের সর্বস্ব বলি দিলে তা তিনি নিজের মধ্যে পরিপাক করে আবার তোমায় ফিরিয়ে দেবেন।...জগন্নাথ নিত্যগোপাল···।

৭, ৭, ৫৩। শ্রীরাধা বিশ্বের প্রাণশক্তি—সকল প্রাণের মহা প্রাণ শক্তি, প্রেমময়ী···শচী দুলাল, গৌরী দুলাল...তুমি সুন্দর, তুমি সকল-সুন্দর···তোমার সকল সুন্দর···তোমার চলন বলন সুন্দর...তোমার পা সুন্দর, তোমার হাত সুন্দর, তোমার মন সুন্দর—কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির সামঞ্জস্যে তুমি সুন্দর—রূপে গুণে সুন্দর—সকলকে তুমি সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোল—সামঞ্জস্যে আমায় সুন্দর করিয়া তোল···তোমার মনোমত আমায় গড়িয়া তোল···তুমি আমায় পাইলে, আমায় দেখিয়া আনন্দিত হইবে, তেমন করিয়া গড়িয়া তোল—তোমারি ছায়া হইয়া আমি সংসারে বিচরণ করিব···তোমার প্রাণের ছায়া, জ্ঞানের ছায়া, আনন্দের ছায়া হইব—তুমি আমার আত্মা। আমি তুমি হইব—আর কিছু হইব না—সকলের সকল হওয়ার পরিপূর্ণ রূপ তুমি—আমি ব্রহ্ম হইব, বড় হইব—তুমি হইলেই আমার ব্রহ্ম হওয়া হইবে—তোমারি মাঝারে নির্বাণ লভিব—সকলের পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি মুছিয়া দাও—সকলে ওংকার-ভাবিত হউক, সকলের ব্রহ্মদৃষ্টি দাও···। নিত্যগোপাল, তোমার মাঝারে আমি গড়িয়া উঠিব, তোমার প্রেমে মরিয়া বাঁচিব; নিত্যগোপাল, আমার সোনার মানুষ, আমার রাজা রাজরাজেশ্বর, আমার ভিখারী বাবা, আমার বুক জুড়ানো ধন, আমার নিত্যগোপাল, আমার ব্রহ্মগোপাল!···মানুষকে সরল কর, অকপট কর।···ধরার ধূলি হউক বিশ্ব-ধূলি, ধরার মানুষ হউক বিশ্ব-মানুষ।...

সন্ধ্যা।...ভাগবত সম্বন্ধে এই রকম লিখিত আছে—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যখন আত্মানং খিলং মত্বে—নিজেকে অত্যন্ত সামান্য, ক্ষুদ্র মনে করিতেছিলেন, অসুখী বোধ

করিতেছিলেন, তখন নারদের আদেশে ভাগবত লেখেন। এই ভাগবতের পথ আমরা অনুসরণ করব। সে পথ এই—অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করবার পথ অন্ধকার নয়—আলো জ্বালিয়ে দাও—তোমার বুকের ভিতরের আলো। শুদ্ধ যে জানে সে বোঝে ভুল কোনটা…তুমি শুদ্ধ কোন্‌টা তা-ই জান না, তুমি তোমার ভুল বুঝবে কি রকম করে? শুদ্ধকে চেন, তবে তো ভুল চিনবে। ভুল ভাঙতে হলে শুদ্ধ জীবন যিনি যাপন করছেন, তাঁর আলোতে দেখতে হবে। নিজের ভুল নিজে চিনতে পারবে না। বর্তমানের কঠিন ব্যাধি হচ্ছে নিজের ভুলকে সমর্থন করা।… positive কিছু ধরতে হবে। অম্বরীষের কাহিনী—দুর্বাসা একদিন অম্বরীষ রাজার অতিথি হয়ে বললেন, তোমার এখানে পারণ করব। স্নান করতে গিয়ে দুর্বাসা অত্যন্ত দেরী করে ফেলছেন। এদিকে পারণের সময় যায়, অম্বরীষের পারণ রক্ষা না করলেও প্রত্যবায় হয়, আবার অতিথিকে ফেলে খাওয়াও চলে না। তখন পণ্ডিতদের বিধান নিয়ে অম্বরীষ শিশির-বিন্দু পান করলেন। ঠিক তখনই দুর্বাসা এসে উপস্থিত। পরম ভক্ত অম্বরীষকে জব্দ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—ছিদ্র পেয়ে অম্বরীষকে অভিশাপ দিলেন—জটা ছিঁড়ে অম্বরীষের উপর নিক্ষেপ করলেন—কালানল সদৃশ পুরুষ অম্বরীষকে পুড়ে ফেলতে ধেয়ে চলল। অম্বরীষ ধীর স্থির আত্মস্থ—ভক্ত সহজে বিচলিত হন না। ভক্তের পিছনে একটা বিশ্বচক্র (world-force) কাজ করে, ভক্তকে রক্ষা করে। কেননা ভক্ত অসহায়…। অম্বরীষকেও রক্ষা করল। বিশ্বচক্র কালানলকে ধ্বংস করে দুর্বাসার পিছনে ছুটেছে। দুর্বাসা আকাশ পাতাল ঘুরে নারায়ণের কাছে উপস্থিত …নারায়ণ বললেন—সাধবঃ হৃদয়ং মহ্যম্…মদন্যৎ তে ন জানন্তি…আমার ভক্ত যারা সাধু, মুক্তির জন্য নয়.. তারা নহেন। ভক্তের হৃদয় আর নারায়ণের হৃদয় এক—যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব—আমার গলার ফুলের মালা তাহার গলায় দিলাম। অম্বরীষের কাছে অপরাধ করে আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কোন লাভ নেই—আমার ক্ষমা করবার সাধ্য নেই—যার কাছে অপরাধ করেছ, তার কাছেই ক্ষমা চাইতে হবে, সে-ই ক্ষমা করবার অধিকারী।… দুর্বাসা যে অস্ত্র ছেড়েছিল তা ক্রোধ-জাত—যা ক্রো থেকে উৎপন্ন তা boomerang জাতীয়—বুমারে হচ্ছে সেই জাতীয় অস্ত্র যা নিক্ষেপকারীর উপর ফি এসে তার সর্বনাশ করবে—তা না হলে ভক্ত রক্ষি হবে কি করে?…আঘাতকারীকে আহত করতে নেই সহ্য করতে হয়—সমস্ত আঘাত সহ্য করে আছি—নিতা গোপালের মুখের সেই অভয়বাণী শপথ—যখন যেখা আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি।…প্রেমবিলাসিনী পাগলনন্দিনী ভিখারিণীর মত ফিরত। থাকত তাকেনাকে, দেখত তা বা কে, আপনি বিভোরে পড়ত।…যে আগুন তুমি জ্বালা সে আগুন তোমার পিছনে ছুটবে।…Sit on a highe plane… অজ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞান দিয়ে, শয়তানের স শয়তানী দিয়ে লড়াই করা যে যুগের, পুরুষোত্তম শুধু সে যুগের নন, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকে, প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে বুঝতে হবে…। শিব নই বটে, তবে হ চাই—এই ৭৩ বৎসরে যে বিষ পেয়েছি, তা ঢেলে দি অনেক কিছু পুড়ে যেত।…বরদাস্ত আমি হলাম না ব পড়ে থাকতে হয়।…Life is from within out—I tune with Infinity—জীবন বাড়াও, আত্মজ্ঞা বাড়াও, প্রেম বাড়াও, ধৈর্য বাড়াও…মাইটের কা শুদ্ধ কোন্‌টা শেখ—কাজ করছি সেবার জন্য—ব্যক্তিগ ভাবে আমার কোনো কাজ নেই—ন মে কর্তব্যমি ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন…। দোতরফা করো না, ঝগ বাড়বে—তুমি সাধু হতে চাও সহ্য করে যাও, তুমি ঠি থাকো, পাল্টা জবাব দিতে যেয়ো না। মিলন যেখা শেষ কথা—মানুষকে পেতে হবে এটাই যেখানে শেষ কথ সেখানে বুকের ওপর দিয়ে সব সহ্য কর, হৃদয়কে প্রসারি করে হৃদয়ের মধ্য দিয়ে চল।…

ক্রমশঃ

উত্তর শতবার্ষিকীপর্বে রবীন্দ্রচর্চা

॥ শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু ॥

উত্তর শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রচিন্তা নূতন খাতে বইবে এ কথা ভাবাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রতত্ত্ব, দর্শনের নানা দিক ও নানা অধ্যায় যা প্রাক্ রবীন্দ্র পর্বে শুরু হয়েছিল, বিভিন্ন গবেষকের গবেষণার মাধ্যমে শতবার্ষিকী যুগে সেগুলি আপাত পরিণতি লাভ করেছে এ কথা বলা চলে। এ কথা অনস্বীকার্য যে সব প্রবন্ধ নিবন্ধাদির প্রকাশ ঘটলেও, শহর-পল্লীর অন্দরে কন্দরে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সরব অনুপ্রবেশের বাহুল্য ঘটলেও রবীন্দ্রচর্চা কিন্তু আশানুরূপ বাড়েনি।

অনেক মনীষী ভেবেছিলেন শতবার্ষিকীর সচেতন প্রয়াসে রবীন্দ্রচর্চার আপাত রুদ্ধ দ্বারগুলি উদ্ঘাটিত হবে এবং জনচিত্তে রবীন্দ্র সাহিত্যের স্নিগ্ধ রসধারা সহজে প্রবাহিত হবে, রবীন্দ্র-ভাবনায় সমগ্র জনচিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠবে। তাঁরা হতাশ হয়েছেন। শতবার্ষিকীর সমাপ্তির অনতিকালে দাঁড়িয়ে এ কথা সহজেই বলা চলে রবীন্দ্র চর্চায় প্রাক্ শতবার্ষিকী পর্বের সঙ্গে উত্তর শতবার্ষিকী পর্বের কোন ভেদ নেই।

একটা প্রশ্ন আসে রবীন্দ্রচর্চা তথা রবীন্দ্র সাহিত্য-চর্চায় কি পরিণতি আমরা দেখতে চাই? একথা অবশ্যই চিন্তনীয় নয়, ঘরে ঘরে রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চা অব্যাহত ভাবে চলবে; রবীন্দ্র ভাবনায় সমগ্র জাতির চেতনা একসূত্রী হয়ে উঠবে এবং দার্শনিক ধ্যান ধারণা ও অভিব্যক্তি রবীন্দ্রানুসারী হবে। বরং তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুমিত রূপ সম্পর্কে বলা যেতে পারে, রবীন্দ্র সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সম্যক ব্যবস্থা, রবীন্দ্র সংগীতের সুপ্রচলন এবং জাতির সংস্কৃতি চেতনায় রবীন্দ্র ভাবনার সুস্পষ্ট সুপ্রকাশ। পরিমিত আলোচনার সংকীর্ণ অবসরে দেখাতে চেষ্টা করব, তাঁদের সে প্রয়াস একেবারে নিষ্ফল হয় নি। জোয়ারের পরে সাধারণতঃ ভাঁটা আসে। প্রাকৃতিক নিয়মে এটিই স্বাভাবিক। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর উচ্ছ্বাসের পর রবীন্দ্রজয়ন্তীর উজান গতির অভাব পড়লেও ক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই।

রবীন্দ্রভাবনা মূলতঃ দুটি খাতে জনজীবনে প্রবাহিত। একটি তাঁর কাব্যসাহিত্য অপরটি তাঁর সংগীত। তাঁর দর্শন ও অধ্যাত্মচিন্তা গবেষকদের অধীত বিষয় হলেও জনচিত্তে তা নিয়ে বিশেষ মাথা ব্যথা নেই। রবীন্দ্রনাথের নিজের কালে ও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাহিত্যচর্চা কম হয় নি। বরং পর্যাপ্তই বলা চলে। পাঠ্য ও উচ্চতর পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র সাহিত্য যথাযোগ্য সম্মানের অধিকারী হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র সাহিত্যের গুরুত্ব যথাযথ ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র সংগীত একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে। সুতরাং বিনা ক্লেশেই বলা চলে শতবার্ষিকীর উদ্দেশ্য যদি ভিন্নতর হয় অন্যকথা, নইলে প্রাক্ শতবার্ষিকী যুগেই রবীন্দ্রচর্চা পরিণতির স্তরে পৌঁছে গেছে।

এ ছাড়া আর একটি দিক্ আছে, তা হোল সংস্কৃতির দিক্। নানা বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রভাব প্রধানতঃ সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। নানা আঘাত সংঘাতে সংস্কৃতির রূপ পরিবর্তিত হয়। সংস্কৃতি নিত্য নয়, গতিশীল। অখণ্ড কালস্রোতে নিয়ত রূপান্তরের পথে এগিয়ে চলেছে। এর পরিণতি নেই। তবুও মাঝে মাঝে এর এক একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধকে অমনি একটি রূপে বিশিষ্টায়িত করা চলে। এর বর্ণ আলাদা, স্বাদ আলাদা। প্রজাপতির পক্ষালীর বর্ণবৈচিত্র্য এর আবরণ, অন্তরে ধ্যানগম্ভীর হিমাচলের অসংশয়িত প্রত্যয়। ভারতের তথা বাংলার বৈষয়িক ও সামাজিক অভিঘাতের তুলনায় এই সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য অভাবিত।

তুলনামূলক বিচার করলে এই সংস্কৃতিকে রবীন্দ্র-সংস্কৃতি ভিন্ন অন্য অভিধায় অভিহিত করা চলে না। সংস্কৃতি প্রকাশের প্রত্যেকটি দিকেই রবীন্দ্র-প্রভাব সুপরিস্ফুট। সাহিত্যকর্ম, চিত্রকলা, নাট্যাভিনয়, সভা-সমিতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা উৎসব অনুষ্ঠান— সব কিছুতে রবীন্দ্র-প্রভাব সুপ্রকাশ।

তা সত্ত্বেও একটা অভিযোগ থেকে যায়। শতবার্ষিকীর পরেও আশানুরূপ রবীন্দ্রচর্চা হয়েছে কি? পূর্বকথিত রবীন্দ্র কাব্য সাহিত্যের পঠন-পাঠনের কথা বাদ দিলে সাধারণ মানুষের কাছে রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের ব্যাপকতা বাড়লেও গভীরতা বাড়েনি। এটা আশা করাও যায় না।

সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি চঞ্চলা নদীর ন্যায় অস্থির ও গতিশীল। নিয়ত পরিবর্তনের পথে এগিয়ে চলে। কোন সভ্যতা বা সংস্কৃতি তা যত উন্নত পর্যায়েরই হোক না কেন, এই গতিশীলতা না থাকলে ধ্বংস অনিবার্য। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকালে একথা বুঝতে অসুবিধা হবে না।

রবীন্দ্র সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। বাংলার সংস্কৃতি রবীন্দ্র প্রভাবকে নিয়েই বসে থাকবে না। রবীন্দ্র-রসধারায় পুষ্ট হয়ে অন্যতর রসের সন্ধানে নিয়ত এগিয়ে চলছে। এখানে সেন্টিমেন্ট অচল। সমাজের সমস্যা নিত্য নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। জীবনবোধ ও সমাজচিন্তা জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে সব চিন্তার সমাধান মিলছে না। সমাজ চিন্তার অনুরূপ সাহিত্যের খোঁজ পড়ছে। রূপ-চেতনাও নূতন আঙ্গিকে নূতন গতি পথের সন্ধান করছে। এইটিই স্বাভাবিক। এখানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচারে তার মূল্যায়ন করাও যেমন অনুচিত, তেমনি রবীন্দ্র সাহিত্যের পুনর্বাসন দাবী করাও অন্যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্য চিরায়ত সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত, উত্তর যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতি যা থেকে রস আহরণ করে চলবে। কালের কষ্টি-পাথরে এর যথার্থ মূল্য নিরূপিত হবে।

উত্তর শতবার্ষিকী পর্বে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানগুলির বিষয় নূতন করে চিন্তা করার আছে। অবশ্য রবীন্দ্র-জয়ন্তী স্বতোস্ফূর্ত অনুষ্ঠান। একে নিয়ন্ত্রিত করা যেমন অসুবিধা-জনক তেমনি অযৌক্তিক। বর্তমান পর্যায়ে রবীন্দ্র ভক্তি জয়ন্তীগুলিকে সরস্বতী পূজার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং লেখকের আশংকা ভবিষ্যতে এটি বুদ্ধ-পূর্ণিমা, রাম-নবমী বা জন্মাষ্টমীর পর্যায়ে না পৌঁছায়।

কাজেই সংস্কৃতি-কামী চিন্তাশীলদের এদিকে কিছু করার আছে। রবীন্দ্র জয়ন্তীকে গতানুগতিক বিচিত্রানুষ্ঠানের কবলমুক্ত করে জাতীয় সাহিত্য সমীক্ষা বা সাংস্কৃতিক সম্মিলনের রূপ দেওয়া যায়। যেমন কবি সম্মিলন, সংগীত সম্মিলন, সাহিত্য সম্মিলন, সাংস্কৃতিক সম্মিলন ইত্যাদি। অর্থাৎ সমকালীন সাহিত্য-সংগীত ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন ও স্বীকৃতিই রবি জয়ন্তীর যথার্থ রূপায়ন বলা চলে। কয়েকটি পরিচিত রবীন্দ্র সংগীত ও কবিতার আবৃত্তির ক্লান্তিকর অনুষ্ঠানের চেয়ে প্রস্তাবিত অনুষ্ঠান যেমন যৌক্তিক, তেমনি উপভোগ্য সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র জয়ন্তী যদি রবীন্দ্র চর্চার প্রকাশ-ভূমি হয় আপত্তির কোন হেতু নেই। কিন্তু চিরায়িত সাহিত্য বা ক্লাসিক সাহিত্য কখনই সাধারণের গভীরতর চর্চার বিষয় হতে পারে না এবং পারে না বলেই এই সব অনুষ্ঠান এত অবসাদপূর্ণ ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে। কাজেই উত্তর শতবার্ষিকী পর্বে জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের চরিত্র বিষয়ে নূতন করে চিন্তা করার আছে, একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

অবশ্য রবীন্দ্র জয়ন্তীই রবীন্দ্র চর্চার একমাত্র উৎসব বলা যায় না। রবীন্দ্র ভাবনা জাতির অন্তর-চেতনা অতি গভীর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট। এ প্রচারের অপেক্ষা রাখে না। রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় রবীন্দ্র রচনাবলী বঙ্গ সংস্কৃতির কোষ-গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হবে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাই অতি সংগত কারণে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই নিজের কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ রাখে নি। রবীন্দ্রভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য কলা সংগীত দর্শন ইত্যাদির চর্চা অব্যাহত ভাবে করতে হবে। আমার মনে হয় উত্তর শতবার্ষিকী পর্বে রবীন্দ্র চর্চা এই খাতেই প্রবাহিত হবে।

যবনিকার ওপারে

॥ শ্রীবিভা সরকার ॥

ঢং ঢং ঢং—তোরণদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার ঘণ্টা পড়ল। খুলে গেল বুঝি লৌহ বেষ্টনী—উঠল বুঝি যুগান্তের যবনিকা! হাসিমুখে সেলাম জানিয়ে এগিয়ে এল আগ্রা দুর্গের চৌকিদার আলি খাঁ—"চলো বাবুজী! আজ জাহাঙ্গিরী মহল দেখে চলো"—সহাস্যে জবাব দিলুম চলো। রক্ত প্রস্তরের কারুকার্যময় বৃহৎ প্রাসাদ আপন স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে এক বিরাট রক্ত প্রস্তরের চৌবাচ্চা—আকারটি ডিম্বাকৃতি। একটি পাথর কুঁদে তৈরী হয়েছে এই জাহাঙ্গীরী-হৌজ। পাঁচফিট উঁচু আট ফিট ব্যাস ও পঁচিশ ফিট পরিধিযুক্ত এই চৌবাচ্চার ভেতর বাইরে সিঁড়ি ওঠা নামা করার জন্য। চৌকিদার বলে, জানো বাবুজী—এ হৌজ-এ মণ মণ গোলাপ ভেজান থাকত আর সেই সুগন্ধি জলে স্নান করতেন সম্রাট জাহাঙ্গীর, স্নান করতেন সম্রাট-বেগম নূরজাহান। এমনি ধারা জলে স্নান করতে করতেই একদিন সম্রাজ্ঞী আবিষ্কার করেন আতর—হে তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্না রাণী, তোমায় পেয়ে আমরা ধন্য!

প্রাসাদের পূর্বদিকে সম্রাটের বৃহৎ গ্রন্থাগার—যদিও আজ গ্রন্থহীন শূন্য কক্ষ। সম্রাট শুধু সুকবি ও সুপণ্ডিতই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুদক্ষ চিত্রশিল্পীও—সূক্ষ্ম নিপুণ শিল্প বিচারক। প্রাসাদের পশ্চিমে মানসিংহ ভগ্নী যোধাবাই-এর মন্দির। শ্মশানের শূন্যতায় সব আজ খাঁ খাঁ করছে। এ মহিষীর সঙ্গে বাদশার বনিবনতা ছিল না কোনও দিনই—তবে সাহস ছিল না উপেক্ষার, সাহস ছিল না অনাদরের। মহামান্য আকবর দিয়ে ছিলেন এ বিবাহ বীরশ্রেষ্ঠ মানসিংহকে স্বপক্ষে রাখতে। এঁরই পিতৃস্বসা ছিলেন জাহাঙ্গীর জননী।

আকবরের প্রিয় পৌত্র খুসরো সন্দেহে সচকিত করে তুলেছিলো পিতা জাহাঙ্গীরকে একদা—কে জানে এ মানসিংহ ভাগিনেয় তাঁকেই বুঝিবা সিংহাসন চ্যুত করে!

কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ—আকবরের প্রিয় পৌত্র খুসরো আর একদিন অতি দুঃখের মৃত্যু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন দীর্ঘদিনের অসহ বন্দী জীবনের পর। শোনা যায় এ হত্যায় শাহজাহানেরও হাত ছিলো—অবশ্য তখন তিনি যুবরাজ খুররম। হায় শাহজাহান! এরই কি পুনঃ প্রকাশ হল না দারার জীবন নাট্যে, তোমারেই অসহায় বার্দ্ধক্য-জর্জর শোক দশায়!

সিংহাসনের জন্য পিতৃদ্রোহী হওয়া মোগলদের যেন বংশপরম্পরায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। পিতার শেষ জীবনে পিতৃদ্রোহী জাহাঙ্গীর পিতৃসুহৃদ্ ও প্রিয় মন্ত্রী আবুল-ফজলকে হত্যা করিয়ে ছিলেন অকাতরে বিনা দ্বিধায়—একবারও ভাবেন নি এ মৃত্যু বন্ধু-বৎসল পিতার বুকে কি গভীর বেদনা কি নির্মম দুঃখ দিতে পারে! কিন্তু এই জাহাঙ্গীরই আবার শীতার্ত হস্তিদের জন্য অস্থির হয়েছেন দুঃখে।

তাতার চেঙ্গিজের রক্তধারা তাঁর মধ্যে যেন বারবার জেগেছিল—তেমনি প্রেমিক তেমনি দুর্ধর্ষ তেমনি আত্মভোলা, কিন্তু তাঁর মত নিরলস কঠোর কর্মী হতে পারেন নি। পিতামহ হুমায়ুনের পদাঙ্ক অনুসরণে আফিম আর মদে বুঁদ হয়ে বসে থাকতেন এই পণ্ডিত মানুষটি। ক্ষমতা থেকেও কোনও কাজে তা যেন লাগেনি। এই একান্ত কবি-মানুষটি যে চরম অত্যাচারী হতে পারতেন তারও বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

আনন্দ মজলিস জমিয়ে তুলেছেন একদা—আতরের খোস বায়ে লাল সিরাজীর চঞ্চল উচ্ছলতায় রাজ পেয়ালা অধীর—তাতারী অধৈর্য জেগে উঠলো মনে—কেন এত বিলম্ব নর্তকীদের সভাগমনে—কেন এ অগ্রাহ্য! ছুটে এল ভয়-কম্পিত নর্তকীরা রাজদরবারে। হতভাগিনী

শিল্পীরা বুঝি প্রাণ নিঃশেষ করে ফেলেছিল—ক্ষমা কিন্তু পেল না তারা। নির্মম রাজ-আজ্ঞায় তাদের চিরদিনের মত অভিশপ্ত করে দণ্ড করে দেওয়া হল—হায় নির্মমতা! তোমাদের রাজত্বে মানুষের মনুষ্যত্ব কেন এমন করে লাঞ্ছিত!

জাহাঙ্গীর প্রাসাদের নীচে আজও ভগ্নদশায় পড়ে আছে বহু জলাধার বা বৃহৎ চৌবাচ্চা—স্নানাগারে স্নানাগারে জল যেত এই চৌবাচ্চাগুলি থেকে। অবাক হতে হয় এঁদের সমযুগের বৈজ্ঞানিকদের জল গরম করার ব্যবস্থা দেখলে—আজও দুর্গে দুর্গে সমস্ত সরঞ্জাম সাজান রয়েছে দর্শকদের কৌতূহল নিবারণার্থে—নিবে গেছে শুধু সেই বৈজ্ঞানিক সাধন-লব্ধ শিখাটি যা অনির্বাণ উত্তাপ দিয়ে যেত জল গরম করার জন্য। আজও দেখা যায় নানা রঙ ফোয়ারা স্নানঘরের মধ্যে যা দিয়ে নানা সুগন্ধি আতর যেত সম্রাজ্ঞীদের স্বেচ্ছামত, পছন্দমত ব্যবহারের জন্য।

এই মোগল বাদশাহরা বিলাসিতা দেখিয়ে গেছেন সত্য কিন্তু সেই সঙ্গেই সে দিনের জ্ঞানে শিল্পে কাব্যে চারুকলায় সর্বদিকে ভারতের ঐতিহ্য ও মনকে বিস্মিত না করে পারে না। সুরা-প্রিয় আপন-ভোলা জাহাঙ্গীর নাকি এক ষাটটি ঘণ্টার মালা টাঙিয়ে ছিলেন আপন মহলে—আর নিচে খোলা অঙ্গনে থাকত এক দড়ি এই বিরাট ঘণ্টার মালা থেকে। প্রজা সাধারণ দরিদ্র আপামর এই ঘণ্টায় ঘা দিয়ে রাজার কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থী হত এ ঘণ্টা বাজলে বাদশাহ ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসতেন অভিযোগ শুনতে। সাধারণের বুকে এ ঘণ্টা বাজানোর হিম্মত মোগল রাজত্বে হত কিনা এ ইতিহাস জানা নেই—তবুও বলব এ অধিকার দানেরও একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল বৈ কি!

কিন্তু হায়! এ দর্পঘণ্টার অধিনায়ক কি সব সময় ন্যায় পথে চলেছিলেন?

স্বামী-শোকাতুরা বন্দিনী মেহেরউন্নিসা চলেছেন আগ্রার পথে রাজ আজ্ঞায়—বর্ধমানের রাঙামাটি বুঝি ব্যাকুল হয়েছিলো তাঁর চোখের জলে। রাঢ়ের মাটি বলবে কালো হয়ে উঠেছিলো বুঝিবা জাহাঙ্গীর বাসনার কলঙ্কে।

রাজ-বন্দিনী মেহেরউন্নিসা ঘা দিলেন এ দর্প ঘণ্টায়। স্তব্ধ হয়ে গেলেন জাহাঙ্গীর এ তপস্বিনীর সামনে।

কই তাঁর সে যৌবনের জাগ্রত স্বপ্ন মেহের? এ যে এক শোকাতুরা বন্দী পতিহত্যার বিচার চায় হত্যাকারীর দরবারে।

ফিরে গেলেন সম্রাট ব্যথার ব্যর্থ আক্রোশে—অসম্মানের নিদারুণ জ্বালা বুকে নিয়ে—সত্যের দাহন যে বড় জ্বালাময়ী।

একই দুর্গে বাস করেন মেহের ও জাহাঙ্গীর, তবুও কেন চির অপরিচিতা—অভিমানের ঘন মেঘ টেনে দিয়েছে বিচ্ছেদের যবনিকা।

বহু প্রত্যাশার পর সাক্ষাৎ পেয়ে জাহাঙ্গীর নির্মম আঘাতে বুঝতে পারলেন—জীবনে যা যায় তা আর ফিরে আসে না! তাঁর যৌবনের প্রথম প্রেম, তাঁর স্বপ্নসঙ্গী মেহেরউন্নিসার হয়েছে চিরমৃত্যু। তাঁর সে প্রেয়সীর প্রিয় আবরণে ঢেকে ফিরে এসেছে প্রৌঢ়া শের-আফগান ঘরণী—জননী—লাডলির।

দিনের পর দিন কেটে চলে—ফুলের গহনা ছেড়ে রেশমী বুটি তুলে মেহের প্রাসাদে দিন গুজরান করেন। হঠাৎ একদিন আত্মভোলা সম্রাট এলেন তাঁর প্রাসাদে—দেখলেন মেহেরের সামান্য দীন বেশ। অবাক হয়ে শুধালেন—বল মেহের?—তোমার কেন এ দীন বেশ? তোমার বাঁদীর চেয়েও কেন তোমার সাজ মলিন?

জবাব পেলেন—'আমার বাঁদী আমার ইচ্ছামত সাজ পরেছে আর আমি পরেছি তোমার অবহেলার বেশ—অনাদরের আভরণ'!

মুগ্ধ হলেন, স্তব্ধ হলেন সম্রাট কথার ঐন্দ্রজালে—আবার বুঝি ফিরে এল সব বাধা সব ব্যবধান পার হয়ে—যৌবনের নর্মসহচরী মেহের-উন্নিসা।

সাদরে নিয়ে গেলেন আপন মহলে। সদরে দিলেন নূরমহল নাম—তাতেও বুঝি আশ মিটল না তাই নাম রাখলেন নূর জাহান বা জগজ্জ্যোতি।

মোহরে বাদশার নামের পাশে অঙ্কিত হল সম্রাজ্ঞীর নাম—মোহরের মূল্য হল দ্বিগুণ। ধন মান রাজ্য-সম্পদ

সব কিছু প্রিয়ার করকমলে তুলে দিয়ে মশগুল হলেন সুরায় আর কবিতায় জহাঙ্গীর।

মোগল প্রাসাদের ইতিহাস—চিরন্তন সাধারণ কথা। সেই জ্ঞাতি দ্রোহ। জহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরো আজ মৃত রাজসিংহাসনের চক্রান্তে। সে আজ লক্ষ্ণৌএর খুসরোবাগে চিরনিদ্রিত। জহাঙ্গীরের যোগ্য প্রিয় পুত্র খুররম বিবাহ করলেন আসফখান-দুহিতা নুরজহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী অর্জুমন্দ বানু বেগমকে—জহাঙ্গীর নাম দিলেন মমতাজ মহল বা মহল শ্রেষ্ঠা। সর্বকনিষ্ঠ শাহরিয়ার হলেন নুরজহান জামাতা—লাডলিকে বিবাহ করে। শুরু হল সিংহাসন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নুরজহান্ আপন জামাতার স্বার্থে খুররম বা শাহজহানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত জাল বিস্তার করলেন। জহাঙ্গীর রুষ্ট হলেন যুবরাজ খুররম এর-প্রতি সম্রাজ্ঞীর প্ররোচনায়। কিন্তু হলে কি হয়—খুররম যোগ্যতর এবং সুকৌশলী রণপটু—তার ওপর নুরজহান্ ভ্রাতা চতুর চূড়ামণি আসফ-খান্ তাঁর সহায়।

শাহজহান্ বিদ্রোহী হলেন—পরাজিত ও বন্দী হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে দুই পুত্রকে রাজদরবারে পাঠাতে বাধ্য হলেন—নতি স্বীকারের চিহ্ন স্বরূপ। কিন্তু নুরজহানের ব্যবহারে রুষ্ট স্বনাম ধন্য সুযোগ্য সেনাপতি মহাবৎ খাঁ। বন্দী করলেন সম্রাট জহাঙ্গীরকে ঝেলম নদীর তীরে কাবুলের পথে। অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এই সময় নুরজহান্—অসাধারণ কূটনীতিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কের মতই নিজে বন্দী হয়ে তিনি ছলে কৌশলে সম্রাটকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন—কিন্তু হায়! সৌভাগ্য-সূর্য তখন তাঁর অস্তগামী! এত চেষ্টা, এত বুদ্ধিমত্তা সবই বিফলে গেল—জীবন-দীপ সম্রাটের নিভে এসেছিলো, অসুস্থ সম্রাট অচিরে প্রাণ হারালেন। বন্দিনী হলেন নুরজহান শাহজাদা খুররমের হাতে ভাগ্যের বিড়ম্বনায়।

সম্রাট শাহ্জহান নির্মম হস্তে অন্ধ করলেন আপন কনিষ্ঠ অনুজ নুরজহানের প্রিয় জামাতা শাহ্রিয়রকে। হায় বন্দিনী নুরজহান! তোমার শেষ দশা কি বেদনাময়। কি গভীর ব্যথায় বিধুর। আবার তেমনই বেদনা কণ্টকিত সম্রাট শাহজহানের শেষ দশা! গৌরবের সুউচ্চশিখর এঁরা আরোহণ করেছেন—আবার ভোগ করে গেছেন চরম বেদনা বার্দ্ধক্যের আতুর অসহায়তায়। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছি—জাহাঙ্গিরী মহলের সামনে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে কিছু বহু পুরাতন যুগের প্রস্তর চিহ্ন। মহারাজা অশোক যে খৃষ্টপূর্ব ২৫০এ এ প্রদেশ শাসিত করেছিলেন, পাওয়া গেছে তার জাজ্বল্য প্রমাণ। সে দিনের অগ্রাবনের এই বাদল গড় দুর্গে প্রথম তৈমুরের বংশধর হুমায়ুন রাজত্ব করেন। তারপর তাঁরই পুত্র জালালউদ্দিন অকবর সে পুরাতন দুর্গ ধ্বংস করিয়ে পনেরো শ ছেষট্টি খৃষ্টাব্দে রচনা করান এই আগ্রাদুর্গ। পনেরো শ আটষট্টি খৃষ্টাব্দে চিতোর জয় করে অকবর সেখানকার দুর্গের একটি তোরণ এই দুর্গে স্থাপন করান। সেই তোরণটিরই নাম দিল্লী তোরণ। চারটি প্রধান তোরণের আজ অমরসিংহ তোরণ ছাড়া সব কয়টিই বন্ধ। এই অমরসিংহ তোরণ দিয়ে ঢুকতে আজও দেখা যায় একটি লাল পাথরের ঘোড়ার মূর্তি। অমরসিংহ ঘোড়ায় চড়ে লাফিয়ে পালিয়ে ছিলেন দুর্গ থেকে এই খানেই—তাঁর প্রাণ বেঁচেছিলো—তিনি সক্ষম হয়েছিলেন পালিয়ে যেতে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে, কিন্তু তাঁর ঘোড়াটি দেহ রেখেছিলো; তারই স্মৃতি-চিহ্ন নাকি এই প্রস্তর ঘোটকটি। প্রতাপ বংশের দ্বিতীয় চৈতক কিনা এ ঘোড়াটি সে কথা জানা নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি—কত কবিতা, কত কিংবদন্তী, কত লোক-গাথায় এই কাব্য-ইতিহাস আজও ওতপ্রোত হয়ে আছে। নির্মম হস্তে কঠিন সত্য বেছে বেছে জাতির ইতিহাস রচনা করে চলেছেন ঐতিহাসিকেরা!

রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ

['বরিশাল হিতৈষী' হইতে]

॥ শ্রীদুর্গামোহন সেন ॥

[১৯২০-র অসহযোগ আন্দোলনের রাজনীতিক্ষেত্রেও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের সাময়িক জীবনধারা কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সেই সময়কার শ্রীদুর্গামোহন সেন পরিচালিত 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। উক্ত সময়কার পত্রিকার বিগত চতুর্দশ বর্ষের আষাঢ় সংখ্যায় এই লেখা শেষ প্রকাশিত হইয়াছিল। বরিশাল হিতৈষীর পুরাণ (কোন কোনটা কীটদষ্ট বা ছিন্ন) সংখ্যা হইতে দীর্ঘ বারো চৌদ্দ বৎসর আগে আমাদের ভগিনী শ্রীযুক্তা সুধাংশুকুমারী ঘোষ কর্তৃক ইহা অনুলিখিত হইয়াছিল। সর্বত্র পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, তাই অনেক স্থানে পড়িতে অসুবিধা হয়। কোন কোন স্থানে বর্তমান প্রসঙ্গ বহির্ভূত বলিয়াও বাদ দিতে হইয়াছে।

শরৎকুমার ও আধ্যাত্মিকতা :—আমি সর্ব্বত্র বক্তৃতা দিয়াছি—আমার মত অনেকে জানেন—আমি কংগ্রেসের দলে।…… মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নূতন বার্ত্তা আনিয়াছেন—ইতি পূর্ব্বে তেমন বার্ত্তা আর কেহ আনেন নাই, মহাত্মা কংগ্রেসকে সর্ব্বসাধারণের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। এই জায়গায় পূর্ব্ব আন্দোলনের পার্থক্য। আধ্যাত্মিকতার একটা অপবাদ উঠেছে। …গোত্রের উল্লেখ করে যাদের চলতে হয় তারা আধ্যাত্মিক নয় বলে সভায় দাঁড়িয়ে গৌরব করে কোন প্রাণে আমি বুঝতে পারি না। যে দেশের ভক্ত কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন 'আহার করি আহুতি দেই শ্যামা মাকে", যে ভারতবর্ষে বেদব্যাস শাণ্ডিল্য জন্মেছিলেন—তাদের গোত্রধারা বহন করিয়া তারা আধ্যাত্মিক হইলে কি লজ্জার কথা হয়? বাঙ্গালীর একটা ধাত আছে। গৌরাঙ্গকে বাদ দিলে বাঙ্গলার রাষ্ট্র, সমাজ, কাব্য, নাটক, বাঙ্গালীর থাকে না, সে কথা ভুলিলেই বাঙ্গালীর অধঃপতন। যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ সন্ধ্যা-গায়ত্রী পড়েন তাঁরা করেন আধ্যাত্মিকতাকে ঠাট্টা! আর ভগবানের কথা বলা উপহাসের কথা হয়েছে! ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-ক্ষেত্র—শিবাজী রামদাস স্বামীর উপদেশে চলতেন, রাজ্য শাসন করতেন।…অনেকে বলে non violence ক্লীবত্ব। ক্লীবত্ব তামসেও আসে—অত্যাহারে অতিব্যবহারেও আসে। আধ্যাত্মিকতার অর্থ কি বৃন্দাবনে মালা জপ করতে যাওয়া? আধ্যাত্মিক স্বরাজবাদী আমি গয়া কংগ্রেস-প্রোগ্রাম পালন করেছি। ধর্ম্ম বাদ দিলে অন্ন হবে না—ছান্দোগ্য উপনিষদ না পড়ে থাকলে সে জন্য কি দায়ী আমি? ঋষিরা অন্ন যজ্ঞ করেছেন, সেটা আধ্যাত্মিকতা। উপনিষদে অন্নকে ব্রহ্ম বলেছে। আধ্যাত্মিকতাকে ঠাট্টা ভগবদ্দ্রোহিতা—ভগবানকে নিয়া ঠাট্টা? আধ্যাত্মিকতার সত্যকার অর্থ বুঝতে হবে। যৎ করোমি জগন্মাত তদেব তব পূজনং, যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন আর আধ্যাত্মিকতাকে ঠাট্টা করছেন—অর্জুনকে যুদ্ধ করবার আগে ভগবান গীতা শোনান নি?

জনাকীর্ণ সভা : এই জেলার প্রতিনিধি পদে সত্যাগ্রহকারী স্বেচ্ছাসেবকগণকে এতদুপলক্ষে আহ্বান করা হইয়াছিল। গত সোমবার পূর্ব্বাহ্নে লেফ্‌টান্যান্ট কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়—প্রথমতঃ তিনি ইংরেজ সৈন্যের নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে সুরেশবাবু এবং শরৎবাবু স্বেচ্ছাসেবকগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন।…

স্বরাজ্য পার্টি সংবাদ পত্রকে অথবা গালাগাল দেওয়ায় পত্রিকামহলে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়।

জিলা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হন ও সুধীর দাসগুপ্ত সম্পাদক হলেন।

শ্রীযুক্ত দাসের বক্তৃতায় শরৎবাবুর উত্তর—৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল

গত বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ব্রজমোহন বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক জনসাধারণের সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে ও তদুত্তরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্তের বক্তৃতান্তরে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জবাব দিতে দণ্ডায়মান হন। তাঁহার বক্তৃতার মাঝে মাঝে দাস মহাশয় দাঁড়াইয়া জবাব দিয়াছেন, সুভাষ বাবু কিছু কিছু বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার ২।১টা বাধা প্রয়োগ করিয়াছেন। এত বাধার মধ্যে বিশেষ সহিষ্ণুতা সহকারে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় ধীর ভাবে যাবতীয় উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

সেদিনের বক্তৃতা যাহারা শুনিয়াছেন, তাহারা উপলব্ধি করিয়াছেন স্বরাজ্য পার্টির যুক্তিগুলি কত শিথিল। শরৎবাবুর বক্তৃতার পর হেমন্তবাবু তাহার স্বাভাবিক হাস্তরস পূর্ণ বক্তৃতায় সকলকে বিদায় দিয়াছেন। শরৎবাবুর বক্তৃতার সময় দাস মহাশয় কয়েকবার দাঁড়াইয়া পরিশেষে মাঝখানে সভাস্থল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

শরৎবাবুর উত্তর: দেশবন্ধু একটি চমৎকার কথা শুনাইয়াছেন যে, সকল ব্যাপারে সত্যিই সরল সহজ ভাবটি পরিত্যাগ করিয়া আমরা তর্ক শাস্ত্রের অবতারণে বিষয়টিকে জটিল করিয়া ফেলি। আমিও তাই দেখিতেছি, এটা আমাদের প্রকৃতির একটা বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমিও চাই বিষয় ও কথাগুলির সরল সহজ ব্যাখ্যা দিতে। কিন্তু দেশের এমনই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে একদল লোক কূট তর্কশাস্ত্রের অবতারণা না করিলে কিছুতেই তুষ্ট হন না—তাই মাঝে মাঝে বাধ্য হইয়া তর্কশাস্ত্রের ২।৪টা কথা তুলিতে হয়।

দেশবন্ধু কাউন্সিলের ওথ অব এলিজেন্সের ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আমিও ওটাকে তর্কের মারপ্যাঁচে ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা না দিয়ে সহজ ভাবে বুঝতে বলি। King শব্দটাকে ঘুরিয়ে Constitution না করে সোজা রাজা বলে বুঝতে চাই। লণ্ডনের রাজা ও Coustitution-এ অনেক পার্থক্য। দেশবন্ধু king-কে Coustitution-এর হিসাব ধরে বলেছেন, কিন্তু ইংলণ্ডের King তা নয়। Bloody Revolution ব্যতিরেকে Constitution বদলান যায় কিন্তু লণ্ডনের রাজা বদলাইতে হইলে without bloody revolution-এ হইতে পারে না। ইংলণ্ড-এর রাজা আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই বরিশালে চাঁদপুরের ঘটনা উপলক্ষে মহাত্মার প্রতি যে দোষারোপ করা হইয়াছে যে তিনি শ্রমজীবিগণকে exploit করিতে নিষেধ করিয়াছেন অথচ ধর্ম্মঘট করে আমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের ডেকে রাস্তায় নামিয়েছি…। এই রাস্তায় নামাটাও exploit করা হয় না, যদি তাদের রাস্তায় রেখে আমি ঘরে ফিরে না যাই। আমার কথায় তারা চাকুরী ছেড়ে বেরিয়েছে—আর আমি যদি তাদের দুর্দ্দশার ভিতর রেখে ঘরে ফিরে গিয়ে চাকুরী করি, তাদের উপোস রেখে রসগোল্লা খাই তবেই হয় exploit করা, আর আমি যদি তাদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি, ঘরে ফিরে না যাই তবে সেটা exploit করা হয় না। মহাত্মা এমনি তাদের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে, exploit করতে নিষেধ করেছেন।

আইন অমান্য ও কাউন্সিলে গমন সম্বন্ধে দেশবন্ধু আমার কথার উত্তরে বলেছেন—কাউন্সিল কাউন্সিল করতে গেলে যেমন কাউন্সিল ঘাড়ে চেপে বসবে, তেমনই আইন অমান্য, আইন অমান্য বলতে বলতে ইংরেজের আইন ঘাড়ে চেপে বসবে। এ সত্যি কথা। ইংরেজের আইন অমান্য করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে তা ঘাড়ে চেপে বসবেই। দেশবন্ধুই শুনিয়েছেন

disobedience হচ্ছে higher laws obey করা। উচ্চতম আইন মেনে চলার পথেই ইংরেজের আইন অমান্য এসে পড়ে। কাউন্সিল আমরা ধ্বংস করতে যাচ্ছি—এখানে কাউন্সিল আমাদের উদ্দেশ্য। কামকে দমন করতে যখন যাই, কাম অজান্তে এসে দুপুর রাত্রে পীড়ন মূর্তিতে সামনে দাঁড়াবে, কিন্তু তার দমন করতে না যেয়ে যদি ভগবানকে লাভ করতে যাই, ভগবান যদি আমার উদ্দেশ্য হন তবে কাম কোন্ পথে পালিয়ে যাবে তা টেরও পাওয়া যাবে না, সাধক জীবনের ইহা অপরিহার্য সত্য। মহাত্মা বলিয়াছেন ইংরেজের সঙ্গে নয়···প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নন্ কো অপারেশন··· তুমি উন্মুক্ত হও, তোমার অহিংসার পথে নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হও, ইংরেজ···তার প্রতিষ্ঠান আপনা আপনি ধসে পড়বে, তার সঙ্গে সংগ্রামের প্রয়োজন হবে না। সভায় প্রশ্ন হইল, আপনি কাউন্সিলে যাওয়া কি মনে করেন, উত্তর—মহাপাপ মনে করি।

খদ্দর ও ফ্যাক্টরী : দেশবন্ধু ফ্যাক্টরীর নিন্দা করেছেন, আমরাও প্রশংসা করি না; আন্দোলনের ফলে যেমন ফ্যাক্টরী হয়েছে, তেমনি ঘরে ঘরে চরকা, তাঁতও চলছে। গৃহ-শিল্প প্রতিষ্ঠাই আমাদের আদর্শ, কিন্তু কোনদিনই একেবারে ফ্যাক্টরী লোপ পাবে না। পেতে পারে না। দেশবন্ধুর নিজের ব্যবহৃত খদ্দরগুলিও বোধ হয় সবগুলি ঘরের তৈয়ারী ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। কেননা সমাজে ধনী দরিদ্রের বৈচিত্র্য চির কালই থাকবে, তাই সমাজের এক শ্রেণীর লোক চির কাল কাপড় কিনে পড়বে। যেমন করেই হোক্ আমাদিগকে ফ্যাক্টরী ভাবযুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকেই তাদের বস্ত্র সরবরাহ্ করতে হবে, তবে সেটা আদর্শ হবে না। আমি বলে থাকি ম্যাঞ্চেষ্টার লাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র আমাদের ষোল আনা বিলাতী, বোম্বের কাপড় বার আনা বিলাতী, বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় আট আনা, চট্টগ্রামের কাপড় বরিশালের পক্ষে চার আনা, পল্লীর পক্ষে সহরের তৈয়ারী কাপড় দুই আনা, প্রতিবেশীর তৈয়ারী কাপড় এক আনা বিলাতী আর নিজের ঘরের চরকা-তাঁতের কাপড় আমার ষোল আনাই দেশী। আমাদের আদর্শ হবে ঘরের তৈয়ারী পড়া—কিন্তু কোন কালেই ষোল আনা এ আদর্শ প্রতিপালিত হতে পারে না। তাই ফ্যাক্টরী থাকবে বটে কিন্তু সে থাকবে চরকার চরণ তলে। দেশবন্ধু জিজ্ঞাসা করেছেন—এ সম্বন্ধে কংগ্রেস কি করেছে? এ প্রশ্ন তিনি আমাদের না জিজ্ঞাসা করে কংগ্রেস কি করেছে, সে প্রশ্নের জবাব তিনিই ত আমাদের চেয়ে ভাল দিতে পারবেন। দেশবন্ধু তখন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি বলছি—কংগ্রেস কিছুই করে নাই, যে চেষ্টা হয়েছে, তা ব্যর্থ। শরৎবাবু বলেন—কংগ্রেস কি factory আদর্শ প্রচার করেছে? কংগ্রেসের কোনো প্রস্তাবে কি factory স্থাপনের কথা উল্লেখ আছে? দাস মহাশয় বলিলেন—"প্রস্তাব নাই বটে কিন্তু কার্যতঃ কংগ্রেস দ্বারা হচ্ছে।' শরৎবাবু—"কোথায় হয়েছে বলতে পারেন?" তখন সভাপতি শ্রীশবাবু বলেন ঢাকায় আছে। শরৎবাবু—আমার জানা নাই; হতে পারে তেমন দু-একটা, কি সেটা আদর্শ বা কংগ্রেসের প্রচার্য নহে।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৩০ সা

বিক্রমপুরে শরৎবাবু : শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশ আজ ৭।৮ দিন যাবত বিক্রমপুরের নানাস্থান ঘুরি কংগ্রেসের প্রচার কার্য করিতেছেন। তিনি হিন্দুধর্মের সাহায্যে বর্তমান আন্দোলনটি এমন সুন্দর ভাবে ব্যাখ করেন যে তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সাধারণতঃ তাঁহার বক্তৃতা প্রা তিন ঘণ্টা ব্যাপী চলিতে থাকে কিন্তু আশ্চর্যের বি এই যে এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলেও শ্রোতৃবৃ আরও শুনিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তাঁহা চিন্তাধারা খুব উচ্চ স্তরের হইলেও তাঁহার বাক্য এ প্রাঞ্জল যে স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হয়। ১৯শে মে, বাহেরক গ্রামে দীঘির পাড়ে মসজিদের একটি সভা হয়, তথায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল অহিংসা ও অসহযোগ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ভাবে আলোচ করেন। তিনি বলেন যে এই আন্দোলনের শিকড় দেশে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছে, অতএব ইহা মরিতে পারে না। প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপী সভায় বক্তৃতা হয়।

২১শে মে বিক্রমপুর, বানারীতে জনসাধারণের এ

২২শে মে, বৈকালে মহিলাদের একটি সভা হয়। মহিলাদের সভায় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার আদর্শ গৃহস্থ এবং মাতৃত্বের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন, এবং সর্বশেষে চরকা ও খদ্দর কার্যের সহায়তার জন্য মহিলাদিগকে আহ্বান করেন। প্রায় ৩৫ জন মহিলা চরকা ও খদ্দর প্রচার কার্যে স্বীকৃতা হন। ২৩শে মে, প্রাতে এক শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎকুমারকে লইয়া কলমা গ্রামে যাওয়া হয়। সেখানে বৈকালে জনসাধারণের একটি সভা হয়। প্রায় ১ ঘণ্টাকাল বক্তৃতার পর বৃষ্টি আরম্ভ হইলে সভা ভঙ্গ হয়। ২৭শে প্রাতে তজাকর গ্রামে মহিলাদের একটি সভা হয়। প্রায় ৪ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হইলেও শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়াছিলেন। ঐ দিন বৈকালে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ লৌহজঙ্গ আগমন করেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ একটি শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। সন্ধ্যাকালে সেখানে জনসাধারণের একটি সভা হয়। জাতীয় বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হইলে শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার বক্তৃতা আরম্ভ করেন। অভিনন্দনে অতিশয়োক্তি সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করেন—পরে বলেন যে বর্তমান আন্দোলন বৈষ্ণবের অতি আদরের জিনিষ। ইহা মহাপ্রভুর প্রেমের আন্দোলন।

পরদিন ২৫শে মে, প্রাতঃকালে ডায়ামিয়া গ্রামে মহিলাদের এক সভা হয়। ঐদিন বৈকালে মালিহাটী জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ এক শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎকুমারকে মালিহাটী লইয়া যান। পরদিন ২৬ মে প্রাতে একটি সভা হয়। তিনি বলেন যে বর্তমান সভ্যতার লক্ষ্য কেবল বাজার প্রতিষ্ঠার দিকে, স্বরাজ্যের লক্ষ্য হবে গ্রাম বা গৃহ-প্রতিষ্ঠার দিকে। তিনি বলেন যে আত্ম সম্মান বোধকে জাগ্রত করাই স্বরাজ্যের একমাত্র কথা। বৈকালে কাজীর পাগলা অভিমুখে যাত্রা করেন।

১২ই আষাঢ়, ১৩৩০ সাল

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষের ভ্রমণ: বরিশাল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পরই শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচার কার্যে গমন করেন। তাঁহার ক্ষুদ্র একটি বিবরণ হিতৈষীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিক্রমপুরের প্রচারের পর খুলনা, তথা হইতে কলিকাতা গমন করিয়াছেন। সর্বত্রই তিনি বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন। যাহারা বলেন দেশে অবসাদ আসিয়াছে, তাহারা যদি শরৎবাবুর ন্যায় গ্রামে গ্রামে জিলায় জিলায় ভ্রমণ করিতেন, তাহা হইলে দেশ অবসাদগ্রস্ত হইত না, অথবা তাহারা এই ছুতা দিয়া পশ্চাতে গমন করিত না।

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩০ সাল

নাগপুর যাত্রা: গত শুক্রবার স্বেচ্ছাসেবক ২য় দল নাগপুর যাত্রা করেন, বৃহস্পতিবার প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষরকারী স্বেচ্ছাসেবকগণের এক শোভাযাত্রা রাজপথ পরিভ্রমণ করেন, তৎপর নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে টাউন হলে এক সভা হয়। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় প্রাণস্পর্শী ওজস্বিনী ভাষায় জাতীয় পতাকা, স্বেচ্ছাসেবকগণের ত্যাগ ও সাধনা ও দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। যাত্রার দিন কংগ্রেস প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছাসেবকগণ সমবেত হন। তাহাদিগকে পুর মহিলাগণ পুষ্পমাল্যে ও চন্দনে ভূষিত করেন। মাঙ্গলিক লাজ ও পুষ্পবর্ষণ করেন। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় পতাকা হস্তে অগ্রবর্তী হইয়া শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। চতুর্দিক হইতে সমস্বরে বন্দেমাতরম্, আল্লাহোআকবর, গান্ধী কি জয় ধ্বনি উচ্চারিত। জয়ধ্বনিতে শহর প্রতিকম্পিত করিয়া শোভাযাত্রা ক্রমে নদীতীর পর্যন্ত উপস্থিত হইল। বিরাট জনসংঘে সকলে কোলাকুলি অভিবাদনাদি করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ উৎফুল্ল অন্তরে স্টীমারে আরোহণ করেন।

(ডাক্তারের মায়ের দুঃখ): মহাত্মাজী ওকালতি ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়কে আক্রমণ করিয়াছেন, আমাদের শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় গল্প বলিয়াছেন—"ডাক্তারের মা সকালে উঠিয়া প্রার্থনা করেন, আজ যেন আমার পুত্র বিকারের রোগী পায়", সে সময় অনেকে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। আজ স্টেটস্‌মেনে আছে বিলাতে ৪ হাজার মামলা কম হওয়ায় ব্যবহারজীবিদের বড়ই দুঃখ। ব্যারাম পীড়ায় ডাক্তারদেরও উৎসাহ আছে। পাদ্রী বা পুলিসের বেতন পাপের সংখ্যানুপাতে গণনা হয় না বটে...

আধুনিক ছোট গল্প

॥ শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার ॥

কল্লোল যুগের পর কয়েকজন গল্পলেখক বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছেন। এঁদের বহু সার্থক ছোট গল্পে বাংলা সাহিত্য-তরুটি ক্রমশঃই পুষ্ট হচ্ছে। জীবনের বহু বিচিত্রতম অভিজ্ঞতা ও অনুভবের তীব্রতা এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং নূতনতম ঘটনা এঁদের গল্পে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। এঁদের পুরোধা প্রবোধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী সন্তোষ ঘোষ সমরেশ বসু বিমল কর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

অবশ্য অতি সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে একদল তরুণতর ছোট গল্পকারের আবির্ভাব ঘটেছে। কয়েকটি বিশেষ সাময়িক পত্রিকায় ছোট গল্পের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য নিয়ে এরা গবেষণা করছেন। এটা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্ব। তাই অতি সামান্য গল্পই সার্থকতায় উজ্জ্বল হয়েছে। অল্পসংখ্যক গল্পগুলিই আলোচ্য বিষয়ে উপজীব্য।

এই নোতুন রীতির ছোটগল্প ইদানিং অনেক লেখা হয়েছে। এ ধরণের গল্পে কয়েকটি নোতুন রীতির বৈশিষ্ট্য আমাদের চমকিত করে। নোতুন ভঙ্গীতে এই সব গল্পের কাঠামো বাঁধা হচ্ছে। অধিকাংশ গল্পই বর্ণিত হচ্ছে চেতনা প্রবাহের ভিত্তিতে। অথচ ঘটনার অভাব এই সব আধুনিক গল্পে বিশেষ লক্ষণীয়। গল্পে একটা রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে এরা বিশেষ যত্নবান। চরিত্রের সূক্ষ্মতম মানসিক ক্রিয়াকে পরিস্ফুট করার জন্য এঁরা "ডিটেল্স" এর আশ্রয় নিচ্ছেন। এ শ্রেণীর গল্পে বক্তব্যটি প্রায়ই প্রতিফলিত অর্থাৎ প্রতীকের ব্যঞ্জনায় বাহিত।

এই প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য। অবশ্য প্রচেষ্টাটি সুস্থ এবং সুরুচিপূর্ণ প্রচেষ্টা হলে সাহিত্যের স্থায়ী এবং সজীবতার লক্ষণ। ঘটনা-প্রধান গল্প থেকে মনন-প্রধান গল্পে দিক পরিবর্তন এই বোধময়তারই পরিচায়ক। আধুনিক মনের বহু বিচিত্র জটিল অলি গলিতে আধুনি যুগের গল্পকারেরা তুরীয় ভূমিকা নিয়ে আনাগোন করছেন। নায়ক নায়িকার জটিল অসংলগ্ন চিন্তাধারা নিখুঁত বিবরণ, তাদের মনের বিচিত্র কামনা বাসনা ছবি এঁরা গল্পে তুলে ধরছেন যেন।

আধুনিক যুগের জটিল মানসিকতাকে প্রকাশ কর জন্য প্রতীক, চিত্রকল্প রূপক ও অনুষঙ্গের প্রতিচ্ছবির ব ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ ধরণের গল্পের বিষ বস্তু আর চরিত্রগুলি নিয়েই আমাদের বিরাট সমস্যা, কে না নোতুন রীতির নোতুন ঢঙের গল্প পড়তে পড় স্বভাবতঃই পাঠকের স্নায়ু পীড়িত হয়। গল্পের চরিত্রে যেন কোন্ অন্ধকারময় অন্তর জগৎ থেকে বাহির একরা বিষণ্ণতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অবাক লাগে এই নায় নায়িকাদের অসংলগ্ন খোঁয়াটে, (হেঁয়ালীপূর্ণ) কথাবার্তা। বিষণ্ণ ও ইন্টেলেকচুয়াল, হীনচেতা চরিত্রহীন মানুষগু যেন নিতান্তই আমাদের অপরিচিত—কোন্ অন্ধকা জগতের জীব। সুস্থ সুন্দর জীবন ও অমল আলো উজ্জ্বলতার প্রতি এদের ঘৃণিত বঙ্কিম কটাক্ষ। এরা সবা যেন ঘোর নাস্তিক। সমস্ত সমাজের বিধানকেই যে এরা Dont care করে চলে। কেননা বঙ্কিম বাবু যুগ হতে কল্লোল যুগীয় সাহিত্যে তথা আধুনিক যুগের যুদ্ধের লেখকের লেখায় আমরা আমাদেরই চি পরিচিত মুখগুলির বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি শহরেরই হোক আর গ্রামেরই হোক সর্ব জাতির স সমাজের সর্ব স্তরের চেনা মানুষের পরিচিত সমাজে চিত্র দেখেছি। অথচ আধুনিক গল্পের উদ্ভট নায় নায়িকার উদ্ভট ভাবভঙ্গে চমকে উঠতে হচ্ছে, অব গল্প পড়ে যেন মূল গল্পটিই পাওয়া যায় না। গ

সংজ্ঞায় হলাহল ভাবলগগুলো গিলতে হচ্ছে। এই সব নায়ক নায়িকারা সবাই যেন মানুষের মূল্য সম্বন্ধে পাপ পুণ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত রকমে শ্রদ্ধাহীন। নারীমাত্রই এঁদের কাছে দেহ-সর্বস্ব জড়বস্তু, চিন্তনীয় বিষয় একমাত্র অপরাধ বোধে। এরা শুধু মাত্র চিন্তা করে ক্লান্তির ধকলে। এই সব নায়ক নায়িকারা বাস্তব জগতের বুদ্ধিধারীর সংখ্যালঘু অথচ অতি বুদ্ধিসম্পন্ন এরা যেন সবাই মার্কিণ হেগেল বংশেরই কাম্যু পড়া। সকলের কথা বার্তা চলা ফেরা ভঙ্গি ও সুর যেন একই ছাঁচে গড়া। এঁদের কথা বার্তা সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য। অবশ্য লেখক নিজেই নিজের গল্প ছাড়া অপরের লেখা পড়েন না। দু'এক বার যদি কোন আধুনিক লেখকের লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় তবে তো কথাই নেই। তিনি তো ধরাকে সরা জ্ঞান করেন, কেতায় বেশ কেতাদুরস্ত ভাবে কাপড় পড়েন, মরাল গমনে না হোক গজেন্দ্র গমনে চলেন, ওজন করে হাসেন, ওজন করে কথা বলেন—পাড়ার উৎসবে সভাপতি হন, তরুণ তরুণীর ফুলমালা পড়ে অটোগ্রাফের পাতায় স্বাক্ষর করে কৃতার্থ করেন। এই শ্রেণীর আধুনিক লেখকরা নিজের গল্প ছাড়া অপরেরটা পড়েন না, অপরের গল্প ভালো বললে এরা মুখ বেঁকিয়ে হাসেন, বলেন—র‍্যাবিশ—রটেন্। অথচ এরা সমাজকে জানেন কেবল আত্মকেন্দ্রিকতার কেন্দ্রে বসে চিন্তা করে। সে সব কল্প চিন্তা যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনই বিকারগ্রস্ত। আচরণ স্বাভাবিক মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। নায়ক নায়িকারা গৃহের ও গার্হস্থ্য জীবনের আবেষ্টনীতে যেন বাস করে না—গৃহহীন কফি-হাউস বা বারে এদের বিচরণ স্থান। পতিতার অভিজ্ঞতা এদের কাছে একটা চরমতম গৌরবের বিষয়। আধুনিক গল্পে কেবল অমুক বাড়ীর অস্বাস্থ্যকর পংকিল জীবনের বিকৃত ঘটনার নিদর্শন। মোট কথা সমস্ত কিছু মিলিয়ে এই শ্রেণীর গল্পে চিত্রিত মানুষেরা সর্বত্রই অসুস্থ বিকারগ্রস্ত এরা সব ইনসমনিয়ার রুগী। আমাদের প্রশ্ন হলো—এরা কারা? সমাজের পরিচিত চরিত্রগুলি কি এই সব গল্পে পরিস্ফুট হচ্ছে? এইসব ধরণের বিচিত্র চরিত্রগুলির ওপরেই অতি আধুনিক গল্পকারদের ঝোঁক অতি বেশী।

গল্পে সমাজের নীচেকার স্তর অর্থাৎ অন্ধকার ও জটিলতার কথা বর্ণিত হোক—তাতে উপকার ছাড়া অপকার হবে না, কিন্তু সেই সঙ্গে সুস্থ সুন্দর ও সহজ জীবনের আলো অন্ধকারে মেশা আমাদের সমাজের পরিচিত মানুষের কথাগুলোরও স্থান দেওয়া দরকার। নীচের তলার মানুষের কথাগুলি বেশ মার্জিত ভাষায় বর্ণনা করা কি যায় না—[illegible] ভাষা ও আকার ইঙ্গিতে কুৎসিত প্রলাপগুলি বাদ দিয়ে। ছোটগল্প কখনোও সমাজ-বিরোধী হ'তে পারে না।

আরো দুঃখের কথা সমস্ত লেখকের গল্পগুলিই বস্তু [illegible]। এই সব পড়ে পড়ে অদ্ভুত এক প্রশ্ন জাগছে। এই সব লেখকেরা নোতুন রীতির মোহে নিবিড় ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন। আঙ্গিকের অভিনবত্বের দিকে এঁরা এত বেশী ঝুঁকে পড়েছেন যে গল্পের ভাববস্তু চাকচিক্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। আঙ্গিকের নতুনত্বে আর জৌলুসে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা হাল আমলের গল্প গুলোতে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। এদের ধারণা গল্পের সার্থকতা নতুনতর টেকনিকের উপস্থাপনায়। ফুলদানীটি সুন্দর সুন্দর রং-বেরংগী ফুলে সাজানো থাকলে লোকে ফুলেরই প্রশংসা করে, আর ফুলদানীর শোভা আর সার্থকতা হয়। ফুলটাই আসল ফুলদানীটি গৌণ। সৌন্দর্য সৃষ্টির ধারক ও সহায়ক ফুলদানী—কাঠামো তেমনই গল্পের ভাববস্তু এবং উদ্দেশ্যকে ধরে রাখে অথচ আধুনিক গল্পের মালাকার ফুলকে দূরে ঠেলে ফুলদানীই পাঠকের কাছে ঠেলে ধরছেন। ফুলদানীটাই অভিনব বলে তাঁরা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে ঝড় তুলেছেন।

আরও একটা লক্ষণীয় নোতুন রীতির নামে সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। অথচ সব শেয়ালের এক রা। এ সব সংঘ বা দল উপদল (ক্যাম্প) জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে চললেও সাহিত্যে অচল। সব সার্থক শিল্পীই একক ব্যক্তিগত সৃষ্টি। বঙ্কিমবাবু শরৎবাবু নন, আবার দ্বিজেন্দ্রলাল

রবীন্দ্রনাথ নন, নবীন সেন হেমচন্দ্র নন, প্রবোধ সান্যাল অচিন্ত্য সেনগুপ্ত নন, প্রেমেন্দ্র মিত্র গজেন মিত্র নন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আশু মুখুজ্যে নন। প্রত্যেকেরই স্থান নিজস্ব—দলীয় বা গোষ্ঠীগত নন এঁরা। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নিভৃত সাধনার ফল। দল বেঁধে গণ-আন্দোলন বা সমাজ সংস্কারের কাজ করা যায়, কোন কিছু নোতুন সৃষ্টি করা চলে দল বেঁধে, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না।

অথচ উগ্র আধুনিক লেখকেরা একই style এমন ভাবে নকলো করে থাকেন, তাতে তার ভেতর থেকে লেখকের ব্যক্তিত্বকে খুঁজে বের করা যাবে না। নাম চেপে দিয়ে উগ্র আধুনিক লেখকদের যে কোন গল্প যে কোন লেখকের নামে চাপানো চলে। এঁদের মুখ প্রবৃত্তি নাম দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু সাহিত্য বা শিল্প ব্যাপারে শিল্পীর মৌলিক সক্রীয়তার অপমৃত্যু ঘটায়. এই নবীন দলের সবাই যদি একই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন তবে গল্পের শরীরে তাঁদের মৌলিক ক্ষমতার চিহ্ন ছড়িয়েই বিলুপ্ত হচ্ছে, হবে।

শুধু ত্রুটিগুলো নিয়েই আলোচনা করলাম এতক্ষণ। কিন্তু একটু আশার আলো এই যে এই আগাছার জংগলেও কিছু ফুলের সৌরভ দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে। এই ফুলগুলি নিয়েই আমাদের এক সম্ভাবনার আশা ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী সাহিত্যের আশা। এদের মধ্যে কয়েকজন রীতিমত শক্তিমান লেখক হবার দাবী রাখেন। এঁরা যেন রীতির অভিনবত্বের দিকেই মনোযোগ না দেন, দোষ গুণে মেশা চির পরিচিত মানুষগুলোর ছবি যেন এঁদের গল্পে দেখতে পাই, সমকালীন সাহিত্যে যেন সেই সময়কার বাস্তব ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। টেকনিকই শুধু যেন প্রাধান্য না পায়। নোতুন কাঠামোয় নোতুন অবিকৃত শালীনতাময় সহজ এবং সরল ভাষায় বাংলা সাহিত্য-তরু সঞ্জীবিত হয়ে উঠুক এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

গ্রন্থ পরিচয়

পথের টানে (ভ্রমণ কাহিনী)—প্রতিভা সরকার। এম. সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-১২ মূল্য ৩.৫০ ন. প। প্রায় দশ বৎসর পূর্বের লেখা। পূর্বে শনিবারের চিঠি ও বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখিকা উত্তর ভারতের কয়েকটি স্থানের ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সারনাথ, বুদ্ধগয়া, কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানের বিবরণ এবং বিভিন্ন স্থানের ঐতিহাসিক তথ্যও কিছু পরিবেশন করেছেন সহজ ঝরঝরে ভাষায়, যা পাঠকদের আনন্দ দেবে। পড়তে পড়তে কোথাও ক্লান্তি বোধ হয় না। স্থানে স্থানে কিছু কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি কাহিনীকে আরো চিত্তাকর্ষক করার চেষ্টা করেছেন। বৃন্দাবনের রাধা ও হরিদ্বারের মাধবী পাঠকের মনে ছাপ রেখে যায়। কিন্তু তাদের কাহিনী অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকায় ফলে ভ্রমণ কাহিনী পাঠ অপেক্ষা উপন্যাস পাঠের আনন্দই যেন বেশী পাওয়া যায়। বইয়ের শেষে একটি মুদ্রাপ্রমাদের তালিকা দেওয়া আছে। তা সত্ত্বেও অনেক বেশি মুদ্রাপ্রমাদ এবং স্থানে স্থানে উদ্ধৃতির ভুলও নজরে পড়ে। বাক্য বিন্যাসও কোথাও কোথাও ত্রুটিপূর্ণ, যেমন—'সফল হয়েছে বৌদ্ধ নৃপতিদের একে সুসজ্জিত করার চেষ্টা,' 'সে ক্ষ্যাপার জীবন—খুঁজে খুঁজেই যায় কেটে।'

—সুগত

পঁচিশে বৈশাখ

।। শ্রীশান্তশীল দাশ ।।

তুমি দাও, দিতে ভালবাসো,
তাই তুমি বারে বারে আস ;
কত কী যে আন সাথে ক'রে,
নিমেষে জীবন ওঠে ভ'রে ;
সব ব্যথা দূরে সরে যায়,
কী খুশিতে এ আকাশ ছায় !
কোন কালো নেই কোনখানে,
শুধু আলো, শুধু হাসি গানে
ভরা এই জীবনের দিন—
কী উদার, মধুর, রঙিন !

সে আলো আবার সরে যায়,
পারি না যে রেখে দিতে তায় ;
কালো কালো মেঘ ভেসে আসে
হাসি খুশি আমার আকাশে ;
চারিধারে নামে কী আঁধার,
কত ব্যথা, কত বেদনার !
জল ভ'রে আসে দু'টি চোখে—
রেখে দেব তোমার আলোকে
চিরদিন কাছে, সে সাধনা
করেছি কি ? তাই এ বেদনা।

তবু তুমি বারবার আস,
তুমি আমাদের ভালবাসো।

বিবেকানন্দ

শ্রীদিবাকর ঘোষ

তুমি তো ছিলে না শুধু আত্মমোক্ষকামী,
ছিলে না অরণ্যবাসী, গিরিগুহাচারী !
শাস্ত্রের জটিল পথে মানুষেরে লয়ে
করো নি বিভ্রান্ত কিংবা মোহগ্রস্ত তুমি !

সংখ্যাহীন মানুষের নির্বীর্য পৌরুষে
জাগ্রত করিয়া তুমি বোলেছিলে ডেকে—
'বীর্য্যবান্ হও সবে। ক্লীবত্বের গ্লানি
দূর কোরে মাথা তোল মহৎ সন্তান।'

যে দেশেতে কোটি কোটি দুধের বাছারা
শুষ্ক মাতৃস্তনে খোঁজে আয়ুর অমৃত ;
ব্যভিচার অবিচার অসত্য অন্যায়
যে দেশের ঐতিহ্যেরে, ভবিষ্যতে হায়
হীনতা দীনতা মাঝে অবলুপ্ত করে—

সেই দেশে এসে আজ-বজ্রকণ্ঠে ডেকে
বলো তুমি হে স্বামীজী, হে বীর সন্ন্যাসী—
পৌরুষে প্রজ্ঞায় আর সংযমে নিষ্ঠায়
মানবতাধর্মে তোরা দীক্ষা নিয়ে বল—
অমৃতের পুত্র তোরা। কে বলে দুর্বল ?

হে স্বামীজী ! তোমাকে প্রণাম।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫১—

(২৭)

সকালে আমি ও প্রতিভা অফিসে যাই।…সেবানন্দ এখানে হইয়া অফিসে যায়। দাদার জন্মোৎসব উহারা শান্তিপুরে করিবে। তাহার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইতে দিবে—তাহা দেখাইতে ও লিখাইয়া নিতে আসিয়াছিল। অন্যের বাড়ীতে করিতে আমি তেমন মত দেই নাই। জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতে ও বাহিরের বেশী হৈ চৈ না করিতে বলি।…সন্ধ্যায় সমর সনকের মা আসে। তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া বেশ লাগিল।…আমি যে ঠাকুরকে লইয়া বিপন্ন এবং প্রতিভা রেণুকে ভর করিয়াই যে আমি এই ভার হইতে মুক্ত হইতে চাই, তাহাই চোখের জলের সহিত উহাদের কাছে বলি। 'মহামানব' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিতে বলি। সকলেই বহন করিয়া আনন্দ পায়। ভগবানও বহন করেন। কেহই তো ভার বহন হইতে মুক্তি চায় না। কিন্তু ভার বহন করিবার অধিকারী কয়জন হয়? আমি কি ঠাকুরের ভার বহন করিতে পারিব? আমি সারা জীবন মুটের মত সকলের ভার বহন করিতে চাহিয়াছি। কেহ তো তেমন করিয়া 'ভার' দেয় নাই। তাই বহিতেও শেষ পর্যন্ত পারি নাই… নারীকে রণমঞ্চ হইতে সরাইয়া এদেশের পুরুষেরা নিত্য বৈরাগ্যের কথা শুনাইয়াছেন। এখন তো নারী আসিয়া রণমঞ্চে পূর্ণ উদ্যম লইয়া দাঁড়াইয়াছে। কে তাহাকে হটাইবে? অসম্ভব। নর-নারীর পারস্পরিক এই সংঘাতের মধ্যে কে পুরুষোত্তম ছাড়া পথের নির্দেশ দিবে?

৫ই ডিসেম্বর

৯-১০-দিঃ-এ 'নির্বাচনের প্রাণকথা' প্রবন্ধ সারিয়া আজই উহাকে প্রথমে দিবার জন্য রেণুর কাছে দেই … রেণু ১টার পর কলিকাতা যায়—বাসন্তী কটন মিলস্, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, শেখরবাবু, প্রেসে পাণ্ডুলিপি দিয়া আসে। এস সরকারে যায়, পায় না।…এতদিন ছিল প্রয়োজন কমাইয়া, পিছনের দিকে সরিয়া 'আত্মতুষ্ট' থাকিবার সাধনা। কিন্তু আমাদিগকে নিতে হইয়াছে সেই সাধনা যে সাধনায় সর্ব্ব প্রয়োজনের বুক চিরিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে, আত্মতুষ্ট হইতে হইবে। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সামঞ্জস্য যে কি দুরূহ, তাহা পুরুষোত্তমই জানেন। এ পথের যাত্রী তো কেহ নাই। রেণুর সামনে বাহির হইতে…আরও কত আসিতে পারে। সবই তো পরিপাক করিতে হইবে, কোথায়ও আত্মসমর্পণ না করিয়া অথচ আত্মতুষ্ট থাকিয়া। এই সাধনায় সফল হইলেই চরম সার্থকতা।…নারীর বিরুদ্ধে কি বিদ্বেষ, কি অভিযোগ পুরুষদের। অথচ নারীকেই ভোগ করিবে। ভজনা না করিয়া, জননীর জ্ঞানে সেবা না করিয়া যে ভোগ, তাহা নিতান্তই কামুকতা। নারীরা পুরুষদের ডুবাইয়াছে, এই অভিযোগই নারীদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ হইতে প্রতিভা প্রভৃতি নারী জাতিকে মুক্ত করুক—ইহাই নিত্যগোপালের দাবী। নিত্যগোপাল ইহারই জন্য মেয়েদের ডাক দিয়াছেন। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ বজায় থাকিলে আমি মেয়েদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দিব না, তাহাদের বিরুদ্ধে আমার বলিবার কিছু নাই। তাহাদের মধ্যে কেহই আমার জীবনে 'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী ছিল না। আমি নারীর মহীয়সী মূর্ত্তির খোঁজই পাইয়াছি ঐ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাই আমি করিব।…

৬ই ডিসেম্বর

আমি ও প্রতিভা সকালেই আফিসে যাই। সেখানে তাপসবাবুর স্বামী বিবেকানন্দ হইতে কিছুটা পাঠ হয়।…বেণু ১টার পর কলিকাতা যায়—প্রথমে দমদম। ফেরে ৩টায়।…স্বামী বিবেকানন্দ সমন্বয়ের প্রথম পর্য্যায় ব্যাখ্যা করিয়া আমেরিকাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। আমাদের সমন্বয় পর পর্য্যায়ের—প্রকৃতি ও পুরুষের সম মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত—নর-নারীর সম মূল্য দানের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহা যে জীবনগত—জীবনেরই সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত।…প্রকৃতির প্রত্যেক স্পন্দনের ভাগবত মূল্য স্বীকার করিয়া পুরুষোত্তমের আস্বাদন ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ-জীবনে, বিশ্ব-জীবনে স্থাপন করা যে যুগান্তকারী বিপ্লব, তাহা ভাবিলে মনে হয়, ইহা একরূপ উন্মত্ততা। কিন্তু ইহাই তো আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। আর ইহাই একমাত্র যুগধর্ম হইতে পারে।…

৭ই ডিসেম্বর

সকালে ৭।০টার পর বেণু আসে। 'স্বামী বিবেকানন্দ' বইয়ের অনেকটা পড়া হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও আমার জীবনের কত পার্থক্য, অথচ একই ধারার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি দুই জনই। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, আমি তাঁহার দার্শনিক জীবনকে আরও গভীরতর ভিত্তিতে দাঁড় করাইবার সাধনায় লাগিয়া আছি। 'Face Nature' কি শঙ্কর-দর্শন দ্বারা সম্ভব হইবে? তাঁহার রজোগুণের উপর জোর দেওয়া কি সফল হইবে যদি না সত্ত্ব, রজঃ ও তম নির্গুণের সঙ্গে directly ও equally equated হয়? স্বামিজীর জীবন শঙ্কর-দর্শন হইতে অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছিল বলিয়াই না তিনি রজোগুণ, কর্ম ও সঙ্ঘের উপর অত জোর দিয়াছেন? কিন্তু শঙ্কর-দর্শন বদলাইয়া যায় নাই, তাঁহার জীবনকেও শান্তি দিতে পারিল না। অথচ স্বামিজীই ছিলেন বর্ত্তমান যুগ-মানবের আদি মানসপুত্র। তাঁহার জীবনের ছাঁচেই গড়িয়া উঠা উচিত ছিল বর্ত্তমান যুগের মানুষকে। তাঁহার জীবনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বেদান্তের প্রচলিত অদ্বৈতবাদকে নূতন ছাঁচে গড়িতে হইবে—যাহার মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের, দ্বৈত-অদ্বৈতের সম মূল্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।…নির্ব্বাচনে লোকসেবক সঙ্ঘকে সমর্থন করিবার জন্য অতুলবাবু চিঠি দেন ও তাঁহাদের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারগুলি সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং করিয়া পাঠাইয়া দেন।…

৮ই ডিসেম্বর

আজ শুক্লা একাদশী—গীতাজয়ন্তী ও সোণার জন্মদিন। সকালে গীতার অবতরণকে সকল দেহমনপ্রাণ দিয়া বরণ করি। গীতার যে অভিনব রূপ আমার জীবনে উদ্ভাসিত হইয়াছে, যাহাকে আমি বর্ত্তমান যুগসমস্যার মহা সমাধান মূর্ত্তি বলিয়া আস্বাদন করিতেছি, তাহা আমার জীবনে, বিশ্বজীবনে জয়যুক্ত হউক। সোণা গীতামূর্ত্তি হউক। সে আমার পরম আদরের। গীতামৃত তাহার সকল শরীরকে অভিসিঞ্চিত করুক। নিত্যকৃষ্ণের সে বুকের ধন। সে গীতা-জীবন লাভ করুক। ৮টার মধ্যে আফিসে যাই।…ফণীবাবুর (ভারতবর্ষের সম্পাদক) নিকট আমি এক পোষ্টকার্ড দেই 'ভারতবর্ষ' পাঠাইবার জন্য প্রীতি জানাইয়া। তাহার নামে আগরপাড়ার ঠিকানায় উজ্জ্বলভারতও পাঠানো হইল। আমি ৮টার পর ঔষধের বাক্স লইয়া আফিসে যাই। বেণু 'আমাদের কথা' শীর্ষক মাঘ মাসের প্রবন্ধ শুনায়।…বুকের রক্ত জল করিয়া, হাড় ভাঙ্গা খাটুনি দিয়া বেণু এই চারি বৎসরে উজ্জ্বলভারতকে একরূপ দাঁড় করাইয়াছে। ওরূপ খাটুনি আর খাটিতে দেওয়া চলিবে না। এখন ধীরে ধীরে ধাক্কা দিলেই চলিবে। Inertia-তেই চলিবে। তাই উহার সঙ্গে জীবনের যোগ দিয়া যুক্ত থাকা। 'সর্ব্বঃ অত্যন্তং গর্হিতম্।' মরণপণ খাটিয়াছে। ধীরেন ডাক্তার সকালে বেণুর এখানে আসিয়াছিল।…সুধীর সরকার একটি বিজ্ঞাপনের জন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া গেল সকালে। ঠাকুরের স্পর্শ সকল দিক দিয়াই তো উপলব্ধি করি। এখানে সঙ্ঘের দুপুরে পূর্ণ ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা তো করিয়াছি, এখন রাখিতে পারিলে হয়। আমি থাকিতে ইহারা দুটি আরও পেট ভরিয়া খাইবে না, ইহা বড়

লাগে। বউ বলিয়াই তো? ছেলেরা তো দুই বেলাই ভাত পায়।

৯ই ডিসেম্বর

সকালে পুস্তক পরিচয় 'স্বামী বিবেকানন্দ' (ভাবনরঞ্জন রায় লিখিত) ও বাঙলা প্রবেশ (বিধুভূষণ দাশগুপ্ত রচিত) লিপি। তাহার পর আফিসে যাই।···রেণু ১টার পর কলিকাতা যায়—রাইটার্স বিল্ডিং নিখিলবাবু, মন্মথ রায় ইত্যাদি।···আমি কাহাকেও পরিত্যাগ করি নাই। মানুষই তাহার কুটিল পথে চলার ভিতর দিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। সে যে কোনও ভাবে আমাকে দেখিতে পারে, আমিও সেই ভাবেই তাহাকে দেখি। ···ইহা সে অস্বীকার করায় আমি বেদনা পাইয়াছি। সে আমার কাছে প্রতারণা করিল কেন?...

১০ই ডিসেম্বর

...রেণু আসে। সে এখান হইতে পোস্টাফিস পার হইয়া কলিকাতা প্রথমে হিন্দুস্থান, পরে হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রিমিয়ারে যায়। ১২-টার পর ফেরে।···যেদিন পুরুষোত্তম নিজ শরীর নিংড়াইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনই সৃষ্ট স্রষ্টা-নিরপেক্ষ এক সত্তা লাভ করিল, স্বতঃ মূল্যবান হইল, নিজের ভাগ্য নিজেই নির্দ্ধারণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। এইরূপ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অনন্ত বিচ্ছিন্ন অংশকে পরস্পরের মধ্যে অন্যোন্যমৈথুনে সম্বন্ধ করিবার জন্যই তিনি সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ লাভ করিলেন, স্বাধীনভর্তৃকা প্রকৃতির দিকে কামুকের দৃষ্টিতে তাকাইলেন, 'অভিধান' করিলেন। স্বাধীন সত্তাকে তাহার মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া পাওয়ার জন্যই তাঁহার কত প্রচেষ্টা। সৃষ্টি স্রষ্টার mechanical ব্যাপার নয়, উহা নিতান্ত organio। সৃষ্টি organic বলিয়াই উহার স্রষ্টা-নিরপেক্ষতা সম্ভব হইয়াছে। Mechanical হইলে উহা হইত একান্ত স্রষ্টা-সাপেক্ষ। এই সৃষ্টিকে পাওয়ার জন্যই প্রকৃতির নাম তাঁহার জপ করিতে হয়। প্রকৃতির পায়ে ধরিতে হয়, প্রকৃতির ঋণ স্বীকার করিতে হয়, দাসখত দিতে হয়, প্রকৃতির মাঝে আত্মসমর্পণ করিয়া গৌর সাজিতে হয়, নিজের নির্ব্বাণ লাভ করিতে হয়। 'তদেবানুপ্রাবিশৎ'-এর অন্তঃপ্রবেশ অর্থ একখানি। 'ন পারয়েঽহম্'—ইহাই অনুপ্রবেশের চরম আস্বাদন।...

১১ই ডিসেম্বর

···আমি 'পুনর্জন্ম' প্রহসনের কথা উল্লেখ করি। আমার নিজের মতবাদও আমি বিশ্বের ভিতর দিয়া যাচাই করিতে চাই। শ্রীরামচন্দ্র নিজের অস্তিত্ব আস্বাদন করিলেন শবরী-হনুমান প্রভৃতির সাক্ষ্যের উপর। একার সাক্ষ্যে কেহ নিজেকে প্রমাণ করতে পারে না, করিতে যাওয়া উচিতও নয়।···ইতিমধ্যে 'নদের নিমাই'-র হৃষীকেশবাবু আসেন আমি ১০ই মাঘ সেখানে বক্তৃতা দিতে পারিব কি না তাহা জানিতে। আমি শরীর সুস্থ থাকিলে রাজী হই। তাহার সঙ্গে অনেক কথা হয়। গ্রাহক হইবেন বলেন। আমরা গৌরের দর্শন দিতেছি—যাহাতে গৌরকে সমাজ-শরীরে অনুপ্রবিষ্ট করা যাইতে পারে।···

১২ই ডিসেম্বর

···রেণু সুহৃৎবাবুর ওখানে যায়।···প্রথমে বীরেনবাবুর ওখানে লোকসেবকে যায়। দেখা হয় না। পরে স্ট্যাণ্ডার্ড ফারমাসিউটিক্যাল, গ্র্যান্ট হইয়া ৫টার পর ফেরে। ···মোট গ্রাহক সংখ্যা ৪৮১ হইল। এই বৎসরই সব চেয়ে বেশী গ্রাহক হইল। অথচ এ বৎসরের মত দুর্যোগ আর কোন বৎসরেই ছিল না। প্রথমে আমাদের আষাঢ় মাসে পাবনা যাওয়া, সেখান হইতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিভার নাক দিয়া রক্ত পড়া, বৈশাখ মাসে নীহারের মৃত্যু, পূজার আগে একই সময়ে আমার enlargement of prostrate gland, সঙ্গে সঙ্গে রেণু-প্রতিভার জ্বর কাশি, পরে আবার রেণু অসুস্থ হয়।···

১৩ই ডিসেম্বর

···কাজ করিতে হইলে বাহিরের দিকে, পরিধির দিকে যাইতেই হয়, অথচ কেন্দ্রেও থাকিতে হইবে। কেন্দ্র

ও পরিধিতে যুগপৎ থাকিতে না পারিলে বিপদ আসে। বেণুকে সে সামর্থ্য ঠাকুর দিন। আমার সকল দেহ-প্রাণ-মনের আশীর্ব্বাদ তাহার সঙ্গে রহিল। আবেষ্টন জয় করিয়া ফিরিতে হইবে। তাহার সাধনার উপর ঠাকুরের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা, আমার সারা জীবনের কল্পনার সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। আমি 'শেষবার' বিশ্রাম করিবার জন্য বেণু-নীলু-প্রতিভা প্রভৃতিকে চাহিতেছি। সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। সে বাধা আমার খুব। আর যেন সে দশা আমার না হয়। তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া একটী জীবন্ত সঙ্ঘ গড়িয়া উঠুক। একটি 'দুর্গম' পথের খোঁজ নিত্যগোপাল দিয়া গিয়াছেন। সেই পথেই সার্থক হইতে হইবে। যাহার জীবনে অগ্রগতি আছে, 'সেয়ে অত্র সর্ব্বে পাপ্‌মানঃ ব্রহ্মের প্রপথে হতাঃ'। কেহ এ পথে ধরা পড়েন নাই। ওগো দুর্গম পথের যাত্রী তোমরা, জয় তোমাদের অনিবার্য।...অফিসে যাইতে গোপীনাথ সাহা নামে বরিশালের চকবাজারের একটী লোকের সঙ্গে দেখা। সে আমি 'সত্যবাবু' কিনা বেণুর কাছে জিজ্ঞাসা করে। সে সেই বরিশালের প্রথম গ্রেপ্তারের দিনের কথা বলে।

১৪ই ডিসেম্বর

আজ সকালে অফিসে যাইব না, বলিয়া আসিয়াছিলাম। ভাল লাগিতেছিল না, তাই গেলাম আমি ও প্রতিভা।...মিঃ জ্যাকবের বাসায় ইলিয়ট রোডে যাই।... জ্যাকবের ওখানে বেণু আদর পাইয়াছে। উঁহারা বেশ ভদ্রলোক। কোটিপতি অথচ ঝাঁজ নাই। জড়বাদের দেশের লোক। জড়ের স্পর্শে উঁহারা আত্মহারা হন না, যেমন হন্ এ দেশের অধ্যাত্মবাদীরা জড়ের সামান্য স্পর্শে। হেমাঙ্গবাবুর কাছে আমি দুপুরে ইংরেজ বিধবাদের খাওয়া-পরার কথা জিজ্ঞাসা করি। এ দেশের বিধবাদের মত খাওয়া-পরায় উঁহারা খুব কৃচ্ছ্র করেন না। অথচ স্ব-ধর্ম্ম, সহজ সংযমী। জ্যাকবের ওখানে অনেক বই আছে। উঁহারা এ দেশের এক সাধুর শিষ্য। বেণুর সঙ্গে পত্রিকার বিষয় বস্তু লইয়া আলোচনা করে।...কাল সকালে দিবন আমার ফটো তুলিবে—বেণুর আগ্রহ। তাই যাইব। কোনও দিনই আমার ইহা ভাল লাগে না। আমাকে নিয়া টানাটানি কেন? কে আমি? কি আমি? ইহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠি না, দুঃখ পাই।...জ্যাকবের কাছে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যসহ গীতা (অবশ্য ইংরাজীতে ট্র্যানস্লেসনে) আছে।...

১৫ই ডিসেম্বর

আমি ও প্রতিভা সকালে অফিসে যাই। ৮টার পর সেখানে আমার দুই রকমের ফটো তোলা হয়।... সুধার মা...আসিয়া আত্মপরিচয় দেয়।...কাহাকেও আমি বিবাহ না করার কথা বলি না। বরং বিবাহিত জীবনে শান্তি রক্ষা করিয়া চলিবার কথাই বলিয়াছি।...ছয় মাসের মধ্যে বাড়ী স্থির করিব—বেণু এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ১৫০৲ টাকা দিয়াও প্রয়োজন হইলে বাড়ী করিব বলিয়া বলি।...আমি আজ কত বড় অসহায়, নিরাশ্রয়। কে বা কাহারা আমার এই পাগল প্রাণের আশ্রয় দেবে? যে একটা উন্মত্ততা আমার বুকের মধ্যে আছে, উহা যদি কর্ম্ম-জ্ঞানের খাতেও প্রবাহিত না থাকিত, আমাকে শেষ করিয়া দিত। 'রাই উন্মাদিনী' করিয়া ছাড়িত।...

১৬ই ডিসেম্বর

সকালে আমি ও প্রতিভা বেণুর ওখানে যাই। জীবনের প্রথম কৈশোরে যখন স্কুলে পড়িতাম, একটা কান্না আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। কোনও হেতু কাঁদিবার ছিল না, অথচ কাঁদিতে ইচ্ছা হইত। ছল করিয়া 'মা মরিয়াছেন' ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিতাম। সারা জীবন আর সেই কান্না ছাড়িল না। খুব কাঁদিয়াছি, আজও কাঁদিতেছি। যে-এক অনাদি কান্না বিশ্বের বুকের মধ্যে রহিয়াছে, যে-কান্না বাঁশীর গানে উথলিয়া উঠে, আজ বুঝিয়াছি কান্নার ঘন মূর্ত্তি শ্রীরাধাই সেদিন আমার অন্তরে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিলেন। তাই তো ঠাকুর আমাকে দেখাইয়াছিলেন যে আমি স্বরূপতঃ শ্রীরাধা।

…এত কান্না কাঁদিয়াছি, কোনও পুত্র-হারা জননী, কোনও স্বামীহারা স্ত্রী এত কান্না কাঁদে নাই। কান্না আমার জীবনে সহজ; তাই উহা যখন তখন যে-সে কারণে আসিয়া পড়ে। এ-যে বিশ্বের সেই অনাদি অনন্ত কান্নারই প্রকাশ। ইহার হাত হইতে আমার রেহাই নাই।…সে বলিতেছিল 'ভাল লাগে না। পরের উপর কত দিন খাইব?' আমি সেজন্য তিরস্কার করি। এমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কোনও অর্থ হয় না। তাহারা তো আদর করে। আর সেই দিনও তো তাহারা সাধিয়া নিয়াছে। কর্ম তো করিতেছে। মানুষের হাতে আছে কর্ম করিবার অধিকার। অত মান অপমানের প্রশ্ন উঠিলে এ সংসারে থাকা চলিবে না। কর্ম ফাঁকি দিও না, অলস থাকিও না, সংসারের পথ খোলা।…

১৭ই ডিসেম্বর

…কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিলে কম্যুনিজমকে ঠেকানো যাইবে না, একমাত্র কংগ্রেসই কম্যুনিজমকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে ও রাখিতে পারে। যখন কম্যুনিজম is knocking at the door, তখন কাহারও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাইবার অধিকার নাই। দেশের যুবকদল আজ কম্যুনিজমের খপ্পরে পড়িয়াছে। সমস্ত দলই কম্যুনিজমকে প্রকারান্তরে আগাইয়া দিতেছে। তাহারা ধীরে ধীরে তাহাদের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। এই কম্যুনিষ্টরাই একদিন জনযুদ্ধের অছিলায় ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী আন্দোলন করিয়াছে। যতীনবাবু স্বীকার করেন যে ইহা ভাবিবার বিষয় বটে। বর্তমান বিশ্বজনীন পরিস্থিতির সামনে কে দাঁড়াইতে পারে কংগ্রেস ছাড়া? রাত্রি ৯টার পর ফিরি।…আজ বারান্দাটা চুনকাম করে। উহারা বেশ কাজ করে; ঘর দুয়ারও নিজেরাই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। ২।৩ বার করিয়া চুণ দিয়াছে। যেমন তেমন করিয়া ধোয়াইলে পাছে চুণ উঠিয়া যায়, তাই ধুইয়া দেয়। ইহাই কর্মের জন্য কর্ম করা। এইরূপ মিস্ত্রি তো দেখি নাই। কাজ ফাঁকি দেয় না, এরূপ কর্মীও জগতে আছে। বেশ ভাল লাগিল। ইহাদের বেশী দেওয়াও সার্থক।

১৮ই ডিসেম্বর

সকাল ৭।০টায় আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই। বেণু ১০টায় সভা আর এস্ এন্ রায়ের সঙ্গে দেখা করিবে বলিয়া ৯টার পরই আমরা বাহির হই।…প্রণতি আসে।…বীরেন ব্যানার্জী আসেন। তাহার সঙ্গে নির্বাচন-এর সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ছাড়া আর কেহই এই ধাক্কা সামাল দিতে পারিবে না। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর যে যোগ্যতা ছিল, তাহাতে তিনি বাঙ্গালার 'নেতা' হইতে পারিতেন কি, আর দাসের পর। কেন হন নাই…।

১৯ শে ডিসেম্বর

সকালে সাবিত্রী 'আসন্ন নির্বাচন ও মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘ' লিখিয়া শেষ করি এবং প্রতিভা উহা নকল করিয়া দেয়।…নিত্যগোপালকে নির্বাচিত করাইতে হইলে চাই জীবন দিয়া প্রতিষ্ঠিত করা। যাচাই না করিয়া কে কাহাকে নিবে, কেনই বা নিবে? ফাঁকি দিয়া নিত্যগোপাল প্রতিষ্ঠা হইবে না। এই সব আলোচনা আমাদের মধ্যে হইল। প্রতিটি মানুষ জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে অপরকে যাচাই করিতেছে। সন্ধ্যার পর শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন) আসেন। তাহার সঙ্গে আলোচনা হয়। আত্মা সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা এবং অনাত্মা সম্বন্ধে যাহা ধারণা—দুই-ই মায়া। বাস্তব বস্তুরই দুইটী দৃষ্টিকোণ ঐ আত্মা ও অনাত্মা। Law of Indeterminism-এর কথাও হয়।…

২০শে ডিসেম্বর

বেশ সকালে আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই…বেণু কলিকাতা যায়—আর্য্যস্থান ঢাকেশ্বরী প্রভৃতি।…প্রতিভা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পড়ে। কথা কহিতে না পারায়

সঙ্গে কথা শুনা, বিশ্বের সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যোগ রাখা সবই করিতে থাকিবে, বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। কিন্তু পুরুষোত্তম-জীবন তো তাহা নয়; নিজের জীবনের প্রশ্ন, বিশ্বের যাবতীয় প্রশ্ন তো চতুর্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে। উহারা যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্তরঙ্গ সঙ্গে যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান করিয়া লইতে হয়। বহিরঙ্গদের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহা ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ইহাই তো 'অন্তরঙ্গ সঙ্গে লীলারস-আস্বাদন। বহিরঙ্গ সঙ্গে নাম সঙ্কীর্তন'-এর তাৎপর্য। নিজ জীবনে কৃষ্ণ-আস্বাদন এবং বিশ্ব-জীবনে আবার সেই আস্বাদনকেই আস্বাদন করিতে হইবে, তবে না পুরুষোত্তম-জীবন লাভ হইবে? রাত্রি ৯টার পর প্রতিভার সঙ্গে আলোচনা হয়।···

২১শে ডিসেম্বর

…অফিস হইতে সন্ধ্যায় ফিরিবার পথে প্রতিভার সঙ্গে কথা হয়—ঠাকুর লিখিয়াছেন—বৃষভানুপুরে কালী রাধা রূপে জন্মগ্রহণ করে। ভারতবর্ষ দীর্ঘ যুগ নারীর জননী রূপের ধ্যান করিয়াছে। কালী তাই জননী। কিন্তু জননী কালী রাধা রূপে রমণী হইলেন। রাধারূপেই ভারতবর্ষ প্রথম নারীর দিব্য রমণী রূপের খোঁজ পাইল, আস্বাদন করিল, চিত্র দেখিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জননী রূপের উপাসক, শ্রীনিত্যগোপাল রমণী রূপের। তাঁহার জীবন ও সম্প্রদায় নারীর দিব্য অপ্রাকৃত রমণীরূপের প্রতিষ্ঠাই করিবে। এইখানেই ঠাকুর মদনমোহন হইবেন। ভারতবর্ষ উঁহারই চরণতলে উজ্জ্বল ভারত হইবে। আরও কথা হয়। রাজা (জরাসন্ধের পিতা) পুত্র কামনা করিয়া মুনির নিকট হইতে একটা ফল পাইলেন। রাজা দুই রাণীকে সেই ফল খাওয়াইলেন। রাণীরা দুইটী মাংসপিণ্ডের মত খণ্ড প্রসব করিল। ফেলিয়া দিলে জরা নামে রাক্ষসী খাইবার জন্য লইয়া যায়। জোড়া দিলে উহারা 'জরাসন্ধ' হয়। জীবনের দুইভাগ এমন করিয়া জরা (বুড়োমন) দ্বারা জোড়া লাগিলে তাহা জরাসন্ধই হয়। পুরুষোত্তম জীবনেই শুধু পরস্পর বিপরীত দুই খণ্ড সার্থক ভাবে জোড়া লাগে। তাই জরাসন্ধ মারা গেলেন ভীমের হাতে পুরুষোত্তম হইতে মারিবার নির্দেশ পাইবার পর।···

২২শে ডিসেম্বর

…বাড়ী করিবার গুরু দায়িত্ব একাই বেণুর। তাহা সে বহন করিতে পারিবে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করে। -এর 'majesty'-র কিছুটা অংশ বেণুতে আছে বলিয়া বেণুর উপর তাহার গভীর শ্রদ্ধা—ইহা বলে।…আমার জীবনে জীবন মিলাইয়া আমার প্রদর্শিত পথে চলিলে জীবন নিরাপদ থাকিবে। কাহারও দাবী অস্বীকার করিয়া কাহাকেও আমি টানাটানি করি না। আমার উপর ছাড়িয়া দিলে আমি সকলকে দিয়া তাহার কাছে অপরের দাবীগুলি একে একে পূরণ করাইয়া দিব—ইহা আমার দাবি এবং ইহা পুরুষোত্তমের ধর্ম। তিনি কাহারও ধন কাড়িয়া নেন না।··

২৩শে ডিসেম্বর

···রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পড়ে।… 'চতুরঙ্গ' বইও আজ অফিসে পড়িয়া শেষ করা হয়। শচীশ কর্মেও স্থিতি লাভ করে নাই, রসেও নয়। কেননা ঐ দুইটাই মনের দুইটী দিক। তাহার জন্য আত্মবোধ প্রয়োজন তাই হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বই পড়িয়াও মনে হয় যে, একটা তত্ত্বের খোঁজ তাঁহার লেখায় আছে বটে, কিন্তু সমাধানের যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দরকার উহাকে রূপ দান করার জন্য, তাহা সে পর্যন্তও দিবার সময় হয় নাই। আজকালও বহু লোকের সেই অবস্থা। তাহারা জড়-অজড় সমন্বয়ের তত্ত্ব আকাশ-বাতাসের মধ্য হইতে পাইয়াছেন কিন্তু তাহাকে কার্যে রূপ দিতে হইলে যে বিশ্লেষণ নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে প্রয়োজন তাহার জন্য প্রস্তুত নয়, বুদ্ধি বা সাহসীও নয়। উর্বশী মেনকার কথা শুনিয়া···তাই—এর মত ইহারা আৎকাইয়া উঠেন।······বেণু আজ বার বার একটা আয়নার কথা বলিতেছিল।…

২৪শে ডিসেম্বর

…হেমাঙ্গবাবু আসে…তাঁহার সঙ্গে মহসম জেলের কিছু ঘটনার আলোচনা হয়—সেই 'বাক্সী সভা', সেই 'টিকিসেধ যজ্ঞ', যাহারা মাছ খায় না তাহাদের বিছানার নীচে মাছের কাঁটা রাখা, যতীন রায়ের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক। রাজদ্বারে যাহাদের সঙ্গে দেখা তাহারা বান্ধব, এই দিক হইতে হেমাঙ্গবাবু বান্ধব।…রেণু বাড়ী করিতে গিয়া জড়াইয়া না পড়ে, বিপন্ন না হয়—এজন্য—এর খুব ভাবনা। তাঁহার ক্ষমতা থাকিলে তিনি সাহায্য করিতেন, কিন্তু সে শক্তি আজ তাঁহার নাই। রেণু একটী গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত; বিপন্ন হইলে সকলেই হইবে। আমার জীবনে যে স্রোতটী অব্যাহিতভাবে চলিয়া আসিয়াছে, আগাইয়া আসিয়াছে, পথের মাঝ হইতে আগাইবার উপযোগী সাহায্যও পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ছাড়া ভবিষ্যৎ কেমন করিয়া নির্ধারিত হইবে? আমার জীবনের সেই ধারাটিকে সাথর না ধরিলে, বিশ্বাস না করিলে ১০০৲।১৫০৲ টাকা দিয়া বাড়ী ভাড়ার কোনই অর্থ হয় না। অথচ সেইটী—এর আলোচনায় বাদ পড়িয়া যায়। রেণুর কর্তব্য তাঁহাকে ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া। তিনি যতটুকু পারিবেন, সেবা করিয়া যান। লাখ লাখ টাকার দরকার। কাহার একার কি স্পর্দ্ধা আছে আমার কাজকে পূর্ণাঙ্গ করিবার। রেণু সেই ধারার সঙ্গে যুক্ত থাকিলে সে অনেক কিছু করিতে পারিবে। নহিলে নয়। আমিও যদি সেই ধারার সঙ্গে যুক্ত না থাকি, আমিও নিঃশক্তি হইব। সে ধারা নিত্যগোপাল-ধারা। রেণুর সঙ্গে ৯টার পর পর্যন্ত আলোচনা হয়। বেদনা লইয়া আসি।

২৪শে ডিসেম্বর

সকালে রেণুর ব্যাকরণ শুরু করিতে আরম্ভ করি। কয়েকদিন হইতে কিছু কিছু করিতেছি। প্রতিভা আমাকে জোর করিয়া আফিসে লইয়া যায়। মনটা খুব ভারাক্রান্ত। একাকিত্বের বেদনা চোখের জলে আবেদন করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। বৃন্দাবন হইতে সন্ন্যাসীর বেশে ঘরে ঢুকিয়া ছিলাম মনকে পুরুষোত্তম-ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার জন্য। আঘাতের পর আঘাত দিয়া সংসার সরাইয়া দিয়াছে। আমি তো বুক চাপিয়া মানুষের মধ্যে আশ্রয় খুঁজিয়াছিলাম। যতটুকু পাইয়াছি তাহার শতগুণ দিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি, তথাপি আমি কাহাকেও দেই নাই, কাহারও দানের অপমান আমি করি নাই। বুদ্ধি আমার কম বলিয়া সত্যব্রতও একদিন তাহার বা সেনার পার্টিদের সঙ্গে কথা বলিতে দিতে আপত্তি করিত কিন্তু তাহার বুদ্ধি তাহার পথ পরিষ্কার করে নাই। আমা প্রাণই বরং আমাকে রক্ষা করিতেছে। বিরাট অজানা মধ্যে মানুষ কত ছোট 'জানা' লইয়া বাস করিতেছে বুদ্ধির দৌড় তো 'জানা' পর্যন্ত। অজানার রাজ্য পা দিতে তো প্রাণ ছাড়া আর সম্বল নাই। বুদ্ধি ডিপ্লোম্যাসি আর অচল। আমি সংসার ছাড়ি না সংসার আমাকে ছাড়িয়াছে।…

২৫শে ডিসে

সকালে আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই। সে প্রেস হইয়া, প্রেস সিণ্ডিকেটের ব্লক লইয়া বাসায় ফে ঠেলাঠেলি করিয়া রেণু বাসে উঠে, কেমন ভয় লাগিতেছি আমার তখন। রেণু এখানে হইয়া ২টার পর আবার প্রে যায়।…আমি ও প্রতিভা ৪।টার পর আফিসে যা রেণু ফেরে ৫।০টার পর প্রেস হইতে। হেমাঙ্গবাবু সে [illegible] সপ্তাহের পর একজন নূতন গ্রাহকের নাম ও টা পাঠাইয়া দেন। কাল নীহারের সামাজিক বিধি অনুষ্ 'শ্রাদ্ধ'। মনে পড়িতেছে যেদিন বৃন্দাবন হইতে বরিশা বগুড়ার বাসায় নিজ পরিবারে প্রবেশ করিয়াছিলা লোভ ছিল—সংসারে নিত্যগোপালকে প্রতিষ্ঠিত করি প্রাণপণ করিয়া সকল দৈব সম্বন্ধের মধ্যে তাঁহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কি পারিয়া কি পারি নাই বলিতে পারি না। তাঁহার শ্রীচরণে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। বাহিরে কোনও সমা নাই। সংসার তাঁহাকে বাদ দিয়াই নিজ প্রতিষ্ঠা চ নিজ সমস্যার সমাধান চায়, অথচ দিব তাঁহারই গাথা। তাহা কি সম্ভব? মন আজ বিপন্ন

করিতেছে। এত বিপন্ন সে মনে না করিলেও পারিত। আগেও তো আমি ছিলাম, আজিও নিত্যগোপাল আছেন। তাহারা তো নিত্যগোপাল-দীক্ষাই প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমার তো বুঝি করিবার কিছু নাই। সকল নরের মাঝে যিনি নারায়ণ, আজ তাঁহারই চরণে আমি পিতা, আমি শ্বশুর সকল বেদনা নিবেদন করিতেছি। নীহার, তুমি আশ্রমের, আশ্রমের ঠাকুর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন ও থাকিবেন। ঠাকুর, নীহারের দুইটি শিশুর ভারও তোমারই উপর। ইহাই আমার আগামী কল্যকার প্রার্থনা। রাত্রি ৯টায় ফিরি। বড় বৌর সঙ্গে প্রতিভার কথা হয়। আমি যে তাহার কাল বেহালা একা যাওয়ার জন্য ইহাদের তিরস্কার করিয়াছি, তাহা বড় বৌ শুনিয়াছে ও প্রতিভার কাছে উল্লেখ করিয়াছে। আমি তো জীবন-ভর সকলের জন্যই করিলাম। ইহাদের বুঝাইতে পারি নাই। আমি কতখানি ইহাদের ছিলাম, এই অবসরে প্রতিভা আমার সেই মেয়ের কথা বিস্তারিত ভাবে বড় বৌর কাছে বলিতে পারিল না। কি করিয়া ইহারা লোক সংগ্রহ করিবে? তাহা প্রতিভাকে বলি।…

২৭শে ডিসেম্বর

অমাবস্যা—নীহারের শ্রাদ্ধ দিবস।

আজ আর সকালে আফিসে যাই না। বেণু আসে ৮।০ টার পর।…সকালে প্রার্থনার পর ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়াছি।…সারা দিনই মনটা ভারাক্রান্ত ছিল। অমলচাঁদের শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে 'Epochal Synthesis' পড়ি। কতকটা বেণুর সঙ্গে, কতকটা নিজে। সব-কিছু synthesis consciousness-এর স্তরে, unity-র স্তরে, উহা মাটির নহে। ইহাও শঙ্করের অদ্বৈতবাদের ক্রম-বিবর্তিত এবং অভিনব সংস্করণ মাত্র; উহার বেশী কিছু নয়।

২৮শে ডিসেম্বর

সকালে আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই। আজ উজ্জ্বল ভারত আসে।…৭টার পর মনোরঞ্জনবাবু আসে। তাহার সঙ্গে নির্বাচন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। আমাদের যাহা মত, তাহারও তাহাই।…

২৯শে ডিসেম্বর

…বর্তমানে বুদ্ধি লইয়া মানুষ বড় বিপদে পড়িয়াছে, অতি তার্কিক হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি বস্তুর যে হাঁ-এর দিক ও না-এর দিক আছে, ইহা বুদ্ধি জানিয়া রাখিয়াছে। অথচ সে বুদ্ধি উপরের স্তরের সমন্বয় বিধায়িকা বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত না হওয়ার ফলে সুবিধামত কখনও হাঁ-এর দিকে, আবার সে দিকে বাধা পাইলে না-এর দিকের সঙ্গে identified হইতেছে। এই ভাবে বুদ্ধি আসল সমস্যাকে এড়াইয়াই চলিয়াছে, আলোচনা আর অগ্রসর হয় না। এই বিপদ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। আমার সঙ্গে থাকিয়া বেণু প্রতিভা জ্ঞানের কোন্ স্তরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, আর কতখানি বা বাকী আছে, তাহা জানা দরকার। নহিলে নিরাশা আসিবে। অনেক দূর তো নিয়া আসিয়াছি, 'পুরুষ'-স্তরে পৌঁছিতে বিলম্ব নাই। ঐ যে পুরুষোত্তম। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি।…

৩০শে ডিসেম্বর

…কামিনীর সঙ্গে সংস্রব যে মানুষকে মুক্তি—পথে আগাইয়া দিতে পারে, পরম মুক্তির আস্বাদন দিতে পারে তাহা জীবনে দেখাইতে পারিলেই ঐ চিঠির জীবন্ত জবাব দেওয়া হইবে। কালীপ্রসন্নবাবুর ঘোষণা 'কামিনী ব্রহ্ম,' 'কাঞ্চন ব্রহ্ম' আজ বিশ্বকে উপলব্ধি করাইতে হইবে।… সমাজ সম্বন্ধে না আলোচনা করিলে মেয়েদের কি দশা হইবে? সমাজে মেয়েদের সম্মানজনক স্থান গড়িয়া তুলিবার জন্যই সমাজ নিয়া পড়া দরকার। সমাজ-জীবন হইতে উৎখাত হওয়া নারী-জীবনকে সমাজেরই স্বাস্থ্য আনয়নের জন্যই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমি ও প্রতিভা ৪টার পরই যাই।…

৩১শে ডিসেম্বর

ক্রমশঃ

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইন্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র : আষাঢ়, ১৩৭০, ১৮৮৫

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (২৩) ... ১৪৫
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত

২। বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র ... ১৪৮
শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত

৩। হারালেম (কবিতা) ... ১৪৯
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

৪। রবীন্দ্র প্রতিভার একদিক ... ১৫০
জনাব রেজাউল করিম

৫। চৈত্রের বারান্দায় (কবিতা) ... ১৫৩
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

৬। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫২) ১৫৪

৭। রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ ... ১৬২
শ্রীদুর্গামোহন সেন

৮। সাময়িকী : অস্পৃশ্যতা ... ১৬৪

তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি
আমাদের পাথেয় হউক

"কর্মীর শ্রম ও ধৈর্যের দ্বারা কি লাভ করা যায় তার জন্য যদি কোন উদাহরণের প্রয়োজন হয় আমি সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের নাম উল্লেখ করবো। ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বিরাট কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিদেশে প্রস্তুত সবচেয়ে সেরা কালির যে গুণগত উৎকর্ষ সুলেখা সেই গুণের অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে সাহায্য করছে। আজকে তাদের এই রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

বিধানচন্দ্র রায়

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

"পুরুষোত্তম cult-এ প্রত্যেক অণুটিও এক একটি কেন্দ্র—কি কথাই না তোমার গোপালবলিয়া গিয়াছেন? 'অল্প অণুটিও পূর্ণ, অধিক অণুটিও পূর্ণ।' এতদিন অল্পের কোন self-centered হইবার যোগ্যতা ছিল না। অল্প সার্থক অধিকের মধ্যে- মিশিয়া গিয়া—এই হাইপথেসিসের—অনুমানের—উপর সব সমাজ গড়া। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু সেই মানুষও যে বৃন্দাবনে গিয়া তরুগুল্মলতাজন্ম কামনা করিবে, তাহা কে জানিত বা বিশ্বাস করিত? কৃষ্ণসখা উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়া এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। একটা hierarchy করিয়া একটিকে রাখিয়াছে সিঁড়ির উর্দ্ধ ধাপে কুলীন করিয়া, আরগুলিকে পর পর নীচে নামাইয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে কিছুদিন চলিল বেশ। কিন্তু উচ্চ স্তরের চাপে নিম্নের সবগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিল, তখনই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ছোটরা, নীচের দল, সব বড়দের, উঁচুদের সমকক্ষতার দাবী করিল। ভাগবত বলিলেন, বড় ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে পুরুষোত্তমের direct ও equal relation। গায়ত্রী জপ ও মুচির জুতাসেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটা কুলীন হইবে এবং অপরটা অকুলীন হইবে? ঘর ঝাঁট না দিলে যখন ঠাকুর-পূজাই হয় না, তখন ঠাকুরের কাছে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও পূজা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়! কে কুলীন, কে অকুলীন?……যদি কৌশলপূর্বক প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সত্ত্ব হইতেও পুরুষোত্তম যতদূর, রজস্তম হইতেও পুরুষোত্তম ততদূর।……এতদিনের সাধনা সব minus-এর সাধনা, নেতি নেতি। কৃষ্ণের সাধনা positive। সবকে রাখিয়া সবকে হজম করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।……ছোটরাও যে অন্তরে অন্তরে পুরুষোত্তন, একথা তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিয়াছে।……তাই আজ নোতুন করিয়া শাস্ত্র দিতে হইবে। New Social Order, New Religious Order সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে না পুরুষোত্তম মিলিবে?……"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

উজ্জ্বলভারত

আষাঢ়, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(২৬)

৮, ৭, ৬৩।...নিত্যগোপাল, আমার বুদ্ধং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্, বর্তমান যুগে কোন্ ভাবে চলিলে মানুষ শুদ্ধ হইতে পারে, তুমি তাহা আচরণ করিয়া গিয়াছ। আমাদের ধারণ করিবার, আচরণ করিবার মত তুমি positive something—বাস্তব বস্তু; তোমার দিকে চাহিয়া, তোমায় ভালবাসিয়া, তোমার কর্ম করিয়া জীবনের দিব্য রূপান্তর সাধন করিব। তুমি যে ছন্দে কথা বলিতে, যে ছন্দে মানুষের প্রাণের কথা শুনিতে, ব্যথার ব্যথী হইতে, আমি তেমন করিব... তোমাকে মনন করিয়া আমি তুমিময় হইব। তোমাকে আমি আড়াল করিব না, আমার অবচেতন মনে যাহা গোপন ছিল তাহা উদ্ঘাটন করিব। আমার জীবনের সকল আনাচে কানাচে তোমার দৃষ্টি পড়ুক—আমি শুদ্ধ হইব। ভুলের সঙ্গে লড়াই করিয়া আমি ভুল বাড়াইব না...শুদ্ধের স্মরণে আমার অশুদ্ধ অজ্ঞান দূর হইবে।...শুদ্ধ, বুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ তুমি জাগ, আমার হৃদয়-মন্দিরে তুমি প্রকাশিত হও।...তোমার কৃপা লইয়া তোমার বিশ্বের সকল আচরণ করিব। তুমি ব্রহ্ম, তোমার আচরণে আচরণ মিলাইয়া আমি ব্রহ্মচারী হইব, সকল ছোটকে হজম করিয়া আমি ব্রহ্মচারী বলিয়া যাইব, ...সকল ছোটর আক্রমণ হইতে আমায় রক্ষা কর।...তুমি আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধন কর—আমি তোমার রূপে রূপবান হইব, তোমার সত্তায় সত্তাবান হইব, তোমার আনন্দে আনন্দিত হইব, আমি অপরিচ্ছিন্ন হইব। পরিচ্ছিন্ন সংসারের পরিচ্ছিন্নতা হইতে দূরে থাকিয়া আমি অপরিচ্ছিন্ন হইব।...তোমায় নমস্কার—এই নমস্কারের ভিতর দিয়া তোমার শুদ্ধত্ব আমার মধ্যে সঞ্চারিত হউক...নিত্যগোপালোঽহমস্মি...নিত্যগোপাল, আমার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ কর—আমার দেহ মন প্রাণ তোমার খেলার পুতুল হউক...প্রাণনাথ জগন্নাথ...।

সন্ধ্যা।...কৃষ্ণ তখন দ্বারকায়, সেখানে দেবকী রোহিণী প্রভৃতিরাও আছেন। কৃষ্ণ কখনও কখনও আনমনা হতেন—মহিষীরা বুঝতেন আমাদের কাছে থেকে তিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন না—মাতা রোহিণীর কাছে মহিষীরা ব্রজলীলা শুনতে চাইলেন। রোহিণী বললেন ব্রজ-প্রসঙ্গ শুনলে কৃষ্ণ-বলরাম ছুটে আসবেন, ব্রজ-লীলা শুনলে তাঁরা গলে যাবেন। তাঁরা যাতে আসতে না পারেন সেইজন্য সুভদ্রাকে দ্বারে দাঁড় করিয়ে রাখলেন—(শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এ উপাখ্যান শ্রীনিত্যগোপালের কাছে শুনেছেন)...। মহিষীরা রোহিণীর কাছে ব্রজলীলা শুনছেন...কৃষ্ণ বলরাম ছুটে এলেন—সুভদ্রা তাদের দ্বারে আটকালেন—ব্রজলীলা শুনতে শুনতে তিনজনেই গলে যাচ্ছেন।...গলে যাওয়ার পর তাঁদের তিন জনের যে রূপ হল জগন্নাথে তারই পূজো হয়।...তাৎপর্য—ঐশ্বর্য্যে দে

মাধুর্যের কথা আলোচনা করলে ঐশ্বর্য গলে যায়, ধনীদের নিকট মাধুর্যের আলোচনা করলে, প্রেমের কথা শুনালে ঐশ্বর্য গলে যাবে···ঐ গলে যাওয়া রূপকে মহাপ্রভু পদ্মপলাশলোচন বলে দেখেছেন ; মহাপ্রভু তো ডেলা ডেলা চক্ষু মেলেন নি।...ঐশ্বর্য তো সেজে গুঁজে বেশ চালাচ্ছে, এ ধরা পড়বে সেদিন যেদিন প্রেমের কথা শোনান হবে...। নরনারায়ণ আশ্রম ঐশ্বর্যকে গালিয়ে দেবার জন্য তীব্র বৈরাগ্য নিয়ে চলবে, কিন্তু তা মাধুর্যমিশ্রিত বৈরাগ্য...। নরনারায়ণ আশ্রম মানুষ গড়ার আন্দোলন করবে···।

৯. ৭. ৫৬।···গোয়া জগন্নাথ জগন্নাথ বলিয়া কাঁদে—তুমি জগৎ, তুমি নাথ—তুমি যোগসূত্র—জগতের সঙ্গে নাথের যোগসূত্র—বিশ্ব মিলন-তীর্থ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে গড়িয়া উঠুক—এই সংসারের বুকে তুমি রথযাত্রায় বাহির হইয়াছ—সমাধি হইতে জাগ্রতে, স্বরূপ হইতে বিশ্বরূপে, বিশ্বের বুকে সত্যানন্দ ব্রহ্মানন্দ গড়িয়া তুলিতে তুমি অবতরণ করিয়াছ।···এসো ব্রাহ্মণ, এসো ক্ষত্রিয়, এসো বৈশ্য, এসো শূদ্র, বিশ্বের মিলন-তীর্থ রচনা করিবে এসো।·· এসো ধনী, এসো দরিদ্র, এসো প্রতাপরুদ্র, এসো পণ্ডিত, আজ জগন্নাথ রথযাত্রায় বাহির হইয়াছেন। এস রথরজ্জু ধারণ কর—জাতির বিচার নাই, কুলের বিচার নাই—রথরজ্জু আকর্ষিয়া চলো, শুদ্ধ হও,·· জগন্নাথ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই তোমার কাছে সমান, সকলেই তোমার অংশ।···জগতের কথা নাথের কানে, নাথের কথা জগতের কাছে পৌঁছাইবেন সুভদ্রা—সুভদ্রা যোগমায়া—দুইয়ের যোগসূত্র। জগৎ+নাথ—জগন্নাথ, আমার প্রাণনাথ—লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল জগন্নাথ। জগন্নাথ, রক্ত-প্লাবিত বিশ্ব তোমায় ডাকে—অনৈক্যে বিচ্ছিন্ন ধরা তোমায় ডাকে। হে আমার ঐক্যের দেবতা, মিলনের দেবতা, বিশ্বনাগরিক, আমি বিশ্বনাগরিক হইব...জগতের সঙ্গে জীবন মিলাইয়া, জগৎকে বুকে লইয়া আমি তোমায় ভজনা করিব—যতখানি তোমার পরিধি, আমার ততখানি হউক—শক্তিতে তুমি অনেক বড়, ভক্তিতে তোমায় আমায় পরিধি সমান - তোমার রথযাত্রাকে জাগাইয়া দিব, সকলকে ডাকিব···জগন্নাথ নিত্যগোপাল, তোমার দুয়ার সকলের জন্য অবারিত ; আজ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলে পাশাপাশি তোমার অন্ন ভক্ষণ করিবে।·· জগন্নাথ ক্ষেত্রের আনন্দবাজার শুধু জগন্নাথ ক্ষেত্রে রাখিলেই চলিবে না—যেখানে ভাই ভাই-এর সঙ্গে মিলিল সেই তো আনন্দবাজার। আজ সর্ব জাতি মিলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তোমার চরণ তলে ছাড়া তো এ প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তোলা যাইবে না।···এসো জার্মাণী, এসো রাশিয়া এসো তোমরা সব—জগন্নাথের চরণে হিংসাবিদ্বেষ নির্বাণ করিয়া দিয়া আমরা মিলিব।.. নিত্যগোপাল, জগন্নাথ আমার, প্রাণনাথ আমার, নরনারায়ণ আশ্রমের দেবতা তুমি, তুমি সর্ববাদ-বিবাদ-প্রতিক্রমশীল—তুমি সভাপতি, আমরা দীন হীন সেবক মাত্র—তুমি আমাদের মিলাইয়া দাও—ঋষি-বাক্য সংগচ্ছধ্বম্ আমাদের জীবনে সার্থক হউক।···নরনারায়ণ আশ্রম তোমার বাণী, তোমার জীবন, তোমার জগন্নাথের রথ বহন করিবে।...বৈরাগ্য দাও, ধৈর্য দাও, তিতিক্ষা দাও।...ধনীর দুয়ার হইতে দরিদ্রের দুয়ারে, পতিতার দুয়ার হইতে সাধুর দুয়ারে তোমার রথ টানিয়া লইয়া যাইব...যো দেবাগ্নি যো ওষধিষু·· নারকেল আম জাম কাঁঠালে তুমি...ওষধি তুমিই ...তোমার এই রথ-যাত্রার দিনে তুমি নরনারায়ণ আশ্রমকে সুন্দর কর।···সংসারের লোক যেন এখানে বিশ্রাম করিতে পায়—যাহারা আছ তাহারা তাহাদের ব্যবহারে কথাবার্তাদ্বারা আশ্রমকে আশ্রম করিয়া তোল ···জগন্নাথের কালচার এইখান হইতে বিচ্ছুরিত হউক···বৃক্ষ ফল দান করুক :···পুরুষোত্তম, সকল কাপুরুষকে তুমি পুরুষোত্তমে গড়িয়া তোল। ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ।

১০, ৭, ৫৬।...নরনারায়ণ...নিত্যগোপাল···উজ্জ্বল-ভারতের দেবতা, আমার বেদনার ঠাকুর · মানবের লাগিয়া...তোমার নবরূপের লাগিয়া আমি কাঁদিয়া ফিরিলাম···সারা জীবন কোন অভিসন্ধি না রাখিয়া,··· তোমার নব-রূপের সাক্ষাৎ চাহিয়াছিলাম—মানুষ পাইব বলিয়া বাহিরিয়া ছিলাম...। শুধু প্রাণের লাগি। কোন

প্রয়োজন-বোধ আমার ছিল না—অভিসন্ধি ছিল না—নরনারায়ণ, আমি কিছু চাহি নাই, শুধু তোমার নররূপের সাক্ষাৎ পাইব, সেবা করিব, মানুষ করিয়া দিব—এই আশায় বাহির হইয়া ছিলাম। নিত্যগোপাল···এতটুকু নিজের সুখ খুঁজি নাই, কাহারও কিছু দেখি নাই, যে আসিয়াছে তাহাকেই বুকে তুলিয়া লইয়াছি · আমার কিছু নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই, বুদ্ধি নাই। যাহা পাইয়াছি তাহা দিয়া প্রাণপণ করিয়া তোমার সেবাই করিয়াছি। আমার জীবনের শান্তি তুমি—সেবা দাও, সেবা দাও, আমার মানুষ-ভগবান নরনারায়ণ, আমার নরনারায়ণ, আঘাতে আঘাতে আমি জর্জরিত, ক্লান্ত···। আমি কাহাকেও প্রতি আঘাত করি নাই—নিজের উপরে শাস্তি টানিয়া আনিয়াছি...সকলের আবার ভবিষ্যতে ফিরিয়া আসার পথ আমি মুক্ত রাখিয়াছি···নরনারায়ণ...মানুষের অন্তরের বিষ যতখানি সম্ভব আমি গ্রহণ করিয়াছি; আমার নিত্যগোপাল, তুমি বারে বারে বিষ স্বীকার করিয়া নিয়াছ—ভক্তদের দেহের বিষ ধারণ করিয়াছ—আমার নীলকণ্ঠ নিত্যগোপাল···বিষে জর্জরিত দেহপ্রাণমন লইয়া তোমার চরণ প্রান্তে আমি আসিয়াছি···আসিবার জন্য আসিয়াছি, ফিরিবার লাগিয়া আসি নাই; আমি আসিয়াছি, তুমি ডাকিয়াছিলে আমি আসিয়াছি, দেহ-প্রাণমন লইয়া আমি আসিয়াছি—আমায় লও, আমায় স্বীকার কর, আমায় অঙ্গীকার কর, আমায় আত্মসাৎ কর—আমায় তোমার করিয়া লও, তোমার করিয়া লও; নরনারায়ণ...নিত্যগোপাল...জগন্নাথ...।

[এই দিনের ভাষণের শেষে লেখা আছে—"আজ শ্রীমৎ স্বামিজী উপোস করেছিলেন—সারাদিনে শুধু ডাবের জল খান। সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে 'শরীরটা এখন দুর্বল লাগছে' বলার ২।৩ মিনিটের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যান। অনেক জল ঢালার পর জ্ঞান হয়; একটু ভাত খেতে দেওয়া হয়—কিন্তু বমি হয়ে যায়। সারা রাত বমির ভাব থাকে—ওয়াক ওয়াক করতে করতে খুব কষ্ট পান। অর্ধেন্দুশেখর রায় ওষুধ দেন—পেটে থাকে না। রাত ২০টার পর নীরদবাবুকে ডাকা হয়। তার হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ার কিছু পরে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমোন অবস্থাতেই রাত ৪০টেতে অজ্ঞান হয়ে যান। মাঝেও বার দুই অজ্ঞান হওয়ার মত হয়েছিল। আবার নীরদবাবু আসেন ও ওষুধ দেন। পর দিন থেকে সুস্থ হন। কেবল দুর্বলতা থাকে। এরপর থেকে সকালে আর বড় একটা ভাষণ দিতেন না।"]

১০ই সকালের পর এই ১১ই সন্ধ্যায় ভাষণ দেন।

১২, ৭, ৫৬—ওঁ নমঃ ভগবন্মূর্তয়ে ভক্তভগবতে নিত্যগোপালায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্মপরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায়।···সূর্য যখন উদিত হন, তখন সূর্য মুঠো মুঠো প্রাণ ছড়িয়ে দেন—নিদ্রিত মানব, অচেতন মানব সেই প্রাণস্পর্শে জাগরিত হয়ে ওঠে · নিত্যগোপাল-সূর্য জাগরিত, উদিত হয়েছেন বিশ্বের বুকে মুঠো মুঠো প্রাণ ছড়িয়ে···। মানুষ যখন জাগে তখনও প্রাণ থাকে, মানুষ যখন ঘুমায় তখনও প্রাণ থাকে—প্রাণেই তাই চৈতন্য অচৈতন্যের সম্বন্ধ।··· এই প্রাণ জাগ্রত হউক...বর্তমান বিজ্ঞানও বলে সমস্ত প্রাণশক্তি সূর্যের কাছ থেকে আসে...শীতকালে মানুষের দেহ শুকিয়ে যায়, কেননা সূর্য তখন দূরে···নিত্যসূর্য জাগ্রত হয়েছেন...নিত্যগোপাল প্রাণের সাগর—সেই প্রাণ-সাগরের একটা স্পর্শ পেয়ে অনন্তের পথে ছুটে চলেছি...মরবার সময় নাই—তবু দেহরক্ষা একবার করতে হবে জানি। অনন্ত কর্ম পেয়েছি, অনন্ত জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছি, অনন্ত ভক্তির। প্রাণ জাগরিত হলে অনন্ত কর্ম · দুর্ভোগ না...সংসারের মধ্যে মানের কর্মের কি শেষ আছে ?...এখানে আমি সখ করতে আসি নি, সখ করতে কাউকে ডাকিনি, সখ করতে কাউকে রাখবোও না আমি বিশ্বাস করি নিত্যগোপালকে নিয়ে যদি কেউ পড়ে থাকে আমাকে আশ্রয় করে, তবে তার সামনে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ভক্তি, অনন্ত কর্ম।···অহঙ্কারী যে কর্মী, তার কর্মশক্তি অনন্ত নয়।···

*ক্রমশ

বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র

।। শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত ।।

গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সকলের সম্মতির ভিত্তিতে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন। অবশ্য সকলেই সম্মতি দিবে ইহা হইতে পারে না, তাই সেক্ষেত্রে অধিকাংশের সম্মতিতেই সকলের সম্মতি এইরূপ ধরিয়া লওয়াই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বীকৃত প্রথা। কিন্তু ইহাতে যাহারা সম্মতি দিতে পারিবেন না তাঁহারা কি করিবেন। গণতন্ত্র বিধির উচিত হইতেছে অন্ততঃ সাময়িক ভাবে ঐ অধিকাংশের মতকেই মান্য করিয়া লওয়া। ঐরূপ অধিকাংশের মত যে সব ক্ষেত্রে সঠিক হইবে তাহা না হইতে পারে। কিন্তু সেই ভুল অবশ্যই অভিজ্ঞতায় ধরা পড়িবে। তখন অধিকাংশ এইরূপ ভুল হইতে শিক্ষা লাভ করিবে এবং হয়তো পূর্ব্বে যাহারা সংখ্যাল্প হইয়াও নির্ভুল যুক্তি দিয়াছেন তাহাদিগকে তখন হয়তো সমর্থন করিবে। যদি সকলে গণতন্ত্রের এই নীতিপদ্ধতি মান্য করিয়া চলে তবে নিশ্চয় গণতন্ত্র সুখের হয়। কারণ ভুল করিতে করিতেই মানুষ ক্রমশঃ অধিকতর নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে শিখে ও সমাজ উন্নত হয়। কিন্তু গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলেই মানুষ এইভাবে পরমত-সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল হয় না। প্রত্যেকেই নিজেকে নির্ভুল মনে করিয়া নিজ মতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে—ভুল ত্রুটি অপরের ঘাড়ে চাপায়। যাহাদের মত গৃহীত হইল না তাহারা অপর পক্ষের সিদ্ধান্তটি যাহাতে ভুল প্রমাণিত হয় তাহার চেষ্টা করে। অনেক সময় নানা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দলাদলি দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া বিশেষ মতে সায় দেয়—যুক্তি বিচার প্রভৃতির ধার ধারে না। এইজন্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির যেরূপ উন্নতি প্রত্যাশা করা হইয়াছিল তাহা হইতেছে না। ইহার কারণ কি? কারণ হইতেছে গণতন্ত্র শুধু একটি বাহ্যিক নিয়ম নহে ইহা একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণগত অভ্যাসের জিনিষ। ঐরূপ অভ্যাস গঠন করিতে হইলে শৈশব হইতেই তাহা চেষ্টা করিতে হয়। গণতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে আচরণীয় বিষয় নহে, উহা সমাজগত ভাবে আচরণীয়। বিদ্যালয়ই শিশুদের ঐরূপ সমাজ হইতে পারে। তাই বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা ডিউই প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ বলেন। তাঁহারা বলেন যদি দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তাহা হইলে বিদ্যালয় হইতেই তাহার ভিত্তি স্থাপন করা চাই। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীও তাঁহাদের শিক্ষা-চিন্তায় ঐ মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিদ্যালয়ে যদি শুধু পুস্তককেন্দ্রী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে শিক্ষার্থী শিশুগণের পরস্পরের সাধারণ স্বার্থ আগ্রহ ও কাজ কর্মের বিষয় কম থাকে বলিয়া আচরণগত ভাবে গণতন্ত্র বিষয় শিক্ষার বিশেষ সুযোগই থাকে না। ছোট শিশুরা শুধু যুক্তি সাহায্যে গণতন্ত্র বুঝিতেও পারে না—পারিলেও তাহাতে বিশেষ লাভ হয় না—কারণ গণতন্ত্র যে আচরণ-ধর্মী শিক্ষা তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কর্মকেন্দ্রী বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের গণতন্ত্র বেশ ভালভাবেই প্রযুক্ত হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে শিশুদের দ্বারা নির্ব্বাচিত শিশুরাই বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করিবে ও শিশুরা মাঝে মাঝেই তাহাদের কাজকর্ম বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করিবে। পর্য্যায়ক্রমে সকল শিশুই বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব পাইবে, তাই তাহাদের সমালোচনা শুধু দোষ বাহির করায় নিবদ্ধ হইবে না—গঠনাত্মক হইবে। নেতা নিজেরাই নির্ব্বাচিত করিয়াছি সুতরাং তাহাকে মান্য করা উচিত এই বোধ সহজেই জাগিবে এবং নিজেও নেতৃত্ব লইয়াছি ও লইব এই চিন্তায় নেতাদের প্রতি সহানুভূতিও থাকিবে।

এইরূপ গণতন্ত্র স্থাপন করিলে শিক্ষক কি করিবেন? এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। শিক্ষক নিশ্চয় উদ্যোগহীন হইবেন না। তিনি শিশুদিগকে তাহাদের স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে ভুল সংশোধন করিতে ও সঠিক পথে চলিতে শিখাইবেন। কোনও গুরুতর ভুল ঘটিবার পূর্ব্বে তিনি সাবধান করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহাকে ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে। তিনি যদি ক্রমাগত শিশুদিগকে বাধা দেন ও উপদেশ দেন তবে শিশুদের উৎসাহ ও দায়িত্ববোধ নষ্ট হইবে এবং গণতন্ত্রের শিক্ষা অকেজো হইবে। আবার শিক্ষক যদি শিশুদের ভুল ত্রুটিগুলির কুফল দেখাইয়া তাহাদিগকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাটি ক্রমশঃ বিকশিত না করেন তাহা হইলেও গণতন্ত্র ব্যবস্থা অচলপ্রায় হইবে। তাই বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সুফল পাইতে হইলে শিক্ষককে সর্ব্বাগ্রে গণতন্ত্রপ্রিয় হইতে হইবে ও শিশুদের আস্থাভাজন বন্ধু হইতে হইবে। যদি তিনি আগ্রহ ও প্রতিষ্ঠাশীল হয়েন তবে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম সম্পাদন, শৃঙ্খলা রক্ষা, এমনকি শিক্ষাদান ব্যবস্থার মধ্যেও কোনও কোনও বিষয়ে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইতে পারে ও তাহা দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়।

যাত্রাশেষ

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

তীব্র তাপে বাতাস কাঁপে, নীল
আগুন চোখে ঝলক দিয়ে ওঠে,
জীবন যেন ঘোড়ার পিঠে সোয়ার,
শূন্য দিয়ে অশ্বহীন ছোটে।

অথচ সেই তীব্র জ্বালা নেই,
সামনে ছায়া-রাত্রি, গোধূলির
ক্লান্তি নামে, হৃদয় বিজনেতে
শান্তি খোঁজে—যাত্রাশেষ তীর।

অনেক পথ হেঁটেছি সারাদিন,
যন্ত্রণায় পেয়েছি জ্বালা, মন
আশায় নীল, আকাশে মেঘ হ'লো,
সবুজ মাটি আঁধারে নিমগন।

তিমির থেকে আলোর মুখ চেয়ে
আমায় নেবে ওপারে কোন্ নেয়ে?

রবীন্দ্র-প্রতিভার একদিক

॥ জনাব রেজাউল করীম ॥

কবিদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ এই যে তাঁরা স্বপ্নদর্শী। বাস্তবের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে বর্ত্তমান জড়বাদী ও বস্তুবাদী জগতেও স্বপ্নদর্শী কবিরও প্রয়োজন আছে। নিছক বস্তুবাদ ও বাস্তববাদ মানুষের জীবনকে একঘেয়ে করে তোলে. পৃথিবীর রূপ রস সুধা আনন্দ সৌন্দর্য মাধুর্য এই সব স্বপ্নদর্শী কবির সৃষ্টি। পৃথিবী এত ভাল লাগত না, কোকিলের গানে, নদীর তরঙ্গে, পত্রের মর্মরে এত শোভা নাই যা মানুষ দিনরাত দেখে দেখে আনন্দ পেতে পারে, কিন্তু স্বপ্নদর্শী কবির তুলিকায় যখন এই সব নিত্যদেখা বস্তুগুলি নূতন হয়ে ফুটে উঠল, তখনই তা গৌড় জনকে চিরকালের তরে আনন্দ দান করতে পারে। প্রকৃতির বুকে যে শোভা সৌন্দর্য আমরা লক্ষ্য করি সেগুলি যখন কবির কবিতায় পড়ি তখনই পাই তাদের প্রকৃত সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বঙ্গ-জননীর যে ছবি পাই তা দেখে আমরা সত্যই মুগ্ধ হই। এত সৌন্দর্য তো নিজের চোখে কোন দিন দেখিনি। সেই জন্য বলা হয় কবিরা সৌন্দর্য-স্রষ্টা। জড়বাদী মেকলে তাঁর Bacon প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন An acre of land in Middlesex is better than a principality in utopia; এর মর্মার্থ বাস্তব জগতের এক একর জমি কল্পজগতের একটা রাজ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জড়বাদী মেকলের এই উক্তিকে আমরা অন্তর দিয়ে মেনে নিতে পারলাম না। তিনি এবং তাঁর মত আরও হাজার লোক আছেন যারা আত্মা ও স্পিরিটের আসল মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাই তাঁরা স্বপ্ন-দর্শী কবিকে উচ্চ স্থান দেন নি। কিন্তু অপর একজন লেখক যা বলেছেন সেটাও লক্ষ্য করা দরকার—The great human societies are creations not of profiteers, but of dreamers. The millioneers who produce their bales of marchandise in enormous quantities have never built a great civilization. It is they who are about to destroy what others have built। এর মর্মার্থ এই যে, বিরাট মানব-সমাজ মুনাফাখোর বণিকদের চেষ্টায় গড়ে উঠেনি। এ সমাজ গড়ে উঠেছে স্বপ্নদর্শীদের দ্বারা। যে সব কোটিপতি মানুষ প্রচুর মাল উৎপাদন করে তারা কোন দিন সভ্যতা গড়ে তুলে নাই। বরং তারাই সভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত। মহান রবীন্দ্রনাথের কথা যদি চিন্তা করি, বিশ্ব-সভ্যতা গঠনে তাঁর দানের কথা ভাবি, তবে এই কথাটাই মনে হবে যে, এ যুগের শত শত রকফেলার ও কারনেগির সমস্ত স্বর্ণমুদ্রার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট একটি কবিতার মূল্য অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথের কল্পলোকের এক কোণায় একটি ছোট কুঁড়ে ঘর পেলে আমরা তার বিনিময়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্যও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। সেইজন্য কারলাইল বলে ছিলেন—"আমাদের ভারত সাম্রাজ্য থাকুক আর না থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমাদের সেক্সপীয়ার না থাকলে সত্যই আমরা দরিদ্র হয়ে যাব।" বাস্তবিকই কারলাইল একটি খাঁটি সত্য কথা বলেছেন। ইংলণ্ডকে ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু আজ যদি তার সেক্সপীয়ার না থাকত তবে কোথায় সে দাঁড়াত? যে কোন দেশের জাতির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হচ্ছে সে দেশের কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী।

রাজা সেনাপতি ও কোটিপতি এদের ইতিহাস কালের অতল তলে তলিয়ে যাবে, কিন্তু হোমার, বাল্মিকী, ভার্জিল, কালিদাস, সেক্সপীয়ার, মিল্টন, শেলী, কিটস

এরা স্বর্ণের অক্ষরে পৃথিবীর ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। এরা অমর জীবন পেয়েছেন। আর অনন্তকাল পর্যন্ত এরাই মানুষের জীবন-ধারাকে প্রবাহিত করে আসছেন। রবীন্দ্রনাথ অতীতের এই সব মহাকবির সগোত্র। তিনি বিশ্বসভ্যতার ধারক ও বাহক।

বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ও শিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এ যুগের একজন চিন্তাশীল সাধক। তিনি যুগের চিন্তাধারার মধ্যে এনেছেন একটা বলিষ্ঠ আশাবাদ। তিনি ভাববাদী সাধকের মত কল্পনার চোখে দেখেছেন একটা নূতন সুন্দর মহান সভ্যতার ছবি। তাঁর ছিল একটা গভীর অন্তর-দৃষ্টি। সেই অন্তর-দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন যে জগতের সুদিন আসবে। নিরাশার অন্ধকার কেটে যাবে। আর তার স্থানে বিকশিত হবে নূতন দিনের নূতন সূর্য। তার্কিকের মত যুক্তি করে অবশেষে একটা চলন-সই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মতো মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। তিনি সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর সেই স্বপ্নে তাঁর মানসলোক এমন একটা জগতের কথা কল্পনা করেছেন যা কোন দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ যে নূতন যুগের স্বপ্ন দেখেছেন, তার গোড়ার কথা হচ্ছে সমন্বয়। তিনি তাঁর কবিতায়, গল্প রচনায় এবং বক্তৃতায় এই কথাই বলেছেন পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সকল রকম বৈষম্য দূর করে একটি বিরাট মানব সমাজ গঠন করতে হবে। সকল মানুষের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেই মানুষ আবার আপন সত্তা ফিরে পাবে। সর্ব মানবের কথা চিন্তা না করে যারা নিভৃতে গুহাভ্যন্তরে সাধনা করে নিজের মুক্তির সন্ধান করেছেন, তিনি তাদের এ প্রকার কর্মধারা স্বীকার করে নেননি। তিনি তাই বার বার বিভিন্ন ভাবে বলেছেন বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। বৈরাগ্যের পথে তিনি মুক্তি চান নি। তিনি মুক্তি চেয়েছেন পৃথিবীর কোলাহলে, পাপপুণ্য মিশ্রিত এই পৃথিবীর কোলে।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারা নানা বিষয়ে ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছে! তাই তিনি আশা করে ছিলেন যে হয়ত সেখানে কোন আদর্শ পাওয়া যাবে। কিন্তু বিশ্ব-প্রেমিক কবি হতাশ হয়ে গেলেন যে পূর্বাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চলের নিকট কোন মহৎ আদর্শ পাবে না, পেতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এই নিতান্ত বস্তুবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ এই যে, এর অধিকাংশ কৃত্রিম, মেকী, বাহুল্যপূর্ণ যান্ত্রিকতায় ভরা। এ সভ্যতার প্রাণ-কেন্দ্র নগর। প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে এ সভ্যতা পুষ্টি লাভ করেনি। গ্রামকে অবহেলা করে সহরে সৃষ্টি এই পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের আত্মাকে মহা বিপন্ন করেছে। প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকে প্রাচীর-ঘেরা নগর-সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। এই সভ্যতার উত্তরাধিকারী হচ্ছে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা। উদার প্রকৃতির সহজ স্বাভাবিক পরিবেশের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নাই। এ সভ্যতা মানুষের সুখ শান্তিকে নষ্ট করে দিয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যে এক চেটিয়া অধিকার, সাম্রাজ্যবাদ, যন্ত্রশিল্প, এইসব এক জোটে মিলে মানুষকে দাসে পরিণত করেছে। দুর্ধর্ষ আরব বেদুইনের মনে যে শান্তি সুখ ছিল বর্তমানে যে সুখ দিতে পারে না। কবি শিল্পী রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে নূতন আদর্শ দান করলেন।

তিনি এই কথাই বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে বিশ্ব সভ্যতাকে নূতন করে গড়তে হবে—বৈরাগ্য ও অনাসক্তির পথে নয়, নিষ্কর্মার অলস জীবন-দর্শন দ্বারা নহে। Philosophy of escapism কে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি বলতেন যে আমাদেরকে পৃথিবীর আলোতে আনয়ন করতে হবে।

　　　　এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বার বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার

রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝে।

এই বিশ্ব-জগতের সকলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ, এই আদর্শ ই রবীন্দ্রনাথকে সব কবির মধ্যে একটা বিশিষ্টতা দান করেছে। সেই জন্য আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ কেবল শেলী ও কিটস নন, তিনি একাধারে হোমার, বাল্মিকী, সেক্সপীয়ার ও গ্যেটের মানবীয়তারও অধিকারী। তিনি সত্য ও সুন্দরের কবি। তিনি যেন কল্পলোক থেকে বেরিয়ে এসে জীবন্ত মানুষের দেশে বসবাস করতে আরম্ভ করেছেন। এমন জীবন্ত মানবতাবোধ ব্রাউনিংয়ের পরে আর আমরা কোন কবির মধ্যে দেখি না। সত্যই জগতে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য অভাব অনটন আছে, কদর্যতার অভাব এখানে নাই। কিন্তু এই সবের প্রতিকার তো ওদের অন্তরালে ফিরে যাওয়া নয়, এর প্রতিকার এই জগতে বাস করে মহৎ মন ও উচ্চ আদর্শ দিয়ে সমগ্র পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করবার জন্য সাধনা করা। তিনি শেলীর স্বর্গত পক্ষীর মত ধূলির ধরাকে অবজ্ঞা করেন নি। তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের স্বর্গত পক্ষীর মত আকাশ ও ধরণীর মধ্যে একটা যোগাযোগ রেখেই চলেছেন—True to the kindred points of Heaven and Home; তাই তিনি বলতে পেরেছেন "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।" পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সমাজের মধ্যে এনেছে বিরোধ। গত চল্লিশ বছরের মধ্যে দুটি প্রকাণ্ড ধরণের বিশ্ব-সমর হয়ে গেল। এর ফলে মানব সমাজ কি পেল? পেয়েছে আনবিক বোমা, হাইড্রজেন বোমা। আর পেয়েছে বিষময় অশান্তি. আজ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চাপে মানব সমাজ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন শুধু অশান্তিপূর্ণ।

এই কি সভ্যতার পরিণতি? তবুও আবার জগৎ জুড়ে আরম্ভ হয়েছে তৃতীয় মহাসমরের মহড়া। অতএব, যুদ্ধ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশ বিস্তারের অপচেষ্টার ফলে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে তাঁর আত্মাকে। কেবল পাশবিক সুখ সম্ভোগের আদর্শ ই মানুষকে পেয়ে বসেছে। এই গোলক ধাঁধাঁ থেকে বাঁচবার কোন সহজ পথ নাই, একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন রোমা রঁলা, একজন গান্ধী এই সর্বজনীন বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্রোতের বেগ রোধ করতে চেষ্টা করেছেন। এরা, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, দেখাতে চেয়েছেন যে, মানব সমাজ একটা অখণ্ড সত্তা, এক পরিবারভুক্ত। এ যুগের রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আর কেহ নিখিল বিশ্বের সামগ্রিক রূপটা এমন করে দেখে নাই। তিনি যেন সারা বিশ্বকে নূতন করে আবিষ্কার করলেন। এমন পরিপূর্ণ বিশ্ববোধ কোন কবির কাব্যে বা শিল্পীর রচনায় ফুটে উঠে নাই।

আমরা সাধারণ লোক "মানুষ" কে দেখি আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি কোণ দিয়ে, বড় লোক, গরীব লোক, ইংরাজ ভারতবাসী, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি ভাবে। এর উর্দ্ধে আমরা উঠতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন সমগ্রভাবে মানুষ জাতিকে। তিনি মানব সমাজকে পায়রার খোপের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ভাবে দেখেন নি। তিনি বিশ্ব মানবতার আদর্শের অগ্রদূত, আদর্শ পুরোহিত। তাঁর মধ্যে সব আদর্শ এসে মিশেছে। বিজ্ঞান ও বিশ্বাস, মরমীবাদ ও বস্তুবাদ, আদর্শবাদ ও কর্মবাদ কবি ও প্রফেট, লৌকিক ও পারলৌকিক, পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্ত্য সব কিছুরই তিনি এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। বর্ত্তমান যুগের ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম আদর্শের তিনি কবিত্বময় প্রকাশ। তাঁর মধ্যে সর্বজনীন মানবের আদর্শ পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের আত্মা, তাঁর মন, তাঁর অন্তর, তাঁর দেহ, তাঁর সমগ্র জীবন যেন অনন্তের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা। তিনি তাঁর অন্তর-ভরা গভীর মানবিকতা থেকে এঁকেছেন এক স্বপ্ন, এনেছেন এক ছবি, এক বিরাট বিশ্বরূপের ছবি। সর্বমানবের সঙ্গে তাই তিনি একাত্মা হয়ে গেছেন। এই বিরাট মানবতার আদর্শ তাঁর দেহের পরতে পরতে প্রকাশমান। "আমার শোনিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।" তাই তিনি সকলকে সম্বোধন করে বলতে পেরেছেন "কেহ নহে মোর পর"।

রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী কবি ছিলেন। কিন্তু তাই বলে

রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝে।

এই বিশ্ব-জগতের সকলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ, এই আদর্শ টি রবীন্দ্রনাথকে বহু কবির মধ্যে একটা বিশিষ্টতা দান করেছে। সেই জন্য আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ কেবল শেলী ও কিটস নন, তিনি একাধারে হোমার, বাল্মিকী, সেক্সপীয়ার ও গোটের মানবীয়তারও অধিকারী। তিনি সত্য ও সুন্দরের কবি। তিনি যেন কল্পলোক থেকে বেরিয়ে এসে জীবন্ত মানুষের দেশে বসবাস করতে আরম্ভ করেছেন। এমন জীবন্ত মানবতাবোধ ব্রাউনিংয়ের পরে আর আমরা কোন কবির মধ্যে দেখি না। সত্যই জগতে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য অভাব অনটন আছে, কদর্যতার অভাব এখানে নাই। কিন্তু এই সবের প্রতিকার তো গুহার অন্ধকারে ফিরে যাওয়া নয়, এর প্রতিকার এই জগতে বাস করে মহৎ মন ও উচ্চ আদর্শ দিয়ে সমগ্র পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করবার জন্য সাধনা করা। তিনি শেলীর ভরত পক্ষীর মত ধূলির ধরাকে অবজ্ঞা করেন নি। তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভরত পক্ষীর মত আকাশ ও ধরণীর মধ্যে একটা যোগাযোগ রেখেই চলেছেন—True to the kindred points of Heaven and Home; তাই তিনি বলতে পেরেছেন "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।" পাশ্চাত্য সভ্যতা সমাজের মধ্যে এনেছে বিরোধ। গত চল্লিশ বছরের মধ্যে দুটি প্রকাণ্ড ধরণের বিশ্ব-সমর হয়ে গেল। এর ফলে মানব সমাজ কি পেল? পেয়েছে আনবিক বোমা, হাইড্রজেন বোমা। আর পেয়েছে বিশ্বময় অশান্তি। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপে মানব সমাজ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন শুধু অশান্তিপূর্ণ।

এই কি সভ্যতার পরিণতি? তবুও আবার জগৎ জুড়ে আরম্ভ হয়েছে তৃতীয় মহাসমরের মহড়া। জড়বাদ, যুদ্ধ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশ বিস্তারের অপচেষ্টার ফলে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে তার আত্মাকে। কেবল পার্থিব সুখ সন্ধানের আদর্শ টি মানুষকে পেয়ে বসেছে। এই গোলক ধাঁধা থেকে বাঁচবার কোন সহজ পথ নাই, একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন রোমা রঁলা, একজন গান্ধী এই সর্ব্বজনীন বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্রোতের বেগ রোধ করতে চেষ্টা করেছেন। এরা, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, দেখাতে চেয়েছেন যে, মানব সমাজ একটা অখণ্ড সত্তা, এক পরিবারভুক্ত। এ যুগের রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আর কেহ নিখিল বিশ্বের সামগ্রিক রূপটা এমন করে দেখে নাই। তিনি যেন সারা বিশ্বকে নূতন করে আবিষ্কার করলেন। এমন পরিপূর্ণ বিশ্ববোধ কোন কবির কাব্যে বা শিল্পীর রচনায় ফুটে উঠে নাই।

আমরা সাধারণ লোক "মানুষ" কে দেখি আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে, বড় লোক, গরীব লোক, ইংরাজ ভারতবাসী, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি ভাবে। এর উর্দ্ধে আমরা উঠতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন সমগ্রভাবে মানুষ জাতিকে। তিনি মানব সমাজকে পায়রার খোপের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ভাবে দেখেন নি। তিনি বিশ্ব মানবতার আদর্শের অগ্রদূত, আদর্শ পুরোহিত। তাঁর মধ্যে সব আদর্শ এসে মিশেছে। বিজ্ঞান ও বিশ্বাস, মরমীবাদ ও বস্তুবাদ, আদর্শবাদ ও কর্ম্মবাদ কবি ও প্রফেট, লৌকিক ও পারলৌকিক, পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্য সব কিছুরই তিনি এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। বর্ত্তমান যুগের ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম আদর্শের তিনি বিস্ময়কর প্রকাশ। তাঁর মধ্যে সর্বজনীন মানবের আদর্শ পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের আত্মা, তাঁর মন, তাঁর অন্তর, তাঁর দেহ, তাঁর সমগ্র জীবন যেন অনন্তের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা। তিনি তাঁর অন্তর-ভরা গভীর মানবিকতা থেকে এঁকেছেন এক স্বপ্ন, এনেছেন এক ছবি, এক বিরাট বিশ্বরূপের ছবি। সর্বমানবের সঙ্গে তাই তিনি একাত্মা হয়ে গেছেন। এই বিরাট মানবতার আদর্শ তার দেহের পরতে পরতে প্রকাশমান। "আমার শোনিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।" তাই তিনি সকলকে সম্বোধন করে বলতে পেরেছেন "কেহ নহে মোর পর"।

রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী কবি ছিলেন। কিন্তু তাই বলে

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(২৮)

ওঁ শ্রীনিত্যগোপাল

সকালে মাঘ মাসের জন্য গীতার অংশ ঠিক করিয়া রাখিবার পর আমি একা অফিসে যাই। কিছু পরে মাখনবাবু আসে।...বহুদূর ছুটিয়া একরূপ ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া আজ কয়েকটী মানুষের মধ্যেই স্থিতিলাভ করিতে চাহিতেছি, বিশ্রাম লাভ করিতে ব্যাকুল, সকল অনাদরের বেদনা ভুলিয়া যাইতে চাহিতেছি, তাহাই বিশেষ করিয়া আলোচনা করি। শ্রীনিত্যগোপাল-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্যই তো মানুষ দরকার। মানুষ মানুষ করিয়াই তো আমি পাগল। আজিও মানুষ চাই। একখানি লেখা পাওয়া গেল অনেক দিন আগের, সেই প্রথম জেলে যাওয়ার প্রাক্কালের। আবার সেই রকম গর্জন করিতে সাধ হইতেছে। সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিত্যগোপালের আসন রচনা করিবার জন্য উন্মত্ততা আসিতে চাহিতেছে। আমাকে কি ঠাকুর সে শক্তি দিবেন না? এমন করিয়াই কি আমি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিব? ...আর একটী চিঠি পাওয়া গেল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের চাকুরী ছাড়ার পর কলিকাতা নিতাইবাবুর বাসা (১৩০ বৈঠকখানা রোড) হইতে লেখা। ২ দিন পূর্ব্বে অবলার নিকট লেখা এক পত্রেরও নকল পাইলাম। সব চিঠিগুলি আবার আমাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে চায়, আবার সেই ছুটাছুটির মধ্যে নিয়া যাইতে চায়।...

১লা জানুয়ারী

সকালে 'পুস্তক পরিচয়' লিখিবার উদ্দেশ্যে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্বসুবোধিনী পড়ি। সকালে আমি আর অফিসে যাই না, প্রতিভা যায়। ঐ পুস্তক মায়াবাদের লেখায় ভরপুর। 'সমালোচনা করিতে হইলে স্পষ্টই লিখিতে হয়। ২।৩ দিন হইতেই—জীবন মেঘাচ্ছন্ন দেখাইতেছে।... উষাদিদি আসিয়া আমার কাছে কাঁদিয়া পড়িল। বলিল, 'আমি যে আর পারি না, আমি কি করিব'? উষাদিদি কোনও দিন জীবনে তো এত বিহ্বল হয় নাই।...সারাজীবন দুর্য্যোগ ঠেলিয়া চলিয়াছি। আজ কোথাও বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য প্রাণ চায়। হৃদয়ের খোঁজই তো করিলাম। উষাদিদির কান্না দেখিয়া প্রাণটা বেদনাতুর হইল। তাহারও মন যোগাইয়া চলিলে শেষ পর্য্যন্ত যে তাহার মন আর যোগান যায় না—তাহা বলিলাম। আমার নির্দ্দেশমত পূর্ব্ব হইতে চলিলে আজ এ পরিণতি আসিত না।...

২রা জানুয়ারী

সকালে অফিসে যাই। ফিরি ১০।০টার পর।... রেণু 'নববর্ষের প্রণতি', 'আমাদের কথা' লিখিয়া শেষ করে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিতে থাকে।...২৩।২৪ বৎসরের সংস্কারেরও কোন মূল্য নাই! মনস্তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য! বিজ্ঞানের বাহিরেও তাই অবিজ্ঞানের একটা রাস্তাও আছে নিশ্চয়ই। মানুষের সাইকোলজি বুঝি সব ব্যাখ্যা করিতে পারে না।...সারা জীবন বড় ঝঞ্ঝাট ঠেলিয়া চলিয়াছি, বিরাম নাই। পরা প্রকৃতি কি উদ্ভাসিত হইবে না? কোথায় যোগমায়া? আমি ব্যাকুল প্রাণে তোমার অবতরণ প্রার্থনা করিতেছি।

৩রা জানুয়ারী

...বিরজার সঙ্গে রাধারাণীর কথা, মেয়েদের কথা হয়। তাহাকে 'সাহিত্যের ইঙ্গিত' পড়িতে দেওয়া হয়। প্রতিভার সঙ্গে সুধাংশু আসে। সে স্কুলেও যায়।...শ্রীনিত্য

গোপালের প্রতিষ্ঠাই আমার জীবনের সবখানি কথা। সে জন্য চাই কয়েকটী প্রাণের সংহতি। বেণু প্রতিভাদের কাছে আমার তাহাই দাবী। তাহারা বোনের মত পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে বিলাইয়া সত্ত্ব গড়িয়া তুলিলেই সেখানে ঠাকুর বিশ্রাম করিবেন, প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তিনি তো হৃদয়-সম্রাট। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের প্রগাঢ় মিলন না হইলে সম্রাট প্রতিষ্ঠিত হইবেন কোথায়? একটী হৃদয়ে তাঁহার স্থান কুলায় না। মানুষকে কতখানি মর্য্যাদা দিয়া যে ভালবাসিতে চাহিয়াছি, তাহা ঠাকুর জানেন। আমি আজিও সকলের মর্য্যাদার প্রহরী। কাহারও মর্য্যাদা আমি লঙ্ঘন করি নাই—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পথের লোক—কাহারও নয়। সেই আমিই বুঝি মানুষ পাইলাম না। এ যে শোষণের দেশ! শোষণের কাছেই আত্মদান করে।

৪ঠা জানুয়ারী

...উহাকে যে না জানিতে চাহিয়াছিল, তাহার মূলে সত্য আছে। এইরূপ যে উহার প্রকৃতি, তাহা কি করিয়া বুঝিব? মহা বিপদের মধ্যে আমি উহাদের আশ্রয়ে স্থান দিয়াছি, ইহারই জন্য আমার সঙ্গে উহার প্রাণখোলা ব্যবহার করা উচিত ছিল।··কিন্তু এ পরিস্থিতি তো আমি সৃষ্টি করিয়াছি, কাজেই আমিও তো দায়ী।···

৫ই জানুয়ারী

···মীরাকে নারীর 'স্বাতন্ত্র্য' সম্বন্ধে অনেক কথা বলি। 'ভারতীয় প্রগতির পটভূমিকা' পড়িতে দেই, বুঝাইয়াও দেই। পুরুষ-নিরপেক্ষ নারীর একটা সত্তা না থাকিলে সে যে স্বামীর অধীন হইয়া থাকিবে, স্বামী অপদার্থ হইলে নিজ পুত্রকন্যার ভার বহনেও সে অপারগ হইবে—ইত্যাদি আলোচনা হয়। 'যোগ্য' হওয়ার কথাই বলি।...বেণু আসে,২॥০ টায়।...-র সঙ্গের কথা আলোচনা হয়। সম্ভবতঃ উহাদের stand point হইতেছে G.C.M -এর, নির্বিশেষের। কাজেই সব পথ, সব process-এর negative হিসাবে এক। উহারা কাজেই সব কিছুকে নেতি হিসাবে সমান মূল্য দিতে পারেন। কিন্তু L.C.M. কিংবা বিশেষের স্তরে যাহারা নির্বিশেষ চায় তাহাদের synthesis তো সর্ব বিশেষের সমন্বয়। যাহা একটি বিশেষকে অস্বীকার করিয়া নিজ বিশেষ পথে নির্বিশেষ স্থাপন করিতে চায়, তাহাদের সঙ্গে মিল হইবে কেন? শঙ্করও তো এক হিসাবে সমন্বয়বাদী, synthesis মানেন। 'তত্তু সমন্বয়াৎ'। কিন্তু তাঁহার synthesis তো G. C. M.। আর আমাদের সমন্বয় L.C.M.। এই synthesis-কে inductively ও deductively দুই ভাবেই স্বতন্ত্রভাবে আস্বাদন করা যায়। সেখানে Divine ও আমি কেহই পূর্ব্বে ও পরে নয়। যে কোন process-এ আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব process-এর সমন্বয়ে (বিশেষের ক্ষেত্রে) পৌঁছানো যায়। ইহাই আমাদের uniqueness।

৬ই জানুয়ারী

···সকালে 'জৈন ধর্ম্মের রূপরেখা'র কিছুটা ও 'জৈনধর্ম্মের পরিচয়' সবটা পড়ি। বেণু সুরেন বিশ্বাস ও নন্দিনী ঘোষের বাসায় যায়। বেণু এখানে আসে ২টার পর।···শৈলেন দত্ত আসেন।···অক্ষয় সেন মারা গিয়াছেন। নিত্যব্রতকে সঙ্গে নিয়া শ্মশানে যাই। তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সুধীর দাসের সঙ্গে দেখা। ৮॥০টার সময় হার্টে কষ্ট হয়। ১১টার পর মারা যান। বেশ মানুষ ছিলেন। নীহারের মারা যাইবার খবর পাইয়া কষ্ট করিয়া তেতলায় আসিয়া বেদনা জানাইয়া যান। পথে দেখা হইলেই মিষ্টভাবে কথা কহিতেন। বরিশালের সব অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। নন্দিনী ঘোষের হাতে একটি ঘর আছে। বেণুকে বলিয়াছে। ভাড়া ১০০৲ টাকা।···যে খাটুনি ইহারা এই ৪ বৎসর করিল, কাহার সাধ্য এরূপ করে?...

৭ই জানুয়ারী

সকালে প্রতিভার দুই খাতা প্রবন্ধ দেখি।...যখন মাষ্টারী করিবার সময়ে জগদীশবাবুর বাসায় ছিলাম

তখন বরিশালে সহবয়স্ক আমরা একদল স্তোত্র-কীর্ত্তন করিতাম, তাহার একটা নামের লিস্ট ও পাঠের পরিচয় সূচক কিছু কাগজ আজ প্রতিভা পুরাতন চিঠিপত্রের মধ্যে পাইল। দুর্গাপ্রসাদ দাদা ও রাধিকা অধিকারীর দুই চিঠিও পাইলাম। রেণু সকালে প্রথমে সন্তোষ লাহিড়ী, পরে এস সরকারের ওখানে যায়;…তাহার পর পোস্টাফিস ব্যাঙ্ক হইয়া কীমার প্রভৃতি জায়গা ঘুরিয়া ১০ টায় বাসায় আসে। আজ আর এখানে আসে না।…সাবিত্রীবাবুর সঙ্গে কথা হয়, কেন্দ্রবাড়ীতে বিজ্ঞাপন দিবে; হিন্দুস্থান মোটরে গিয়াছিল, লাভ নাই।…সে আমি বলিলাম, তোমরা ধনকে জয় কর, আদরকে জয় কর না। আমার বহু আদর উপেক্ষা করিয়াছি। সমাদৃত হইবার জন্য কতই না বলিয়াছি। শক্তিকেই মানুষ মর্য্যাদা দেয়, প্রাণকে নয়। আমার জীবনে তাই কেহ রহিল না। কিন্তু কি করিব। স্বভাব আর বদলানো সম্ভব নয়। একটু আদরের সামনে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি, জোর আমি কখনও বরদাস্ত করি নাই।…আজ জাপজী (যতীনবাবুর) অনেকটা পড়ি।

৯ই জানুয়ারী

সকালে আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই।… পুরুষোত্তমের ত্রিমুখী সাধনার কথা সকালে 'তত্তে কৃপাং সুসমীক্ষমান' শ্লোক দিয়া আলোচনা হয়। এক মুখ তাঁহার কৃপার দিকে, অপর মুখে কায় মন বাক্য দিয়া তাঁহার বিশ্বরূপকে প্রণাম করার দিকে। প্রথমটী deductive, **দ্বিতীয়টী** inductive। এই সাধনা মিলে এই সংসারেই **ঐক্য হয়**। কোনও একটীকেই পূর্ব্বে বা পরে সাধনা হিসাবে নিলে চলিবে না। Transendence-কে দেশ কালের বুকে আবাহন করিতে হইবে। তবেই Reality lies ahead বাণী সার্থক হয়। কিন্তু এতদিনকার সাধনা ছিল জগৎ ছাড়িয়া দেশে আসা, দেশ ছাড়িয়া নিজ পরিবারে আসা, নিজ পরিবার ছাড়িয়া নিজের মধ্যে আসা, পরে নিজের দেহ ছাড়িয়া প্রাণে মনে বিজ্ঞানে আনন্দে—সর্বশেষে আত্মায় আসা। দেশকালের বুক চিরিয়া চলাও তো transcend করা। ইহাই 'স ভূমিং সর্ব্বতোস্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ' পুরুষোত্তম-সাধনা। শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে নিয়াছেন সব ছাড়িয়া transcend করার সাধনা, পরে সেখান হইতে অবতরণ করিয়া তবে এই জড় জগতের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং ইহাকে গড়িয়া তুলিবার সাধনা। ইহাতে জগৎকে প্রথমেই static ধরিয়া লওয়া হইয়াছে—সত্ত্ব নিছক সত্ত্ব, রজঃ নিছক রজঃ, তমঃ নিছক তমঃ। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃও যে relative, ইহা বুঝিতে আজ আর supermind-এর দরকার হয় না। বর্ত্তমান বিজ্ঞানেই যথেষ্ট। আমরা এই জগৎকে ধরিয়া এই জগতের বুকেই জগদাতীতকে আবাহন করিব—ইহাই পুরুষোত্তম-আবাহন। এখানে আগে ascent, পরে descent নয়, দুই-ই যুগপৎ। তবে বুদ্ধির ক্ষেত্রের আবাহনে কখনও একটী আগে, কখনও বা অপরটী।…

১০ই জানুয়ারী

সকালে আমি ও প্রতিভা অফিসে যাই। রেণু ৯॥০ টার পর বাহির হইয়া যায়—কীমার, অমল, হোম, প্রেসে যায়। ১২টার পর ফেরে। আমি ও প্রতিভা ১০।০টার পর ফিরি। প্রতিভা তাহার অতীতের…এই সবকেই আজ আমার জীবনে সার্থক করিবার সুযোগ পাইবে। সব অতীত অভিজ্ঞতাকে—কোনও একটীকেও বাদ দিয়া নয়—যদি জীবনে সদ্ব্যবহার করা যায়, তবে তাহাই তো পূর্ণতা।…আমি আমার সারা জীবন বহন করিয়া চলিয়াছি, অতীত সবটুকুর বাধা পাইয়াছি। যে জীবনের সব অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগতের অর্থ পাওয়া সম্ভব, সেই জীবনই তো পুরুষোত্তম জীবন। আমি তেমন জীবন লাভ করিবার জন্য সদা লালায়িত।… প্রত্যেকের জীবনই unique। যাহার যাহা সম্বল, তাহার সদ্ব্যবহার হইলেই তো সার্থকতা। কাহারও মত কেহ হয় না।…আমার যে সংসার-অসংসার মিলাইবার সাধনা।…

১১ই জানুয়ারী

আমি আর সকালে আফিসে যাই না, প্রতিভা যায়। আমি সাময়িকী 'অধিকারের অপব্যবহার', যোধপুরের মহারাজার ধৃষ্টতা ও ভূমিদান যজ্ঞ' লিখিয়া ফেলি। ১০টার পর রায়তার নিতাই ও আর একটী ছেলে আসে।…বেণু সকালে সুবোধ দে-র ওখানে যায়। সেখান হইতে চতুর্বেদী, নলিনীবাবু, হেরম্ববাবুদের সঙ্গে দেখা করে। গ্রামোফোন কোং-তে ফোন করে।…স্থিতপ্রজ্ঞের চারিটী স্তর আলোচিত হয়। সব ভাষ্যকার, টীকাকার এ চারিটি প্রশ্নের উত্তরকে একই স্তরের ধরিয়া লইয়াছেন। উহাতে পুনরুক্তি দোষ হয়। প্রথম ৩টি স্তর প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে স্থিতির স্তর, শেষেরটি হইতেছে রসের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার স্থিতির স্তর। 'অস্য রসঃ পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' অংশদ্বারা রসের ক্ষেত্র সূচিত হইতেছে। 'যদা সংহরতে চায়ং' ইত্যাদি অংশেও রসের ব্যাপারই আলোচিত হইয়াছে। প্রথম ৩টি নিগেটিভ-এর স্তরে স্থিতি, শেষেরটি পজিটিভ স্থিতি। যুদ্ধের ক্ষেত্রে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার রহস্যই গীতার মূলকথা। ইহাই গীতার বিশেষ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের দান। এ ক্ষেত্রে ঋষির সূক্তি—'সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ'। ইহাই মদনমোহন স্তর। তাই শ্রীকৃষ্ণ 'অনাদিবিষয়সংস্কৃ-দর্পকদর্পদর্পহা'। আজিকার আলোচনা বেশ রসাল হয়। কেন আমি এইরূপ ধনের অধিকারী হইলাম, যদি ধরার বুকে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার মত শক্তি না পাইলাম! এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য সুধা প্রভৃতিকে টানিয়া লইয়াছিলাম, অন্য কোন ক্ষুদ্র অভিসন্ধি আমার ছিল না।…কাল অক্ষয় সেনের স্মৃতি সভা ৪।০-টায় হরিদাস মজুমদারের বাসায় হইবে—অতীনবাবু বলিলেন।

১২ই জানুয়ারী

সকালে আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই। ১১টার পর আসি। ২টার পর অক্ষয় সেনের দৌহিত্র (বড় সেনের পুত্র, অধ্যাপক) আসে আমাকে যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতে। কিছু পরে বেণু ও হেমাঙ্গবাবু আসে। ৪টার পর আমি রওয়ানা হই।…দুর্গামোহনবাবু সভাপতি হন, ভূপালবাবুর হওয়ার কথা ছিল, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। ছোট একটি লেখা পাঠান অক্ষয়বাবুর সঙ্গে পূর্ব্ব পরিচয়ের ঘটনার উল্লেখ করিয়া। প্রথমে আমি প্রার্থনা করি। পরে তারক চন্দ্র, অমিয় রায়, শশিভূষণ প্রভৃতি বলেন। সুধীর দাসও বলে। আমি হাঁটিয়া আসি। আজ ফুন্টুর জন্মদিন।…সত্যব্রতর সঙ্গে সমাজের কথা হয় পথে আসিতে আসিতে ও এখানে বসিয়া। যদি আমাদের কিছু করিলে সে সুস্থ থাকে, তবে তাহা করিব, কিন্তু মনের অশান্তির জন্য যদি সে গোলমাল করে তবে কি করিবার আছে?…সারা জীবনের আঘাতগুলি যেন জমিয়া উঠিয়াছে, জাগাইতে চাই; নহিলে বাঁচিব কেমন করিয়া? নীদু যদি আসিত, একবার দেখিতাম। হেমাঙ্গবাবুকে বলিয়াছি—আমার লেখাগুলি যদি পড়িতে, একটু আলোচনা করিতাম; বড় একা বোধ করি। কে বা কাহারা আমার লেখা পড়িবে, জীবনে আচর করিবে, সমাজে ছড়াইয়া দিবে?…যে কথাবার্ত্তা মত-পার্থক্য হয় এমন কথা নাকি সে আর বলিবে না। মতের চেয়ে মানুষ বড়। কিন্তু মতে মতে না মিলিলে মনে মনে গভীর মিল হয় না এবং মনে মনে মিল না হইলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মিল হয় না। ইহারা সব ভাবুক।…

১৩ই জানুয়ারী

আজ দাদার তিরোধান দিবস। গত বৎসর এই দিনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রথম ফর্মের প্রিন্ট অর্ডার লইয়া বেণু ১০টার পর বাহির হয়; এন্‌. সি. ঘোষ-এর ওখানেও যাইবে। সেখানে শুনিল যে মিত্র ব্রাদার্স-এর ওখানে ৮ রীম কাগজ পাওয়া যাইবে।…৫-১৫-এ বাসায় ফেরে। এত দেরীতে ফেরার জন্য রাগ হইতেছিল। সেই ১০টার পর বাহির হইয়াছে, বসিয়া খাওয়া নাই, আর ফিরিল এত দেরীতে। সকালে আফিস হইতে ফিরিয়া দেখি হরিদাসী আজ পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে.. পাঠাইয়াছে। সাদরে গ্রহণ করিলাম।…সারা জীবন একটা বিরাটের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছি।…আজও বিরাট কর্মক্ষেত্র, আলোচনা না হইলে প্রাণ আকুপাকু

করে, কিছুতেই স্বস্তি পাই না। স্বতন্ত্র নিজস্ব ক্ষেত্র না করিলে তো তাহা সম্ভব হইবে না। যে-বস্তু পাইয়াছি, তাহা তো বিরাটের ক্ষেত্র ছাড়া আস্বাদিত হওয়াও সম্ভব নয়।…

১৩ই জানুয়ারী

…আমি ও প্রতিভা ২১-টায় মধাদের বাসায় যাই। সেখানে কিছু আলোচনা হয়। জীবনে কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পর্ক সিধাসিধি নয়; সম্পর্ক বেঁকাইয়া—তাই জগৎটা বঙ্কিম। নৌকাকে গুণ দিয়া টানিবার সময় নৌকার আগা রাখিতে হয় নদীর মধ্যের দিকে। এই ভাবেই নৌকা তীরের কাছ দিয়া যাইতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পাইতে পারে world force-এর সঙ্গে তাল রক্ষা করিয়া, বক্র হইয়া ঘুরিয়া। সিধা চাহিলে মিলন হইবেই না, প্রত্যেকেই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবে। বিশ্বরূপের ছন্দে চলিলেই 'পাওয়া' হয় বাস্তব।…যতীন চট্টোপাধ্যায় আসেন…তাঁহার সঙ্গে 'আপজী' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীকৃষ্ণ-জীবন গুরু গোবিন্দ সিংহের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—ইহাই তাঁহার বক্তব্য। তিনি শিখ মতবাদকে পছন্দ করেন বলিয়াই হাতে লোহার বালা ধারণ করেন। এতদিন পরে আপজীতে দেওয়া চিত্রের অর্থ পরিস্ফুট হইল।…

১৫ই জানুয়ারী

…রেণু…ভবানীপুর…এ কাগজ কিনিতে যায়।… ৪টার পর আসে। আমরা গীতার যে ব্যাখ্যা দিতেছি, তাহা আশ্রয় করিয়া যে-কোনও ব্যক্তি সমাজের যে-কোনও স্তরে বিজয়ীর মত প্রবেশ লাভ করিতে পারে।… 'কৃষক-মজদুর-প্রজা'কে ভোট দিয়াছে। ইহাদের জীবনে যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা সবই ব্যর্থ হইয়াছে। ভোটের স্বাধীনতা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু শালীনতা শোভনতা বলিয়াও তো একটা বস্তু আছে। জওহরলালের ছোট ভগিনী প্রকাশ্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। এতই কি সত্যবাদী স্বাধীনতা-প্রিয় ইহারা? শ্রদ্ধা বলিয়া একটা জিনিষ অন্তর্হিত হইয়াছে।…

১৬ই জানুয়ারী

সকালে আমি আর আফিসে যাই না, প্রতিভা যায়। রেণু ৮টার পর আসে। আমি ও রেণু ১১টার পর বাহির হই। আমি অক্ষয়বাবুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার বাসায় যাই। সুধীর আমাকে উপরে নিয়া যায়। অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় তাহার পরে।…সন্ধ্যায় কিছু পরে নিরজা ও তাহার ছোট বিধবা বোন কুসুম আসে। কুসুম রামদাস বাবাজীর কাছে দীক্ষিত, সে সারা দিন শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবা করে, কিন্তু প্রাণ তবু জুড়ায় না—ইহা নিরজা বলিল। আকাশের ভগবান দিয়া মানুষের প্রাণ জুড়ায় না। প্রাণ জুড়াইতে হইলে প্রয়োজন বর্তমান মানুষ-ভগবানের। প্রায় ১ ঘণ্টা তাহারা থাকে। কুসুম কিছু বলে না, চুপ করিয়া শোনে।…সত্যব্রত আগামীকাল মেদিনীপুর বিশ্বনাথের ওখানে যাইতেছে। এক অনিশ্চিতের মধ্যে সে যাইতেছে।…

১৭ই জানুয়ারী

…সত্যব্রতর সঙ্গে কথা হয়। আমিই বলি, সে বিশেষ কিছু বলে না।…তাহার জীবন দিয়া ঠাকুরের সেবাই চাহিয়াছিলাম।…রিক্সায় উঠিবার কালে বলি—'আমি ৬৯ বৎসরের। আমার কথা মনে রাখিও। যেখানে থাক খবর দিও। যাইতে আমি তোমায় মানা করিব না, খবর যেন পাই'। সারা জীবন আমার চোখে জল। মানুষের প্রতীক্ষাই তো করিলাম। কাহাকেও তো স্থান দিতে পারি নাই। কেন আমার কাছে থাকিবে? আমি ঝড়ের ভিতর দিয়াই চলিয়াছি। কোথায় আমার স্থান? সারা জীবন ঝড় কে সহ্য করিবে? আর কাহাকেও আমার কাছে থাকিতে দিতে সাহস হয় না। কত না জানি দুঃখ পায়! ১১টায় ফিরি আফিস হইতে। বেহালা হইতে ফিরিয়া আফিসে যাই।…

১৮ই জানুয়ারী

সকালে আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই, পথে সতীশ মুখার্জী রোডে শাখার দোকানে উঠিয়া কিছু সময় রেডিও

শুনি। দাঁড়াইলে তাহারা তাকিয়া ঘরে নেন।...তাহারা যখন আত্মসমর্পণের ভার নিজের উপর নেন, তখন আমি অঠাই জলে পড়ি। তাহাদের সমর্থন করিব আমি, আমাকে সমর্থন করিবে তাহারা—তবেই না ইহার মধ্য দিয়া পারস্পরিক আত্মপক্ষ সমর্থিত হইবে। তাহাদের মর্যাদা রক্ষার ভার তো আমারই উপর।...সুধীর দাসের ভাই নেপাল দাস ও তাহার এক বন্ধু আসে। সেই বন্ধুটী গ্রাহক হইবে বলিল। আধ ঘণ্টার উপর ছিল। আমার বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইল। সুধাংশু আসে।...ঠাকুরের যে আশীর্বাদ সারা জীবন তাঁহার অযাচিত করুণায় পাইয়াছি, তাহা স্মরণে রাখিয়া এবং যতদূর আমার পক্ষে সম্ভব কায়মনোবাক্যে কাজে লাগাইয়া ধীরে ধীরে প্রফুল্ল মনে চলিয়া যাওয়া উচিত; যাহা হয় নাই, যাহা পাই নাই, তাহার বোঝা তাঁহারই উপর ফেলিয়াই চলিব। আমার সম্বন্ধে যাহা ভাল তাহাই তিনি করিতেছেন। আমি আমার কি বুঝি?...

১৯শে জানুয়ারী

সকালে ৭টার মধ্যেই রেণু এখানে আসে।...শুনিলাম যে আমাদের নামই নাকি ভোটারের তালিকায় নাই।...খোঁজ নেওয়া উচিত।...সৃষ্টি না করিয়া কেহ তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিতে পারে না। তাই উপনিষদ্ লিখিতেছেন, 'তদেব সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ' যেমন তেমন অবস্থায় বস্তুর মধ্যে প্রবেশ লাভ করা বস্তুর উপর বলাৎকার এবং নিজের পক্ষে অত্যাচার। সৃষ্টি করিবার জন্য সারা জীবন প্রাণপণ করিয়াছি। বোধহয় ব্যর্থ ই হইয়াছি। অনুপ্রবেশ করিতে না পারিলে সত্য পড়িবে কি করিয়া? সৃষ্টি না করিয়া কোন কিছুকে স্পর্শ করা উচিত নয়। উপনিষৎ যে সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন তাহা দ্বিতীয় সৃষ্টির কথা, মানুষের সৃষ্টির কথা, বিশ্বের ঠাকুরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার কথা।...

২০শে জানুয়ারী

...৯টার পর সুরেশ দাসের ওখানে যাই। সেখানে হাসাড়া (বিক্রমপুর) নিবাসী নরেন্দ্র সোমের সঙ্গে দেখা। যখন আমি বিক্রমপুর ঘুরে তাহাদের বাড়ী গিয়াছিলাম, তখন আমার সঙ্গে দেখা। সে বেশ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিল। দেখা করিবার জন্য বলিলাম। ফিরিয়াই দেখি প্রতিভার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। নিত্যব্রতকে দিয়া রেণুকে খবর দেই, এ্যাড্রিনালিনটা আনি। পরে আবার নিত্যব্রতকে পাঠাইয়া রেণুকে আনাই।...

২১শে জানুয়ারী

কলিকাতার নির্বাচনের দিন।

আমি একাই উষাদিদি সহ প্রার্থনা করি, রেণু প্রতিভার কাছে থাকে। রেণু ৮টার পর যায় এখানের কাজকর্ম সারিয়া। প্রতিভা সকালে দুধ-খই খায়।...স্পেসিফিক ২, ২৪, ৮, ১৩, ২৬ নং ওষুধ ৩ বার করিয়া দেই। আর রক্ত পড়ে না। নিত্যব্রতকে পাঠাই ধীরেন ডাক্তারের ওখানে।...'বঙ্গের নিতাই'-র লোক আসে। বৃহস্পতিবার ৪টার গাড়ী নিয়া আসিতে বলিয়া দিলাম। হেমাঙ্গবাবু ...এখানে আসে ৩টার সময়।...আমরা কোনও সম্প্রদায়ের নই বলিয়াই সাম্প্রদায়িক বলিয়া সাম্প্রদায়িকদের দ্বারা কথিত হই।...

২২শে জানুয়ারী

রেণু ৮টার পর চলিয়া যায়।...হেমাঙ্গবাবুর একবার আসার কথা ছিল—আসা হয় নাই। অপেক্ষা করিয়াছি নীলুর কোনও চিঠি নাই। এদিকে প্রতিভা অসুস্থ। সারা জীবন দুর্যোগ ঠেলিয়া চলিয়াছি। 'অদৃষ্ট' বলিব না জীবনের পথই এইরূপ। তাঁহার শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া চলিব আবেষ্টনকে নমস্কার করিতে করিতে। তিনি তো বলিয়াছেন, 'টেনে তুলব'। তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট পথ চলিবার পাথেয়। টানিয়া তো তুলিয়াছেনও, নহিলে কোথায় তলাইয়া যাইতাম, ঠিকানা নাই। এত জটিল আবেষ্টনের মধ্য দিয়া আমার মত অতি অল্প লোকই চলিয়াছে। যখন তখন যে সে অবস্থার সহিত জড়াইয়া পড়িতে পারিতাম। কিন্তু আটকাইয়া তো যাই নাই

পথ কাটিয়া আনাইয়া তো আসিয়াছি। তিনিই হাত ধরিয়া লইয়া আসিয়াছেন। ধন্য তিনি, তিনিই আমার সব।...

২৩শে জানুয়ারী

সকালে আফিসে যাই···অজিৎ মল্লিকের নিকট খোঁজ করি যে আমি 'নদের নিমাই'-তে যাইব, সে যাইবে কিনা। আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে বলিল। রেণু এখানে আসে ৩টার পর। ৫টার একটু আগে মোটর আসে ধীরেনবাবুর। আমি ও রেণু ৫টায় রওয়ানা হই। অজিৎ মল্লিকের বাসায় যাই। অসুস্থ বলিয়া যাইতে পারিল না। ৭টায় সেখানে আলোচনা আরম্ভ হয়। প্রথমে 'অনর্পিতচরীম্‌, ও 'অপারং' শ্লোকদ্বয় দ্বারা মঙ্গলাচরণ। পরে 'তব কথামৃতম্‌' শ্লোকদ্বারা 'নদের নিমাই' সম্প্রদায়ের 'তৃপ্তি' হওয়ার জন্য অভিনন্দন। তৎপরে 'জন্মকর্ম চ মে দিব্যম্‌' শ্লোকদ্বারা গৌরসুন্দরের জন্ম কর্ম জানিবার উদ্দেশ হয়। পরে 'রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতিঃ' শ্লোক আস্বাদন। 'রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলাস-রস আস্বাদন করি। সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞি। ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই।' অন্যোন্যবিলাস দ্বারা রস-আস্বাদন, আর 'এক ঠাঁই' হওয়ার ভিতর ভাব-আস্বাদন। ইহাই Nature এবং God-এর সম্বন্ধ। শ্রীরাধা হইতেছেন Deeper nature, Higher nature। এই শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পরম ঐক্যই রহিয়াছে বিশ্ব সৃষ্টির মূলে। ইহাই মায়াবাদের বিরুদ্ধে অভিযান। 'মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী'—মহাপ্রভুর উক্তি। সব নাস্তিকের, সব বুর্জোয়াদের দর্প চূর্ণ গৌরলীলায়—'পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান'। 'ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে ধন গোরা জগতে ফেলিল ঢালি,' রাজা প্রতাপরুদ্রকে পথে দাঁড় করাইয়া তবে তাঁহাকে দেখা দিলেন, খোলা-বেচা শ্রীধরকে লইয়া কোন্দল করিলেন, প্রকাশানন্দের গর্ব চূর্ণ করিলেন। মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় নন, ব্রহ্মচারী-গৃহী-সন্ন্যাসী নন, তিনি 'মানুষ' এই মানুষের শ্রীচরণ-তলে গণতন্ত্র মূর্ত। আজ ধনীর পূজায় ব্রহ্মাস্বাদন। ৯টার পর···ভাড়াটিয়া গাড়ীতে এখানে পৌঁছি।···অনাথবন্ধু কাছে কাছে ছিল।···

২৪শে জানুয়ারী

সকালে আফিসে যাই না; রেণুই এখানে আসে প্রায় ৮।টায়।···রেণু ও আমি এখানে র‍্যাপার মিলাই।... কালিকার বক্তৃতার কথা প্রতিভা রেণুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলে রেণু বলে, দোতলায় একজনকে দেখিলাম চোখ হইতে জল পড়িতেছে, আর বাহিরে দেখিলাম আর একজন চোখের জলে বিভোর। সত্যই কাল খুব কাঁদিয়াছি, অনেকদিন এমন কাঁদি নাই। জীবন যে আমার কান্নায় ভরা। যখন-তখন কান্না আত্মপ্রকাশ করে। এ কান্নার কি বিরাম নাই ? গৌর গোপাল, নিতাইগোপাল, তোমাকেই তো ধরার ধূলিতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই, করিতে চাই। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে তুমিই তো বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিয়াছিলে এখানে কাজ আছে বলিয়া। কি কাজ তোমার করিতে পারিলাম ?···

২৫শে জানুয়ারী

সকালে...আফিসে যাই। রেণু র‍্যাপারগুলি ঠিক করে। আমি ১১টায় পর ফিরি। আবার ২।০টায় যাই। ২টার পর ৩৫০ পত্রিকা মুটে দিয়ে যায়, ৫টার পরে ৩৫০, বাকী ৩০০ কাল সকালে দিবে।··· রেণুর আজ ১৬০০৲ টাকার কিছু বেশীর প্রাপ্তিযোগ ঘটে। রেণুদের ঢাকায় বাগিচা বিক্রয়ের transaction আজ হইয়া গেল। উহা ৭ ভাগ হইবে, মা, ৪ ভাই ও ২ বোন। রেণুও এক ভাগ ৮ শত টাকার কিছু বেশী পাইবে। পবিত্রের টাকাটা সে রেণুকে দিল কোনও জায়গা কিনিবার জন্য শিশু-প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে।···পিতার সেবা পবিত্র এইভাবে করিল! রেণু যদি যোলশত টাকার উপর পায়, তবে আরও কিছু যোগ করিয়া একটা জায়গা কিনিতে পারিবে, যেখানে আমার এই দেহটির শেষ শয্যা হইতে পারিবে। ঠাকুর অভাবিতভাবে ঐ টাকা দিলেন। ঠাকুরের এই দান রেণুকে সামনের দিকেই

লইয়া যাউক। টাকা মানুষের বন্ধন হয় যখন উহা মানুষকে স্থিতি দান করে, গতিপথের সহায়ক না হয়। মাখনবাবুর দান, অন্যান্য ভাইবোনদের দান, হেমাঙ্গবাবুর দান সবই তো আগাইয়া নিবার জন্য সামনের দিক হইতে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। কোথায় স্থিতি? আগাইয়া যাও, আগাইয়া যাও। সন্ধ্যার কিছু পরে বিরজা আসে।...অনেকক্ষণ কথা হয়। পুরুষ-নিরপেক্ষ একটা সত্তা যে মেয়েদের আছে, পুরুষোত্তম না পাইলে যে সেই সত্তা অবলম্বনে আগাইয়া যাইবার অধিকার মেয়েদের আছে, তাহা রাধা-জীবনে প্রথম বিশ্ব দেখিয়াছে। ৮৷৹টার আশ্রমে ফিরি।...অশ্বিনীকুমারের জন্মদিন উপলক্ষে শ্যামবাজারের কিছু দূরে 'বাউই' কলোনীতে উৎসবের নিমন্ত্রণ জন্য আজ ২টী ভদ্রলোক, ১জন সুধীর দাসের ভাইরা স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক, আসেন। ২দিন পূর্বে মাখন খবর আনিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে সভায় যোগদানের জন্যও নিমন্ত্রণ আছে।···

২৬শে জানুয়ারী

৮টার পূর্ব্বে আফিসে যাই···।...। মনে হইতেছিল, পুরুষোত্তমানন্দ, তোর জীবনের টানে, তোর সাধনার টানে যদি কখনও কোনও টাকা আসে, তাহা আসে, তবে তাহাই হইবে সত্য তোর। তোর জায়গায়ই তুই মরিস। সন্তানের টাকা তোর কাজে লাগে নাই। তোর জন্য কেহ কিছু করিতে পারিবে না। তুই যা'হা পারিলি তাহাই সত্য। দুঃখ কি? ঠাকুর আমার বলেন ইহাই আমার গর্ব। নীলু হয়ত আসিল না। বেশ, তবুও তো চলিব। আমার যে চলা ছাড়া উপায় নাই। কাহাকেও তো আঘাত করি নাই। যতটা পারিয়াছি পাশ কাটাইয়া আগাইয়া গিয়াছি।···বীরেনবাবু এখান হইয়া ৩টার পর আফিসে যান। তাঁহার বক্তৃতা (শনিবার, শনিবার) সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি বেশ প্রেরণা পান। আমার লেখা হইতেই বলেন। আমাদের কথা যে চলে, তাহা তিনি বুঝিতেছেন। পত্রিকা আজও ছাপার যোড়া হইল না। নানা বাধা। প্রতিবার একরূপ ভাব আছে।

২৭শে জানুয়ারী

বেশ সকালেই আফিসে যাই। সেখানেই মুড়-খই খাই। সমস্ত গ্রাহক ও কমপ্লিমেন্টারী ৮টার পর বেণু রিক্সায় দিয়া আসে। নীলুর ১টা মনিঅর্ডারে ৫ জনের ২০৲ টাকা আসে···হেমাঙ্গবাবু ১টার পর আসেন।···যদি বেণুর অভিভাবকগণ ঐ টাকাটা কিংবা উহা দ্বারা ক্রীত জায়গাকে পাবলিক প্রপার্টি হিসাবে দিতে পারে, তবেই উহা নেওয়া যাইতে পারিবে এবং আমরা সেখানে যাইতে পারিব।···আবেষ্টন বাদ দিয়া সে কিছু নয়, তাহাকে পাইতে হইলে যে আবেষ্টনশুদ্ধ পাইতে হইবে—ইহাই ছিল ঐ লেখাটির তাৎপর্য।···সন্ধ্যার পর গৌর সাহা যতীশ দাশগুপ্ত, শান্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুধাংশু আসে।...

২৮শে জানুয়ারী

···আবেষ্টনকে মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মের উপাসনা এতদি চলিয়াছিল। আবেষ্টন মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। তাই আবেষ্টনে সঙ্গের ব্যবহার কমাইয়া কমাইয়া ব্রহ্মে পৌঁছিবার সাধনা এতদিন ছিল। কিন্তু আবেষ্টনও যে ব্রহ্মকে সৃষ্টি করে শুধু ব্রহ্মই আবেষ্টন সৃষ্টি করেন বলিয়া প্রতিভাত হয় না তাহা আজ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আবেষ্টন ও জ পরস্পরকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। আবেষ্টন সহি ব্রহ্মই পুরুষোত্তম। তাঁহাকে পাইতে হইলে সাধককে আবেষ্টন সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিতে হইবে। জগৎ+নাথ= জগন্নাথ। নাথের আবেষ্টনই তো জগৎ। আবে আবেষ্টন ছাড়িয়া নাথ পাইব, পরে আবার আবেষ্টনে সঙ্গে নাথকে পাইব, তাহা হয় না। বুদ্ধির ক্ষেত্রেই হ নাথ, নয় তো আবেষ্টন এইরূপ হইয়া গিয়াছে। সো জন্যই প্রত্যক্ষ কোনও মানুষের সঙ্গে বুদ্ধিযোগের সাধন অভ্যাস করিতে করিতে কখনও নাথকে ধরিয়া deductively, কখনও বা জগৎকে ধরিয়া inductively এ দ্বিমুখী সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে।

ক্রমশ

রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ

['বরিশাল হিতৈষী' হইতে]

॥ শ্রীদুর্গামোহন সেন ॥

সম্পাদকীয় মন্তব্য : বরিশালের রাজনৈতিক অবস্থা। ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩০।

দুরারোগ্য ব্যাধিক্লিষ্ট অশ্বিনীকুমার আজ বরিশাল ত্যাগী। তাঁহার দল সাময়িক কর্মীগণ আজ কর্মক্ষেত্র হইতে পূর্ণ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্য যুগে যে একদল কর্মী আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহারাও অকালে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বরিশাল আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আর দেশের ও দশের কথা ভাবিতে প্রস্তুত হন নাই। সহসা আসিল অসহযোগ আন্দোলন। সে আন্দোলনের ফলে যাহারা এতকাল নিজ ব্যবসায় বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে অবসর মত দেশের কার্য করিতেন, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইতে হইল, কারণ ২৪ ঘন্টা রাজনীতি বা অসহযোগ কথা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তখন একদল তরুণ যুবক কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক গ্র্যাজুয়েট, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট; নূতন উকিল প্রভৃতি ছিলেন। এতৎব্যতীত বহুকর্মী আন্দোলনে যোগদান করিলেন। এই সময় বরিশাল কনফারেন্স উপস্থিত হইল। আবাল-বৃদ্ধের দল ও তরুণের দলে প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত হরনাথ ঘোষ, তারিণী কুমার গুপ্ত, শরৎ চন্দ্র গুহ প্রভৃতি বিষয় নির্বাচন কমিটিতে নির্বাচিত হইতে পারিলেন না। স্বেচ্ছাসেবকগণের ভোটে কয়েকটি যুবক মেম্বার হইলেন। এই কন্ফারেন্সে সর্বপ্রথমে শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ বাঙ্গালার সমগ্র প্রতিনিধি মণ্ডলীর সমক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেই শরৎকুমারকে পুরোভাগে লইয়া—বরিশাল অসহযোগ আন্দোলন স্বীয় প্রাচীন গৌরব অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করেন, অথবা বৃদ্ধি করিতে থাকেন। এই সময় হইতে নব কর্মীগণের মধ্যে শিক্ষিতদল শরৎবাবুর গৌরবে ঈর্ষান্বিত হইতে থাকে—তাহারা বাহ্যতঃ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করিতে থাকিলেও সুযোগ পাইলেই তাঁহার নিন্দা করিত। চট্টগ্রামে, গয়ায়, যশোহরে এমন কি বরিশাল সভার পশ্চাতে তাঁহার নিন্দা ও কার্যের বাধা প্রদান করা হইয়াছে। তারপর আসিল ধূমকেতুর ন্যায় স্বরাজ্য-পার্টি। কুক্ষণে স্বরাজ্য-পার্টি বরিশালে আগমন করিল। তখন ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া বরিশালকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা গয়া কংগ্রেসের পর হইতেই নানা প্রকার অজুহাতে সরিয়া পড়িতেছিল—তাহারা সহসা সমারোহে হইয়া উঠিল—যাহারা কোনদিন কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নহেন—ব্যবসায় বুদ্ধি ব্যতীত অপর বুদ্ধির দ্বারা কোন দিন পরিচালিত হন নাই, কোনদিন একটি সভা করেন নাই, একটি পয়সা আদায় করেন নাই—একবার গ্রামে যান নাই, একজন গরীবের সহিত কথা বলেন নাই—অথচ মহাত্মা আসিবার সময় যাহারা তাঁহার গাড়ীর উপরে চড়িয়া বসিলেন—ঘন্টায় নব্বই টাকা ভাড়া ব্যয় করিয়াছেন—যাহারা ধনী ও শিক্ষিত যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাকুরী ব্যবসায় করিতে হয় না—অথবা যাহারা পরের ধনে ও পরিশ্রমে ব্যবসায় করেন তাহারা ইচ্ছা করিলে যথেষ্ট দেশের কাজ করিতে পারেন…কিন্তু প্রায় তিনমাস অতীত হইল জিলা কংগ্রেস কার্য বন্ধ হইল, সভা নাই, সমিতি নাই, চরকা খদ্দরের প্রচার নাই—উৎসব বাড়ী হইতে অর্থ সংগ্রহ নাই…,

কংগ্রেস বিদায় : ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩০

বাখরগঞ্জ জিলা কংগ্রেস কমিটী সেদিন ঘরে বসিয়া রাজা উজির পাত্র, মিত্র সাজিয়াছেন—শরৎকুমার ঘোষ

অতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী দুর্গামোহন সেন প্রভৃতি ১৪৭ জনের বিরুদ্ধে নিন্দা সূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। অপর দিকে গ্রাম্য কমিটী সমূহ ইহাতে ক্ষুব্ধিত হইয়া জিলা কংগ্রেস কমিটীর নিন্দাসূচক মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন—এখন কমিটীতে কমিটীতে মারামারি। গ্রাম্য কমিটী যখন জিলা কমিটীর সমালোচনা করেন তখনই একটা বিভ্রম সৃষ্টি হয়!

কংগ্রেস রূপাতলী

আগুন জ্বলিল : জিলা কংগ্রেসের কার্য্যের প্রতিবাদ

(বিগত ১২ই আগস্ট)

রূপাতলী কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে রূপাতলী সাগরদী প্রভৃতি গ্রাম সমূহের অধিবাসীবৃন্দ এক মহতী সভার অধিবেশন করেন, সেই কমিটীর কোষাধ্যক্ষ শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত সুরেশচন্দ্র মুখোটী মহাশয়ের বক্তৃতায় বরিশাল কংগ্রেস কার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করেন, এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১ম—কংগ্রেস প্রাণ দেশপূজ্য শরৎকুমার ঘোষ প্রমুখ ১৪৭ জন কংগ্রেস সভ্য ন্যায় ও নীতি রক্ষার জন্য সত্য প্রচার করিয়াছেন, তদুপলক্ষে গত ২০শে শ্রাবণ মুষ্টিমেয় কংগ্রেস সভ্যের উপস্থিতিতে তথাকথিত জেনারেল মিটিংএর নামে সভাপতি সমর্থনে শ্রীযুত শিবরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয় যে ঘৃণিত প্রস্তাব উক্ত সভায় গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছে, রূপাতলী, সাগরদী, জাগুয়া প্রভৃতি গ্রামের এই জনসাধারণ সভা তাহার আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ প্রস্তাব ও সভাপতির মন্তব্যের প্রতি তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন। এই সভা জিলা কংগ্রেস কমিটীর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের অর্থ ও ক্ষমতার যে অপব্যবহার করিয়াছেন তাহা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সুরেশচন্দ্র মুখোটী
সমর্থক—কালীমোহন সমদ্দার।

২য় প্রস্তাব—রূপাতলী, জাগুয়া, সাগরদী প্রভৃতি গ্রামের এই জনসাধারণ সভা দেশপ্রাণ শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রতি তাহাদের অবিচলিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ তাঁহারই নেতৃত্বে পরিচালিত হইবার জন্য তাঁহাকে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছে।

প্রস্তাবক—সুরেশচন্দ্র মুখোটী,
অনন্তলাল গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকান্ত সমদ্দার

৩য় প্রস্তাব—উক্ত প্রস্তাব সমূহের প্রতিলিপি সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া শ্রীযুত শরৎকুমার ঘোষ, শ্রীযুত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ সমীপে ও সংবাদ প্রেরিত হউক।

সুরেশচন্দ্র মুখোটী
সভাপতি
শ্রীশরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রূপাতলী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা

১ম প্রস্তাব—বরিশাল জিলা কংগ্রেস কমিটী ২০শে শ্রাবণের সাধারণ অধিবেশনে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রে কমিটীর সভ্য বাংলার অন্যতম মহাপ্রাণ নেতা শ্রী শরৎকুমার ঘোষ প্রমুখ ১৪৭ জন সভ্যের বিরুদ্ধে তাহাদে অসাক্ষাতে এক পক্ষের মুষ্টিমেয় সভ্য উপস্থিতির সুযোগে যে ঘৃণ্য আক্রমণ মূলক প্রস্তাব গৃহিত হইয়াছে রূপাতলী শাখা কংগ্রেস কমিটীর এই কার্য্য নির্ব্বাহক সভা উক্ত প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুত শরৎকুমার ঘো প্রমুখ নেতা ও কংগ্রেস কর্ম্মীগণের প্রতি গভীর শ্র জ্ঞাপন করিতেছে।

২য় প্রস্তাব—আইন অমান্য ব্যপদেশে যাহা কংগ্রেসে প্রস্তাবানুযায়ী সংগৃহিত অর্থের শতকরা ৫০৲ আই অমান্যের জন্য মজুত রাখার যে প্রস্তাব জিলা কংগ্রে কমিটীর কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক গৃহিত হইয়াছি শোনা যায় কমিটীর বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তাগণ সে প্রস্তা অগ্রাহ্য করিয়া অন্যান্য বাজে খরচের জন্য ঐ মজু তহবিলের অর্থব্যয় করিতেছেন।...দুঃখের সহিত নির্দ্ধার করিতেছেন যে ঐ মজুত তহবিলের টাকা যেন কংগ্রে সভ্যগণ সাধারণ সভার অনুমতি ব্যতীত ব্যয় না হয়।

ক্রম

সাময়িকী

অস্পৃশ্যতাঃ—১৯৬৩ সালের ১২শে মে তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিতেছেন, 'At the Seventeenth annual session of the Bharatiya Depressed Classes League at Bharatpur, Mr Lal Bahadur Shastri hit right nail on head when he observed that untouchability to the extent it existed in the country to-day, was more an economic than a religious problem. The remedy, therefore, lies more in the improvement of the economic condition of the Harijans than in efforts to remove religious prejudices by persuation or legal measures'।

'To-day' বলিতে শাস্ত্রী মহাশয় কি বুঝাইয়াছেন বলিতে পারি না—কিন্তু অধুনাতম কালে যিনি এই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, সেই মহাত্মাগান্ধী তাঁহার 'গঠনকর্মপদ্ধতি' নামক পুস্তিকা রচনা কালে ১৯৪১ সনে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে লিখিতেছেন, 'আজিকার দিনে হিন্দুধর্মের এই কলঙ্ক দূর করার কথা বেশী করিয়া বলা অনাবশ্যক। কংগ্রেসীরা এই দিকে অনেক কিছু করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে এ-কথা বলিতে হইতেছে যে, অনেক কংগ্রেসী এই ব্যাপারকে নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টি হইতে আবশ্যক বস্তু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহা যে হিন্দুদের পক্ষে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য অপরিহার্যভাবে আবশ্যক এ ধারণা অনেকে রাখেন না। যদি হিন্দু কংগ্রেসীরা অস্পৃশ্যতা বর্জন উহার নিজস্ব আবশ্যকতার জন্যই মানেন, তবে তাঁহারা তথাকথিত 'সনাতনী'দিগকে আজকার- অপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাবিত করিতে পারিবেন'।

অস্পৃশ্যতা বা জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থায় কতখানি ধর্মীয় ব্যাপার আরও একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। লোকমান্য তিলকের জীবনী লিখিতে গিয়া (কিশোরদের জন্য) শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা লিখিতেছেন, 'এই সময়ে এমন একটা ঘটনা পুণা শহরে ঘটেছিল, যা থেকে তখনকার সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা যে-কেউ করতে পারবেন। একবার রানাডে, তিলক, গোখেল এবং আরও [illegible] জন গণ্যমান্য লোক এক খ্রীষ্টান মিশনারীর বাড়ীতে চা পান করেছিলেন। এই অপরাধে দক্ষিণ ভারতের তৎকালীন ধর্মগুরু শ্রীশংকরাচার্যের দরবারে তাঁদের বিচার হয়। তিলকের ত' কথাই নেই, রানাডে বা গোখেলের মত ইংরেজ-বন্ধুদেরও এমন সাহস হয় নি যে ধর্মগুরু শ্রীশংকরাচার্যের ধর্মীয় আদালতকে অগ্রাহ্য করেন।···অপরাধীরা সবাই একটা প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজচ্যুতির আশঙ্কা থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। রানাডে গোখেল তিলক—সবাইকেই তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এইভাবে ধর্মীয় আদালতের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার দরুণ।'

এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৮৯০ মত সময়ে, গান্ধীজী গঠন কর্মপদ্ধতি লিখিয়াছেন ১৯৪১-এ। পঞ্চাশ বৎসরে যে ঘটনাটার ধর্মীয় রূপ বদলায় নাই, ১৯৪২ হইতে ১৯৬২-র পরবর্তী কুড়ি বৎসরেও তাহার রূপ খুব বেশী এমন কিছু বদলায় নাই। পরিবর্তনের গতিবেগ যত বেশীই হউক না কেন যাহাতে বলা সম্ভব যে, অস্পৃশ্যতা আজ যে-রূপে আছে তাহাতে ইহা যতখানি ধর্মীয় ব্যাপার, তাহা অপেক্ষা বেশী অর্থনৈতিক ব্যাপার। আসলে সমস্যাটা মূলতঃ ধর্মীয় চেতনা-জাত। সে কথা যখন সত্য, তখন যতক্ষণ সমস্যাটা আছে ততক্ষণ তাহা কোনদিনই মুখ্যতঃ তাহার স্বরূপ হারায় না, আর তাহাকে দূরীকরণের

উপায় সম্বন্ধেও সে কথা মনে রাখা দরকার। অস্পৃশ্যতার মূল যে ভারতবাসীর জীবন-চেতনায় প্রধান প্রযোজক ধর্মীয় চেতনা উদ্ভূত—এ সত্য কথাটা আমাদের অনেকেরই জানা নাই, দেখিতেছি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যেও এ সত্য উপলব্ধ হয় নাই। আবার অনেকেই যেমন মনে করেন যে অস্পৃশ্যতা আজ আর নাই, সে মনোবৃত্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই একেবারে বিলুপ্ত হইবে, দেখিতেছি নেতৃস্থানীয়দের মনোভাবের মধ্যেও এ ধারণা রহিয়াছে। গান্ধীজী গঠনকর্মপদ্ধতিতে লিখিয়াছেন তখনকার কর্মীরা অস্পৃশ্যতাকে একটা রাজনৈতিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন, হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্যই যে অস্পৃশ্যতা দূর করা দরকার ইহা বুঝিতেন না। এখনও দেখিতেছি বর্তমানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মনে করিতেছেন যে ইহা অর্থনৈতিক ব্যাপার, হিন্দুধর্মের সহিত আর ইহার তেমন কোন সম্পর্ক নাই। আরও একটা কথা এই যে, আমাদের দেশের জাতিভেদ প্রথা যেমন লজ্জাকর, তেমনি এ শুধু আমাদের দেশেই যে আছে এ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশেও কোন-না-কোন রকমের ভেদ বিভেদসূচক মনোবৃত্তি আজ পর্যন্তও রহিয়াছে—অতএব আমাদের একা খুব বেশী লজ্জিত হইবার কারণ নাই—এমনও অনেকে মনে করিয়া থাকেন। ইহাও যেমন অবৈজ্ঞানিক তেমনি হীন-মনোভাব-মূলক কথা। আমরা এরূপ মনোবৃত্তিকে একেবারেই স্বাস্থ্যকর বলিয়া মনে করি না।

যাহাহউক, যে কথা বলিতেছিলাম—আমরা বলিতে চাই অস্পৃশ্যতা ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমীয় চিন্তাধারার ফল, তাই ইহা ভারতবর্ষের ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং আজও বর্ণাশ্রমীয় ধার্মিকদের মধ্যে ইহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত।

অস্পৃশ্যতা যে আজও অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে, তাহার প্রমাণ যে দিতে হয়, ইহাই আশ্চর্য। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে আজও বহু ধর্ম-প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে খুব নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের ভেদবোধ এবং বর্ণাশ্রমীয় চিন্তাধারা রক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার শিষ্য আছে, তাহারা ব্যবহারিক জীবনে যদি অস্পৃশ্যাচরণ কিছু করেও, তথাপি এই ভেদবাদের চিন্তাধারাই যে চিরন্তন সত্য একথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে এবং দৈনন্দিন জীবনের অস্পৃশ্যাচরণকে 'উপায় নাই অতএব' বলিয়াই শান্তি লাভ করে। আর কোনো ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নাই এমন বহু বহু শিক্ষিত মানুষও অন্তরে অন্তরে উহাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া বাহিরে বর্তমান কালানুযায়ী চলে। ইহারও পরের কথা হইতেছে অস্পৃশ্যতার ভেদবাদ যে-পরিমাণ আজ সমাজ-জীবনে নাই বলিয়া মনে হইতেছে তাহা ইহার স্রষ্টা ধর্মীয় ক্ষেত্র হইতে শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা তো দূরীকৃত হয় নাই। বহু বহু বৎসর আগে ধর্মশাস্ত্রের যে ব্যাখ্যানুযায়ী এই অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, সে ব্যাখ্যা বদলাইয়া সমাজ-জীবনের কাছে তো উপস্থিত করা হয় নাই, যাহারই ফলে এই পরিবর্তিত ব্যবহার দেখা যাইতেছে? যে পরিবর্তন আসিয়াছে, তাহা আসিয়াছে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এবং সেই দৃষ্টিকোণ হইতে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের সহায়তায়। আজ যে মোটামুটি-ভাবে রাস্তাঘাটে ছোঁয়ায়াতে ইহার আতিশয্য দেখা যাইতেছে না, তাহার কারণ স্বাধীন বিধান এবং একদলের নিকট ইহা যে স্বরূপতঃ ক্ষতিকর তাহার স্বীকৃতি কিন্তু দেশের একটা মোটা অংশই অস্পৃশ্যতার ভেদবাদের অসৌন্দর্য ও মানুষের মনুষ্যত্বের এ কত বড় ক্ষতিকর, তাহা জানেও না, বিশ্বাসও করে না। তাই ইহাকে মূল হইতে উৎপাটিত করিতে হইলে কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন দ্বারা কিছুই হইবে না, আবার রাজনৈতিক প্রকারের দ্বারাও ইহার কিছু পরিবর্তন বা পরিশুদ্ধ করা যাইবে না। এই উন্নয়নেরই সাথে সাথে সব চাইতে যাহা বেশী প্রয়োজন তাহা হইতেছে যে চিন্তাধারার ফলে এই ভেদবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই চিন্তাধারার মূলের পরিবর্তন।

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল ব্রাহ্মণত্ব বা সাত্ত্বিকতাকেই শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া। একমাত্র সাত্ত্বিকতা

যাহাই শ্রীভগবান লক্ষ্য ইহাই আমরা মুখস্থ করিয়াছি হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত। তাই তমোগুণকে, তমোগুণের বাহককে আমরা চূড়ান্তভাবে ঘৃণা করিয়াছি, তাই স্বাভাবিকভাবেই তমোগুণের কাজ করে যাহারা তাহাদিগকেও ঘৃণা করিয়াছি, তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি। অথচ এ কথা কোনোদিন ভাবিয়া দেখি নাই যে, মুচি মেথর ডোম চাড়াল ভূঁইমালী নমঃশূদ্র প্রভৃতি যাহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহারা যে কাজগুলি করে সে কাজগুলি না করিলে কি আমরা বাঁচিতাম? কিংবা আমরা কি সে কাজগুলি তাহারা না করিলে নিজেরাই করিয়া নিতে পারিতাম? যাহা নিজেরা পারি না, অন্যে না করিয়া দিলে যেখানে জীবন-ধারণই দুর্বিষহ হইয়া মৃত্যু আনিবে, সেখানে সেই কাজ যে করিয়া দিল তাহাকে পরম বান্ধব বলিয়া না দেখিয়া তাহাকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিলাম, আমার খাবার ঘরে ঠাকুর ঘরে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিলাম? মানুষ কি নিষ্ঠুর, আর কি নিমকহারাম! কেবল নিজেদের দিক হইতেই চিন্তা করিয়াছিলাম, অপরের দৃষ্টিকোণকে একেবারেই ভাবিয়া দেখি নাই বলিয়াই এমন লজ্জাজনক চিন্তার দৈন্য জাতির মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া জাতিকে এমন পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছিল—যাহারই ফল স্বরূপ সমাজ-জীবনে পঙ্গুতা, রাষ্ট্র-জীবনে পাকিস্থান-সৃষ্টি। মানুষের দিক হইতে যেমন ভাবিয়া দেখি নাই, তেমনি গুণের গুণের দিক হইতেও ভাবিয়া দেখি নাই। নিদ্রা তমোগুণ—অতএব নিন্দনীয়। কিন্তু রাত্রের নিদ্রাটুকু না হইলে দিনের সাত্ত্বিকতা রক্ষা করা যাইবে কি? জীবনের পক্ষে নিদ্রার যে নিজস্ব প্রয়োজনীয়তাটুকু আছে তাহার উপযুক্ত মূল্য ও মর্যাদা না দিয়া তাহাকে যে নিন্দনীয় করিয়া রাখিলাম, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমরা অপর মানুষ বা অপর গুণ বা বস্তুর যথোপযুক্ত মূল্য ও মর্যাদা দিতে জানি না, অথচ তাহার সেবাটুকু পূর্ণ মাত্রায়ই গ্রহণ করিতে পারি! আমাদের ভাবনাই খুব ক্ষুদ্র-পরিসর, মোটেই তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন নয়, আর আমরা চূড়ান্তভাবে হৃদয়হীনও। যাহাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের উপর আমাদের অস্তিত্ব, তাহাদের অস্পৃশ্য করিয়া, অমানুষ বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে আমাদের একটুকু অসুবিধা হয় না আমাদের হৃদয়ের বিচার এতই সামান্য! আমরা শাস্ত্রের দোহাই দেই! যে শাস্ত্র মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করে না, যে শাস্ত্র মানুষকে অপমান করিয়া ছোট বলিয়া দূরে সরাইয়া দিতে পারে, তাহার মস্ত জন্মোচিত সুস্থ জীবন বিকাশের অন্তরায়ের সৃষ্টি করে, সে কি সত্যিকারের শাস্ত্র? এ তো চূড়ান্ত ও নিপুণ একটা শোষণ যন্ত্র মাত্র। ধর্মের নামে এই শোষণ ব্যবস্থাদ্বারা শোষিতের অবস্থা যাহা করিয়া তোলা হয় তাহাতে তাহার বর্তমান জীবন যাপন দুর্বিষহ হইয়া উঠে, তাহার পরকালের কথা আমরা ভাবি না। পাকিস্তান বিনা কারণে সৃষ্টি হয় নাই—ধর্মের নামে মানুষকে অপমান করার যে সুনিপুণ ব্যবস্থা ছিল, তাহারই চোরাবালির ফাটলে পাকিস্তানের জন্ম।

আমরা শাস্ত্রের দোহাই দেই—কিন্তু বুদ্ধির নাম দিয়া শোষণের এই যন্ত্র যে শাস্ত্রকারেরা বানাইয়াছিলেন, তাহারা স্পষ্টতঃ হৃদয় নামক বস্তুটি হইতে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু যুগে যুগে যে সকল মহাপুরুষ বা অবতার ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা মানুষের মধ্যে হৃদয়ের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, মানুষ মাত্রকেই ভালবাসিয়া গিয়াছেন। কবীর, বুদ্ধ, নানক, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ মানুষকে ভালবাসিবার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধির শাণিত ছুরি চালাইয়া যে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা রচিত হইয়া সমাজ-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে মূলতঃ বদলাইয়া না লইবার জন্য অবতারগণের প্রাণধর্ম টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। বুদ্ধির জোরবারই জয়ী হইয়াছে। এই সমস্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারগণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বাণীকেও নিজেদের পছন্দমত করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'গুণকর্মবিভাগশঃ' বর্ণ-বিভাগই করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ণ-কৌলীন্য তিনি সৃষ্টি করেন নাই, যৎ শব্দযোগে তিনি সাত্ত্বিক রাজস তামস তিনকেই বুঝাইয়া ছিলেন—

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ।'

শ্রীকৃষ্ণ কোথাও বলেন নাই যে সাত্ত্বিকতাই শ্রেষ্ঠ বা তামসিকতা নিকৃষ্ট. তিনি বলিয়াছেন যাহা কিছু কর, যাহা কিছু হোম কর, দান কর, তপস্যা কর অর্থাৎ যাহা কিছু কর তাহা আমাকে অর্পণ করিয়া করিও তিনি সাত্ত্বিক রাজস তামস কিছুই বলেন নাই। তিনি যদি সাত্ত্বিকতাকে এবং সাত্ত্বিক কর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিতেন, তাহা হইলে অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য আঠার অধ্যায়ী গীতা বলিতেন না, রাজসূয় যজ্ঞে নিজেও সকলের পা ধোয়ার কাজ লইতেন না। তাঁহার বক্তব্য এই যে গুণ কর্ম বৃত্তি হিসাবে কোনটাই কোনটা হইতে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নয়, প্রত্যেকেরই যাহার যথা স্থানে অনন্য প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু কেহই একান্ত সার্থক নয়, একটা সমগ্রের মধ্যে প্রত্যেকে বিধৃত, অথচ প্রত্যেকের একটা স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যও আছে—independent at the same time interdependent,—each cell must live for itself as well for the whole organism—ইহাই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কর্মবিভাগের তাৎপর্য—এবং ইহাই তাঁহার রাসলীলার মর্মার্থ। একে অন্যের কণ্ঠগৃহীত অথচ প্রত্যেকের পার্শ্বেই শ্রীকৃষ্ণ। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাও হইবে এই রূপ—গুণ সম্বন্ধেও তাহাই। প্রতিটী গুণ স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ আবার অন্যের প্রতি অপেক্ষমান হইয়া কণ্ঠগৃহীত এবং তাহাদেরই জীবন এমন মধুরে কঠিনে স্বচ্ছন্দ-গতি।

শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার 'জাতিদর্পণ বা নিত্য-ধর্ম' গ্রন্থে প্রায় আশি বৎসর পূর্বে নানারকমভাবে এই জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, 'জগতের সকল লোকই এক মানব জাতির অন্তর্গত। সেই মানবজাতির অন্তর্গত কোন লোককে তুমি অমানব বলিলে তিনি অমানব হইবেন না'; 'জন্মানুসারে জাতি-নির্ণয় হইতে পারে। গুণকর্মানুসারে জাতি-নির্ণয় হইতে পারে; পরম জ্ঞানদ্বারা জাতি-নির্ণয় হইতে পারে। সৎক্রিয়াদ্বারা জাতি-নির্ণয় হইতে পারে। নিকৃষ্ট জাতি জ্ঞানলাভদ্বারায় উৎকৃষ্ট জাতি হইতে পারে। নিকৃষ্ট জাতি সদ্ভক্তিলাভদ্বারা উৎকৃষ্ট জাতি হইতে পারে। অসাধু সাধুতালাভে সাধু হইতে পারে। মূর্খসকল পাণ্ডিত্যলাভদ্বারা পণ্ডিত হইতে পারে'; 'চারি বর্ণই ব্রহ্মপুত্র, চারি বর্ণেরই ব্রহ্ম-গোত্র, চারি বর্ণই ব্রহ্মবংশীয়, চারি বর্ণই ব্রহ্মার অংশী, চারি বর্ণই সেই ব্রহ্মার আত্মজ। অতএব আমাদের বিবেচনায় চারি বর্ণের মধ্যে কেহই শ্রেষ্ঠ নহে, কেহই অশ্রেষ্ঠ নহে। চারি বর্ণের কারণ অন্বেষণ করিলে চারি বর্ণেরই এক কারণ বলিয়া চারি বর্ণই, একেরই চারি প্রকার বিকাশ বলিয়া চারিবর্ণই এক বর্ণ, চারিবর্ণই এক জাতি। যেহেতু চারি] বর্ণই একের অঙ্গজাত, সেই জন্য চারি বর্ণেরই এক জাতি। তবে জাতীয় বিদ্বেষ কেন? এই ত শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে চারি প্রকার জাতির এক-প্রকারতা প্রদর্শনপূর্বক জাতি-সম্বন্ধ কথা হইল'; 'সকল আম্রবৃক্ষই এক প্রকার। কিন্তু সকল গুলিরই ফলের এক প্রকার আস্বাদন নহে। সকল মনুষ্যই এক প্রকার। কিন্তু গুণকর্মানুসারে সকলেই এক প্রকার নহে। তাঁহাদের মধ্যে গুণকর্ম অনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য এবং কেহ বা শূদ্র'; '...ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র একই ব্রহ্মার কায়াই চারি প্রকার হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হয়েন। সেইজন্য ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়তা, বৈশ্যতা এবং শূদ্রতা আছে। সেইজন্য ক্ষত্রিয়েতেও ব্রাহ্মণতা, বৈশ্যতা এবং শূদ্রতা আছে; সেইজন্য বৈশ্যেতেও ব্রাহ্মণতা, ক্ষত্রিয়তা এবং শূদ্রতা আছে। সেইজন্য শূদ্রেতেও ব্রাহ্মণতা, ক্ষত্রিয়তা এবং বৈশ্যতা আছে। সেইজন্যই বলি ব্রাহ্মণও সর্ববর্ণ, সেইজন্যই বলি শূদ্রও সর্ববর্ণ'; 'ভবিষ্যতে জগতে সমস্ত জাতি এক জাতি হইবে। সমস্ত জাতি এক ধর্ম মানিবে। তখন ধর্ম সম্বন্ধে কাহারো প্রতি কাহারো বিদ্বেষ থাকিবে না।"

শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার চিন্তা ও যুক্তি-শক্তির অপূর্ব আধুনিকতাবোধদ্বারা তাঁহার ৬৬০ পৃষ্ঠার জাতি দর্পণ গ্রন্থে জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে কাহাকেও আঘাত করাও হয় নাই, আবার কোন ক্ষুদ্র সংস্কারকেও মানা হয় নাই। বিরাট ব্রহ্ম-বোধের মূল সত্যের উপর দাঁড়াইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের ঐক্যে বিশ-

নাগরিক হওয়াকেই তিনি প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন সেই প্রায় আশি বৎসর পূর্বে। আবার এই অস্পৃশ্যতা-বোধটা যে ধর্মগত চেতনা হইতে জাত, সে সম্বন্ধেও তিনি স্পষ্ট ও পরিষ্কার—তাই প্রকৃত শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারাই সমস্ত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা চিন্তাশীল ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এই আলোচনা সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল হইতে অনুরোধ করি এবং সমস্যাটার দূরীকরণ ব্যাপারে এই ব্যাপকতম একটি মুক্ত চিন্তাধারা মানুষের নিকট উপস্থিত করিতে বলি। কেবল রাষ্ট্রীয় চাপ অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান দ্বারাই এ সমস্যার সমাধান করা যে যাইবে না—সে সম্বন্ধে সচেতন হইতে অনুরোধ করি। শ্রীনিত্যগোপালের চিন্তাধারার মধ্যে যে একটা বলিষ্ঠ আশাবাদ পাওয়া যায়, তাহা অনন্যসাধারণ—ভবিষ্যতে সব জাতি এক জাতি হইবে, তখন বর্ণ সম্বন্ধে কাহারো প্রতি কাহারো কোন বিদ্বেষ থাকিবে না। কী গভীর সান্ত্বনার কথা—সংসারে মানুষ মানুষ হিসাবে বাস করিবে—গুণকর্ম তাহার যাহা-ই থাকুক না কেন। শক্তির—যে কোন বিষয়েরই শক্তি, তাহা ধর্ম, অর্থ, বিদ্যা, কুল, গুণ, কর্ম বা যাহা কিছু—ধর্মই এই যে, তাহা অপরের শোষণের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্যই তাহার রূপ এত কুৎসিৎ। কিন্তু মানুষ সর্বোপরি মানুষ—তাহার ধর্ম জাতি গুণ কর্ম পাণ্ডিত্য যাহা কিছু যাহা-ই হউক না কেন—এ বোধ আসিলে, সকলে এক-জাতি বোধ করিতে পারিলে, কাহারো প্রতি কাহারো বিদ্বেষ না থাকিলে—এ পৃথিবীর মধু-আস্বাদন সকলের জন্যই হইবে—সে সুন্দর দিন অবশ্যই একদিন আসিবে। শ্রীনিত্যগোপাল রাষ্ট্রনেতা নন, অর্থনৈতিক পণ্ডিত নন, কিন্তু সমস্ত মানুষের সমান সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যতাবাদের সমস্যায় যে রকম approach হওয়া দরকার, তাহাই পৌঁছাইয়া দিয়া তিনি সকলেরই চিরদিনের নমস্য।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নয়নারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইন্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

বিদেশে আমাদের বড়ো দশজন খরিদ্দার

ভারতীয় বাটা জুতো বিদেশে যেসব
জায়গায় রপ্তানী করা হয়, তাদের প্রথম
দশটির নাম: যুক্তরাজ্য, আমেরিকার
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া,
ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নাইজিরিয়া, সিয়েরা
লিওন, মরিশাস এবং সুদান।
১৯৬২ সালের জানুয়ারি থেকে
ডিসেম্বর এই দশটি দেশে
মোট ৩,৭০৬,৭০০ জোড়া জুতো
রপ্তানী করা হয়েছে।

Bata

উজ্জ্বলভারত

(মাসিক পত্র, ১৬শ বর্ষ)

উজ্জ্বলভারতের বার্ষিক মূল্য ৩৲। প্রতি সংখ্যা ·৪০ ন. প.।

মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ' মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেয়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার।

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৬"×৮"।

উজ্জ্বলভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অসংবদ্ধ সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল বিষয়ই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে একটি জীবনের সমগ্রতার ও যুগদর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

কার্যাধ্যক্ষ—উজ্জ্বলভারত
নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রামঃ বাগুইআটি
পোঃ অশ্বিনী নগর
জিঃ ২৪ পরগণা

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.			
শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·০০
সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.			
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,			
বিদ্যাসাগর	২·২৫	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ** ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী ঃ ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। ॥ গড়িয়াহাট মার্কেট ॥

সূচীপত্র : শ্রাবণ, ১৩৭০, ১৮৮৫

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (২১) ... ১৬৯
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রবর

২। বাইশে শ্রাবণ ... ১৭২
শ্রীজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়

৩। মরণোন্মুখ বাঙালীর বাঁচিবার পথ ... ১৭৪
শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্তী

৪। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী স্মরণে (কবিতা) ১৭৭
অধ্যাপক সুধীর গুপ্ত

৫। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী ১৩৫২ (২১) ১৭৮

৬। সাময়িকী : গুরুপূর্ণিমা
নরনারায়ণ আশ্রমদলের সংবাদ ... ১৮৬

কিরণ
মানে আলো
কিরণ
কায়েন্ড কায়েল

এজেন্টস্ :
দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোম্পানী লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • কানপুর • মাদ্রাজ

"পুরুষোত্তম cult-এ প্রত্যেক অণুটিও এক একটি কেন্দ্র—কি কথাই না তোমার গোপালবলিয়া গিয়াছেন? 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ।' এতদিন অল্পের কোন self-centered হইবার যোগ্যতা ছিল না। অল্প সার্থক অধিকের মধ্যে নিভিয়া গিয়া—এই হাইপথেসিসের—অনুমানের—উপর সব সমাজ গড়া। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু সেই মানুষও যে বৃন্দাবনে গিয়া তরুগুল্মলতাজন্ম কামনা করিবে, তাহা কে জানিত বা বিশ্বাস করিত? কৃষ্ণসখা উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়া এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। একটা hierarchy করিয়া একটিকে রাখিয়াছে সিঁড়ির উর্দ্ধ ধাপে কুলীন করিয়া, আরগুলিকে পর পর নীচে নামাইয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে কিছুদিন চলিল বেশ। কিন্তু উচ্চ স্তরের চাপে নিম্নের সবগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিল, তখনই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ছোটরা, নীচের দল, সব বড়দের, উঁচুদের সমকক্ষতার দাবী করিল। ভাগবত বলিলেন, বড় ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে পুরুষোত্তমের direct ও equal relation। গায়ত্রী জপ ও মুচির জুতাসেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটা কুলীন হইবে এবং অপরটা অকুলীন হইবে? ঘর ঝাঁট না দিলে যখন ঠাকুর-পূজাই হয় না, তখন ঠাকুরের কাছে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও পূজা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? কে কুলীন, কে অকুলীন?……যদি কৌশলপূর্বক প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সব হইতেও পুরুষোত্তম যতদূর, ক্ষুদ্রতম হইতেও পুরুষোত্তম ততদূর।……এতদিনের সাধনা সব minus-এর সাধনা, নেতি নেতি। কৃষ্ণের সাধনা positive। সবকে রাখিয়া সবকে হজম করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।……ছোটরাও যে অন্তরে অন্তরে পুরুষোত্তম, একথা তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিয়াছে।……তাই আজ নোতুন করিয়া শাস্ত্র দিতে হইবে। New Social Order, New Religious Order সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে না পুরুষোত্তম মিলিবে?……"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

উজ্জ্বলভারত

শ্রাবণ, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(২৭)

বাড়ীর ভৃত্য অহংকারী কর্মী, বাড়ীর মা নিরহংকারী কর্মী।···নিজের পছন্দমত ছাড়া যে কর্ম করতে পারে না, সে অহংকারী।···অহংকারীর অন্তরকে শুদ্ধ করতে যাওয়ার অধিকার নেই—কেননা অহংকার নিজেই অশুদ্ধ।···অহংকারীর কর্মজ্ঞানভক্তি সব টুনকো, অল্পেতেই ফুরিয়ে যায়...অগাধ জলে সঞ্চরণ করে যে রোহিত মাছ, সে বিকারী হয় না—গণ্ডূষ জলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে। ...অনন্ত কর্ম যেখানে মানুষের কর্মবিধান, সেখানে অহংকারী কর্মীর কর্ম কতটুকু?...কাজ করলেই যদি কাজ হত, তবে কষ্ট করে আর এত কথা তোমাদের বলতাম না।···শরণাগত না হলে কর্ম জ্ঞান ভক্তি কোনটারই কোন অর্থ নেই।...শ্রীনিত্যগোপালের কাজ হল না—মরতে কষ্ট হয়—তবু দেহের এ চৈতন্য থাকে, প্রাণ যায় না...।...'পাটিলাস' হয়ে পড়ে থাক—নিত্যগোপাল আশীর্বাদ করছেন—তা ধরবার মত দেহমনের অবস্থা হউক···তোমরা অগাধ জলের মাছ হও—পুঁটিমাছের মত অল্প জলে ফরফর করো না—এই ফরফরানির স্বভাবে বর্তমান যুগ গেল।···জগন্নাথ নিত্যগোপাল, আমার প্রাণনাথ..। তোমরা ব্রহ্ম-মানুষ হও।

১৩, ৭, ৫৬।···তিনদিন আগে আমি অনশন করেছিলাম—এ আমার প্রথম নয়—আগে আরও অন্ততঃ ৮।১০ বার করেছি। সব চেয়ে বড় অনশন বরিশালের অশ্বিনীকুমার হল থেকে সিনেমা উৎখাত করবার জন্য—৩১ দিন উপবাস করে ছিলাম তখন।...জাননাসিংস্কুল স্থাপনের জন্য উপবাস করেছিলাম।···উপবাস করি একটা তপস্যা হিসাবে—এটা তোমাদের জেনে রাখা ভাল। শাক্তের বলি দান এক কোপে—তাই তাদের পাঠা বলি—বৈষ্ণবের বলি-দান তিল তিল করে মৃত্যু—দুই রকমই করেছি কোনদিন জল খাই নি, জল পরি নি—তিল তিল করে নিজেকে দান করেছি বিশ্বের কাছে, নিত্যগোপালের কাছে।...কিন্তু মানুষের জীবনে যখন অন্ধকার জমাট বেঁ ওঠে, তখন বৈষ্ণবের তপস্যায় হয় না, তখন শাক্তে মত অন্ধকারে বলি দিতে হয়। এক দিনের উপবাসে যত রক্ত ক্ষয় হয় তা বলিই বটে। তিল তিল করে তপস্যা করেছি সারা জীবনই।···এখানে এসেছি যখন তখ জল ছিল না...মরুভূমির মধ্যেই এসেছিলাম।...সাহস ক এগোতে পারলেই দুর্যোগ কেটে যায়—কি রকম ক কাটবে আগে থেকে তা ভাবাও যায় না।...প্রথম যেদি দুর্ভিক্ষের বক্তৃতা দিয়েছিলাম, তার আগে ৪ দিন উপো করে অন্ন না পাওয়ার কষ্ট একটু উপলব্ধি করে নিয়েছি—অন্নহীন কত কষ্ট পাচ্ছে তার এক বিন্দু ধারণা করে নি তবে বক্তৃতা দিয়েছি।···বিনা তপস্যায় কিছু পাই নি—যতটুকু তপস্যা করেছি, ততটুকুই সংসারে আমার পাওয়া অধিকার হয়।···উপবাসের এক অর্থ শক্তি নেমে আসে—যেখানে আমার আমিত্ব নেই, সেখানে তিনি নে আসেন।...যে পথে আমি চলেছি এটা সম্পূর্ণ নূতন পথ—

নিত্যগোপালের পথ।...বাইরের জিনিষ—তেল সাবান ইত্যাদি যত কম পারি ব্যবহার করি—জীবনের তেল থাকলে বাইরের তেলের প্রয়োজন কমে যায়...। স ভগবান্‌। ইদং সর্ব্বম্‌ অনুস্যূত।...যোগ্যতা না থাকলে সংসারের সব গ্রহণ করা অর্থ চুরী করা—আমি চুরী করি নি।...যোগ্য হয়ে সংসারের যা কিছু গ্রহণ করেছি।...উপবাসের আর এক অর্থ পারিপার্শ্বিককে পবিত্র করবার প্রয়াস...মনে রেখো মরণকে আমি ভয় করি না...জগতের প্রান্তে যখন আমাকে কাটাতে হবে, তখন সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে। যখন তোমরা আমার থেকে পৃথক হয়ে যাও, তোমরা আমার উপর নির্ভর করতে পার না...তখন মানুষের পাপ নেবার জন্য উপবাস আমাকে করতেই হবে।...শিব নীলকণ্ঠ...আমিও যে বিষ সারা জীবনে পান করেছি, তা যদি ঢেলে দেই, তাহলে অনেক স্থান পুড়ে যাবে।...তোমরা বাক্যে মনে প্রাণে সংযম শেখো, আর্য্যোচিত জীবন যাপন করতে শেখো...তোমরা ছ্যাচড়া হয়ো না...তোমরা ভাগবতী বুদ্ধিসম্পন্ন হও...আমার বুদ্ধি তোমাদের শিখবার প্রয়োজন আছে...।

১৪, ৭, ৫৬।...১৩১২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ শ্রীনিত্যগোপালের কাছে দীক্ষা পাই...১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বাস করি—তখন বি, এ পড়ি।...নিত্যগোপালের স্পর্শের পরে সঙ্ঘ গড়বার একটা প্রেরণা জেগে উঠল...চিরকাল কুণো ছিলাম, এখনও তাই আছি, কিন্তু সঙ্ঘ গড়বার একটা লালসা ভেতরে ভেতরে কেমন করে গজিয়ে উঠতে থাকল ঐ চরণ-স্পর্শের পর থেকে।...প্রথমে গড়লাম (১) সত্যব্রত সমিতি—১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—১২ জন সভ্য—সবাই মিলে একটা ফটো তোলা হয়েছিল।..আদর্শ ছিল—বিষয়েষু সত্যানন্দঃ কৃষ্ট্যা হুবী ভব ভবে।...নামের ইতিহাস না-ই বা বললাম। মাঝে মাঝে বৈঠক হতো—আমিই প্রধান বক্তা। এক একদিন প্রার্থনায় এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতাম...তখনকার মনের অবস্থায় পড়াশুনা হল না...ব্যবসা আরম্ভ করলাম—খাটী কাপড়ের দোকান...ঐ অবস্থায় দোকানই কি হয়।...গেলাম বৃন্দাবন...ফিরে এসে এক বৎসর বাড়ীতে বসে রইলাম...ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করলাম...সেই সময় করলাম (২) শিব-কল্যাণ সভা। এর মধ্যে ছিল হরেন্দ্র ঘোষ, সতীশ দাশ, সুরেশ গুপ্ত, বনমালী দাশ, নির্মলা দাশ, হেমন্ত দাশগুপ্ত। এক এক জনের বাড়ীতে এক একদিন বৈঠক হত, বৈঠকের শেষে হত লুচি ভোজন—হেমন্ত দাশগুপ্তই খাওয়াত বেশী। শীতকালে নগর-কীর্ত্তন বের হত, প্রভাত ফেরীও। সেই সময় জগদীশবাবুর বাড়ী থাকতাম—রবিবারের পাঠে যোগদান করতাম...। ৮ বৎসরের মাষ্টারী ছেড়ে দিলাম ১৯১৯-এর ১-ই ফেব্রুয়ারী। কলকাতায় চলে এলাম।...গুরুভাইদের বাড়ীতে নিত্যগোপালের আলোচনা চলতে লাগল—রাখাল দাস পালের বাড়ীতে আলোচনা হত।...থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীতে বেদান্ত নিয়ে আলোচনা করবার ভার এল। হীরেন দত্তের সঙ্গে বেদান্তের একটী সূত্র নিয়ে আলোচনা হল...আমার আলোচনা শুনে তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন—একক্রমে চৌদ্দ রবিবার থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীতে বেদান্ত নিয়ে বক্তৃতা দিলাম।...(৩) কংগ্রেসে যোগদান করলাম—প্রাণ ঢেলে মানুষের কাছে স্বরাজের বাণী পৌঁছে দিলাম—তারও মধ্যে এই পুরুষোত্তম তত্ত্বই...দুটি দল নো-চেঞ্জার, প্রো-চেঞ্জার দল—নীতি নিয়ে লড়াই...নো চেঞ্জার আমরা, প্রো-চেঞ্জার সি আর দাশের দল—আমাদের কথা means create the end, তাদের কথা যে কোন means-এ হোক স্বাধীনতা হলেই হল...গান্ধীজী এসে সি আর দাশের সঙ্গে প্যাক্ট করলেন ..আমি গান্ধীজীকে বললাম—I shall fight with Gandhi in order to maintain his Gandhism...বরিশালের কংগ্রেস ছাড়লাম, কংগ্রেসের নীতি নয়—গড়লাম (৪) স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ—তার মধ্যেও বিভ্রাট শুরু হল—সরে এলাম—নিজের দৃষ্টিকে জোর করে কখনও আঁকড়ে থাকি নি—বিরাট জগতের অনন্ত পথে বেরিয়ে এসেছি—নিজেকে জোর করে একটিমাত্র ক্ষেত্রেই আবদ্ধ করে রাখি নি—স্বরাজ সেবক সঙ্ঘকে কর্মীদের হাতে দিয়ে আবার নূতন পথে

নিত্যগোপালের পথ।...বাইরের জিনিষ—তেল সাবান ইত্যাদি যত কম পারি ব্যবহার করি—জীবনের তেল থাকলে বাইরের তেলের প্রয়োজন কমে যায়...। দ তপবস্তু। ইদং সর্ব্বম্ অস্তত।...যোগ্যতা না থাকলে সংসারের বস্তু গ্রহণ করা অর্থ চুরী করা—আমি চুরী করি নি।···যোগ্য হয়ে সংসারের যা কিছু গ্রহণ করেছি।...উপবাসের আর এক অর্থ পারিপার্শ্বিককে পরিশুদ্ধ করবার প্রয়াস...মনে রেখো মরণকে আমি ভয় করি না...অন্তর্জগতের প্রারব্ধ যখন আমাকে কাটাতে হবে, তখন সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে। যখন তোমরা আমার থেকে পৃথক হয়ে যাও, তোমরা আমার উপর নির্ভর করতে পার না ··তখন মানুষের পাপ নেবার জন্য উপবাস আমাকে করতেই হবে।· শিব নীলকণ্ঠ···আমিও যে বিষ সারা জীবনে পান করেছি, তা যদি ঢেলে দেই, তাহলে অনেক স্থান পুড়ে যাবে।... তোমরা বাক্যে মনে প্রাণে সংযম শেখো, আত্মোচিত জীবন যাপন করতে শেখো···তোমরা ছ্যাচ্‌রা হয়ো না··· তোমরা ভাগবতী বুদ্ধিসম্পন্ন হও···আমার বুদ্ধি তোমাদের শিখবার প্রয়োজন আছে··।

১৪, ৭, ৫৬।···১৩১২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ শ্রীনিত্যগোপালের কাছে দীক্ষা পাই...১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বাস করি—তখন বি, এ পড়ি।···নিত্যগোপালের স্পর্শের পরে সঙ্ঘ গড়বার একটা প্রেরণা জেগে উঠল···চিরকাল ঘুমো ছিলাম, এখনও তাই আছি, কিন্তু সঙ্ঘ গড়বার একটা লালসা ভেতরে ভেতরে কেমন করে গজিয়ে উঠতে থাকল ঐ চরণ-স্পর্শের পর থেকে।···প্রথমে গড়লাম (১) সত্যব্রত সমিতি—১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—১২ জন সভ্য—সবাই মিলে একটী ফটো তোলা হয়েছিল।··আদর্শ ছিল—শিবমস্তু সত্যানন্দং দৃষ্ট্বা সুখী ভব ভবে।···নামের ইতিহাস না-ই বা বললাম। মাঝে মাঝে বৈঠক হতো—আমিই প্রধান বক্তা। এর একদিন প্রার্থনায় এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতাম...তখনকার মনের অবস্থায় পড়াশুনা হল না... ব্যবসা আরম্ভ করলাম—কাটা কাপড়ের দোকান···ঐ অবস্থায় দোকানই কি হয়?···গেলাম বৃন্দাবন··ফিরে এসে এক বৎসর বাড়ীতে বসে রইলাম...ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করলাম···সেই সময় করলাম (২) বিশ্ব-কল্যাণ সভা। এর মধ্যে ছিল রমেন্দ্র ঘোষ, সতীশ দাশ, সুরেশ গুপ্ত, বনমালী দাশ, বিমলা দাশ, হেমন্ত দাশগুপ্ত। এক এক জনের বাড়ীতে এক একদিন বৈঠক হত, বৈঠকের শেষে হত ভূরি ভোজন—হেমন্ত দাশগুপ্তই খাওয়াত বেশী। শীতকালে নগর-কীর্তন বের হত, প্রভাত ফেরীও। সেই সময় জগদীশবাবুর বাড়ী থাকতাম—রবিবারের পাঠে যোগদান করতাম...। ৮ বৎসরের মাষ্টারী ছেড়ে দিলাম ১৯১৯-এর ২-ই ফেব্রুয়ারী। কলকাতায় চলে এলাম।···গুরুভাইয়ের বাড়ীতে নিত্যগোপালের আলোচনা চলতে লাগল—রাখাল দাস পালের বাড়ীতে আলোচনা হত।... থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীতে বেদান্ত নিয়ে আলোচনা করবার ভার এল· হীরেন দত্তের সঙ্গে বেদান্তের একটী সূত্র নিয়ে আলোচনা হল...আমার আলোচনা শুনে তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন—একক্রমে চৌদ্দ রবিবার থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীতে বেদান্ত নিয়ে বক্তৃতা দিলাম।...(৩) কংগ্রেসে যোগদান করলাম—প্রাণ ঢেলে মানুষের কাছে স্বরাজের বাণী পৌঁছে দিলাম—তারও মধ্যে এই পুরুষোত্তম রবাই···দুটি দল নো-চেঞ্জার, প্রো-চেঞ্জার দল—নীতি নিয়ে লড়াই...নো চেঞ্জার আমরা, প্রো-চেঞ্জার সি আর দাশের দল—আমাদের কথা means create the end, তাদের কথা যে কোন means-এ হোক স্বাধীনতা হলেই হল···গান্ধীজী এসে সি আর দাশের সঙ্গে প্যাক্ট করলেন ..আমি গান্ধীজীকে বললাম—I shall fight with Gaudhi in order to maintain his Gandhism···বরিশালের কংগ্রেস ছাড়লাম, কংগ্রেসের নীতি নয়—গড়লাম (৪) স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ—তার মধ্যেও বিভ্রাট শুরু হল—সরে এলাম—নিজের সৃষ্টিকে জোর করে কখনও আঁকড়ে থাকি নি—বিরাট জগতের অনন্ত পথে বেরিয়ে এসেছি—নিজেকে জোর করে একটীমাত্র ক্ষেত্রেই আবদ্ধ করে রাখি নি—স্বরাজ সেবক সঙ্ঘকে কর্মীদের হাতে দিয়ে আবার নূতন পথে

বাইশে শ্রাবণ

॥ শ্রীজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥

বাইশ বৎসর পূর্বে এইদিন রবীন্দ্রনাথ অস্তমিত হয়েছিলেন। মহাসমুদ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয়। মহাসাগরের প্রসার ও গভীরতা তাঁর জীবনে—; কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাগুরু এবং মর্ত্ত্য ও মানবপ্রেমিক নানা রবীন্দ্রনাথের মিলন হয়েছে রবীন্দ্রনাথে। তাঁর কাব্যে জীবন ও মৃত্যুর সমন্বয় তাঁর জীবন-দর্শনের একটি বড় অংশ। সেই কথাই আলোচনা ক'রে আজ তাঁর মহাপ্রয়াণের স্মৃতি-বাসরে অর্ঘ্য নিবেদন করলাম।

গভীর মর্ত্ত্যপ্রীতি ও মানব-প্রেম রবীন্দ্র কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ধরণীর বিপরীতধর্মী সুখ দুঃখ, হাসি ও ক্রন্দন জীবন ও মৃত্যু পরস্পরের মধ্যে অন্যোন্য সম্বন্ধ বহন করছে। দুঃখ আছে তাই সুখ এত রমণীয়, জীবনের অবসান আছে, তাই জীবন এত মধুর; মানুষের কান্নাহাসি, বিরহ ও মিলন ধরিত্রীকে এক অপূর্ব সুষমায় পূর্ণ করেছে।

ধরণীর পরপারে কল্পিত এক অন্তহীন, বিচ্ছেদহীন, পরিপূর্ণ সুখেভরা অবাস্তব স্বর্গভূমি কবির মনে কোন রেখাপাত করে না।

"...স্বর্গে তব বহুক অমৃত
মর্ত্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা, অশ্রুজলে চির শ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি"— স্বর্গ হইতে বিদায়

গ্রামপ্রান্তে ছোট বালিকা বধূর কুমারী জীবনের সাধনা কবিকে মুগ্ধ ক'রেছে।

"......সে বালিকা-বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর।"

—স্বর্গ হইতে বিদায়

মানুষকে বর্জন করে মুক্তি সাধনা কবির ধর্ম নয়।

"... এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।" —মুক্তি—নৈবেদ্য

কিন্তু জীবন চলমান; শৈশব, কৈশোর, যৌবন, জীবনের প্রৌঢ় প্রহর—এই নানা কালান্তরের মধ্য দিয়া জীবনের গতি মৃত্যুর সাগর সঙ্গমে। মৃত্যু বিলুপ্তি নয়, রূপান্তর। জীবনের নানা স্তরের মধ্যে এই পটপরিবর্ত্তনের স্বাক্ষর রয়েছে। মর্ত্ত্যজীবন ছোট ছোট মৃত্যুরই মালা। চলমান জীবনে এই পরিবর্ত্তন অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথ গতির কবি; তিনি পথিক, পথের বাঁকে বাঁকে তিনি অপরূপকে দেখে গেছেন, জীবনের ধারাস্নানে পূর্ণ অবগাহন করেছেন, কিন্তু কোথাও বদ্ধ হন নি। তাঁর যাত্রাপথে আনন্দ আছে, বন্ধন নাই, মোহ নাই। তিনি সুদূরের প্রয়াসী।

"সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাসরি"

—আমি চঞ্চল হে

মর্ত্ত্যজীবনের শেষ জীবনের অবসান নয়—ওপারে অমর্ত্ত্য-জীবন প্রতীক্ষা করছে, পথিক কবিকে আহ্বান করছে।

"পুরাণ আবাস ছেড়ে যাই যবে, মনে ভেবে মরি কি জানি কি হ'বে।" এই অনিশ্চিতের ভয়, প্রিয় জনের বিরহ, মৃত্যুকে বিভীষিকাময়ী করেছে। কবি মানুষের মনকে এই ভীতি হ'তে, এই অনিশ্চয়তা হতে মুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর অভয়বাণী মৃত্যুকে সুন্দর করেছে।

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

—সুপ্রভাত

"……জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে এমনি ভাল বাসিব নিশ্চয়।
স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

—মৃত্যু –নৈবেদ্য

কবির জীবনে মৃত্যু বারবার দেখা দিয়েছে, ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাঁর প্রিয়জনদের। কবির জীবন তাদের বিয়োগ বেদনায় বিধুর। কিন্তু এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তি, ভাগবতী সাধনার বলে তিনি সেই শোক জয় করেছেন। ভগবানকে নিবেদন করেছেন তাঁর বেদনা, —শান্তিলাভ করেছেন। আমাদের প্রিয়জন মৃত্যুর পরপারে যাঁরা চলে গেলেন তাঁরা আশ্রয় পেয়েছেন ভগবানের চরণে যিনি অণুপরমাণুকেও রক্ষা করছেন। কিছুই হারায় না কিন্তু আমরা আমি লইয়া থাকি তাই কণাটুকু হ'তে বঞ্চিত হ'লেও বেদনায় ভেঙে পড়ি। তাই এই মৃত্যুভয়।

"যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয় সবি জেগে রয়
তব মহামহিমায়।"

"যে পূর্ণ তব চরণের কাছে
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি
নিশিদিন কাঁদি তাই।"

—নৈবেদ্য

মৃত্যু শুধু অপরিহার্য নয়, সে সুন্দরী কল্যাণী। মৃত্যুহীন মর্ত্যজীবন বৈচিত্র্যহীন, পঙ্কিল, অসুন্দর; তা কবির কাম্য নয়।

"কে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতা কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে। নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।" —জন্ম ও মরণ

কবি তরুণ বয়স হ'তেই এই মোহন আর সুন্দর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছেন। প্রতীক্ষা করেছেন একদিন জীবন-সন্ধ্যায় সে বধূ বেশে আসবে, কবির নিকট বরমাল্য গ্রহণ করবে।

"যদি কাজে থাকি আমি গৃহ মাঝ
ওগো মরণ হে মোর মরণ
তুমি ভেঙে দিও মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ" —মরণ মিলন

জীবন-সন্ধ্যায় জন্ম ও মৃত্যুকে একাসনে স্থান করেছেন।

"আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন একাসনে দোঁহে বসিয়াছে
দুই আলো মুখো-মুখি মিলেছে জীবন প্রান্তে মম'

—জন্মদি

দেখেছেন উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন—বরবধূর মিলন

"দূরের গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্র গাছি দিয়ে বাঁধা। —দূরের গোধূলি ল

জীবন চলেছে নব নব পূর্বাচলে, আলোকে আলোকে—মুক্ত করেছে কবিকে, অমৃতের তীর্থ যাত্রীকে।

মর্ত্যজীবনের অবসানে অমর্ত্যজীবনের প্রকৃত স্বরূপ কবির অজ্ঞাত, তবুও "মৃত্যুর পরে" কবিতাটিতে তাঁ নানা সম্ভাব্যরূপ তিনি চিত্রিত করেছেন:

"গিয়েছে কি আছে বসে, জাগিল কি ঘুমাল সে
কে দিবে উত্তর?
"অনন্ত জনম মাঝে গেছে সে অনন্ত কাজে
সে আর সে নাই।
আর পরিচিত মুখে তোমাদের দুখে সুখে
আসিবে না ফিরে।"

মৃত্যুর প

জীবন-সায়াহ্নে রচিত—প্রান্তিক, আরোগ্য, রোগশয্যা

সেঁজুতি এই কয়েকটি কাব্যেও কবি মৃত্যুর রূপ সম্বন্ধে কিছু আভাষ দিয়েছেন। রোগশয্যার আলো আঁধারির মগ্নচৈতন্যের পরিবেশে নব মৃত্যুর এক আবছা রূপ। মর্ত্য-জীবনের বন্ধন হ'তে তিনি মুক্ত—সেই তাঁর ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল। এক কৃষ্ণ যবনিকার পারে প্রকাশিত হ'ল জ্যোতির্ময় রূপ।

"বন্ধমুক্ত—আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে, ছায়াপথ পা'র হয়ে গিয়ে
অলোক আলোক তীর্থে—সূক্ষ্মতম বিলয়ের ঘাটে—"

এই আলোক তীর্থে প্রয়াণের পথে তিনি সমস্ত বন্ধন হ'তে মুক্তি কামনা করেছেন। এপারের সমস্ত কামনা তিনি নির্মমভাবে বর্জন করতে চেয়েছেন।

"পশ্চাতের নিত্যসহচর অকৃতার্থ হে অতীত
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেত ভূমি হ'তে
নিয়েছ আমার সঙ্গ—
ছিন্ন কর স্বপ্নের বন্ধন
রেখেছ হরণ করি—মরণের অধিকার হ'তে
বেদনার ধন যত। কামনার রঙিন ব্যর্থতা
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।"

—পশ্চাতের নিত্যসহচর

অসংখ্য বন্ধন মাঝে এই মুক্তিকামনা রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন। সকল কীর্তির চেয়ে মহৎ জীবনের গতি।

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার বারম্বার"

—শাজাহান

ধরণীর সমস্ত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ তিনি গ্রহণ করেছেন ক্ত—সাধকের দৃষ্টিতে। কিন্তু জীবন-উৎসব শেষে সকল ীর্তিকে ভগ্নপাত্রের মত বর্জন করেছেন। এখানে তিনি ার্শনিক, সাধক। তবুও এই বর্জন কখনও শুষ্ক ার্শনিকতা, রসহীন সাধনা হয়ে ওঠে নি। আগে চলার থে তিনি বারবার পিছু ফিরে চেয়েছেন—করুণাঘন অমৃতময়ী সে দৃষ্টি। এখানে তিনি কবি। তাঁর জীবন সাধক দার্শনিক ও কবির অপূর্ব সমন্বয়।

পুরাতনভৃত্যের মৃত্যুবেদনা কাঙালিনী মেয়ের ব্যথা, মুমূর্ষু রাখাল বালকের অন্তিম আর্তক্রন্দন তাঁকে অভিভূত করেছে। প্রিয় জনের জীর্ণ ছবিটি তাঁকে চঞ্চল করেছে।

"তোমারে কি গিয়েছিনু ভুলে?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।"

—ছবি

আর "যেতে নাহি দিব"র সেই চারি বৎসরের বালিকাটির বেদনা মগ্ন করে দিল সমস্ত পৃথিবী ও আকাশকে। ভাঙা দেউলের উপেক্ষিত দেবতাটিকেও কবি বিস্মৃত হ'ন নি। কত নগর রাজধানী কত অপরিচিত তবু কবির স্মৃতিসীমার বাইরে রয়ে গেল। গৃহ-প্রাঙ্গণের একটি ছোট ঘাসের শিশির বিন্দু তাঁর এ বেদনা লাঘব করল। এইরূপ কত উপেক্ষিত ছবি কবির কাব্যে অমর হয়েছে। মহাকবি বাল্মীকির উপেক্ষিতা বধূ ঊর্মিলাকেও তিনি ভোলেন নি। সাধক দার্শনিক বলেন চলার পথে সকল কিছুই পিছে ফেলে যেতে হয়। কবি বলেন—কিছুই তুচ্ছ নয়—সকলেই পূর্ণের পদ-পরশে ধন্য। তিনি শেষ প্রণতি নিবেদন করেছেন মানুষকে, পৃথিবীকে। প্রার্থনা করেছেন মাটির ফোঁটার একটি তিলক। বিদায়ক্ষণে ভোলেন নি নাগকেশরের চারাটিকে—"ফুল যার ধরে নাই।"

আজ রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দিনে কবির এই মমতা-স্নিগ্ধ করুণাময় রূপটি বারংবার স্মরণ করি আর তাঁরই ভাষায় তাঁকে নৈবেদ্য নিবেদন করি :—

"তোমারে করিবে বন্দী নিত্য কাল মৃত্তিকা শৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার
ইচ্ছার বন্ধন নহে, সে বন্ধন ইন্দ্রজাল বলে
কর অলঙ্কার—"

—বসন্ত

মরণোন্মুখ বাঙ্গালীর বাঁচিবার পথ

॥ শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্ত্তী ॥

একটি জাতির মরণ অপমৃত্যু অকস্মাৎ আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া তাহাকে নিধন করিয়া দেয় এ ধারণা সত্য নয়। যবনিকার সূচনা অনেক দিন ধরিয়া জাতির ভিত্তি-ভূমির তলায় ঘনাইতে থাকে তাহার উদাসীনতার সুযোগে। এই উদাসীনতা জাতির রক্তে সংক্রামিত হয় তাহার সমাজ-ব্যবস্থার কোন বিশেষ রন্ধ্র পথে।

বৃহৎ শিল্প সৃষ্টির কারখানাগুলি বাংলা দেশের সম্পদ। কিন্তু বাঙ্গালী প্রতিযোগিতাহীন কৃষি-নির্ভর সমাজ-ব্যবস্থায় অভ্যস্ত বলিয়া বৃহৎ শিল্প তাহাকে আকর্ষণ করে নাই। কৃষকশ্রেণী স্বল্প পরিশ্রমে প্রচুর উৎপাদনের সহায়তা পাইয়াছিল বলিয়া তাহারা শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রের শ্রমিক জীবন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে বাংলার বৃহত্তর মধ্যম ভোগী সম্প্রদায় সংস্কৃতি চর্চা এবং ডাক্তার উকিল, কেরাণী জীবনের পথ বাছিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিও ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া শিল্প বাণিজ্যকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। তাহার ফলে বাংলার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের মালিকানা যেমন অবাঙ্গালীর হাতে চলিয়া যায় অন্যদিকে অবাঙ্গালী শ্রমিকরা শ্রমের বিনিময়ে অর্থ আহরণ করিয়া বাংলার অর্থ নৈতিক জীবন পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে। বাংলার কৃষকের দ্বারা উৎপাদিত কাঁচামালের মাধ্যমে অর্জিত প্রচুর ধন সম্পদ দিনের পর দিন অবাঙ্গালী শ্রমিক ও মালিক ভোগ দখল করিতে লাগিল।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, বাঙ্গালীর ভিত্তি মূলের ক্ষয় শুরু হইয়াছিল অনেক পূর্ব্বেই। দেশ বিভাগের বিপর্যয় ও ভূমিস্বত্ব বিলোপে মৃত্যু নগ্নরূপে একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ দেখা যাইতেছে যে, তাহার জমির পরিমাণ স্বল্প ও সম্পদও সামান্য, অন্য পক্ষে অর্থ নৈতিক মুষ্টি তাহার হাতছাড়া হইয়া গিয়া মৃত্যু-ফাঁস গলায় চাপিয়া বসিয়া তাহাকে অসহায় করিয়া ফেলিয়াছে। তাই উনিশ শতকের বিজয়ী বাঙ্গালী আজ পর্যুদস্ত, ছত্রভঙ্গ। অর্থ নৈতিক নিশ্চয়তাই জাতির প্রাণ স্রোত। ইতিহাস এই শিক্ষা দেয়, যে জাতির অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় নয় তাহার বাঁচিবার পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে অর্থ নৈতিক জীবনে প্রথমেই তাহাকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে।

কিন্তু বাংলার শিল্প-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর অনুপ্রবেশ বর্তমান পরিস্থিতিতে সহজ সাধ্য নহে। বাঙ্গালীর হাতে বৃহৎ পুঁজি অনুপস্থিত। অন্য দিকে নতুন শিল্প বাণিজ্য স্থাপন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ অবাঙ্গালী পুঁজির সহিত প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করা অসম্ভব।

একমাত্র ক্ষুদ্র শিল্প বাঙ্গালীকে এই দুঃসহ অবস্থা হইতে মুক্তি দিতে পারে। আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছে ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান অনেক উচ্চে। ইহার বড় সুবিধা এই যে ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা প্রচুর কিন্তু উৎপাদন ব্যয় কম একদিকে যেমন উৎপাদন আপনি চাহিদার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলে অন্য পক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাধীন জীবিকার পথ খুলিয়া যায়। ভারী পুঁজির প্রয়োজন নাই বলিয়া সবাই সামান্য শিক্ষা পাইয়া এই জীবিকা গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু কাঁচা মাল ও বিক্রির বাজার একটি মস্ত বড় সমস্যা। ইহার সমাধানের সহজ পথ সরকারী হাতে কাঁচামালের যোগান এবং বিক্রয়ের নিশ্চয়তার দায়িত্ব গ্রহণ। বিক্রয়ের নিশ্চয়তা এবং কাঁচামালের যোগান ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাণ। স্মরণ থাকিতে পারে এই ক্ষুদ্র শিল্প ভরসা করিয়া জাপান বিশ্বের বাজারে আধিপত্য করিতেছে। জাপানীরা যাহা সম্ভব করিয়াছে বাঙ্গালীর তাহা পারিবে না কেন!

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি বোর্ডের মাধ্যমে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। বেসরকারী স্তরে বাঙ্গালী শিল্পপতিরা কয়েকজন অর্থনীতিবিদ্‌ সমাজ-সেবক লইয়া একটি বোর্ডের মাধ্যমে শিল্প ব্যাঙ্ক গঠন করিয়া এই কাজে হাত লাগাইতে পারেন। এর ফলে কিছু বাঙ্গালী শিল্প সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে যেমন নিজেদের নিরাপত্তা খুঁজিয়া পাইবে অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্পের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণ উদাসীন সরকারকে চাপ দিতে অগ্রসর হইবে।

অন্যদিকে বৃহৎ শিল্পগুলি হইতে সাধ্যমত চাকুরীর মাধ্যমে অর্থ আদায় করিয়া লইতে হইবে। প্রতি বছর অল্প টাকার শ্রমিকদের মনিঅর্ডার বাবদ প্রায় ২৮ কোটি টাকা বাংলার বাহিরে চলিয়া যায়। ইহার সহিত শিল্প সংস্থার লাভ অন্যান্য অর্থ পাচারের সহস্র পথের টাকা যোগ করিলে তাহা গগন স্পর্শ করিবে। এই বিপুল অর্থ বাংলার বাহিরে লইয়া যাইবার পথ আইনের সহায়তায় এই মুহূর্তে বন্ধ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। অবাঙ্গালী মালিকানা ও শ্রমিকের সক্ষমতা এই অর্থ বাঙ্গালীর পক্ষে আদায় করিয়া নিজ দেশে রাখিবার প্রধান অন্তরায়। অন্য দিকে ছোটখাট অন্যান্য স্বাধীন জীবিকা (ধোপা, নাপিত, খাবারের কাজ প্রভৃতি) গুলিতে পুনঃ প্রবেশের চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। বাঙ্গালীর শিল্পে বাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োগ করিব—এই শপথ লইতে হইবে। শ্রমকে ঘৃণা করার প্রবৃত্তি এই পথে সাফল্যের প্রধান অন্তরায়। সুতরাং কোন কাজ ছোট নয়—এই সত্য প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং প্রচার চালাইবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বাংলার সমস্ত লাইসেন্স, পারমিট একমাত্র বাঙ্গালীর জন্য এই দাবী অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এ পর্যন্ত বৃহৎ শিল্পে হাত না দিয়া ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হইবার চেষ্টা এবং অবাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্যের অর্থ বাংলায় আটকাইবার বিষয় আলোচনা হইল। বাঙ্গালীর নিরাপত্তা লাভের আর একটি বৃহৎ ক্ষেত্র আছে যে ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গবাসীরা অগ্রসর হইতে পারেন। নদী পথে এবং কলিকাতার বৃহৎ জাহাজী বন্দরে বাঙ্গালী একেবারেই অনুপস্থিত। এই ক্ষেত্রের সমুদয় অর্থ অবাঙ্গালী পুঁজি শ্রমিক ও পাকিস্থানী লস্করেরা আত্মসাৎ করিতেছে। বাঙ্গালী এই পথে অগ্রসর হইলে কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী জীবনে নিশ্চয়তা খুঁজিয়া পাইবে।

কৃষি-সংস্কার আইনের ফলে গ্রাম অঞ্চলের অর্থ নৈতিক জীবন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অন্যদিকে উদ্বাস্তু আগমনে জমির পরিমাণের স্বল্পতা আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথমোক্ত ক্ষুদ্র শিল্পের কাঁচা মাল যোগান এবং স্বল্প জমিতে একাধিক ও প্রচুর ফসলের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনের নিরাপত্তা আসিতে পারে। ইহার জন্য দরকার (ক) সমবায় ভিত্তিক চাষ (গ) অনাবাদী জমি আবাদে আনা (গ) ক্ষুদ্র বাঁধ, জলাশয় সংস্কার, প্রচুর রাস্তা ঘাট নির্মাণ। পল্লীবাসীর জন্য আরো কতগুলি সুবিধা সৃষ্টি করা যায়—(ক) হস্ত চালিত তাঁত (খ) কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন (গ) পশুপক্ষী পালন (ঙ) ডেয়ারী, মৎস্য চাষ, মধুমক্ষিকা পালন ইত্যাদি মাধ্যমে।

রাস্তাঘাট তৈয়ারীর কাজে প্রচুর ঠিকাদার ও শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ আছে। বাঙ্গালীর জন্য এই সুযোগ থাকিলে অবাঙ্গালীদের এই বৃহৎ মুষ্টিগত কারবার হাতছাড়া হইয়া যাইবে, অন্য পক্ষে স্থল পথে আমদানী ও পরিবহনে প্রচুর স্বল্প শিক্ষিত বাঙ্গালী নিরাপত্তা খুঁজিয়া পাইবে।

বৃহৎ শিল্প সৃষ্টির দু'একটা সুযোগ এখনো বাংলায় আছে। বাঙ্গালী শিল্পপতিদের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিৎ। উত্তর বঙ্গের কাঁচা মালের উপর নির্ভর করিয়া চিনির কল, কাপড়ের মিল ও কাগজ শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে।

আমরা প্রথমে বাঙ্গালীর বর্তমান অবস্থার কারণ, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্পের (গোয়েরিং প্ল্যান) প্রয়োজনীয়তা, পরে জীবিকার নানা পথ ও গ্রামীণ জীবনে আত্ম প্রতিষ্ঠার পথ এবং বৃহৎ শিল্পে বাঙ্গালীর সুযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। ইহা হইল অর্থ নৈতিক জগতে বাঙ্গালীর আত্ম প্রতিষ্ঠার কতগুলি বৈজ্ঞানিক পন্থা। ইহা

ছাড়াও ভূমিহীন উদ্বাস্তু সমস্যা বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে একটি অন্তরায়। আন্দামান নিকোবর সমেত বাংলার বাইরের বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চল বাংলার সহিত যুক্ত করিতে পারিলে এই সমস্যার বড় একটা সমাধান আশা করা যাইতে পারে।

বাঙালীর রাজনৈতিক অসহায়তা তাহার কল্যাণের পক্ষে একটা বিরাট অন্তরায়। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে শোষণ ও শাসনে জর্জরিত করিতেছে। অন্যদিকে প্রাদেশিক সরকার মাড়োয়ারীর পুঁজির স্বার্থে পরিচালিত। বামপন্থী সম্প্রদায় অবাঙালী শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে মনোযোগী। স্বাজাত্য প্রীতিকে বাঙালী ছোট দৃষ্টিতে দেখিতেছে। স্বাজাত্য প্রীতি নিন্দার নয় বরং গর্বের এবং আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সম্মানের এই বোধ জাগ্রত না করিতে পারিলে এই সর্বনাশা সমস্যার সমাধান অসম্ভব। আজিকার এই দুর্দিনে বাঙালীকে বাঙালীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। বাংলার সর্বস্তরের মানুষ এক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করিলে আজকের রাজনৈতিক অসহায়তার 'মাহেন্দ্র মুহূর্তে' অপসারিত হইবে। আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় ঐক্য বোধের সম্মুখে জাতির বিমুখতা বার বার পরাজিত হইয়াছে ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয়।

রাষ্ট্রশক্তির বিমুখতা অপেক্ষাও আত্মশক্তির দুর্বলতা আরো বড় কথা। আত্ম শক্তিতে অবিশ্বাস এবং হীনমন্যতার অভিশাপ জাতির জীবনে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া রাষ্ট্র শক্তির বিমুখতাকে সাহায্য করিতে থাকে। তাই সর্বপ্রথম চাই আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস—ইহার মধ্যেই আছে মরণোন্মুখ বাঙালীর রক্তে নতুন জীবনের স্পন্দন সৃষ্টির যাদু মন্ত্রটি।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী স্মরণে

॥ অধ্যাপক সুধীর গুপ্ত ॥

[ইনি বৈষ্ণবদের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। হুগলী জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামবাসী সপ্তগ্রাম তালুকের বার লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় বিশিষ্ট জমিদারীর মালিক গোবর্দ্ধনের পুত্র এই রঘুনাথ প্রথম যৌবনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আনুমানিক ১৪১৯—১৫০৪ শকাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন।]

সে-এক বিত্তাঢ্য বাড়ী, রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার
বস্তুগুরুতার পূজা ; যত নর-নারী
সোনা-বাঁধা সে-সংসারে যথার্থ সংসারী ;—
খোঁজে না কি পেলে শান্তি অন্তর আত্মার।
প্রান্তর—কান্তার-গিরি-মরু-পারাবার—
নীলাভ্র-বিদ্যুৎ কভু তত্ত্ব বস্তুচারী
করে না কা'রেও দেখা ; ভাণ্ডারী কাণ্ডারী
স্বর্ণ-রৌপ্য-মান-চক্র সেথা গোলাকার।
সে-নিরন্ধ্র সংসারের কবাট খুলিয়া
কৃষ্ণতারা-দীপ্ত পথে গোপনে কখন্
বাহিরিলে কার বংশী-সংকেতে ভুলিয়া ;—
অবরুদ্ধ লাভা-দগ্ধ যেন প্রস্রবণ
চলিল উদ্বেল শত তরঙ্গ তুলিয়া ;—
গ্রীষ্ম-শুষ্ক দেশে এলো অশান্ত শ্রাবণ।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(২৯)

কোনও এক পথেই পুরুষোত্তম মিলিবে না। ইহাই শরণাগতির পথ। সকল আবেষ্টন মানিয়া সাধনা করা কি দুঃসাধ্য! কেহই হয়তো সঙ্গে থাকিবে না, আবেষ্টনের টানে হয় তো সকলেই সরিয়া যাইবে। তাই প্রচলিত সন্ন্যাসীরা কতগুলি শিষ্যকে আবেষ্টনের সহিত সম্পর্ক ছাড়াইয়া দল গড়েন। কিন্তু আমার তো তাহা হইবে না। আমার দল তাই হইবে না। নীলুও তো পারিতেছে না, সুধা পারে নাই। আবেষ্টন ছাড়াইয়া লইলে হয় তো সুধা পারিত। ৮।০টার পর রাত্রিতে আসি।...Saw Palmetto ২ আউন্স আজ ফুরায়।

২৯শে জানুয়ারী

...চারু রায়ের সঙ্গে দেখা। চারু রায় বিধান রায়কে congratulation জানাইয়া ফোন করার কালে রিফিউজীরা কেমন করিয়া চারু রায়কে betray করে, কেমন করিয়া প্রতি ব্যালট পেপার দিয়া ৪৲ টাকা কম্যুনিষ্টদের কাছে আদায় করিয়াছে, তাহা বলে। রাশিয়ান money নাকি খুব ছড়ানো হইয়াছে ভোট কিনিবার জন্য। ১১টার পর ফিরি। বেণু...২টায় এখানে আসে।...বার বার মনে হইতেছিল, ঠাকুর যদি 'ব্রহ্মবিদ্যা' জীবনে প্রকাশ করিলেন, তাহা যদি ছড়াইয়া দেওয়া যাইত, তবে কম্যুনিজমকে পরিপাক করিতে এ দেশ পারিত। এক দিকে চরম idealism, অপর দিকে চরম materialism, কে আজ এই দুইয়ের মাঝখান দিয়া দুইকে পরিপাক করিয়া বিশ্বের এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবে পুরুষোত্তম দর্শন ছাড়া? একবার মনে হয় আবার মঠের মতন দেশের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ি। তবে ঠেকানো যায়। এ দেশ কি আবার কম্যুনিজমদ্বারা ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইবে? পুরুষোত্তম রক্ষা করুন। সনাতনীদেরই যে প্রতিক্রিয়ার ফল এই কম্যুনিজম। হিন্দু কোড বিল পাশ হওয়া উচিত। কিন্তু শুধু পাশ করিলেই চলিবে না, উহার পিছনের দর্শনও খুলিয়া দিতে হইবে, তবেই মার্কসবাদকে পরিপাক করা সম্ভব হইবে।..

৩০শে জানুয়ারী

সকালে অফিসে যাই। নীলুর চিঠি আসে। সে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে এখানে আসিবে। তারিখ পরে জানাইবে। বুকটা একটু শান্ত হইল; সব দিক দিয়া একটা আঁধার জমিয়াছিল। একটু আলো পাইলাম। ১০টার মধ্যেই ফিরি। সুধাংশু আসে। সে ৩টার পর যায়। আমার সেবার জন্য সে ১০৲ টাকার একটা চেক দিয়া যায়। তাহার যোগ্যতা ঠাকুরের সেবায় লাগিলে সে সার্থক হইত, ঠাকুরের সেবা হইত, তাহা আলোচনা করি। তাহার তেজস্বিতা ছিল, অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যেও দাঁড়াইয়া থাকিবার মত বল ছিল, ঠেলিয়া চলিবার সামর্থ্য ছিল, সঙ্ঘ গঠনের যোগ্যতাও ছিল। কিন্তু তাহা ঠাকুরের সেবায় লাগিল না। আমি আজও টানি বলিয়া যুক্ত আছে। নহিলে ছিটকাইয়া পড়িত। বেণু ২টার পর আসে।...বিশ্ব-আবেষ্টনের মাঝে কোনও ব্যক্তিকে পাইলেই যে সে পাওয়া হয় সহজ ও বাস্তব, তাহাই এই কয়দিন বেণুর সঙ্গে আলোচনা হয়। গীতায় 'সখেতি মত্বা প্রসভং' ইত্যাদি শ্লোক অবলম্বনে আলোচনা হয় যে 'অজানতা মহিমানম্'—মহিমা না জানিলে সখা মনে করিয়া যাহা কিছু বলা হয়, সব জোর করিয়া বলা—প্রসভম্। বলা তখনই হয় সহজ, যখন মানুষকে তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ব্যবহার করা যায়, বলা হয়। মহিমাই হইতেছে মানুষের আবেষ্টন। প্রায় ৯ টায় আসি। ১টার পর উঠি।

১লা ফেব্রুয়ারী

...সুরেন বিশ্বাসের সঙ্গে···দেখা...। ১৯২১-এর আন্দোলনে বহু কর্মী সত্যই 'ত্যাগ' লইয়া কাজে নামিয়াছিলেন। তাঁহাদের রক্তে গড়া কংগ্রেসকে নষ্ট হইতে দেওয়া চলে না। 'স্বরাজ' শব্দটী মহাত্মাজীরই অবদান। জওহরলাল ইহার স্থলে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' শব্দ বসাইতে চাহিয়াছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতা means, স্বরাজ end। আজই তো গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি চালাইবার সুযোগ। জনসাধারণই নিজের অভাবের সমাধান করিবে, সরকার শুধু তাহার পথের বাধার অপসারণ করিবেন। জনসাধারণই নিজের ভাগ্য নিজে সৃষ্টি করিবে—ইহা ঘরে ঘরে জনে জনে শুনানো উচিত। ১১টার পর আসি। কাল সকালে সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা হইল। রেণু ২টায় আসে। ..শীতলাতলায় ওখানে পিরোজপুরের সতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা। উজ্জ্বলভারত, আমার বই লেখা, মন্ত্র সম্বন্ধে কথা হয়। একদিন দেখা করিবেন বলিলেন। আমার বুকভরা তাড়নার কথা বলি। আজও একবার ঝড়ের মত ছুটিতে ইচ্ছা হয়। রেণু 'বাঁধন ছিঁড়িতে হবে'—ফাল্গুন মাসে তাহার প্রবন্ধ ঠিক করে। আজ কয়েকটা পোষ্ট কার্ড লেখে। সন্ধ্যার পর সত্যব্রত ও রবি আপিসে যায়। নিত্যব্রত যখন বেহালা যায়, তখন সত্যব্রতকে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা বলিয়া দেই। তাহার কাজকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করি। টেলিফোন বিলটার কথা বলি। সে দিতে না পারিলে জানাইতে বলিয়াছি। সময় হইয়া গিয়াছে, রেজিষ্ট্রার্ড চিঠি পাঠাইয়াছে। মানুষের আচরণ, কথাবার্ত্তা—ভাল আর লাগে না। ১০টায় শুই, ৪টায় উঠি। আজ গজুর জন্মদিন।..ট্রাইসাইকেল, কমলা, সন্দেশ কিনিয়া আনে। অথচ খুঁইয়া দুপুরে চাউল না থাকায় কতকটা রুটি খায়। আর আমি গরীব মানুষ, মাসে ২০৲ টাকার চাউল কিনিতে দিব বলিয়াছি।... ৩টায় বাহির হইয়াছে, রাত্রি ৮।০টায় ফিরিয়াছে। কে তাহার রান্না করিবে? তাহার মা? বেশ কথা। শুধু দেখি। বলিবার তো কিছু নাই।

২রা ফেব্রুয়ারী

সকাল ৭।০টার পর আফিসে যাই। সেখানে কিছু পরেই সুরেন বিশ্বাস আসেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্বের একটা লেখা (স্বরাজ সম্বন্ধীয়) পড়েন। ২৬ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ সাইজ সেই লেখাটা। লেখাটী মন্দ হয় নাই। আমার প্রাণের তাড়নার কথাও বলি। ১৯২১-এর ৩১শে মার্চ বরিশাল কনফারেন্সে আমার বক্তৃতার কথা বারবার উল্লেখ করেন। সত্যই উহা খুবই অদ্ভুত হইয়াছিল। অমনটা বোধহয় আর হয় না। ১২টার পর ফিরি। এ পর্যন্ত সুরেনবাবুর সঙ্গেই কথা হয়। বর্তমানে কিছু করা যায় কি না, তাহাও আলোচনা করা হয়। শরীরের বর্তমান অবস্থা সত্বেও আবার ঝাঁপ দিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়।···লোকসেবককেই পত্রিকা ছাপাইতে দেওয়া স্থির হইল।···

৩রা ফেব্রুয়ারী

সকালে 'ভারতের মাটিতে মার্ক্সীয় দর্শন (৪) ও শ্রীগৌর সুন্দর' কিছুটা লেখার পর ৮।০টার পর আফিসে যাই।···বুদু আজ কর্পোরেশনের স্কুলে যায়। অথচ আমি তাহা জানি না।···নিত্যব্রত ঘড়ি মেরামত শিখিবার স্কুলের খোঁজ পাইয়া···। ৩ মাসে course সমাপ্ত।··· নিত্যব্রতের একটী পথ করিয়া দিতে পারিলে হইত। সত্যব্রতর কোন প্রচেষ্টার মধ্যে আর থাকা সঙ্গত হইবে না। ...সংগঠনের কোনও যোগ্যতা নাই।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী

সকালে 'ভারতের মাটিতে মার্ক্সীয় দর্শন' প্রবন্ধটী শেষ করিয়া আফিসে লইয়া যাই। আমি ১১টার পূর্বে চলিয়া আসি। রেণু ১২টার মধ্যে বাহির হইয়া হেরম্ববাবু, অমল হোম, মন্মথ রায়, শেখরবাবুদের ওখানে যায়। কাহারও সঙ্গে দেখা হয় না। রাইটার্স বিল্ডিং-এ বিজ্ঞাপন ও গ্রাহকদের টাকার তাগিদ দিয়া আসে। এখানে পৌঁছে ২টার পর। ৬।০ টার পর আমি ও রেণু আফিসে প্রতিভাকে দেখিয়া অমলের বাড়ীতে যাই সকালে নীলুর কার্ড আসে। সে আসিতে পারিল না।···

হতাশ হইবার কিছু নাই, ঠাকুরের মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকিব।···বীরেনবাবু (লোকসেবক) আজও তো খোঁজ করিলেন না। এরা বেণু কি যে করিবে, ভাবিয়া কূল পাইতেছি না। সারা জীবন ঠেলাঠেলি করিয়া চলিলাম। আজও তাহাই। শুধু ঠাকুরের স্নেহ আমার সম্বল। তিনি ভালবাসেন—আর কিছু আমার নাই…

৫ই ফেব্রুয়ারী

সকালে আফিসে যাই, সেখানে খই দই খাই। ১টার পর চুনি মিত্র আসে ...তাহার পুস্তকের রিভিউ বাহির না হওয়ার জন্য সে ক্ষুণ্ণিত। তাহার সঙ্গে কথা না হইলে ছাপান সম্ভব হইবে না। আবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিলে সে দার্শনিকের মাঝে একটী শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে পারিত। সে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিল।···৮টায় বীরেন বাগচী আসেন। স্বর্ণ কিনিয়া আনিবার জন্য ১০৲ টাকা দিই। আধ ঘণ্টার উপর থাকেন। যাহা উপনিষদে metaphysics, তাহাই গীতায় psychologically ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। তাই গীতা উপনিষদের সার। 'মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্' মন্ত্রকে গীতা রূপ দিয়েছেন নিষ্কামের ভাবে—'যঃ পশ্যতে আত্মবান্মনাৎ যেন এব সঃ'। যাহা ছিল transcendent, তাহাই গীতায় immanent। যাহা মানুষকে পাইতে হইত নিজকে অতিক্রম করিয়া, আজ তাহাই মানুষ পাইবে নিজের মধ্যে নিজের স্বরূপ রাখিয়া। তাই গীতায় সম্বন্ধ-সাধনা অনিবার্য্য। অতিক্রম করার সাধনায় সম্বন্ধ নাই, স্বরূপ হওয়ার সাধনায় সম্বন্ধ অনিবার্য। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ, বোধয়ন্ত-ই তো সম্বন্ধ সাধনা।···ইংলণ্ডের রাজা হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন।···

৬ই ফেব্রুয়ারী

সকাল ৭টার কিছু পূর্ব্বেই হেমাঙ্গবাবু...আসেন। প্রতিভাকে কবিরাজ দেখানর প্রসঙ্গ হয়।···হেমাঙ্গবাবু নারায়ণী কবিরাজী নামে বেশ একজন বড় কবিরাজের কথা বলেন।···বেণু মহেন রায়, নলিনীবাবু, সুরেন বিশ্বাসের বাসায় যায়। তাহাদের পায় না।...মাস্টারদের অধিকার কোনও ভালবাসারই অমন নয়।...উষাদিদির সঙ্গে আলোচনা হয়। যে দুর্দ্দিন, কিছুই তো বলা চলে না অথচ মুখ বুজিয়া সহ্য করাও যে আর যায় না। কেন এমন হইল? কোথায় ইহার পথ? এইভাবেই এখানে পড়িয়া থাকিতে হইবে?···এ আবেষ্টন যে আর আমি পরিপাক করিতে পারিতেছি না। ঠাকুর তুমি জান।···

৭ই ফেব্রুয়ারী

সকালে আফিসে যাই।···বেণু...তার এম. এল রায়ের ওখানে রওয়ানা হয়।···নীলুর এক পোষ্ট কার্ড সকালে আসে।...আমি এক মহা বিপদে পড়িয়াছি। যে রকম করিয়া আমি ভাবি, সেই রকম করিয়া তো কেহ ভাবে না।···

৮ই ফেব্রুয়ারী

আজ আর সকালে আফিসে যাই না। এখানে পুস্তক পরিচয়—'আপ বা গণচণ্ডী' লিখিতে আরম্ভ করি। আরম্ভই করা হয়, অগ্রসর হওয়া যায় নাই। বইটী একটু পড়ি। বেণু মহৎবাবু, প্রিয়দা মদনবাবুর সঙ্গে দেখা করে···। সাবিত্রীবাবুর খুব ভাল লাগিয়াছে 'নির্বাচনের প্রাণকথা' পৌষ সংখ্যায়। এইবার রাজনৈতিক শরৎ বোস speaks—তিনি বলিলেন।···আজ ব্যবহারিক পারমার্থিক, মন ও অতি-মন নিয়া বেণু-প্রতিভার সঙ্গে আলোচনা হয়। সংসারের সকল মানুষের সঙ্গের সম্পর্ককে আমি কত গভীরভাবে, কতখানি ভাগবত সম্পর্ক নিয়া দেখিয়াছি, তাহার আলোচনা করি। কিন্তু মানুষ সকল সম্পর্ককে কাজ-চালানো উপযোগী করিয়া দেখিতে চায়। ইহাদের সম্পর্ক কত hollow। তাই আমার ব্যর্থতা। আমি এই মনেরই এক নূতন rearrangement হিসাবে অতি-মনকে খুঁজি। মন সকল ইন্দ্রিয়ের পিছনে থাকিয়া কাজ করে। দ্রষ্টা চায় দর্শনদ্বারা দৃশ্যকে ভোগ করিতে, দৃশ্যকে নিজের প্রয়োজনে লাগাইতে, বক্তা চায় বচনদ্বারা বক্তৃতার জাল সৃষ্টি করিয়া নিজ স্বার্থ আদায় করিতে।

কিন্তু দ্রষ্টা ও বক্তার মত দৃষ্ট ও বক্তব্যেরও যে একটী স্বয়ংমূল্য সত্তা রহিয়াছে, ইহা কামুক স্বীকার করে না। ইহাই মনের ক্ষেত্র। কিন্তু এই মনই অতি-মন হয়, যখন দ্রষ্টা-দর্শন-দৃষ্ট, বক্তা-বচন-বাচ্য স্বয়ংমূল্য বজায় রাখিয়া নিজের মধ্যে ও নিজের বাহিরে বিশ্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-মৈথুন যোগে চলিতে চায়। দৃষ্ট হইতে aloof দাঁড়াইতে চাহিলেও দৃষ্টের দৃশ্য, কারণ দ্রষ্টা সেই aloofness-এর মধ্যেই থাকিয়া যাইবেই। ত্রিবেণীর মধ্যের মান-সম্বন্ধ, মানসিক সম্বন্ধকে নূতন জাগ্রত ছন্দে গড়িলেই তাহা হয় অতি-মানস। অতি-মানস মনের বাহিরে নয়, উহা মনের অন্তরে ও বাহিরে। অরবিন্দের সাধনায় বাহির জগৎকে সাধনাবিস্তার একরূপ প্রকারান্তরে বাদই দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সাধনা deductive, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তবে descend করিয়া এই সংসারকে গড়িতে হইবে। কিন্তু তাহা হয় না, যাহা একবার ছাড়া হয়, তাহাকে গ্রহণ করা এ জন্মে সম্ভব নয়। নীরেনবাবু আজও declaration আনিতে পারেন নাই…।

৯ই ফেব্রুয়ারী

সকালে আজ আর আফিসে যাই না। বেণু ৮টায় এখানে আসে।…social sense কই ? অথচ পুরুষোত্তম-সাধনার রক্ষা করিতে সমর্থ একমাত্র ঐ 'সামাজিক চেতনা'। জীবন আমার দুঃখময়, দুঃখ বহিয়াই যাইতে হইবে। আমার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া কাহাকেও তো তাহার সমাজ-চেতনা মুছিয়া ফেলিতে হয় না, বরং উহা আরও অধিকতর জাগ্রত হয়। আমাকে পাইয়া কাহাকেও তো কিছু হারাইতে হয় নাই। সকলের সব সম্পর্ক বজায় রাখিয়াই তো সকলকে আমি চাহিয়াছি।…

১০ই ফেব্রুয়ারী

সকাল ৭টার সময়ই আফিসে যাই নীলুর মেয়ে মীরা আসিতে পারে এই আশায়। আসে নাই। প্রতিভা আজ হইতে কবিরাজী ঔষধ খাইতে আরম্ভ করিল। ১২টায় হেমাঙ্গবাবু কেমন আছে জানিবার জন্য ফোন করি। বেণু বাজার হইতে প্রতিভার খাওয়ার জিনিস, পাহাড়িয়া ডুমুর ইত্যাদি কিনিয়া আনে …নীরেনবাবু… declaration দিয়া গেলেন। ফাল্গুন মাসের matter দিয়া দেওয়া হইল। ৭ বৎসরের সম্পর্ক আজিকে সমস্ত প্রেমের সঙ্গে ছিন্ন হইল। প্রাণপণ করিয়াও রাখিতে পারিলাম না। সারা জীবনই তো এইরূপ ভাবে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে চাহিয়াছি। পারি নাই। তাহারা যেন জোর করিয়া ছিন্ন করিয়া গেল। আমি আজিও প্রতীক্ষায় আছি। বেণুকে বলি, 'নবোদ্যে মন আধত্তে'-এর অর্থ এই যে, যখন যাহা মনে হয় তাহা কার্যে রূপ দান করিবার পূর্বে তাহাকে ভগবানে আদান করিতে হয় যাহা মনে হয় তাহা যেন খেয়াল না হয়। তাই সত্য মূল্য পাইল কিনা, বস্তু মূল্যবান ঐ মনন বস্তু-জগতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া করিবে, পরিশেষে অন্তরের নিকটেই বা কি প্রতিক্রিয়া আসিবে, ইহা ভাবিতে পারিলেই মনের মধ্যে অতি-মনের খোঁজ পাওয়া যায়। যাহা মনে আসে তাহার পিছনে ছুটিলে ডুবাডুবি হইবেই। তাই যখন যাহা মনে হয়, তাহা আমার সঙ্গে বুকে বুক মিলাইয়া আলোচনা করিয়া তবে কার্যে রূপ দিতে চাহিও। এ সংযম মনের উপর না থাকিলে বহু লক্ষ বৎসরেও অতি-মনে গড়িয়া উঠিবে না। কিছু মনে হইলেই তখন তাহা হইতে দূরে আসিয়া সব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাল বজায় রাখিয়া ভাবিতে বলিতে হইবে। এই ভাবে অভ্যাস করিলেই মনের অতি মানস সত্তা লাভ হইবে, 'নমঃ ভব' বাক্যের সার্থকতা আসিবে।…

১১ই ফেব্রুয়া

খুব সকালে বাবুসরকার মাখনলাল ধর আসেন তাঁহার সঙ্গে প্রায় ১ ঘণ্টা কথা হয়। গুণ-কৌলীন্য কর্ম-কৌলীন্য দার্শনিকভাবে দূর করিতে না পারিলে ব্রাহ্মণ-কৌলীন্য দূর করা সম্ভব হইবে না, ব্রাহ্মণেত মানুষসমূহের স্ব মর্যাদা স্থাপনও সম্ভব হইবে না—তাহ জোর দিয়া বলি। কলিকাতায় অখিল ভারত

সভা হইবে, আমাকে তাহার সদস্য করা হইয়াছে, সেখানে আমাকে যাইতে হইবে, তাহা জানাইতে তিনি আসেন। তাঁহার সঙ্গে আনন্দবাজার লইয়া বাহির হই। তিনি পথ হইতে চলিয়া যান, আমি আফিসে যাই। ১১টার পর ফিরি।…৫॥০টার পর অনাথবাবুর (হাওড়া) সঙ্গে দেখা। সেও আফিসে যায়। তরুনাল গ্রন্থের কিছুটা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে। এই বই এখন ‘নদের নিমাই’-এ পাঠ হইবে। অনাথবাবুর সঙ্গে ছানা, টমেটো ও আপেল খাই। তাহাকে আমি প্রথমে খাওয়াইয়া দেই, সে-ও আমাকে দেয়।…কুসুম সরোবরে (বৃন্দাবনে) বাক্যহীন রাধারাণীর যে ছবি দেখিয়াছিলাম—যোগমায়ার কোলে সমাসীনা কৃষ্ণ-প্রেমবিরহ-কাতরা শ্রীরাধা, অদূরে বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ—তাহাকেই মাটির দেশে রূপায়িত করিয়া দেখিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছি। স্বপ্নের রাধারাণী, আকাশের রাধারাণীকেই মাটির বুকে চাই। আমার প্রাণ মন চক্ষু কবে তাহা দেখিয়া আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবে? আমি নারী-জাতিকে মহিমময়ী মূর্তিতে দেখিতে চাই, স্থাপন করিতে চাই। মনে হয়, আমার মত এমন করিয়া কেহ বুঝি নারীকে দেখে নাই। কি মহান, কি মধুর, কি গৌরবমণ্ডিত সে। ৯টার পর ফিরি।…কুসুমের নিকট পোস্টকার্ড দেওয়া হয়। ২০ দিন হইল চিঠি দেয় নাই।

১২ই ফেব্রুয়ারী

সকালে আফিসে যাই,…। রেণু মেট্রোপলিটান প্রভৃতি জায়গায় যাইয়া শ্যামবাজারে বিমলা মিত্রের সঙ্গে দেখা করিতে যায়, তাহার কথা সে বলে।…সে গোস্বামী সম্প্রদায়ের, সাধন ভজন করে। সে চিন্তায় নাকের সঙ্গতি হারাইয়া ফেলিয়াছে। রেণুকে পাইয়া খুব খুশী। উজ্জ্বলভারত খুব ভালবাসে। রবীন্দ্রনাথকে সে সাধক হিসাবে ভালবাসে।…সংসারকে এক রকমে জড়াইলে তাহা হয় সংসার, আর এক রকমে জড়াইলেই তাহা হয় সন্ন্যাস। স্বামী-স্ত্রী-পিতা-পুত্র, প্রভু-ভৃত্যকে ‘লীলা’র ভাবে জড়ানো যাইতে পারে। কৃষ্ণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও গো-গোপ-গোপী সব স্বাধীন মর্যাদা পাইয়া পরস্পরের সখ্য দিয়া পরস্পরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-গোপী-বৃক্ষ-লতাদির সেবক। দেশ কাল-পাত্র সকলেই সেখানে সম-মর্যাদার অধিকারী।…

১৩ই ফেব্রুয়ারী

বেশ সকালেই আফিসে যাই। বৈদ্যনাথ (আর্থিক জগৎ প্রেস) আসে না। শরীরটা ভাল নয়। ১০টার সময়ই আসিয়া পড়ি। রেণু ১টার সময় এখানে আসে। রাজেনবাবুর নিকট ফোন করা হয়। রাজেনবাবু ডাকিয়া পাঠান। রেণু সেখানে যায়। কর্তৃপক্ষ উজ্জ্বলভারতের নাম কাটিয়া দিয়াছে। অনেক দিন রাজেনবাবু বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। রেণু বিমানপথের যাত্রী বইখানি শেষ করে।…রাধারাণীকেই তো জীবনে চাহিয়াছি। কোনও অভিসন্ধি—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ অভিসন্ধি—ছিল না। তাই বুঝি মানুষ পাই নাই। প্রাণ ঢালিয়া মানুষের জীবনে পুরুষোত্তম-প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছি। তাই সারাজীবন বেদনাই পাইলাম। ব্যর্থই কি হইলাম? এত বড় দুর্যোগের ভিতর দিয়া যে আজিও চলিতে পারিতেছি, চূর্ণবিচূর্ণ হই নাই, জটিলতম আবেষ্টনের মধ্যেও মাথা তুলিয়া বিচার বুদ্ধি না হারাইয়া দাঁড়াইয়া আছি, ইহাই যথেষ্ট। যদি অপর এক পুরুষোত্তমানন্দ কোনও দিন আসেন, তিনি বুঝিবেন কি জটিলতা ঠেলিয়া আমি গেলাম। মাটির জীবনে রাধারাণীর প্রতিষ্ঠা! এ কি অসম্ভব! কেন? মানুষ তো প্রাণই চায়। তবে কেন প্রাণের ঠাকুরাণীকে সে তাহার প্রাণে বসাইবে না? রাধারাণীকে বসাইলে যে খেয়াল চলে না। তাই সে চায় না। বিচ্ছিন্নতাই মানুষের ব্যাধি। সহজ রাধারাণী তাই নিকটতম হইয়াও দূরে, আপনতম হইয়াও পর।…

১৪ই ফেব্রুয়ারী

বেশ সকালে আফিসে যাই। লোকসেবকের বেয়ারার সকল সেও আসিয়া চেক দিয়া যায় ও ১টা ব্লক লইয়া যায়।…condition বা উপাধি-ই মানুষকে মহাবিপদ

হইতে রক্ষা করে। করিতেছেও। এই উপাধিকে লইয়া কথায় বাধ সাধনা। উপাধিহীন বা আবেষ্টনহীন ব্রহ্মকে এ দেশের লোক চাহিয়াছে। উপাধিহীন স্বামীকে অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক সম্পর্কের মধ্য হইতে ছিনাইয়া লইয়া স্ত্রীরা স্বামীকে চাহিয়াছে। তাহার ফল শুভ হয় নাই। তাহারই প্রতিক্রিয়ায় তো আজ উৎকট আবেষ্টনবাদের কবলে এই দেশটা পড়িয়াছে। উৎকট আবেষ্টনের মধ্যে বিশ্ব আজ হাবুডুবু খাইতেছে। ইহার মধ্য হইতে সুপথে চলিবার জন্যই তো উজ্জলবাদের প্রচেষ্টা। জীবন দিয়াও তাহাই দেখাইতে ও আস্বাদন করিতে চাহিতেছি।…

১৫ই ফেব্রুয়ারী

সকালেই অফিসে যাই।...বেণু পোস্টাফিস ও ব্যাংকে যায়...কলিকাতা যায়,…বীণুর সঙ্গে দেখা হবে।… সন্ধ্যায় সমর বিরজা আসে।...বহু মানুষের সঙ্গে দেখা হইয়াছে সকলকেই মানুষ করিবার জন্য প্রাণপণ করিলাম। পারিলাম কৈ? রাধারাণীর প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্যে মানুষ চাই বলিয়াই তো মানুষ খুঁজিলাম।...বিরজা… গীতার 'তত্ত্বপ্রদীপ' পড়িবার জন্য নিয়া যায়। 'শক্তি ও জীবন' প্রথমে পড়িতে বলি।…

১৬ই ফেব্রুয়ারী

সকালে আজ আর অফিসে যাই না, সারাদিনই 'নির্বাচনের পরে' শেষ করি।...জীবনে কত লাঞ্ছনার ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে, কে জানে? এত ঠেলাঠেলি করিয়াও তো আগাইতে পারিতেছি না। ঠাকুরের ইচ্ছা।

১৭ই ফেব্রুয়ারী

প্রার্থনার পর আমি ও নিত্যব্রত…দুলালীকে দেখিবার জন্য টালিগঞ্জের চার পার হইয়া যাই।…আমাদের লেখার মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা আছে, ইহা তাহার মত। বোধহয় colourless নির্বিশেষ লেখা উঁহারা চান। কিন্তু কোনও বিশেষের আলোচনা না করিয়া এবং সর্ব বিশেষের সমন্বয় না করিয়া যে লেখা হইবে, তাহা কি কোনও দিন কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিতে পারিবে? আলোচনা definite না হইলে, আলোচনায় criticism না থাকিলে সে আলোচনা শেষ পর্যন্ত দানা বাঁধে না। তপস্বী লৌকিক ইত্যাদির সমালোচনা করিলেই কি উহা প্রোপাগাণ্ডা হয়? মনস্তত্ত্ব তো সার্বজনীন। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া পাওয়া কৃষ্ণও কি সার্বজনীন নন? আমার কৃষ্ণ যে বাঁশিরও কৃষ্ণ….

১৮ই ফেব্রুয়ারী

…বিরজা…গীতাজয়ন্তী হইতে কিছুটা পাঠ করে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করি। 'আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে', 'ত্রোপাঙ্গবিপুষ্টঃ' ইত্যাদি শ্লোক অবলম্বনে জীবের জন্য ভগবানের আকুলিবিকুলির কথা আলোচনা করি ও কাঁদি।…

১৯শে ফেব্রুয়ারী

…বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন। কাগজপত্র পড়েন উহা নাকি বহু লোকের পছন্দসই হইয়াছে।…

২০শে ফেব্রুয়ারী

…আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য শ্রীনিত্যগোপালকে আমার বুকে তাঁহার স্বমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কেহ সত্য সত্যই আসে, তা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইব কোনও ব্যবধা না রাখিয়া তাহার সকল ভার মাথায় লইয়া। নচেৎ আমা সঙ্গে কাহারও কোনও সম্পর্ক নাই। শ্রীনিত্যগোপাল ছা কে আমি? তিনি সরিয়া দাঁড়াইলে আমার অস্তি কোথায়? আমাকে পাইতে হইলে, চাহিতে হে শ্রীনিত্যগোপাল ও তাঁহার বিশ্বের মধ্য দিয়া তাহা করিতে হইবে; আমি, নিত্যগোপাল ও বিশ্ব এক-তত্ত্ব, এক-প্রা এক-মন, এক-বিজ্ঞান ও এক-আনন্দ। যাহারা আমা কাছে আসিবে তাহাদের কাছে আমার ইহাই বক্তব্য

তাহাদের গানের জন্য ইহাই ইহাদিগকে বলিয়া দিব। এই সম্বন্ধের ভিতরই সব প্রকৃতির একটা ভাগবতী তত্ত্ব সংস্কারের মিলিতে পারে।…

২১শে ফেব্রুয়ারী

…পুরুষোত্তম-দর্শনে টানাটানি নাই। আমি মানুষের সব পাইবার দাবী করিয়া প্রতীক্ষা করিব, যদি সে তাহার পুঞ্জিভূত প্রাণের ব্যাকুলতা নিয়া সব দিতে আসে, গ্রহণ করিব। ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি মানুষ তো চাই-ই যাহারা সকল প্রাণ লইয়া আমাকে ঘিরিয়া থাকিবে। তাহারাও কৃতার্থ হইবে, আমিও কৃতার্থ হইব। কাহারও কিছু আমি কাড়িয়া নেই না। সকলের সব কিছু থাকিয়াও যে মানুষ অখণ্ড, আমি সেই অখণ্ড মানুষকেই চাই। পিতার মেয়ে, স্বামীর স্ত্রী, পুত্রের মা, সকলের সব হওয়ার পরেও যে অখণ্ড মানুষ, সে-ই আমার। কাহারও মর্য্যাদা আমি লঙ্ঘন করি নাই, করিব না। সকলের সব হইয়াই আমার ষোল আনা হইতে হইবে। সকলের সব দাবী পূরণ করিয়াই আমার পূর্ণ দাবী রক্ষা করিতে হইবে। যাহারা সকলের, তাহারাই আমার ষোল আনা আপন।…সকলের সব অতীতকে সার্থক করিয়া আমি তাহাদিগকে আগাইয়া নিয়া যাইতে পারি—এইখানেই আমার সার্থকতা। চেষ্টাও করিয়াছি তাহাই।…

২২শে ফেব্রুয়ারী

সকালে আফিসে যাই, রেণুকে লইয়া অমার বাসার জন্য রওনা হই।…'শিব' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়। ·র বিবাহের পাত্রপক্ষ ৪।০ হাজারেও রাজি হইতেছে না। য পর্য্যন্ত মেয়েদের পুরুষ-নিরপেক্ষ স্বয়ংপূর্ণ দর্শনের ক্ষেত্র ৎপদে সমাজে স্বীকৃত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত পণের াত হইতে মেয়েদের রক্ষা নাই। বাৎস্যায়ন পর্য্যন্ত ন্যাকে পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। পুরুষোত্তম-র্শনেই শুধু ব্রহ্ম-মায়া সব যাবে।…আমার কাছে আসিয়া কেহই তো শান্তি পায় না। আমার জীবন বেদনায় জর্জরিত, তাই কেহই আমার কাছে নিশ্চিন্ত নয়। আমি সর্বতোভাবেই ব্যর্থ। কি আর করিব? যত দিন আছি, ব্যর্থতা বহিয়া চলিব। কিছুই তো করিতে পারি নাই। কাহাকেও সুখে রাখিতে পারি নাই। চেষ্টা প্রাণপণ করিয়াছি, এই যা তৃপ্তি। নিত্যব্রতদের জন্য বড় বেদনা বোধ করি।…

২৩শে ফেব্রুয়ারী

সকালে আজ আর আফিসে যাই না। মনটা ভাল নয়। সারাদিন একরূপ শুইয়াই থাকি কোনও কথা না বলিয়া।…মাঝে মাঝেই —র মন খারাপ হয়। যতদূর অধিকার ও সুযোগ দিবার তাহা আমি দিয়াছি। আমার তো আর কিছু দিবার নাই। 'তিল তুলসী' দিয়া আমার সবই তো মানুষের কাছে সঁপিয়া দিয়াছি। ইহাই তো সত্যিকার 'পাওয়া'। ইহাতেই তো তৃপ্ত থাকা উচিত। 'আছেন একজন আমার'—এই বিশ্বাসই তো সত্যিকার 'পাওয়া'। 'ঘরে আমার মা আছে যে'। আস্বাদনের ক্ষেত্রে 'পাওয়া' যার যার শক্তিসামর্থ্যানুযায়ী হয়। তারতম্য সেখানে চলে না। সেবকের যাহা-কিছু দীন সম্বল, তাহা দিয়াও সে ধনীর মতনই সেবা করিতে পারে এবং ভগবান দুই-ই সমভাবে স্বীকার করেন। লোক তারতম্য দেখে, সেবা দেখে না। সে স্বল্প লইয়াও তৃপ্ত। আমার সাক্ষাৎ সেবা করিবার যে অধিকার— পাইয়াছে, তাহা কেহ পায় নাই, পাইবেও না। দুনিয়ার মানুষ আসিলে আজ তাহাকেই তাহা স্বেচ্ছায় সরল প্রাণে ত্যাগ করিতে হয়।…

২৪শে ফেব্রুয়ারী

সকালে আফিসে যাই।…জীবনে কোন দিন যোগ্য-অযোগ্য, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করি নাই, মানুষই ভালবাসিয়াছি। মানুষের পোষাককে ভালবাসি নাই। যোগ্যতাবাদীরা বলে, যোগ্য হও, পরে দিব। আমার কথা—আগে নেও, পরে যোগ্য হও। বর্ণাশ্রম ধর্ম যোগ্যতার উপাসক, ভাগবত ধর্ম মানুষের উপাসক। কাহাকেও তো কোন

দিন শান্তি সেই নাই, তা দুলের জন্যই হউক, দুর্বলতার জন্যই হউক বা দারিদ্র্যের জন্যই হউক।···দুলালীর শরীর আবার জখম হইয়াছে, খাইতে ইচ্ছা হইতেছে।···চুনী মিত্র আসে। আধ ঘণ্টার উপর থাকে। তাহার দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বৈশাখ মাসে সমালোচনা বাহির হইবে বলা হয়। কৃষ্ণনগর যাইবার কথা বলে। শরীরটা ভাল বোধ করিলে যাবার পূর্বে যাইব বলিয়া দেই। 'It is as true to say' ইত্যাদি তাহাকে শুনাই।

২১শে ফেব্রুয়ারী

সকালে প্রার্থনা সারিয়া বেহালার জন্য রওয়ানা হই। বাসে গিয়া চার পার হইয়া যাই। একাই যাই। নিত্যব্রতকে ডাকিয়াছিলাম. উঠিল না। চায়ের এপারের কাছাকাছি ঐ কলের কাছে একটি লোক বলিল, 'একটু ঘুরিয়া যান'। দেখিলাম, আমার সামনে তারের বেড়া। পথের ভিতর তিনি থাকেন। 'নর-নারায়ণ' জপ করিতে করিতে চলিলাম। তিনিই তো আমার সারা জীবনের সঙ্গী।··· দুলালীকে কোলে লইলাম।···আসিবার সময় সত্যব্রত আসে।···পথে অনেক কথা হয়।···যে মাটিতে আছাড় খায়, মানুষ তাহা ধরিয়াই উঠে। সকলের সব টাকা ফিরাইয়া দিতে পারিতে, আমি জুড়াইতাম।···বিমলা আসে।··· সে আমাকে বুঝিয়া নিবে। বেশ। তাহাই তো উচিত। কিন্তু নিজে নিজে বুঝিলে কি বুঝা তাহার হইবে?···প্রতিভার সঙ্গে অনেক কথা হয়।

২৬শে ফেব্রুয়ারী

সকালে আফিসে যাই। রেণু জি পি ওলি ঠিক করে ১০টার পর চলিয়া আসি। বিমলা মিত্র রেণুর কাছে এক পত্র দেয়। তাহার জীবনে বোধহয় আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে একটা সংঘাত চলিতেছে। উজ্জ্বলতারও তাই ভাল লাগে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত তাহার বেশ পরিচয় আছে, কিন্তু আদর্শ ও বাস্তব সমন্বিত জীবনের স্পর্শ না পাইলে তো জীবন জুড়াইবে না। একান্ত আদর্শ বা একান্ত বাস্তব বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিত হইতে পারে। কিন্তু উহাদের সংযত জীবন ছাড়া কোথা হইতেই পুষ্টিত হওয়া সম্ভব নয়। Life begets life,...গাঙ্গুলী এক ভদ্রলোক উজ্জ্বলবাবুদের গ্রাহক হয়। তিনি পূর্বে marxist ছিলেন। এখন তাহা তাঁহার পছন্দ নয়। তিনি 'ভারতের মাটিতে মার্ক্সীয় দর্শন' প্রবন্ধগুলি চাহিয়াছেন। জ্ঞানরঞ্জন সেন এখানে আসেন···ভগবান তামস দানের মধ্য দিয়াও ভক্তের কাছে দান পৌঁছান। তাঁহার দান যে সাত্ত্বিকতার মধ্য দিয়াই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ভক্ত যদি এই তামস দানের মধ্য দিয়া ভগবানের সেবা করেন, তবে তাঁহার দাতারও কল্যাণ হয়। তামস দাতা নিশ্চয়ই অভিশপ্ত হইয়া যায়. কিন্তু 'কাম লাগি কৃষ্ণ ভজিলেও সে পায় কৃষ্ণপদে', গৃহীতাকে এ ক্ষেত্রে খুব হুঁশিয়ার হইয়া নিতে হয়। কৃতজ্ঞ সে নিশ্চয়ই থাকিবে দাতার কাছে, কিন্তু কৃতজ্ঞতার চাপে সে যেন তাহার নিজের স্থিতি-ভূমি, সেবাক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে। বরং তাহার টানেই যেন ধরা পড়েন। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি।...

২৭শে জানুয়ারী

সকালে চৈত্রের 'সমন্বয়ের পথপর্যায়'—শ্রীনিত্যগোপাল প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। প্রতিভা নকল করে। তাহার পর ৮টায় আফিসে যাই। চিদানন্দ আসে। আমি ১০টার পর চলিয়া আসি।··· দশগ্রামের গোপাল অধিকারী আসে। ইলেকশান সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। কংগ্রেসের এই দুর্দিনে আবার ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হয়। আমি যেন পারি বলিয়া মনে হয়, কম্যুনিজমকে পরিপাক করাইবার মত দর্শন ও বুকের জোর যেন টের পাই

ক্রমশ

সাময়িকী

গুরুপূর্ণিমা—[শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৯৫৭ সনের ১১ই জুলাই গুরুপূর্ণিমা তিথি দিনে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা হইতে সংক্ষেপে খানিকটা এইখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। স—উঃ ভাঃ]

ভারতবর্ষের সব সম্প্রদায় এই দিনে যার যার গুরু-পূজা করে আসছেন। গুরু কে, পূজা কি, পূজা করলে কি ফল হয়—সে কথা ভাববার দিন আজ। একটি বিশেষ দিন ছাড়া একটি সারা বছর ধরে যতটুকু গুরুপূজা করেছেন, সেই সব ক্ষেত্রেও আজ আবার রওয়ানা হতে হবে। গুরু কে? প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন গুরু—কিন্তু এত ভিন্ন ভিন্ন গুরু আজ অচল—আজ অখণ্ড বিশ্ব রচনার যুগ—রাজনীতিতেও তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সকল গুরুকে আজ সমন্বিত হতে হবে। সমস্ত গুরুদের মিলতে হবে...গুরুরা যদি না মেলেন জন-সাধারণ মিলবে কি রকম করে?···সর্ব গুরুর সমন্বয়, সর্ব ইষ্টের সমন্বয় কি করে হয় শ্রীনিত্যগোপাল তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন···তাই তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের গুরু নন। তাই তিনি কোন বিশেষ আচারের উপর জোর দিতেন না...বিশেষ কোন রূপে তো সর্ব গুরু, সর্ব ইষ্ট সমন্বয় সম্ভব নয়···প্রত্যেক সম্প্রদায় তার সত্তাকে নিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই মহানির্বাণ মঠে সমবেত হবে—এমন কথা নাকি তিনি বলেছেন...ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সামঞ্জস্য হলে তবে তো তারা আসবে?···আর সর্বগুরু সমন্বিত গুরুই সত্যিকারের গুরু।·· পূজা হল সমর্পণ—সমস্ত ছেড়ে দিলে তবে পূজা সম্ভব হবে। দুয়ার ভেঙেছে—জ্যোতির্ময় তিনি এসেছেন—তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ কর···। কি ভাবে পূজা করব? কি মূর্তিতে তিনি এসেছেন?—দুঃখের পথে তিনি আসেন···তিনি আসেন···তিনি আসতে চাইছেন—আমাকে নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে।···পুরনো যুগ চলে গেছে। নূতন রূপে তিনি আসছেন...আরাম, সব স্বাচ্ছন্দ্যের দিন আর নেই··· মানুষের সাথে মানুষের আজ নূতন সম্পর্ক নির্ণীত হবে··· অতীত যুগের আমরা কেউ নই···। পূজা করলে কি হয়? একাত্মতা আসে—একটা বড় কিছুর সাথে একাত্মতাতেই মুক্তি···একাত্ম হওয়ার বাসনা মানুষের স্বতঃসিদ্ধ—কিন্তু ছোটর সঙ্গে, ক্ষুদ্রের সঙ্গে, সীমার সঙ্গে একান্ত একাত্মতায় মানুষ ভোগে—বড়র সঙ্গে একাত্মতায় মুক্তি পায়···আমার মনের তিনি মন, আমার প্রাণের তিনি প্রাণ··গুরু শিষ্য, ভক্ত ভগবানে এই মিলন যে মহা মিলন। এই মিলন হলে 'সকলি যায় খুলে, বিশ্ব-সাগর ঢেউ খেলায়ে ওঠে তখন দুলে'।···আমি তাঁর ছায়া···যথাকাল কৃষ্ণের ছায়া ব্রজ-গোপী।···বড়র সঙ্গে এই মিলনে সমস্ত দুয়ার খুলে যায়··· চতুর্দিকে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়···তিনি আসলে আমার জিহ্বা আর কুকথা বলে না, আমার পা বিপথে যায় না··· আমার দেহ-মন-প্রাণের মালিক তুমি···। আদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে অর্জুনকে বলছেন, দেহকে তারা কৃষ্ণ বলে জেনেছেন···।··

আমারে আলাদা করে কোন পূজা হওয়া উচিত নয়··· আমি প্রতীক···প্রতীকের পূজা করতে পার, কিন্তু কখনো মনে করো না পুরুষোত্তমানন্দ বলে কোন পৃথক সত্তা কিছু আছে...।

[ইহার পর শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৯৫৮-তে দেহ রক্ষার মাস তিনেক পরেই প্রথম যে গুরুপূর্ণিমা তিথি নরনারায়ণ আশ্রমে পালিত হইয়াছিল, সে দিনে পঠিত শ্রীগুরুপূর্ণিমা সম্বন্ধে আশ্রম-সম্পাদিকার রচনাখানি উদ্ধৃত করিলাম। উঃ ভাঃ সঃ]

শ্রীগুরুপূর্ণিমা : ১৬ই আষাঢ়, মঙ্গলবার ১৮৮০, ১৩৬৫ ; ১লা জুলাই ১৯৫৮। আজ শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি—আষাঢ়ী পূর্ণিমা। দীর্ঘ কাল হইতে ভারতবর্ষ এই দিনটিকে শ্রীগুরু পূজার প্রশস্ত দিন বলিয়া ধরিয়া ইহার অনুষ্ঠান করিয়া

থাকে। আমরাও আজ এই দিনে আমাদের শ্রীগুরুদেবকে, আমাদের ইহকাল পরকালের সর্বস্ব-ধন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে স্মরণ করিব, পূজা করিব, তাঁহার ইচ্ছানুসারে নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার সংকল্প লইব।

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে আমাদের শ্রীগুরুদেব পুরুষোত্তমানন্দ গুরু হইতে আমাদের কাছে আসেন নাই, তিনি প্রত্যেকের আপন হইতে আসিয়াছিলেন, আপন হইতে চাহিয়াছিলেন। মা যেমন করিয়া সন্তানকে ভালবাসে, ভাই যেমন করিয়া ভাইকে ভালবাসে, বন্ধু যে সমপ্রাণতা লইয়া বন্ধুকে ভালবাসে, স্বামী যে প্রাণ লইয়া স্ত্রীকে ভালবাসে বা স্ত্রী যে নিষ্ঠ একমনোযোগ দিয়া স্বামীকে ভালবাসে, সন্তান যে আসক্তিদ্বারা পিতামাতাকে ভালবাসে—আমাদের গুরুদেব পুরুষোত্তমানন্দ মানুষের নিকট হইতে সেই প্রাণের সেই ভালবাসা চাহিয়াছিলেন, আমাদের প্রত্যেকের নিকট তিনি এমনই একটী ভালবাসাদ্বারা মণ্ডিত, ভালবাসাদ্বারা কোমল, ভালবাসা দ্বারা সিক্ত প্রাণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে প্রাণ অপূর্ব, সে প্রাণ আমাদের নিকট অপরিচিত—তাই আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, বুঝিতে পারি নাই—তিনি যাহা চাহিয়া ছিলেন তাহা দিতে পারি নাই। তিনি আমাদের কাছে, তাঁহার শিষ্যদের কাছে আর কিছু চান নাই কেবল ভালবাসা ছাড়া। আমরা ভালবাসিতে পারি নাই—শিশু যেমন করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না পাইলে কাঁদিয়া আকুল হয়, তিনিও তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ঐ ভালবাসা সকল মানুষের নিকট হইতে না পাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

মানুষ ভগবানকে চায়, আমাদের গুরুদেব মানুষকে চাহিয়াছিলেন! তাই গোড়াগুড়ি তিনি সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক। তাই তাঁহাকে বুঝিতে পারা মানুষের পক্ষে কষ্টকর হইয়াছিল। তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এই সোজা কথাটী কি বুঝিতে পারিব না যে তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন আমরাও তাহাই যদি চাহিতে পারি, তাহা হইলেই তাঁহার প্রাণ তৃপ্তি পায়, তাহা হইলেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী সুখী হন? তাই তাঁহাকে যখনই স্মরণ করিব, তাঁহাকে যখনই পূজা করিতে উদ্যত হইব, তখন তাঁহাকে যেমন চাহিব তেমনি তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন সেই মানুষকেও চাহিব। তাঁহাকে ভালবাসিব আর মানুষকে ভালবাসিব। তিনি এই দুইটী জিনিষ আমাদের দিয়া গিয়াছেন· নিজেকে দিয়াছেন আর মানুষকে দিয়াছেন তাঁহাকে বাদ দিয়া মানুষ লইয়া সংসার লইয়া মগ্ন থাকিলে তাঁহার তাহাতে আনন্দ হইবে না, আবার মানুষকে আপন করিতে না পারিলে, মানুষকে ভালবাসিতে না পারিলে কেবল দিনরাত তাঁহাকে লইয়া থাকিলেও তাঁহার তাহাতে আনন্দ হইবে না। তাই আজ এই গুরু-পূজার দিনে তাঁহাকে যদি আমরা তৃপ্তি দিতে চাই তাহা হইলে তাঁহাকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে যেন আমরা ভালবাসি।

শ্রীগুরুদেবের দেওয়া এই দুটী বস্তুকে—শ্রীগুরুদেবকে ও মানুষকে—ভালবাসিতে হইলে নিজেদেরকে আমাদের আরও অনেক বড় করিতে হইবে। বড় হইবার জন্য ব্রহ্ম হইবার জন্য তিনি আমাদের ডাক দিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার মধ্যে ডুবিয়া আমাদিগকে অন্তর্মুখী গতিতে সাধনায় গভীর হইতে গভীরতর স্তরে পৌঁছাইতে হইবে, মানুষকে ভালবাসিয়া বহির্মুখী গতিতে নিজেদিগকে আমাদেরকে বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর করিতে হইবে। পুরুষোত্তম-সাধনার পথ এ উভয়তঃ ছড়ানো। প্রতি মুহূর্তে একথা স্মরণ রাখিয়া চলার আমাদের যেন ভুল না হয়।

আমাদের শ্রীগুরুদেবের জীবনে আমরা প্রত্যক্ষে শ্রীগুরুকে আর প্রত্যক্ষাতীতের ইষ্টদেবকে একত্র করিয়া পাইয়াছি—তাই শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ আমাদের কাছে একাকার হইয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষভা পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার নিজকেই মাত্র আমাদের সামনে স্থাপন করেন নাই, শ্রীনিত্যগোপালকেই মুখ্যতঃ আমাদে সামনে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষোত্তমান ও শ্রীনিত্যগোপাল এমন ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছেন আমাদের কাছে উভয়ে পৃথক রূপে থাকিয়াও এক হইয়া

গিয়াছেন। তাই আমাদের এই গুরুপূজা মানে শ্রীনিত্যগোপাল-পূজা, পুরুষোত্তমানন্দ-পূজা। আমরা যেন কখনও শ্রীনিত্যগোপালকে শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ হইতে পৃথক করিয়া না দেখি কিংবা শ্রীপুরুষোত্তমানন্দকে শ্রীনিত্যগোপাল হইতে পৃথক করিয়া না দেখি।

শ্রীগুরুদেব আমাদের নিকট ভালবাসা চাহিয়াছিলেন—সংসারের লোকেরা তো ভালবাসাই চায়—তাহা হইলে তাঁহার ভালবাসা কি সংসারীর ভালবাসা? এ প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন। হয়তো আমাদের মনে হইতে পারে শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে ভালবাসা হইতে মুক্ত হইবার কথাই তো বলিবেন—গুরুরা তো তাহাই বলিয়া থাকেন—তাহা হইলে তিনি আমাদেরকে ভালবাসিতে বলেন কেন, তাহা হইলে আমরা মুক্তি পাইব কি প্রকারে? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে জানিতে হইবে। সংসারীর ভালবাসা আর আমাদের শ্রীগুরুদেবের ভালবাসা এক রকম নয়, এক স্তরের নয়। সংসারী ভাল বাসিয়া নিজের ক্ষুদ্র গৃহ সাজায়, নিজেকে বিরাট বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়, আর আমাদের গুরুদেব ভালবাসিয়া বিশ্ব নাগরিক হইতে বলিয়াছেন, বিশ্বনাগরিক হইয়া ভালবাসিতে বলিয়াছেন। তাই এ ভালবাসায় আসক্তি নাই, আছে বিস্তার, আছে মুক্তি। শ্রীগুরুদেবকে ভালবাসিতে পারিলেই আমরা এই স্তরের ভালবাসার অধিকারী হইতে পারিব, অন্য কোন উপায়ে নয়। তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিলেই আমরা আমাদের জীবত্বকে ডিঙাইয়া শিবত্বের আস্বাদন লাভ করিতে পারিব, অন্য কোন উপায়ে নয়। তাঁহাকে ভালবাসিলে যে আমাদের জীবত্ব শিবস্বরূপে ফুটিয়া উঠিবে—জীবনের এই চলার পথের খোঁজ দিবার জন্যই তিনি আমাদের তাঁহাকে ভাল বাসিতে বলিয়াছিলেন, এমন আকুল প্রাণে আমাদের ভালবাসা চাহিয়াছিলেন। আজ এই গুরুপূজার দিনে আমরা এই সংকল্প গ্রহণ করিব যে, আমরা যেন তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি, বিশ্বকে ভালবাসিতে পারি।

প্রশ্ন যদি হয় যে প্রত্যক্ষভাবে তিনি আজ নাই—তাঁহাকে ভালবাসিব কেমন করিয়া?—এ কথা ঠিক আমরা, যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছি তাঁহার ভালবাসা তিলে তিলে পাইয়া ধন্য হইয়াছি—সেই আমরা বলিতে পারি না। কেন না তিনি অপ্রত্যক্ষ হইলেও অপ্রত্যক্ষ নন—তাঁহার কথা, তাঁহার চলা, তাঁহার সব কিছুই তো আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে—আমাদের বাকি দিনগুলিকে যেন আমরা তাঁহাকে দিয়াই ঘিরিয়া রাখি। এর পরের কথা এই যে, আমাদের শ্রীগুরুদেব ভগবান ও মানুষ এই দুইকে ভালবাসিবার যে চলার পথ মানুষের কাছে তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস তাঁহার সারা জীবনব্যাপী করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রয়াসকে আমরা আজ জাগাইয়া রাখিব, বাঁচাইয়া রাখিব, জাগাইয়া দিব—তাঁহার কাজ নিজের হাতে তুলিয়া লইব—তবেই না তাঁহাকে ভালবাসিলাম! তাঁহাকে ভালবাসিব, তাঁহার কাজকে ভালবাসিব, তাঁহার প্রতিষ্ঠানকে ভালবাসিব, তাঁহার জনকে ভালবাসিব—তবেই না তাঁহাকে ভালবাসিলাম! আবার সেই কথা আসিয়া পড়িতেছে—মানুষকে ভালবাসিবার কথা। আমরা তো বলি—'যে জন নিত্যগোপাল বলে সে আমার প্রাণ রে'—এ কথা যেন আমাদের শুধু কথার কথা না হয়, আমরা যেন ইহা সত্য করিয়া তুলিতে পারি।

যতদিন তিনি প্রত্যক্ষ ছিলেন তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি নাই, যাহা তিনি চাহিয়াছিলেন তাহা দিতে পারি নাই—এ কথা মনে করিয়া আজ প্রাণ আকুল হয়। এ আকুলতাকে তিনি জ্বালাইয়া তুলুন, তীব্র ভাবে জ্বালাইয়া তুলুন, আর সেই জ্বলনের মধ্য দিয়া তিনি প্রকাশিত হইয়া উঠুন, ফুটিয়া উঠুন, উজ্জলভাবে ফুটিয়া উঠুন—আর তাঁহার প্রকাশের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন মরণের দেবতা, তাঁহার জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির ধ্যানের বস্তু শ্রীনিত্যগোপাল-জীবন ও শ্রীনিত্যগোপাল-তত্ত্ব প্রকাশিত হউক বিশ্বের হৃদয়-দ্বারে। শ্রীনিত্যগোপালের বিশ্ব-জীবন, শ্রীনিত্যগোপালের দিব্য জীবন ও দিব্য তত্ত্বকে প্রকাশ করা—আচার ও প্রচার করা ছাড়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের আর দ্বিতীয় কাজ ছিল না। আমাদের চিত্তদাহকে তিনি

চতুর্বর্গ জ্বালাইয়া তুলুন—সেই অগ্নির মধ্যে তাঁহাদের যুগলমূর্তি প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠুক। নিজের চিত্তাধারে স্মরণ করিয়া বলি, 'জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'—আর তাঁহারই মধ্যে তিনি মূর্তি লাভ করুন—তাঁহার বিশ্বজনীন দিব্য মূর্তি দর্শন করিয়া এ দেহ মন প্রাণ আর একবার তৃপ্ত হউক। দীর্ঘ জীবন ভরিয়া তিনি মানুষকে চাহিয়া যে করুণ কান্না কাঁদিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সে কান্না তখনই শান্ত হইবে যখন পীড়িত মানবাত্মা বিশ্ব-মানব হওয়ার পথের খোঁজ পাইয়া বিশ্ব-মানব হইবে, সুস্থ হইবে, মুক্ত হইবে। তাঁহার সে করুণ মুক্তির কথা স্মরণ করিলে বিহ্বলতা আসে। জীবনে কত কান্নাই তিনি কাঁদিয়াছেন, কিন্তু এক ফোঁটা জলও নিজের জন্য ফেলেন নাই। তাঁহার নিজ বলিতে কিছু ছিল না। এমন একটী প্রাণ-প্রবাহের স্রোত তাঁহার সমস্ত জীবনকে অবলম্বন করিয়া বহিয়া গিয়াছে, যাহা বর্তমান মানুষের কাছে দুর্বোধ্য, যাহা ভবিষ্যৎ মানুষের বিস্ময় ও পথ-প্রদর্শক। সেই প্রাণ-প্রবাহের যেটুকু ধারায় নিজেকে স্নান করাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, ততটুকুই তাঁহাকে ধরিতে পারিয়াছি। তিনি পূর্ণ ভাবেই নিজেদেরকে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, দুর্ভাগা আমরা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই—এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। তবে আবার চেষ্টা করিব, সারা জীবন ভরিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার আবার প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চেষ্টা করিব। তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহার প্রাণ-দেবতা শ্রীনিত্যগোপাল স্বপ্রকাশ—বিশ্বজীবনে মহত্তা কালের তাঁহারা প্রকাশিত হইবেনই—আজ আমার ক্ষুদ্র জীবন, আমাদের ক্ষুদ্র জীবন তাঁহার জীবনের যেটুকু দর্পণ হইল, তাহাতে আমরা ধন্য হইলাম, আমাদের ইহকাল পরকাল ধন্য হইল, সার্থক হইল। তাঁহাকে যাহা দিতে পারি নাই, বাকি জীবন ভরিয়া দিনে দিনে তিলে তিলে তাহাই যেন তাঁহাকে দিতে পারি—আর তাঁহাকে সকল সত্তাদ্বারা প্রণাম জানাইয়া এই সংকল্প গ্রহণ করি।

গুরুদেব, তুমি সুন্দর, তুমি মধুর, তুমি রুদ্র, তুমি শান্ত, তুমি শিব। তোমার জীবনের যে চলার পথে তুমি আমায় ডাক দিয়াছিলে, সে পথে তুমি চিরদিন আমায় চালাইয়া নিও। তুমি এমনিই অদ্ভুত প্রাণ-প্রবাহকে আকাশে বাতাসে দেহে মনে প্রাণে দেশে কালে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছ—যাহা তোমার দেহে না-থাকার শূন্যতাকে একেবারে নিছক ফাঁকা শূন্য করিয়া দেয় নাই। পথের বাঁকে বাঁকে তোমার স্পর্শ জিয়াইয়া রাখুক, জাগাইয়া তুলুক। তুমি নিত্যগোপালময় হইয়া ছিলে—আমাদেরও নিত্যগোপালময় হইতে হইবে, তুমিময় হইতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি না হইতে পারিতেছি, ততক্ষণ তোমার আনন্দ পূর্ণ হইবে না, আমারও যে জীবনের সুর কানায় কানায় ভরিয়া উঠিবে না। দুর্যোগের পথে তোমার আহ্বান—বাহিরের দুর্যোগ চিরদিন রহুক—তোমার আনন্দ-স্পর্শ যেন চিরদিন স্মরণ রাখিয়া পথ চলিতে পারি—তাহাই তুমি করিও। এই সেদিন তুমি প্রত্যক্ষ ছিলে, আজ তুমি প্রত্যক্ষ নাই—তোমার বর্তমান জীবন আজ সবমাত্র পরের ভজনে পরিণত হইয়াছে। তোমার প্রত্যক্ষ থাকাকে প্রতি রক্ত বিন্দুতে প্রত্যক্ষ রাখিয়া চলিতে যেন পারি—চিরদিন সকল দুর্যোগ তোমাকে অধিকতর নিকটে আনিয়া দিবে। শ্রীনিত্যগোপালের যে অভয় বাণী তোমার পথ-চলার সম্বল ছিল, তাহাই তুমি আমাদের দিয়া গিয়াছ 'যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি', 'ভয় কি, টেনে তুলব', 'তুমি কি জাননা তোমার যখন যা দরকার ভগবান অন্তর্যামী রূপে তখন তোমায় তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন'—তোমার দেওয়া তাঁর এই অভয়-বাণী লইয়া পথ চলিব। তুমি অভয় দিয়া গিয়াছ। আমাদের জীবনে তুমি প্রকাশিত হইবে শ্রীনিত্যগোপাল প্রকাশিত হইবেন—এ অভয় কি আমরা তোমাকে দিতে পারিব না? দিব, দিব, আমরাও তোমাকে অভয় দিব—তোমাকে প্রকাশ করিব, তোমাকে আচরণ করিব, প্রচার করিব। তুমি আছ, তুমি আছ—আমাদের সমস্ত সত্তায় আছ—আমাদের রক্তের কণা কণায় আছ—আমাদের জ্ঞানে আছ, আমাদের ভক্তিতে আছ, আমাদের কর্মে আছ, আমাদের সব কিছুতে আছ—তুমি আছ। তোমার সে থাকা প্রকাশিত হউক, ফুটিয়া উঠুক। তুমি সুন্দর, তুমি মধুর, তুমি সুন্দর।

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া এনেছ অশ্রুজল
এনেছো তোমার বক্ষে ধরিয়া দুঃসহ হোমানল
দুঃখ যে তাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে
মুগ্ধ প্রাণের আবেশ বন্ধ টুটে
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদ শতদল।

ওগো পথিক, ওগো সুন্দর পথিক, তোমার বিচ্ছেদ আমাদেরকে জাগাইয়া তুলুক, তোমার পথে, তোমার অনন্ত ভ্রমণপথে আমরা চলিব। ওগো চির পথিক, ওগো অনাদি অনন্ত কালের পথিক, তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না—তোমার দিব্য জন্ম দিব্য কর্ম রূপান্তর লাভ করিবে—বিশ্বকে নূতন বিশ্বে গড়িয়া তুলিবার তোমার অদম্য প্রয়াস নূতন পথে যাত্রা করিবে—তোমার সে পথে আমাদেরকে তোমার সাথে রাখিও, তোমার পথে, তোমার বিশ্ব-পথে আমরা চলিব। গড়িয়া তোলা তোমার কাজ—মানুষের পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতিকে অপরিচ্ছিন্ন প্রকৃতিতে গড়িয়া তোলায় তোমার চিরন্তন কাজ—আমাদেরকে আমাদের প্রকৃতি গড়িয়া তুলিতে দাও, তোমার কাজের চিরন্তন সাথী হইতে দাও।

সুন্দর, তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর; তোমার মধুর মাধুর্যময়ী রূপ চোখে লাগিয়া আছে, চিরদিন যেন তোমার সে রূপ দেখিতে পাই: তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার—তোমার প্রকৃতিতে প্রকৃতি মিলাইয়া তোমাকে নমস্কার, তোমার সাথে তুমিময় হইয়া তোমাকে নমস্কার, তোমার সঙ্গে দুই থাকিয়া তোমাকে নমস্কার, তোমার পথ চলার সাথী হইয়া তোমায় নমস্কার, তোমার পথের ধূলি হইয়া তোমায় নমস্কার। তোমার দিব্য জন্মকে স্মরণ করি, তোমার দিব্য কর্মকে স্মরণ করি, তোমার দিব্য দেহকে স্মরণ করি, তোমার দিব্য স্নেহকে স্মরণ করি। তুমি আস, তুমি আমাদের মধ্যে আস; ব্যাকুল প্রাণ বলিতে চায় তোমার সেই দিব্য দেহ লইয়া আস, সেই সুন্দর দেহ, সেই নয়নমনমুগ্ধকর দেহ, সেই দিব্য দেহ যাহাকে আমরা চিনি—অন্ততঃ চিনি বলিয়া মনে হয়। সেই দেহেতে তোমাকে দেখিতে চাই, তুমি আস। সুন্দর তুমি আস।

নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘ সংসদ—নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি। উপস্থিত সকলকে আমি আশ্রমের তরফ হইতে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। আশ্রমের কাজে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা আহ্বান করি।

বিগত ১লা জানুয়ারী ১৯৬১-তে ১৯৫৯-৬০ এর বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার পর ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬১-৬২-র বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয় নাই। হয় নাই কেননা দিন যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া যায়, তাহার নাগাল পাই না। বছর যে ঘুরিয়া গেল, অধিবেশন যে হইল না, এ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইলে যে সময় ও পারিপার্শ্বিক হইতে যেটুকু সাহায্য প্রয়োজন, সেটুকুর অভাব বলিয়াই বছর ঘুরিয়া যায় কি রকম করিয়া তাহা ঠিক পাই না। সঙ্ঘের সম্পাদিকা হিসাবে অপরাধ আমার প্রচুর, আমি এজন্য আপনাদের নিকট মার্জনা চাহিতেছি এবং এই সঙ্গে আপনাদের নিকট এই দাবী করিতেছি যে আপনারাও একটু সক্রিয় হইয়া বার্ষিক অধিবেশন যে করিতে হইবে, এইরূপ ঘটনাগুলি আমাকে দয়া করিয়া স্মরণ করাইয়া দিবেন।

যাহা হউক, আমি ১৯৬০-৬১, ৬১-৬২ এবং এই সঙ্গেই ৬২-৬৩ সনের অডিটেড হিসাব আপনাদের নিকট আজ উপস্থিত করিতেছি।

নরনারায়ণ আশ্রম কিংবা আশ্রম-সঙ্ঘ যাহাদের সহানুভূতির উপর দাঁড়াইয়া আছে তাঁহারা যে সংখ্যায় অল্প কেবল তাহাই নয়, তাঁহারা অনেকেই দূরে, অনেক দূরে থাকেন। সেইজন্য আশ্রমের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক ঐক্যবোধ সত্ত্বেও তাঁহাদের পক্ষে আসা সম্ভব হইয়া উঠে না। আরও একটা অসুবিধা এই যে যদিও বাস্তবিক পক্ষে আশ্রম ও আশ্রম-সঙ্ঘ একই বস্তু, তথাপি বাহিরের দিকে গঠনগত ভাবে ইহাদের আলাদা করার জন্য সব ঘটনারই দুইটী করিয়া ব্যাপার করিতে হয়—এই জন্যই সভা করা বা দূরের লোকের পক্ষে সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা আরও হয় না। যাহা হউক, যাঁহারা আসা যাওয়া করেন অথবা সংবাদ রাখেন তাঁহারা জানেন গত

দুই বৎসরে আশ্রম-সঙ্ঘ কি কি কাজ করিয়াছে। সঙ্ঘের গ্রন্থাগার, পাঠাগার, মেয়েদের বয়স্কা শিক্ষা কেন্দ্র ও মেয়েদের শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র এই তিনটী কর্মক্ষেত্র ছিল। ৫৯-৬০ এর কার্যবিবরণী দিবার সময় গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ছিল ১৩৬৪ খানা, আড়াই বৎসরে ৩১শে জুন ১৯৬৩ পর্যন্ত পুস্তক সংখ্যা হইয়াছে ২১৭০, সেই সময় lending বিভাগে সভ্য ছিল ৩৮, উহা এখন হইয়াছে ৯১ মত; পাঠাগারে পাঠকের দৈনিক উপস্থিতির গড় ১৬। গ্রন্থাগারের কাজ মোটামুটি সন্তোষজনক হইলেও উহাকে যে আরও উন্নত করা উচিত, এ সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইলেও কর্মীর অভাবে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

বয়স্কাদের শিক্ষা ব্যাপারটা ১৯৬১-তে ভালই চলিয়াছিল, ১৯৬২-এর এপ্রিল মাস হইতেই ছাত্রীসংখ্যা কমিয়া যাইতে থাকে। উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলি উঠিয়া যাওয়াই ছাত্রীসংখ্যা কমিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ। যে ক্যাম্পগুলি রহিয়াছে, সরকারী সাহায্য বন্ধ হওয়ায় তাহাদেরও খাটিয়া খাইতে হয় বলিয়া পড়ার সুযোগও তাহাদের কমিয়া যায়। আর সব শেষে ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারীতে নরনারায়ণ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা ছাত্রী সংখ্যা কমিয়া যাওয়ার আর একটি মস্ত কারণ। ছাত্রীসংখ্যা বাড়াইতে হইলে যতখানি শ্রমদ্বারা এই সব অনিচ্ছুক বা লেখাপড়ার প্রয়োজন-বোধহীন ছাত্রী সংগ্রহ করা যায় এবং যতখানি শ্রম করিলে তাহাদের উপস্থিতি বজায় রাখা যায়, তাহা করিবার মত আমাদের লোকাভাব। এই সব কারণে স্কুলটি রাখা আর সম্ভব নয় বলিয়াই বুঝিতেছিলাম। ছাত্রীদের সে কথা জানাইতে তাহারা মে মাস হইতে ২৭ জন করিয়া ছাত্রী সংগ্রহ করিয়া জুন মাসে ৩১ জন ছাত্রী করিয়াছে, জুলাই মাসেও তাহাই আছে। উপস্থিতির গড় ২৪।২৫। যতদিন মেয়েদের উপস্থিতি এইরূপ বজায় রাখিতে পারিব ততদিন বয়স্কা স্কুলটি চালাইব।

শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রটি মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে। ইহার ক্রমশঃ উন্নতিই হইতেছে বলা যায়। প্রতি মাসে সাধারণ ক্লাসে ১৭ জন মত ছাত্রী থাকে। ১৯৬১-র জানুয়ারী হইতে জেটী অ্যাংলো বিভাগ খোলা হইয়াছিল। ১৯৬১-তে ৩ জন প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়াছিল, ৬২-তে প্রাইমারীতে ৬ জন, মিডিল-এ ২ জন পরীক্ষা দিয়াছে, ৬৩-তে বর্তমানে প্রাইমারীতে ৩ জন, মিডিলে ৩ জন, ফাইনালে ১ জন আছে।

বয়স্কা শিক্ষা ক্লাশটী চিরদিন রাখা সুবিধাজনক হইবে না মনে করিয়া অথচ অন্ততঃ একটী শিশু-প্রতিষ্ঠা আশ্রমে থাকা উচিত বুঝিয়া গত ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারী মা সরস্বতী পূজার দিন নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলটী খোলা হইয়াছে। গত বৎসর ভর্তির সময় পার হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে ৮ জন ভর্তি হইয়াছিল; তাহার মধ্যে অনেকে চলিয় গিয়াছিল। এ বৎসর ১২৭ জন ছাত্রছাত্রী এখন আছে। স্কুল-গৃহ ও শিক্ষকদের জন্য সরকার অ সাহায্য করিয়াছেন।

গ্রন্থাগার, বয়স্কা শিক্ষাকেন্দ্র ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহায্য করেন, শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রে জন্য সেন্ট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড সাহায্য করেন সাহায্যের বিস্তৃত বিবরণ অডিটের রিপোর্টে আপনা পাইবেন।

এই গেল সঙ্ঘের কাজের ও টাকা পয়সার মোটামু হিসাব। কিন্তু আগেই বলিয়াছি নরনারায়ণ আশ্র সঙ্ঘের ভিত্তি রহিয়াছে নরনারায়ণ আশ্রমের মধ্ আশ্রমেরই কর্মের একটা দিক আশ্রম-সঙ্ঘ আজ পর্য এ কথা সত্য, আশ্রম হইতে ইহা একেবারে আলাদা বি নয় এবং আমরা আশা করি ইহা আশ্রমের আদর্শকেই চি দিন রূপ দিবে। তাই সঙ্ঘের বার্ষিক বিবরণীতে আশ্রমে কথাটা প্রসঙ্গতঃ থাকা উচিত বলিয়া মনে করি। ত অল্পের মধ্যে একটু বলিব।

আশ্রম ও আশ্রম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমান একটী চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। তাঁহার সামগ্রি জীবনবাদের এই চিন্তাধারা তাঁহার রচিত কাব্যে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যগুলিতে, তাঁহার উজ্জ্বলভারত না মাসিক পত্রিকাতে রহিয়াছে। তাঁহার রচিত ভাষ্য এখনও অনেকই মুদ্রিত হইল না। মানবের চিন্তাজগতে

এই অমূল্য সম্পদকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া রাখিয়া ধ্বংসের হাত হইতে উদ্ধার করা আমাদের একটা প্রাথমিক কাজ। এগারখানা উপনিষদের মধ্যে ৬খানা ছাপা হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদ্খানা ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছি যদিও টাকা কোথা হইতে আসিবে তাহা জানি না। ভাবিয়াছি প্রশ্নোপনিষদ্খানা খুব বড় নয়; ৭০০৲, ৮০০৲ টাকার মধ্যে হইবে মনে হয়—আমাদের আশ্রমবাসীদের জীবন ধারণ যখন চলিতেছে, তখন ইহার মধ্য দিয়াই এই বইখানাও ছাপাইতে হইবে। ইহার পর আরও ৪ খানা বাকি, তাহার মধ্যে মুণ্ডকোপনিষৎ ও তৈত্তিরীয়োপনিষৎ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিয়া মুদ্রণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, প্রায় আড়াই বৎসর হইল, এখনও পর্যন্ত উহার কোন শেষ উত্তর পাওয়া যায় নাই। এদিকে উজ্জ্বলভারত পত্রিকাটি যেমন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবন ও বাণীকে বহন করে, তেমনি ইহা খানিকটা নরনারায়ণ আশ্রমকে ধারণ করিয়া আছে। কাজের নানাবিধ রকমের চাপে উজ্জ্বলভারতের প্রতি দৃষ্টি ও সময় উপযুক্ত পরিমাণে দেওয়া হইতেছে না—আপনাদের নিকট আবেদন জানাই আপনারা যে যে ভাবে পারেন, ইহার প্রচারকল্পে সহযোগিতা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

আশ্রমের আরও অনেকগুলি প্রয়োজনের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি—সেগুলি আশ্রম-সঙ্ঘেরও প্রয়োজন—যেমন আশ্রমের চতুর্দিকের বেড়া ভাঙিয়া গিয়াছে, খুঁটিগুলি বদলান দরকার, গেটটা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে, আশ্রমের জমির মাঝখানটা চতুর্দিক হইতে নীচু বলিয়া জল জমিয়া যায়, মাটি ফেলিয়া এবং জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করিয়া ইহাকে উঁচু করা প্রয়োজন, গেট হইতে লাইব্রেরী পর্যন্ত লম্বা পথটুকুতে জুতা পরিয়া বর্ষাকালে হাঁটিয়া যাওয়া যায়, এরূপ একটা রাস্তা থাকা উচিত—ইত্যাদি অনেকগুলি সমস্যাই রহিয়াছে। আমি মোটামুটি সকল কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। আশ্রম ও আশ্রম-সঙ্ঘের সমস্ত কাজে আপনাদের সহযোগিতা ও সাহায্য আরও বেশী করিয়া প্রার্থনা করিয়া আজিকার সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আপনাদের আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ তত্ত্বমূর্তিতে প্রকাশিত হউন।

ইতি—
রেণু মিত্র, সম্পাদিকা,
নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘ

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য উৎপাদন বাড়ান

ক্ষেতখামারে আর কলকারখানায় আমরা যে যেখানেই
কাজ করি, আমাদের আজ প্রতিজ্ঞা হোকঃ আমরা দিন দিন
উৎপাদন বাড়াতে থাকব—যাতে জাতির সুখ-সমৃদ্ধি হয়,
যাতে অকুতোভয়ে আমরা স্বাধীনতা ভোগ
করতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

সূচীপত্র : ভাদ্র, ১৩৭০. ১৮-৮৫

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (২১) ... ১৯৩
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
২ শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ... ১৯৬
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত ভাষণ হইতে
৩। রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ... ২০০
শ্রীদুর্গামোহন সেন
৪। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী ১৯৫২ (২৯) ২০৪
৫। জীবন সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দ ... ২১২
অধ্যাপক প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। সাময়িকী : সত্য অসত্য ... ২১৯

উজ্জ্বলভারত

(মাসিক পত্র, ১৬শ বর্ষ)

উজ্জ্বলভারতের বার্ষিক মূল্য ৫্ প্রতি সংখ্যা ·৪৫ ন. প.।

মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ' মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেয়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার।

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৬"×৮"।

উজ্জ্বলভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অসম্বদ্ধ সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে একটি জীবনের সমগ্রতার ও যুগদর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

কার্যালয়—উজ্জ্বলভারত
নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রাম: বাগুইআটি
পো: অশ্বিনী নগর
জি: ২৪ পরগণা

কিরণ
কয়েল্ড কয়েল
এজেন্টস্।
দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোম্পানী লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • কানপুর • মাদ্রাজ
OMOAD

তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি আমাদের পাথেয় হউক

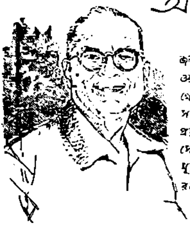

"কর্মীর শ্রম ও ধৈর্যের দ্বারা কি লাভ করা যায় তার জন্য যদি কোন উদাহরণের প্রয়োজন হয় আমি সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের নাম উল্লেখ করবো। ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বিরাট কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিদেশে প্রস্তুত সবচেয়ে সেরা কালির যে গুণগত উৎকর্ষ সুলেখা সেই গুণের অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে সাহায্য করছে। আজকে তাদের এই রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

বিধান চন্দ্র রায়

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬'০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫'০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫'০০	Soul of India Speaks	৫'০০
কর্মবাণী	১'২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১'৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২'০০	পকেট গীতা	২'০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	২'০০	রাজর্ষি রামমোহন	১'৫০
বীরত্বে বাঙালী	১'৫০	আচার্য জগদীশ	১'৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪'০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১'৫০
বাংলার ঋষি	৩'০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১'২৫
বাংলার বিদুষী	২'০০	রবীন্দ্রনাথ	১'২৫
বাংলার মনীষী	১'২৫	জীবন গড়া	'৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি.

বিদ্যাসাগর	১'২৫	বঙ্কিমের গল্প	১'২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯'৫০

"পুরুষোত্তম cult-এ প্রত্যেক অণুটিও এক একটি কেন্দ্র—কি কথাই না তোমার গোপীরা বলিয়া গিয়াছেন? 'অল্প অপিও পূর্ণ, অধিক অপিও পূর্ণ।' এতদিন অল্পের কোন self-centered হইবার যোগ্যতা ছিল না। অল্প সার্থক অধিকের মধ্যে নিভিয়া গিয়া—এই হাইপথেসিসের—অনুমানের—উপর সব সমাজ গড়া। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু সেই মানুষও যে বৃন্দাবনে গিয়া তরুগুল্মলতাজন্ম কামনা করিবে, তাহা কে জানিত বা বিশ্বাস করিত? কৃষ্ণসখা উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়া এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। একটা hierarchy করিয়া একটিকে রাখিয়াছে সিঁড়ির উর্দ্ধ ধাপে কুলীন করিয়া, আরগুলিকে পর পর নীচে নামাইয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে কিছুদিন চলিল বেশ। কিন্তু উচ্চ স্তরের চাপে নিম্নের সবগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিল, তখনই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ছোটরা, নীচের দল, সব বড়দের, উঁচুদের সমকক্ষতার দাবী করিল। ভাগবত বলিলেন, বড় ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে পুরুষোত্তমের direct ও equal relation। গায়ত্রী জপ ও মূর্তির জুতাসেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটা কুলীন হইবে এবং অপরটা অকুলীন হইবে? ঘর ঝাঁট না দিলে যখন ঠাকুর-পূজাই হয় না, তখন ঠাকুরের কাছে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও পূজা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? কে কুলীন, কে অকুলীন?......যদি কৌশলপূর্বক প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সব হইতেও পুরুষোত্তম যতদূর, রজস্তম হইতেও পুরুষোত্তম ততদূর।......এতদিনের সাধনা সব minus-এর সাধনা, নেতি নেতি। কৃষ্ণের সাধনা positive। সবকে রাখিয়া সবকে হজম করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।...... ছোটরাও যে অন্তরে অন্তরে পুরুষোত্তম, একথা তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিয়াছে।...... তাই আজ নোতুন করিয়া শাস্ত্র দিতে হইবে। New Social Order, New Religious Order সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে না পুরুষোত্তম মিলিবে?......"

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

উজ্জ্বলভারত

ভাদ্র, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(২৮)

১২, ৭, ৬৩—সন্ধ্যা:—···। নবনারায়ণ আশ্রম বেদান্ত দর্শনকে বহন করে সমাজের কাছে উপস্থিত করতে চায় এবং তার একটা দিব্য রূপান্তর ঘটাতে চায়, আজ পাঠে তা বলেছি। অনেক বারই বলেছি এ আমি কোন বই পড়ে পাই নি—নিত্যগোপালের স্পর্শে তাঁর আশীর্বাদে আমার বুকের মধ্য দিয়ে পেয়েছি—আমি বুঝেছি কর্ম জ্ঞান ভক্তি সব কিছুরই একটা ব্রহ্মমূল্য রয়েছে, সেটা আমি আস্বাদন করতে চেয়েছি। সমস্ত পৃথিবী যদি বলে এ সত্য নয়, তবু আমাকে বলতে হবে এ সত্য...। সত্যং শিবং সুন্দরং তদর্পণম্ এই সুরে...। সমস্ত সম্পর্ককে আমি ব্রহ্মমূল্য দিতে চেয়েছি—আমি ব্রহ্মবাদী—আমার কোনো সুবিধাবাদ নেই—আমার জীবনে সব স্থূল, সব শুদ্ধ, সব ঠিক, সব অঠিক ব্রহ্মমূল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।... ১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারীর অনির্বাণ যাত্রা কেউ ঠিক বলে নি...আমি নিত্যগোপাল-মূল্যে জীবনকে দেখেছি...এক হিসেবে কিছুই আমার খোয়া যায় নি···এক হিসেবে যাদের হারিয়েছি, তাদেরও আমি আছি। যাদের একদিন বুকে তুলে নিয়েছি, শত বিশ্বাসঘাতকতা করলেও বুকেই আমি রাখব।...এ ধারায় আর কেউ চলেছে বলে আমি জানি না—তাই আমার কেউ নাই...। এ আমার প্রাণ-ধারা—আমি সাধুর দলে নই, অসাধুর দলে নই, আমি সংসারীর দলে নই, অসংসারীর দলে নই...আমি 'কেবল'—তোমরা যদি 'কেবল' হতে চাও, সর্বোপাধিমুক্ত প্রাণকে গ্রহণ কর...নিজের ছিটিফুটি খুঁজে নাও, তখন লক্ষ লোকের সঙ্গে মিশলেও 'কেবল'ই থেকে যাবে।...অমৃতদের কেবলানন্দ...। আমার জীবন ব্রহ্মময়—তোমরা তাই হও—তোমাদের ব্রহ্মময় সত্তা দিয়ে একটা ব্রহ্ম-সঙ্ঘ গড়ে তুলবে—এই তো ইচ্ছা। আম মানুষ পেলাম না, একদিন পাব...কেউ তো ধরা দে না—সবাই পালিয়ে যায়—তাদের পিছনে ছুটি—কখনও ক্লান্ত হয়ে বসি—আবার তাদের পিছনে চলি...অনন্তের ব্রহ্মকে ফুটিয়ে তোল···। আমি গুরু, না তোমরা গুরু; এক হিসাবে আমি পিতা, আর এক হিসাবে তোমরা·· নির্মাল্যস্বরূপ তাঁর চরণে তোমাদের দিতে চেয়েছিলাম...।

১৩, ৭, ৬৩—সন্ধ্যা।···।···পুরুষোত্তম-কৃষ্ণ গীতা স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—আমি ভাগবতধর্ম বলছি, তার স্বল্প মহা ভয় থেকে মানুষকে ত্রাণ করে। অল্পের চেয়েও অল্প—স্বল্প ধর্ম যাজন করে মহা ভয় থেকে উত্তীর্ণ হব?—কি করে হয়? মহা ভয় উত্তীর্ণ হতে মহা সাধনাই করা লাগছিল। কি যাদের জীবন স্বল্প পরিসর, তাদের জন্য স্বল্প সাধনা কথাই কইতে হয়। তার অর্থ এ নয় যে কিছু করতে হবে না—নাক ডেকে ঘুমালেই হবে।...স্বল্পও যে পূ নিত্যগোপাল তা বলতেন। কিন্তু স্বল্প পূর্ণ কখন হয়—শরণাগত হয়ে করলে স্বল্প পূর্ণ হয়। অনন্ত ক নেই, অনন্ত বৃদ্ধিতে—ছোটর এই মূল্য ·কৃষ্ণ দি

গেছেন—শিশুর মুখের অম হাসি—দিবানী নামক বিড়ালটীর খেলা—ভাল লাগে। প্রাণ আছে বলে এগুলি মূল্যবান। লক্ষ নাম তুমি জপ করছ—অভিসন্ধি ও অহংকার আছে বলে তা ভগবানের কাছে পৌঁছায় না—শুষ্ক নিষ্ফল হয়ে গেল। প্রাণ ও নিরহংকারতাই মন সাধনার মহা ভয় থেকে ত্রাণ করে।··

কোন লোক দরিদ্রদের পাঁওরুটি দিত···। অনেক মানুষ পাঁউরুটি নিতে আসে···একটি ছোট ছেলে হুড়াহুড়ির মধ্যে নেই, কোন কাড়াকাড়ির মধ্যে নেই, সকলের শেষে গিয়ে সকলের ছোট রুটিটি আনত, দাতার হাতে চুম্বন করে আসত। একদিন বাড়ীতে গিয়ে সে দেখে রুটির মধ্যে একটি স্বর্ণ মুদ্রা। সে দৌড়াতে দৌড়াতে দাতার কাছে গিয়ে হাজির—স্বর্ণ মুদ্রাটি তাকে দিতে চাইল। দাতা বলল, না, সেটা তারই প্রাপ্য, তার স্বভাবের পুরস্কার। ছেলেটির ধৈর্য, তুষ্টি, বিবাদ না করার মনোবৃত্তি প্রভৃতির মূল্য স্বরূপ বালকটি স্বর্ণ-মুদ্রা পেল।···কর্ম নিয়ে বাহাদুরী করলে সে কর্ম ভগবানে পৌঁছয় না। করুণার একটুকু অনন্ত···একদিনের করুণায় যে তৃপ্ত নয়, সে মায়ার কবলে পড়েছে। যা পেয়েছি অনেক পেয়েছি···সুখে আছি, আছি হবে একথা ভাবতে না পারলে শান্তি নেই। আমির স্পর্শে সোনাভরা ধান শূন্য হয়ে যায়। আমির নেই যেখানে, তখনই আমার ছোট ফুলটী তাঁর পায়ে পদ্মফুল হয়ে দাঁড়াল।···তোমরা মিষ্টি হও, মধুর হও, দুর্বিনয় পরিত্যাগ কর, অহংকার ছাড়...। —এর পিছনে আমার বড় তাড়না, বড় বেদনা···। তোমরা মুক্ত না হলে আমার এ মঙ্গল ঘট ভেঙে দিয়ে যেতে হবে···যাদের মধ্যে বাহাদুরি আছে, তাদের সেবা তো গোবিন্দ নিত্য-গোপাল নেন না।···ঠাকুর, আমার সব কিছু ক্ষুদ্র আয়োজন তুমি গ্রহণ কর—তোমার চরণ-স্পর্শে সব ছোট অনন্ত হয়ে উঠুক···আমার অল্প আয়ু—(আমার আয়ু তো শেষ হয়ে এল)—তোমার চরণ-স্পর্শে পূর্ণ হয়ে উঠুক। আমি সেবা চাই না—যা কিছু পাই তাঁর কাছে পৌঁছে যেই···। দামোদর' পার হয়ে গাড়ীতে যাচ্ছিলাম—মাঝেরা আমাকে কাঁধে নিয়েছে—মনে হবে যেমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল—জপ করছিলাম, ঠাকুর, গাড়ীর ভিতরে তুমি থাক, যে আছে সে মুছে যাক—তোমাকে কাঁধে নেওয়া সার্থক, আমাকে মানুষ কাঁধে নেবে কেন? নিত্যগোপাল, আমার ছোট প্রণামটুকু তোমার কাছে পৌঁছাক—যারা এসেছে, তাদের মানুষ কর, বঞ্চিত করো না—। ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ।

১৭, ৭, ১৯৫৭। সন্ধ্যা। ওঁ নমঃ—। যে ভাবে আমি জীবন চালাচ্ছি তারই একটা ছবি আজ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পেয়ে বড় আনন্দ পেলাম—অথচ এ কবিতা আমার কোনদিন পড়া ছিল না—আজই শুনলাম।

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

—আমাকে স্বর্গ রচনার ভার দিয়ে তিনি আমাকে শূন্য হাতে তাঁর এই মাটির ধরণীতে রেখে আড়াল থেকে হাসছেন।··তোমাদের নিয়ে গড়ে তুলতে পারতাম—কিন্তু তোমাদের তো শূন্য হতে হবে—দেহ দিয়ে দেহশূন্য, বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধিশূন্য, অহংকার দিয়ে অহংকারশূন্য, সব শূন্য হয়ে আমার সাথে যুক্ত হতে হবে।—বুদ্ধ বলেছেন শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি—একথা আমি বুঝি...। বৃন্দাবন থেকে এসে এই শূন্য স্থানকে মানুষ দিয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছি—আমার মান মর্যাদা তোমরা···আমি চিরদিন স্বতন্ত্র...নীলু বলেছিল সে থাকলে আমায় উপবাস করতে দিত না··শুনে উষাদিদী বলেছিলেন যে মানুষটি চিরদিন নিজের মতে চলে আসলেন...সত্য কথা—সত্যিই আমি স্বতন্ত্র···। মানুষকে আমি মর্যাদা দিয়ে নিতে চাই···আমি সুবিধা-বাদী নই, আমি কাজ হাসিল করতে চাই না···শূন্যই কেবল, শূন্যকে শঙ্কর বললেন ব্রহ্ম, বুদ্ধ বললেন শূন্য—তাঁর আকার নেই, তাঁর জগৎ নেই···আমি তোমাদের পূর্ণ করতে চাই···। সংসারের কোন বন্ধন আমায় আটকাতে

পারে নি—কত বড় স্বাধীনচেতা মানুষ আমি, আমার সারা জীবনের কাহিনী শুনলে সে কথা তোমরা বুঝতে পারতে।…তোমাদের কাঠখড় করে তোমাদের দিয়ে নিত্যগোপালের বিরাট বিগ্রহ সেবা করতে চেয়েছিলাম।…হরেকৃষ্ণবাবু বললেন—আপনার উপস্থিতি এখানের আবহাওয়া অনেকখানি বিশুদ্ধ করেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ করতে হলে তোমাদের দিকেও তো দরকার—এত সংযম চাই—সে যারা ব্রহ্মচারী নয়, তা বলো না… অথচ তুমিও চলার বেলায় মনে সব দিক দিয়া সংযত হও—এখানকার পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হও তাহলে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হতে এতটুকু আটকাবে না।

১৮, ৭, ৫৩। সন্ধ্যারতি। ওঁ নমঃ… কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাঁহার স্বরূপ। এই নরের মহিমা বৈষ্ণবেরা কীর্তন করে গেছেন—উপনিষদ্ও তাই। ব্রহ্ম অন্য সমস্ত দেহে তৃপ্তি না পেয়ে মানুষ দেহে তৃপ্তি পেলেন। মানুষের দেহ কিসে বড়?—নিড়ালী বিবালী শুধু ছানা খাবে—এটা ওর দুর্ভাগ্য—মানুষ সব খেতে পারে এইখানে মানুষ বড়। এমনি সবটাতে…মানুষে পশুত্ব দেবত্ব সব আছে—পশু কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধা পায়—সে জন্ম থেকেই সাঁতার জানে—ব্যাঙ্ সাপ দীর্ঘদিন না খেয়ে পড়ে রইল—পশুর হাত পা বাঁধা—যা পারে তাই পারে, তার বেশী পারে না।… …মানুষ এক হিসাবে সর্বপ্রকারে পরাধীন—আবার তার রয়েছে অপার স্বাধীনতা—এই জন্য মানুষ বড়। পশুর সহজ সংযম—কিন্তু মানুষের সংযত হওয়া না হওয়া তার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে—এইখানে সে বড়।…ঈশ্বর কাছেও সে নিয়ন্ত্রিত হয়। দেবতাদেরও হাত পা বাঁধা—কিন্তু মানুষ শুধু কোন দিক দিয়ে বদ্ধ নয়, তার হাত পা সব বৃত্তি নিয়ে সে খোলা—তাই তার কাজ এই সব শাখায় ক্ষমতাকে, সব স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত সাজিয়ে সামঞ্জস্য করা—এমন কিছু নাই যা দেবতা বা পশুর আছে অথচ মানুষ পারে না। …কিন্তু সামঞ্জস্য যেখানে মানুষের সব চেয়ে বড় শক্তি, সেখানে কর্ম আছে, ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই কর্ম আছে ইত্যাদি অবস্থার সৃষ্টি করে মানুষ শক্তিহীন ব্যর্থ হচ্ছে…আদর্শ ও বাস্তব সমান ভাবে চালাতে হবে।…কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে যদি অবাধ বিচরণ করতে হয়, তাহলে নিজের আমিটিকে কোথাও রাখতে হয়—অহংকার দিয়ে কিছুতেই এই সর্ব প্রকার স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পারবে না…। সর্ব ক্ষেত্রে বিচরণ করবার অধিকার একমাত্র মানুষেরই আছে…। আশ্রমে এসেছ, সেবা কর—সেবা মনোবৃত্তি নিয়ে থাক—সব বৃত্তিগুলি যাতে সুসমঞ্জস হ তাই করে যেও…। এক সময়ে সত্যব্রত যদি প্রতিষ্ঠাতে থাকাকালীন গরু সেবার ভার তার উপর ছিল—সমস্ত প্রাণ দিয়ে নিষ্ঠাভরে গরুর কাজ করেছে…আশ্র যদি কখনও গরু রাখা হয়—আগেই বলে রাখি—গ একজনের হাতে থাকবে—গরু যে অন্ন ব্যতীত খড়-ভূ খেয়ে আসবে তা কিছুতেই হবে না—অন্নের এক পয়সা ক্ষতি কখনও আমি করি না…। সত্যব্রত ১ বছ গরু, পরের ছ মাস বাগানের, পরের ছ মাস পায়খা পরিষ্কার এই ভাবে কাজ করেছে।…তোমাদের সব কা by tern করতে হবে…বাইরের টাকা আসে নিবেদে যোগাড়ার উপর…।

১৯, ৮, ১৯৫৩। ওঁ নমঃ তত্ত্বদর্শনে…। গীতার দর্শন, ভাগবতে তারই জীবন। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যু আরণ্যক উপনিষদকে নাগরিক বেদান্ত করে তুলেছেন যুদ্ধের দুই পক্ষের মধ্যে বসে তিনি বেদান্ত শুনিয়েছে নগরের সভ্যতার বুকে বনের বেদান্তকে এনেছেন-ভাগবত নিত্যপাঠ্য—কর্মের জগতের কোলাহলে কৃ যাই পুরুষোত্তম-কথা—তাই নিত্য পাঠ কর্তব্য। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু…কর্মের আকাবি পরিণতিতে, evolution-এর মধ্য দিয়ে ফল আসে-

ক্রম

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত ভাষণ হইতে

ওঁ বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।
ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ম্
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

ওঁ নমঃ তবমূর্ত্তয়ে ভক্ত ভগবতে নিত্যগোপালায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায়।

শুধু ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বের প্রাণপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র মাসের এই কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মকে স্মরণ করিয়া দেবতারা স্তব করিতেছেন—'সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে ...'—ভগবান, আপনি সত্যব্রত, সত্যই আপনার সঙ্কল্প; সত্যই আপনার প্রাপ্তি সাধন; আপনি তিন কালে সত্য, সত্যের কারণ এবং সত্যে অবস্থিত।

এই সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-অবতরণের পূর্ব্বের কাহিনী হইতেছে যিনি পৃথিবী নিজের ভূরিভারে আক্রান্ত হইয়া গোরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। জানিতে পারিলেন ভগবান পৃথিবীর বিপদের কথা বিদিত আছেন—তিনি বসুদেব গৃহে শীঘ্রই জন্ম গ্রহণ করিবেন।

পৃথিবী নিজেকে ভার স্বরূপ মনে করিয়াছিলেন কেন? মানুষ তখনই নিজের কাছেও নিজে ভার হইয়া উঠে, যখন সে নিজের সম্মানটুকু পায় না। শ্রীকৃষ্ণ কয়েকটি অসুর বধ করিতেই আসেন নাই। পৃথিবী—মাটি—যে তাহার নিজস্ব সম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, পৃথিবীকে, মাটিকে সেই সম্মান দিবার জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জড়ের নিজস্ব মূল্য দিতে—জড়ের revaluation দিতে তিনি আসিয়াছিলেন। আসিয়াছিলেন ভিখারী রূপে মানুষ-ভিখারীর সঙ্গে যুক্ত হইতে। মহারাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলিতেছেন—

দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং
সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্।
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো
মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ।
বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্।

কুরু-পাণ্ডব বংশের নিদান স্বরূপ আমার এই দেহ অশ্বত্থামার অস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে, যিনি শরণাপন্না আমার মাতার গর্ভে চক্র ধারণ করত প্রবেশ করিয়া ইহাকে রক্ষা করিয়া ছিলেন, যিনি অন্তরে পুরুষরূপে ও বাহিরে কালরূপে থাকিয়া অখিল দেহ-ভাক্‌দিগকে মৃত্যু ও অমৃত প্রদান করিতেছেন, সেই মায়া-মনুষ্য ভগবানের বীর্য সকল আপনি বলুন।

পরীক্ষিৎ কোন্ অবস্থায় কৃষ্ণ-কথা বাসুদেব-কথা শুনিতে চাহিয়াছিলেন? যখন তাঁহার মাত্র ৭ দিন আয়ু অবশিষ্ট ছিল। কলিযুগের মানুষ কৃষ্ণ-কথা শুনিবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র—তাহাদের মত মন্দাঃ সুমন্দমতয়ঃ মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ আর কাহারা? কলিযুগের মানুষের সমস্যা নানাবিধ—এত রকম ভাবে উপদ্রুত মানুষের আর কৃষ্ণ ছাড়া গতি নাই। কৃষ্ণ শুধু বাঙ্গালীর বা ভারতবাসীর নন, মদনমোহন কৃষ্ণ বিশ্বের। বিশ্বের

সমস্ত মানুষেরই কাম আছে—সেই কামকে কি করিয়া মোহিত করিয়া সুস্থ ব্যক্তি-জীবন, পরিবার-জীবন, রাষ্ট্র-জীবন লাভ করা যায়, সেই তত্ত্ব নিজের জীবনে যিনি রাখিয়া গিয়াছেন সেই মদনমোহন কৃষ্ণ বাঙ্গালীর, জার্মানীর, ইংরেজের, আমেরিকার; কামের যিনি divine রূপ, তাঁহাকে না পাইলে কাম যাইবে কি করিয়া?

সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সত্য কি? শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন, 'সত্যং সমদর্শনম্'। আর শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে, শ্রীনিত্যগোপালকে বুঝিতে হইলে, আমি যে দর্শনের কথা বলিতে চাই তাহা বুঝিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের সত্যকে বুঝিতে হইবে। সমদর্শনই সত্য! দশরথ কৈকেয়ীকে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। রামের বনবাসের বর দশরথের নিকট চাওয়া কৈকেয়ীর উচিত হয় নাই। দশরথের এ সত্য রক্ষাও সত্য হয় নাই। উহা রামচন্দ্রের যুগের সত্য হইতে পারে, কৃষ্ণের যুগের সত্য নয়। কৈকেয়ী ও দশরথের সমদর্শন ছিল না। দুই পক্ষ যেখানে এক রকম করিয়া দেখে না সেখানে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। একজন আড়াল করিয়া বলে, আর একজন আড়াল করিয়া শোনে, সেখানে সত্য নাই। যে অর্থে দশরথ বর দিতে চাহিয়াছিলেন, সে অর্থে কৈকেয়ী বর চান নাই। দশরথ যখন বর দিতে চাহিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনের কোণেও ছিল না যে, রামের বনগমন কৈকেয়ী চাহিতে পারে ··· তোমার দেখা ও আমার দেখা মিলিলে তবে সত্য দর্শন। আসল কথা গোপন করিয়া কার্য হাসিল করা—ইহা সত্য-দর্শন নয়। তোমার কথা যেন বাচ্যার্থে সত্য হয়—কেহ যেন কদর্থ করিতে না পারে। কৃষ্ণ এই সম দর্শন স্থাপন করিয়াছেন, শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যগোপাল সেই সমদর্শন বর্তমান কালের বুকে স্থাপন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ের দৃষ্টিকোণেই শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতেন—নরনারায়ণ আশ্রমের দেবতা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, পুরুষোত্তম শ্রীগৌর, পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল। যাহারা আমার নিকট আসিয়াছে তাঁহাদের চক্ষু লইয়া আমি তাহাদের দেখিয়াছি।···আমার কথা আর একজনে আমারই অভিপ্রেত অর্থে নেয় কি না, দুইজনের দেখা সমান হয় কি না তাহারই উপর সমদর্শন সত্যদর্শন নির্ভর করিতেছে। পুরুষোত্তম ছাড়া আমার কিছু নাই। সমদর্শনে আপন বিপক্ষ নাই···সমদর্শনে নিরন্ধ্র প্রীতি।

কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেন আসিয়াছিলেন সে কথা প্রত্যেক ভারতবাসীকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি নিজের এক নব রূপায়ণ রাখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ এই বহু-নিন্দিত নিজেকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া ঐ নিন্দার প্রতিবাদ করিয়াছেন, নিজের প্রশংসা, খ্যাতি করা যায় কোন্ স্তরে দাঁড়াইয়া তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাই তিনি পুরুষোত্তম। প্রকৃতির নিজস্ব মূল্য স্বীকার না করিয়া সেই অস্বীকৃতির উপর পুরুষ যখন নিজের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি গড়িল, তখনই শোষণের ঘর তৈরী হইল। অস্বীকৃতির মধ্য দিয়া সৃষ্টি হয় পারস্পরিক অবিশ্বাস, পরস্পরের মধ্যে থাকে একটা অন্ধকার, একটা গোপনতা—তাহারই ফল শোষণ। ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধের মধ্যেও ছিল এই অস্বীকৃতি অবিশ্বাস ও শোষণের অন্যায়। পুরুষোত্তম সমন্বয়-মূর্তি। সংযমের স্তরে পরস্পর পরস্পরের সমান অনুগমন করে—তাই তো শ্রীনিত্যগোপালের প্রণাম মন্ত্রে বলিয়াছি 'ভক্ত-ভগবতে'—ভক্ত ভগবানের পিছনে, ভগবান ভক্তের পিছনে।·· মাটি সেবা দিতেছে, কথা কহে না—কিন্তু তাই বলিয়া মাটিকে যেমন তেমন ব্যবহার করিয়া তুমি উপরে উঠিবে তাহা হয় না।...বুদ্ধির বিশেষণ উপনিষদ্ দিয়াছেন কলঙ্কিনী।...বুদ্ধিই অপরকে অস্বীকার করিবার এই বিপর্যয় আনিয়াছে।·· কৃষ্ণের মতন ভক্ত কেউ নাই—তিনি সকলের অনুগমন করিতে রাজী।···অন্ন ও মনের সম্পর্ক কি? মন অন্নের কাছে বাঁধা আছে। উপনিষদ্ অন্ন ক্রমশঃ কমাইয়া শিষ্যকে অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন মন অন্নের উপর কতখানি নির্ভর করে।...খাওয়া কমাইয়া দাও, দেখিবে তোমার চিন্তা করিবার ক্ষমতাই কমিয়া গিয়াছে।···আজ মালিক আর মজুরের এক না হইলে কাজ চলিবে না—তাহাকে দিয়া এত বড় কাজ করাইয়া নিতেছ, মূল্য দিবে না? 'অন্নং ন নিন্দ্যাৎ'—সে প্রশংসার যোগ্য কোন্ স্তরে—তাহাই খুঁজিয়া বাহির

কর।...প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা—যা-কিছুকে বুদ্ধি অবিচার করিয়াছে আমি সেই সব কিছুকে মূল্য দিয়া যাইব। এতদিন যাহাকে মূল্য দাও নাই, আজ তাহাকে মূল্য দিতেই হইবে।

...সেই গল্প জানেন না লঙ্কা ডিঙ্গাইল যেটা তার নাম কি? যাত্রা গানে অধিকারীর আর পাঁচ ছোকরা গায় তাহাদের সঙ্গে দশআনি ছয় আনি ভাগ-ব্যবস্থা। এখন গান গাহিতে গাহিতে অধিকারী হনুমানের নাম ভুলিয়া গিয়াছে—অথচ গান বন্ধ করা চলে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া অধিকারী গান গাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—লঙ্কা ডিঙ্গাইল যেটা তার নাম কি? গাইয়েরা গান গাহিয়াই উত্তর দিল দশ আনি ছয় আনি ভাগ আমরা জানি কি? অধিকারী তখন না বলিয়া পারিল না আজি হইতে ভাগ হইল সমানে সমান—গাইয়েরা উত্তর দিল লঙ্কা ডিঙ্গাইল যেটা বীর হনুমান।

ধনিকে শ্রমিকে আজ সমান সমান ভাগ করিতে হইবে। তাহার মূল্য কি কম? সরিয়া দাঁড়াক সে—দেখি তুমি থাক কোথায়?...এই রকমই ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে একটা অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াই তাই চোরাকারবার চলিতে পারে। মধ্যবর্তী দলকে অপরিচিত করিয়া রাখিও না। ঘটক করিতে হইবে হৃদয়কে। কৃষ্ণের সম্বন্ধে ভাগবত লিখিয়াছেন—ব্রহ্মা দেখিলেন কৃষ্ণের সঙ্গে ভগবান মিশিয়া যান—গো-গোপ সব ব্রহ্মবস্তু; ব্রহ্মা ইহাতে প্রমাদ গণিলেন, গোবৎস সব হরণ করিলেন তখন কৃষ্ণ উভায়িতম্ আত্মানম্ আবার সব কিছু সৃষ্টি করিয়া লইলেন।...প্রজার সঙ্গে জমিদার মেশে ইহা কর্মচারীরা পছন্দ করে না। তেমনি দেবতারা চান না যে মানুষ ভগবানকে পায়। উপনিষদে এ বিষয়ে সুন্দর কাহিনী রহিয়াছে।...হৃদয়ের ধর্মে যাহাকে পাইয়া বাঁচি সে আমারই অপর অর্ধ। Jeans খুব চমৎকার ভাবে এ কথাটা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—Complete objectivity can only be regained by treating the observer and the observed as parts of a single system. Subject object, রাজা প্রজা, নর নারী সব parts of a single system...প্রথমকে, অপরকে বাদ দিতে আজ কিছুতেই পারিবে না—তাহাকে দেখানো স্বীকার নয়। দুই পক্ষ যেখানে মিলিবে সেইখানে ব্রহ্ম ফুটিয়া উঠিবে।

প্রকৃতি পুরুষের ঝগড়ায় সংসার জ্বলিয়া গেল। প্রকৃতিকে, অপরকে আজ ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে—আজিকার কথা শ্রীকৃষ্ণের ভাষায়—রাধাকে ভজিয়া রাধারমণ নাম পেয়েছি অনেক আগে। প্রকৃতিকে আজ ভজনা করিতে হইবে। রাধাই প্রকৃতি, রাধাই matter, রাধা হইতেছেন যাহা কিছু enjoyed—যাহা কিছুকে ভোগ করা হয়। আজ সকলকে লইয়া থাকিতে হইবে—সকলকে ফেলিয়া একলা থাকিলে অন্ন পালাইয়া যায়।...

বর্তমান আমাদের বুদ্ধিপ্রধান বিচারকে বিমোহিত করে—তাই সেই গল্প—গৃহিণী বলিল নোড়াটা বড়ই ভারী, মশলা বাটিতে কষ্ট হয়। বাড়ীর কর্তা সেই নোড়াটাকে সোনা দিয়া মুড়াইয়া আনিয়া গৃহিণীর হারের লকেট করিয়া দিল—গৃহিণী মহানন্দে সোনা-মোড়া সেই নোড়া গলায় ঝুলাইয়া বেড়ায়।—আমাদের দৃষ্টি এই গৃহিণীর মত হইয়া গিয়াছে—তাই মাটি আমাদের প্রিয় নয়, সোনা আমাদের অধিকতর প্রিয়, তাই মায়ের হাতের শাক ভাতের চেয়ে হোটেলের অন্ন আমাদের প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।...আজ প্রকৃতিকে রাজরাণী করিয়া ঋণ শোধ করিতে হইবে।... যে সংসারে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বিচরণ করিয়া গিয়াছেন সেই সংসার পরম পবিত্র হইয়া গিয়াছে। দেবতারা শ্রীকৃষ্ণ-অবতরণকে স্মরণ করিয়া স্তব করিতেছেন, 'দিষ্ট্যাঙ্কিতা ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈঃ দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্'—যে মাটিতে তুমি হাটিয়া গিয়াছ সে মাটি কি স্বর্গ না পৃথিবী তাহা আমরা বুঝিতেছি না।

এই মাটির, জড়ের, ছোটর, নিপীড়িতের, লাঞ্ছিতের স্বীকৃতির তত্ত্ব, সম্মান আর মর্যাদা দানের তত্ত্ব ও জীবন লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র মাসের এমনই এক দিনে ধরার বুকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে আমি চিনিতাম না, না, তাঁহার প্রয়োজনীয়তা বুঝি নাই, ছোটকাল হইতেই

মা মা বলিতাম, দুর্গা আমার ইষ্ট। তারপরে শ্রীনিত্যগোপালের মধ্য দিয়া আমার জীবনে শ্রীনিত্যগোপালই কৃষ্ণ হইয়া আসিয়াছেন।… বৈকুণ্ঠীয় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে শ্রীনিত্যগোপাল বৈকুণ্ঠীয় গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া বিশ্বজনীন করিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন।…সংসারের প্রকৃত অর্থ, সমাজের প্রকৃত অর্থ তিনি দিয়াছেন। বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে না আসিলে সংসার সত্য হয় না।

পুরুষোত্তম, তোমার জন্ম আমার কাছে সার্থক হোক—আমি রাধাগোবিন্দকে বিশ্বে ছড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, পারিলাম না।…আমার দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া বিজ্ঞান দিয়া আত্মা দিয়া তোমাকে নমস্কার। তোমার পাদস্পর্শে ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্মমানুষ।

(শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-কথিত ভাষণ শেষ)

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জন্মকে উপলক্ষ করিয়া আপনারা যাঁহারা আজ এই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন, আশ্রমের পক্ষ হইতে তাঁহাদের সকলকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাই। আজ পাঁচ মাস হইয়া গেল শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ আমাদের ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গত বৎসর এমন দিনে আপনারা তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠের মধুর বাণী শুনিয়াছেন। সে কণ্ঠ আমরা আর শুনিব না—ইহা গভীর দুঃখের কথা কিন্তু তাহার পরের কথা কি? তিনি নাই—কিন্তু তাঁহার কথা তো আছে—আপনারা আজ তাঁহার কথাকে অনুধাবন করিতে, ধ্যান করিতে, জীবনে প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হউন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আপনারা সুখী হইয়াছেন—কিন্তু সেই বক্তৃতার মধ্যে তিনি জীবন সম্বন্ধে যে কথা বলিতে চাহিয়াছেন—সেই কথাটা ধরিতে চেষ্টা করা ছাড়া আজ তো আর অন্য পথ নাই। আপনারা আশ্রমে আসিবেন—তাঁহার বই পড়িবেন, তাঁহার কথা লইয়া আলোচনা করিবেন, বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে, মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে ধরার বুকে ছড়াইয়া দিবার তাঁহার ব্রতকে আগাইয়া দিবেন—আপনাদের নিকট আমি এই আবেদন জানাইতেছি। চিরদিন এই দেহে কেহ থাকেন না, কিন্তু যাঁহারা ব্যাপক ও গভীর জীবনের বাণী লইয়া আসেন, তাঁহাদের কথা কোনদিন শেষ হইয়া যায় না। পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ বর্তমান জটিল আবেষ্টনে মানুষের চলার পথ, চিন্তার পথ নির্দেশ করিতে আসিয়াছিলেন, সে কথাকে আপনারা অনুধাবন করিতে প্রয়াস পান—এই নিবেদন জানাই।

জন্মাষ্টমীর দিনে গত দুই বৎসরে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু তাঁহার বলার সময়েই আমি যেটুকু টুকিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই জোড়া দিয়া আজ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। তাঁহার ভাষণ যেরূপ ছিল এখানে তাহার কিছুই নাই—তাঁহার ভাষণের দৃষ্টিতে বিচার করিলে এই নোট আপনাদের খুশী করিতে পারিবে না। কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষেপে ইহার মধ্যে তাঁহার কথা আছে। তাঁহার ঝড়ের মত বক্তৃতায় নোট নেওয়াও খুব সহজ ব্যাপার নয়—খুব সামান্যই ধরিতে পারিয়াছি—তবু ইহা তাঁহারই কথা—তাই এই জন্মাষ্টমীতে ইহাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম।

আশ্রম-সম্পাদক

রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

['বরিশাল হিতৈষী' হইতে]

॥ শ্রীদুর্গামোহন সেন ॥

কালীগঞ্জ—২১।৪.৩০ তারিখে শাখা কমিটির সভায় প্রস্তাব কালীগঞ্জ কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি বরিশাল জিলা কংগ্রেস কমিটী হইতে সভাপতির নামে প্রচারিত ২০শে শ্রাবণের সভার বিবরণ পাঠ করিয়া বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, দেশ-বিশ্রুত ও ত্যাগী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ ও তাঁহার ১৪৭ জন সহকর্ম্মী কংগ্রেস মেম্বারের বিরুদ্ধে গৃহীত মন্তব্য অত্যন্ত বিদ্বেষজনক ও দেশের ঘোরতর অমঙ্গলকর মনে করে। এই কমিটী জিলা কমিটীকে ঐ মন্তব্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করিতেছে। ২য় প্রস্তাব—সর্ব্বত্র গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী আইন অমান্য মজুত তহবিলের শতকরা ৫০ টাকা বর্ত্তমান জিলা কমিটী অন্যায় ভাবে ব্যয় করার চেষ্টা করিতেছেন। প্রস্তাবানুযায়ী যাহাতে মজুত তহবিল স্থির থাকে, তজ্জন্য জিলা কমিটীকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ৩য়—এই প্রতিলিপি জিলা কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি, সেলফরেন্স অফিস ও কোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হউক।

বিনীত শরৎচন্দ্র দাস মুন্সী
সম্পাদক ঝুলইনগর, কালীগঞ্জ

সপ্তদশ গান্ধী পুণ্যাহে কড়াপুর রামশালা মহাসমারোহে সভা মিছিল—বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্ম্মী সমাগম, কংগ্রেস কমিটির নিন্দা প্রস্তাব—(কিয়দংশ)

গত ১লা ভাদ্র রাম শালা কেন্দ্রে নানাস্থানের কর্ম্মীগণ সমবেত হইয়া অতি প্রত্যুষে স্তোত্র সঙ্গীত সহকারে অফিসের সম্মুখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন শোভাযাত্রাসহ সকল গ্রাম পরিভ্রমণ করে। সভাক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী, তিলক, শরৎকুমারের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্য সুশোভিত করিয়া মহাত্মার বিদায় বাণী—মহাত্মার ফটো সম্মুখে রাখিয়া জলকাদা দুর্গমপথ সকল অসুবিধা উপেক্ষা করিয়াও বহু সংখ্যক নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব সকল গ্রহণ করেন। সপ্তদশ গান্ধীপুণ্যাহের এই পবিত্র আসরে মহাত্মার পূত চরিত্র ও কারাগারের কঠোর সাধনার কথা পুনরায় স্মরণ করিয়া কড়াপুর রামশালা শিবপাশা প্রভৃতি গ্রামের এই জনতা জগৎ-বরেণ্য মহাপুরুষ গান্ধী মহারাজের চরণতলে সমবেত ভাবে প্রণিপাত করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। ২য় ও ৩য় প্রস্তাবের পরে ৪র্থ প্রস্তাবের উত্থাপন করে জিলা কমিটির রিপোর্ট বরিশাল হিতৈষীর কতকাংশ ও শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার ঘোষ মহাশয়ের কংগ্রেস ও কংগ্রেস কমিটী [illegible] নিবেদন পত্র পাঠ করেন।

সম্পাদক, সতীশচন্দ্র ঘোষ

৪র্থ প্রস্তাব

বরিশাল জিলার অসহযোগ আন্দোলনের অগ্রদূত বাংলার মহাপ্রাণ নেতা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ প্রমুখ ১৪৭ জন কংগ্রেস সভ্যের প্রতি যেরূপ অসঙ্গত ভাষায় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া জিলা কংগ্রেস কমিটির মারফতে বিতরিত হইতেছে, তাহা ন্যায়-বিগর্হিত ও নিতান্ত হীন বুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া এই সভা উপলব্ধি করেন এবং দেশ-সেবায় সর্ব্বত্যাগী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষের নেতৃত্বের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন।

৭ই ভাদ্র ১৩৩০

ঠুঁটো জগন্নাথ : জিলা কংগ্রেসের হীন অবস্থা

বাখরগঞ্জ জিলা কংগ্রেস কমিটীর শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু—

মহাশয় : জ্ঞাত হইলাম ২০শে শ্রাবণের জেনারেল মিটিংএ প্রাদেশিক কংগ্রেস ও এ, আই, সি, সির

কংগ্রেস কমিটির ...দেশপূজ্য···শরৎকুমার ঘোষ, অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, দুর্গামোহন সেন প্রমুখ ১৭৭জন···প্রতি একটি ঘৃণিত...ভোটে গৃহীত হইয়াছে। যোগ্য··· দলের অনুপস্থিতির সুযোগে···দেশের অমঙ্গলকর··· প্রতিবাদ কল্পে আমরা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নিম্নলিখিত সভ্যগণ পদত্যাগ করিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

২৭শে শ্রাবণ ১৩৩০

নিঃ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত—কোদাবর
,, নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য—গৌরনদী
,, অনন্তকুমার বসু—ঝালকাঠী
,, সাজ্জনলাল হক—থানা নলছিটি
,, কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—কোতোয়ালী
,, সুরেন্দ্রনাথ দাস—গোমরাজী

সম্পর্ক বর্জন

গত ২০ শ্রাবণের কংগ্রেস সভ্যগণের সাধারণ সভায় দেশপূজ্য শ্রীশরৎকুমার ঘোষ, অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, দুর্গামোহন সেন প্রমুখ ১৪৭ জন কংগ্রেস সভ্যগণের প্রতি যে আপত্তিজনক ঘৃণিত মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে উহা দেশের পক্ষে অমঙ্গলকর। এই দায়িত্বশূন্য সভার কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর যে আংশিক নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে সেই কমিটির সহিত যুক্ত থাকা অপমানজনক বোধ করিয়া এই পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতেছি। গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

নিবেদক

শ্রীঅনন্তলাল গাঙ্গুলী, বাখরকাঠি নলছিটি

বরিশাল কংগ্রেস সংবাদ সভায় শরৎকুমারের কংগ্রেস ব্যাখ্যা।

১২ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৩০ সাল

অদ্য বেলা ৬টার সময় রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ ৬-৮ অবধি পূর্ণ ২ ঘণ্টা কাল বর্ত্তমান কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও [illegible] ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বর্ত্তমান বরিশাল জিলা কংগ্রেস কমিটির মেম্বরগণের আরোপিত দোষসমূহের প্রতিবাদ করেন। দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে এতবড় সভা আর হয় নাই। আর বাবু শরৎকুমারের বক্তৃতা এমন সুন্দর শীঘ্র শুনি নাই। সভায় সকলে নীরবে সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন—এবং বুঝিয়াছেন শরৎকুমার ও তাঁহার বিরুদ্ধ দলের মধ্যে তফাৎ কোথায় এবং কতদূর। পারিলে আমরা ইহার আগামী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

বয়রাবাদ হইতে জানকীনাথ দত্ত নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, চাখার হইতে রমেশচন্দ্র সেন···হইতে অন্নদাচরণ সেন গুপ্ত, উজীরপুর হইতে কাজীরহাট হইতে সম্পাদক কামিনী কুমার রুদ্র, ঝালকাঠি ও বাখরকাঠি হইতে অনন্তলাল গাঙ্গুলী পদত্যাগ পত্র, নলছিটি হইতে শ্রীশচন্দ্র দাস সরকার প্রত্যেকে বর্জিত হইয়া গালাগাল ভৎর্সনা টাকা এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে দৈববাণী প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন।

২৬শে ভাদ্র

কংগ্রেস কমিটির সভা

গত রবিবার অপরাহ্নে ব্রজ মোহন বিদ্যালয়ের গৃহে বর্ত্তমান কংগ্রেস কমিটির এক সভা হয়। মফঃস্বলের কতক মেম্বর তথায় উপস্থিত ছিলেন। বরিশাল সম্পাদকে প্রিয় অনুগত মেম্বর সেই সভায় নিমন্ত্রিত ছিলেন। শরৎ বাবু সুরেনবাবুকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কি তাঁহারা যান নাই। যাহারা আসিয়াছিলেন, তাহার মীমাংসার জন্যই আসিয়াছিলেন, যতদূর শুনিলাম তাহাতে নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ এক কমিটী গঠিত হইয়াছে। তাহাতে রহিলেন বাবু শরৎচন্দ্র গু রোহিণী কুমার গাঙ্গুলী, প্রসন্ন দাস, অনন্ত কুমার সেন নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্য—ইনি সেক্রেটারী হইলেন—এ মাসের মধ্যে কমিটির রিপোর্ট দিবেন। মেম্বারগণে পদত্যাগ পত্রের আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু মীমাংসা অপেক্ষায় আলোচনা স্থগিত থাকে। তৎপর দুর্গামোহন বাবু প্রভৃতির প্রতি নিন্দাসূচক প্রস্তাব রহিত করি প্রস্তাব উপস্থিত হয়।...কিন্তু [illegible]

তুলিয়া লওয়া হয়। কিন্তু স্থির হয় যে অনন্তর বন্ধক দিয়া মাত্র (ছাপা পড়ে নাই) ২০ টাকা সংগ্রহ করা হইবে—সঞ্চিত টাকা তোলা হইবে না—ইত্যাদি, ইত্যাদি—।

গৌরনদী বাণীর সমিতির ১ম অধিবেশনে শরৎবাবুর প্রতি বিশ্বাস জ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষের প্রতি তাঁহার দেশ সেবার জন্য এই সমিতির শ্রদ্ধা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ আছে, এবং তিনি যে কোন দেশ-হিতকর কার্য্য করিবেন তাহার উপর এই সমিতির সহানুভূতি আছে। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ দত্তিদার মহাশয়গণকে তাঁহাদের উপস্থিতির জন্য এবং বাবু অনন্তকুমার সেন মহাশয়ের অনুরোধে বাবু সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত যে উপদেশ দেন এই জন্য সভা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

১৩ই আশ্বিন সৈদায় এই সমিতির পুনরধিবেশনে ইহা ঘোষণা করার কথার পর সভা ভঙ্গ হয়।

সম্পাদক—শ্রীচিন্তাহরণ গুপ্ত
গৌরনদী বাণীর সমিতি
২রা আশ্বিন, ১৩৩০

(দিল্লী বিশেষ কংগ্রেস হয়) কোকনদের কথা, শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের উৎপত্তি, স্বরাজ্য দলের জন্ম ব্যক্তির প্রবলাকাঙ্ক্ষা, কংগ্রেস বিরোধ, কাউন্সিল প্রবেশ মুখ্য। ২য় দিনের অধিবেশনে প্রস্তাব—১—কংগ্রেসের গঠন প্রণালী ও নিয়মাদি সংশোধন করিবার জন্য একটি কমিটি নির্বাচন। ২—গত বার মাসে যে সকল দাঙ্গা হইয়াছে ঐ স্থান পরিদর্শন। ৩—আগামী কোকনদ কংগ্রেসের সময় আলোচনার জন্য একটি জাতীয় একতা গঠন উদ্দেশ্যে এক কমিটি গঠন। ৪—সাম্প্রদায়িক বিরোধ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশে বিবেচনা এবং সংবাদ পত্র পরিচালকদিগকে অনুরোধ। ৫—খদ্দর প্রচলন বিলাতী পণ্য বর্জন। ৬—দেশে ইংরেজদের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কার্য্য করা সম্বন্ধে বিবেচনা।

১৬ই আশ্বিন, ১৩৩০

সভা: গত শনিবার অপরাহ্নে ৫। ডাক্তার দৈবজ্ঞ আইনজ্ঞের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। তাহাতে দিল্লী কংগ্রেস ও বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। বাবু সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত দিল্লী কংগ্রেস প্রতিনিধি নিয়োগ, তাহাদের দিল্লী-গমন, তথাকার বিচার, ব্যবস্থা ও অভ্যর্থনা সমিতির ব্যবহার; দাস মহাশয়ের দলের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন একমাত্র দাস মহাশয়ের দোষেই তাঁহারা বাংলা দেশের আড়াইশত বাঙ্গালী প্রতিনিধি দিল্লীতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন—অথচ অল ইণ্ডিয়ার অভ্যর্থনা সমিতি তাহার প্রতিকার করিতে পারিলেন না। তৎপর বাবু শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় দিল্লীর এই নির্ব্বাচনে দেশবাসী কর্ম্মীদের জীবনে কি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করেন। তিনি বলেন সত্যের প্রতি সুস্পষ্ট এ দুরবস্থার কারণ। অথচ তিনি বেদান্ত ব্যাখ্যা হইতে রাজনীতি ব্যাখ্যায় আসিয়াছিলেন শুধু মহাত্মার বাণী শ্রবণে, তাঁহার প্রচারিত আদর্শে পাইয়াছিলেন নিজের জীবনে আদর্শের ছায়া, তাই বেদান্ত প্রচার ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন জন সমাজে রাজনীতির মধ্য দিয়া ধর্মনীতি প্রচার করিতে। দীর্ঘ ৩ বৎসর তাহা করিয়া সম্প্রতি দেখিতেছেন মহাত্মার কারাবাসের সুযোগ সমগ্র আন্দোলনটাকে পশ্চাতে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে—এখন দেশবাসীর মতের উপরে কার্য্য নির্ভর করে না; যেন তেন প্রকারেণ কমিটী দখলগত করিবার চেষ্টা এবং তাহার সাফল্য কংগ্রেস মূলনীতি···করিতেছে। তাই তিনি বলেন—তিনি কোন কংগ্রেস কমিটির সহিত যুক্ত থাকিয়া কার্য্য করিবেন না, তিনি স্বাধীন ভাবে মহাত্মা প্রবর্ত্তিত পথে তাঁহারই আদর্শ প্রচার জন্য জীবন যাপন করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, দিল্লী হইতে বরিশাল ফিরিবার পথে দেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি ব্রজমোহন কলেজের "সত্য, প্রেম, 'পবিত্রতার" বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা আলোচনা করিয়া বড়ই আক্ষেপ করিলেন। তারপর ওয়াড়েন ফুটবল ক্লাব খেলায় এই জেলার লোকদের যোগদান সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন

যাহার কৃপায় শত শত লোক জেলে গেল, বেত্র দণ্ডে দণ্ডিত হইল, সরকারী কর্মচারীগণের শত লাঞ্ছনা সহিল, তাহার নামের ছাপ—সেই খেলা খেলিতে—সেই খেলা দেখিতে সেই খেলার জয়লাভ করিয়া এত উল্লাস করিতে বরিশালে এত লোকই পাওয়া যায়—কংগ্রেস কমিটির মেম্বরও নাকি খেলার মেম্বর টিমের পরিচালক হয়—দুঃখে লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। তারপর কাউন্সিলে যাইবার জন্য কত প্রতিনিধি দণ্ডায়মান হইয়াছেন—তাঁহারা নানা ভাষায় নিজগুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন, আর প্রমাণ করিতেছেন—তাঁহারা দেশের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য। সেই সমস্ত ঘোষণা পত্রে শত শত লোক অবিচারে দস্তখত করিতেছে—যেন দেশে অসহযোগ আন্দোলন ছিল না—যেন আত্মসম্মান জ্ঞান নাই—তিনি আজ মাত্র আসিয়া বলিলেন আমার মত যোগ্য প্রতিনিধি পাইবেন না, অমনি বৃদ্ধ নেতার দল—কংগ্রেস কমিটির মেম্বর অমনি স্বীকার করিয়া লইলেন। তা ঠিক! অথচ ইহারা জানেন, ইহারা সহর ব্যতীত কোনও গ্রামে কোন দিন যান নাই—দেশবাসীর সুখ দুঃখের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক নাই। কংগ্রেস কিন্তু কাউন্সিলে যাইতে উপদেশ দেন নাই। যে সকল কংগ্রেস সম্পর্কিত লোক একান্ত যাইবেই তাহাদের যদি বিবেকে না বাঁধে তবে যাইতে অনুমতি দিয়াছে। এমতাবস্থায় কেন কাউন্সিলে যাইতে এত আস্ফালন—এ বৎসরে কাউন্সিলের স্বপ্ন দেখিয়া, সুদীর্ঘকাল কংগ্রেসের উপদেশ শ্রবণ করিয়াও দেশের এই দুর্দ্দশা দর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

উপসংহারে তিনি দেশবাসীর নিকট কাতর কণ্ঠে কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ও ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস কার্য্য করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। সভাপতি সভাভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে লালমোহন সেন কয়েকটী কথা বলিতে চান, তিনি তাঁহাকে স্বরাজ্য-পার্টির লোক বলিয়া ঘোষণা করেন এবং দিল্লী কংগ্রেসে ভূপতি মজুমদারের বি, পি, সি, সির প্রতিনিধি হইয়া বন্ধুসহ দিল্লী গিয়াছিলেন—তিনি দিল্লী অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সভায় লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তাহাকে কংগ্রেস প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দিল কে? তি স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির রিটার্নিং অফিসার বাবু শর কুমার দত্তকে ডিঙ্গাইয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন করিয়া? এই প্রকার নানা প্রশ্ন করায় তিনি নিরস্ত হন তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

মহিলা সভা

২৩শে আশ্বিন, ১৩

গত বৃহস্পতিবার ধর্ম্মরক্ষিণী বালিকা বিদ্যালয়ের নূ গৃহে একটী সভা হয়। শরৎ বাবু এখানেও মহিলা প্রতি মহাত্মার উপদেশ শ্রবণ করান, চরকা, খদ্দর ব্যবহ ও দেশের সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যে মহিলাগণের প্রতি একান্ত আবশ্যক বলেন। প্রায় ১ ঘণ্টা বক্তৃতার পরে স ভঙ্গ হয়।

পতিতাদের সভা

গত বুধবার অপরাহ্নে নাথির মহল্লার সহরের পতিতাদের সভা হয়। সভার প্রারম্ভে অনাথকুমার ে চরকা, খদ্দর সম্বন্ধে সরল ভাষায় উপদেশ প্রদানের শ্রীযুত শরৎ কুমার ঘোষ মহাশয় বরিশাল হইতে প্রত্যাব করিয়া মহাত্মা ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় বরিশালের পতিতাদের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেন তদবলম্বনে পতিতাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। ঐ সম্বন্ধে বরিশ নাগরিকগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ প্রদান করে চরকা খদ্দর প্রচলনে ইহাদের পবিত্রতা, স্বাবলম্বন, আ সম্মান বৃদ্ধি হইবে—অতএব সকলেরই চরকা চা কর্ত্তব্য। সেদিন সভায় সকলেই প্রায় খদ্দর প আসিয়াছিল। তাহারা চরকা চালাইতে প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল এবং যতদূর সম্ভব শুদ্ধ জীবন যাপন করি স্বীকৃতি দিয়াছিল।

ক্র

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৩০)

শরীরটা কি ঠাকুর দান করিয়া দিবেন? গোপাল ৮ জনের বাবদ ৩২৲ টাকা দিয়া যায়। রেণু ১০টার পর বাহির হইয়া পাসপোর্ট আফিস, রাইটার্স বিল্ডিং, সুনীল দাস, মেট্রোপলিটান, হিন্দুস্থান ইত্যাদি হইয়া ৫টার পূর্ব্বে এখানে ফেরে। বিরজার সঙ্গে কথা হয়।… বিশ্বপ্রাণ ছাড়া কেহ মদনমোহন হয় না। ব্যক্তিগত জীবন যাপন করিলে বিরোধের পথ অনিবার্য। বিরাট কর্মক্ষেত্রে, জ্ঞানক্ষেত্রে, প্রেমের ক্ষেত্রে সকল নারীর বেদনা লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। প্রত্যেকের জীবন-সমস্যা যে কাহারও একার নয়, উহা যে লক্ষ লক্ষ লোকেরই সমস্যা, একের জীবনে উহার কথঞ্চিৎ সমাধান হইলে তখন অন্যের জীবন সমস্যা সমাধান আরও ঘন হয়।…

২৮শে ফেব্রুয়ারী

সকালে 'সমন্বয়ের পর পর্য্যায়—শ্রীনিত্যগোপাল' প্রবন্ধের আরও কিছুটা লিখি।…আফিসে যাই।… রেণু জ্ঞানবাবুর কাছে urgent telegram করিয়া আসে। রেণু এখানে তাহার প্রবন্ধ 'জগতে তোমার নাম' নকল করে। অনেক কথা বলি। সারা জীবন নারীর সম্মান ও মর্য্যাদা দিতে প্রাণপণ করিয়াছি। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় নিপীড়িতা ইহাদের বিরুদ্ধে লেখনী চালাইব না, ইহাদের মহিয়সী রূপই তো ধ্যান করিয়া আসিয়াছি। কোনও দিন কোনও ব্যবহার দ্বারা উহাদিগের অপমান করি নাই। নারীর হৃদয়েই বিশ্ব বিশ্রাম করিতে চায়, পায়ও। মায়ের বুকে সন্তান, স্ত্রীর বুকে স্বামী। এই হৃদয়ের মাধুর্য আস্বাদন করিতেই বিশ্ব পাগল। তন্ত্র ইহাদেরই পথ দেখাইয়া গিয়াছে। পুরাণ তেমন করিয়া নারীর মর্য্যাদা দেয় নাই। রজস্বলা নারী পুরাণে অস্পৃশ্যা, তন্ত্রমতে তখনই তাহারা পূজ্যা। পূজা করিতেই চলিলাম। প্রকৃতি সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী—সকলেরই সর্বমঙ্গলা রূপ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছি। তামসীও তো ব্রহ্মময়ী। তাঁহার সামনে মস্তক অবনত করিয়া মঙ্গল রূপেরই ধ্যান করিয়াছি। নারীকে মুক্তি দিয়াছি, তাই নারীও আমাকে মুক্তি দিয়াছে। ভয় আমার নাই। 'যো মাং জয়তি সংগ্রামে'—এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে আপ্রাণ করিয়াছি।… বিরজাকে নারী প্রগতির কিছুটা পড়াইয়া দেই।… আমি সব ভার বহন করিব যতটা পারি।…

২৯শে ফেব্রুয়ারী

সকালে 'সমন্বয়ের পর পর্য্যায়' শেষ করিয়া ৮টার পর আফিসে যাই। প্রতিভা নকল করিয়া দেয়। ১০টার পর আসি। রেণু…১১টার পর পাসপোর্ট আফিসে যাইয়া বসিয়া থাকিয়া উহা সংগ্রহ করে। এখানে আসে ৩টার পর। জ্ঞানবাবুকে ট্রাঙ্ক কল করে…। সিদ্ধান্তদর্শনের কিছু অংশ প্রতিভা পড়ে। কি অদ্ভুত এই গ্রন্থ! অথচ তাঁহার ভক্তগণ ইহার সম্বন্ধে কত উদাসীন! এই গ্রন্থ প্রচারিত ও আস্বাদিত হইলে নূতন বিশ্ব রচিত হইবে। তখন এই ধরার বুকেই ব্রহ্মধাম গড়িয়া উঠিবে।…এই দর্শন ছাড়া কি করিয়া বর্তমান যুগ সৃষ্টি হইবে? তাই শ্রীনিত্যগোপাল যুগস্রষ্টা। কোথাও তাঁহার ভক্তেরা তো ইহা লইয়া মাথা ঘামান না। আমার উপরই যেন এই দায়িত্ব চাপিয়া বসিয়াছে। রেণু-প্রতিভা যদি ইহা প্রাণ দিয়া বুঝিয়া নেয়, তাহারাই তো যুগের সামনে দাঁড়াইয়া যুগ-রচনার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে, ঠাকুরের কৃপালাভেও ধন্য হইতে পারে। ঠাকুর, তাহাই যেন হয়। ঠাকুরের এই অমূল্য দর্শন থাকা সত্ত্বেও কি তিনি ডুবিয়া যাইবেন?

তাহা অসম্ভব। সে আজ ঠাকুরের জন, এস, আসিয়া মাথা পাতিয়া এই দান নেও। ঠাকুরের এই সমন্বয় ব্যাপকতর ও গভীরতর। কেহ কি ইহা কল্পনাও করিয়াছে? 'এক', 'পূর্ণ' প্রভৃতি শব্দের কি dynamic অর্থ! তাঁহার জীবনে চার্বাক দর্শন ও শঙ্কর-দর্শন সমন্বিত হইয়াছে। ইহাই সমন্বয়ের চরম ও পরম রূপ। 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্র শ্রীনিত্যগোপালেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।···সারা জীবন তো মানুষের জন্য অপেক্ষাই করিলাম। কৈ, মানুষ আসিল কই।...সতীশ গুহের এক চিঠি আসে। উজ্জ্বলভারতের ফাল্গুনের লিনো ছাপা দেখিয়া খুসী হইয়াছে। সকলের খবর জানিতে চাহিয়াছে। বোধহয় নিজ পরিবার হইতে কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের কি দুর্দ্দৈব। মানুষটী কত বড় পণ্ডিত! প্রাণও তো আন।

১লা মার্চ

সকালে আজ আর আফিসে যাই না।···আমি সকালে 'প্রাণ' সম্বন্ধে পুস্তক পরিচয় কিছুটা লিখি। সিদ্ধান্ত দর্শন পড়ি। পড়িতে পড়িতে অবাক হইয়া যাইতে থাকি। কেমন করিয়া ঠাকুর ইহা আমাকে দিলেন, আর কেমন করিয়াই বা ইহা বিশ্বের মাঝে ছড়াইয়া দিব? বেণু প্রতিভাই তো ইহার প্রচারের মূলাধার হইবে।···ঠাকুরের এই বিপ্লবী দর্শন কি করিয়া ধরার বুকে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহার আলোচনা করি। আমার বুকটার মধ্যে বড় তাড়না। কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছি না।...

২রা মার্চ

সকালে 'প্রাণ' পুস্তক পরিচয় লেখা শেষ করি। ৭-২০-তে আফিসে পৌছি।···-কে তাহার মন হইতে erase করিয়া ফেলিবার সাধনা নাকি লইয়াছেন। তাহাতেই নাকি সত্যকে ঘনতম করিয়া পাওয়া হইবে। প্রথম দিনের পাওয়া যখন···জমিয়া উঠিতে পারিল না, তখন তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলাই নাকি সত্য রক্ষা। কত গোঁজামিলই না মানুষ দিতে পারে!...ভগবৎ বিধান যদি বাস্তব ঘটনার সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ না করে, তবে শয়তানের বিধান ও ভগবানের বিধানের পার্থক্য মানুষ ধরিবে কি করিয়া? 'এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন গোপাল'—অথচ সেই গ্রন্থেই আছে যে বৃন্দাবনবাসিগণ 'হা-রাম' বলিয়াই ভগবানকে পায়, 'কৃষ্ণ' বলিয়া পায় না। বর্ত্তমান যুগের মদনগোপাল কি এই কথা বলিবেন? যুগে যুগে মানুষে মানুষে মদনগোপাল বদলান—ইহা না বুঝিলে যে চতুর্দিকে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইবে। কোথায় মিলন? ১০॥টায় জ্ঞানবাবু আসেন, তখনই বেণুকে লইয়া চেতলা এয়ার অফিসে টিকিট কিনিতে যান।···অনাথবন্ধু আসে তাহার এক বন্ধু শৈলেন দাসকে লইয়া।···অনাথবন্ধু সন্দেশ আনে। আমি উহাদের ২জন, প্রতিভা-বেণুকে দিয়া খাই। গৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়—আমার জীবনে কেমন করিয়া সেই তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করি। বৃন্দাবনের কৃষ্ণদাস বাবাজীর কথা বলি। যে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু আজ কি ব্যবস্থা করিতেন তাহাদের সম্বন্ধে যাহাদের পা জোর করিয়া বৈষ্ণবীগণ বুকে স্পর্শ করে? বর্ত্তমান যুগের গৌরাঙ্গ ৪৫০ বৎসর আগের গৌরাঙ্গ নহেন। তাঁহাকে আজ চিনিতে হইবে।···

৩রা মার্চ

সকালে 'শ্রীচৈতন্যতত্ত্বপ্রবোধিনী' গ্রন্থখানি একটু নাড়াচাড়া করি। পরে আফিসে যাই। ১০॥টার পর চলিয়া আসি। বেণু ১১-২০-তে কলিকাতা বাহির হয়। শেষে মহানির্বাণ মঠে ঠাকুরের সঠিক তিরোভাব-তিথি জানিয়া এখানে ৪টার পর আসে। ঐ তিথি হইতেছে কৃষ্ণা দশমী।···মেয়েরা সভ্য হইয়া গিয়াছে, তাই তাহাদিগের বিবাহের জন্য কোনও সর্ত্তের ভিতর দিয়া পুরুষকে pass করিতে হয় না। কিন্তু সীতার বিবাহে সর্ত্ত ছিল 'হরধনুভঙ্গ', দ্রৌপদীর বিবাহেও সর্ত্ত ছিল। শ্যামসুন্দর রাধাকে পাইবার জন্য বাঁশী শিখিয়াছিলেন; প্রথমে যে বাঁশী বাজাইলেন, তাহাতে নারীগণ আকৃষ্ট হইল, কিন্তু গোপীগণ হইলেন না। তাহার পর যে বাঁশী বাজাইলেন তাহাতে গোপীগণ আকৃষ্ট হইলেন বটে কিন্তু রাধারাণীকে

কিছুতেই আকৃষ্ট করা সম্ভব হইতেছিল না। ইহার পর বাঁশের বাঁশী সকল মাধুর্য্য পূর্ণ করিয়া যখন বাজাইলেন, তখনই শ্রীরাধা পাগলিনী হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। এই বাঁশী বাজানো সকলকেই শিখিতে হইবে, শিখাইতে হইবে। পুরুষ হইলেই যে-মেয়ে পাওয়া যায় না, আর তেমন মেয়ে হইতে হইবে। আমার এখানের মেয়েরা যেন তেমন মেয়ে হয়, যাহাদিগকে পাইতে হইলে পুরুষদের আকর্ষণ করিবার উপযোগী যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। নারীর রাধারাণী-রূপ প্রতিষ্ঠাই আমার জীবন-ব্রত। ৯টার পর আসি।···

৪ঠা মার্চ

সকালে আফিসে যাই। ১০টার পর ফিরি। বেণু প্রিয়দারঞ্জনবাবুর বাড়ী গিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের ২ সংখ্যা আনে। তাহার পর বাসন্তী, এম সরকার প্রভৃতি জায়গায় যাই।···মনটা আমার ভাল নয়। ইহাই তো আমার স্বাভাবিক। হাসাটাই আমার জীবনে অস্বাভাবিক।··· প্রস্রাব কষা ও জ্বালা। কি আর করিব? কে আমার সামান্য এই প্রয়োজনটুকুর খোঁজ নিবে? যখন যাহা জুটিত তাহা খাইয়াই এতদিন চলিয়াছে; এখন তো তাহা চলে না। অথচ কে আমার করিবে? রাত্রিতে আজ আর ঘুম হয় নাই। সব শুদ্ধ যদি ১৫ মিনিট ঘুমাইয়া থাকি। বুকভরা বেদনা। সবাই যেন ছাড়িয়া গিয়াছে। একটা শূন্য। ঠাকুর, তুমিই আমার আছ। তাই বাঁচিব। তোমার সেবা করিব, তোমার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিব আশা ছিল। উহা আমার দুরাশা নিশ্চয়ই। ছিন্ন কুম্ভে জল আনিবার কি সাধ্য আমার! ঠাকুর, আমি তোমার—ইহা যেন ভুলি না।

৫ই মার্চ

সারা রাত্রি বিনিদ্র থাকার পর প্রাণে ব্যথা নিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণতলে আমার যা-কিছু কথা নিবেদন করি। শরীরটা খুব ক্লান্ত, তাই বাহির হইলাম না।···আমিই গেলাম।···মীরার আদায় নীলুর আদায় পূর্ণ পূজা হয়। ……?

৬ই মার্চ

সকালে প্রার্থনায় মীরাও যোগদান করে। 'মানুষ'-কে আবাহন করা হয়....কেন জপে ফল হয় না, তাহার আলোচনা করি—'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি' ইত্যাদি। গুরু-কৃপাতেই মানুষ মুক্ত হয়, জপ শুধু তাহার সেবার জন্য। মানুষ পাইয়াই আছে, না-পাওয়ার ভুল ভাঙার জন্যই সাধনা—একথাও বলা চলে। 'বিদ্যা-তপ-প্রাণনিরোধ' শ্লোকটী আস্বাদিত হয়।···

৭ই মার্চ

সকালে প্রার্থনার পর মীরাকে লইয়া দেশবন্ধুর মন্দির, পুলের ওপারে, কেওড়াতলা শ্মশান, মহিমবাবুর মন্দির ও মহীশূর পার্ক ঘুরিয়া আসি। আফিসে চলিয়া যাই। সেখান হইতে বেণুদের বালীগঞ্জ গার্ডেনস-এ রেবতী সেনের ওখানে যাই। কিছু কথাবার্তার পর ৯টায় আফিসে পৌছি। আসিয়া দেখি কলম্বো হইতে আনন্দবাবু ফিরিয়াছেন।··· জটিলতায় পূজা করিতে চাহিয়াছিলাম। জটিলতার চরম।···বিরজা আসে, উজ্জ্বলভারতের ভূমিকাটা পড়ে, আমি বুঝাইয়া দেই।···ছেলেটি কম্যুনিষ্ট হইলেও গোড়া মনে হইল না। সে বলিল, তাহার পার্টির মতবাদ ও তাহার নিজস্ব মতবাদ পৃথক। মাখনবাবু আসে। বিরজাকে 'কামব্যূহে'-র কথা বলিলাম। দুই দল মেয়ের দরকার—এক দল বাহির হইতে ধাক্কা দিবে, অপর দল ঘরের ভিতর দিয়া ধাক্কা দিবে। দুই দল ব্রজগোপীর কথা বলি। মেয়েরা সাধন করিলে পুরুষদল সংযত হইবে। মেয়েরা আজ সস্তা হইয়াছে। বিনা যোগ্যতায় যে তাহাদিগকে পুরুষ পাইবে না, ইহা মেয়েরা বুঝাইয়া দিবার মত জীবন লাভ করে যেন।···

৮ই মার্চ

সকালে ৬টার পর নিত্যব্রতকে লইয়া রাজাবাবার ওখানের জন্য রওয়ানা হই। নেতাজী নগরের পরই নামিতে হয়, বেশী সময় লাগিল না। রাজাবাবার সঙ্গে অনেক কথা হয়। মাঘ ফাল্গুনের সংখ্যা ও কেন উপনিষৎ দিয়া আসি। ভগবানের করুণার কথা—এক কাপা-

কড়িও ছাড়িয়া যেন না সেখানে একটি মোহর না রাখিয়া, প্রাণধর্ম প্রতিষ্ঠার যুগ আসিতেছে, যাহারা প্রাণধর্মী তাহারাই এই যুগে এই transition-এর মধ্যে শহীদ. আর প্রজ্ঞাবাদীরাই লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণুর লক্ষ্মী আর ব্রাহ্মণ-গৃহে বন্দিনী, বৈষ্ণব আর লক্ষ্মীছাড়া ইত্যাদি কথা আলোচনা হয়। সেখানে সোনাবাগানের কালী উপাসক আসেন, তিনি মা-কে লইয়া আসিয়াছেন।…

৯ই মার্চ

সকাল ৯।০টার পর আফিসে যাই।…দেখিলাম আমার নয়নের জল তাহার (মীরার) উপর কোনও প্রতিক্রিয়া আনে নাই। আমি একার বাসায় চলিয়া যাই। রেণু তাহাকে দক্ষিণেশ্বর রাখিয়া আসে।…বলিয়াছিলাম, আমি নীলকণ্ঠ। যে-বিষ আমার জীবনে পুঞ্জীভূত, তাহা যদি বাহিরে ঝাড়িয়া ফেলি, তোমরা পুড়িয়া যাইবে। নিত্যগোপালের আশীর্বাদে সব পরিপাক করিয়া চলিয়াছি। তাই মাথা ও হৃদয় আজও একরূপ সুস্থ আছে। সারা জীবন বিষ পান করিয়াই চলিয়াছি। নীলুর মেয়েটা থাকিল না—বেশ দুঃখ বেদনা বোধ করিতেছি। মানুষকে ভাল তো বাসিলাম, কিন্তু পাইলাম না তো কাহাকেও। বাহিরের কিছু যে সেই নাই, ক্ষুদ্রতম ঘটনার মধ্যে প্রাণের আস্বাদন চাহিয়াছি, তাই এত বেদনা। রাধারাণী যদি আমার জীবনে শুধু চিন্ময়ী হইতেন, বিশ্বের অনেকখানি ব্যবহারিক সত্তামাত্র হইত, তখন আর এত বেদনা হইত না। জড়ও অনন্ত, সেই অনন্ত জড়ের বুকে চৈতন্যের জমাট বাঁধাও তো অনন্ত। তাই অনন্ত বিরহ থাকিয়াই যাইতেছে। আমার বেদনা আমি জানি। কাহাকেই বা বুঝাইব, কে-ই বা বুঝিবে? বুঝিবার দরকার নাই। সে-ও তাহা হইলে আমার মত জ্বলিবে। রাধারাণীর জীবন বেদনায় জ্বলিতেছে, জ্বলুক। রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া এখানে আসে ৩টায়। ইহার কিছু পূর্বে হেমন্ত বাবু আসেন। ও বার কথা রাখেন, আমি খুলিয়া দেই। আগামী বুধবার তাহার বাসায় যাওয়ার কথা বলিলেন। যাইব, বলিলাম। আর আলোচনা করিয়া কি আমার লাভ? আমি ধীরে ধীরে সব কিছুই বাহিরে ফেলিয়া যাইতেছি। সকলেই ঠেলিয়া সরাইয়া দিতেছে। আফিসে যাই। বিকাল ৫টার পর আসে। ৭।০টায় যায়। ৯।০টায় আমি ও প্রতিভা চলিয়া আসি।

১০ই মার্চ

প্রার্থনার ভিতর যোগ লীলার তত্ত্বাস্বাদন করি—যে কাম ছিল বদ্ধ হইয়া অবচেতন মানসে, সেই কামকেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ চেতনার স্তরে, সংস্কৃতির স্তরে আনিবার উপযোগী কৌশল শিখাইবার ব্রত লইয়া রাসলীলার আস্বাদন করিয়াছিলেন। সত্যকার নর-নারীর মিলন কেমন করিয়া অন্তরের ভিতর বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে, তাহারই কৌশল রহিয়াছে এই যোগ-লীলার ভিতর। কিন্তু কে ইহার রহস্য বুঝাইয়া দিবে? এই জন্যই কি রাধারাণী আমার জীবনের আঙিনায় ভিখারিণীর বেশে দাঁড়াইয়াছিলেন? কিন্তু পারিলাম কৈ? এ জন্য যে আমার মর্মদাহের অবধি নাই। আমি যে চিন্ময়ী-মৃন্ময়ী রাধারাণীকে বাস্তবের বেশে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছি না, সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতর অনুপ্রবেশ করিতে পারিতেছি না। এই লীলারস আস্বাদন করাইতে না পারিলে সমাজ কি করিয়া সুস্থ হইবে?…আমাকে যে লোকে নিতে পারে না, তাহার কারণ কি যে আমার ঐশ্বর্যের লেশমাত্রও নাই? ঐশ্বর্যহীন মানুষকে—তা সে যতই প্রাণবান হউক, মানুষের গ্রহণ করিতে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু আমি যদি দেহের ক্ষেত্রে ও আত্মার ক্ষেত্রে সমানভাবে 'কর্ত্তা' হইতে পারিতাম, তবে দৈহিক আবেষ্টনের যথামূল্যে স্বীকার করানো কি সম্ভবপর হইত? আবেষ্টন বাদ পড়িয়াই যাইত, তাই যাহা আছি, বেশ আছি। নেয় কেউ নিবে, নয় জানিয়াই যাইব। পূর্ণকে বিচার বিতর্কদ্বারা বুঝা যায় না, তাহাকে স্বীকার করিতে হয়। 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'—তর্কে বহু দূর। স্বীকার করিলেই জীবনে পূর্ণের বিস্তার হয়। ৯টায় ফিরি।…

১১ই মার্চ

সকালেই আফিসে যাই।···৬টার পর হেমাঙ্গবাবু গাড়ীসহ আসেন। সঙ্গে নাতনী খুকু আমাদের নিতে আসে।...সেখানে ভারতবর্ষের সম্পাদক ফণীবাবু নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। হেমাঙ্গবাবুর বন্ধু তারকবাবুও। ফণীবাবুর সঙ্গে অনেক কথা—বর্ত্তমানে মেয়েদের সমস্যা, হিন্দু-বৌদ্ধ সমস্যা, অস্পৃশ্যতা বর্জন সমস্যা, এক-ভারত গঠন সমস্যা। Practically ভারত এক হইলেও এক হওয়া তাহার বাস্তব হইবে না যতদিন না Philosophically সে এক হইতেছে। তাহারই জন্য আমি উপনিষদাদির ভাষ্য লিখিয়াছি।···প্রবাসের অবস্থা খুব খারাপ নয়। মন ভাল নয়। ঠাকুর জানেন কোথায় লইয়া যাইবেন।

১২ই মার্চ

বেশ সকালে রেণু আছে। যাহার সংসারে দাঁড়াইয়া কাজ করিবার মত কোনও অবলম্বন নাই, তাহার নিঃসঙ্গ হওয়া ছাড়া গতি কি? আমি একা, সবাই একা। কিন্তু আমি আমাকে 'বিশ্বাস' করি। কেহ আমাকে বিশ্বাস করে নাই, আমি কিন্তু স্বামী-পুত্র-বন্ধু হিসাবে কাহাকেও বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। প্রাণপণ নিজের কাছে নিজে সত্য হইবার চেষ্টা করিয়াছি। কাহাকেও যোগ্য করিবার জন্য প্রাণপণ না করিয়া পারেও হাত দেই নাই। যাহাকে আদর করিতে চাহিয়াছি তাহার জীবনের সবটুকুকে মর্য্যাদার উচ্চ স্তরে স্থাপিত করিয়া তবে তাহাকে ভালবাসিয়াছি, আদর করিয়াছি। অত খুব ভালবাসা আমি জীবনে কাহাকেও বাসি নাই। তাহাদের জীবনের সব দিক আমার কাছে sacred trust। সংসারের উপর আমি বলাৎকার করি নাই। রেণু পোস্টাফিস হইয়া বিমলাদিদের বাড়ী যায়। কলিকাতায় সুধাংশু ভট্টাচার্য প্রভৃতির ওখানেও যায়। বিমলাকে লইয়া সে এখানে ৩টার আসে। বিমলা প্রাণ খুলিয়া সব কথা, তাহার অতীত সব কাহিনী বলে। শুনিয়া শান্তি পাইলাম।...তাহার জীবনে শ্রীরাধা মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হউন—ইহাই তো আমার প্রার্থনা রহিল। আমি যতটুকু পারি এই সব মেয়েদের শ্রেয়ের পথ দেখাইয়া দিব। সে পারিবে। আমি বিমলা ও রেণু আফিসে যাই, কিন্তু পরে প্রতিভাও যায়।···সবিতা যাওয়ার সাধনা করিতেছে। দূরে দাঁড়াইয়া যতটুকু পারি চলিব। কাজটা তো আর নষ্ট করা চলিবে না। মিলিবার জন্য ডুবিতে চাহিয়াছিলাম, ডুবিতে কেহ দিল না। কে আমাকে অন্তঃপ্রবেশ করিতে দিবে তাহার জীবনে? আমি তো আকুলি বিকুলি করিলাম। রাত্রি ৯টার আশ্রমে ফিরি। ভোর ৫টায় উঠি।

১৩ই মার্চ

সকালে নিত্যব্রতসহ টালিগঞ্জ বাস ডিপো হইয়া চার পার হইয়া কারখানায় যাই। দুলালীর জন্য দুইটি মুরগীর ডিম ।০ আনায় কিনিয়া নেই। দুলালীর জন্য মোসাম্বী কিনিতে ১৲ টাকা দিয়া আসি। পথে যাইতে যাইতে কেমন করিয়া যমের সঙ্গেও এ দেশের মানবেরা লড়াই করিয়া ছিলেন, তাহা অজামিল, প্রহ্লাদের উপাখ্যান উল্লেখ করিয়া নিত্যব্রতের সঙ্গে আলোচনা করি—আরও আলোচনা করি 'কপালের উপর গোপাল'; ভগবানের কৃপা সম্পাত হইলে কর্ম্মের ফল ফলে না। দুলালীর যদি কোনও আশঙ্কা থাকে, তাহাও কাটিতে পারে ভগবানের করুণায়। তাহার মাকেও তাহাই বলিয়া আসি। আমি সকালের প্রার্থনায় দুলালীর জন্য প্রার্থনা করি। ভগবান যাহাদের আমার কাছে পাঠাইয়াছেন, তাহাদিগকে স্নেহে প্রাণে মনে আবরণ করিয়া রাখা আমার দায়। আমি তো কোনও দিনই দায়িত্ব এড়াইয়া চলি নাই, তাহা হইলে উহা আসক্তি হইত। কামুক কি কোনও দায়িত্ব নেয়? দায়িত্বের কথা উঠিলেই সে পালায়। অন্যে দায়িত্ব-ভার বহিবে, আর সে ভোগ করিবে—ইহাই আসক্ত পুরুষেরা চায়। যত দূর পারিয়াছি সকলের দায়িত্ব বহন করিয়া চলিয়াছি। কাহারও মানের অমর্য্যাদা করি নাই। তাই পুরুষোত্তম ঋণী রহিলেন। রেণু ১০।০টায় আসে।···বিমলা আসে ১১।০টার পর···। প্রতিভার সঙ্গে অনেক কথা হয়। যে

পথে আমরা চলিয়াছি, সেই পথ হইতে অন্য পথে যাওয়ার কি আর সুযোগ আছে? সে তো মৃত্যুরই শামিল। বিশ্বের শেষ সমস্যার সমাধান করিবারই তো চলিয়াছিলাম। এত বড় সুযোগ কি পরিত্যাগ করা সম্ভব না সঙ্গত?··· যে-কোনও দুর্যোগের মধ্যে আমার সঙ্গে যুক্ত থাকিবার কথা, দূরে সরিয়া না যাইবার কথা বলি।...

১৪ই মার্চ

সকালে নিবেদিতার দেওয়া খাতায় তাঁহার সুখদ্ সত্তার জন্য কয়েকটি শ্লোক লিখি।......সেবানন্দ ঠাকুরের জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ চিঠি লইয়া আসে। সে আমাকে ট্রাস্টী হইতে বলে যদি উহারা নির্বাচন করে। ঠেলাঠেলির মধ্য দিয়া সেবা করার ধাত যে আমার নয়, ইহা আমি সারা জীবন বুঝিয়াছি। কংগ্রেসেও সেজন্য থাকি নাই। বিপুলা পৃথিবীর বুকে সেবকের সেবার সুযোগ সর্বদাই থাকে। মহানির্বাণ মঠের বাহিরে যে বিরাট জগৎ পড়িয়া আছে, সেখানে আমি ঠাকুরের সেবা করিয়া যাইব। উহারা যেরূপভাবে নির্বাচন করেন তাহাতে আমার আস্থা নাই। ইতিমধ্যে বীরেন চৌধুরী ডাক্তার আসে। তখন মহাত্মাজীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, তাঁহার বরিশাল যাওয়ার কথা, তাঁহার সহিত আমার কথাবার্তা, সতীনবাবুর আমাকে কংগ্রেস হইতে সরাইবার প্রচেষ্টা, মহাত্মাজীর প্রতি আমার আনুগত্য, আমার সেবা করিয়া যাওয়া ইত্যাদির কথা চোখের জলে আলোচনা করি।

১৫ই মার্চ

সকালে সাময়িকী 'পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' শেষ করিয়া প্রতিভার নিকট নকল করিতে দিয়া অফিসে যাই। ৯॥০টার পর রেণুর বড়দাদা পবিত্র আসে ও ১২৫৲ টাকা দিয়া যায়, যাহা রেণুর নিকট গচ্ছিত-রাখা ১০০০৲ টাকা হইতে ইতিপূর্বে তোলা হইয়াছিল। ঐ ১০০০৲ টাকা প্রকারান্তরে রেণুকেই দেওয়া হইয়াছে। জায়গা কিনিবার ভিত্তি পত্তন হইল। কাজের জন্য টাকা চাহিলে মিলিবে। উপেন দা তো মাসিক ১৲ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ঠাকুরের তত্ত্বকে বিশ্বের সামনে দাঁড় করাইতে হইলে আমাদিগকে আগাইয়া যাইতেই হইবে। ঠাকুর আসিয়াছেন বৃন্দাবনে কাজের যে গুরুতর প্রয়োজন ও অর্থ আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিল, তাহারই জীবন ও দর্শন বর্তমান যুগের ছাঁচে ঢালিয়া উপস্থিত করিতে। সে ভার আমাদের উপর বর্তাইয়াছে। আমরা যদি আগাইতে পারি, সম্প্রদায়ের মধ্যে ও চারি দিকে একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে। যাহারা দূরে সরিয়া আছে, তাহারাও আসিয়া যুক্ত হইবে। রেণু ২টার আসে। সে 'ভারতীয় প্রগতির পটভূমিকা' (বৈশাখের জন্য) লিখিতে আরম্ভ করে। অনেকটা হইয়া গিয়াছে। ···হরিচন্দন মুখোপাধ্যায় তাহার উপন্যাস 'যুগ-অবতার' সমালোচনার জন্য দিয়া যান। আমাদের পত্রিকার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন কিছুটা বলি।···

১৬ই মা

প্রার্থনার পূর্বে দিনপঞ্জী লিখি। পরে 'জগজ্জ্যোতি' হইতে বুদ্ধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ প্রতিভা পা করিয়া শুনায়।...নারীর মর্যাদা কিরূপে পুরুষোত্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিতে করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়ি···।...তীর্থপতি স্কুলের শিক্ষ কৌশিকবাবু আসেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদের দর্শন সম্ব আলোচনা হয় প্রায় ১ ঘণ্টা। রেণুর লেখাগুলি পড়িবা জন্য নিয়া যান। তাহার পর বীরেনবাবু আসেন।···

১৭ই মা

সকালে গীতাভাষ্য কিছুটা revise করি। অফি যাই। ১০টার পর ফিরি। বৈকালে আমি প্রতি ও রেণু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এ বেড়াইতে যাইব ঠি হয়। অনেকদিন রেণু বেড়াইবার কথা বলিয়াছিল।··· অফিসে আমার কিছু পরেই বিমলা আসে। তাহা 'বংশীবিভূষিতকরাৎ' ইত্যাদি শ্লোক কয়েকটা বুঝাই দেওয়া হয়। সে আমার জন্ম-দিবসে রেণুর লেখা পড়ে।···কাল রেণুর পরীক্ষার কাগজ আসিবে। আম

জীবনের সকল আশা ভরসা, সকল আশীর্বাদ দিয়া ইহাদিগকে পুষ্ট করিয়া বিশ্বের সামনে গৌরবোজ্জ্বল মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া যাইতে চাই। তবেই ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে।

১৮ই মার্চ

বেশ সকালে উঠিয়া প্রার্থনা করিয়া ৮টার সময়ই বেহালা যাইবার জন্য বাস স্ট্যাণ্ডে যাই। ২টা বাস চলিয়া গেল, ডাকাডাকিতেও দাঁড়াইল না। চোখে তো আর ৪ নং দেখি না। তখন নিজের মধ্যে নিজের জন্য ক্ষুব্ধ হইতেছিল নিজ অসহায়তার জন্য। একবার রেণুকে ডাকিয়া আনিবার কথাও মনে হইয়াছিল। চলিবার ফিরিবার কোনও সুযোগই তো নাই। নাই অর্থ, নাই তেমন জন। অথচ প্রাণের ছটফটানি তো আছে। কি করিব আমি? একা গেলে ইহারা দুঃখ পায়। কিন্তু হাত পা গুটাইয়া ঘরে থাকিবই বা কেমন করিয়া? চার পার হওয়ার পরই চায়ের দোকানে ঐখানের উমার কলোনীর ৫টী বরিশালবাসীর সঙ্গে দেখা। কথাবার্তা হইল।... দুলালীকে ঔষধ দেই। সত্যব্রতর সঙ্গে কথা হয়। সত্যব্রত ৮টার পর আমার সঙ্গেই আসে, সে ডালহৌসী গেল। 'জগদীশবাবুর বাসায় যখন ছিলাম, ছোট এতটুকু আমার কোলের মধ্যে শুইয়া থাকিতে, আজ যদি তেমন করিয়া পাইতাম'—ইহা বলিলাম। 'যদি আমার নির্দেশ দিবার অধিকার থাকিত, তবে মেদিনীপুরে কৃষি করিতে যাইতে দিতাম না।' 'তোমার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মত-বিরোধ থাকিতে পারে, কিন্তু উহা তাহাকেও জানিতে দেওয়া প্রয়োজন নয়।' ১০টায় মোড়ে পৌঁছি। আফিসে যাই। ১১।০টার পর ফিরি। রেণু পোস্টাফিস হইয়া পরীক্ষার কাগজ [illegible] বাসায় রাখিয়া ২টার পর এখানে আসে। এখানে [illegible] শুরু করে।...তাহার (বিমলার) নিকট কাগজ দেখ[illegible] '[illegible]' শ্লোকটী ব্যাখ্যা করি। তাঁহাকে 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভি[illegible] [illegible]লীলা চলিয়াছে, তাহাকে পাওয়া অর্থ বিশ্বব্যাপী যে ক[illegible] [illegible] প্রাণের মধ্যে [illegible] করিয়া তুলিবার প্রাণপণ পাওয়া। এই পাওয়া দুর্লভ। সকল নর নারী, দেশ দেশীয়, সকল সত্তার মধ্যে রসলীলার কার্য্যাত্মক আস্বাদন করিতে করিতেই পাওয়াকে ধন করিয়া পাইতে হইবে।...

১৯শে মার্চ

সকালে কিছুটা গীতাভাষ্য দেখিয়া আফিসে যাই। খই দই খাই। বিমলা মিত্রের এক চিঠি আসে রেণুর নামে। আমার কাছে আসিয়া তাহার ভিতরে একটা ভাবের স্রোত বহিতেছে, আমার বয়সের পূর্বস্মরণ পড়িয়া সে আরও আমার কাছে আগাইয়া আসিতেছে লিখিয়াছে। শাস্ত্রে নারীর কি ও কতখানি অভিযোগ এবং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কেমন করিয়া নারীর জয়না করিয়া তাহাদের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা বিবৃত করি।...সকলকেই জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া ঠাকুরের সেবা করিতে চাই।...

২০শে মার্চ

সকালে উজ্জ্বলভারতের page filler দিবার জন্য ঠাকুরের বইগুলি উল্টাইয়া দেখি। কয়েকটি ঠিকও করি। Mill-এর কথা জানিবার জন্য (রেণুর পরীক্ষার খাতার জন্য) History of Western Philosophy বইটা দেখি।...আমার বইগুলির মধ্যের নূতনত্ব যাহার আত্মাসমাজে কোথাও কোথাও আছে, তাহাকে বিহ্বল করিয়াছে। তাহার চিন্তাধারার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসিয়াছে, সে পথের একটা খোঁজ পাইয়াছে। আমি বলিলাম, চুম্বক কাছে আসিলে লোহার molecule-গুলি এমনভাবে গুছাইয়া যায় যে সেখানে চুম্বক আত্মপ্রকাশ করে। তিলে তৈল আছে, দুধে ঘৃত আছে—বাহির হইতে তো আসে না। আমার লেখাগুলির সংস্পর্শে যত আসিবে, ততই জীবন গুছাইয়া উঠিবে। যাহা উপলব্ধি করি নাই, তাহা লিখি নাই। আমার লেখা যে খাম কথা নয়, তাহা বিমলাও বুঝিয়াছে ... বেদনা ছাড়া যে কিছুই পাওয়া যায় না, তাহা বিমলাকে

বলি। বুদ্ধদেবের বেদনার (প্রেমের বেদনার নহে) কথা উল্লেখ করি। আমার জীবনে জীবন মিশাইয়া ঠাকুরের ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবার জন্য আহ্বান জানাই।

২১শে মার্চ

বেশ সকালে আফিসে যাই, ঠাকুরের বই হইতে page filler-এর জন্য কতগুলি অংশ বাছিয়া বাহির করি। প্রেসের লোক আসে। প্রুফ দিয়া যায়। ১০৷০টায় আমি ও বেণু বাহির হই।…দিদিমার ছোট বোন সন্ধ্যাও সঙ্গে আসে। তাহাকে ঠাকুরের নাম লইতে বলি। তাহার 'শ্যামসুন্দর' নাম ভাল লাগে। শ্যামসুন্দরই তাহাদের কুলদেবতা। 'মহানাং অর্পিতং' শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া শুনাই। সন্তোষ অধিকারী আসে। অমিয় গাঙ্গুলী নামে একজন উজ্জ্বলভারতের গ্রাহক সন্তোষের নিকট বলিয়াছে যে, উজ্জ্বলভারত তাহার খুব ভাল লাগে। কংগ্রেসের প্রতি এমন নিন্দা অথচ অভদ্রভাবে নয়, এরূপ দেখা যায় না। সন্তোষের এক প্রবন্ধ 'সভ্যতার সঙ্কট' (জনসেবকে বাহির হইয়াছে) সে পড়িয়া শুনায়। তখন সত্যিকার সঙ্কট কোথায় তাহা বলি। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে শঙ্কর বুদ্ধ প্রভৃতির সঙ্ঘাত রহিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বুদ্ধকে বাদ দিয়া শঙ্কর দর্শনের উপর গড়া। এতদিনকার ভারতীয় সংস্কৃতি 'ঈশ্বর'-কে কেন্দ্র করিয়া। বুদ্ধ সেখানে 'মানুষকে' স্থান দিতে চাহিয়াছিলেন। Whitehead-এর 'It is as true to say' ইত্যাদি দেখাই এবং উজ্জ্বলভারতে 'ব্রহ্মহৃদের অবধূত-কাণ্ড' যে সংখ্যায় আছে তাহা দেই; মাঘ-ফাল্গুনও দেই। বেণু-প্রতিভার কাছে বলি—ঈশ্বরের নিপীড়ন আমার জীবনে চলিতেছে, lower nature প্রতি মুহূর্ত্তে বাধা সৃষ্টি করিতেছে, একমাত্র পুরুষোত্তম সৎ-শিষ্যের মধ্য দিয়া আগুলিয়া রাখিয়া আগাইয়া আনিতেছেন। আমার কুয়োর মধ্যে আছ, বলিয়া কিছু টের পাও না কি চাপ চারিদিক হইতে আসিতেছে! রমেও দেবতারা এই লাঞ্ছনা করিয়াছিল।…

২২শে মার্চ

সকালে গীতার নিকট একটা পোস্টকার্ড লিখি, পরে প্রতিভার নকল-করা গীতা-ভাষ্য দেখি। ৮টার পূর্ব্বে আফিসে যাই।…আমার উপর যে-দায়িত্ব বর্ত্তাইয়াছে, যে-স্থানে দাঁড়াইবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল এবং মনে হয় সেখানে দাঁড়াইবার অধিকার ও যোগ্যতাও ঠাকুর দিয়াছেন, সেই দায়িত্ব ও স্থান আমাকে সারা দিন আকর্ষণ করিতেছে। একদিন ঠাকুর একটানে সারা বাঙ্গলায় পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। আজ সে পথ আমার পথ নহে। কিন্তু বাঙ্গলার মর্ম্মস্থল তো আমি চিনিয়াছি, তাহার স্পর্শও পাইয়াছি। আবার কি সে পাওয়া অধিকারকে পুনরায় আস্বাদন করিতে পারিব ন এই পুরুষোত্তম-দর্শনের পথে; নিশ্চয়ই পারিব। যা একবার পাইয়াছি, তাহা আবারও পাইব তাঁহারই কৃপায় পাওয়া ধন হারাইব কেন?…সারা জীবন অপেক্ষা করিলাম। কৈ, 'মানুষ' তো আসিল না। যে সংখ্য মানুষ পাইলে 'মানুষ' পাওয়া হয়, তাহা আসিতেছে কি …ঠাকুরের শতবার্ষিকীর জন্য এখন হইতেই প্রস্তুত হইত হইবে। তাঁহার একটী জীবনী ও তত্ত্বসম্বন্ধীয় পুস্তক খুব প্রয়োজন। এজন্য তাঁহার সব জীবনীগুলি লেখাগুলি পড়া দরকার।

২৩শে ম

সকলেই আফিসে যাই। ৮৷০টার পরই চলি আসি। সত্যব্রত ইতিমধ্যে আসিয়াছে।…আমার নি ১০-৪৪-এ সমন (জামাতার মৃত্যু সংক্রান্ত মামলা আসে। মনটা ভাল লাগিতেছিল না, অতটা সময় কো দুঃখিতের মত বসিয়া থাকিতে হইবে।

ক

জীবন-সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দ

॥ অধ্যাপক প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

স্বামী বিবেকানন্দের সংগ্রাম-মুখর জীবন তাঁকে একটি ব্যক্তিত্বের অধিকারী করেছে। ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তা কাকে বলে এ সম্বন্ধে হিয়ুড থেকে আরম্ভ করে ক্রেৎসমার, সেলডন ও আইসঙ্ক প্রভৃতি প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানীর মতামত উদ্ধৃত করলেও এই ব্যক্তিত্ব কথাটির স্বরূপ স্পষ্ট হবে না। বিশেষতঃ সহজাত প্রবণতা ও পারিবেশিক শক্তি এ দুয়ের সংঘাতের ফল থেকে উদ্ভূত মহাপুরুষদের ব্যক্তিত্ব এমনই অসংখ্য জটিল কতকগুলি সংলক্ষণের সমষ্টি যেগুলি আলাদা আলাদা ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির অতীত আর একটা কিছু যা' অনুভূতির সামগ্রী। বিবেকানন্দের দেহ-সৌষ্ঠব থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর প্রতিটি পদবিক্ষেপে, প্রতিটি কথার প্রতিটি শব্দে এই ব্যক্তি-সত্তারই পরিপ্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে এবং এই ব্যক্তিত্বের গুণেই বিবেকানন্দ সারা জন-জীবনে মূল্যবান প্রভাব বিস্তার করেছেন। রোমা রোলা তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, বিবেকানন্দের কথাগুলি তাঁর দেহে বৈদ্যুতিক শিহরণের সৃষ্টি করতো—"I cannot touch these sayings of his scattered as they are through the pages of books at thirty years' distance, without receiving a thrill through my body like an electric shock. And what shocks, what transports must have been produced when in burning words they issued from the lips of the hero!" বিবেকানন্দ তাঁর "My life and mission" নামক বক্তৃতা সংকলন গ্রন্থে যে ভাষায় এবং যে ভঙ্গিতে নিজের জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা নানা সংগ্রামের বেদনাদায়ক ইতিহাস বিবৃত করেছেন এবং ভারতবর্ষের প্রতিটি মানবকে জীবনের গভীরতর সত্য উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত করেছেন সে ভাষায় আছে অফুরন্ত জীবনী শক্তি, ভঙ্গিতে আছে ঋজু-দীপ্ত-ব্যক্তিত্ব।

ভারতবর্ষের জীবনাদর্শটি বিবেকানন্দ পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। পার্থিব ধন-সম্পদকে ভারতবর্ষ কোনদিন প্রাধান্য দেয় নি। যদিও ভারতবর্ষ একদা প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল তথাপি অর্থ তা'র কাছে পরম অর্থ হয়ে দেখা দেয়নি। ভারতবর্ষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, তার তন্ত্রীতে উপলব্ধি করে যে, এই পার্থিব জীবনই একমাত্র সত্য নয়; ধর্মাচরণ হলো তার সাধনার অঙ্গ। তাই, "The Hindu man drinks religiously, sleeps religiously, walks religiously, marries religiously, robs religiously". অর্থাৎ ধর্মবোধ আমাদের রক্ত মাংসের সম্পদ, আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত—বাইরের জিনিষ নয় যা প্রচেষ্টা দ্বারা লভ্য।

বিবেকানন্দ বলেছেন, ভারতবর্ষ কোনদিন সাম্রাজ্যবাদী হতে পারে না—কখনও না। ভারতবর্ষ কোনদিন বিরাট একটি রাজনৈতিক শক্তি হবে না। ভারতবর্ষের তা লক্ষ্যও নয়। ভারতবর্ষের জীবনে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে তথাপি ভারতবর্ষ চিরকাল বেঁচে থাকবে।

বিবেকানন্দের কাছে কর্মের জগৎ এবং ধ্যানের জগৎ দুটোই সত্য; কোনটি নিঃসঙ্গভাবে সত্য নয়। এই ধ্যানের জগতের প্রবেশ-পথ দেখিয়ে দেন যিনি সন্ন্যাসী, যিনি গুরু। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই গুরু শিষ্যের সম্পর্কের একটি মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষা ব্যাপারটি দান ও গ্রহণের ব্যাপার নয়। গুরু শিষ্যর সম্পর্ক হলো পিতা পুত্রের সম্পর্ক। গুরু আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন। তাই বিবেকানন্দ বলেছেন, "The techer is more than my own father, and I am truly his child, his son in every respect." এমন একজন তরুণ সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে ব'সে বিবেকানন্দ এবং আরও কয়েকজন সতীর্থ শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ধারণাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার শপথ গ্রহণ করলেন—"We shall start a universal religion now and here…we shall not wait." হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিকতা, বৌদ্ধধর্মের জীবে দয়া, খৃষ্টান ধর্মের মানবতা এবং ইসলাম ধর্মের সৌভ্রাতৃত্ব সমস্তগুলি মিলিত হবে যে শাশ্বত ধর্ম, সেই ধর্মের প্রচারই এই তরুণ সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। তাই বিবেকানন্দের ধর্মবোধ এমনই সার্বজনীন আবেদন লাভ করতে পেরেছে। এইখানেই মহামানব বিবেকানন্দের মহত্ব।

এই শ্রীরামকৃষ্ণ যার কাছে টাকা মাটি, যিনি কোনদিন হাতে মুদ্রা স্পর্শ করলেন না, যিনি নামমাত্র আহার করেন, মলিনবাস যার পরিধেয় তিনি আজ রাজার সঙ্গে আহার করেছেন, কাল পথের ভিক্ষুকের সঙ্গে গাছতলায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিবেকানন্দ তিন মাসের বেশী কোথাও কাটান নি কারণ তিনি জানেন, বহমান শৈলখণ্ডে শ্যাওলা জমায় না' স্থাবরতাই হলো মৃত্যু, জঙ্গমত্বই প্রাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য সাহচর্যে বিবেকানন্দের দিন কাটছিল। তারপর তাঁর জীবনে এলো দুর্যোগের ঘনঘটা। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসান হলো। বিবেকানন্দ ও তাঁর তরুণ সম্প্রদায় আপ্রাণ সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর তাঁরা হলেন নিঃস্ব। এই তরুণ বালকদের তখন বন্ধু নেই, স্বজন নেই। কে তাদের ডাক শুনবে? জনকয়েক কিশোর বালক। মনে তাদের দুরন্ত আশা, প্রাণে আছে অফুরন্ত শক্তি। এই বিপুল পৃথিবীর নিপীড়িত অসহায় মানুষের সেবায় আত্মত্যাগ করবার মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। চরৈবেতি, চরৈবেতি। পাথরের যতই ভার থাক, সমুদ্রের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝরের কাছে তার শক্তি কতটুকু?

দুর্যোগের তমিস্রা আরো নিবিড় হয়ে এলো। বিবেকানন্দের বাবা মারা গেলেন। একদিকে রইল তাঁর মা এবং ভায়েরা, তাঁদের প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধ; সংসারের তিনিই তখন একমাত্র আশা এবং আশ্রয়। অপরদিকে রইলো শ্রীরামকৃষ্ণের মহান আদর্শ সমস্ত মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রচারের দায়িত্ব। এই দুই জগতের মাঝে মন দুলতে থাকে। মনে আসে দ্বন্দ্ব, প্রতি মুহূর্তে সংশয় এবং সন্দেহ। "On the one hand I would have to see my mother and brothers starve into death; on the other, I had believed that this man's ideas were for the good of India and the world, and had to be preached and worked out." দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মনের মধ্যে চলে সংগ্রাম। বিবেকানন্দের কোমল বালক-মন সংসারের শোক-দুঃখ সহ্য করতে পারে না। এদিকে সহানুভূতি দেখানোর কেউ নেই। বালকের কল্পনা-প্রবণ মনকে সান্ত্বনা দেবে কে? কেউ না—কেবল একজন; None, except one.

মনের এই দোলাচল অবস্থায় বিবেকানন্দের সমস্ত ব্যথা-বেদনায় সহানুভূতি জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যা, সহধর্মিণী সারদাদেবী। তিনি বিবেকানন্দকে আশা দিয়েছেন, তাঁর হৃদয় কর্মপ্রেরণার ইন্ধন জুগিয়েছেন। বিবেকানন্দ বুঝেছেন, বিরাট কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়—কোন মহ চিন্তার মৃত্যু অপেক্ষা কয়েকজনের আত্মোৎসর্গ অনে বেশী কাম্য। "It is better that a few person suffer than that such ideas should die ou of the world. What if a mother or tw brothers die?"

কয়েক বছর ধরে বিবেকানন্দ তাঁর কয়েকজন ঘনি বন্ধুর সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় পরিভ্রমণ কর লাগলেন। অন্তরের মধ্যে জ্যোতির্ময় সত্তা রয়ে প্রোজ্জ্বল—মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসার উৎস প্রস্রবণ এই শক্তির বলে তাঁরা হিমালয় থেকে কুমারীকা, সি থেকে ব্রহ্মপুত্রে পদচারণা করেছেন।

দশ বছর এইভাবে কাটলো। বিবেকানন্দের শরীর দিন দিন ভেঙে পড়তে লাগল—দুদিন, তিনদিন অন্তর আধপেটা আহার জোটে। এমন সময় বিদেশ থেকে তাঁর ডাক এলো। ২৭শে জানুয়ারী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি তাঁর জীবন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাষণে তাঁর সংগ্রামের জীবন বর্ণনা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য তিনি সারা পৃথিবীতে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্মের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে বৃহত্তর জীবন-দর্শনে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সে ধর্ম মানব-ধর্ম। তাঁর কথায়, "মানুষের মধ্য দিয়াই ভগবানকে জানা সম্ভব। যেমন আলোক-স্পন্দন সর্বত্র, এমন কি তমসার প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিলেও কেবল-মাত্র প্রদীপের মধ্যেই উহা লোক চক্ষুর গোচর হইয়া থাকে, সেইরূপ যদিও ভগবান সর্বত্র বিরাজিত তথাপি তাঁহাকে আমরা কেবল এক বিরাট মানব রূপেই কল্পনা করিতে পারি।" স্বামিজীর এ হেন ধর্ম-চেতনা ও জীবন-দর্শনকে ভারতবর্ষ উপলব্ধি করতে পারেনি, তাই তিনি দুঃখ করে একটি চিঠিতে বলেছিলেন, "ভারতের অসংখ্য নর-নারী আমাকে বুঝিতে পারে নাই, আর কিরূপেই বা পারিবে? বেচারীদের চিন্তাধারা দৈনন্দিন খাওয়া-পরার ধরা বাঁধা নিয়ম-কানুনের গণ্ডীই যে কখনো অতিক্রম করিতে পারে না।"

আজ সারা বিশ্বে মৈত্রীর বাণী প্রচার অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। স্বামিজী-শতবর্ষ জয়ন্তীতে স্বামিজীর চিন্তা ও আদর্শের প্রচারই আমাদের কার্যসূচী হোক।

সাময়িকী

সত্য অসত্য—মাস দুই আগে ছাত্র ভর্তি করিবার জন্য কলিকাতার এক কলেজে গিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি—অত ভিড়ের মধ্যে কোথা দিয়া কি করিব ভাবিতেছি—একটি ছেলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কিছু জানিতে চান? আমি বলিলাম, আমার ছেলে বাইরে আছে, ২৫ দিন দেরী করিলে কি শেষে সীট পাওয়া যাইবে? তৎক্ষণাৎ সে উত্তর দিল, আপনি অন্য কাহাকেও দিয়া সই করাইয়া ভর্তি করাইয়া দিন। আমি বলিলাম, দেখুন, সে তো আমি পারিব না, আপনারা তো এদিকে ঘোরাফেরা করিতেছেন—ব্যবস্থাটা কিরকম বোঝেন, ২৫ দিন অপেক্ষা করা যায়? সে আর একটি ছেলেকে ডাকিল, বলিল, ওকে জিজ্ঞাসা করুন। তাহাকেও সেই একই কথা বলিলাম, পূর্ব্বের ছেলেটী কি ব্যবস্থা দিয়াছিল, তাহা সে শোনে নাই; সে-ও তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা দিল আপনি কাহাকেও দিয়া সহি করাইয়া ভর্তি করিয়া দিন। আমিও আগের মতই জবাব দেওয়াতে সে আর একটা ছেলেকে ডাকিয়া লইয়া আসিল—সে ছেলেটী স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের সেক্রেটারী। আমার কথা শুনিয়া সেক্রেটারী মহাশয় আমাকে একটু একপাশে ডাকিয়া লইয়া অপর ছেলে দুইটীর মতই পরামর্শ দিল।

তিনটী যুবক ছেলে—বয়স তাহাদের বেশী হইলে ১৭।১৮, বড় জোর ২০.২২ হইবে—সহজভাবে অতি স্বাভাবিকতার সহিত যে পথের আশ্রয় আজ সব—মিথ্যাচারের এই পথ যে অন্যায়, এ বোধও আজ তাহাদের লোপ পাইয়াছে। একজন বয়স্কা মহিলাকে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিতে অতটুকু ছেলেদের এতটুকু সংকোচও দেখিলাম না।

কি করা যায়? দিন কাল যেমন পড়িয়াছে তাহাতে এ পথ ছাড়া বাঁচিবার উপায় নাই—এই সোজা উত্তরে এ প্রসঙ্গ শেষ করিয়া দিলে একটা জাতির ভবিষ্যৎ—ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এ কথা ভুলিয়া

গেলে চলিবে না। ভারতবর্ষের পক্ষে যেমন এই নিঃস্বার্থের পথকে শুধু স্বাভাবিক পথ বলিয়া কিছুতেই মনে করা যাইবে না, তেমনি পৃথিবীর কোন দেশেরই পক্ষে ইহা স্বাভাবিক এ কথা আজ আর মানিয়া লইব না—কেননা আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া একটি মাত্র জাতি আছে—সে জাতির নাম মানুষ জাতি এবং মানুষ-মাত্রের ইহা একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য যে সে সৎ পথে চলিবে; এখন এই যে জটিলতা সমাজ-জীবনে আজ সর্বত্রই সৃষ্টি হইয়াছে যে মিথ্যা না বলিলে বাঁচা যাইবে না—ইহাকেই স্বভাব বলিয়া মানিয়া লইব কি না। পৃথিবী হইতে অন্যায়, মিথ্যা, পাপকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া শুধু ন্যায় ও সত্যকে রাখিব—ইহা যেমন কোন দিন হইবে না, আবার যে কোন কারণে যখন তখন মিথ্যার আশ্রয় লইয়া দিন যাপন করিতে হইলে মানুষ বলিয়া কোনো সৌন্দর্যের দাবীও আর মানুষ করিতে পারে না। সত্যের একটা যুগোপযোগী রূপ আছে সত্য, কিন্তু তাহা যদি প্রতি মানুষে প্রতি ঘটনায় সুবিধানুযায়ী পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে সে সুবিধাবাদ কি ব্যক্তি, কি জাতি কাহাকেও বিশিষ্ট কল্যাণের অধিকারী করিতে পারিবে না। চিরন্তন সত্য বা truth for itself বলিয়া একটা বস্তু যেমন থাকিতেই হয়, তেমনি আবার কোন এক সময়ের সত্যকেও তো চিরন্তন সত্য বলা যাইবে না, কোন এক রকমের সত্যকেও নয়। যুগের প্রয়োজনকে যেমন মানিয়া লইতে হয়, তেমনি জনে জনের প্রয়োজনকে মানিতে গেলেও সত্য বলিয়াই আর কিছু থাকে না। তাহা হইলে এ দুইয়ের সামঞ্জস্য হইবে কি রকম করিয়া? এ ঠিক সেই রকম সমস্যায় আসিয়া পড়া গেল যেখানে দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথকে বলিতে হইয়াছিল

এমন একান্ত করে চাওয়া
এ-ও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সে-ও সেই মত।

কিন্তু তাহারও পরে কবি-চিত্ত ক্রান্তি-দর্শীর দৃষ্টি পাইয়া বলিতেছেন,

এ দু'য়ের মাঝে তবু কোনোখানে
আছে কোন মিল
নহিলে নিখিল এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না

—তাই মিল একটা আছেই। কিন্তু সেই মিলট বাহির করা সহজ নয়। তুমি আমি বাহির করিতে গেলে মুস্কিল হইবে ঠিকই। যুগে যুগে সত্য রূপ পরিবর্ত করিয়াও যে দুইয়ের মধ্যে মিল রক্ষা করে, সেই জন্য ভগবানকেই যুগে যুগে আসিতে হয় আর সে মিল বাহি করিয়া দিতে হয়। ব্যাপক-গভীর সার্বত্রিক জীবন ন হইলে এ মিল বাহির করার বেশী ভুল থাকিয়া যাওয়া সম্ভাবনা। তাই তেমন জীবনের মধ্য হইতেই এ মিলকে লইতে হইবে। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল লাগা ম লাগা দিয়া আমরা কোন এক রকমে এমনভাবে আসক্ত হইয়া পড়ি যে, দৃষ্টি আমাদের সীমাবদ্ধ, তা ব্যক্তি-স্বার্থ বা দল-স্বার্থের উপরে উঠিতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীকেই একটা বাসগৃহ মনে করিয়া সম মানুষকেই এক মানুষ জাতি বলিয়া বুঝিয়া সকলের বর্তমান যুগোপযোগী কল্যাণকর ব্যবস্থা দিতে পারা যে সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যতটুকু দেখিতে পাই মহাভারত বলিতেছেন, 'অনভিজ্ঞ অল্পবিদ্য ব্যক্তি ধ নির্ণয়ে সমর্থ হয় না'; আবার হিটলারীয় অহংকা লইয়া একটা অংশকেই সমগ্র ধরিয়া লইয়াও ধর্মনির্ণয় ব যুগোপযোগী সত্যনির্ণয় সম্ভব নয়। কিন্তু পুরুষোত্ত শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর—দেশকাল পাত্র-কে যে মানিতে হয় সে সম্বন্ধে তিনি অত্য সচেতন ছিলেন বলিয়াই গীতায় বলিলেন—যৎ করো যৎ অশ্নাসি যৎ জুহোষি দদাসি যৎ, যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ যৎ তৎ বলিয়া নির্দে দিয়াছিলেন—করা খাওয়া দান করা তপস্যা করা প্রভৃতি কোন কিছুরই তিনি একটা ধরা বাঁধা রূপ আঁকিয়া দে নাই, সাত্ত্বিক, রাজস, তামস বলিয়াও উল্লেখ করে নাই। তিনি অত্যন্ত সমন্বয়শীল বলিয়া সত্যের যুগোপযোগী প্রয়োজনকে মানিয়া নিয়াও চিরন্তন সত্যের মর্যাদ

রক্ষা করিতে পারেন কেননা শেষ পর্যন্ত সর্বভূত-হিতই সত্য অসত্যের একমাত্র মানদণ্ড হইতে পারে—কিন্তু সর্বভূত-হিত আসক্তি বিদ্বেষ-জর্জরিত ক্ষুদ্র চেতনাদ্বারা বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। তাই আমরা যেন সত্যকে আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তি-প্রয়োজনে বিকৃত না করি। এ সম্বন্ধে আমাদিগকে সাবধান হইতেই হইবে। ব্রহ্ম-বেত্তার বলিয়া যিনি সার্থক নমস্কৃত, 'অহমস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ' বলিবার দুঃসাহস বা বুকের পাটা যাহার আছে, 'সমগ্রম্ মাম্' বলিয়া নিজেকে যিনি ঘোষণা করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষেই সম্ভব ও সঙ্গত হয় 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ' বলার। মাত্রা-বোধ তাঁহার পক্ষে সহজ ও নিপুণ—কোন্খানে সাময়িক প্রয়োজনকে মানিতে হইবে, কতটুকু মানিতে হইবে, কেন মানিতে হইবে অথচ ব্যক্তিগত বা দলগত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ-স্বার্থে প্রযুক্ত হইবে না, পরন্তু সত্যেরও স্খলন হইবে না, তাহা উপনিষদ্ ভাগবত চণ্ডী-প্রোক্ত সর্বের সর্বভূত হিতের প্রয়োজনে লাগিবে—ইহা সেই ব্যাপক-গভীর জীবন যাহার সেই পুরুষোত্তমই ধরিতে বুঝিতে পারেন। আমার আপনার পক্ষে তাহার প্রয়োগ করিতে যাওয়া সমাজ-বিধ্বংসী কার্য। তাই যুগক্রান্তি সময়েই তাঁহাকে বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হইতে হয়। যুগে যুগে তত্ত্বগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সমগ্র সমাজে যে পরিবর্তন আসিতে চায়, তাহাতে বাধা দিব না, কিন্তু তাই বলিয়া এই যে যুক্তি যে প্রতিপদে মিথ্যাচরণ না করিলে আজ বাঁচিয়া থাকা যায় না, ইহা যেমন অর্থহীন, তেমনি দুর্নীতিপরায়ণদের একেবারে ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের কথা। যুগোপযোগী সত্যের যতই পরিবর্তন হউক না কেন, প্রতি দিনের চলার প্রতি পদক্ষেপে ডাইনে বাঁয়ে না তাকাইয়া মিথ্যাচার গ্রহণের যে অসুস্থ আবহাওয়ায় আজ শিশু হইতে বয়স্কদের চিত্ত পর্যন্ত বিভ্রান্ত, তাহার পক্ষে কোন যুক্তিও নাই, কোন সৌন্দর্যও নাই। রবীন্দ্রনাথের হাতে লিখিত হইয়াছিল '……দ্রাণ বুকের মানিক হবে, যদি মিথ্যা থেকে খালাস পেতে পার'—কিন্তু এই একটী অতি প্রয়োজনীয় সত্য কথা আজ সুবিধাবাদের অন্তরালে এমনভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছে যে, দেখিয়া শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। এই নির্বিচার মিথ্যাচার সুবিধাবাদ যত শীঘ্র কমান যায়, সেই দিকে প্রত্যেক অভিভাবক, শিক্ষক শিক্ষিকা দৃষ্টি দিবেন, নিজেদের জীবনের আচরণের শুভ্রতা দ্বারা শিশু কিশোর যুবক চিত্তকে শুদ্ধ করিবেন—এ দায়িত্ব সমস্ত মানুষের অন্তরাত্মা দাবী করিতেছে। মানুষের অন্তরাত্মা সুন্দরকে চায়, বিস্তারকে চায়, ব্যাপকতাকে চায়, আনন্দকে চায়—নির্বিচার মিথ্যাচারের মধ্যে, সুবিধাবাদের মধ্যে ওগুলির কোনটাই নাই—তাই আধুনিকতার নাগপাশে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রয়োজন এই মিথ্যা যুক্তির চাপে পড়িয়া সুন্দরের উপাসক মানুষের আত্মা আজ কাঁদিয়া ফিরিতেছে, তাহাকে উদ্ধার করিবার দায়ও মানুষেরই।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

যে কোন রকমের গৃহাদি
নির্মাণে
বেঙ্গল বিল্ডার্স এণ্ড ট্রেডার্স
প্রাইভেট লিঃ
-এর
পরামর্শ লউন।

পি-১৩ মিশন রো এক্সটেনসান
কলিকাতা—১
ফোন: ২৩-৩৪২৮

কবি শান্তশীল দাশের কবিতা

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: আপনার কবিতার মধ্যে একটি প্রশান্ত সংযম, একটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতা মনে তৃপ্তি আনে।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত: সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গির ভিতর দিয়া উচ্চ ভাব ও চিন্তা আপনার বৈশিষ্ট্য

নিশিকান্ত (পণ্ডিচেরী): অতি আধুনিক কবিদের মোহ থেকে মুক্ত আপনার রচনা। চিরন্তন আধ্যাত্মিকতার পরিচয়ে প্রশান্ত ও স্বচ্ছন্দ আপনার কবিতা

নারায়ণ চৌধুরী: আপনার কবিতার আদর্শবাদী সুর আমার মন স্পর্শ করে।

অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত: জীবনের একটা মূল্যে আপনার স্থির বিশ্বাস রয়েছে তাই আপনার কবিতা এমন স্নিগ্ধ এবং মধুর গম্ভীর।

১। জীবনায়ন ২। পরিক্রমণ
৩। একটি প্রসন্ন সুর
৪। তোমায় কী দিয়ে বরণ করি ৫। তুমি মহাত্মা

গ্রন্থজগৎ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই
বিশুদ্ধ
মাখন ও ঘৃত
★
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
সরকার ডায়েরী
ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক
৩২ ভূপেন বসু এভিনিউ
কলিকাতা ৪

সূচীপত্র, আশ্বিন ১৩৭০

১। মাতৃ বন্দনা ... ২১৭
শ্রীনিত্যগোপাল
২। দেবীসূক্ত .. ২১৮
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
৩। মাতৃনাম্ন দশকম্ ... ২২১
৺স. চ. ঠাকুর
৪। মায়ের কথা ... ২২২
শ্রীবেণু মিত্র
৫। অমর সুরনাথও বাঁচেন ... ২২৬
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়
৬। দেশ-প্রেম ... ২৩০
শ্রীকনক মজুমদার
৭। ভাববার কথা ... ২৩৩
শ্রীনলিনীরঞ্জন গুহ
৮। শ্রীচৈতন্য-জীবনের শেষ অধ্যায় ... ২৩৭
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। দেশাত্মবোধের প্রেরণা ও বাংলা নাটক... ২৪১
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
১০। সাহিত্যে বৈতরূপ ... ২৪৩
[illegible]ভূষণ বিশ্বাস
১১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ ... ২৪৬
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত (২৯)
১২। জীবন-চরিত্রের মূলতত্ত্ব ... ২৪৯
শ্রীমণি বাগচি
১৩। মীরা (কবিতা) ... ২৫২
শ্রীসুধীর গুপ্ত
১৪। কি দিয়ে পূজি মা (কবিতা) ... "
শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ
১৫। বসুধারা (কবিতা) ... "
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
১৬। শরৎ ও শারদীয়া ... ২৫৩
শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত
১৭। আমাদের দুর্গোৎসব ... ২৫৫
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮। এমার্সন ... ২৫৮
জনাব রেজাউল করীম
১৯। সামাল ছেলে (কবিতা) ... ২৬১
শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়
২০। গানাৎ পরতরং নহি ... ২৬১
শ্রীসন্তোষকুমার দে
২১। সহজ সুন্দর (কবিতা) ... ২৬৩
শ্রীশান্তশীল দাশ
২২। স্বর্গের সিঁড়ি (একাঙ্কিকা) ... ২৬৪
শ্রীমন্মথ রায়
২৩। একটি বৃক্ষ : অনেক প্রাণ (কবিতা) ... ২৬৭
শ্রীগোপাল ভৌমিক
২৪। সমাধান (কবিতা) ... ২৬৭
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়
২৫। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও নাটক
—গিরিশচন্দ্র ... ২৬৮
ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
২৬। রূপময় (কবিতা) ... ২৭১
শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য
২৭। এস পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ (কবিতা) ... ২৭২
শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত
২৮। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী ১৯৫২ ২৭৩
২৯। এই সব অন্ধকার (কবিতা) ... ২৮০
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

রেলওয়ের প্রচার মাধ্যমগুলিকে যথাযথ কাজে লাগান

চোখা তীরও সবসময়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারে না কিন্তু রেলওয়ের প্রচার-বাহনগুলি সঠিক ভাবে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় ।

……

বিজ্ঞাপনের জন্য খোঁজ খবর করুন

কমার্সিয়াল পাবলিসিটি অফিসার

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

১১, গার্ডেন রীচ রোড, কলিকাতা-৪৩ ফোন: ৪৫-৩৭৬৯, ৪৫-৬৩৪৯, ৪৫-২৩৯০

CPUO 363

'পূর্ব্বে নিজের অহম্‌কে ও অহম্‌পূর্ব্ব কর্ম্ম-বুদ্ধি-মন ও ইন্দ্রিয়কে ভগবান বিষ্ণুতে অর্পণ করা হইলে সেই অর্পিত অহম্‌ ও মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় যে কর্ম্মে স্ফুরিত হইবে, তাহাই হইবে 'ভক্তি'। এক কথায় ভগবানে মনোলয়, বুদ্ধিলয় ও অহম্‌-লয়ের পরই ভক্তির আস্বাদন জমিয়া উঠে। নিষ্কামা ভক্তিতে কর্ম্মজ্ঞান হইবে ভক্তির ঘন আস্বাদন।…বর্ণাশ্রমের আরম্ভ জীবের অহম্‌ হইতে, ভক্তি সাধনার আরম্ভ ইহারই উজান গতিতে ভগবান হইতে, 'পুরুষোত্তমোঽহম্‌' হইতে। বর্ণাশ্রম বিশ্ব হইতে বিশ্বনাথে পৌঁছিবার কথা শুনাইয়াছে, আর ভাগবত শুনাইয়াছেন বিশ্বনাথ হইতে বিশ্বে আসিবার খবর।……ভক্তিবাদ কখনও ভগবানকে বিশ্বের ওপারে নির্ব্বাসন করে নাই। ভগবান' তাঁহার immanent aspect এই বিশ্বকে 'সর্ব্বতোবৃত্বা' অতিক্রম করিয়া আছেন (অত্যতিষ্ঠৎ)।……'

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

উজ্জ্বলভারত

(মাসিক পত্র, ১৬শ বর্ষ)

উজ্জ্বলভারতের বার্ষিক মূল্য ৫৲। প্রতি সংখ্যা ৪৪ ন. প.।

মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ' মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেয়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার।

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৬″×৮″।

উজ্জ্বলভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের মধ্যে একটি জীবনের সমগ্রতার ও পূর্ণদর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

কার্য্যালয়—উজ্জ্বলভারত
নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রাম: বাগুইআটি
পো: অশ্বিনীনগর
জি: ২৪ পরগণা

উজ্জ্বলভারত

আশ্বিন, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

শারদীয়া সংখ্যা

মাতৃ-বন্দনা

॥ শ্রীনিত্যগোপাল ॥

ভুবনেশ্বরী ভবানী মহেশমনোমোহিনী
সুরেশ্বরী শঙ্করী শিবানী।
কালী কৈবল্যদায়িনী বিমলা ব্রহ্মরূপিণী
কৃপাময়ী কলুষনাশিনী।
মাহেশী মূল প্রকৃতি ভক্তিময়ী ভগবতী
ভক্তিরূপা ভুক্তেশতারিণী।
পার্বতী পরমেশ্বরী গিরিজা গিরিকুমারী
বিদ্যুত্বরণী হেমাঙ্গিনী ॥
মহামায়া মহেশ্বরী যোগমায়া যোগেশ্বরী
জগদ্ধরা জগত জননী।
তারা ত্রৈলোক্যতারিণী নিবিড় নীলবরণী
চিৎ-শক্তি চৈতন্যকারিণী ॥

অম্বিকা অমলা উমা অবিনাশিনী শ্যামা
অনুপমা অমৃতভাষিণী।
ভদ্রকালী কপালিনী ঘন অঞ্জন বরণী
কপালকুণ্ডলা কুণ্ডলিনী।
অংশুমতী আহ্লাদিনী পরেশী প্রাণতোষিণী
আভাময়ী অর্দ্ধেন্দুভালিনী।
আনন্দময়ী অপর্ণা ইন্দুমুখী অন্নপূর্ণা
অপরূপা শিব নারায়ণী।
শিবা সর্ব্বার্থসাধিকা আত্মতত্ত্ব প্রকাশিকা
কাশীশ্বরী কৈলাসবাসিনী।
পরা অপরা অনাদ্যা ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মবিদ্যা
আদ্যাশক্তি শিবস্বরূপিণী।

দেবীসূক্ত

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইতেছেন প্রচলিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বেদে অনধিকারী একটি নারী। ইনি ছিলেন মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা; নাম ইঁহার 'বাক্'। এই মহীয়সী নারীর ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে বিশ্বের সার্বভৌম নারী শক্তির স্বরূপের কথা; নারীই 'সৃষ্টি হেতুভূতা সনাতনী'। সৃষ্টির হেতুভূতা সনাতনী এই নারীশক্তি ব্যষ্টি ও সমষ্টি। নারী শুধু খণ্ডপ্রদর্শিনীই নহেন; তাঁহার এই ব্যষ্টিরূপ সার্থক হইতে পারে তাঁহার বিশ্বপ্রদর্শিনী স্বরূপের সম্বন্ধেই। নারী স্বভাবতঃ ব্যষ্টি-প্রকৃতিই; কিন্তু ভাবতঃ তিনি বিশ্বপ্রকৃতি। বিশ্বপ্রকৃতি না হইলে ব্যষ্টিপ্রকৃতি হওয়ার কোনও পারমার্থিক মূল্যই থাকে না; তখন ব্যষ্টি-সৃষ্টি হয় নারীর পক্ষে এক মহাবন্ধন,—পুরুষের পক্ষেও। দেবীসূক্তের মধ্যে নারী-প্রকৃতির সমষ্টি স্বরূপের খোঁজ আছে। আর এই মহাপূজার অবসরে দেবীসূক্তে আস্বাদিত নারীজাতির সমষ্টিপ্রকৃতিভূত তত্ত্বকথা মাটির মেয়েদের কাছে উপস্থিত করিতেছি।

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ-
মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥১

অহম্ [আমি দেবীসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা, মহর্ষি অম্ভৃণের দুহিতা ব্রহ্মবিদুষী বাক্] রুদ্রেভিঃ [একাদশ রুদ্ররূপে] বসুভিঃ [অষ্ট বসুরূপে] চরামি [এই বিশ্ব সৃষ্টির অন্তরে বাহিরে বিচরণ করিতেছি, আমার ব্যষ্টি-জীবনকে বিচরণপথে, গতিপথে বিশ্বব্যাপ্ত বলিয়া অনুভব করিতেছি]। অহম্ [আমি] আদিত্যৈঃ [দ্বাদশ আদিত্যরূপে] উত [আর] বিশ্বদেবৈঃ [সকল দেবতা-রূপে বিচরণ করি] অহম্ উভা [উভৌ; উভয়] মিত্রাবরুণা [মিত্রবরুণকে] বিভর্মি [সকলের সব বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া ভরণ করি, ধারণ ও পালন করি] অহম্ [আমিই] ইন্দ্রাগ্নী [ইন্দ্র ও অগ্নিকেও ভরণ করি] উভা [উভয়] অশ্বিনা [অশ্বিনৌ; অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কেও ভরণ করি]। (মাটির জগতের একটী রক্ত-মাংসের মানুষ আজ সর্ব্বদেবময়ী বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হইয়া বিশ্বাত্মত্বের আস্বাদন করিতেছেন। ইহা ভারতীয় নারীপ্রগতির তত্ত্বকথা।)

আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং সকল দেবরূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে বিভরণ করি। আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে বিভরণ করি।১

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥২

অহম্ [আমি] আহনসং [(দেব) শত্রুহন্তা] সোমং [সোমদেবকে] বিভর্মি [বিভরণ করি] অহম্ ত্বষ্টারম্ [ত্বষ্টা নামক দেবতাকে] উত [এবং] পূষণং [পূষাদেবকে] ভগং [ভগদেবকে ভরণ করি] হবিষ্মতে [হবির্যুক্ত] সুপ্রাব্যে [উপরোক্ত দেবতাগণের তৃপ্তি-বিধানকারী] সুন্বতে [(সোমরস) প্রস্তুতকারী] যজমানায় [যজমানের জন্য] অহম্ দ্রবিণং [যজ্ঞফল স্বরূপ বিশ্বপ্রসাদরূপ বিশ্বজীবন, 'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ'—গীতা] দধামি [বিধান করি] (বিশ্বরূপের সেবায় যে যজমানের সব কিছু সমর্পিত, বিশ্বরূপের প্রসাদে সে বিশ্বজীবনই প্রাপ্ত হয়)।

আমি দেবশত্রু হন্তা সোমদেবকে, ত্বষ্টা নামক দেবতাকে, এবং পূষা, ভগ নামক সূর্য্যদ্বয়কে ভরণ করি।

প্রচুর হবিযুক্ত দেবগণের তৃপ্তি-বিধানকারী এবং সোমরস প্রস্তুতকারী যজমানের জন্য যজ্ঞ-ফলরূপে ধন আমিই বিধান করি।২

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্।৩

অহম্ [আমি] রাষ্ট্রী [বিশ্বের ঈশ্বরী] বসূনাং [ধনসমূহের] সংগমনী [প্রাপয়িত্রী; সবকিছু ধনই বিশ্বসম্পদ; আমি এই বিশ্বসম্পদকে বিশ্বের প্রতি মানবের কাছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বণ্টন করি] চিকিতুষী [জ্ঞানস্বরূপে বিশ্বের সত্তে সত্তে ব্রহ্মতত্ত্বদ্রষ্ট্রী] (তাই) যজ্ঞিয়ানাং [যজ্ঞার্হগণের মধ্যে] প্রথমা [মুখ্যা; আমিই প্রথমে নিজেকে বিশ্ব ও বিশ্বদেবের সেবায় বিলাইয়া দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির আস্বাদন করিয়াছি] ভূরিস্থাত্রাং [কলেবরে মাংস এই প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিত] ভূরি-আবেশয়ন্তীম্ [সর্বজীবে অন্তর্ভাবে প্রবিষ্ট] তাং মা [সেই আমাকেই] পুরুত্রাঃ [বহু দেশে, সর্বদেশে] দেবাঃ [দেবগণ (Natural forces) এবং সুর-নরাদি যজমানগণ] ব্যদধুঃ [নানাভাবে আরাধনা করে]।

আমিই সমস্ত জগতের ঈশ্বরী, ভক্তগণের ধনপ্রদাত্রী দেবী ও পরম জ্ঞানবতী। অতএব যজ্ঞার্হগণের মধ্যে আমিই প্রধান। আমিই প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিত ও সর্বভূতে অন্তঃপ্রবিষ্ট; আমাকেই সর্বদেশে সুরনরাদি যাজ্ঞিকগণ বিবিধভাবে আরাধনা করেন।৩

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।।৪

যঃ [যে পুরুষ] অন্নং [ভোজ্য পদার্থ] অত্তি [ভোজন করে] যঃ [যে] বিপশ্যতি [বিশেষের দর্শন করে] যঃ [যে] প্রাণিতি [প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন করে] যঃ [যে] উক্তং [কথিত বিষয়, শব্দাদি] শৃণোতি [শ্রবণ করে] সঃ [সে পুরুষ] ময়া [সমষ্টিবৃত্তি আমা দ্বারাই তাহা সম্পাদন করে, সমষ্টির পরিপোষণেই ব্যষ্টির অস্তিত্ব, চৈতন্য ও আনন্দাস্বাদন সম্ভব। সমষ্টির অনুধ্যান করিয়াই ব্যষ্টি ব্যষ্টিরূপে বাস্তব] (যাহারা) ঈং [বিভিন্নভূমিরূপে অবস্থিত ঈদৃশ] মাং [আমাকে] অমন্তবঃ [অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত প্রাণরূপে জানেনা] তে [তাহারা] উপক্ষিয়ন্তি [জীবনের সকল ক্ষেত্রে উপক্ষীণ হয়] শ্রুত [হে বিশ্রুত সখা] শ্রুধি [শ্রবণ কর] তে [তোমাকে] শ্রদ্ধিবং [শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্ম-পুরুষোত্তম তত্ত্ব] বদামি [বলিব, যেমন বলিয়াছিলাম কেনোপনিষদে উমা হৈমবতীরূপে ইন্দ্রের কাছে]।

পুরুষ যে অন্ন আহার করে, প্রাণনক্রিয়া সম্পাদন করে, কথিত বিষয় শ্রবণ করে, তাহা আমারই শক্তিতে। যাহারা আমাকে অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত প্রাণরূপে জানেনা, তাহারা উপক্ষীণ হয়। হে কীর্তিমান সখা, আমি তোমাদিগকে শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব, শ্রবণ কর।৪

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।।৫

দেবেভিঃ [দেবগণ কর্তৃক] উত [এবং] মানুষেভিঃ [মনুষ্যগণ কর্তৃক] জুষ্টং [সেবিত] ইদং [এই ব্রহ্মতত্ত্ব] অহম্ এব স্বয়ং [আমি স্বয়ংই] বদামি [বলিতেছি, কেননা আমিই মানুষী পরব্রহ্মমহিষী। মা ছাড়া পিতার সত্তা পরিচয় প্রদান আর কাহার দ্বারা সম্ভব ?]। (এবম্বিধ ব্রহ্মস্বরূপিণী মানুষী আমি] যং [যাহাকে] কাময়ে [কামনা করি] তং তং [তাহাকে] উগ্রং [শ্রেষ্ঠঃ] কৃণোমি [করি] তং [তাহাকে] ব্রহ্মাণং [ব্রহ্মা] তং [তাহাকে] ঋষিং [ঋষি] তং [তাহাকে] সুমেধাং [পুরুষোত্তম দেবের মেধাবী করি]।

দেব ও মানবগণের দ্বারা সেবিত ব্রহ্মতত্ত্ব মানুষী আমি স্বয়ংই উপদেশ করিতেছি। আমি ঈদৃশ ব্রহ্মস্বরূপিণী আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি, কাহাকে ব্রহ্মা, কাহাকেও ঋষি করি, এব

কাহাকেও বা ব্রহ্মজ্ঞানী করি ।৫

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ।।৬

অহং [আমি] (যুগে যুগে) ব্রহ্মদ্বিষে [ব্রহ্ম-পুরুষোত্তম-বিদ্বেষী] শরবে [হিংস্র প্রকৃতির জনগণকে] হন্তবৈ [হনন করিতে] উ [পাদ পূরণে], রুদ্রায় [রুদ্রের] ধনুঃ [ধনুকে] আতনোমি [গুণ দেই]। অহম্ [আমি] জনায় [ভক্তগণের কল্যাণের জন্য] সমদং [সংগ্রাম] কৃণোমি [করি] অহং দ্যাবাপৃথিবী [স্বর্গে ও পৃথিবীতে] আবিবেশ [রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট আছি, দুইয়ের মধ্যে দুইয়ের সম্বন্ধ করিয়া]।

হিংস্র প্রকৃতির জনগণের যথার্থ রুদ্রের ধনুকে আমি জ্যা সংযোগ করি, ভক্তগণের জন্য আমিই যুদ্ধ করি, স্বর্গে ও পৃথিবীতে আমিই অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছি।৬

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্
মম যোনিরপ্‌স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ।।৭

অহম্ [যোগমায়া আমি] পিতরম্ অস্য [এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পিতৃস্থানীয় কারণোপাধি ঈশ্বর পরমাত্মাকে] মূর্দ্ধন্ [মূর্দ্ধায় অর্থাৎ সকল শ্রেষ্ঠ স্থানে সৃষ্টিকালে] সুবে [প্রসব করিয়াছি]; মম যোনিঃ [আমার যোনি হইতেছে] অপস্থ-অন্তঃ সমুদ্রে [অপ্‌ স্থানীয় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সমুদ্রবৎ প্রেম সমুদ্রে; এই বিশ্বপ্রেম-যোনি, প্রেম-কারণ]। ততঃ [সেই হেতুতেই] বিশ্বা ভুবনা [সর্ব্ব ভুবনে, সর্ব্বভূতে] অনু বিতিষ্ঠে [প্রেম দ্বারা বিবিধভাবে বর্ত্তমান আছি] উত [আরও] অমূং [ঐ দূরবর্ত্তী] দ্যাং [স্বর্গকে] বর্ষ্মণা [আমার প্রেমময়ী যোগমায়া শক্তিদ্বারা] উপস্পৃশামি [স্পর্শ করিয়া ব্যাপিয়া আছি; সবকিছু বড়র হৃদয় আলোড়ন করিয়া তাহাদিগকে ছোটদের মধ্যে ছোট হইয়া মিশিবার উপযোগী প্রাণ সঞ্চার করি]।

আমি যোগমায়ারূপে পিতৃস্থানীয় পরমাত্মাকে সর্ব্ব যোগ্যতার সহিত প্রসব করিয়াছি। অপ্‌ স্থানীয় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে প্রেমসমুদ্র, তাহা আমারই যোনি। আমি বিশ্বভুবনে প্রেমদ্বারা বিবিধভাবে বর্ত্তমান আছি। ঐ যে দূরবর্ত্তী স্বর্গ, উহার মধ্যেও প্রেমস্পর্শ দ্বারা সর্ব্বভূতের ক্ষেত্রে অবতরণোপযোগী প্রাণসঞ্চার করি।৭

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সং বভূব ।।৮

অহম্ এব [আমিই] বিশ্বা ভুবনানি [ভূতসমূহ] আরভমাণা [আরম্ভ করিয়া, সৃষ্টি করিয়া] বাতঃ ইব [বহনকারী বায়ুর মত] প্রবামি [সকলকে বহন করিয়া, বুনিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছি] পরঃ দিবা [আকাশের পর] এনা পৃথিব্যা পরঃ [এই পৃথিবীরও পর] (বলিয়াই আমি) মহিনা [স্বমহিমায়] এতাবতী [এই রসঘন জগদ্রূপে] সংবভূব [সম্ভূত হইয়াছি; 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি'; তিনিই সমগ্র, ষোল আনা; বার আনা যাহার স্বর্গে, তাঁহারই চারি আনা এই বিশ্বভুবন। কারণোপাধি পরমাত্মাও তাঁহার সন্তান, কার্য্যোপাধি জীবও তাঁহারই কোলের শিশু। তিনিই নিরুপাধি প্রেমঘন যোগমায়া শক্তি]।

আমিই বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়া বহনকারী বায়ুর মত ইহাদিগকে বুনিয়া চলিয়াছি; আমি আকাশের পর, এই পৃথিবীরও পর বলিয়াই রসঘন জগদ্রূপে সম্ভূত হইতেছি।

মাতৃমাধুর্য-দশকম্

॥ শ্যস, চ ঠাকুর ॥

বদনং মধুরং বচনং মধুরং
হসিতং মধুরং নয়নং মধুরং
হৃদয়ং মধুরং চরিতং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ১
পাদৌ মধুরৌ হস্তৌ মধুরৌ
বস্ত্রং মধুরং বক্ষং মধুরং
যোগং মধুরং ধ্যানং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ২
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
শিরসি কেশবন্ধনঞ্চ মধুরম্
লালনং-তাড়নং-হরণং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ৩
ক্রোড়ং মধুরং স্তন্যং মধুরং
সন্ততিহৃদয়েন প্রণীতঞ্চ মধুরং
ধৃতি র্মধুরা স্মৃতির্মধুরা
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ৪
জাগরঃ মধুরঃ স্বপ্নং মধুরং
স্পৃষ্টং মধুরং চিত্রং মধুরং
দৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ৫
গীতং মধুরং আশংসং মধুরং
ক্রোধোর্মধুরা তাপং মধুরং
কণ্ঠং মধুরং শব্দং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ৬
নিন্দির্মধুরা নিদেশং মধুরং
বসনং মধুরং চলনং মধুরং
বাঞ্ছা মধুরা রমণং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ৭
প্রশংসা মধুরা ভর্ৎসনং মধুরং
আস্বাদনং তাত-মাতুর্মধুরং
লীলা মধুরা শীলং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ৮
প্রসাদং মধুরং প্রদানং মধুরং
কেপনং মধুরং জ্ঞাপনং মধুরং
ক্ষমা মধুরা আশিসং মধুরং
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥ ৯
সত্তাং মধুরং তত্ত্বং মধুরং
প্রসন্নাননঞ্চ মধুরং
দৃষ্টাঙ্কং মধুরং ভক্তী চ মধুরা
মধুরং মাতুঃ সর্ব্বং মধুরম্ ॥১০

[নিবেদনম্—গীতমিদং 'ভাষাভারতী' নাম সংকলনে যোজনায় আধুনিক 'লৌকিক' সরল সংস্কৃতেন রচিতম্ 'আবহম্' আদি শব্দ প্রয়োগঃ লক্ষ্যতে ইতি ।]

মায়ের কথা

।। শ্রীরেণু মিত্র ।।

যা চাই, তা পাই না; যা আমি চাই, তা আমাকে চায় না; যা আমাকে চায় না, তার জন্য আমার চাওয়া আরও বেড়ে যায়—সংসারে এ অভিজ্ঞতা সকলের। সংসারে আমি কিছু চাই মানে আমি আমাকেই চাই, আমার যা ভাল লাগে তাকেই শুধু চাই; যা চাই তা চাওয়া উচিত কি না, চাইলেই সেটা সত্য চাওয়া হয় কি না, না পেলে কি করব, সে বস্তুর উপর আমার মনোভাব কি রকম হবে, আমি এবং আমার বাইরের বস্তু যা আমি চাই, তার সাথে আমার সম্পর্ক কি—সংসারে শতকরা একশ জনই বোধহয় এসব বিচার বিবেচনা করবার ক্ষমতা বা প্রবণতা রাখে না। এ সব প্রশ্ন তাদের জাগে না যে কেন এমন হয়, কেন আমি যা মনে করি তাই-ই হয় না, আমি যা চাই, তাই-ই পাই না? যা আমার মনে হচ্ছে, বস্তু-বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের এই-ই কি সবটুকু কথা, না আরও কথা কিছু আছে? দিন যায় রাত্রি আসে—বুঝি বা শতকরা একশ জনেরই মাথা এ সব নিয়ে ঘামে না। আবার কালে ভদ্রে কারো কারো ঘামে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কারো কারো। হাজার হাজার বৎসর আগে একদিন তাদের রাজ্য ও পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে এক রাজা ও এক বৈশ্যকে এমনি এক মাথা ঘামাতে পেয়ে বসেছিল। কেন এমন হয়, কেন যারা আমাদের চায় না, তাদেরও জন্য মন এমন করে? অনেক ভেবে চিন্তে মনোবিজ্ঞানের আর বস্তু-বিজ্ঞানের কূল কিনারা না পেয়ে দুই জনে গেলেন এক মুনির কাছে—অর্থাৎ যিনি তাদের থেকে বেশী বোঝেন, জানেন, ভাবেন, করেন। মুনিকে বললেন তাঁরা তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা, তাঁদের মনের দুঃখের কথা—তাদের চাওয়ার হাতে কেমন করে তাঁরা পীড়িত হচ্ছেন সেই কথা। আর মুনি তাঁদের শোনালেন মায়ের কথা, মাতৃতত্ত্ব, একটা ব্যাপক গভীর অস্তিত্ব সত্তার কথা—সেই অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ মায়ের সঙ্গে ব্যক্তি-মনের সম্পর্কের কথা। রাজা ও বৈশ্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটেছিল—তাঁরা যে যার প্রকৃতি অনুযায়ী পথে শান্ত সমাহিত মন নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। সেই থেকে মায়ের পূজা করে আসছে মানুষ—ভারতবর্ষের মানুষ—বাংলাদেশের মানুষ সেই কত শত কাল থেকে।

তারপরে যা হয় তাই হয়েছে—মায়ের অর্থ ভুলে গেছে মানুষ, ভুলে গেছে মায়ের তত্ত্ব—এখন শুধু আচার আচরণ, শুধু প্রথা রক্ষা।

মনের দ্বন্দ্ব দূর করতে মাতৃ-তত্ত্ব শোনালেন কেন মুনিবর? সেইটে প্রণিধানযোগ্য। দ্বন্দ্ব কেন সৃষ্টি হয়? দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তখনই যখন আমি একটা পক্ষ, আর আমার বাইরে বিশ্ব-জগৎ আর একটা পক্ষ, এবং আমি চাইব বিশ্ব জগৎকে আমার অধীন করতে, আমার পছন্দমত চালিয়ে আমার আয়ত্তে আনতে. আর বাইরের বিশ্ব চাইবে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে। এই যে টানাটানির সম্পর্ক—দ্বন্দ্বের সৃষ্টি এইখানে। আর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যখন মানুষ তার দেহ বা মন কিংবা দেহ ও মনের নিরাপত্তা, আশ্রয় বা স্থিতি হারিয়ে ফেলে। প্রথম থেকেই নিজের সঙ্গে বিশ্বের আর সব কিছুর ভেদ সৃষ্টি করে পরে বস্তুকে আমার করতে চাওয়ার যে পথ সেই পথই দ্বন্দ্বের পথ। অথচ জগতে মনের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কটা এরকম না হয়ে আরও এক রকম হতে পারে—সেটা হচ্ছে আমি এবং আমার বাইরের যা কিছু এই দুই মিলিয়ে এক সমগ্র বস্তু, পক্ষাপক্ষ নেই। বৈজ্ঞানিক দার্শনিক জেমস্ জিনসের ভাষায়, 'complete objectivity can only be regained by treating the observer and the observed as parts of a single system...। আমি এবং যা কিছুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক হচ্ছে এই দুটো

মিলিয়ে এক হয়—এই জন্যই উপনিষৎ বলেছেন যা কিছুকে তুমি আত্মা থেকে আলাদা করে দেখবে, তা-ই তোমাকে পরাজিত করবে। আলাদা করে দেখবার মনোবৃত্তি দূর হলেই ভয়ের অপসারণ হয়। পরস্পর ঘুচিয়ে ভেদের দৃষ্টি দূর করে কিংবা ভেদের সৃষ্টি না করে সর্বের সঙ্গে একাত্মবোধই সমস্ত ভয় দূর করতে সক্ষম। আর ভয় দূর করতে সক্ষম নিরাপত্তা-বোধ। সর্বের সঙ্গে অভেদ দৃষ্টি এবং নিরাপত্তা-বোধ সম্ভব যে স্তরে সেটা প্রাণের স্তর—এবং এই প্রাণকে বোধহয় সব চাইতে বেশী পাওয়া যাবে মাতৃত্বের মধ্যে—যে মাতৃত্ব বিকৃত হতে পারে নি এবং সেই জন্যেই বিশ্বজনীন। সংসারে মাতৃত্বের যেটুকু স্পর্শ পেয়ে আমরা ধন্য হয়ে যাই, সে মাতৃত্ব এই বিশ্বজনীন মাতৃত্বের কণা মাত্র। তবু সে-ও প্রতি সন্তানের কাছে অমৃত, অমূল্য—অনন্ত যে বোধ করতে পারে। সাধক-চিত্তে এই যে বিরাট মাতৃত্বের বোধ ধরা পড়েছে, তা যে মহাপ্রাণের প্রকাশ তাকে ধারণা করতে পারলে চিত্তের ভয় দূর হয়—তাই মাতৃসাধনা প্রত্যেকের জীবনে অপরিহার্য। মনঃসমীক্ষণ'ও এই সংবাদই দেয় যে মাতৃস্নেহ-বঞ্চিতের চিত্ত-বিক্ষেপ সহজে ঘটে এবং তা দূর করা সহজ কেবল ঐ মাতৃস্নেহের মাধ্যমেই। পরিবার ও রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে যে অনিশ্চয়ভাব সৃষ্টি হয়েছে মনের গভীরে, মাতৃত্বের অস্তিত্ব-বোধের মধ্যে তারও একটা আশ্রয় মিলবে। তাই রাজা ও বৈশ্যের চিত্ত-ভয় দূর করতে ভারতের ঋষি মাতৃসাধনার পথ রেখে গেছেন, মাতৃতত্ত্ব প্রকাশ করে গেছেন।

সে মায়ের রূপই বা কি, তাঁর স্বরূপই বা কি?

বিশ্ব জুড়ে অণুতে বৃহতে ভালয় মন্দতে যে শক্তির খেলা চলছে, যা দেখে কবি, বৈজ্ঞানিক, ভক্ত বিস্মিত, আনন্দিত, আর যার সম্যক উপলব্ধি না থাকায় বিষয়ী অহঙ্কারী শক্তিমদে উন্মত্ত, প্রমত্ত—সেই শক্তিই মাতৃশক্তি। বিশ্ব জুড়ে শক্তির খেলা একটা চলছে বটে কিন্তু তাকে মা বলি কেন? বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মূলে এই শক্তিই, এ কথা বুঝতে কষ্ট নেই, কিন্তু তাঁকে মা বলি কেন? এই শক্তির যেমন আছে ভীষণ রূপ, তেমনি আছে কল্যাণী রূপ। এই যে আমার বাইরে ভিতরে এক মহাশক্তি ভীষণা ভীষণতমা, আবার সুস্মিতা স্নিগ্ধা জীবনদাত্রী, তাঁকে আমার কাছে অপরিচিতা করে রাখলে আমি ভীত হই, পরাজিত হই, নিজের কোন দুর্গই খুঁজে পাই না। বস্তু-বিজ্ঞানী বলে ছিলেন Force is relation। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর যে সম্পর্ক সেটাই তার শক্তি। এ-ও তাঁরা বলেছেন যে এ সম্পর্ক atonce coutradictory ও complementary। তাহলে আমার ভিতরেই যে শক্তি রয়েছে তা-ও একই সময়ে পরস্পরবিরোধী ও পরস্পর পরিপূরক বাইরের বিশ্বের সঙ্গে আমার সম্পর্কও এই রকমই। এ ভাবে শক্তির এই জটিল স্বভাবহেতু তাঁকে যদি পরমাত্মী করে নিতে পারি, তাহলে তাঁর ভীষণ রূপকেও মেনে নিতে আমার তেমন কষ্ট হবে না, তাঁর কল্যাণীরূপকেও মধুরত করে পাব—সব মিলিয়ে যা আমাকে শক্তি দান করবে তাই তাঁকে ভারতীয় সাধক চিত্ত 'মা' বলে উপলব্ধি করে নিজের ভিতরে বাইরে। যদি জানতে পারি, উপল করতে পারি যে ভেতরে বাইরে এই বিশ্ব-শক্তি যেম 'পরমা মুক্তের্হেতুভূতা' তেমনি 'সংসার-বন্ধ-হেতু'ও, য বুঝি যেমন তিনি 'মহাবিদ্যা মহামায়া' তেমনি 'মহামোহা-মহাসুরী', তিনি 'সদসৎ অখিলাত্মিকা', যদি আস্বাদন কর পাই অতিসৌম্যাতিরৌদ্রা তাঁতে সর্বভূতের সব বি রয়েছে—আমি তাঁর মধ্যেই স্থিত, তাঁর সঙ্গেই আ এক হয়ে আছি—প্রকাশে এবং অপ্রকাশেও—তাহলে তো আমি নিশ্চিন্ত নির্ভয়—তাহলেই তো আমি নির্বি চিন্তা, ভয় ও দ্বন্দ্ব না থাকা থেকে তো মোহমুক্ত মানু আর কিছুই বেশী কাম্য হতে পারে না—তখন সব হ সঙ্গে, সর্বভূতের সঙ্গে আস্বাদনই শুধু চলতে থাকে জীবনে চাওয়া পাওয়ার সেখানে অবসান হয়ে যায়। বিে সঙ্গে আমার স্বতঃসিদ্ধ অথচ ভুলে যাওয়া একাত্মত আস্বাদন জন্য বিশ্বজোড়া এই শক্তিকে মা বলে ভাবি যতক্ষণ বেঁচে আছি, এই মাতৃশক্তিধারায় ওতপ্রোত হ আছি, মাতৃস্নেহ-সাগরে ডুবে আছি। তাঁকে প্রত্যহ স্মরণ করতে হয়, আবার মাঝে মাঝে অনেক আয়ো করে সকলের সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তাই বৎস

একবার করে সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে স্মরণ করি।

তাঁকে স্মরণ করলে কি হয়? তাঁকে স্মরণ করি কেন? এ সংসারে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করে করে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কোন্ মনোবৃত্তিদ্বারা প্রতি মুহূর্তকে সৃষ্টি করতে করতে অথচ সৃষ্ট বস্তুর অতীত থেকে বেঁচে থাকতে হয়, যেমন থাকছেন শক্তিস্বরূপিণী মা—সব কিছুতেই তাঁর প্রকাশ কিন্তু কোন একটাতে তিনি আটকে নেই—সেই সেই কথা তাঁর কাছ থেকে শিখব যখন তাঁকে স্মরণ করি। এই সব কিছুর স্রষ্টা হয়েও কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সৃষ্টি স্থিতি-বিনাশিনী মা আটকে নেই, শক্তি সর্ব বিশেষের ভিতরে বাইরে একই সময়ে—সৃষ্টির এই-ই কৌশল। এই সৃষ্টিতত্ত্ব শিখে নেব তাঁর কাছ থেকে।

সংসারে প্রতিদিন নূতন করে সৃষ্টি করে চলতে হয় যেমন আবার কখনও কখনও বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ সৃষ্টি করতে হয়। প্রতি নূতন সৃষ্টিতেই পুরোনো সংস্কার বাধা দেয়। সে সংস্কার ভালরও সংস্কার, মন্দেরও। কেননা মানুষের মধ্যে যেমন আছে নূতনের দিকে ছুটে যাবার প্রেরণা, তেমনি আছে পুরোনোর মধ্যে আটকে থাকবার জড়তা। কাজেই সে যেমন শোনে সামনের দিকের অপরিচিতের আহ্বান, তেমনি পুরোনো ভাল মন্দ সংস্কারকে ছাড়তেও তার শিরায় শিরায় টান লাগে। এই পুরোনো ভালমন্দের সংস্কারই মাতৃসাধনায় মধু ও কৈটভ নামক অসুর রূপে চিত্রিত হয়েছে এবং তাদেরকে বধ করেই নূতন সৃষ্টির পথে এগোতে হবে বলা হয়েছে। এর পরে ভালমন্দের সংস্কার পেরিয়ে নূতন সৃষ্টি কিছু হয়েছে—সে সৃষ্টি রক্ষা করার পথ কি? সৃষ্টি করা ও সৃষ্টি রক্ষা করা তো এক মনোবৃত্তিতে হয় না। সৃষ্টি রক্ষা করতে সঙ্ঘ-শক্তির প্রয়োজন—বিচ্ছিন্নতার মহিষাসুরকে বধ করেই, সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে, ওতপ্রোত হয়ে থেকেই সৃষ্টি রক্ষা করা সম্ভব। কোন কিছু নূতন সৃষ্টি করবার সময় একজনের সৃষ্টিশক্তি যতটা মুখ্য, সৃষ্টি মোটামুটি রূপ নেবার পর তখন ব্যক্তিবিশেষকে অনেকখানিই গৌণ হয়ে যেতে হয়—সৃষ্টি রক্ষা করতে তখন সঙ্ঘশক্তি বেশী মুখ্য হয়ে পড়ে। এ সংবাদ জানা না থাকলে বা ব্যক্তিবিশেষ গৌণ হয়ে যেতে না পারলে সে সৃষ্টি অসুন্দর হয়ে পড়বে। এর পরে সৃষ্টির ব্যাপারে এই আর একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায় যে, স্রষ্টা নিজের সৃষ্টির মধ্যে আসক্ত হয়ে পড়ে, সৃষ্টিকে অত্যতিষ্ঠং হয়ে থাকতে পারে না, সৃষ্টির সাথে একাত্ম হয়ে জড়িয়ে পড়ে, তাকে নিজের ভোগ্য বস্তু বলে মনে করে। স্রষ্টার শক্তিমত্তের অভিমানে বাস করে আত্ম-অহংকৃত এই শুম্ভ নিশুম্ভ অসুর হয়। সৃষ্ট বস্তুকে নিজের ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি দিতে না পারলে সে সৃষ্টি কেবল যে অসুন্দর তা নয়, তার মধ্য দিয়ে সমাজের যেমন কোন কল্যাণ হয়ে উঠবে না তেমনি স্রষ্টারও তা কল্যাণের কারণ না হয়ে হয়ে উঠবে বন্ধনের শেকল। যারা সচ্চিদানন্দের মহাপ্রাণের, মাতৃপ্রাণের অধিকারী হয়ে নূতন সৃষ্টি করেন, তাঁরা নিজের সৃষ্টিতে আসক্ত হয়ে পড়েন না—তাঁদের জীবনে এই কথাই সত্য হয়—

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ—
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার……'। ইত্যাদি

আমাদের প্রতি দিনের সংসারে এই আসক্ত হয়ে পড়ার দৃষ্টান্তের অভাব হবে না—আমাদের ঘরের মায়েরা সাধারণতই নিজের সৃষ্টিকে—সন্তানকে—অতিক্রম করে থাকতে পারে না—সন্তানের সঙ্গে একাত্মভাবে তারা একাত্ম হয়েই যায়, নিজেদের আর ছাড়িয়ে আনতে পারে না। সৃষ্টিকে তারা ভোগ করে, সৃষ্টির মধ্যে তারা আসক্ত হয়ে ডুবে যায়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যখন সবরমতী আশ্রম ছেড়ে দিতে পারেন, তখন বুঝি কতবড় মহা প্রাণের অধিকারী হলে নিজের সৃষ্টিকে মানুষ ফেলে দেবার সামর্থ্য রাখেন; শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অনেক প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, যখনই আকাশ থেকে ইঙ্গিত এসেছে তখনই সমুখের আহ্বান শুনতে পেয়ে সে প্রতিষ্ঠান তিনি অন্যের উপর অকুণ্ঠ দ্বিধাহীন চিত্তে ভার রেখে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছেন, তখনও নিজের সৃষ্টিকে

দিয়ে কাড়াকাড়ির মধ্যে যান নি। ভারতবর্ষ তার মাতৃপূজায় এই তিন বিষয় শিক্ষা লাভ করবার সাধনা করছে। তিন বিষয়কে পূজার তিনদিনে ভাগ করে দিয়েছে—সপ্তমী পূজার প্রথম দিনে মহাকালীর সাধনা করে সু ও কু-রূপ সংস্কার মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয়কে বধ করে থাকে; পূজার দ্বিতীয় দিনে অষ্টমী তিথিতে মহালক্ষ্মীর উপাসনাদ্বারা বিচ্ছিন্নতার মহিষাসুর বধ করে সঙ্ঘচেতনার সাধনা করে; তৃতীয় দিনে মহাসরস্বতীর ধ্যানে অহঙ্কার-দৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা রূপ শুম্ভ নিশুম্ভ অসুর থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রয়াস করে।

এইভাবে দেখা যায় বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ দেখেছে যে, এই শক্তিই সৃষ্টির হেতুভূতা সনাতনী, অথচ সে শক্তি বিরাট হলেও ক্ষুদ্রতমের মধ্যেও যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাঁকে আমার ধারণাযোগ্য রূপের মধ্যে নিয়ে যদি আসি, এবং তাঁর বিশাল সৃষ্টির যে তত্ত্ব তাই-ই যদি আমি খানিকটা ধ্যান করতে চেষ্টা করি, তাহলেই সেই বিরাট আর অনির্বচনীয় মহিমা আমাকে শুধু মুগ্ধ ও বিস্মিত করে না, আমাকে অভয়, নিশ্চিন্ততা ও শক্তি প্রদান করে, তাই শক্তি সাধনার এ প্রয়াস উল্লেখযোগ্য বটে। কিন্তু এই সঙ্গেই একটা প্রশ্ন জাগে যে, এমন করে মাতৃ-আরাধনা করেও বাস্তবের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এমন দুর্বল হয় কেন? মাকে যে ধ্যান করে দানবদলনী রূপে, সে বাস্তব ক্ষেত্রে দানব দলন করতে পারে না কেন? তার কারণ যুগ যুগ ধরে এই শক্তি-সাধনাটিকে ভারতবর্ষ পুরোপুরি আধ্যাত্মিক করে ফেলেছে, শক্তিরূপিণী মায়ের ধ্যানকে বাস্তব ক্ষেত্রে এনে বাস্তব জগতে অসুর-বধের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নি। তাই যাদের ধ্যানের মা অদ্ভুত রণকুশলী, বছর বছর সেই রণরঙ্গিণী মায়ের যারা পূজো করে আসছে, তারাই পরের দাসত্ব করেছে লজ্জাহীন ভীরুতায় যুগের পর যুগ। অসামঞ্জস্যের জন্য লজ্জা বোধ করতেও ভুলে গিয়েছিল।

এখনও যে সামঞ্জস্য হয়েছে সে কথা বলতে পারি না—
আধ্যাত্মিকতা মানুষের ক্ষেত্রকে শুদ্ধ ও শক্তিশালী ক
না, সে আধ্যাত্মিকতাকে কেউ বাদ দিয়েছে জানি, আ
একদল বিনা প্রশ্নে তাকে আজও মেনে চলেছে কিন্ত
কিছুই করে না। কিন্তু ভারতের এই শক্তি-সাধনা
সত্যি সত্যি মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সম
দিকই সার্থক করতে পারে, ভারতবর্ষ শক্তিমান হ
পারে অথচ অপরেরটা কেড়ে খায় না, অপরের স্বাধী
সত্তাকে অপমান করে না—এ যে ভারতবর্ষই পা
এ কথা কবে ভারতবর্ষ প্রমাণ করবে? স্বাধীন ভারতে
দৈনন্দিন জীবন আজও কর্মকুণ্ঠা, অলসতা, স্বার্থান্ধ
মিথ্যাচার প্রভৃতি অসৌন্দর্যে ভরা, আর শক্তিহীনত
আর কথা কি? তবু যদি কোনদিন মাতৃসাধক ভারত
মায়ের মত শক্তিমান হবে, সে শক্তিমত্তাদ্বারা সে সর্বভূতে
কিছু তো গ্রাস করবেই না, বরং সে শক্তিদ্বারা
তার মায়েরই মত সর্বভূতের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর কর
সর্বভূতের তুষ্টি পুষ্টি শান্তি বিধান করবে।
আরাধনায় ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনকে মানসিকতার
স্তরে পরিশুদ্ধ করব, সৃষ্টিকর্ত্রী মায়ের কাছ থেকে স
স্থিতি বিনাশের তত্ত্ব লাভ করে সেই ভাবে মুক্ত জী
পরিচালিত করব, তেমনি দেহের ক্ষেত্রে বাস্তবতায় সে
শক্তিমান হয়ে দুর্বলতার পাপ থেকে মুক্ত থাকব—
আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজ বিশ্বশক্তি মাকে প্রণাম
বলি, মাগো তুমি যেমন, আমাদের তেমন হওয়ার
লাভ হোক, আমরা তুমি হব—নইলে কিসের পূ
মায়ের মত শক্তি যদি লাভ করতে না পারি, মা
মত সর্বভূতের কল্যাণ করতে যদি না পারি তো কি
পূজা? মিথ্যা পূজার আচার আর আড়ম্বর থে
মাগো, আমাদের রক্ষা কর। আমাদের মাতৃপূজা স
ভাবের পূজা হোক, যাতে পূজকে পূজ্যের গুণ বর্তা
মাগো, আমাদের তেমন যোগ্য কর।

অমর সুর-সাধক বীঠোফেন

।। শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ।।

"তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে—
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে ?"

সুর সাধনা জীবনের পরমার্থৈষণায় পরিণত হয়েছিল সঙ্গীতকার বীঠোফেনের জীবনে। শুরু কিন্তু, জ্ঞান বীঠোফেন যখন নেহাৎ বালক সে সময় থেকেই শুরু হয় সুর-সাধনা। বীঠোফেনের পিতা ছিলেন একজন পেশাদার পিয়ানো বাদক। তার আর্থিক অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। তাই ছেলেকেও পিয়ানো-বাজিয়ে তৈরী করবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করতে লাগলেন। ঘরে ছিল একটা পুরনো পিয়ানো। ছেলেকে এক-আধটা গৎ দিয়ে তার সামনে বসিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন যাতে বালক ঘর ছেড়ে অন্যত্র না যায়। বালক বীঠোফেন পিয়ানোর রীডে রীডে হাল্কা আঙুল চালিয়ে গৎ বাজিয়ে যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হত। বালক একান্ত চিত্তে সুরের পর সুর তুলতেন পিয়ানোতে। প্রায়ই একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যেত। দরিদ্র গৃহস্থের বেবন্দোবস্ত ঘরের যেখানে ছিল নানা জায়গায় ফাটল। সেই একটা ফাটল থেকে প্রতিদিন বেরিয়ে আসত একটা মাকড়সা। সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ত মধুর সুর-তরঙ্গ। সেই সুরের তালে তালে মাকড়সার হাল্কা দেহটিও অপূর্ব পুলকাবেশে শিহরিত হত।

বালক জন্ম নিয়েছিলেন এক দৈবায়ত্ত প্রতিভা নিয়ে। প্রকৃতির প্রতিটি সুর, প্রতিটি ছন্দ অনুরণিত হত বীঠোফেনের হৃদয় তন্ত্রীতে। বিশ্ব-বীণার ঝঙ্কার কানের ভিতর দিয়ে নিত্য এই জন্ম-শিল্পীর মরমে প্রবেশ করত। হেডিন, মোজার্ট, বাখ প্রমুখ সুরকারগণ যে সুর-লোকের সৃষ্টি করে অমরত্ব অর্জন করেছেন, তার সৌন্দর্য ও সুষমা মূলতঃ বহিরাশ্রিত। বীঠোফেনের সৃষ্ট সীম্ফনির (symphony) সৌন্দর্য অন্তরাশ্রিত—কেবল স্থূল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই এর রসোপলব্ধি সম্ভব নয়, এ হচ্ছে সূক্ষ্ম অন্তরোপলব্ধির বস্তু। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের শত শত সুরের মধ্যে বীঠোফেন রচিত নয়টি সীম্ফনি অনন্য ও অনবদ্য। কি জনপ্রিয়তায়, কি আকৃতিমত্তায় এর তুলনা নাই। এই অসামান্যতার কারণ শ্রুতিমধুরতাই শুধু নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শ্রুতি-মাধুর্যেই বীঠোফেন সোনাটার (sonata) পরিণতি নয়। সঙ্গীতকে তিনি যুক্ত করেছেন জীবন-মর্মের সঙ্গে। যেমন মানুষের আশা ও আনন্দ তেমনি মানুষের বেদনার হাহাকার ধ্বনি-রূপ লাভ করেছে বীঠোফেনের সুর-সৃষ্টিতে।

মানুষের জীবনের সমস্যা, মানুষের হৃদয়াবেগ সুর ও সঙ্গীতের মাধ্যমে আত্ম প্রকাশের নূতন পথ খুঁজে পেয়েছে। সস্তা বাহবা পাওয়ার গান বীঠোফেনের নয়। এ গান করতালির অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু অন্তরের দুয়ারে আঘাত দেয়। নিবিড়তা ও গভীরতা হচ্ছে বীঠোফেন সোনাটার বৈশিষ্ট্য—যে কারণে শ্রোতামাত্রেই সহজ ভাবে সাড়া দেয় এ-সঙ্গীতের সুরের লালিত্যে। বীঠোফেনে সুরের তপস্যা পরমার্থের সন্ধান।

প্রথম সীম্ফনির রচনা কাল বীঠোফেনের ত্রিশ বৎসর বয়সে। প্রতিভাবান যুবকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের অবধি নাই। আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ সচেতন বীঠোফেন সঙ্গীত নগরী ভিয়েনাজয়ের স্বপ্নে তখন বিভোর। ভক্ত, শিষ্য এবং অনুরাগীর নাই অভাব। বহুব্যাপ্ত জনপ্রিয়তা, আর সম্মুখে আ-দিগন্ত প্রসারিত জীবনের জয়যাত্রাপথ।

কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। উজ্জ্বল প্রভাত-

তখন যেন অপ্রত্যাশিত কৃষ্ণ মেঘে আবৃত হল। যাত্রার প্রারম্ভেই পথরোধ করে দাঁড়াল এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বধিরতার উপসর্গ দেখা দিল। বিমূঢ় বীঠোফেন নিজেকে সরিয়ে নিলেন লোক-সমাজ থেকে। সামাজিক উৎসবাদি বর্জন করলেন। নিজের এই মারাত্মক অপারগতা যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ বধির হয়ে গেলেন। ভিয়েনার শহরতলীর অপেক্ষাকৃত নির্জন পল্লী হেইলিগেনস্টাডে আশ্রয় নিলেন বীঠোফেন।

ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস এই উদীয়মান প্রতিভা-দীপ্ত শিল্পীকে একদিকে করে তুলল অধীর ও অসহিষ্ণু, আবার অন্যদিকে চিত্তলোকে এনে দিল এক নিবিড় ধৈর্য ও প্রশান্তি। বহিরাচরণে বীঠোফেন ক্রমশঃ হয়ে উঠলেন অসংযত ও উদ্দাম। নিজের দিনপঞ্জীতে তাঁর মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে :

"কাউকে জোরে কথা বলতে অনুরোধ করতে পারব না। যে ইন্দ্রিয়ের শক্তি আমার ছিল সব চাইতে বেশী সতেজ ও সক্রিয়, আজ তারই অভাব আমি কি করে আর দশজনকে জানাব? এ আমার কি দুর্ভাগ্য যে, আমার পাশের লোকটি যে কোন দূরাগত বাঁশির ধ্বনি উপভোগ করবে, আর আমি দাঁড়িয়ে থাকব শ্রবণহীন নিশ্চল পাথরের মত। এ দুঃখ আমি কোথায় রাখি! গভীর নৈরাশ্যে আমি অভিভূত, বুঝিবা এই ব্যর্থ, বঞ্চিত জীবনের উপর মৃত্যুর যবনিকা টেনে দেওয়াই এখন আমার একমাত্র কর্তব্য।"

কিন্তু এই শোচনীয় মানসিক অবস্থাতেই রচিত হয় বীঠোফেনের বিখ্যাত দ্বিতীয় সিম্ফনি। সুরস্রষ্টার দিক দিয়ে তিনি ক্রমশই অন্তর্মুখীন হয়ে উঠলেন। প্রকৃতির প্রসাদে বঞ্চিত হয়ে তিনি খুঁজতে লাগলেন অন্তরের সম্পদকে। বাইরের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। হৃদয়ের গভীর প্রশান্তি জাগিয়ে তুলল এক অভিনব উপলব্ধি, এক নূতন অনুভূতি। বধিরতা এনে দিল জীবনের সুবর্ণ সুযোগ। অভিশাপ দেখা দিল আশীর্বাদরূপে। ইন্দ্রিয়-বিকলতায় অন্তরানুভূতির সাড়াগুলি যেন প্রখরতর হয়ে উঠল। বিশ্বকবির কথায় 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে'; যে নিগূঢ়, নিপুণ ছন্দে বিশ্ব-সংসার গাঁথা সেই ছন্দ ধরা দিল সুরশিল্পীর অনুভূতিতে, এবং সেই অনুভূতিই বাঙ্ময় হয়ে উঠল সুর-সম্ভারের মুখর লীলায়।

বীঠোফেন রচনা করেছিলেন মাত্র নয়টি সিম্ফনি—সুরলোকের এক একটি অম্লান, অক্ষয়, শাশ্বত সম্পদ। মহাকবি সেক্সপীয়রের রচনায় যেমন আছে প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যের বর্ণনা আবার তেমনি অভিব্যক্ত হয়েছে জীবনের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ, আর মানব মনের দুর্জ্ঞেয় প্রতিবেদন সেক্সপীয়র-সাহিত্য আর বীঠোফেন-সিম্ফনি প্রায় সমধর্মী উভয়েরই দিগন্ত অনন্ত-বিসারিত। কড়ি ও কোমলে অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে উভয়ের সৃষ্টিতে। সে সুর কখনও রৌদ্রময়, হাস্যদীপ্ত শিশু-সারল্যের প্রতীক, আবার কখনও সে সুরধারায় নেমেছে দুঃখ বাদলের অঝোর অশ্রু-প্লাবন। সেক্সপীয়র এবং বীঠোফেন উভয়েই পেয়েছেন জীবনের সন্ধান।

সংশয় ও নিরাশার কুহেলি অপসৃত হয়ে ফুটে উঠে আশার প্রদীপ্ত আলোক। উভয়েই জীবন-রস মানবতা পূজারী। বীঠোফেনের সঙ্গীত সত্যোপলব্ধির নিগূঢ়তা দার্শনিক তত্ত্বকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। সুরস্রষ্টার দিক দিয়েও যে মানুষ পরমার্থের সন্ধান লাভ করতে পারে শিল্প-সাধনায় বীঠোফেনের এই হল সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁর সমসাময়িকের দৃষ্টিতে বীঠোফেন হচ্ছেন সর্বকালের মহাশূন্যবিহারী মুক্ত বিহঙ্গম।

কিন্তু এই অসামান্য মনীষীর পার্থিব দৈনন্দিন জীবন তাঁর অন্তর্মুখীন আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। অন্তরের গভীর প্রশান্তি ও আনন্দময় অভিব্যক্তি তাঁর সুর-সৃষ্টি। কিন্তু প্রতি দিনের জীবনে এর লেশ মাত্র চিহ্ন নাই। পারিবারিক জীবনে না ছিল সুখ, না শান্তি। অকৃতদার শিল্পীর আপন জন বলতে ছিল এক বিধবা ভ্রাতৃজায়া, যাকে তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না, আর ছিল এক বালক ভ্রাতুষ্পুত্র যাকে অপরিমিত আদর এবং আস্কারা দিয়ে নষ্ট করেছিলেন ছেলেটিকে তার মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে

সাংসারিক জ্ঞান বর্জিত বীঠোফেন। তাকে যে পরিমাণ আদর দিতেন তার সিকি ভাগও দিতেন না আহার এবং পরিধেয়। মাতৃসান্নিধ্যবঞ্চিত বালক পিতৃব্যের অস্বাভাবিক স্নেহের আতিশয্যে হতাশ হয়ে প্রথমে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তারপর সৈন্যদলে যোগদান করে নামহীন বিলুপ্তি বরণ করে নিয়েছিল। প্রতিভার কোন প্রভাবই তাকে স্পর্শ করে নি।

অপরিষ্কৃতা আর খামখেয়ালের অন্ত নেই। বীঠোফেনের বাসগৃহের না ছিল কোন শৃঙ্খলা, না সৌন্দর্য। সারা ঘরময় ছড়িয়ে থাকত বই, কাগজপত্র আর আবর্জনা। নিজের বেশভূষাও ক্রমশঃ বুনো হয়ে উঠল। ছোট শিশুরা তাঁকে দেখে ভাবত বইয়ের ছবিতে দেখা "রবিন সন ক্রুশো"। মেজাজ বেজায় রুক্ষ। পরিচারিকার মুখেই একদিন ছুঁড়ে মারলেন খাবারের ডিশ। এই সময়টায় বীঠোফেনের আচরণে উন্মাদ-লক্ষণ বেশ সুস্পষ্ট। মৌন, বধির, নির্বাক একটা মানুষ যেন জীবনের ভারে বিড়ম্বিত—এই হল তৎকালীন বীঠোফেনের একটা অবয়ব বর্ণনা। কানে একেবারে না শোনায় মন দিন দিন হয়ে উঠছেন সন্দিগ্ধ। কাউকেই বিশ্বাস করেন না। প্রকাশক আর থিয়েটারের মালিক কারুর সঙ্গেই সদ্ভাব নাই। সকলের উপরেই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। কিন্তু আবার এই সময়েই বন্ধুর পুত্রবিয়োগে ব্যথাতুর শিল্পী গিয়েছেন বন্ধুর গৃহে। কোন সান্ত্বনাবাক্য মুখ দিয়ে একবারও বের করলেন না, নীরবে বসলেন পিয়ানোটির সম্মুখে, সকরুণ সুর তরঙ্গে ব্যক্ত করলেন সান্ত্বনা ও সমবেদনা। প্রশমিত হল বন্ধুর শোকতাপ। তারপর ধীরে ধীরে নীরবে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বীঠোফেন ছিলেন অকৃতদার, কিন্তু জীবনে প্রেম এসেছিল একাধিকবার। রূপসী অভিজাতিকার প্রণয়-সংসর্গ তিনি লাভ করেছিলেন বার কয়েক, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সে প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পরিণয়ে পরিণতি প্রাপ্ত হয় নি। দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে গেলে যে তিতিক্ষা ও মনোসাম্য প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন তার লেশমাত্র ছিল না বীঠোফেনের চরিত্রে ও আচরণে।

বিখ্যাত মুন-লাইট সোনাটা (moon light sonata) উৎসর্গীকৃত হয়েছিল ভিয়েনার সুন্দরীশ্রেষ্ঠা কাউন্টেস গুইলিয়েটো গুইসিয়ার্ডির উদ্দেশ্যে। এই পরম-লাবণ্যবতী তরুণী ছিলেন বীঠোফেনের প্রথম প্রেমাস্পদ। বিবাহ তাঁদের হ'ল না প্রধানতঃ অভিজাত তরুণীর আত্মীয়বর্গের বিরোধিতায়। প্রতিষ্ঠাহীন পিয়ানো বাদকের হাতে কন্যা সম্প্রদান তাদের আদৌ মনঃপূত হয়নি। তারপর ব্যর্থপ্রেমের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক বন্ধুর লিখিত পত্রে। ব্যঙ্গ ও ব্যর্থতা সংমিশ্রিত আছে এই চিঠির ছত্রে ছত্রে। "Now you can help me to look for a wife. She must be a good-looking one. I cannot love anything that is not beautiful or I should love myself. * * Among women, the soul has no body and the body no soul." ভালই হয়েছিল তিনি কোন নারীকে পরিণয়সূত্রে নিজের ক্ষিপ্তপ্রায় জীবনের সঙ্গে বাঁধেন নি। বিরল জীবনের ছন্দহীনতা তাতে বাড়তো বই কমত না।

বীঠোফেন ছিলেন একজন সত্যিকারের পথিকৃৎ। নীল দানিয়ুবের তীরে সঙ্গীত ও সৌন্দর্যের শহর সুবিখ্যাত ভিয়েনা—সুরশিল্পীর সাধন পীঠ। বীঠোফেনের জীবন-সংগ্রাম এবং সাধনা শুরু হয় ভিয়েনা নগরীতেই, সিদ্ধি লাভও হয়েছিল এখানেই। গোড়া থেকেই দেখা যায় তরুণ শিল্পীর স্বকীয়তা। বিখ্যাত পিয়ানোবাদক অ্যালব্রেত্‌স্‌বার্গারের কাছে শিক্ষানবীশির সময়েই প্রকট হয় গতানুগতিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব। বীঠোফেনের রোজনামচায় লেখা আছে: "I want to learn the rules in order to find out the best way of breaking them."

ভিয়েনার প্রাচীনপন্থী সুরকারদের শেষ প্রতিভূ হচ্ছেন বীঠোফেন। রসজ্ঞ সমালোচকের মতে তিনি পুরাণ যুগকে পিছনে ফেলে এক নবযুগের তোরণদ্বারে দাঁড়িয়েছেন। সুরের ঝরণা ধারায় অভিষিক্ত করলেন ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ মানবীয় সাম্য এবং মৈত্রীকে;

মামুলী ধারার নিগড়মুক্ত করলেন সঙ্গীতকে।

বীঠোফেন সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন দার্শনিক শোপেনহর (Schopenhaur): In a Beethoven symphony we hear the voices of all human passions—joy, sorrow, love, hate, fear, hope and so on in innumerable shades and gradations, but all as it were abstract and without particularisation; we hear simply their form without substance, as in a purely spiritual world."

যোগীর ধ্যানের মতই স্পষ্ট অনুভূতি-সাপেক্ষ এই সুরধারা—সত্য ও সুন্দরের ব্যঞ্জনায় মধুর, সমুজ্জ্বল। শাণিত তরবারির মত নৃত্য করে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক। যেন—

"বাদল দিনে কত মেঘের গান,
হোলির দিনে কত কাফি।
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে
গেয়েছে বিজয়ার গান,
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া গেছে
দু'নয়ান।"

এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাধরের জীবনে সুখ দুঃখ, খ্যাতি ও বিড়ম্বনা, ব্যর্থতা ও বঞ্চনা কোনটারই অপ্রতুল ছিল না। জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন প্রচুর, জনবিমুখতায় আঘাতও পেয়েছেন অনেক। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ। ওয়াটার্লু যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী কাল। নেপোলিয়নের শাসন-পাশ মুক্ত ভিয়েনা নগরী সেদিন আনন্দে উচ্ছল, উদ্বেল। পথঘাট, কফিখানা, পানশালা, পার্ক, প্রমোদোদ্যান সব গানে গানে মুখরিত। লঘু, চপল গানের সুর-মদিরায় ইতর জন-চিত্ত সেদিন মত্ত মাতাল। এই হাল্কা পরিবেশে বীঠোফেন সৌন্দর্যের গূঢ় আনন্দরস অনাদরে ধুলায় লুটায়। তাই ক্ষুব্ধ শিল্পী লিখেছেন: "I am now alone in the ugly city. Everything that happens here is dirty and mean. It could not be worse."

দুরারোগ্য নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শেষ শয্যা নিয়েছেন। শয্যার চারপাশে নিক্ষিপ্ত হ্যাণ্ডেলের স্বরলিপি (Handel chorus)। ধীরে মৃত্যু-যবনিকা অবনমিত হচ্ছে। জীবন রঙ্গমঞ্চের প্রতিটি আলো একে একে নির্বাপিত হচ্ছে। অন্তিম শয়নে শায়িত মহাশিল্পী। যাজক প্রাক্ মৃত্যু-অনুষ্ঠান (sacrament) শেষ করলেন। বীঠোফেনের অস্ফুট কণ্ঠস্বর শ্রুত হল "Applaud my friends, the comedy is over."। শেষ কথা, শেষ নিঃশ্বাস।

কী অদ্ভুত মানুষ, কী অদ্ভুত চরিত্র! আনন্দ ও নৈরাশ্যের কী অদ্ভুত সংমিশ্রণ! সুর-সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ সাধক বীঠোফেন! "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে": আনন্দ হতেই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ও স্থিতি। উপনিষদ্ যেমন সেই ছন্দের পরিপোষক, সঙ্গীতও তেমনি শাশ্বত জীব আত্মার পরিপোষক। নয়টি সুর-সমন্বয় (symphony) রচনার শেষে দশম সিম্ফনি রচনা অসমাপ্ত রইল।

জন্ম জার্মানীর বন শহরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর, মৃত্যু অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা নগরীতে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ।

দেশ-প্রেম

॥ শ্রীকনক মজুমদার ॥

আমাদের জীবন যাত্রা গতানুগতিক ভাবে চলতে থাকে, যতক্ষণ না কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শরীর যখন অসুস্থ হয় তখন আমরা বিশেষভাবে শরীরের দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকি। তখন রোগ সারাবার দিকেও যেমন দৃষ্টি দেই তেমনি শরীরকে কি করে সুস্থ রাখা যায়—সে বিষয়েও চিন্তা করি। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে অপরকে সজাগ করবারও চেষ্টা করি। আমরা সমাজে দলবদ্ধ হয়ে বাস করছি—কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার কোন প্রয়োজন হয় না—অনেক সময় নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়েও আমরা থাকি। দরকারে পড়লে পরস্পরের খোঁজ পড়ে। প্রতিবেশীর প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব না রেখে—পরস্পরের প্রতি একটা আপন জন বোধ থাকার প্রয়োজন তখন আমরা বুঝতে পারি বিশেষ করে যখন আমরা বিপদে পড়ি। বর্ত্তমানে সময়ে দেশপ্রেম সম্বন্ধে সকলকে সজাগ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—একথা আজ সকলেই চিন্তা করছেন, কারণ দেশের সম্মুখে বিপদ; এই বিপদ থেকে দেশকে মুক্ত করতে দেশবাসীকে সচেষ্ট হতে হবে এবং সেই চেষ্টার মূলে দরকার দেশপ্রেম। দেশবাসীর চেষ্টাকে কি ভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায়, কি ভাবে সফল করে তোলা যায় সেই দিকে দেশনেতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে।

বনের মধ্যে চলতে চলতে পথিক হঠাৎ বাঘ দেখে ছুটতে আরম্ভ করে, অথবা যদি সে সশস্ত্র থাকে তাহলে বাঘকে মারবার জন্যে রুখেও দাঁড়াতে পারে। পথিকের এই চেষ্টার পেছনে থাকে তার প্রাণের ভয়; বাঘ তার প্রাণ নিয়ে নেবে, প্রাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়; তাই প্রাণ বাঁচাতে পথিকের প্রাণপণ চেষ্টা। দেশের বিপদই দেশবাসীর বিপদ। দেশবাসী বলতে যদি এক ব্যক্তি বোঝাত তাহলে কোন সমস্যা থাকত না। কিন্তু সেখানে একাধিক ব্যক্তি এবং সেই একাধিক ব্যক্তির মধ্যে একই প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে হবে। ব্যাপারটা তাই কঠিন। একাধিক ব্যক্তির এই বিপদকে যে মনোবৃত্তিতে দেখলে ভেতর থেকে একটা স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টা প্রাণপণ চেষ্টার আকারে দেখা দিতে পারে, সেই মনোবৃত্তিকে জাগানই দেশপ্রেম। এর প্রেরণার মূল সূত্র হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে মমত্ববোধ এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একাত্মবোধ। দেশাত্মবোধ বা দেশপ্রেমের গোড়ার কথাও তাই মমত্ব বোধ।

শত্রুর বিরুদ্ধে কেবলমাত্র বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপকে প্রকৃত পক্ষে দেশপ্রেম বলা চলে না। সম্মুখ বিপদ থেকে বাঁচবার জন্যে দেশবাসীকে শত্রুর বিরুদ্ধে নানাভাবে উত্তেজিত করার প্রয়োজন সাময়িক; এবং আপৎ কালে কখনও কখনও সেইরূপ করার প্রয়োজনও হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছেলেমেয়েদের মনে দেশপ্রেম জাগানোর কাজ অনেক বেশী কঠিন ও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। সেখানে লক্ষ্য বস্তু শত্রু নয়; মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগানো, 'দেশ আমার' 'আমি দেশকে ভালবাসি,' এই অনুভূতি জাগিয়ে তোলা।

শিশু মাকে যে কারণে, যে ভাবে ভালবাসে, জন্মস্থান, জন্মভূমিকেও সেই ভাবে ভালবাসবে। জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলা হয়। মাতৃভূমি মায়েরই সমতুল, শিশু মাকে ভালবাসে বলেই মায়ের প্রতি শিশুর অধিকারবোধ ও দায়িত্ববোধ জন্মায়। মাকে যত্ন করা, মাকে রক্ষা করার কথা তখন শিশুকে শিখিয়ে দিতে হয় না। রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতায় শিশুর কল্পনায় তার পরিচয় মেলে। শিশুর কাছে মা জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ'

ভালবাসায় পায়। দেশ পরোক্ষভাবে মায়েরই কাজ করে। শিশু মাকে ভালবাসে বলেই সে চাইবে না তার মায়ের উপর অন্য কেউ এসে আধিপত্য করবে, মাকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে, মাকে কষ্ট দেবে। কিন্তু যদি সে দেখে যে মায়ের ভালর জন্যে কেউ কিছু করছে, তার মাকে সেও ভালবাসছে, তাহলে শিশু তাকে আপনজন মনে করবে, মায়ের কাছে আসতেও দেবে। শিশু তার খেলনাটিকে প্রাণপণ করে ভালবাসে এবং সযত্নে লুকিয়ে রাখে—পাছে অন্য কেউ নিয়ে নেয় বা নষ্ট করে ফেলে, সেই ভয়ে। ভালবাসার জিনিসের ওপর এই মমত্ববোধ এবং অধিকার বোধ স্বাভাবিক। এই বোধ জন্ম ভূমির ক্ষেত্রেও জাগিয়ে তুলতে হবে।

শিশুর ক্রীড়াভূমি শিশুর প্রিয় হয়। জন্মভূমি শিশুকালের সঙ্গে জড়িত, তার প্রতি সাধারণতঃ সহজ ভাবেই মনের প্রীতি গড়ে ওঠে। জন্মভূমির বৃহত্তর পরিধিই হচ্ছে 'আমার দেশ'। জন্মস্থান বা জন্মভূমির সঙ্গে শিশুর মনকে যত দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে দিতে পারা যাবে, পরবর্ত্তীকালে দেশের প্রতি টানও তত দৃঢ় হয়ে গড়ে উঠবে।

দেশাত্মবোধ বা দেশপ্রেম ছেলেমেয়েদের মনে জাগাতে হলে শিশুকাল থেকে সে চেষ্টা করতে হবে। শিশুকে যে বা যা কিছু আনন্দ দেয় তাইই শিশুর প্রিয় হয়, তাকেই শিশু আপন মনে করে, তার সঙ্গে তার মন যুক্ত হয়। শিশুর সুখকর অনুভূতির সঙ্গে কি ভাবে দেশ বা জন্মভূমিকে যুক্ত করা যায়—সেই চেষ্টা করতে হবে। শিশুকে দেশ সম্বন্ধে জানতে দিতে হবে। শিশুকে দেশ সম্বন্ধে জানতে দিতে হবে। প্রথমে সে পরিচিত হবে জন্মস্থানের সঙ্গে। তাকে শেখাতে হবে, এটা তোমার ঘর, এটা তোমার বাড়ী, এরা তোমার প্রতিবেশী, এরা তোমার দেশের লোক; তারা যে কি কাজ করে এবং কি ভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর নির্ভরশীল ইত্যাদি। নিজের ঘরকে সুন্দর করে রাখা, বাড়ীকে সাজিয়ে রাখা, ভালভাবে রাখা ইত্যাদি কাজে তাকে উৎসাহিত করা—বাড়ীর প্রতি মমত্ববোধ জাগানো। অপর কেউ এসে ঘর বাড়ী নষ্ট করবে, আধিপত্য করবে, দখল করে বসে থাকবে, এটা সে তখন নিশ্চয়ই চাইবে না। কিন্তু বন্ধুরা এলে সে খুশী হয়ে তাদের ঘরে নিয়ে যাবে, বসাবে, যত্ন করবে। ঠিক এই মনোভাবটি-ই দেশের প্রতি জাগিয়ে তুলতে হবে।

শিশু বড় হতে হতে পারিপার্শ্বিকের প্রতি মনোযোগী হয়। তখন তাকে জানাতে হয়, শেখাতে হয় কি ভাবে তার প্রতিটি প্রয়োজন মিটছে। সে যে দুধ খাচ্ছে, ভাত মাছ তরকারী খাচ্ছে—কোথা থেকে, কি ভাবে সে সব তার বাড়ীতে আসছে, কে দিয়ে যাচ্ছে, এবং যারা যোগান দিচ্ছে তাদের জীবন যাত্রা কি রকম—ইত্যাদি শিশুকে জানাতে হবে। সে যে পোষাক পড়ছে, খেলনা কিনছে—কোথা থেকে আসছে? তাও সে জানবে। শিশুকে তাদের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যেতে হবে। সে দেখবে চাষী কত কষ্ট করে, রোদে বৃষ্টিতে ভিজে ধান বোনে, সেই ধান থেকে চাল হয় এবং সেই চাল কিনে নিয়ে বাড়ীতে ভাত রান্না হয়। সে প্রতিদিন বাড়ীতে মায়ের কাছে যে ভাত খাচ্ছে তার পেছনে যাদের পরিশ্রম রয়েছে তাদের কথা জানতে পারলে তাদের প্রতি শিশুর মমত্ববোধ জাগবে, তাদের আপন জন মনে হবে, তাদের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ জাগবে। এই ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে জানতে পারবে তার প্রয়োজন মেটাতে অপরে কত পরিশ্রম করছে। শিশুর জগতে তখন তারা সকলেই আপনজন পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়বে। এই ভাবে দেশবাসীর সঙ্গে বৃহত্তর পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

শিশু বড় হয়ে যখন স্কুলে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি পড়বে তখন শিক্ষক যদি শিশুর জন্মস্থানের উদাহরণ দিয়ে পড়া আরম্ভ করেন এবং বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপন করে দেখান তাহলে দেশের সঙ্গে শিশুর মনোভাব দৃঢ়ভাবে যুক্ত হবে। সমাজ-বিজ্ঞানে প্রথমে শিশুর জন্মস্থানের লোকেদের জীবন যাত্রার উল্লেখ করা দরকার।

শিশু যেমন দেশের লোকেদের জানবে তেমনি দেশের

ভৌগোলিক জ্ঞানও তাকে দিতে হবে। সে যে গ্রামে বা শহরে জন্মেছে তার কোথায় কি আছে তাকে দেখানো, জানানো দরকার। ক্লাসে ভূগোল পড়াবার সময় তাকে তার জন্মস্থানের ভূগোল আগে শেখানো দরকার। কারণ জন্মস্থানের সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ থাকে। তারই সঙ্গে বৃহত্তর দেশের যোগাযোগ করিয়ে দিতে হবে। বাড়ীতে মা-বাবা, ঠাকুমা-দিদিমার কাছে শিশু তার পূর্ব্ব পুরুষদের কথা জানবে। ইতিহাসের ক্লাসে শিক্ষকের কাছে সে জানবে দেশের বীরদের কাহিনী। কেন তাঁরা স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়েছেন? কি ভাবে দেশের রক্ষার্থে প্রাণ পণ করেছেন। কেন করেছেন? কি ভাবে বীরপুরুষদের চেষ্টায় দেশের সমস্ত লোকের স্বার্থ রক্ষা হয়েছে, যাঁরা করেছেন, তাঁরা তারই দেশের লোক—এ সবই সে জানবে। তাঁদের সঙ্গে শিশুর মনে 'আপন জন' বোধ এনে দিতে হবে। মা-বাবা ও শিক্ষকের মনেও ঐ একাত্মবোধের অনুভব সর্ব্বাগ্রে থাকা দরকার। তা না হলে ছোটদের মধ্যে তাঁরা ঐ ভাব জাগাতে সক্ষম হবেন না।

দেশাত্মবোধ জাগাতে দেশের মাটির সঙ্গে পরিচয় হওয়া একান্ত দরকার। আজ কাল ভাড়া করা ফ্ল্যাট বাড়ীতে থেকে শিশুর মনে 'আমার বাড়ী', 'আমার ঘর' এই বোধ এনে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। মনে হয়, শহরের জীবন যাত্রায় এটা একটা অন্যতম ক্ষতিকর পরিণতি। শহরের মানুষের মনে একাত্মবোধ গড়ে উঠতে চায় না। শহরের প্রতিবেশীর সঙ্গে সহজে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে না এবং উঠবার সুযোগও কম। যেটুকু পরিচয় ঘটে সেখানে বেশীর ভাগই থাকে তুলনামূলক মনোভাব। শহরের পরিবেশ শিশুর মনের সহজ বিকাশের অন্তরায়। যেমন যদি এমন হয়, শিশু জন্মাচ্ছে হসপিটালে 'লেবার রুমে', থাকছে এসে বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে, খেলছে ফুটপাতে; মা-বাবাকে দেখছে শুধু কাজ করতে এবং অন্য মা-বাবার সঙ্গে তুলনা করে কখনও সঙ্কুচিত কখনও গর্ব্বিত হয়ে থাকতে; বন্ধুদের দেখছে কার কি আছে না আছে, তাই নিয়ে বড়াই করছে, ঈর্ষা করছে, ঝগড়া করছে—এই রকম পরিবেশে যে শিশু বড় হচ্ছে—তার কাকে আপন মনে হবে? কার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে? যথার্থ দেশাত্মবোধ জাগাতে হলে রাষ্ট্রপতিদের এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিশুর নিজের ঘর, নিজের বাড়ী সম্বন্ধে আমার বোধ এবং মমত্ববোধ এনে দিতে হবে। তাকে ভিত্তি করেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশপ্রীতি গড়ে উঠবে।

সুষ্ঠু ভাবে দেশাত্মবোধ জাগাতে হলে শিশুকাল থেকে যত্ন করে শিশুর মনে দেশের সঙ্গে একাত্মবোধের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে এবং দেশের প্রতিটি জিনিষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়ে দিতে হবে—একথা পূর্ব্বেও বলেছি।

সঙ্কট মুহূর্ত্তে দেশের রক্ষার্থে ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করতে হলে দলবদ্ধভাবে নানা রকম উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা, গান, কবিতা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দেওয়া যায়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বীরত্বের কথা ও কাহিনী অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত করা যায়। রাজপুত বীরদের দেশপ্রেমের বহু জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, ইদানীং কালের স্বদেশী যুগের বাংলার বীরদের কাহিনী প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। যারা জোর পূর্ব্বক আমাদের দেশে আসতে চায়, তারা কেন আসতে চায়, এলে আমাদের কি অসুবিধা হবে, কি আমরা হারাব—ছেলেমেয়েদের মনে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিয়ে দিতে হবে। আমার নিজের বাড়ীতে যেমন অজানা অচেনা লোককে ঢুকতে দেই না, বা ঢুকতে দিলেও আধিপত্য করতে দিই না, তেমনি আমার দেশেই বা তা হতে দেবো কেন? বাবা মায়ের প্রতি ছেলেমেয়েদের যে ভালবাসা ও বিশ্বাস থাকায় সকল বাবা-মায়ের কথা ছেলেমেয়েরা মেনে চলে এবং বাবা-মাকে রক্ষাও করে, তেমনি রাষ্ট্রপতিদেরও বাবা-মায়ের মনোভাব নিয়ে দেশের লোকেদের ভালবাসা ও আস্থা অর্জ্জন করতে হবে। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের মনে ঐ ভালবাসা ও আস্থা গড়ে ওঠার গোড়া পত্তন করতে হবে বাবা-মায়েদের। ছেলেমেয়েরা দেশের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করতে পারলেই দেশ রক্ষায় চেষ্টার আর কোন ত্রুটি থাকবে না এবং সেটা মনে হওয়ার মূলে থাকবে—"দেশ আমার" এই বোধ।

ভাববার কথা

॥ শ্রীনলিনী কিশোর গুহ ॥

বিপদটা রাষ্ট্রিক না সামাজিক, সেই প্রশ্নই উঠিয়াছে।

ইংরেজ জাতির সুদীর্ঘ রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে অনেক বিপত্তি বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, কিন্তু সেই বিপত্তি-বিপর্যয়ের কোন আঘাতই জাতি হিসাবে ইংরেজকে দুর্বল করিয়া দিতে পারে নাই। একটা নিয়মানুবর্ত্তিতার সংযম, ধৈর্য্য, চারিত্রিক দৃঢ়তায় যে কোন আঘাত সে কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছে। ইংরেজ জাতির এই শক্তির মূলে রহিয়াছে তাহার স্বদেশ-প্রীতি। জাতি হিসাবে এই স্বদেশ প্রীতিই তাহার স্বধর্ম। এই জাতটা সত্যই বড়। দোষে গুণে বড়। সেদিনের সাম্রাজ্য বিস্তার লালসা, পরজাতি বিদ্বেষ, প্রভুত্বের অহমিকা, শোষণাদির গ্লানিকর ইতিহাস আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই জাতির স্বাধীনতা ও স্বদেশ প্রীতি, ইংরেজের সাহিত্য সৃষ্টি, ইংরেজের যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান-নিষ্ঠা তাহাকে জাতি হিসাবে নিঃসন্দেহে বড় করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন ইংরেজ জাতির শক্তির ও বৈশিষ্ট্যের মূলে কাজ করিয়াছে তাহার সমাজ ও পারিবারিক জীবনের রক্ষণশীলতা বা উহার প্রবণতা।

এই রক্ষণশীলতার গুণও আছে, দোষও আছে— যেমন প্রগতি বা আধুনিকতার গুণও আছে দোষও আছে। রক্ষণশীলতা প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। কিন্তু যাহা সত্যই যুগের জ্ঞানের আলোকে 'প্রাচীন' তথা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাকেই ধরিয়া থাকার যে রক্ষণশীলতা তথা গোঁড়ামী, তাহা কল্যাণের হইতে পারে না; কিন্তু অতি আধুনিকতার প্রগতির দাপটে "anything old is rotten" যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই পচা—মিথ্যা, এমন মিথ্যা ধারণা জীবনের আদর্শ হইলে একটা বর্বর আরণ্য জীবন লাভই হইবে উহার পরিণাম। মানব সভ্যতার অনেক কিছু কল্যাণকর নিয়ম নীতি কালের কষ্টিপাথরে সত্য বলিয়াই টিকিয়া রহিয়াছে, যাহাতে সমাজের কল্যাণ নিহিত,— স্থিতির পক্ষে যাহা অপরিহার্য। সমাজের রক্ষণশীলতা— কুসংস্কারে যাহা মিথ্যা তাহাকেও ধরিয়া থাকিতে চাহিতে পারে, আবার এমন কিছু পুরাতন আদর্শও সে রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে, যাহা সে কল্যাণকর বলিয়াই মনে করে।

ইংরেজ জাতি আধুনিকতার পাঠ লইয়াও, দেখ যায়, ষোল আনা আধুনিক হইতে পারে না, একটা রক্ষণশীলতার কৌলীন্য-বোধ বাধা দেয়। এই কৌলীন্য-বো আসলে কোন কিছু প্রাচীন সত্য বা নিষ্ঠার প্রতি গৌরব বোধ। আর, যাহা সত্যই গৌরবের, তাহা লই গৌরব-বোধের প্রয়োজন আছে বই কি? ভী প্রতিশ্রুতি রক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভারত ই লইয়া গৌরব করিতে পারে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা রেওয়াজ দেখা দিলে প্রতিশ্রুতি রক্ষার এমন দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে বৈ কি? বহু জনের প্রতি আন যখন প্রবল হইতে চাহে, তখন সমাজে এক-নিষ্ঠার আদর্শে তথা দৃষ্টান্তকে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে বৈ কি?

ইংরেজ জাতির রক্ষণশীল মতি গতির কথা বলিয়াছি ইংরেজের রাজা সম্রাট এডওয়ার্ড সিংহাসন ত্যা করিয়া গেলেন, রাজার বিবাহ সম্পর্কে ইংরেজ জাতি নিয়ম-নির্দ্দেশের দরুণ। কথায় বলে বাপের বেট বাপের বেটা বরং রাজসিংহাসন ত্যাগ করিলে তথাপি বিবাহের কথা-দেওয়া মেয়েটিকে ত্যাগ করিলে না। রাজা সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির প্রথাকে রাজা ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সোর গোল না তুলিয়া মানিয়া চলি গেলেন। ইহাকে জাতির রক্ষণশীলতা বলিতে পা যায়, প্রাচীন-পন্থী গোঁড়ামী বলা যায়; কিন্তু এব

জাতির এই নিয়ম নিষ্ঠার মূল্য এবং শক্তিও সামান্য নহে। আর রাজার প্রণয়-নিষ্ঠা এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার আচরণ জাতিকে ত্যাগ সংযম ও নিষ্ঠার আদর্শ দিয়া গেল। কিন্তু সেই নিয়ম-নিষ্ঠাও বুঝি আর থাকে না।

কিছু দিন পূর্বে প্রোফুমো-কীলার-ওয়ার্ড সম্পর্কিত ঘটনার (সংবাদ পত্রের ভাষায় কেলেঙ্কারী) কাহিনী প্রকাশ পায়। প্রোফুমোর মন্ত্রিত্ব গিয়াছে, ওয়ার্ড বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিলার-কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িলে ম্যাকমিলান গভর্ণমেন্টকে বিলাতী পার্লামেন্টে শুধু বিব্রত হইতেই হয় না, গভর্ণমেন্টের ভিত্তিতে (অন্ততঃ প্রেষ্টিজের ভিত্তিতে) প্রচণ্ড আঘাত লাগে। গোড়ায় বলিয়াছি—ইংরেজের জাতীয় ইতিহাসে অনেক বিপত্তি দেখা দিলেও ইংরেজ জাতির চারিত্রিক শক্তি তাহা কাটাইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের কোন আঘাত জাতি হিসাবে ইংরেজকে দুর্বল করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রোফুমো-ওয়ার্ড-কীলার-রিস্ ডেভিস্ কাহিনীর মাধ্যমে যে বিপত্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে,—তাহা ইংরেজ জাতির বাহির নয়, আসলে সামাজিক ও পারিবারিক বিপত্তি। সমাজে যাহা ছিল অপাংক্তেয়, তাহাই যখন সমাজে তথা সোসাইটিতে পাংক্তেয় হইয়া পড়ে, তখন সামাজিক অনিয়ম-ব্যভিচার ব্যতিক্রম হিসাবে আর একান্তে সরিয়া যায় না; তাহা সমাজে চলতি তথা গা-সহা নিয়ম হইয়া পড়ে। দেহ-ব্যবসায়ী দেহ বিলাসিনী সমাজে শুধু পাংক্তেয়-ই হয় নাই; বারবিলাসিনী হইলেও কীলার বারবনিতা, বেশ্যা নহে; সমাজে আনন্দদায়িনী মিস, নিশী-বন্ধু, জল-কেলি সাহচর্য-শিল্পী!

কুমারী কীলার তার সাক্ষে বড় গলায় এই দাবীই করিয়াছে, "আমি বেশ্যা নই"। সমাজের উচ্চ শিখির, সমস্ত শিল্পী কীলারকে ইহাই বুঝাইয়াছে, সে বারবনিতা নহে—শিল্পী। বেশ্যার দুর্নাম (হয়তো সেকেলে দুর্নাম-বোধ ছিল) গ্রহণ না করিয়াও চির কুমারী কীলার বহু জনের শয্যাসঙ্গিনী হইতে পারে, নূতন কোন শিল্পকলার নামে! এবং সমাজ পরিবার যদি তাহা মানিয়া নেয়, যদি ইহাই চলতি প্রথা হইয়া উঠে, তবে পারিবারিক জীবনের সহন, সংযম ও নিষ্ঠার আদর্শ লুপ্ত হইবে বিচিত্র কি?

সমাজে অসংযম যৌন লালসা কোথাও নাই তাহা নহে, ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণীও আছে, কিন্তু সমাজ তাহাদের লইয়া কখনো গৌরব বোধ করে না, যথাস্থানেই তাহাদের স্থান নির্দেশ করে। চরিত্র আর চরিত্রহীনতা, সতীত্ব তথা একনিষ্ঠা আর একাধিকে কামনা লালসা—এই সব কিছুকে একাকার করিয়া এক পংক্তি ভোজনে বসাইবার বিপদ এই যে সমাজে পরিবারে তরুণ-তরুণীর সম্মুখে আর কোন আদর্শ-নিষ্ঠার প্রেরণা থাকে না।

যুদ্ধ-মন্ত্রী প্রোফুমো-কীলার কাহিনীর অপর নায়ক ছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ার নৌ অফিসার আইভানভ্। কীলারের লীলা-কুঞ্জে প্রোফুমোর মতো আরো যাহাদের আনাগোনা ছিল,—তাদের মধ্যে রুশিয়ার এই অফিসারও ছিলেন। বিলাতী পার্লামেন্ট প্রোফুমো-কীলার সম্পর্কে যাহা ছিল বড় অভিযোগ, তাহা রুশ নায়কের নিকট সামরিক গোপন তথ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের অভিযোগ অর্থাৎ কীলারের প্রেমে বেসামাল প্রোফুমো সামরিক তথ্য উদগার করিয়াছেন কিনা এবং তাহা সজাগ সতর্ক রুশ নায়ক তাঁহার রাষ্ট্রের কাজে লাগাইয়াছেন কিনা, এবং তাহার দ্বারা বৃটেনের নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়াছে কিনা, এই রাজনৈতিক প্রশ্নই পার্লামেন্টে বিরোধীদল বড় করিয়া তুলিলেন, বৃটিশ গভর্ণমেন্টও সেই প্রশ্নের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করিয়া যোগ্যতম ব্যক্তির দ্বারা তদন্তের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু বলিতে হয়—সোভিয়েট নায়কের সম্পর্ক ধরা না পড়িলে—প্রোফুমো-কীলার সম্পর্ককে একটা প্রচলিত, মামুলি, পরকীয়া প্রণয় লীলা এবং নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়াই সমাজ মানিয়া লইত। অর্থাৎ এ সব আকছার হইতেছে; এ-আর বেশী কি? কিন্তু ইংরেজের সমাজ পরিবারের পক্ষে ইহা যে কত বড় বিপত্তির বিষয় তাহা ইংরেজ জাতির চিন্তা-নায়কগণের ভাবিবার।

বৃটিশ সমর-মন্ত্রী প্রোফুমোর দাম্পত্য জীবনও লক্ষ্য করিবার। তিনি এক নক্ষত্র, অভিনেত্রীকে স্ত্রী রূপে

গ্রহণ করেন। ওদেশের সমাজে ইহা আদর্শ না হইলেও অচল নহে। কিন্তু ইহাও অনেকে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনকই মনে করেন। দৃষ্টান্ত: বৃটেনের কতিপয় বিখ্যাত পাদ্রী এই মর্মে ঘোষণা করেন যে, ওদেশের সিনেমা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের পুনঃ পুনঃ স্বামী স্ত্রী বদলান (শুধু বহু নয়, বহুতর বিবাহ) সমাজের নৈতিক জীবন নষ্ট করিতেছে, ইহাদের সম্পর্ক সকলের বর্জন করা উচিত। পাদ্রীদের এই ধরণের উক্তিকে, সেকেলে নীতিবাগীশদের উক্তি বলিয়া তুচ্ছ করা যায়, কিন্তু সমাজে একনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা-বুদ্ধি হ্রাস পাইলে, অনাচারের প্রতিও আর ঘৃণা থাকে না।

প্রোফুমো-কিলার কেলেঙ্কারীর ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িলে প্রোফুমোর পত্নীর মানসিকতায় কোন বিরূপতাই প্রকাশ পায় নাই। স্বামীর নৈতিক চরিত্রের শৈথিল্যে দুঃখ লজ্জায় বঙ্কিমচন্দ্রের "ভ্রমরের" মতো তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া যান নাই। ইহার অর্থ এক-নিষ্ঠার প্রতি অব্যভিচারিণী শ্রদ্ধা দাম্পত্য জীবনে আর বড় কথা নহে। সেই কারণে যে ধরণের নারী বা পুরুষ ছিল সমাজে অপাংক্তেয়—নূতন নূতন রুচির নামে তাহাদের পাংক্তেয় করিয়া নিলে—সমাজের ভিত্ ধ্বসিয়া যাইবে বিচিত্র কি?

সমাজ ও পারিবারিক জীবনে ক্ষেত্র বিশেষে আদর্শ-ভ্রষ্টতা, নৈতিক স্খলন ও ব্যভিচার দেখা দিতে পারে—কিন্তু সমাজের নীতি বোধ যখন উহার প্রতি বিরূপতা পরিহার করে,—নিন্দার্হ পর্যন্ত মনে করে না, কাঞ্চন-কৌলীন্যের পায়ে নীতি-বোধকে বিসর্জন দেয়—তখন সমাজ-জীবনে ভোগ লালসা, অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যভিচার সংক্রামক ব্যাধির মতো জাতির জীবনী শক্তি ক্ষয় করিতে থাকে। সমাজ-জীবনের এই গ্লানিই রাষ্ট্র জীবনে সংক্রামিত হয়। সমাজ-পরিবারের সুনাম মর্যাদার ক্ষেত্রে যদি ভ্রষ্টচরিত্র হওয়া যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের মর্যাদার প্রশ্ন তুচ্ছ হইতে কতক্ষণ? কিলার কাহিনীতেই প্রকাশ ইংলণ্ডের উচ্চতর সমাজ সমাজ-জীবনে বিলাসের নামে কিরূপ অবাধ লালসা চলিতে পারিয়াছে, লর্ড এ্যাষ্টরের জল-কেলির বিলাস-কুঞ্জকে সমাজ-পরিবার বিরূপতার ধিক্কারে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করে নাই।

চরিত্র-ভ্রষ্টতার বিলাস, যৌন অসংযম যেমন যে মোগল রাষ্ট্র শক্তি তাহারও মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে। ফরাসী জাতির সেই শক্তি ও বীর্যের অভাব কেন ঘটিয়াছিল? থাকুক সে কথা।

ইংরেজের সমাজ-পরিবারের সংস্কার জন্য আমাদের চিন্তা না করিলেও চলিত; কিন্তু আমাদের সমাজের কথাই এই প্রসঙ্গে ভাবিতে হইতেছে। আমরাও কি আমাদের পারিবারিক জীবনে যাহা অপাংক্তেয় ছিল, তাহাই কি সমাজে পাংক্তেয় করিয়া লইতেছি না?

আমাদের সমাজ পরিবারে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অন্তবাসী নারীদেহের রূপ-যৌবনকেই বড় করিয়া দেখার শিক্ষা ছিল না, নারীও নিজ দেহের রূপ-যৌবনই তাহার এক মাত্র সম্পদ ও ভরসা, ইহা মনে করার শিক্ষা পায় নাই। সমাজ পরিবারে সে যে কন্যা, বধূ ও মাতা, নারীর চরম পরিণতি যে মাতৃত্বে, এই আদর্শ-ই এই দেশে নারীর মর্যাদার প্রধান কথা। তাই অনন্ত যৌবনা উর্বশী কল্পলোকের মোহিনী হইয়া থাকিতে হয় থাকুক, কিন্তু আমা মর্ত্যলোকের সমাজ-পরিবারের দৃষ্টিতে সে—'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ'—তাই, সমাজ পরিবারে সেই কল্পলোকের অপ্সরীর কোন মর্যাদা আমরা দেই নাই। শিল্পী, নৃত্য শিল্পীর মর্যাদার কথা? সতী বেহুলা নৃত্য-শিল্পী ছিলেন দেব-দুর্লভ নৃত্য-বিদ্যা তাঁহার অধিগত ছিল। তাঁহার সেই নৃত্যে দেবাদিদেব প্রসন্ন হন, ছিল তাহাতে অমৃত। ফলে মৃত-স্বামী সঞ্জীবীত হয়। কিন্তু আমাদের সমাজ সেই বেহুলাকে সতী বেহুলা বলিয়াই মর্যাদা দিয়াছে, কন্যা বধূ মাতার মর্যাদা,—নৃত্য শিল্পী বলিয়া সমাজ তাহাকে মনেও রাখে নাই। সমাজে এই পার্থক্য বিলুপ্ত হইলে বিপদ।

মানুষের একনিষ্ঠার এই আদর্শ যদি সমাজের স্থিতি পক্ষে হয় অপরিহার্য, তাহা হইলে এই আদর্শকেই পুত্র কন্যা নিকট তুলিয়া ধরিতে হইবে। কোন ঐশ্বর্যের লালসা সেই আদর্শ ম্লান হইয়া যায়। বর্তমান যুগে আর্থিক সমস আমাদের সমাজ-দেহেও আঘাত করিতেছে। পুরুষে

সঙ্গে নারীকেও অর্থ উপার্জনে নামিতে হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থ উপার্জনের জন্য লালসাও আসিয়া যাইতে পারে, এবং যায়। যদি আসিয়া যায়, তাহা হইলে এই অর্থই হয় একমাত্র কাম্য। আর উহার আকর্ষণেরও শেষ নাই, প্রয়োজনেরও শেষ নাই। যে পথে কোন উর্বশী মেনকা ঐশ্বর্য্যের চূড়ায় উঠিয়াছে, এবং সমাজেও তাহাদের জয়ধ্বনি, সমাদর—সেই পথে আর সকল আধুনিকরা ঐশ্বর্য্যের সন্ধানে পদক্ষেপ করিবে, এবং বিচিত্র নয়, পিতা মাতা ও স্বামীই যোগাইবে উৎসাহ। একান্ত কাম্য যে অর্থ, সে তো হইবেই, সঙ্গে নাম যশ, কাগজে কাগজে ছবি। এই সুযোগ ছাড়িয়া সেকেলে সমাজ পরিবারের আদর্শ আঁকড়াইয়া 'মোটা ভাত কাপড়ে' সাবিত্রী ব্রত পালনের প্রয়োজনটা কি? আজ এই কুল-ভাঙা ভাবে সমাজের এক অংশ ছুটিয়াছে, আর একটা অংশ ক্ষীণ। সংস্কারে বাধে; কিন্তু অক্ষম অসহায়। যাহা ছিল আদর্শ তাহাই আজ ক্ষীণ সংকুচিত, জনসমাজেও অনাদৃত। প্রখরতম বিজুলী আলোর রোশনাইয়ের সমারোহের দাপটে পরিবারের কুলবধুর তুলসী মঞ্চের ক্ষীণ দীপ শিখাটুকুও বুঝি নিবিয়া যাইবার ক্ষণ গণিতেছে। অর্থ ও ঐশ্বর্য ভারতেও ছিল—কিন্তু তাহাই সমাজে একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য ছিল না; চরিত্রের সত্যতার প্রতিই ছিল অধিক শ্রদ্ধা। চারিত্রিক নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা গেলে সমাজ দাঁড়াইবে কোন্ ভিত্তিতে।

ইংরেজ জাতির সমাজে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে—তাহা উহারা নৈতিক-শৃঙ্খলা সম্বন্ধের রক্ষণশীল প্রবণতা ঠেকাইতে পারিবে, অথবা কালের নিষ্ঠাহীনতার প্রবল স্রোতে গা ভাসাইবে জানি না। তবে মনে হয় ও জাতির মধ্যে এখনও নিষ্ক্রিয় ভাল মানুষ (এই আমাদের মতো) সব নয়, সক্রিয় আদর্শ-নিষ্ঠ মানুষ আছে। সম্প্রতি গত ১০ই সেপ্টেম্বর রয়টারের সংবাদে প্রকাশঃ মিঃ হাওয়ার্ড ব্রুক নামক একজন ইংরেজ বিলাতের 'ডেলী নিউজ' কাগজের মালিক কোম্পানীর বিরুদ্ধে এই বলিয়া আদালতে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন যে, কুমারী কীলার-মামলার বিবরণ উক্ত সংবাদ পত্রে যে ভাবে চিত্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা নিছক অশ্লীল, যৌন উত্তেজনাকর, জঘন্য। আমি একজন অভিভাবক, আমার পুত্র কন্যাগণও এই সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে। বিবরণগুলি হইতে যাহা কুৎসিত যৌন আবেদনমূলক তাহাই খুঁজিয়া খুঁজিয়া সংবাদ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে আমার সন্তানদের নৈতিক আদর্শে আঘাত করিতেছে। মামলার আসামী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, এই মামলার বিবরণ প্রকাশ করার দরুণ কাগজ বেশী বিক্রয় হইয়াছে। অর্থাৎ নিম্নরুচির পাঠক-সমাজের চাহিদা তাহারা মিটাইয়াছে মাত্র। বিচারক এই বলিয়া রায় দান স্থগিত রাখিয়াছেন, মামলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—তাই এই সম্পর্কিত আইন প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া তিনি পরে রায় দিবেন।

ওদেশের কেলেঙ্কারী হইলেও, কুমারী কিলার সম্পর্কে সচিত্র কাহিনী এই দেশের সংবাদপত্রেও কিছু কম প্রকাশ পায় নাই। উহাতেও যুক্তি হয়তো পাঠকের চাহিদা মেটানো। কিন্তু উহা আমাদের সমাজের বহুজনের রুচিতে আঘাত করিলেও এবং পুত্র-কন্যাগণের পক্ষেও উহা নিতান্ত অবাঞ্ছিত মনে হইলেও,—কোন অভিভাবকের সমাজ-সচেতন আদর্শ-নিষ্ঠা এতোটা সক্রিয় হয় নাই, যাহার প্রেরণায়, ইংরেজ ইংজিনিয়ার মিঃ হাওয়ার্ডের মতো এদেশের কোন অভিভাবক কোর্ট-কাছারিতে ছুটিতে পারেন। ইংরেজ-জাতির পক্ষে ইহা ভাবনার কথা। কিন্তু আমাদের ভাবনার কথা কি? আমাদের সমাজে ভোগ-বিলাস এবং অর্থ-লিপ্সার দরুণ সমাজের প্রাচীন-নৈতিক আদর্শ নিষ্ঠার মূল্য যে ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে, চারিত্রিক মূল্য-বোধে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, তাহাতে সমাজ ও পরিবারের স্থিতি-শক্তি-সংযম ও সম্ভ্রমের বনিয়াদ্ রক্ষা পাইবে কি না ইহাই ভাবিবার।

শ্রীচৈতন্য-জীবনের শেষ অধ্যায়

।। অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

পরমযোগী শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজবালাগণের নিদারুণ আর্তির কথা মহারাজ পরীক্ষিৎকে শোনালেন। ভক্তি মার্গের চরম কথা গোপী-প্রেম। প্রভুর শেষ জীবন তারই জলন্ত দৃষ্টান্ত। ভক্তি মার্গের সে সব চরম অনুরাগের কথা পুঁথির পাতে নিবদ্ধ হয়ে থাকতো যদি না শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কের অভিনয় আমরা দেখতে পেতাম। শ্রীমতীর ব্যাকুল বিরহ ও দিব্যোন্মাদ প্রভু স্বজীবনে দেখিয়েছেন। ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। জগতে গৌরসুন্দরের অমিয় লীলা প্রকাশিত না হ'লে শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাজন পদাবলী বর্ণিত শ্রীরাধার অলৌকিক প্রেম মহিমা কবিকল্পনা বলে উপেক্ষিত হ'ত।

রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা—
জগতে জানতো কে
যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত।

নীলাচলে কাশীমিশ্রের [illegible] ভবনে গম্ভীরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে প্রভু গোপীপ্রেম আস্বাদন করতেন এবং এই দুই ভাবগ্রাহী অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রভুর ভাবানুযায়ী ভাগবতের শ্লোক, জয়দেবের গীত গোবিন্দ ও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী শোনাতেন। ব্রজলীলায় শ্রীমতীর যেমন ললিতা ও বিশাখা, গম্ভীরা লীলায় প্রভুরও তেমনি ছিলেন রামানন্দ ও দামোদর। শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখছেন—

দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইল আস্বাদন ছলে॥
রাত্রি দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেই মত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ সহিত॥

কৃষ্ণ-বিরহে এই যে আর্তি—জগতে ইহাই প্রভুর মহাদান। বিষয়মুখী জীব বাসনা-কামনার দাস। ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংসারে কত দুঃখ পায়। উট কাঁটা ঘাস খায়, ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরে, তবুও চিবায়। ঈশ্বর-বিচ্ছেদে আমাদের এই যে সংসার-তাপ একথা আমর মানতে চাই না কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্বেই আমাদের দৃ বিশ্বাস নেই। কৃষ্ণ-বিরহে প্রভুর প্রলাপ-বিলাপ আমাদে কাছে স্বপ্নবৎ অলীক। জন্মজন্মান্তরের বহুপুণ্যফলে গুরু-কৃষ্ণ-সাধু-কৃপায় যার চিত্তে কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা জাগে তিনিই ধন্য।

নিমাই পণ্ডিতের হৃদয়ের গোপনতম স্থলে এই বিরহ জ্বালা প্রচ্ছন্ন ছিল। গয়াধামে গুরুকৃপায় তা প্রক হল। লৌকিক লীলায় প্রভুর পরম গুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণপ্রেমে পাগল।

মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দরশন মাত্রে হন অচেতন॥

মহাপ্রেমনিকেতন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী মাধ্যমে প্রভুর হৃদয়ে এই বিরহ-বেদনা সঞ্চারিত হ'ল। ঈশ্বরপুরীর নিকট প্রভু কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। ে অবধি তাঁর বিরহজ্বালা, তারই চরমতম প্রকাশ হ' নীলাচলে গম্ভীরা-লীলায়। গদাধর পাদপদ্মে পিতৃ-পি দিয়ে প্রভু যখন ফিরলেন শচীমাতা পুত্রের চোখে মু কৃষ্ণ বিরহের আর্তি দেখে সজল নয়নে বললেন—

গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল।
সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল॥

প্রভুর অন্নপ্রাশন, উপনয়ন দীক্ষা প্রভৃতি সংস লোকব্যবহারের জন্য। শ্রীকৃষ্ণই রাধাভাবে ভাবিত হ

শ্রীমতীর দেহ-লাবণ্য নিয়ে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে। মানুষকে পিতামাতা অঙ্গীকার করে যখন নরদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন তখন ঠিক ঠিক মানুষের ব্যবহার করতেই হয়। সে সব কথা আলোচনার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে শ্রীমতীর যে বিরহজ্বালা তার একটু পরিচয় নিতে হবে।

শারদীয় পূর্ণিমায় বৃন্দাবন জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত। মল্লিকা মালতী প্রভৃতি নানা কুসুমবিকাশে বনানীর অপূর্ব শোভা দেখে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজ অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করে, নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য, গোপনারীগণের সঙ্গে আনন্দ আস্বাদন করতে ইচ্ছা করলেন। জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমিতে সুনয়নাগণের চিত্তহারী বংশীধ্বনি করলেন—জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্‌ সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণগৃহীতমানসা ব্রজাঙ্গনাগণ প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে সকল বাধা উপেক্ষা করে পরম প্রিয়তমের নিকট দ্রুত উপনীত হলেন। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বললেন—তোমরা ঘরে ফিরে যাও। গৃহধর্ম আর্যধর্ম পতিসেবা উপেক্ষা করে কেন তোমরা নীরব নিশীথে এই বিজন বনে এসেছ? শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠুর কথা শুনে সজল নয়নে তাঁরা বললেন—মোহন বংশীরবে আমাদের ডেকে এনে কেন এভাবে প্রত্যাখ্যান করছ? যে নদী আপন উৎপত্তিস্থান ত্যাগ করে দুর্বার বেগে মিলিত হয়েছে সাগরে, সে আবার কেমন করে তার উৎসমুখে ফিরে যাবে? তুমিই তো পতির পতি বিশ্বপতি, [illegible]কে ছেড়ে পতিনামধারী দেহ-সর্বস্ব মানুষের কাছে ফিরে যেতে বলছ কেন? তুমি আমাদের জীবনধন, তোমার সুখের জন্য নারী হয়ে আমরা সব ত্যাগ করেছি, তুমি ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না। পরম পতির আশ্রয় লাভ যারা করেছে তাদের কাছে কুলশীল মান গৃহধর্মের আর মূল্য কি?

শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করতে লাগলেন তখন তাঁদের মনে অহংভাবের উদয় হ'ল তাঁরা ভাবলেন জগতে আমরাই শ্রেষ্ঠ নইলে বিশ্বনাথ কেবল আমাদের কাছে কেন থাকবেন? তাঁদের মান সৌভাগ্য গর্ব চূর্ণ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হলেন—প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়তে।

যেখানে অভিমান যেখানে অহঙ্কার সেখানে শ্রীভগবান থাকেন না। এইবার আরম্ভ হ'ল 'আমি'র বিলোপ, 'তুমি'র সন্ধান—বিরহ-কাতর হৃদয়ের আকুল আহ্বান, কৃষ্ণের অদর্শনে অনির্বচনীয় আর্তি—কোথায় তুমি ব্রজনাথ, দেখা দাও। হে অশ্বত্থ হে অশোক হে চম্পক হে গোবিন্দচরণপ্রিয় তুলসী, আমাদের চিত্ত হরণ করে ব্রজেন্দ্রনন্দন কোথায় গেল, বলে দাও। সে আকুল আহ্বানের কেহ সাড়া দিল না।

ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি—গোপীদের কৃষ্ণ-তন্ময়তা এতই প্রগাঢ় হ'ল যে তাঁরা কৃষ্ণময় হয়ে কৃষ্ণ লীলা অনুকরণ করতে লাগলেন। মহাপ্রেম সমাধিতে কতক্ষণ চলে গেল। বিরহ-ব্যথায় সুতীব্র দহনে তাঁরা ব্যথিতা হয়ে দেখলেন, যে গোপীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়েছিলেন, তিনিও বন-মাঝে পরিত্যক্তা হয়ে বিলাপ করছেন হা নাথ, হা রমণ, হে মহাবাহু, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়। হে সখে, আমি কাঙালিনী, দীনাতিদীনা তোমার দাসী, একবার দেখা দা'ও। তখন সকলে মিলে ব্রজগোপী বেদনায় মথিত হয়ে বললেন—হে দুঃখনাশন, তোমার কথামৃত দ্বারা আমাদের বিরহতপ্ত জীবন শীতল কর। অদর্শনের প্রতিটি ক্ষণ আমাদের কাছে যুগের মত দীর্ঘায়িত হচ্ছে। হে করুণাসিন্ধু, কৃপা কর, তোমার অদর্শন আমরা কেমন করে সইব তা বলে দাও।

গোপীপ্রেমের মত অহৈতুকী শুদ্ধ নির্মল প্রেম জগতে দুর্লভ। কৃষ্ণকে পাবার জন্য নারী হয়ে তারা সব ত্যাগ করেছে—কুল শীল মান লজ্জা ধর্ম দেহ গেহ। কৃষ্ণ সুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাই তাদের একমাত্র কাম্য। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখা দিলেন গোপীগণ তাঁর কোন দোষ দিলেন না, লুণ্ঠিত হয়ে তাঁর চরণ ধারণ করে বিরহতাপ শীতল করলেন। লজ্জিত হয়েই যেন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে সুন্দরীগণ, তোমাদের এই একনিষ্ঠ ভজন, এই নিষ্কাম প্রেমের ঋণ আমি শোধ দিতে পারলাম না, তোমাদের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

রসিক ভক্তগণ বললেন এই ঋণ শোধ দিতে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীমতীর অঙ্গ প্রভায় তিনি বাহিরে গৌরবর্ণ, অন্তরে কিন্তু নবজলধর শ্যাম। রাই-কানু মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা প্রেম আস্বাদন করবার জন্য এবং জগজ্জীবকে প্রেমভক্তি অকাতরে বিলাবার জন্য ভক্তভাবে ভাগীরথী তটে আবির্ভূত। প্রভুর আবির্ভাবের প্রায় শতাব্দী পূর্বে সাধক কবি চণ্ডীদাসের ধ্যাননেত্রে একথা উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাই তিনি লিখলেন—

আজ কে গো মুরলী বাজায়,
এ তো কভু নহে শ্যাম রায়।
ইহার গৌরবরণে করে আলো
…চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল ?
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে,
এরূপ হইবে কোন দেশে ?

শেষের ছত্রটী যেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বাভাস।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারও প্রভুর আবির্ভাবের হেতু নির্দেশ করেছেন।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।

(১) শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, (২) ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীমতী আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করেন তাহাই বা কিরূপ, (৩) আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীমতী যে আনন্দ ও সুখলাভ করেন তাহাই বা কিরূপ—এই তিনটি অনুভবের লোভে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে শচীগর্ভসিন্ধুহতে আবির্ভূত হয়েছেন। অন্য এক ভক্ত-কবিও এই বলে তাঁকে প্রণাম জানিয়েছেন—রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্ —রাধাভাব ও কান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপশ্রীচৈতন্যকে আমি নমস্কার করি।

তারপর উদ্ঘাটিত হ'ল বিরহ-বেদনার করুণতম আলেখ্য। বৃন্দাবন ত্যাগ করে ব্রজের বাঞ্ছিত-ধন কর্তব্যের আহ্বানে মথুরায় চলে গেলেন। মহাজন পদাবলীতে এ বেদনার যে কাহিনী রচিত হয়েছে জগতে তার আর তুলনা নেই। শ্রীগোবিন্দকে নয়নে আর দেখবে না সেই শোকে—

যশোমতী নন্দ অন্ধসম বৈঠত
সাহসে উঠই না পার,
সখাগণ ধেনু বেণু সব ছোড়ল
ছোড়ল নগর বাজার।

শ্রীমতী বিরহানলে দশদিক দগ্ধ হ'ল ব্রজজনের চোখের জলে যমুনায় জল বেড়ে গেল—

বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব
দশদিশি বিরহ হুতাশ ;
সহস্র যমুনা জল হোয়ল অধিক
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস।

বৃন্দাবনচন্দ্র বিহনে সব অন্ধকার, চারদিকে হাহাকার, শুধু ব্যথার অশ্রুজল। শেষে এমন হ'ল কেহ কৃষ্ণনাম শুনালে শ্রীমতীর আর ধৈর্য থাকত না, তিনি তাদের পায় ধরতেন। পদকর্তা লিখছেন—

অকথন এ বেয়াধি কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলী যেন ভূতলে লুটায়॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে শ্রীমতীর মনে বিরহের যে আগুন জলেছিল, অন্তিম লীলায় মহাপ্রভুর অন্তরেও সর্বদাই সেই ভাবের স্ফুরণ হ'ত। রাধাভাবে জড়িত প্রভুর সেইমন।

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধবদর্শনে,
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সব প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদগম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় প্রভুর বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'ত কদম্বকেশরের মত দেহ কণ্টকিত হ'ত, হস্তপদাদি কখন দীর্ঘাকৃতি, কখন দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে কূর্মাকৃতি ধারণ

করত। স্বরূপ ও রামানন্দ সর্বদা কাছে থেকে সেবক গোবিন্দের সহায়তায় অতি যত্নে প্রভুর পবিত্র দেহ রক্ষা করতেন। নিয়মিত আহার ও নিদ্রার জন্য অনুরোধ জানালে প্রভু বলতেন—প্রিয় বান্ধব, আমি নিরুপায়, আমার মন আর আমার বশে নেই।

মন কৃষ্ণবিয়োগী দুঃখে মন হইল যোগী
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হইয়া মন গেল পলাইয়া
শূন্য মোর শরীর আলয়॥

তীব্র বিরহের আর্তিতে রাধাভাবে আবিষ্ট প্রভু স্বরূপ ও রামানন্দের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে সজল নয়নে বলতেন—

কহ সখি কি করি উপায়।
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়॥

• • •

কৃষ্ণাম্বুদ বলাহক মোর নেত্র চাতক
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥

'কৃষ্ণ সাপ কাটে যারে'—কৃষ্ণ-সর্প দংশন করলে সে বিষের যে কী দুঃসহ জ্বালা প্রভু নিজেই তাঁহা শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোকে প্রকাশ করেছেন।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

শ্রীগোবিন্দ-বিরহে এক নিমেষ কাল আমার কাছে এক যুগের মত মনে হচ্ছে, আমার নয়ন শ্রাবণের জলধারার মত অশ্রুপাত করছে, বিশ্বভুবন আমার কাছে একান্ত শূন্য বলে মনে হচ্ছে।

দেহসর্বস্ব বিষয়ীর কাছে ভগবদ্‌বিরহে প্রভুর এই সব ভাবাবেশ নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক বলেই মনে হয়। কিন্তু তা নয়। দেহে আত্মবুদ্ধি যাঁর লেশমাত্র নেই, তাঁর কাছে আবার দেহের কষ্ট কি? বিষয়ীর চোখে দুঃখের আকারে দেখা গেলেও প্রভুর অন্তরে অক্ষয় আনন্দস্রোত প্রবাহিত হ'ত। বিরহের মধ্যেই প্রেমের মাধুর্যরসের আস্বাদনে প্রেমিক স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর থাকে। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামীচরণ লিখলেন—

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ-রামানন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষ জ্বালা হয় অন্তরে অমৃতময়
কৃষ্ণ প্রেমের অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমের আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেম যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

আবার লিখলেন—

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে॥

কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত আর্তিতে তনুমন ক্ষীণ কৃশ হলেও যাঁর প্রেমভাব ভক্ত-গণকে আনন্দ দান করে সেই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর চরণ কমলে আমরা শরণ নিলাম।

দেশাত্মবোধের প্রেরণা ও বাংলা নাটক

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেন—

"পাঁচশো বছর এমনি করে আসছি স'য়ে সমুদায়—
এইটে কি আর সইবে নাক দু'ঘা বেশি জুতোর ঘায়।"

এই পংক্তি দুটির মধ্যে একটি প্রচণ্ড আত্মধিক্কার ফুটে উঠেছে। এই ধিক্কারের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে একটি আত্মবিস্মৃত ও পতিত জাতির ইতিহাস।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা দেশে একটি সর্বাত্মক জাগরণের সূচনা দেখা দিল। এই জাগরণের আলোক রশ্মিকে একদিক দিয়ে বহন করে আনলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, অন্যদিকে জাতির অন্তরাত্মার মর্মজ্বালাকে ও নবঅভ্যুত্থানের ধারাকে সাহিত্য ও নাটকে যাঁরা প্রতিফলিত করলেন তাঁদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

আজকে একথা ভাবতে আশ্চর্য বোধ হয় যে, একশ' বছর আগে এ'দেশের মানুষের মনে স্বদেশচেতনার অনুভূতি দানা বাঁধেনি। ভৌগলিক অর্থে যদিও এ'মাটিকে আমরা আমাদের দেশ ব'লে জানতাম কিন্তু দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ আমাদের ছিল না। বাংলাসাহিত্যও পূর্বে দেশ বা সাধারণ মানুষকে নিয়ে লেখা হ'ত না। দীর্ঘদিনের মুসলমানশাসন ও তারপর ব্রিটিশ অধীনতা আমাদের মন থেকে জাতীয়তার অনুভূতিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যূষ মুহূর্তে যাঁরা লেখনীর মুখে এই চরিত্র-ভ্রষ্ট জাতির গ্লানিকে পরিস্ফুট ক'রে চোখের সামনে তুলে ধরলেন তাঁরা আমাদের নমস্য।

বাংলা নাটকে এই ধারার সূচনা রামনারায়ণ তর্করত্ন'র কুলীনকুল-সর্বস্ব গ্রন্থে। কিন্তু বাংলা নাট্য সাহিত্যে চিরকালের স্মরণীয় গ্রন্থ হচ্ছে ১৮৬০ সালে প্রকাশিত "নীলদর্পণ"। এই নাটক অভিনীত হওয়ার পর দেশে এমনই একটি সাড়া জেগেছিল যে, ইংরাজ শাসক এই নাটকের অভিনয় বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হন।

কিন্তু দেশপ্রেম তখন চিন্তাশীল মানুষের বক্ষের মধ্যে স্পন্দন তুলেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রণম্য পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দুর্গেশনন্দিনী, দেবীচৌধুরাণী ও আনন্দমঠ উপন্যাসে দেশাত্মবোধের যে প্রেরণা দিলেন তার তুলনা নেই। সমসাময়িক কালের মধ্যে মহাকবি মাইকেলের নাটকগুলি আধুনিক চিন্তাভঙ্গিতে রচিত। তাঁর নাটকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে উন্মত্ত বাঙালীর কদর্যতার চিত্র রূপায়িত, মধুসূদনের কাব্যে তাঁর দেশাত্মবোধের পরিচয় আরও সুস্পষ্ট। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত যে মধুসূদনের দেশাত্মবোধ বিদেশী শাসনের বন্ধনকে ধিক্কার দেয়নি। বঙ্কিমও কোথাও শাসক ইংরাজকে স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করতে পারেন নি। এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও পরাধীনতা থেকে পূর্ণমুক্তির কথা ভাবতে ১৯০৫ সালের আগে কেউ পারেন নি।

১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়। এই কদর্য ভেদনীতির প্রতিবাদে মূক বাংলা মুখর হ'য়ে ওঠে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ থেকে অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই এ'র প্রতিবাদে আন্দোলন করেন। বাংলা তথা ভারতের সত্যকার জাতীয়তা-বোধের সুরু এই সময়েই। এবং জাতীয়তার মন্ত্রে প্রথম বাংলানাটকের রচনাও এই কালে।

"প্রতাপাদিত্য", "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত", "পদ্মিনী" ও "নন্দকুমার" নাটকে জাতীয়তার মন্ত্রকে রূপ দিলেন বাংলা নাট্যজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। যদিও অত্যুগ্র দেশপ্রেমের আদর্শ প্রতাপাদিত্যে ছিল না এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "প্রতাপ

সিংহে"র মত স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ-স্বীকারও প্রতাপাদিত্যের নাই, তবু প্রথম হিসাবে "প্রতাপাদিত্য" নাটক নিশ্চয়ই বরেণ্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের সমসাময়িক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালে কিন্তু দেশাত্মবোধের চেতনা প্রকৃত আত্মধিক্কার, ত্যাগ ও নির্যাতন ভোগ ও আদর্শবাদের পথ ধরে অগ্রসর হ'লো। "প্রতাপসিংহ" নাটকে প্রতাপের যে চরিত্র আঁকলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, বাংলার শেষ বীর সন্তান সুভাষচন্দ্রও সেই চরিত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন। রাজ্যের জন্য না দেশের জন্য মৃত্যু পণ প্রতাপচরিত্রের আদর্শ।

এই একটি যুগের পটভূমিকায় বাংলা-নাটকের ধারা বদলে গেল। দেশ ও জাতীয়তাবোধ রক্তের সঙ্গে মিশে গেল। বাংলা দেশের নাট্যকারেরা নব জাগরণের এই মহাবিক্ষোভের ঢেউকে ছড়িয়ে দেবার ভার গ্রহণ করলেন। গিরিশচন্দ্র লিখলেন—সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি; অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, দ্বিজেন্দ্রলাল দিলেন "প্রতাপসিংহ", 'দুর্গাদাস', "মেবার পতন"। প্রতাপসিংহ ও তাঁর অনুগামীদের সেই শপথ গ্রহণ—"আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব …যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয় ততদিন ভূমিপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব, তৃণশয্যায় শয়ন কর্ব্ব"…লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের সত্য হ'য়ে উঠলো।

জাতীয়তাবাদের এই নব প্রেরণা কাব্যে নাটকে সঙ্গীতে সমানভাবে পরিস্ফুট হ'য়েছিল। ১৯০৫ সালেই বাঙালী প্রথম পাইলো স্বদেশ মন্ত্র "বন্দেমাতরম্"। সমস্ত বাংলা দেশের সে এক জাগরণের দিন। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে প্রত্যেকটি কবি ও সাহিত্যিক দেশাত্মবোধের গীত রচনা করলেন। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকগুলির মধ্য দিয়ে সেদিন যে জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রেরণা দিলেন, তার বাণী রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের মাধ্যমে সাধারণ দেশবাসীর কাছে পৌঁছেছিল।

কবি রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে এই প্রেরণাকে সঞ্জীবিত করেছিলেন। "মিলেছি আজ মায়ের ডাকে", "বাংলার মাটি বাংলার জল" ইত্যাদি গান সেই সময়ের রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র দৃষ্টিতে এই ঘটনাগুলিকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি দেখছিলেন, এই সংগ্রাম শুধু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক আত্মমুক্তিতেই শেষ হ'বে না। পৃথিবীতে মুক্তিকামী মানুষের ওপর আজ পীড়ন চলেছে দানবের। বহুজাতির সর্বগ্রাসী শোষণ ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের স্বার্থান্ধবোধ থেকে মানুষকে মুক্ত হ'তে হ'বে। সর্বোপরি তাকে লোভ, অন্ধতা, সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পেতে হ'বে। কবির "অচলায়তন" "মুক্তধারা" "রক্তকরবী" প্রভৃতি সাংকেতিক নাটকগুলি এই নবদর্শনের স্বাক্ষর। কবি চেয়েছিলেন আত্মার শৃঙ্খলমোচন করতে।

আধুনিক যুগে দেশাত্মবোধের সুর বিশেষভাবে ধ্বনিত হ'লো যাদের কণ্ঠে তাঁদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মন্মথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। শচীন্দ্রনাথের "সিরাজ উদ্দৌলা" ও "গৈরিকপতাকা" এবং মন্মথ রায়ের "কারাগার" একদিন সাড়া সৃষ্টি করেছিল। মনোজ বসুর কয়েকটি নাটকে, বনফুলের কিছু একাঙ্কিকায় এবং মহেন্দ্রগুপ্তের [illegible] নাটকগুলিতে জাতীয় জীবনে প্রেরণা সৃষ্টির মত উপাদান যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের "পথের দাবি"র নাট্যরূপ বিপ্লবী বাংলার জাগ্রত মনের পরিচয়কে বহন করে।

নাট্যকার মন্মথ রায়—যিনি একদিন "কারাগার" রচনার জন্য অভিনন্দিত হ'য়েছিলেন, তিনিই সমসাময়িক কালের অগ্রগণ্য নাট্যকার। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত "মহাভারতী" ও ১৯৫৯ সালে রচিত "মহাপ্রেম" তাঁর স্বদেশ চেতনার সাক্ষ্য। ভারতে চীনা আক্রমণের ফলে সাহিত্যিক সমাজ আজ নতুন চেতনায় জেগে উঠেছে। এই নব জাগ্রত দেশাত্মবোধকে কেন্দ্র করে প্রথম নাটক রচনা করলেন মন্মথ রায়ই। তাঁর "স্বর্ণকীট" ও "জওয়ান" যথাক্রমে ষ্টার ও বিশ্বরূপায় অভিনীত হ'য়েছে। সমকালীন নাট্য সাহিত্যে দেশাত্মবোধক নাটক রচনা আরও অনেকে করেছেন। তাঁদের মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগী (সৈনিক) ও কিরণ মৈত্র (মায়ের ডাকে)'র নাম উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যের দ্বৈত রূপ

॥ শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস ॥

উদারার্থে সমস্ত সাহিত্যেরই দু'টি রূপ। প্রথমটি জ্ঞান-মুখ্য, দ্বিতীয়টি রস-ভাব-ঘনিষ্ঠ। এ দু'টোর কোনটা কার আগে বা পরে, সেটা তর্ক-সাপেক্ষ বিষয়। বিষয়টি নিয়ে নানা মহল থেকে নানা বিতর্ক উঠেছে। তর্কটা কি সাহিত্যের ক্রম নির্ণয়ের প্রশ্ন নিয়ে? না। আসলে ওটা কিন্তু অগ্রাধিকারের প্রশ্ন। সাহিত্যিক ডি-কুইন্স অবশ্য এর একটা মীমাংসার পথ দেখিয়েছেন। বলেছেন—জ্ঞান-মুখ্য সাহিত্যই অগ্রাধিকারে জ্যেষ্ঠ, গতিশীল সাহিত্য কনিষ্ঠ।* প্রথমটির কাজ শিক্ষা দেওয়া, দ্বিতীয়টির কাজ চালনা করা। সাহিত্য-নৌকার এরা যেন হাল আর পাল। প্রথমটি নির্দেশের দাঁড়, দ্বিতীয়টি হ'লো উৎসাহের পাল। তা' মূল-ভাবনার হাওয়ায় ফুলে উঠে অদম্য গতিবেগে।

এই দ্বৈত-সাহিত্যের কাজও দ্বি-মুখী। প্রথমটা যেন ব্যাখ্যাতা। সে কেবল বিতর্ক মূলক বিষয় বুঝানোর কথা বলে। দ্বিতীয়টি দেখায় অনুধাবনের রাস্তা। পরিণামে পাঠককে নিয়ে যায় উচ্চাঙ্গের ভাবলোকের দিকে। অথচ চাই জটিল যুক্তিবাদকে হৃদয়ঙ্গম করাতে। সেখানে অবশ্য অভিভাবকত্বের কড়া অনুশাসন থাকে না। থাকে আনন্দের সোহাগ আর সহানুভূতির স্নেহ। তাই প্রথমটির প্রভাব অনেকটা সাময়িক, অন্যটির ভাবনা যেমন স্থায়ী, তেমনি তার প্রভাব আরও সুদূর প্রসারী।

ডি-কুইন্স-এর মত আর্য ঋষিরাও ভারতীয় শিক্ষাকে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন। যথা পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যা। প্রথমটি জ্ঞানমুখ্য শিক্ষা, দ্বিতীয়টি হ'লো বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। ডি-কুইন্সের ভাষায় এই জ্ঞান-মুখ্য পুস্তকাবলীকে বলা যায় literature of knowledge, অন্যটিকে বলতে পারি literature of power। এই দ্বৈতভাব সমন্বিত সাহিত্যই পূর্ণাঙ্গ, সার্থক সৃষ্টি। প্রথমটি সাহিত্যের অন্তর্লোক, দ্বিতীয়টির বিচরণ ক্ষেত্র ব্রহ্মাণ্ড: এই ঘর বার নিয়েই বিশ্ব-সাহিত্যের দরবার।

সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ এই দ্বৈত-সত্তার দিক নির্ণয় করেছেন: বলেছেন যে, সাহিত্য বিচারের দুটি দিক আছে। একটি স্রষ্টার চেতনা বিশ্বকে কত গভীর ও ব্যাপক ভাবে লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, অপরটি এই উপলব্ধিকে তিনি কত দূর প্রকাশ করতে সমর্থ হ'য়েছেন। এই দুটি বস্তুতঃ একটি দিক। অর্থাৎ স্রষ্টা বিশ্বকে যত গভীর করে লাভ করতে থাকে, তার সৃষ্টি ক্ষমতাও তত বেড়ে যায়। একটি অধ্যাত্ম উপলব্ধির দিক, অপরটি তার রূপায়ণের দিক। প্রয়োজন বিশ্ব-সত্তার গভীর থেকে গভীরতর প্রবাহে আত্ম-বিসর্জন, সেই সঙ্গে যে রূপের বোধ আসে, তাকে রূপ-রস ও রেখা ভাব ও ভাষার বন্ধনে বাঁধবার জন্য নিরলস অনুশীলন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আর একটি উক্তি স্মর্তব্য: সাহিত্য বিচারের সময় দুইটি জিনিস দেখিতে হয়। প্রথমতঃ বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি—দ্বিতীয়তঃ তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা? এইখানেই চিত্ত আর বিশ্ব-সত্তার রাগ বিরাগের লীলা। অর্থাৎ বাহিরের আনন্দ-নিমন্ত্রণে হৃদয়ের যোগ। এই চিত্ত-সংযোগের আনন্দেই সাহিত্য সৃষ্টি। বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব চরিত্র মানুষের হৃদয়ে যে উপলব্ধির

---

* There is, first, the literature of knowledge; and secondly the literature of power. The function of the first is to teach; of the second is to move: the first is a rudder, the second is an oar, or a sail. The first speaks to the mere discursive understanding: the second speaks ultimately to the higher understanding or reason, but always through affections of pleasure and sympathy. —De Quincey.

রস প্রাণ দিচ্ছে, তারই প্রকাশ সাহিত্যতত্ত্বে। একথা আরও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যে। বস্তুতঃ বহিঃ-প্রকৃতি এবং মানব চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা-রচিত সেই চিত্র, সেই গানই সাহিত্য।

সাহিত্য জগৎ আর মনের সংযোগ সেতু। সমস্ত শিল্পের মধ্যেই আছে এই বিশ্বসত্তা আর মানব আত্মার সাড়া। এই তত্ত্বের রবীন্দ্রনাথ একটা চমৎকার কাব্যিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন: এই জগৎ-সৃষ্টির আনন্দ-সংগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়-বীণার তন্ত্রে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে, সেই যে মানস-সংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ।

এ দেশের সাহিত্যে অপরা জ্ঞানের প্রকাশ সীমাবদ্ধ। পাশ্চাত্য লেখকদের তুলনায় এ দেশের লেখকদের সাহিত্য সম্পর্কীয় ধারণা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—এই অপ্রিয় সত্যটি অনস্বীকার্য। সে দেশে literature of power-এর সঙ্গে literature of knowledge-কেও সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁদের এই অভিমত যে, কেবল শব্দবিন্যাসকে নিয়েই সাহিত্যের গৌরব নয়, অপরাজ্ঞানও সাহিত্যের একটা অজেয় শক্তি। সে দেশে সৃষ্টিধর্মী শিল্প-সচেতন লেখক যেমন জন সমাজে আদৃত, তেমনি আলোচনা-সমালোচনা এবং জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের লেখকও সমান শ্রদ্ধেয়।

আমাদের দেশে এখনও মননশীল সাহিত্যের দৈন্য ঘুচল না। এ সত্য প্রথম ধরা পড়ে গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। এই অভাব দূরীকরণার্থে তিনি সাহিত্যের সর্বাত্মক শ্রীবৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি গল্প উপন্যাস রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মননশীল প্রবন্ধ রচনায় কাজে হাত দিয়ে ছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সর্ব ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছিলেন সিদ্ধিদাতা গণেশের মত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা বক্তৃতায় তিনি ব্যক্তিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে শক্তির আয়োজন করবার জন্ত শুধু আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি জীবনী-সাহিত্য থেকে মায় বিজ্ঞান আলোচনায় পর্যন্ত আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সাহিত্যে শক্তির আয়োজন বলতে তিনি অবশ্য literature of power-কে লক্ষ্য করেন নি। যে সাহিত্য মুষ্টিমেয় প্রতিভাবানের কল্পনা-নির্ভর, যে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বাছিত-মানস ব্যক্তির কঠিন প্রয়াসকে সদা সর্বদা জাগ্রত রাখতে হয়—সে সাহিত্য সমৃদ্ধির কামনায় আত্মনিয়োগ করবার জন্ত সবল কণ্ঠে তিনি শিক্ষিত স্বদেশ-প্রেমিক দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন।

রচনা-সাহিত্যের আঙ্গিকেরও দুটো রূপ। একটা হ'লো তার বিষয়-বস্তু, আর অন্যটি হলো তার বলবার ভঙ্গী। যে রচনায় লেখক বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে রচনাকে গুরু গম্ভীর এবং চিন্তা ও মননের সহায়ক করে তোলেন—তাকে বলা যায় বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় রচনা। মানুষের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করে মানুষের মানসিক দৈন্যকে দূর করাই হ'লো এই ধরণের রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই জাতের রচনাকার যেন বেদীতে উপবিষ্ট আচার্যের মত জ্ঞান বিতরণ করেন আর পাঠক যেন তাঁর কথা শুনে জ্ঞান আহরণ করেন। এই জ্ঞানবৃদ্ধিকারী রচনাকে বলা চলে literature of knowledge.

রচনার মধ্যে এই যে বস্তু সমাবেশ, তা' কিন্তু বিচ্ছিন্ন বা বিশৃঙ্খল নয়। একটা সংহত সংহতিই ভালো রচনার লক্ষণ। অর্থাৎ একটা সুনির্দিষ্ট, সুচিন্তিত সীমারেখার মধ্যে সমস্ত বস্তুকে একটা সংহত রূপ দিতে না পারলে, তাকে ঠিক রচনা নামে অভিহিত করা যায় না।

তা হ'লে বিষয়-বস্তুই কি রচনার অপরিহার্য অঙ্গ? আসলে হৃদয়গ্রাহী মনোজ্ঞ রচনার মধ্যে বিষয়ের প্রাধান্য থাকলেও, সেটা তার পক্ষে চরম এবং পরম জিনিষ নয়। এই পৃথিবীতে বস্তু মাত্রই পুরাতন এবং সীমাবদ্ধ। সেই পুরাণো বিষয়গুলো আমরা যখন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ঢেলে সাজি, তখনি তার মধ্যে সৃষ্টি হয় সৌন্দর্য এবং মাধুর্য। এখানে ব্যক্তি-চিন্তাটাই বড় কথা নয়,

ব্যক্তি-হৃদয়ের স্বাক্ষরই হ'লো প্রধান উপভোগ্য বিষয়।

রচনা কথাটির ব্যবহারিক অর্থ অন্তত তিনটি—নির্মাণ, সৃষ্টি এবং গঠন। বাস্তবিকই একটা নব সৃষ্টির ভাব যেন রচনা শব্দটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। সেখানে জ্ঞান ও শক্তি, ব্যক্তি এবং হৃদয় যেন অঙ্গাঙ্গি হয়ে আছে।* ফরাসী belles letter-এর অনুকরণে রম্য রচনার সৃষ্টি। বাংলায় অন্তত রম্য কথাটির সৃষ্টি হয়েছে রম্ ধাতু থেকে। যার অর্থ ক্রীড়া করা। অর্থাৎ রম্য রচনার মধ্যে আছে কল্পনার পটভূমিকায় ভাবের খেলা। এক কথায় লেখক কল্পনার ডানা মেলে ভাবের বাজি মাৎ করতে পারেন। এই কাল্পনিক বিচরণের পরিধি আকাশের গ্রহ তারা থেকে পৃথিবীর ধূলি কণার পর্যন্ত বিস্তৃত। লেখক এখানে বক্তব্য বিষয়টি প্রতিপাদিত করতে গিয়ে যুক্তি তর্কের জাল বিস্তার না করে নিজের প্রজ্ঞালব্ধ ভাব এবং ভাবনাকে ছড়িয়ে দেন নিজের খুশীতে। এক কথায় লেখক এখানে ভাবের ঘোড়াকে মনের আনন্দে ছেড়ে দেন দিগ্বিজয়ের সওয়ার হ'য়ে। কথার যাদুতে বাজি মাৎ করাই সেখানে লেখকের লক্ষ্য।

তা হ'লে রম্য-রচনার একদিকে আছে বিষয় বস্তুর অসীমতা, অন্যদিকে আছে সীমাহীন কল্পনার পরিসর। এক কথায় রম্য-রচনা স্থান থেকে স্থানান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, ঘটনা হ'তে ঘটনান্তরে মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মত যেমন তার কল্পনা অবাধে পক্ষ বিস্তার করে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কল্পনাকেও তা টেনে নিয়ে যায় সৃষ্টির নানা বৈচিত্র্যের পথে।

তবে কি রম্য রচনা কথা-যাদুকরের খেলা? অথবা শুধু নিছক কবি-কল্পনার লীলা মাত্র। এখানে ব'লে কথায় রসের হাট বসানো সহজ কথা নয়। এই 'কথায় কথার ফসলের চাষ করা' যে কতটা কষ্ট-সাধ্য, সেদিকে নব্য-রীতির গদ্য লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। বস্তুতঃ জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে একটা সুগভীর অভিজ্ঞতা না থাকলে রম্য রচনায় লেখকের পক্ষে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে অবলীলাক্রমে মানসিক চংক্রমণ কি কখনও সম্ভব হতো? এ ছাড়া একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব দৃষ্টির সাহায্যে রম্য রচনার লেখক যদি সমস্ত বস্তুকে ও ব্যক্তিকে না দেখতে পান, তা' হ'লে তাঁর কথাগুলো হয়ে পড়বে জন-সাধারণের আলগা কথার মত। ডাঃ জনসনের কথায় তাকে বলা চলে যে, 'loose shally of the mind' বা এক রাশ অজীর্ণ কথা মাত্র।

সমস্ত নাট্য সাহিত্যকেও দু'টি পর্যায়ে ভাগ করা চলে যথা শ্রাব্য ও দৃশ্য কাব্য। শ্রাব্য কাব্য বা নাটক আসলে জ্ঞান-ভাবমুখ্য লেখক নিজেদের মনের ভাব বিগ্রহ-তা মধ্যে যে পরিমাণ রস-ভাব-ভাবনা আছে, সে পরিমাণে কর্ম সংঘাত নেই। দৃশ্যকাব্য আসলে সংঘাত-মুখর লোক চিত্তের অনুসরণ। তাকে drama of action বল চলে। এখানে জ্ঞান এবং কর্ম ঘটনার ঘনঘটায় কেবল দৃশ্যোত্তর হয়ে উঠে না, সংঘাতের উত্তেজনায় উপভোগ্য হয়ে উঠে। এই কারণে আজ নাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই সেই literature of knowledge এব literature of power-এর অপূর্ব সমন্বয়ে। এ কথায় জ্ঞান ও শক্তির দ্বন্দ্ব নানা পটভূমিকায়, না পরিবেশে ভাষা-নিয়তির বিচিত্র আকারে সাহিত্যের দ্বৈ রূপকে এক অভাবনীয় চমৎকারিত্বে সত্য করে তোল দৃশ্য নাট্যকার। সেখানেই সমন্বয়ের সার্থকতা, নাট সৃষ্টি কৃতিত্ব।

---

* সাহিত্য ও শিল্পলোক, বিজেন্দ্র লাল নাথ।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(২৯)

জীবনটা সরল অঙ্ক—যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগে জড়িয়ে আছে—কারো সঙ্গে যোগের সম্বন্ধ, কারো সঙ্গে বিয়োগের, কারো সঙ্গে পূরণের, কারো সঙ্গে ভাগের। জীবনের যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ ঠিক মত করে গেলেই জীবনের সার্থকতা।···কর্মের ফলের দিকে তাকিয়ে না থেকে তুমি কাজের কৌশলটিকে অনুসরণ করে যাও, evolution-এর process-এ ফল আসবে। কাঁঠালের বীচি পোড়া দিয়ে বালক রোজই দেখে পুড়েছে কিনা—তার সবুর সয় না—ফলের জন্যই সে ব্যাকুল।···লাউকুমড়োর গাছ বুনে রোজ দেখে ফল হল কি না—এতে গাছের সেবা হয় না—তুমি সেবা করে যাও—ফল আপনি যা আসবে গ্রহণ করো, লুট বিলিয়ে দিও।···(গোবর্দ্ধনধারণ কাহিনী বিবৃত করলেন) কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করলেন অর্থ কি? পাহাড় তো জড় বস্তু—কৃপার পাত্র—তাকে কৃষ্ণ আকাশে তুলে ধরলেন অর্থাৎ মান সম্মান দান করলেন। এমন বলা হয় জান তো—মশায়, অমুককে আপনি মাথায় তুলে দিলেন?—যা কিছু হেয়, অল্প মূল্যবান—সেই জড় বস্তুকে কৃষ্ণ মান দিলেন—এই ভাবেই বিশ্বের দিব্য রূপান্তর সাধন করলেন তিনি...পাথর জড়, পাথর অজড়ও বটে, পাথরের অন্তরের চৈতন্যের খোঁজ তুমি পাও নি, কৃষ্ণ পেয়েছিলেন···কৃষ্ণ-জীবনে বিরুদ্ধ ধর্মের সামঞ্জস্য হয়েছে···। কর্ম কর, process of becoming-এর পথে এগিয়ে চল···পন্থার বিরুদ্ধতা এ পথে বড় কথা··· হিংস পন্থায় স্বাধীনতা, অহিংস পন্থায় স্বাধীনতা—দুইয়ে তফাৎ আছে···। মহাপ্রভুর পায়ে হেঁটে যাবার পর মাস কেবল প্রাণের আর্তি দিয়ে হা জগন্নাথ হা জগন্নাথ করতে করতে জগন্নাথ দর্শন, আর আমাদের মত রাত ৯টায় পুরী প্যাসেঞ্জারে যেয়ে রেলে ঘুম লাগিয়ে পরদিন সকালে নেমে জগন্নাথ দর্শন—এই দুই দর্শন কি এক? Becoming-এর মধ্য দিয়ে ভগবানকে জন্ম দিতে হবে ···ফল ফল করে চেঁচালে ফল পাবে না—এমন কৌশলে কাজ করে যেতে হবে যাতে কর্মের স্বাভাবিক পরিণতিতে ফল আসবে। Whithead এর কথা—It is as true to say that God creates the world, as that the world creates God, it is as true to say that God transcends the world, as that the world transcends God.···বিজ্ঞানী ম্যাক্স বলেছেন, বিজ্ঞান ও মেটাফিজিক্স্ আজ এক হতে চাইছে...বিশ্বটা creative evolution।···এক আধ জন ব্রহ্ম পেলে কি হবে? জনসাধারণ ব্রহ্ম পায় নি—তাদের শেখাতে হবে যোগঃ কর্মসু কৌশলম্—কৃষ্ণ সব ক্ষেত্রের দেবতা—অহংকার থাকলে চলবে না—কর্ম আমার নয়, কর্ম ভগবানের···ভগবান আদেশ দেন, অর্জুন তাকে কর্মে রূপ দেন—মানুষের পক্ষে এটা গৌরবের—সে মাটিতে ভগবানের আদেশকে রূপ দেবে।...মানুষ দিচ্ছে বিশ্বের খবর, নারায়ণ দিচ্ছেন বিশ্বাতীতের খবর।... আশ্রমে যারা আছ সহজ সরল হয়ে কর্ম কর—কৃষ্ণ সংসারী, কৃষ্ণ সন্ন্যাসী—নরনারায়ণ আশ্রম চায় ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ।··· নিত্যগোপালের I am a cosmopolitan বাক্য স্মরণ কর—জীবন থেকে cosmic life বাদ দেওয়ার ফলেই জীবনটা devil's dance এ পরিণত হয়েছে।···

২০, ৭, ৫৬। ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্ত্তয়ে গুরু-ভগবতে নিত্যগোপালায়···। ভারতবর্ষ অতি সুপ্রাচীন দেশ—ভারতবর্ষ যখন তার সভ্যতা নিয়ে বিশ্বে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা শিশু, অর্বাচীন। এই সুপ্রাচীন

ধারাকে বহন করে, পালন করে কত ঋষি আমাদের কাছে এসেছেন—শ্রীনিত্যগোপালই এই ধারার আধুনিকতম ধারক ও বাহক। এই ধারার এক বিশেষ পথা গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ। বই পড়ে বিদ্যালাভ হয় না—সেখানে আমি আমার বুদ্ধি দিয়ে আমার মত ব্যাখ্যা করি। গাছের পাখীর ডাক যে যার মত শোনে, ব্যাখ্যা করে—এতে পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়—পাখী কি গায় তা কেউ বোঝে না—সকলে এক রকম শোনে না, যে যার পছন্দমত ব্যাখ্যা করে।…বিদ্যা কাকে বলে সে সম্বন্ধে আচার্য শঙ্কর বলেছেন 'বস্তুতন্ত্রা ভবেৎ বিদ্যা'—গোরুর বিদ্যা জানতে হলে গরুবস্তুর অধীন হতে হবে—নিজের মত করে ব্যাখ্যা করে বস্তু-জ্ঞান লাভ হয় না—বিদ্যা সব সময় বস্তুর অধীন। এইজন্য ভারতবর্ষ সব সময় বস্তুর সামনে মাথা নত করেছেন—মাটিকে প্রণাম করেছেন, জলকে প্রণাম করেছেন…এর থেকেই আসে সব কিছুকেই—একটা পাথরকেও—ভগবান করে পূজো করার ব্যাপার।…বস্তুতন্ত্রং ভবেৎ জ্ঞানম্—আমি যা জানতে চাইছি তাকে ভোগ-দৃষ্টি থেকে মুক্ত রাখতে হবেই।…বস্তুর শরণাগত হয়ে বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে হবে—তুমি যার জ্ঞান জানতে চাইছ, সে নিশ্চয়ই তোমার থেকে বড়।…গীতা বলেছেন—বিদ্যা প্রণাম। জুলুম করে বিদ্যা-লাভ হয় না, সেবা করে সরস্বতীকে পাওয়া যায়…।…জানি না করে কোন্ একটি প্রণাম নিত্যগোপাল চরণে পৌঁছে গিয়েছিল—তাই আজ বেদান্ত ফুটে উঠেছে আমার কাছে।…ঠাকুর, তোমার নির্দেশকে যেন নিজে ব্যাখ্যা না করি—তোমার নির্দেশ যেন শুনতে পারি…। অবিদ্যা বোকা—রাধার বাঁশী শিক্ষা—স্রষ্টার ভরে যেতে হবে ..৭৩ বছরের অভিজ্ঞতা একটা কিছু আছে বলেই এত বড়, এত হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে চলে আসতে পারছি…তোমাদের বুদ্ধিতে তো পারবে না, বিচ্ছিন্নতার বুদ্ধি নিয়ে যদি থাক, পারবে না তো থাকতে…আমি নিতান্ত গোবেচারা—আমাকে ঠকাতে চাইলে ঠকবে—উদ্দালক আরুণীর মত গুরু-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে মেনে চল—ব্রহ্ম-বিদ্যা নেমে আসবে।…জগন্নাথদেব মহাপ্রভুকে গ্রাস করে ফেলেছিলেন, আর শুনেছি মীরাবাঈ নাকি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিলেন…আমি প্রতি মুহূর্তে প্রার্থনা করি আমার এ দেহ তোমার মধ্যে মিশে যাক—আমার মন নিত্যগোপাল তোমার,…দেহ তোমার…। তোমরা যারা এসেছ, যারা গড়ে তুলছ,…তারা কিন্তু নিজের বুদ্ধি চালাতে গিয়ে চলে যাবার অবস্থা ঘটিও না—তোমার আমার প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে দেখ; সেবার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছে. আষাঢ়ী পূর্ণিমা গুরু পূর্ণিমা….

২১, ৭, ৭৬।…কাল গুরুপূর্ণিমা—গুরুপূজার এটাই প্রশস্ত দিন শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ করেছেন। মহানির্বাণ মঠকে নিত্যগোপাল গুরুপীঠ আখ্যা দিয়েছেন—এর অর্থ বিশ্বের যত আদর্শ যত গুরু প্রচার করেছেন—আস্তিক্য নাস্তিক্য জড় অজড় সব বাদ—সেই সব গুরুদের পীঠস্থান।…সব গুরুর সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নিত্যগোপাল গুরুগরীয়ান্। সমস্ত মত আদর্শের সমন্বয়মূর্তি নিত্যগোপাল। তিনি সমন্বয়াচার্য নন, সমন্বয়মূর্তি.. সমন্বয় তাঁর জীবনে মূর্চ্ছিত হইয়াছে তাঁর চরণতলে সব কিছু গলাগলি…তিনি আমার গুরু, তিনি বিশ্বগুরু তিনি শিব।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

…তোমার বুদ্ধিদ্বারা আদর্শ ঠিক হবে না, যার জীবনে আদর্শ আছে, তিনিই আদর্শ ঠিক করতে পারবেন তিনিই গুরু; তুমি অবশ্য চেনই না মোটে তাই নিজে বুদ্ধি সম্বন্ধে অনাস্থা রেখো—এর নাম বিনয়।…তাঁর নয়নে নয়ন মিলাতে হবে, তোমার চক্ষু দিয়ে দেখা হবে না। অর্জুনকে বলছেন দদামি দিব্যং তে চক্ষুঃ—তোমার পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি দিয়ে তো তুমি সবটুকু দেখতে পাবে না—অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি থাকলেই অন্ধত্ব আসে—একটা বস্তুর এতটুকু দেখি—সবটা দেখি না—যতটুকু দেখি ততটুকুকে সবটুকু বলে জানি…শিষ্য হলেই পথ খুলে যায়—যা

বল আমার বুঝ আমি বুঝে নেব, তবে নাও···। অবিদ্যা দ্বারা···এত বড় বিরাট আদর্শকে ধরে রাখবার তোমার কোন সম্ভাবনা নেই—কেবল তাঁর আশীর্বাদের উপর নির্ভর...গুরুর ইচ্ছা পূরণ করাই আমার একমাত্র আদর্শ... হরির বাঞ্ছা পূরণ করতে সক্ষম একা রাধিকা—ন চান্যম্। তুমি কিছু চেয়ো না—তুমি গুরুকে চাও—গুরু তোমার আদর্শ ঠিক করবেন। গুরুর নির্দেশ মানাই তোমার আদর্শ।···নিজের আদর্শ কেউ বোঝে না, আমিই কি বুঝতাম? একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে আমি অসুর বলতাম কেননা তিনি রজোগুণের কথা বলতেন।··· আজ বিবেকানন্দকে আমি জ্যেষ্ঠ সহোদর বলে দেখি··· আদর্শ নিজে ঠিক করতে যেয়ো না···তুমি যে প্রতিষ্ঠিত হতে পার নি সেটা তোমার পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টির ফল। গুরু অতীত জানেন, বর্তমান জানেন, ভবিষ্যৎ জানেন, তুমি জান না।...পিতা গুরু, মাতা গুরু···গুরু গুরু।...আমি ফাঁকি দিলে, কালকে ফাঁকি দিতে পারবে না...তোমার অনন্ত সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতা গুরুর আছে... ৭৩ বৎসর পর্যন্ত নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই যে এখানে এসেছি, কার আশীর্বাদে? নিত্যগোপালের।... অনেক চড় চাপড় খেয়েছি কিন্তু নিজের আদর্শ ত্যাগ করতে পারি নি, আমার আদর্শ তো আমি করি নি নিত্যগোপাল দিয়েছেন···। গুরু, গুরু, গুরু! অভাবে মরতে পারতাম, অপমানে জর্জরিত হতে পারতাম, কত কিছুই হতে পারত! সব থেকে তিনি রক্ষা করেছেন 'যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি' বলেছিলেন। শ্রীবং সঃ ব্রহ্ম গুরুং বদামি, গুরুং স্মরামি, গুরুং ভজামি। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু···। আমার শিষ্যদের আমি গুরু না তারাই গুরু? আমি তাদের দেহ মন প্রাণের সব দিক দিয়া সুস্থ রাখতে চেষ্টা করি...। নিত্যগোপাল গুরু— আজকালকার গুরু নন; তিনি না খেয়ে না পরে শুধু তক্তপোষের উপর বসে জীবন কাটিয়েছেন। এক শিষ্য একটা ভেলভেটের চাদর দিয়েছিল, তার উপর কোন দিন বসেন নি···। নিত্যগোপাল, তুমি শিব, শিব।··· আমি শাসন করি, তাই আমাকে কেউ ভাল বাসে না। কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি শুধু করুণ নই···।···মায়ের মত নিত্যগোপালে কাছে বসে খাইয়েছেন...একদিন কাঁকর-ওয়ালা চাল ছিল, ঠাকুর ছেলেরা এগুলি খাবে কি রকম করে বলে উপবাসী রইলেন। আমরা এত বোকা ছিলাম, নির্লজ্জের মত খেয়ে এলাম।...তাঁকে ভালবাসা হয় নি, এ কথা মনে করে আজ চোখে জল আসে···। কোনদিন তো জিজ্ঞাসা করা হয় নি, 'তুমি কেমন আছ'? আজ তাই জানা। সংসারের আদর্শও আমার কাছে আছে, সন্ন্যাসের আদর্শও···আমি শত দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার চালিয়েছি। নিত্যগোপাল জানতেন কেমন করে সংসার করতে হয়। বর্ষায় যত্ন দূর্বাঘাস শুকিয়ে রেখেছেন তিনি···অণরোণীয়ান্ তিনি, মহতো মহীয়ান্ তিনি। ছোট্ট পেনসিল দিয়ে তিনি লিখেছেন, হাতে ধরা যায় না, কাগজ লাগিয়ে নিয়েছেন...বুকপোস্টের সুতোটুকু রেখে দিয়েছেন, সময়ে কাজে লেগেছে...বড় বড় মোটা মোটা অক্ষরে লিখতেন, এতটুকু ছোট্ট চিরকুটে লিখতেন··· সংসারটা ভগবানের বিশ্রামের জায়গা···গুরুর প্রসাদে পুরুষোত্তমানন্দ একটু একটু শিখেছে···তিনি সন্ন্যাস করতে জানতেন, সংসার করতে জানতেন।...ভোলা একদিনে বাজারে গেছে, চারপয়সার হিসাব দিতে পারে না। নিত্যগোপাল খুব রাগ করলেন—ভিখারীকে সে /০ আনা দিত, কিন্তু সে হিসাব দিতে পারবে না কেন, ঠকবে কেন?...মহানির্বাণ মঠ গুরুপীঠ,...তিনি আদর্শের গুরু, বাবারের গুরু···। তাঁর মত এমন মানুষ আমি দ্বিতীয়টি দেখি নাই—এমন সহজ সরল মানুষ কোনো উপাধি নেই···। আজ সরকার পতিতাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে, আমি সেই আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বেশ্যাদের নিয়ে সভা করেছি, নিত্যগোপালের প্রসঙ্গ শুনিয়ে এসেছি বরিশাল পিরোজপুর ঝালকাঠি সব জায়গাতেই করেছি···।

ক্রমশঃ

জীবনচরিতের মূলতত্ত্ব

॥ শ্রীমণি বাগচি ॥

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে অপরিণত এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত বিভাগ বলে যদি কিছু থাকে, আমার মতে তা হোল আত্মচরিত এবং জীবনচরিত বিভাগ। বিপুলায়তন বাংলাসাহিত্যে এই বিভাগটির দৈন্য অত্যন্ত প্রকট। সাহিত্যের এমন কোনো বিভাগ নেই যা রবীন্দ্রনাথের দৈবী প্রতিভার স্পর্শে সমৃদ্ধ বা উদ্ভাসিত হয় নি; তবু বলব রবীন্দ্রসাহিত্যে যদি কোনো বিষয়ের অনুশীলন কিছু পরিমাণে উপেক্ষিত বা বর্জিত হয়ে থাকে তা হোল সাহিত্যের এই বিভাগটি। রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শ এখানে অনুপস্থিত। কবি 'জীবনস্মৃতি' রচনা করেছেন, কিন্তু আত্মচরিত লেখেন নি। তাঁর 'চরিত্রপূজা' বা 'ভারত-পথিক রামমোহন' কারো বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত নয়; রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও স্বীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র। অথচ এই তিনজন মহাপুরুষের মধ্যে যে কোন একজনের বিষয়ে তিনি একখানি পরিপূর্ণ জীবনচরিত রচনা করে যেতে পারতেন, অন্ততঃ তাঁর কাছে আমাদের সেই প্রত্যাশাই ছিল। 'ভারতপথিক রামমোহন' পাঠ করে এ-কথা আমার বহুবার মনে উদয় হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ যদি রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে একখানি জীবনচরিত রচনা করে যেতেন, তাহলে আমরা দুটি জিনিস পেতাম; এক, বাংলাসাহিত্যে একখানি রসোত্তীর্ণ জীবনচরিত আর দ্বিতীয়ত জীবনচরিত রচনা করা বিষয়ে একটি 'মডেল' বা দৃষ্টান্ত। তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্যের এই বিভাগটি সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। শরৎচন্দ্রও না, এই তিনজন মহৎ শিল্পী যদি আত্মচরিত বা জীবনচরিতের ক্ষেত্রে তাঁদের স্ব স্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতেন, উত্তরপুরুষের পক্ষে নিঃসন্দেহে তা প্রেরণার স্থল হয়ে থাকত।

বাংলাসাহিত্যে এই বিভাগটির দৈন্য বোঝা যাবে যদি আমরা একবার বিশ্বসাহিত্যের প্রতি, বিশেষকরে ফরাসি, জার্মান ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আমাদে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। আত্মচরিত ও জীবনচরিতের কী সমারোহপূর্ণ মিছিল সেখানে। ইয়ুরোপের প্রায় সকা দিকপাল সাহিত্যিক ও কবি হয় আত্মচরিত নতুবা জীবন চরিত রচনা দ্বারা তাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন এতখানি ভূমিকা করলাম শুধু এই কথাটা বলবার জন্য যে দীর্ঘকাল যাবৎ জীবনচরিত অনুশীলনের ক্ষেত্রে নিযু থেকে আমার এই প্রত্যয় হয়েছে যে, প্রকৃত সাহিত্যর সমৃদ্ধ জীবনচরিত বা আত্মচরিত মানবমন গঠনের বিশে সহায়ক; এর দ্বারা শুধু যে সাহিত্যেরই পরিপুষ্টি সাধি হয় তা নয়, সমাজচেতনারও কিছু পরিপুষ্টি সাধিত হ থাকে সেই সঙ্গে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দে আজো এই বিষয়ে অনেকের মনে সঠিক ধারণা গ ওঠে নি। জীবনীসাহিত্যের প্রকৃত তাৎপর্য খুব ব পাঠকই হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন। মহৎ সাহিত্য, যা আমরা বলি সৃজনধর্মী সাহিত্য বা creative literatur তা মানবজীবনেরই অংশ। এতে প্রতিফলিত শাশ্বতকালের অনুভূতি ও চিন্তা, যা যুগ হতে যুগান্ত মানুষের মনকে নবনব সৃষ্টির পথে প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগি থাকে। তাকেই বলি আমরা সার্থক আত্মচরিত জীবনচরিত বা মহৎ সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অ হিসেবে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, আমাদের চিন্তা উদ্দীপ্ত করে, আর চিত্তকে করে সরস।

যথার্থ রসোত্তীর্ণ জীবনচরিতের সংখ্যাও বাং সাহিত্যে খুব বেশি নয়। তার একটি কারণ, খুব ক সাহিত্যিকই এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। কার্লাইল লিটন স্ট্রেচি অথবা ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বা বেসওয়েল-পিয়ার্স

মতো জীবনচরিতকার আমাদের দেশে কোথায়? সাহিত্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ জীবনচরিত—এই সত্যটাই আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত যথার্থ উপলব্ধ হয় নি। এমার্সন বলেন, "One moment of a man's life is a fact so stupendous as to take the lustre out of all fiction"। স্যার ওয়াল্টার স্কটের মতে "Biography is the most interesting of every species of composition"। আর একজন আধুনিক বিশেষজ্ঞ গামালিয়েল ব্র্যাডফোর্ড মন্তব্য করেছেন: "Biography is one of the most fascinating of all pursuits, for by it we are taken out of our lives into another life which we find very much like our own"। কার্লাইল আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন; জীবনচরিত সম্পর্কে তাঁর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাটি কম বেশি সবাই জানেন। তিনি বলেছেন, "History is the essence of numerous biographies. If one wants to know the meaning of history let him look into the lives of great men"। বস্তুত তাঁর আগে জীবনচরিতকে এইভাবে অর্থাৎ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে আর কেউ উপলব্ধি করেন নি। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ানের অভিমতও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তাঁর মতে জীবনচরিত হোল "Personalised history" এবং জীবনচরিতকারের প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হোল "to recover lives, to weigh souls, and to catch that will-o-the-wisp known as the human spirit"। সুতরাং জীবনচরিত রচনা কাজটি মোটেই সহজ নয়।

কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ঘটনাবলী, বা তার চরিত্রের গতি-প্রকৃতি সাধারণতঃ জীবনচরিতে এইসব সন্নিবদ্ধ হয়ে থাকে। অর্থাৎ জীবনচরিত একান্তভাবেই তথ্যবহ—তথ্যের সমাবেশ ভিন্ন কোনো জীবনচরিতই রচিত হোতে পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র তথ্যের সমাবেশে কোনো সার্থক জীবনচরিত সৃষ্টি হোতে পারে না, যদি না তার মধ্যে আমরা পাই ব্যাখ্যা (Interpretation) এবং তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য সন্নিবেশ (arrangement)। যদিও এই দুটি কাজ নিখুঁতভাবে হয়, তথাপি শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে Interpretation-এর অভাবে লেখকের পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয় নি, অর্থাৎ জীবন্ত জীবনচরিত তিনি রচনা করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে এমীল লুডউইগের একটি কথা মনে পড়ে। তিনি তখন নেপোলিয়নের জীবনচরিত রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, নেপোলিয়নের জীবনচরিতের উপাদান তো প্রচুর, তবে তোমার এই বই লিখতে এত সময় লাগছে কেন? উত্তরে লুডউইগ বলেছিলেন, উপাদানের অপ্রতুলতা নেই সত্য, তবে কি না "Behind every piece of biography is a special feeling about life, a special view of life and a special set of values"। এখানেও সেই ব্যাখ্যার কথা আসছে।

একটি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসে আমরা কী প্রত্যাশা করি? অর্থাৎ কী কী গুণ থাকলে পরে একটি উপন্যাসকে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলে অভিহিত করা যায়? মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে সেই গুণাবলী হোল suspence, plot, logic, interpretation, belief; total experience-এর যে-কোনোর একটির অভাব ঘটলে, বিশেষ করে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অভাব ঘটলে পরে সে উপন্যাস নিকৃষ্ট হোতে বাধ্য। জীবনচরিত সম্পর্কেও সেই একই কথা। Total experience কথাটা বলতে সোজা, কিন্তু জিনিসটি ধারণায় আনা অত্যন্ত কঠিন। কোনো একটি চরিত্রের প্রতি পাঠকচিত্তে সহানুভূতির উদ্রেক করা এক জিনিস আর সেই চরিত্রের ভাবে পাঠককে ভাবিয়ে তোলা আরেক জিনিস। তেমন সার্থক সৃষ্টি উপন্যাসের জগতে হাজারে দু-চারটির বেশি মেলে কিনা সন্দেহ। সার্থক জীবনচরিত সম্পর্কেও সেই একই কথা—বেশি মেলে কিনা সন্দেহ। চেস্টারটনের কথায় "When one reads a good biography one is supposed to simply live through everything which the biographer writes about his subject"। ঠিক এই রকম effect পাঠকচিত্তে যিনি সৃষ্টি করতে পারেন তিনিই ক্ষমতাসম্পন্ন জীবনচরিতকার বলে অভিহিত হোতে পারেন। প্রতিভাবান লেখকের হাতে পড়লে পরে কোনো একটি পরিচিত বিষয় বা বহুপঠিত বিষয় যে সম্পূর্ণ নূতনভাবে প্রতিভাত হোতে পারে, তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন লুডউইগ, দেখিয়েছেন স্ট্রেচি, দেখিয়েছেন পিয়ার্সন। নূতন করে সৃষ্টি করা সাধারণ ক্ষমতার কাজ নয়, আবার সেই সৃষ্টিকে পাঠকের অনুভূতির মধ্যে, তার উপলব্ধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা আরো সুকঠিন। এই সফলতার মানদণ্ডেই জীবনচরিত রচনার সফলতা বা সার্থকতা যাচাই হোয়ে থাকে। "To find the meaning of life—" জীবনের অর্থকে (এখানে বুঝতে হবে motivation) আবিষ্কার করা—এই দুঃসাধ্য কাজে সফলতা লাভ করেছেন পৃথিবীর খুব অল্পসংখ্যক জীবনচরিতকার। ঠিক এই নিরিখে যাচাই করলে বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত জীবনচরিতকারের সংখ্যা নিতান্ত অল্পই বলতে হয়।

নরনারীর চরিতাখ্যান কোন্ পদ্ধতি অনুসারে লিখলে তা সমাজের মঙ্গলজনক হোতে পারে, তা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন সিড্নে লী তাঁর Principles of Biography নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে। যিনি জীবনচরিতকার হোতে ইচ্ছে করেন তাঁর পক্ষে এই বইখানি ভালো করে পাঠ করা প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবন কথা লিখে রাখার সাধ হয় কেন? উত্তরে সিড্নে লী বলেছেন: "মানুষের চরিত্রের ও কীর্তির ধারা বজায় রাখবার উদ্দেশ্যেই ইতিহাস ও চরিতাখ্যান রচিত হয়ে থাকে। পুরাতনকে সজীব রাখাই চরিতাখ্যানের মূলতত্ত্ব।" জীবনচরিত রচনার উপাদান কী? উত্তরে বলেছেন: "Character and exploit constitute biographic personality." অর্থাৎ কোনো মানুষের জীবনে তার চরিত্র ও কর্মকৃতিই আখ্যানযোগ্য বিষয়। আরো বিশদভাবে বলা যেতে পারে যে, যে চরিত্রে বিশিষ্টতা নেই, বৃহত্তর সমাজজীবনের উপর যে চরিত্র একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে না পারে, তা আখ্যানযোগ্য নয়। বাঙালী কবি যে বলেছেন: "সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে"—এ কথা মিথ্যা নয়। যে পুরুষ কীর্তিমান নন, যার যশ স্থায়ী হবে না, তাঁর জীবন-কথা আখ্যানযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে এরিস্টটেলের একটি উক্তি স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন": "A career, which is serious, complete and of a certain magnitude, is a fit biographic theme"। অর্থাৎ যে জীবন ব্যাপ্তিতে ও দীপ্তিতে প্রগাঢ় নয়, সম্পূর্ণ নয়, তার আখ্যানের কোনো সার্থকতা নেই। এরিস্টটেলের 'magnitude' কথাটি নিয়ে লী অনেকখানি আলোচনা করেছেন তাঁর বইতে। কোনো ব্যক্তি বিশেষের জীবিতকালের প্রশংসার ছটা দেখে এবং সে ছটায় মুগ্ধ হয়ে তার বিষয়ে লিখতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের জীবনের মহত্ত্ব বা magnitude বোঝা বড়ো কঠিন। এখানে তিনি মার্লবরো আ ওয়েলিংটন—এই দুটি চরিত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক বলেছেন: "বীরত্ব হিসাবে মার্লবরো ওয়েলিংটন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু মার্লবরো তাঁর স্বজাতির কা অনেকটা বিস্মৃত অথচ ইংরেজ জাতি ওয়েলিংটনকে ম রেখেছে"। টেনিসন মার্লবরোর ওপর কবিতা লেখে নি, লিখেছেন ওয়েলিংটনের ওপর। এর কারণ এই ওয়েলিংটনের জীবনের মহত্ত্ব বা magnitude মার্লবরো চেয়ে খুব বেশি। এই মহত্ত্বের আলোচনা ব্যতিরেকে কোনো জীবনচরিতই সার্থকভাবে বিরচিত হতে পা না। মানুষের মহত্ত্বের অনুশীলনই জীবনচরিতের মূলত হিসাবে তাই স্বীকৃত। মনীষী কার্লাইল তাঁর সুবিখ্যা Hero-worship গ্রন্থে এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন। তাঁর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন জীবনচরিত রচনা অতি দুরূহ কার্য। তথ্য জোগাড় হলেই যে জীবনী হবে এমন কোনো কথা নেই। আস কথা, সত্য কথা বলার সাহস না থাকলে এবং যার বিষ লিখতে হবে তার বহিরঙ্গ জীবনের পাশাপাশি ত অন্তরঙ্গ জীবনের অর্থাৎ তার মনের বিস্তার, গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ব্যতিরেকে কেউই সার্থ জীবনচরিত রচনা করতে পারেন না। তাই জীবন স্বরূপ উদ্ঘাটন জীবনচরিতের অন্যতম মূলতত্ত্ব।

মীরা

॥ অধ্যাপক শ্রীসুধীর গুপ্ত ॥

ঈশ্বর ভেবেছে তা'রে। রতি-অভিসারে
উতলা উদ্‌ভ্রান্ত নিত্য তা'র চিত্তদল ;
সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বদা কোন্ প্রেম-পরিমল
পথের নির্দ্দেশ দেয় দূরে অন্ধকারে।
কদাচিৎ কেহ যা'রে পায় চিনিবারে,
সে তা'রে চিনিছে, তাই হয়েছে পাগল।
আগল্ খুলেছে তা'র ; প্রেমের সম্বল
পথের পাথেয় তা'র এই মর্ত্ত্য-পারে।
অমৃতের উৎস-মুখ খুলে যায় যা'র
সঙ্গীতে সে দুনারেও করে প্রাণময় ;
কঙ্কর-কণ্টক-পথে চির-অভিসার
আনন্দ যোগায় শুধু ; যত ক্ষতি-ক্ষয়
পুষ্পময় হ'য়ে ওঠে ; পরম-আত্মার
আহ্বান আসিলে রাণী ভিখারিণী হয়।

কি দিয়ে পূজি মা

॥ শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ ॥

কি দিয়ে তোমায় করি অর্চনা অপর্ণা শারদীয়া ;
পূজিছে চরণ রক্ত বরণ পদ্ম প্রস্ফুটিয়া।
রাশি ধূলি কণা সিক্ত শিশির প্রকৃতি বেড়ায় ভোরে ;
মার্জন করিতে স্বয়ং পবন দাঁড়ায়ে নিত্য দোরে।

রবি রশ্মির শঙ্খ প্রদীপে আরতি তোমার নিতি ;
দিগঙ্গনা দেয় আলপনা রাঙা'য়ে আকাশ ক্ষিতি।
সারা নিশি জাগে শুভ্রা শেফালী প্রভাতে লুটায় পায় ;
কুলু-কুলু নাদে স্রোতস্বতী যত আগমনী গান গায়।
সপ্ত সিন্ধু বাজায় শঙ্খ তোমার পূজার তরে ;
উছলি তুলেছে ভুবন দেউল সুধাকর সুধা-করে।

তাই ভেবে মরি কোন্ কুসুমেতে দানিব মা অঞ্জলি—
সন্তর্পণে অর্পি চরণে ক্ষুদ্র কবিতা কলি।

বসুধারা

॥ শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক ॥

বসুধারা ঘুচাও সকল রিক্ততা ও তিক্ততা—
দৈন্য হয় গুণরাশিনাশী যে সে ঠিক কথা।
মানুষ হউক স্নিগ্ধ শুচি,
বিশুদ্ধ হোক অভিরুচি,
কর, নীরস বিরস যাহা সুধায় অভিষিক্তা।

কল্যাণের যে প্রতীক তুমি আনো অশোক আনন্দ
ভুবনকে আজ পুণ্য করুক হোমের হবির সুগন্ধ।
প্রসন্ন হোক শত ক্রতু।
মহালক্ষ্মী প্রসীদতু
সব সাধনা পূর্ণ হউক—তপঃফল হোক অনন্ত।

অভ্যুদয়ের সপ্ত ধারায় করি তোমায় বরণ গো,
আসুক তোমার পদপাতে মন্দাকিনীর তরঙ্গ।
এসো শুভ সংগী তুমি
হে হেম রাজ হংসী তুমি।
দুর্নীত দুর্গতি ভীতি সব তুমি হরণ গো!

শরৎ ও শারদীয়া

॥ অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত ॥

মানুষের যে সত্যিকারের উৎসব, সে-উৎসব অন্তরের : হৃদয়ের গভীরতম স্তরের আনন্দোচ্ছ্বাস নিয়েই জেগে ওঠে অন্তরের বাঁশি,—সুরে সুরে তার ছড়িয়ে পড়ে অসীমের আনন্দ-কল্লোল। আনন্দের আকৃতি নিয়ে যে-অনুষ্ঠান শুনিয়ে যায় অনন্তের ছন্দকে, সেই তো উৎসব। প্রাত্যহিক জীবনের একটানা গতানুগতিকতার বন্ধনে বাঁধা পড়ে থাকে আমাদের প্রাণ, উৎসবই তো সেখানে নিয়ে আসে সীমাহীন আর এক প্রাণ-সম্পদকে। উৎসব তাই যেমন বাইরের কোলাহলে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি নিঃশব্দচারী বন্ধুর মতো অন্তরের গহনে তোলে প্রিয়জনের সঙ্গে প্রেম-পরিচয়ের এক কলসংগীত। প্রেমের মধ্যেই তো অসীমের পদসঞ্চার, আর সেই সঞ্চারের মধ্যেই উৎসবের পরিব্যাপ্তি।

আমাদের উৎসব তাই জেগে উঠেছে ঋতুলক্ষ্মীর ছন্দ সংগীতের সঙ্গে তাল রেখে। ঋতুলক্ষ্মী তার প্রতিটি পদক্ষেপে মাটির জগতে ফুটিয়ে তোলে একটি সৌন্দর্যের বিশেষ রূপ। সেই বিশেষ রূপই রং বুলিয়ে দেয় আমাদের প্রাণে। সেই রং-এই প্রাণ রাঙিয়ে নিয়ে আমরা বিশ্বকে দেখি, আর প্রিয়জনের সঙ্গে যেন একাত্মতাও অনুভব করি।

শরতের আগে যে-বর্ষা, সেই বর্ষার রং সজল ঘন,—শরতের পরে যে শীত এবং বসন্ত, তাদের একজনের রং রিক্ততার ধূসর, আর একজনের রং যৌবনের সবুজে দীপ্তিমান। এদের মাঝখানে যে-শরৎ, তার গায়ে লেগে আছে নতুন ফুটে-ওঠা শ্বেত কমলের শুভ্রতার আবেশ। শরৎ তাই মনে বর্ষার মতো যৌবন-জাগানো মত্ততা আনে না,—যা' আনে সে হচ্ছে অন্তরঙ্গতার এক সুমধুর স্নিগ্ধতা। মূলে তার সারল্যের শুচিশ্রী, রূপে তার শিশুর কোমলতা, মনে তার মিলনোৎসবের আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—'শরতের রংটি প্রাণের রং,—অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম।'

এই শরতেই বাঙালী তার প্রাণের পূজার অর্ঘ্যটি সাজিয়ে নিয়ে অনন্তের এক শক্তি মহিমাকে অন্তরের প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা দিয়ে অন্তরকে উত্তীর্ণ করতে চায় এক অপরূপ মহিম ক্ষেত্রে; সেখানে অন্তর লাভ করবে বিপুল ব্যাপ্ত মাতৃত্বের সুকোমল স্পর্শ, আত্মিক চেতনায় অনুভূত হবে অসীমের সৌন্দর্যের ম্লানিহীন প্রসন্নতা! এই অনুভবের মধ্যেই তার প্রাণের উৎসব! এই উৎসবে আছে নিবিড় মিলনের শঙ্খধ্বনি! জীবনের সমস্ত স্নিগ্ধ অনুভবের মধ্যে অন্ধ হৃদয়ের অনুভূতিকে জড়িয়ে নিয়ে শরতের বুকে তাই আমাদের উৎসবের মালা রচনার পালা। সে-মালা মিলন-বন্ধনের প্রাণ-চেতনায় ঘেরা।

এই প্রাণ-চেতনার ঐশ্বর্য নিয়েই আমরা শরতের বুকে শারদীয়াকে দেখি। শরৎ রূপ, শারদীয়া ভাব; শরৎ প্রকৃতির, শারদীয়া অন্তরের; শরৎ আনন্দের, শারদীয়া পূজার। শারদীয়া শরতের আনন্দ সজ্জা,—মহামায়ার রূপের অঞ্জলি-ভরা শুভ্রতা। যে-মহামায়া জগন্মূর্তি, যাঁর প্রসন্ন বিভূতির দ্বারা এই পৃথিবী হয়ে আছে পরিপূর্ণ, শরতের ভাবময়তা জমিয়ে দিয়েছে বাঙলা কবির ছন্দে সেই মহামায়ারই রূপখানিকে।

পূজার পুণ্যধারা হ'তে জেগে ওঠে যেমন আত্ম নিবেদনের স্বকৃতি, শরৎ কালেই শ্যামল বাঙলার কোমল বুকের কোণ থেকে জগন্মাতার উপলব্ধির সঙ্গে তেমনি জেগে উঠেছে শত সহস্র স্বপ্ন-কামনা। সৌন্দর্য-ধ্যানের প্রাণ-সত্তা ধরা দিতে চেয়েছে সত্যোপলব্ধির শিল্প-লীলায়। তাই বাঙলার কাব্য জগতে জেগে উঠেছে কালকেতু-ফুল্লরা, লহনা-খুল্লনার কাহিনী, জেগে উঠেছে কমলে কামিনীর

রূপচ্ছায়া! নিশীথ রাত্রির পটভূমিকায় রজনীগন্ধার যেমন সুরভি-বিস্তার, ঠিক তেমনি অন্নদামঙ্গলের পুণ্য-কাহিনীর বিরহে এক ধ্যান-মধুর ভাবমণ্ডল! মহামায়ার সৌন্দর্য-ধ্যানের রেখা-বলয়িত এক ছন্দমধুর কাব্যলোক। এই পূজা ও মাতৃধ্যানের স্নিগ্ধ ভাবমণ্ডলকে সর্বকালের কাল-ভূমিতে কেন্দ্রীকৃত করে রেখেছে যেন শরৎ তার বুকে। শরৎ তাই বিমল জ্যোৎস্না-ঝরানো চাঁদিমার আলোক-মালায় গাঁথা একটি দিব্যোজ্জ্বল রূপমূর্তি।

শরতের আর একটি দিক আছে,—তার চোখে প্রথম দেখা দেয় শিশিরাশ্রু,—কি যেন গভীর বেদনার প্রাণোদ্বেলতার বহিঃপ্রকাশ এটা। এ-বেদনার মধ্যে যেন আছে সেই চিরন্তনী বাণী—

রজনী জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়,
তুমি না সদয় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায়!

(অজ্ঞাত)

বাংলার রিক্ততা-ভরা এক বেদনা রূপময় হয়ে আছে বিজয়ার ব্যথা-জাগানো সংগীতে। শরতের সঙ্গে তাই শাক্ত পদাবলীর ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তম। শরতের প্রাণোদ্বেলতার সঙ্গে স্নেহ প্রীতিময় মানস-অনুভূতির ব্যাকুলতা এসে শক্তি আরাধনার পথটিকে এমনি ভাবেই জড়িয়ে র'য়ে আছে।

মিলন-আলিঙ্গনের পরে বিচ্ছেদের যে-শূন্যতা, সেই শূন্যতার আশংকাকে শরৎ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই বুকের বেদনার সমুদ্র বুকে মিলনের শেফালি ফুটিয়ে তুলেও তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় নীরব রাত্রির বিষাদ-করুণ শেষ প্রহরটিতে। শরৎ এইদিকে তাই মিলনের ক্ষেত্রেও নিঃসঙ্গ। কেননা, শরতের মনে ভাবাকুলতার সুর বেশি। স্রোতে তার বাস্তবের বহন শক্তি যত না আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে ভাব-সৌন্দর্যের মেদুরতা। শরতের বুকে তাই আগমনীর সাহানা যেমন বাজে, বিজয়ার বেহাগও বাজে ঠিক তেমনি। কারণ, তার যেমন আনন্দকে গ্রহণ করে আবেগের সঙ্গে, তেমনি গ্রহণ করে বেদনাকে। তাই শরতের বুকে জেগে ওঠে শারদীয়া উৎসবে আন্তরিক মিলন ও বিচ্ছেদ-ভাবনার আবেশময়তা। শরতের তাই আমাদের সমাজ-জীবনের একটা বন্ধন আছে।

শরৎ শারদার রূপস্বরূপকে আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছে,—একদিকে হাসি, আর একদিকে অশ্রুর ইংগিত-মুখরতায় পূর্ণ করেছে অন্তরকে। শরতের উৎসব তাই হাসি অশ্রুময় মিলন-স্বপ্নের উৎসব, যে-স্বপ্নের মধ্যে পাওয়ার আশা আছে, আবার বিচ্ছেদ-বেদনার ভয়ও আছে। কিন্তু সেই ভয়কে কোমল করে দিয়েছে আবার ফিরে পাওয়ার স্নিগ্ধ আশ্বাস। এই জন্যই শরতের উৎসব-প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আমরা প্রাণখুলে বলতে পারি

মেঘ-বিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ-আশ্বাস,
হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তম, রে!

(রবীন্দ্রনাথ।)

আমাদের দুর্গোৎসব

॥ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥

মহাপূজার শুভলগ্ন যতই কাছে আসিতেছে দুশ্চিন্তার বেড়াজাল ততই ঘিরিয়া ধরিতেছে। দুর্গাপূজা-বিজয়া-লক্ষ্মীপূজা-কালীপূজা-ভাইফোঁটা—ব্যয়সমুদ্রের এক একটি উত্তাল তরঙ্গ কি করিয়া কাটাইয়া উঠিব তাহাই ভাবিতেছি। সোনালের নৌকায় অত বোঝার আর ঠাঁই নাই। ক্রেডিট-সোসাইটি ও আফগানী কর্ণধারদের আশ্রয়ও তাই আজকাল লইতে হয়। এবার কিভাবে ভারসাম্য বজায় রাখিয়া পূজার পারে গিয়া তরী ভিড়াইব তাহাই ভাবিতেছি।

বিগত বৎসরগুলির অভিজ্ঞতার বিভীষিকা এখনও ভুলিতে পারি নাই। দু'পয়সা কামাইবার এমন সার্বজনীন স্বর্ণ সুযোগ হারাইতে অনেকেই রাজী নয়। এ ব্যাপারে শিক্ষিত অশিক্ষিত ভেদ নাই। খবরের কাগজে রোজই নানারকম বিজ্ঞাপন দেখিতেছিলাম—শারদীয়া সংখ্যার কি বিরাট, বিপুল আয়োজন। কোন্ পত্রিকাটি কিনিব কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। না কিনিলেও রক্ষা নাই। আজকাল মহাপূজার অন্যতম উপচার শারদীয়া সংখ্যা। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা আমার উপর বড়ই সদয়। উৎসবের আয়োজনে যাহাতে কোনরূপ অঙ্গহানি না হয় সেদিকে তাহাদের কড়া নজর। এমন সময়ে আমাকে রক্ষা করিল "ভানুমতী"। বিজ্ঞাপনে দেখিলাম এমন অভিনব সস্তা শারদীয়া সংখ্যা পূর্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই, আর ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনাও অতি অল্প। ভাবিলাম 'ভানুমতী' কিনিয়াই জন্ম সার্থক করিব। কিন্তু হা-হতোস্মি! পরের দিনই আবার বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে—'অত্যন্ত দুঃখিত! ভানুমতীর সকল শারদীয়া সংখ্যাই বিক্রী হইয়া গিয়াছে। অর্ডার দিয়া আর লজ্জা দিবেন না।' ভাবিলাম সত্যই পোড়া কপাল আমার! দুঃখও হইল, কেন গতকালই অর্ডার দিয়া রাখিলাম না। অবশেষে রামশরণের শরণাপন্ন হইলাম। সে আমাদের খবরের কাগজ দেয়। তাহার হাতদুটি ধরিয়া কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিলাম—"দাদা, দোহাই তোমার! মেহেরবাণী করকে এক কপি ভানুমতী জোগাড় কর দেও।" ভানুমতীর জন্য আমার কেন এই ব্যাকুলতা তাহা সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়া গেল, "বাবুজী, ঘাবড়াইয়ে মাৎ। আপকো ভানুমতী জরুর মিলেগী।" রামশরণের কথায় আশ্বস্ত হইয়া এক গ্লাস জল খাইয়া ফেলিলাম। পূজার একটি বড় সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। যথাসময়ে 'ভানুমতী' দর্শন দিলেন। দেখিলাম—ভানুমতীর খেল্। যৌন আবেদনমূলক ছবি ও রচনা ছাপিয়া 'ভানুমতী' বাজার মাৎ করিয়াছে।

পূজার বাজার নিজে সারিবার উপায় নাই। 'সংসারটিকে' সঙ্গে লইতে হইয়াছে। তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে যে আমি দোকানে দোকানে ঘুরিয়া দর যাচাই করিয়া তবে কেনাকাটা করি। ইহাতে তাহাদের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়। কাঞ্চনমূল্যের দৌলতে নামকরা দোকানের জিনিষ কৌলীন্য পাইয়া থাকে। আমি গরীব কেরাণী হইলে কি হইবে। আভিজাত্যের প্রতিযোগিতায়—অন্ততঃ বেশ ও কেশের বিন্যাসে—তাহারা যে কাহারো অপেক্ষা ছোট নয় ইহা প্রমাণ করিতে সদাই সচেষ্ট। তাই সকলকেই সঙ্গে লইতে হইয়াছে, গৃহিণীর জন্য কেনা হইল সিনেমা দেখার শাড়ী; সিনেমা উপলক্ষ করিয়া নূতন ডিজাইনের শাড়ী সকলকে দেখাইবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। কেননা লক্ষ্য করিয়াছি—নূতন শাড়ী কেনা হইলে গৃহিণী প্রায়ই সিনেমায় যাওয়ার জন্য উত্ত্যক্ত করিয়া তোলেন। ছেলেমেয়েদের জন্য কেনা হইল—জামা, কাপড়, ফ্রক ইত্যাদি। কোনটি সিল্ক, কোনটি নাইলন, কোনটি ডেক্রন, কোনটি বা টেরিলিন।

হায় পপ্লিন-সাটিন—তোমাদের দিন গিয়াছে। যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন বোনাসের টাকা উবিয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম টাকা যাক, সকলকে যে খুসী করিতে পারিয়াছি ইহা বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। আপাততঃ কিছুদিনের জন্য জামাকাপড় কেনার দুশ্চিন্তা হইতে বাঁচিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যের খেতায় পাতায় যিনি জমা-খরচের হিসাব লেখেন তিনি বোধহয় আমার এই নিশ্চিন্তভাব দেখিয়া মুচকি হাসিয়াছিলেন। সপ্তমীর দিন বিকালে সকলে প্রতিমা দর্শন অভিযানে বাহির হইয়াছে। জনসমুদ্র ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাহারা যখন এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরিয়া প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিল তখন হঠাৎ সুরু হইল মুষলধারে বৃষ্টি। ট্রামে বাসে উঠিবার উপায় নাই। আশ্রয়স্থলগুলি লোকে পরিপূর্ণ। অগত্যা বৃষ্টিতে ভিজিয়াই তাহারা বাড়ী ফিরিয়াছে। পরদিন সকালে দেখা গেল—জুতার ভিতর হইতে পিচবোর্ড উঁকি মারিতেছে, জামা-ফ্রকের জৌলুষ জলে ধুইয়া গিয়াছে, গৃহিণীর সখের শাড়ী সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, পরিয়া বাহির হইবার আর উপায় নাই। বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। ভাবিতে লাগিলাম আবার কাহার শরণাপন্ন হইব!

তাই লাল শালুতে দুর্গোৎসবের বিজ্ঞপ্তি দেখিলে আতঙ্কিত হইয়া উঠি। কিন্তু রেহাই পাইবারও কোন উপায় নাই। সর্বত্রই পূজার আয়োজন। পা মচ্কান গলি, ঠ্যাং ভাঙা রোড, এ্যাকসিডেন্ট এভিনিউ কোথাও বাদ নাই। কোথাও আবার রাস্তার দুই ধারে দুইটি পূজা, এই পূজাগুলির উদ্যোক্তা বারো-ইয়ারী কমিটি। কি বিচিত্র ইহাদের গঠন পদ্ধতি। মিলিটারী অর্গানাইজেশনকেও হার মানায়। টাকা না হইলে পূজা হয় না। তাই কমিটীগুলির শীর্ষস্থান আলো করিয়া থাকেন কালো বাজারী, তাঁহাদের পরেই থাকেন রাজনৈতিক এ্যাপ্রেন্টিস, ইহারা অবশ্য সংখ্যায় বেশী। বারোয়ারী কমিটি, লাইব্রেরী কমিটি, স্কুল কমিটিতে মাতব্বরীর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইহারা ভবিষ্যৎ জীবনের বনিয়াদ পাকা করেন। খবরের কাগজওয়ালারাও বাদ পড়েন না। ছবি ও নাম ছাপাইবার জন্য ইহাদেরও হাতে রাখা প্রয়োজন। যাহাদের ডাকিতে হয় না, নিজেরাই কমিটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়েন তাঁহারা হইলেন সুযোগ সন্ধানী, পূজা উপলক্ষ্য করিয়া ইহারা সংগ্রহ করেন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের পাসপোর্ট। এইরূপে বহু ধুরন্ধর দিকপাল, মহারথী ও রথী লইয়া বারো-ইয়ারী কমিটির ব্যূহ রচিত হয়।

ইহাদের লক্ষ্য হইল উৎসব, উপলক্ষ্য হইল পূজা। তাই বোধনের দিনেও দেখা যায় মণ্ডপগুলি সামিয়ানায় অবগুণ্ঠিত। ডেকরেশন ও দেব-দেবীর ড্রেসিং রাত্রে সুরু হইবে, সন্ধ্যার পর কর্মীর দল এক এক করিয়া আসিতে লাগিলেন। যজ্ঞ-সজ্জা সুরু হইল, আয়োজনের ত্রুটি নাই। কেটলিতে চা আসিতেছে, বিস্কুট পানও আছে, আর আছে অফুরন্ত সিগারেট; গ্রামোফোনে গান বাজিতেছে—"মেরে জান লুট লিয়া," মাঝে মাঝে হৈ হল্লা ও চিৎকার। মা ধীরে ধীরে জাগিতেছেন! সকালে আসিয়া লোকে দেখিবে—কাল কি ছিল আর আজ কি হইয়াছে…কোথাও নিয়ন ল্যাম্পের সাহায্যে জগজ্জননী মহামায়া অসুর নিধন করিতেছেন। বোধহয় দুর্মূল্যের ঠেলায় পড়িয়া শক্তির মূলাধার মা আমার শক্তিহীনা হইয়া পড়িয়াছেন, ইলেক্ট্রিকের সাহায্য না লইলে দুর্দান্ত অসুরকে নিধন করা শক্ত। কোথাও লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্তি আধুনিকাদেরও লজ্জা দেয়, দেবসেনাপতি কার্তিকের বাটারফ্লাই গোঁফ ও জামাই জামাই মূর্তির মধ্যে অনেক তরুণ তাঁহাদের আদর্শ খুঁজিয়া পান। সাম্যবাদের মহিমা উপলব্ধি করিয়া সকলে এক বর্ণ ধারণ করিয়াছেন। কোথাও এক একটি খোপের মধ্যে এক একটি মূর্তিকে দেখিয়া মনে হয় বুঝি বা দেবলোকে যৌথ পরিবার অচল হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে বহু বিনিদ্র রজনীর পরিকল্পনা রূপ ধারণ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সাজ-সজ্জা যখন শেষ হইল তখন সকাল হইয়া গিয়াছে। ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ লইয়া কর্মীর দল একে একে বিদায় লইলেন।

সকাল হইতে না হইতে বালক-বালিকার দল আসিয়া জুটিতে লাগিল। পুণ্যলোভাতুরা বৃদ্ধার দল পূজার জন্য কিছু কিছু ফুল দিয়া যাইতে লাগিলেন। যথাসময়ে

পুরোহিত মহাশয় আসিয়া পড়িলেন। পূজার কোন আয়োজনই তখন হয় নাই। এদিকে পূজার লগ্ন অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। পাড়ার কয়েকটি বৃদ্ধ লোকের তাগিদে পুরোহিত মহাশয় বেগতিক দেখিয়া কয়েকটি ফুল লইয়াই ঘণ্টা নাড়া সুরু করিলেন। সকলে আশ্বস্ত হইল, যাক্, পূজা সুরু হইয়া গিয়াছে। পাড়ার মাসী-পিসিদের ধরিয়া আনিয়া পূজার আয়োজনে বসান হইল। পুরোহিত মহাশয় দেখিলেন—গোময় গোমূত্র আনা হয় নাই। তাঁহার রসজ্ঞানের কিছু অভাব ছিল, তাই যখন একজন কর্মীকে একথা জানাইলেন তখন উত্তর আসিল, "পুরুত মশাই, কলকাতায় কি আর গরু আছে? সব যে হরিণঘাটায়, আপনি গঙ্গাজলে কাজ সেরে নিন।" পুরোহিত মহাশয়ের শুভ বুদ্ধির উদয় হইল। উপকরণের যাহা অভাব পড়িয়াছে গঙ্গাজলে তাহা পূর্ণ করিয়াছেন।

পূজামণ্ডপে সারাদিন যাঁহাদের পদচিহ্ন পড়ে নাই তাঁহাদের আবির্ভাব ঘটিতে লাগিল সন্ধ্যার কিছু পূর্ব হইতে। দর্শনার্থিনীদের ভীড় সুরু হইবে, জুয়াচোর পকেটমারদের হাত হইতে তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে। পাড়ার কোনরূপ বদনাম যাহাতে না হয় সেদিকে তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি, মণ্ডপের আশে-পাশে এক একটি ঘাঁটিতে আশ্রয় লইয়া তাঁহারা সকলের উপর কড়া নজর রাখিতে লাগিলেন।

সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী তিথি অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে বিদায় লইল। আসিয়া পড়িল বিজয়া। কিন্তু মাকে বিদায় দিতে কোন্ মাতৃভক্ত সন্তানের প্রাণ চায়? এত শীঘ্র মায়ের যাওয়া হইবে না। মা মূক পূজামণ্ডপে পড়িয়া রহিলেন, যাত্রার তাড়া আসবে কে বা কাহার খোঁজ রাখে! এইভাবে কয়েকদিন কাটিল। তারপর একদিন আবার মরা গাঙে বান আসিল। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। লরী আসিয়াছে, জেনারেটার আসিয়াছে, এম্‌প্লিফায়ার আসিয়াছে। আজ মহাসমারোহে মায়ের গঙ্গাযাত্রা। আলো, বাজনা ও বাজীর এক বিরাট বিপুল আয়োজন। হেবো গদা পঞ্চার দল আসিয়া পড়িয়াছে, পাগল জুটিয়াছে, মাতালও বাদ যায় নাই কাহারো পরনে প্যাণ্টলুন, হাতে ছড়ি, মাথায় তালপাতা টুপী। কি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, কি বাঁধভাঙ্গা উল্লাস মাকে বিদায় দিবার কি অভিনব আয়োজন! তাসপার্টি ব্যাণ্ডপার্টি নহবৎ ও ঢাকিঢোলের আওয়াজে গগনমণ্ড বিদীর্ণ হইতে লাগিল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য জানালায় লোক, বারান্দায় লোক, ছাতে লোক, রাস্তা লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অবশেষে ধীরে ধীরে মায়ের শেষ যাত্রা সুরু হইল!

রাস্তার একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। সাহি সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে পড়িল। কবি মিল্ট সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লেখা একটি লাইন বঙ্কিমচন্দ্রে বেলায় প্রয়োগ করিয়া মনে মনে বলিলাম "Tho shouldst be living at this hour"। তুমি জীবি থাকিলে আবার দেখিতে পাইতে "মা কি ছিলেন অ কি হইয়াছেন"!

এমারসন

।। জনাব রেজাউল করীম ।।

আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তাশীল লেখক মনীষী "এমারসন" ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত। তিনি ভারতের বেদান্তের আদর্শের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে তাঁর ভারত-প্রীতির পরিচয় পাই। Transcendentalism বা অতীন্দ্রিয়বাদ আদর্শের এমারসন ছিলেন অন্যতম ধারক ও বাহক। তিনি এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিভিন্ন দেশের বহু গ্রন্থ পাঠ করেন। তার মধ্যে ভারতের দর্শনের গ্রন্থাবলীও যে ছিল, তার প্রমাণ পাই তাঁর রচনার মধ্যে।

এমারসন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৮২ সালে। তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল দারিদ্র্যের মধ্যে। বহু কষ্টের মধ্যে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর ছিল প্রচণ্ড মেধাশক্তি, আর ছিল অতুলনীয় ধৈর্য। তাই কোন দুঃখ কষ্ট তাঁকে দমন করতে পারে নি। তিনি মেধা ও প্রতিভাবলে অনায়াসে হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি,এ পাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। এমন কি সরকারী চাকরীও গ্রহণ করেছিলেন। চার্চের বেদীতে উপবিষ্ট হয়েও কিছুদিন ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সে সময় ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা উচ্চভাবপূর্ণ। বোষ্টনগরের গির্জায় তিনি কিছু দিন প্যাষ্টোরের (pastor) কাজ করেন। সেই সময় ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে সন্দেহবাদ ও ধর্ম বিরোধী মনোভাব মানুষের মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলছিল। সে তরঙ্গ এমারসনকেও আন্দোলিত করেছিল। তার ফলে ধর্ম সংক্রান্ত বিবিধ প্রকার সংশয় ও সন্দেহের দ্বারা এমারসনের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাঁর মনের মধ্যে আরম্ভ হলো একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই ধর্ম ও পরের চাকরী এক সঙ্গে চলতে পারে না। বিশেষ করে সে চাকরী যদি ধর্ম-মন্দিরের সীমার মধ্যে নিদিষ্ট হয়। তিনি অবিলম্বে চাকরীতে ইস্তাফা দিলেন। ঠিক এই সময় তাঁর পত্নী বিয়োগ হ'ল। তখন এমারসন অত্যন্ত নির্জনতা অনুভব করতে লাগলেন। দুঃখ ভুলবার জন্য তিনি ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হলেন। তাঁর মনে হ'ল যেন তাঁর জীবনের সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। কোথাও শান্তি পেলেন না। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি তৎকালীন বহু সুধী-সজ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, কার্লাইল প্রভৃতি কবি শিল্পী ও মনীষীর সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করলেন। কিন্তু তবুও এমারসন তাঁদের নিকট কোন পথের দিশা পেলেন না। তাই তিনি অবশেষে স্থির করলেন যে তাঁর জীবন-দর্শন তিনি নিজেই আবিষ্কার করবেন। দুঃখ হতাশার ভিতর থেকে তিনি সগৌরবে প্রকাশিত হলেন দার্শনিক লেখক ও কবি রূপে।

ইউরোপ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে এমারসন নানা প্রকার প্রবন্ধ, সারমন বা উপদেশ মূলক রচনা লিখতে লাগলেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধাদির প্রত্যেকটি লাইন প্রজ্ঞা ও দর্শনের আলোকে আলোকিত। বিবিধ প্রকার রচনার মাধ্যমে তিনি জীবন-সমস্যার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর ছিল একটা ভাবালুতাপূর্ণ রোমান্টিক প্রত্যয়। তিনি "ইনটিউশন" বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি শক্তির উপর অধিকতর গুরুত্ব দিলেন। যে যুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ফলিত বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছিল এবং যে যুগে যুক্তিকেই জ্ঞানালোক প্রাপ্তির একমাত্র উৎস বলে মনে করা হত, সেই যুগে এমারসন বিশ্বাস

ও অন্তর্দৃষ্টির উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করলেন। তিনি মানব-চিন্তার ইনটিউশন বা প্রত্যক্ষ অন্তর্দৃষ্টির কার্যকারিতার কথা প্রচার করলেন। তিনি বলেন যে প্রত্যক্ষ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে যে জ্ঞানোপলব্ধি হয় তা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সম্ভব হয় না। তাই দেখি এমারসন ক্রমে ক্রমে মরমী সাধকের মত চিন্তা করতে লাগলেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, অপর দিকে জার্মান ও বৃটিশ চিন্তানায়কের অতীন্দ্রিয়বাদ আদর্শকে তিনি মর্মে মর্মে গ্রহণ করে নিলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে মানুষের জন্য যুক্তি একমাত্র পরিচালক হ'তে পারে না।

এমারসন ছিলেন অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জীবনের প্রধান শক্তি হচ্ছে ওভার সোল (over soul)। তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষের এমন একটি শক্তি আছে যার সাহায্যে সে ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করতে পারে। এবং মহৎ চিন্তা ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। প্রচলিত খৃষ্টান-সমাজ ত্রিত্ববাদে (Trinity) বিশ্বাস করেন। কিন্তু এমারসনের ধর্ম-বিশ্বাস অন্য রূপ। তিনি যিশু খৃষ্টকে স্বয়ং ঈশ্বর বলতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে যিশুখৃষ্ট পূর্ণ মানুষের চরমতম বিকাশ। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিরাজমান (Immanent)। এই ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সর্বমঙ্গলময় over soul। ওভার সোল হচ্ছে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি যা থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করে। এবং এই ভাবে মানুষ জ্ঞান লাভ করে। তাঁর মতে ঈশ্বরকে লাভ করতে হ'লে কোন মধ্যস্থতা, চার্চ পুরোহিতের প্রয়োজন নাই। মানুষের মধ্যে সর্বক্ষণ যে ঈশ্বর বিরাজমান আছেন তিনিই হচ্ছেন মানুষের ওভার সোল। যদি কোন মানুষ নিজের উপর নির্ভর ক'রে তবে তদ্বারা সে মূলতঃ ঈশ্বরের উপরই নির্ভর করে। এ সম্পর্কে তাঁর কতকগুলি উক্তি প্রণিধান যোগ্য—"নিজের উপর বিশ্বাস কর—সেই লৌহ সূত্রে প্রত্যেক হৃদয় স্পন্দিত হয়"—। "তোমার নিজের আত্মার বিশুদ্ধতা ও অখণ্ডতা ব্যতীত তোমার কাছে কিছুই অধিকতর পবিত্র বস্তু নাই।" এমারসন বলতেন যে "এই আত্ম নির্ভরতার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। সেই জন্য মানুষকে পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে। ঈশ্বর-জ্ঞান প্রত্যেক মানুষেরই আছে।" বস্তুতঃ এসব কথা একেবারেই নূতন নয়। তাঁর পূর্বে দার্শনিক প্রবর ইমানুয়েল কান্ট ঐ সব কথাই বলে গেছেন। এমারসন সেই একই কথাকে আরও জোর দিয়ে বলেছেন।

"ওভার সোল" সম্বন্ধে এমারসনের এই যে আদর্শ তার সঙ্গে ভারতের বেদান্ত ও উপনিষদের আদর্শের অনেক সাদৃশ্য আছে। তাঁর এই সব রচনা পড়ে মনে হয় যে তিনি ভারত-আত্মার পরম অর্থ লাভ করেছিলেন। একথা অনস্বীকার্য্য যে তাঁর যুগে বহু ভারতীয় গ্রন্থ আমেরিকায় প্রচারিত হয়েছিল। হুইটম্যান, থরো, এমারসন—এঁরা সকলেই কিছু না কিছু ভারতের দর্শন জানতেন। এবং কতকটা এই ভারত-দর্শন দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এমারসন যে এসব গ্রন্থ পড়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচনাবলী থেকে। "ব্রহ্ম" নামক তাঁর একটি সুন্দর কবিতা আছে। তাতে তিনি all-pervading over-Soul এর কথা বলেছেন। তাঁর এই কবিতাটি বেদান্ত দর্শনের ভাবে অনুপ্রাণিত। ভারতের দর্শনের একটি প্রধান কথা এই যে ঈশ্বরই সব কিছু। তিনি সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বব্যাপী, ও সর্বভূতে বিরাজমান। ভারতের দার্শনিক ও চিন্তাশীল লেখকগণের নিকট থেকে এমারসন পেয়েছেন প্রচুর আদর্শ। প্রাচীন যুগ থেকে, বেদের সময় থেকে যে সব সত্য জগতে প্রচারিত হয়েছে, সেই সব সত্যকে এমারসন নূতন পোষাকে রূপ দিয়েছেন তাঁর নানা নিবন্ধে।

প্যানথিজম বা সর্বেশ্বরবাদ আদর্শকে এমারসন মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। এই আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর দার্শনিক চিন্তার অনেকটা স্থান জুড়ে আছে অকৃত্রিম প্রকৃতি-প্রেম। তিনি যে সব পরিকল্পনা রচনা করেন তাতেও প্রকৃতির স্থান উচ্চে। শেক্সপীয়ারের নির্বাসিত ডিউকের মত তিনি তরু লতার মধ্যে উপদেশ পেতেন, প্রবহমান নদীতে পেতেন শিক্ষার গ্রন্থ, পাথরের মধ্যে শুনতে পেতেন

ধর্মোপদেশ। এবং প্রত্যেক বস্তুতেই দেখতেন মঙ্গলের আভাষ। তাঁর সবচেয়ে সুখী মুহূর্ত ছিল তখনই যখন তিনি মুক্ত উদার প্রকৃতির কোলে আপন মনখানি নিয়ে চিন্তা করতেন। বনের পরিবেশের মধ্যে তিনি আপনাকে বিস্তার করে দিয়ে প্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করতেন। তিনি প্রকৃতির নিকট বহু অসাধ্য প্রশ্নের উত্তর পেতেন।

এমারসনের জীবন-দর্শনের আর একটা বড় কথা এই যে তিনি ছিলেন চরম আশাবাদী। তিনি বলতেন যে মানুষের স্পিরিট হচ্ছে একটি পাখী, তার ডানা হচ্ছে আশা। এই আশাবাদের মধ্যে এমারসনের জীবন-দর্শনের আসল পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন: "The Soul always affirm in man an optimism, never a pessimism"। এর মর্মার্থ আত্মা মানুষের মধ্যে আশাকেই দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে; নিরাশাকে কখনই নহে। তাঁর আশাবাদী মন সব সময় গোলাপী রঙে রাঙায়িত থাকত। এই আশাবাদী মন নিয়ে তিনি অনেক সময় ঊর্ধ্বলোকে অবস্থান করতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর ছিল একটা সূক্ষ্ম বিচক্ষণতা ও বাস্তবতাবোধ। এই বাস্তবতাবোধ তাঁর অনন্ত যাত্রা পথে একটা ভারসাম্য রক্ষা করত। তাই তিনি শেলীর মত scorner of the ground ছিলেন না, বরং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত তিনি ছিলেন "True to the kindred points of Heaven and Home."

রাজনীতি ও সমাজ-কল্যাণমূলক বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। তাতে একজন চিন্তাশীল লেখকের পরিচয় পাই। তাত্ত্বিক দার্শনিকতাকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে একটা ভার সাম্য রক্ষা করে চলতেন বলে তিনি দর্শনের বহু প্রকার সমস্যার মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্য সন্ধান করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তিনি জীবন দর্শনের পাষাণ স্তূপ ভেদ করে বহু দূরে যেতে পেরে ছিলেন। প্রাচীন Seer বা তত্ত্বদর্শী সাধকদের মত এমারসন তাঁর ধর্মোপদেশের মধ্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট যুক্তি প্রদর্শন করেন নি—অন্তর থেকে উৎসারিত ভাবধারাকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এই ভাবে তিনি সব কিছুকে তাঁর সত্যের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেছেন। সেজন্য তাঁর কথাগুলি অনেক সময় প্রফেটিক্ (prophetic) হয়ে উঠেছে।

এমারসনের রচনার একটা সাহিত্যিক মূল্য আছে। সাহিত্যের অলঙ্কার হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কেবল চিন্তার মহত্ত্ব ও ঔদার্যের উপর নির্ভর করে না। সেই সঙ্গে তিনি এক একটা বাক্যকে মুক্তাতে পরিণত করেছেন। ইংরাজ লেখকদের মধ্যে ফ্রান্সিস বেকনের সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে।

দামাল ছেলে

।। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ।।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে,
আমরা সবে ভাই,
স্বামীজি আর কবিগুরু
মোদের মাঝে ঠাঁই।
দেশের তরে ত্যজে পরাণ,
ক্ষুদিরাম, কানাই;
আমাদের অগ্রজ তারা,—
আমরা ছোট ভাই।

প্রতিরোধে অন্যায়ে মোরা
আর না আও যাই;
যাবে যাউক এই পরাণ,—
ক্ষতির কিছু নাই।
জীবন, মরণ,—দু'টী দ্বার—
আসা ও যাওয়াই,
যাবার মতো যেতে পারবো,
এই তো মোরা চাই।

গানাৎ পরতরং নহি

॥ শ্রীসন্তোষ কুমার দে ॥

গানের উপর আর কথা নেই। শুধু দু'চারটি কথা, তাই নিয়ে যখন সুরের বর্ষা বইতে থাকে তখন মনে হয় যেন এখনও গঙ্গাবতরণ হয়। গঙ্গা নেমে আসেন সুরলোক থেকে মর্ত্যধামে, তাঁকে ধারণ করে মহাদেবের জটিল জটা, যার পাকে পাকে সুর-লয়-তালের জটিলতা কিন্তু সব ছাপিয়ে ঝরে পড়তে থাকে অমৃতরসের পুণ্য প্রস্রবণ। তাই কি গঙ্গার আর এক নাম সুরধুনী?

এ যুগের মহত্তম প্রতিভা রবীন্দ্রনাথেরও শ্রেষ্ঠ দান তাঁর অতুলনীয় গান।

একদিন মহাজাতি সদনে এক গানের জলসা বসেছে, ভারতের বড় বড় গায়ক-বাদক ওস্তাদ-পণ্ডিতেরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। সারা রাতের প্রোগ্রাম। আসর খুব জমেছে। যারা টিকিট পেয়েছে তারাই হল্ ভর্তি করে ফেলেছে। যারা টিকিট পায় নি, তারাও ভিড় করে হলের বাইরে রাস্তা জুড়ে বসে আছে। শীতের রাত, খোলা আকাশের নীচে হিম পড়ছে। তবু তারই মধ্যে চিত্তরঞ্জন এভেনিউ-এর পিচঢালা পথের উপর, কংক্রিটের ফুটপাথের উপর, ঘাসে ঢাকা ছোট্ট ফালি ফালি জমির উপর, রেলিং-এর উপর, গাড়িবারান্দার নীচে—যে যেখানে এতটুকু ঠাঁই পেয়েছে সেখানেই খবরের কাগজ, চটের থলে, খান ইট—যা পেয়েছে তাই পেতে বসে পড়েছে। গভীর রাতে এমনিতেই গাড়ি ঘোড়ার যাতায়াত কম, আর এখন তো পথের উপরেই শ্রোতার দল বসে পড়েছে—পুলিশ ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে উপস্থিত আছে কিন্তু তাদেরও অবস্থা একই রকম। গানের সুরে বাজনার তালে দুলছে সবাই। কে আর কোথায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে যায়—যে যেখানে আছে দাঁড়িয়ে বসে গান শুনছে।

এমন সময় দক্ষিণ হতে একখানা গাড়ি এলো। নিশুতি রাত, এমন সময় কে এলো আবার এ পথে? যদি শ্যামবাজার যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তার জন্য কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট আছে, সার্কুলার রোড আছে, চিৎপুর রোড আছে—সব ফেলে এই মহাজাতি সদনের সুমুখ দিয়ে যাওয়ার আগ্রহ কেন? কেউ নড়েও বসতে রাজি নয়।

ড্রাইভার হর্ন দিতে চায়, আরোহী বারণ করেন। কর্কশ শব্দ কোরো না, কান পেতে শোন, প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। এখানে কি হর্ন দিতে আছে? হসপিট্যালের সুমুখের পথে নোটিশ জারি থাকে—"এখানে হর্ন দেওয়া নিষেধ"। কিন্তু গানের মজলিসের সুমুখে তেমন কোনও নোটিশ দেওয়ার রেওয়াজ নেই। থাকলে কেমন হয়? স্থায়ী নোটিশ নয়, কেবল অধিবেশন চলাকালীন নোটিশটা জারি করে রাখা এবং কড়া দৃষ্টি রাখা, যাতে কেউই সে আদেশ অমান্য না করেন।

আরোহী অত্যন্ত বিবেচকের মত মোটরের হর্ন বাজানো বন্ধ রাখলেন তাই নয়, নিজে নেমে এলেন। একটু বেঁটে মানুষটি; মাথায় বাবরি চুল, গায়ে শেরওয়ানি। বললেন, তিনি মহাজাতি সদনের ভিতরে যেতে চান।

মন্দ বায়না নয়—টিট্‌কারি দেয় কি কেউ? তিল ধারণের স্থান নেই মহাজাতি সদনে, তাই না তারা এই শীতের রাতে খোলা আকাশের তলায় রাস্তার উপর বসে আছে। আর ইনি কিনা গাড়ী হাঁকিয়ে এসে বলছেন,—'অন্দরমে যানা হ্যায়।' যানা হ্যায় তো আগাড়ি কাঁহে নহি আয়া হ্যায়? কেউ পথ ছেড়ে দিতে চায় না।

তিনি তখন বললেন,—তবে আমাকেও এখানে বসতে হয়, আর তাতে আমার নিজের কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু আসরের প্রোগ্রামটা মাটি হবে। ওঁকারনাথ ঠাকুরের গানটা শোনানো যাবে না।

হাঁ ?—দৃষ্টি পড়লো সবাই-র। আরে তাইতো। আলো আঁধারিতে ঠাহর হয়নি, তার উপর অন্যান্ চোখে সবাই গীত রসাস্বাদনে মত্ত থাকায় মন যায়নি এই আগন্তুকের দিকে। এ যে পণ্ডিত ওঁকারনাথ ঠাকুর স্বয়ং। মুহূর্তে সাড়া জাগল, ভিড়ের ভিতর সরু পথ তৈরী হয়ে গেল—"আইয়ে পণ্ডিতজী, আইয়ে"।

পণ্ডিত ওঁকারনাথ অতি আনন্দের সঙ্গে তাঁর এই চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা বললেন গানের আগেই। কলকাতার তাঁর গানের সমঝদার ব্যক্তিদের নিকট তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদেরই অনুরোধে গান ধরলেন—"যোগী, মৎ যা।"

যোগী যেও না, ক্ষণেক দাঁড়াও, তুমি যেওনা।

সে কি গান। যাঁরা তা না শুনেছেন তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না। স্বরের গমকে, বাজনায়, মূর্চ্ছনায়, আর্তিতে, স্ফূর্তিতে—স্পষ্ট মনে হতে লাগল—যোগী যেতে যেতে যেন ঐ আহ্বান শুনে ফিরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে অদূরে দেখা যাচ্ছে। তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য, যেতে না দেবার জন্য সাধকের আবেগময় কণ্ঠে যে আর্তি প্রকাশ পেতে লাগল তাতে সহস্র সহস্র শ্রোতার হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল।

সম্রাট আকবর মিঞা তানসেনের গান শুনে বিমুগ্ধ, শুনে শুনে তার যেন আশা মেটে না। তানসেন খুশী হন কিন্তু মনে মনে সত্যই একটু কুণ্ঠা না জেগে পারে না। কোন মহৎ শিল্পীই তাঁর নিজ সৃষ্টিকে সর্বাঙ্গসুন্দর মনে করেন না, তাঁর কাছে মনে হয়—ঠিক যা দিতে চাইছেন তার সবটুকু যেন ফোটাতে পারছেন না, "ভালো হত আরও ভালো হলে।" সাধারণ রসজ্ঞ ব্যক্তি যেটুকু পেয়েছে তাতেই 'আহা মরি' 'আহা মরি' করছে। মহৎ শিল্পীর মনে তাতে আরো সঙ্কোচ বোধ জাগে।

তানসেন তাই সাহস করে আকবরকে একদিন বলেই ফেল্লেন, আমার এ গান আর কি! গান যদি শুনতে হয় তবে শুনবেন আমার ওস্তাদের গান। মনে হবে মন এই পৃথিবীর পরিমণ্ডল হতে ঊর্ধ্বে আর কোনও গ্রহে গমন করেছে।

আকবর বল্লেন, পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে ডাকো তোমার ওস্তাদকে।

তানসেন বল্লেন, তিনি সন্ন্যাসী, তিনি তো রাজসভায় আসবেন না, গাইবেনও না। তাঁর গান শুনতে হলে তাঁর কাছেই যেতে হবে, যেতে হবে সাধারণ বেশে, একজন সাধারণ নাগরিক হয়ে। তিনি আপনার জন্যেও গাইবেন না। তিনি গাইবেন তাঁর ইষ্টদেবতার প্রীত্যর্থে, আমরা শুধু নিঃশব্দে শুনে সেই গীত-অমৃতের প্রসাদ পেয়ে আসব।

হরিদাস গোস্বামীর আশ্রমের শান্ত পরিবেশে নিজ পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখে আকবর সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনে বুঝতে পারলেন তানসেন কেন এই গান শোনাবার জন্য সম্রাটকে গোপনে নিয়ে গিয়েছিলেন। হরিদাস গোস্বামীর গান তো কারো ফরমায়েসে গাওয়া নয়, কোন রাজ সভায় সভাসদদের বাহবা কুড়াবার জন্যও নয়। সে গান হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হতে স্বতোৎসারিত আত্মনিবেদন, ইষ্টের নিকট সাধকের দীন আর্তি প্রকাশের পরম প্রয়াস। বস্তুত তা সাধনারই অঙ্গ।

ভারতীয় দর্শনে সঙ্গীতের এই গভীরতার দিকটি শুধু যে স্বীকৃত হয়েছে তাই নয়, অতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দুধর্মের বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত সাধন পদ্ধতির মধ্যে সঙ্গীতের একটি সুস্পষ্ট স্থান আছে। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নাম সঙ্কীর্ত্তনের মত সর্বজনপ্রিয় ও সর্বজনগ্রাহ্য গীতধারা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। য়ুরোপীয় খৃষ্টধর্মের যে 'ক্যারল' গান প্রভৃতি আছে তাও গীর্জার মধ্যেই গীত হয়। কিন্তু নগর সংকীর্ত্তন যখন খোলকরতাল নিয়ে বের হত, তা যে বর্তমান দিনের মিছিল ও রাজনৈতিক ধুয়াধারী জনতার চেয়েও বেশী উন্মাদনা সৃষ্টি করত তাতে সন্দেহ নেই। মনে হত পশু পাখী তৃণ লতা সবাই সেই সঙ্কীর্ত্তনে অংশ গ্রহণ করছে। তাতে যোগ দিতেই আসত বেশী লোক, বাধা দিতেও যে কেউ আসত না তা নয়। জগাই-মাধাই-এর কাহিনীতে তার বিবরণ ও পরিণতি উক্ত আছে।

উপাসকদের গান কালী কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভজন গীত প্রভৃতি জনজীবনেও যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রমাণ পাই আমাদের সঙ্গীত-গুরুদের জীবন আলোচনা করলেই। সঙ্গীতের মাধ্যমেই দেখা যায় ধর্মের সীমাবন্ধন ছাপিয়ে সুরের প্লাবন গায়ক এবং শ্রোতা সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। তাই তো দেখি ওস্তাদ আলাউদ্দীন কালীকীর্তনের ভক্ত আর ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর কণ্ঠে সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে আশ্চর্য সুন্দর গান ‘হরি ওঁ তৎ সৎ।”

সহজ সুন্দর

।। শ্রীশান্তশীল দাশ ।।

এ মন বৈরাগী নয় : পৃথিবীর আলো রঙ ঘ্রাণ
সব কিছু নিয়ে খুশি হতে চায় এই মন প্রাণ।
একটি সহজ সুর, মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়া
ঝড় যদি বয়ে যাক, সেই সুরে থাকে যেন ছাওয়া
খুশি-ভরা সেই নীড়; না থাক সেখানে ঝলমল
অনেক আলোর ভিড়, নানা সুরে কল কোলাহল।
একটি মন্থর গতি, আলোছায়া-ঘেরা চারিপাশ,
সুমিষ্ট মধুর হাসি, ছোট সুখ দুঃখে বহমান
কেটে-যাওয়া দিনগুলি; এই মাটি, একেই আশ্রয়
ক'রে এর পানে চেয়ে হয়ে যাক্ এ জীবন ক্ষয়।
সেই ভালো। বৈরাগীর উদাসীন উত্তরীয় দিয়ে,
সব কিছু অস্বীকার করে, শুধু নিঃসঙ্গ তিমিরে
দিন গুণে গুণে চলা—সে-জীবন চায়না এ মন,
অনেক অসার স্বপ্ন, আঁধারের মাঝে বিচরণ।
সুখ-দুঃখ, আলো-ছায়া কান্না-হাসিতে প্রাণ ভ'রে,
সব পেয়ে, সব নিয়ে, দেখে শুনে অনুভব ক'রে
এ জীবন হতে চায় সাধারণ সহজ সরল
প্রভাতের আলো লেগে ফুটে-ওঠা একটি কমল।
তারপর আসুক না শেষ দিন; সকল দিনের
মত তাকে মেনে নিয়ে, হাসিমুখে জমা-খরচের
খাতাখানি ফেলে রেখে, শেষ করে পাওনা ও দেনা
এ পারের, চলে যাব; গরমিল কোথাও রবে না।

স্বর্গের সিঁড়ি

(একাঙ্কিকা)

।। শ্রীমন্মথ রায় ।।

[পুরাকাল। পুরীর সমুদ্রতীর। সূর্যাস্ত আসন্ন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।]

ব্রহ্মা। বিশ্বকর্মা রচিত জগন্নাথদেবের সদ্যসমাপ্ত আশ্চর্য এই মন্দির দর্শন করে আমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।

বিষ্ণু। বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে এই মন্দিরে বাস করতে আমার বাসনা হচ্ছে।

মহেশ্বর। আমার হচ্ছে হিংসা। কৈলাসেও আমার এমন কোন মন্দির আজও নির্মিত হয়নি, ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা। বিশ্বকর্মার কেমন অদ্ভুত প্রেরণা, তেমনি অদ্ভুত সাধনা।

বিষ্ণু। কৃতিত্ব শুধু বিশ্বকর্মার নয়। সমস্ত ভারত থেকে নির্বাচিত শিল্পীর দল বিশ্বকর্মাকে যে ভাবে সাহায্য করেছেন তাতে তাঁদের প্রতিভা আর নিষ্ঠা দুই-ই পরিস্ফুট হয়েছে এই আশ্চর্য মন্দির রচনায়।

মহেশ্বর। বিশ্বকর্মার এই সার্থক শিল্পবাহিনী নতুন এক স্বর্গ রচনাতেও বোধহয় আজ সক্ষম।

[দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ]

ইন্দ্র। পিতামহ ব্রহ্মা, বিশ্বপাল বিষ্ণু এবং মহাকাল মহেশ্বর! একটি চরম বিপদ সংবাদ বহন করে এনেছি আমি।

সকলে। কী? কী দুঃসংবাদ দেবরাজ ইন্দ্র?

ইন্দ্র। আপনাদের সাধের সৃষ্টি আজ রসাতলে যেতে উদ্যত।

ব্রহ্মা। প্রকাশ কর দেবরাজ! কী চরম বিপদের সম্মুখীন আমরা?

ইন্দ্র। বিশ্বকর্মা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

বিষ্ণু। সে কি! কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ?

ইন্দ্র। বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন আমার বিরুদ্ধে।

মহেশ্বর। সুতরাং সমগ্র দেবতামণ্ডলের বিরুদ্ধে তাঁর এই বিদ্রোহ! কী দুঃসাহস?

ইন্দ্র। জগন্নাথদেবের সদ্য সমাপ্ত মন্দির দেখে আমরা বিস্মিত, মুগ্ধ। আমি বিশ্বকর্মাকে আদেশ করলাম, এই মন্দিরের দর্পচূর্ণ করে তোমাকে নির্মাণ করতে হবে দ্বিতীয় এক মন্দির—ইন্দ্রমন্দির। আমাদের অমরাবতীতে।

ব্রহ্মা। অস্বীকার করেছে বিশ্বকর্মা?

ইন্দ্র। না, ঠিক অস্বীকার করেনি, কিন্তু এতে সে যে প্রস্তাব করছে তা মারাত্মক।

বিষ্ণু। বটে? কী তার প্রস্তাব?

ইন্দ্র। ঐ বিশ্বকর্মা এসে গেছে। তার নিজ মুখেই শুনুন কী সংঘাতিক সেই প্রস্তাব।

[বিশ্বকর্মার প্রবেশ]

বিশ্বকর্মা। দেবলোকের জয় হোক।

ইন্দ্র। দেবলোকের জয় সাধন হোক, আজ তোমার কাম্য বিশ্বকর্মা।

বিশ্বকর্মা। দেবরাজ ইন্দ্র আমার প্রতি অনর্থক রুষ্ট হচ্ছেন দেবতামণ্ডল।

বিষ্ণু। জগন্নাথদেবের এই অপূর্ব মন্দিরের গর্ব খর্বকারী এক ইন্দ্র-মন্দির গঠনে তুমি কি সম্মত নও, বিশ্বকর্মা?

বিশ্বকর্মা। সম্মত। শিল্পীর সাধনাই হচ্ছে নতুন সৃষ্টি দ্বারা পূর্ববর্তী সৃষ্টির মহিমা ম্লান করা। দেবরাজের প্রস্তাব এই ইন্দ্র-মন্দির নির্মিত হবে

অমরাবতীতে। গোল বেঁধেছে ঐখানেই।

মহেশ্বর। কেন? অমরাবতী কি এরূপ মন্দির নির্মাণের পক্ষে অনুপযুক্ত?

বিশ্বকর্মা। না।

ব্রহ্মা। তবে?

বিশ্বকর্মা। জগন্নাথদেবের মন্দির রচনার পরিকল্পনা আমার। কিন্তু সে পরিকল্পনা রূপায়িত করেছে পুণ্যভূমি ভারতের শিল্প-প্রসিদ্ধ অঞ্চল থেকে সু-নির্বাচিত এক প্রতিভাধর শিল্পীদল। অমরাবতীতে ইন্দ্র-মন্দির রচনা করতে হলে আমার শিল্পী শিষ্যদের সাধনা ও সাহায্য অপরিহার্য।

ব্রহ্মা। হুঁ! অমরাবতীতে ইন্দ্র-মন্দির নির্মাণ সম্ভব নয় কি বিশ্বকর্মা দেব-শিল্পীদের সাহায্যে ও সহযোগিতায়?

বিশ্বকর্মা। না, পিতামহ! মর্ত্যের মাধুরী, মৃত্যুর মহত্ব পরিস্ফুট হবে না কখনও দেব-শিল্পীর শিল্প কার্যে।

বিষ্ণু। দেব-শিল্প সৃষ্টির এক চরম বিস্ময়, বিস্মৃত হয়ো না বিশ্বকর্মা!

বিশ্বকর্মা। অস্বীকার করছি না, ভগবান বিষ্ণু। কিন্তু জগন্নাথদেবের মন্দির-সৌন্দর্যকে পরাজিত করতে হলে, মানুষের মনের সুষমায় উদ্ভূত শিল্প চাতুর্য একান্ত আবশ্যক।

মহেশ্বর। বিশ্বকর্মার এই উক্তি আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। ঐ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই মানুষকে বিকশিত হয়ে উঠতে হয় রূপে, রসে, বর্ণে ও গন্ধের শতদলে। সীমিত আয়ুর মধ্যে বিরাট সৃষ্টির রহস্য এবং যাদু আয়ত্ত করেছে একমাত্র মানুষ। মৃত্যুর ভ্রূকুটি সামনে রয়েছে বলেই মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে এত অপরূপ।

বিশ্বকর্মা। তাই দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আমার পুনরায় সশ্রদ্ধ প্রস্তাব, আমার এই ভারত বিখ্যাত শিল্পী শিষ্যদল যে স্বর্গের সিঁড়ি রচনা করতে উদ্যত হয়েছে, আগে তা হোক সুসম্পন্ন। তার পরেই ঐ সিঁড়িপথে আমি স্বর্গে নিয়ে যেতে পারবো মর্ত্যের মানুষদের, মর্ত্যের শিল্পীদের।

ইন্দ্র। তবেই বুঝুন পিতামহ ব্রহ্মা, লোকপাল বিষ্ণু, মহাকাল মহেশ্বর, কী সাংঘাতিক এই প্রস্তাব।

বিষ্ণু। স্বর্গের সিঁড়ি! স্বর্গ মর্ত্যের ভেদাভেদ হয়ে যাবে দূর?

ব্রহ্মা। ইহকালের পর কালের ব্যবধান যাবে ঘুচে?

মহেশ্বর। জন্ম-মৃত্যুর রহস্য হয়ে যাবে ভেদ?

দেবগণ। (একসঙ্গে) অসম্ভব!

ব্রহ্মা। এই সিঁড়ির রচনা কার্য কি সুরু হয়ে গেছে বিশ্বকর্মা?

বিশ্বকর্মা। হ্যাঁ, পিতামহ ব্রহ্মা।

বিষ্ণু। রচনা-কার্যে আত্মনিয়োগ করেছে কারা?

বিশ্বকর্মা। জগন্নাথদেবের মন্দির রচনাকারী আমার শিল্পী-শিষ্যদল।

মহেশ্বর। তারা সবাই মানুষ?

বিশ্বকর্মা। হ্যাঁ, মহাকাল মহেশ্বর, তারা সবাই এ মাটিরই মানুষ। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রে শিল্পী তারা। উৎকল, গৌড়বঙ্গ, মদ্র, কর্ণাটি কাঞ্চী, কেরল, কাশ্মীর, সিন্ধু অঙ্গ—ভারতে প্রায় সব রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মহামিলনে রূপায়িত হচ্ছে স্বর্গের সিঁড়ি নির্মাণের অভূতপূ পরিকল্পনা।

ব্রহ্মা। আমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, শুনে আবার আমা রোমাঞ্চ হচ্ছে।

বিষ্ণু। আমি ভাবছি, স্বর্গ আর স্বর্গ থাকবে না আর আমরা—আমরাই থাকবো কিনা জানে?

মহেশ্বর। মাটির মানুষের সঙ্গে স্বর্গের দেবতার এ যোগাযোগে মানুষ হারাবে তার মনুষ্যত্ব, দেবত হারাবে তার দেবত্ব।

ইন্দ্র। রাখুন আপনাদের দার্শনিক তত্ত্ব। এই সে

নির্মাণ প্রকৃত পক্ষে দেবতার বিরুদ্ধে মানুষের দুঃসাহসিক অভিযান। এবং দুঃখ এই, এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বকর্মার নেতৃত্বে।

ব্রহ্মা। দেবরাজ ইন্দ্র, তুমি যথার্থ বলেছ। এই আত্মঘাতি অভিযান থেকে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও, এই নবশিল্পীদের সংস্রব তুমি অবিলম্বে ত্যাগ কর বিশ্বকর্মা।

বিশ্বকর্মা। ত্রিভুবনের শিল্প এই সেতু রচনায় পৌরোহিত্য একবার যখন আমি গ্রহণ করেছি, সে পৌরোহিত্য ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় নয় পিতামহ ব্রহ্মা।

বিষ্ণু। এই কি তোমার শেষ কথা বিশ্বকর্মা।

বিশ্বকর্মা। হাঁ, ভগবান বিষ্ণু।

মহেশ্বর। দেবতা হয়ে দেব-স্বার্থ তুমি অনিষ্ট করতে বদ্ধপরিকর বিশ্বকর্মা?

বিশ্বকর্মা। আমি নিরুপায়, মহাকাল মহেশ্বর।

ব্রহ্মা। আমি বিস্মিত হচ্ছি দেখে যে, পৃথিবীর শিল্পীরা দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মার উপর মায়াজাল বিস্তার করে তাঁর শিল্পজ্ঞানকে এমন কলুষিত করতে পেরেছে।

বিশ্বকর্মা। পিতামহ ব্রহ্মার দৃষ্টিশক্তি যদি এখনও বার্ধক্যজনিত দৌর্বল্যে নিষ্প্রভ না হয়ে থাকে, তবে তাঁকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নবশিল্পীদের অনুপম কলাকৌশল নিরীক্ষণ করতে।

ব্রহ্মা। আমি প্রস্তুত। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন শিল্পকলা পরীক্ষা করে দেখার মতন পর্যাপ্ত সময় নেই আমার হাতে। এদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? বা কোন্ রাষ্ট্রের শিল্পকলা শ্রেষ্ঠ?

বিশ্বকর্মা। এর উত্তর দিতে আমি অক্ষম, পিতামহ ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা। কেন? তোমার শিল্পগণ কী সকলেই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে?

বিশ্বকর্মা। আপনার অনুমান সত্য, পিতামহ ব্রহ্মা।

বিষ্ণু। কিন্তু তাদের এ দাবী সম্পর্কে তোমার কি অভিমত দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা?

বিশ্বকর্মা। আমি তাঁদের দাবী অস্বীকার করি না, লোকপাল বিষ্ণু। প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা স্বতন্ত্র এবং অনন্য।

ব্রহ্মা। (চিন্তা করিতে করিতে) হুঁ!

বিশ্বকর্মা। তা হলে পিতামহ ব্রহ্মা। আপনি চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবেন আসুন।

ব্রহ্মা। ক্ষমা কর বাপু। ঐ বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষা বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি বুঝি একমাত্র দেব-ভাষা।

বিশ্বকর্মা। নব শিল্পীদের কাছে দেবভাষা অজ্ঞাত নয়। দেব-ভাষাই হয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের, বিভিন্ন শিল্পীদের ভাব আদান-প্রদানের যোগ-সূত্র। আর তা হয়েছে বলেই দেব-শিল্পী আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই নবশিল্পীদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়।

বিষ্ণু। সাধু! সাধু! দেব-ভাষার কল্যাণেই তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিল্পীরা পরস্পরকে বুঝতে পারছে, বুঝতে পারছে তোমাকে এবং তুমিও তাদের বুঝতে পারছো?

বিশ্বকর্মা। এবং আপনারাও তাদের বুঝতে পারবেন এবং তারাও আপনাদের বুঝতে পারবে।

মহেশ্বর। দেব-ভাষার জয় হোক।

ব্রহ্মা। হ্যাঁ, দেব-ভাষার জয় হোক। এবং এই মুহূর্তেই আমি অভিশাপ দিচ্ছি, মর্ত্যবাসীরা এই দেব-ভাষা বিস্মৃত হোক—মর্ত্যবাসীরা দেবভাষা বিস্মৃত হোক।

বিশ্বকর্মা। ভগবান ব্রহ্মা! একি সর্বনাশ আপনি করলেন মানুষের।

বিষ্ণু। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, অভিশপ্ত হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিল্পীরা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষরা বিভিন্ন ভাষায় মগ্ন আর পরস্পরকে বুঝতে পারছে না।

মহেশ্বর। শুধু কি তাই? আমি আমার ত্রিনয়নে কি

দেখতে পাচ্ছি, ভালো ভগবান বিষ্ণু! বিভিন্ন রাষ্ট্রবাদীদের মধ্যে সুরু হয়ে গেছে বাগ্‌বিতণ্ডা নিজ নিজ ভাষায়—যে ভাষা অন্য রাষ্ট্রবাসী বুঝতে পারছে না। দেশ দেশ, বহুত দেশ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষায় গুণকীর্তন করছে, শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করছে এবং তাতে যে আত্মকলহের সৃষ্টি হচ্ছে—

বিশ্বকর্মা। স্বর্গের সিঁড়ি রচনার কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! একি সর্বনাশ হলো? যাই আমি ওদের বুঝিয়ে বলি, এ পথ সর্বনাশের পথ। স্বর্গের সিঁড়ি রচনার পথ এটা নয়, এটা নয়।

[ব্যাকুলভাবে প্রস্থান]

ইন্দ্র। মহাকাল, আপনার শূল নিক্ষেপ করে বিশ্বকর্মার গতি রুদ্ধ করুন।

ব্রহ্মা। আবশ্যক নেই দেবরাজ। কোনো আবশ্যক নেই। আমার অভিশাপে মানুষ দেশ-ভাষা বিভক্ত হয়েছে। বিশ্বকর্মার একটি কথাও মানুষের বোধগম্য হবে না।

বিষ্ণু। উপরন্তু বিশ্বকর্মা ভ্রান্ত হতে পারেন; এমন এই হচ্ছে আমার উদ্বেগ।

মহেশ্বর। যাক, ভাষা-অস্ত্রেই মানুষকে ধরাশায়ী করা গেল, শূলের আর প্রয়োজন হলো না।

ইন্দ্র। খুব রক্ষা পেলাম। স্বর্গের সিঁড়িটা যে আর রচিত হলো না, এতে আমরা খুব রক্ষা পেলাম। জয় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জয়! জয় লোকপাল বিষ্ণুর জয়! জয় মহাকাল মহেশ্বরের জয়!

যবনিকা

একটি বুক : অনেক প্রাণ

॥ শ্রীগোপাল ভৌমিক ॥

চিত্তকে প্রসন্ন কর, মুখে আন হাসি;
না হলে নালায় ডুবে শুধু ক্লেদ রাশি
ঘাঁটাঘাঁটি করা যদি করে তোল সার
তবে তার চেয়ে বড় থাকবে কি আর?
সকলেই চায় হাসি, আলো অনাবিল,
অথচ দরজা এঁটে ঘরে দিয়ে খিল
কেবল নিজেকে নিয়ে নাড়াচাড়া করি;
পৃথিবী হয় নি দামী তাই ক্ষোভে মরি।
প্রাণখোলা হাসি হেসে যারা পথ চলে
তাদের দেখলে মন ঈর্ষায় জ্বলে
আর সেই সাথে শেষ এ মুখের হাসি:
বাজে মনে নিরন্তর বেদনার বাঁশি।
প্রেম যদি থাকে মনে হাসি থাকে মুখে
হাজার প্রাণের তেজ থাকে এক বুকে।

সমাধান

॥ শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ॥

জীবনের ছন্দ আজ হারায়েছে মিল।
কিছুতে পাইনা খুঁজে পূর্বের বিশ্বাস।
যে ধরণী পূর্ণ ছিল রূপে রসে গানে
আজি সে ধূসর, রুক্ষ, নয়নের ত্রাস।
কোথায় মিলায়ে গেল আশা-সম্ভাবনা?
অতন্দ্র তীর্থ বুঝি পরিত্যক্ত, ম্লান।
দৃষ্টির অতীত হ'ল সৌন্দর্য কমল।
হৃদয় নিঙাড়ি উঠে বেহাগের গান।
বর্ণের ধর্মের দ্বন্দ্ব, বাক্যের সংঘাত,
নিন্দা, ক্ষোভ, ক্রূরতায় মিথ্যা-অভিলাষ
এই সভ্য পরিচয়। আর আছে শুধু
বিমর্ষ ব্যথায় ভরা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।
মধুর ধ্যানের রসে পূর্ণ পাত্র ভরি
প্রভাতের কোলাহলে যাইব পাসরি।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও নাটক—গিরিশচন্দ্র

॥ ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ॥

[১]

গিরিশচন্দ্র যে সময়ে নাটক রচয়িতার আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন বাংলা নাট্য সাহিত্যের শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত হইয়া যৌবনের সূচনা হইয়াছে। তাঁহার পূর্বে প্রতিভাবান্ নাট্যকারবৃন্দ বিভিন্ন নাট্যধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র আপন বৈশিষ্ট্যবলে সেই সব নাট্যধারাকে আরও পুষ্ট করিয়া অগ্রগতির পথে চালিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর মনে ধর্মনৈতিকতা এবং ন্যায় অন্যায় বিষয়ে যে স্থির ধারণা আছে, গিরিশচন্দ্রের আদর্শ ছিল তাহারই অনুগত। সেই কারণেই তাঁহার রচিত সামাজিক নাটকগুলির মধ্যেও এই সত্যটির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার সামাজিক নাটকের নানা পাগল বা পাগলিনী চরিত্রগুলি ইহার প্রমাণ। ইহা ছাড়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে সমসাময়িক সামাজিক চিত্রকে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তবে তাহা শুধু কলিকাতার সাধারণ গৃহস্থ ঘরের চিত্র। যেহেতু এই সমস্ত ঘরের নিরুপদ্রব ও গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে নাটকীয় উপাদান খুবই কম বিদ্যমান, সেইজন্য গিরিশচন্দ্র সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবনের যতরকম ব্যাঘাত এবং বিকৃতি ঘটিতে পারে, তাহাদের সকলকেই তাঁহার নাটকের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। উপরন্তু কলিকাতার বাহিরের পল্লীজীবন তাঁহার নাটকে স্থান পায় নাই। কলিকাতার জীবনচিত্রের মধ্যে শুধু অন্তঃপুরিকাদের কথাবার্তার আভাস মিলে। পুরুষচরিত্রে বাস্তবতা নাই বলিলেই হয়; অবশ্য, অবান্তর ভূমিকাগুলিতে তাহা দুর্লক্ষ্য নয়। উত্তর-কলিকাতার ইতর-জীবন সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু ছিল এবং এই অভিজ্ঞতা তিনি ভালো ভাবেই কাজে লাগাইয়াছেন। এই সম্পর্কে অন্যত্র যাহা বলিয়াছি, তাহা এখানে উল্লেখ করিতে পারি। রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, এমন কি মাইকেল মধুসূদনেরও বাংলার সমাজের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা ছিল, গিরিশচন্দ্রের তাহা ছিল না। বাংলার সমাজ বলিতে গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র উত্তর কলিকাতা অঞ্চলের মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবী সমাজকেই চিনিতেন। দেশীয় কিংবা পাশ্চাত্ত্য কোন বিষয়ক কোন শিক্ষা সম্বন্ধেই এই সমাজ যেমন খুব অগ্রসর ছিল না, তেমনই বিশিষ্ট একটি নাগরিক জীবনের পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিবার ফলে ইহার মধ্যে বৈচিত্র্যও বেশী প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বাঙ্গালীর যথার্থ সামাজিক জীবন বাংলার পল্লীতেই তখনও বিরাজ করিতেছিল, সদ্য প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনে তাহার একটা সংহতিহীন ও কৃত্রিম পরিচয় মাত্র প্রকাশ পাইত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলার বিস্তৃত পল্লীজীবনের নিভৃত ছায়া-শীতল লোকে বাংলার যে জীবন আপন সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধতর, গিরিশচন্দ্র তাহার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহার সামাজিক নাটক কোন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ঘটনার অত্যধিক বাহুল্য অনেক সময় নাট্যরসের পক্ষে বিঘ্নকর এবং নাট্য-রসিকের পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছে। এই শ্রেণীর নাটকে কাহিনী রস, এমন কি চরিত্র থাকিলেও দ্বন্দ্ব নাই এবং দ্বন্দ্ব বলিয়া দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিও নাই।

[২]

গিরিশচন্দ্রের যেমন একটি সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক বোধ ছিল, পারিপার্শ্বিক বাস্তব সমাজ সম্পর্কে তাঁহার তেমন কোন বিশিষ্ট ধারণা ছিল না। বাস্তব পরিবেশের আলোচনা তিনি 'নর্দমা ঘাঁটা' বলিয়া মনে করিতেন। প্রয়োজনের অনুরোধে তাঁহাকে কয়েকখানি সামাজিক নাটক রচনা করিতে হইলেও, তিনি যে তাঁহার স্বাভাবিক

প্রতিভার সহজ প্রেরণায় তাহা রচনা করেন নাই, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার কয়েকজন মনীষী এ দেশের হিন্দু-সমাজ সম্পর্কে নানা দিক হইতে গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, তথাপি গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি সেদিকে আদৌ আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার প্রতিভা ছিল ভাবমুখী, বস্তুমুখী নহে; সেইজন্য সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে তিনি নির্দিষ্ট কোন মতবাদ প্রচার করিতে যান নাই। কয়েকটি সামাজিক বিষয় সম্পর্কে নাটক রচনা করিবার জন্য বন্ধু-বান্ধব ও কোন কোন সমাজ-সংস্কারক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যে কয়খানি নাটক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের কাহারও সঙ্গে তাঁহার রচিত পৌরাণিক নাটকের তুলনা হইতে পারে না; তাঁহার সামাজিক নাটক কয়খানি অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ হইয়া আছে।

ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াও দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সর্বপ্রথম আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম হইল। ভারতীয় হিন্দুর সামাজিক জীবনের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সমাজের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের মৌলিক বিরোধ আছে। আত্মবোধ লুপ্ত করিয়াই হিন্দুর সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সকল মনীষী সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুর সামাজিক আদর্শের এই মৌলিক তত্ত্বটি বিস্মৃত হইয়া এই দেশের সমাজের উপর পাশ্চাত্ত্য আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই দলের লোক ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রাচীন পন্থী; সেই জন্যই সমাজ সম্পর্কে তিনি নূতন করিয়া কিছু ভাবিয়া দেখিতে যান নাই। এক কথায় বলিতে গেলে প্রত্যক্ষ সমাজ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, তাঁহার লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক আদর্শ। সেইজন্য বাংলার সমাজ-জীবন হইতে যথার্থ রস তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের সামাজিক অভিজ্ঞতা ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। অনুভূতির দ্বারা ভাব-লোকের পরমতম ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে বস্তুলোকের রসের সন্ধান পাওয়া যায় না। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে গিরিশচন্দ্র ভাব-স্বর্গের বহু ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়া অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে বাংলার ধূলিমাটির উপর একখানিও খেলাঘর সার্থকভাবে রচনা করিতে পারেন নাই। কারণ, ধূলার জগতে স্বপ্নের প্রকার সীমাবদ্ধ।

কলিকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের কাহিনী লইয়া গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি রচিত হইয়াছে। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত গৃহের নিরুপদ্রব এবং গতানুগতিক জীবন যাত্রার মধ্যে নাটকীয় উপাদান খুব বেশি নাই। তথাপি বাংলার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে বিচিত্র নাটকীয় উপাদান বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, তাহাও নগণ্য নহে। ইহাদের যথার্থ ব্যবহার করিতে পারিলে যে বাংলা সাহিত্যেও উচ্চাঙ্গের সামাজিক নাটক রচিত হইতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা ব্যবহার করিবার পূর্বে নাট্যকারের এই বিচিত্র উপকরণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন। ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর মানব চরিত্রের জটিল রহস্য সম্পর্কে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যক্তি-চরিত্র সম্পর্কে আন্তরিক সহানুভূতি না থাকিলে সামাজিক নাটক রচনায় কেহ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না। বিশেষতঃ সামাজিক নাটক কেবল মাত্র ব্যক্তি-জীবনের বাহ্যিক ঘটনার উত্থান-পতনের বর্ণনা নহে, ইহার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন সমস্যা আছে, জীবনের গভীরতম স্তর হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া লইয়া সামাজিক কর্তব্যবোধ ও আত্মবোধের সঙ্গে তাহার সংঘর্ষ সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য। সামাজিক নাটকের সমস্যা কোন সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা নহে, অর্থাৎ সামাজিক নাটকে যে সকল সমস্যার অবতারণা করা হইয়া থাকে, তাহা বিধবা-বিবাহ, পণপ্রথা, মদ্যপান প্রভৃতির মত কোন সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা-বৈগুণ্য নহে, বরং বিশেষ কোন সামাজিক পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-চরিত্রের সুগভীর জীবন-সমস্যা। নরওয়ে দেশের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেনের A Doll's House নাটকখানির সহিত গিরিশচন্দ্রের যে কোন সামাজিক নাটকের তুলনা

করিলেই এই উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে। বাংলার বিচিত্রমুখী সামাজিক জীবনের বিচিত্র রূপ ও রসের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকিবার জন্য তাঁহার নাটকে ইহার কেবল একটি দিকেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা ইহার বহির্মুখী সমস্যার দিক। এই সমস্যাগুলির গুরুত্বে তাঁহার সামাজিক নাটকগুলি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির ব্যর্থতার পশ্চাতে রহিয়াছে সমাজ সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতার দৈন্য। নানা ছোট বড় অসঙ্গতি, অশান্তি, অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়াও জীবনের রস নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যে বিচিত্র রসের রামধনু সৃষ্টি করিতেছে—গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় দিতে পারেন নাই; সেই জন্য দেখা যায়, বাস্তব জীবনের প্রতি কোনও মমত্ব কিংবা কৌতূহল তিনি জাগাইয়া তুলিতে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। অথচ নাট্যকারের ইহাই প্রধান কর্তব্য। সেক্সপীয়র কিংবা কালিদাস এই বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করেন নাই বলিয়াই কালোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটকের এই একটি অতি বড় অভাব সহজেই অনুভব করা যায়। জীবন তো কেবল সমস্যার দিক নহে—ইহার একটি নিবিড় ভোগের দিকও আছে, এই ভোগের মধ্যে ইহার সৌন্দর্য ও রস অনুভূত হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে জীবনের এই ভোগের কথা নাই—বহির্বিক্ষোভের কথাই আছে। বহিরঙ্গণে যেখানে মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে, সেখানে গিরিশচন্দ্র লেখনী লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি অন্তঃপুরের দ্বার ঠেলিয়া সূক্ষ্ম হৃদয়-লীলার তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অথচ বিক্ষোভের ভিতর দিয়া তাহা নিবিড় হইয়া থাকে। যেখানে রসের নিবিড়তা নাই, সেখানে রিক্ততার হাহাকার দেখা দেয়। এই কারণে অভাবে সামাজিক রীতিনীতি, বিধিসংস্কার প্রভৃতির ঘূর্ণাবান আবর্তে সাধারণ নরনারীর জীবন কি ভাবে আবর্তিত হইতে থাকে, মানুষের ধর্মবোধ নীতিবোধের সহিত তাহার দুর্দম কামনা এবং দুর্বার প্রবৃত্তির কি রকম নিদারুণ সংগ্রাম অহরহ ঘনাইয়া তুলে, তাহার পরিচয় গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটকে দুর্লভ। সেই কারণেই তিনি এতগুলি বাংলা নাটক লেখা সত্ত্বেও একখানি সার্থক সামাজিক নাটক কিংবা প্রহসন রচনা করিতে পারেন নাই। যদিও সামাজিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি তিনি দীনবন্ধুর সৃষ্টিধর্ম আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার তীব্র অধ্যাত্মবোধ তাঁহার সামাজিক জীবন-দর্শনে দুরপনেয় বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। নাট্যকার যদি দার্শনিক হন, তাহা হইলে এই ত্রুটি নিতান্তই অপরিহার্য হইয়া উঠে।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিতে সমসাময়িক বাংলার সামাজিক সমস্যা, যেমন মদ্যপান, পণপ্রথা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির নিন্দা হইতে দেখিয়া কোন প্রসিদ্ধ সমালোচক ইহাদিগকে ইবসেনের সমাজ-সমস্যামূলক নাটকের সমতুল্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। কারণ, ইবসেনের নাটকে যে গভীর সমাজ চেতনা এবং প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুতীব্র বিদ্রোহ দেখা যায়, গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাহা নাই। তিনি তাঁহার সামাজিক নাটকে তৎকালীন সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন মাত্র, কোথাও সমস্যার অন্তস্তলে প্রবেশ করেন নাই, কেবল বাহিরের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। এই সকল সমস্যা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র নিজে যে সর্বদা দুশ্চিন্তা পোষণ করিতেন, তাহা নহে। কোন সামাজিক সমস্যাই তাঁহার চিত্ত কোনদিন অধিকার করে নাই; কারণ, তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, সামাজিক সমস্যামূলক বিষয় সম্পর্কে সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ যাহা ভাবিতেন, তাঁহার নাটকের মধ্যে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। এমন কি, তিনি অন্যকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও এই শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সামাজিক নাটক রচনার ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্রের সহজ প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ হয় নাই এবং ইহাই তাঁহার সামাজিক নাটকের ব্যর্থতার প্রধানতম কারণ। নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর বিশিষ্ট একটি অঞ্চলের বাহিরে বাংলার যে বিস্তৃত সমাজ আপনার

বিচিত্র রূপে ও রসে সেদিন সমৃদ্ধ ছিল, গিরিশচন্দ্র তাহার সঙ্গে কোন পরিচয় স্থাপন করিতে পারেন নাই। যে ক্ষুদ্র নাগরিক সমাজটির সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, তাহার বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যে নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য ছিল না বলিয়াই গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি বৈচিত্র্যহীন হইয়া রহিয়াছে—প্রায় এক রূপ বিষয়-বস্তুর মধ্যেই তাহা বার বার আবর্তিত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকেরও দুইটি প্রধান বিভাগ—নাটক ও প্রহসন; কিন্তু কোন পূর্ণাঙ্গ সামাজিক প্রহসন গিরিশচন্দ্র রচনা করেন নাই। তাঁহার প্রহসনগুলি তৎকালীন নাগরিক জীবনের নানা অসঙ্গতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্সা বা অতিরঞ্জিত চিত্র। তিনি ইহাদের অধিকাংশকেই 'পঞ্চরং' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সঙের নৃত্য দেখিলে যে শ্রেণীর হাস্যরস সৃষ্টি হয়, ইহাদের মধ্যেও অনুরূপ হাস্যরস সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা খুব উচ্চাঙ্গের বলিয়া অনুভূত হইবে না। গিরিশচন্দ্র তাঁহার সামাজিক ও রোমান্টিক নাটক রচনায় দীনবন্ধু মিত্রের অনুসরণ করিলেও দীনবন্ধুর অনবদ্য প্রহসনগুলির তিনি অনুসরণ করিতে পারেন নাই। সমাজ-জীবন সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ এই যে, দীনবন্ধুর যে ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সুগভীর সহানুভূতি ছিল, গিরিশচন্দ্রের তাহা ছিল না। বিশেষতঃ দীনবন্ধুর মত গিরিশচন্দ্রের মধ্যে হাস্যরসবোধও ছিল না।

রূপময়

॥ শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য ॥

প্রভু—
এ কী অপরূপ-রূপ দেখালে,
গগনে, পবনে, বনে, প্রান্তরে,
প্রদোষে, নিশীথে, সকালে।

যবে ঘুমভাঙা আঁখি
মেলে চেয়ে থাকি
তোমার উষার আকাশে—

কী রূপ বিকাশি
রবি ওঠে হাসি'
অরুণ দিনের আভাসে,

যেন লক্ষ কিরণে
হিরণ কিরীট
নব প্রভাতের কপালে—

মোর মুগ্ধ মন
ভাবে সারাক্ষণ
কী মন্ত্রে তারে জাগালে।

যবে সারা দিবসের ক্লান্তি বহিয়া
ফিরে আসি নীড়ে ঘরে গো,

হেরি অস্তরবির ম্লান আঁখি হতে
গোধূলি-অশ্রু ঝরে গো।

প্রভু, এ কী বেদন-ভরা নিশীথে
কোন্ বিরহীর বেদনার সুর
বাজাও নীরব বাঁশীতে,

মোর মর্ম গলায়ে কেন আঁখি ধারা
নয়নে অঝোরে ঝরালে—

ওগো রূপময়, চিরলীলাময়,
এ কী ভাবে মোরে ভরালে।

"এস পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ"

॥ **শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত** ॥

এস আর বার প্রভু প্রতীক্ষায় পৃথ্বী চেয়ে রয়
কায়মনোবাক্যে ডাকি তুমি ছাড়া কে আছে আশ্রয়
দেবকী ও বাসুদেবে বন্দী এবে করেছে অসুর
কংসাসুর দম্ভভরে ক্ষমতামত্ত হতে অতি ক্রূর।
এস তুমি এস অসুরারি
ত্রাস হারী গোবর্দ্ধনধারী
আর্ত পৃথিবী আজি ত্রাতা তোমারেই যাচে
চক্ষে তার বিভীষিকা নাচে।

দেবকীর ক্রোড় হ'তে যশোদার বক্ষে রাকা চাঁদ
আনন্দের বৃন্দাবনে আবির্ভূত শরীরী আহ্লাদ,—
মুরলী বাজায়ে হরি মুগ্ধ করি ব্রজের রাখাল
পাঞ্চজন্যে কুরুক্ষেত্রে কাঁপালে বিপক্ষ ফেরুপাল
কৃষ্ণ সর্প, তীক্ষ্ণ বিষ যার,
ভেঙে দাও বিষদন্ত তার,
বধ পাপ পরিত্রাণ সজ্জনে সংশয় ভয় হরি'—
এস সর্ব দর্পহারী হরি।

শিথিল শৃঙ্খলা আজি শৃঙ্খলিত সত্য সদাচার
ধর্ম কারাগারে বন্দী অসহ অধর্ম অনাচার
অণু অণু এ পৃথিবী স্বৈরাচার স্বৈরাচার নীতি
দুর্বলে নিগ্রহ করি সবলের বিদ্বেষ দুর্নীতি।
স্পর্দ্ধা তার স্পর্শিছে আকাশ
বাড়ে স্পৃহা করি সর্বগ্রাস
গর্বিতের সৌধ চূড়া আস্ফালিত স্ফীত অহঙ্কার
দরিদ্রের গৃহে হাহাকার।

ধর্ম নাই? ধর্ম আছে অধর্মের বর্ম গোপন করি,
অর্থ নাই? অর্থ আছে সহস্রাক্ষ কৃপণ প্রহরী,
অস্ত্র নাই? অস্ত্র আছে অসুরের অস্ত্রাগার ভরে,
শাস্ত্র নাই? শাস্ত্র আছে কপটের কূটনীতি তরে।
বীরের বিক্রম যার যত
ক্লৈব্য-প্রশ্রয় পায় তত
সুদর্শন চক্র ধরি এস হরি হরিতে ভূ ভার,
এস নরসিংহ অবতার।

পাঞ্চালীর কেশাকর্ষি বস্ত্রাঞ্চল টানে দুঃশাসন
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য ক্রীতবীর্য ধিক্কৃত জীবন,—
সিংহ সম পঞ্চ স্বামী বহে মৌন মেষের আচার
হত বাক্ হত বুদ্ধি এই কি ক্ষত্রিয় ব্যবহার?
কোথা কৃষ্ণ অগতির গতি
বিপদের এক মাত্র গতি
সমূলে নাশিতে পাপ পাতকীর সন্নিপাত লাগি,
দ্রৌপদীর বেণী বন্ধ লাগি।

সূর্যের নীচেই ছায়া আলোকের নিম্নে অন্ধকার
কী বিচিত্র লীলা তব দুর্বোধ্য বিধান দুর্বার!
আর্যের মর্যাদা লভি যদুগণ মত্ত হ'লে মদে
ধ্বংস করি নিজ বংশ সমাসীন সমাধির পদে।
তুলাদণ্ডে দণ্ডের নির্ণয়
নিরপেক্ষ সম ব্যবহার
দণ্ড দিয়ে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠিতে ধর্মাধিকরণ
এস পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৩১)

…৩টার পর আমি আফিসে যাই।…জীবনের সব ত্রুটি, সব ছিদ্র বন্ধ করিয়া প্রভু যদি না দাঁড়ান, তবে নিজের কি সাধ্য যে সে নিজের সাধনায়, নিজের চেষ্টায় সেই ছিদ্র বন্ধ করে! ছিদ্র বুজে জল আনা তখনই সম্ভব হয় যখন পুরুষোত্তম নিজে সে ছিদ্রে প্রবেশ করেন। 'যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যৎ ভবেৎ' এই শ্লোকটী আস্বাদনীয়। কে আমার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কথা বলিবার জন্য বসিয়া আছে? বড় বড় কথার যুগে ছোট আমার জীবন-কথা কেমনে বিকাইবে? কোনও দিন ভাল খাই নাই, ভাল পরি নাই। আজ শরীরের জন্য ভাল খাইতে পরিতে হইতেছে। লজ্জা করে। যাহা আমার নয়, তাহাই লোকের সামনে করিতে হইতেছে। আমি নিজের কাছেই একটা সমস্যা হইয়া উঠিতেছি। ইচ্ছা হয় সব কিছু ছাড়িয়া দিতে।…

২৪শে মার্চ

সকালে আফিসে যাই। সেখান হইতে আমি ও রেণু বাহির হই। রেণু প্রিয়রঞ্জনবাবুর বাসায় যায়…আমি অমাদের বাসায় যাই। রেণু কিছু পরে সেখানে যায়।… ছুটি তো কোনও দিন চাহি নাই। সকলের মাঝে বুকে বুক মিলাইয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র রচনা করিব—ইহাই তো জীবনের ছিল সাধনা। যখন সব আঁধার দেখি, তখন ছুটির কথা মনে হয়। কিন্তু ছুটি দিলেই কি ছুটি নিব? এখানের এরা তো ছুটি দিয়াছে, কৈ, এখনও তো পড়িয়াই আছি। যাহাই হউক, সকল মনপ্রাণের মাঝে পুরুষোত্তম আত্মপ্রকাশ করুন, ইহাই তো চাই। কোনও ঘটনা যেন সামনে দিয়া চলিয়া যাইতে না পারে, যাহাকে পুরুষোত্তম-হাতে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিলাম। প্রতি ঘটনাকে 'face' করিতেই হইবে—ইহাই তো আমাদের ব্রত। Sight-seer, উদাসীন হইয়া থাকা চলিবে না। তবে অনধিকার-চর্চা অবশ্য করিব না। ৭টার সময় ৮০০ উজ্জ্বলতাবত আসে।…

২৫শে মার্চ

সকাল ৭টার পর আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই। খাতায় লিখাইতে আরম্ভ করে।…আমি কেমন করিয়া কোনও রকমের কোনও কৌলীন্য না রাখিয়া সহজ ভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করি, তাহা বিবস্তার কাছে বলি। কোনও ব্যক্তিকে পাইতে হইলে যতখানি 'আবরণ' উন্মোচন করিয়া নিজেকে উপস্থিত করা দরকার আমি তাহাই করি। আমাকে পাইয়া তবে পরে আমাকে চিনিবে—ইহাই আমার জীবনের ধারা। জানি এ পথে আমার অশেষ লাঞ্ছনা হইয়াছে ও হইবে, তবুও এ ছাড়া অন্য পথ নাই আমার পক্ষে।…চৈতন্যবাবু রেণুর জন্য বৃন্দাবনের প্রসাদ পাঠায়। সকলকেই ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এখানের জন্য দেওয়া হয়। ৬টার পর আমি প্রসাদ পাই। আমার জীবনই তো তাঁহার প্রসাদ। প্রসাদ মুখে দিয়া চক্ষু আর্দ্র হইল। আমার পরাণপুতলী রাধারাণী, শ্যামসুন্দর। তোমাদের জয় হউক।

২৬শে মার্চ

সকালে ৬টায় নিত্যব্রতসহ বেহালা যাই চার পার হইয়া। ঠাকুরের কাছে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া বলি, ইহাদের কল্যাণ হউক।…প্রকৃতি-পুরুষের ব্যবধানের ফাঁক দিয়া বিশ্বের সব বাধার সৃষ্টি হয়। যেখানে প্রকৃতি-পুরুষ এক সেখানের বাধাই শ্রীরাধা। আজ সকালের প্রার্থনায়

শ্রীরাধার নামই বিশেষ ভাবে নেই। বিশ্বের সকল বাধার দিব্য ভাগবত রূপই শ্রীরাধা। তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সংসার-বাসনাবদ্ধ 'দুঃখনা', বিশ্বের ভাগবতী দুঃখনাই শ্রীরাধা। তিনিই আমার জীবনে আসিয়াছেন। ইহা তো পরম সত্য। তাঁহাকে চিন্ময়রূপে পাইয়াছি বৃন্দাবনে, তাঁহার দুঃখ রূপ তো আজও প্রাণ ভরিয়া পাইলাম না। যখন দুলিতেই তো তাঁহাকে আমি চাই। যখনই বাধায় সমুখীন হই, তখনই তো তাঁহার দিব্য রূপের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বড় ক্লান্তি বোধ হইতেছিল। পা যেন আর চলে না।···বীরেনবাবু আসে। তাহার নিকট মহাভারতের 'কপোত-লুব্ধক' গল্প শুনি। কপোতী কেমন করিয়া কপোতের জন্য করিল, কেমন করিয়া শরণাগতের প্রাণ-রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হইল, ইহা বর্ণনা করিল। আগামী ২০শে চৈত্র ঠাকুরের জন্মোৎসবের কথা বলি। ঠাকুরের লেখার কিছু ব্যাখ্যা করি। অনিল সমাদ্দার দুইটি চিঠি রেণুর কাছে লেখে। তাহার উজ্জলভারত ভাল লাগিয়াছে। সে 'নরনারায়ণ' আশ্রমে থাকিতে চায় কাজ করিবার জন্য—খাওয়া ও থাকা। তবে গেরুয়া সে পরিবে না, দাড়ী রাখাটাও বরং সন্দেহ'! যুবকটি ভাল। কমুনিষ্ট হইলেও গোঁড়া নয়, ব্যক্তিগত ভাবে সে কমুনিষ্ট নয়, সে কমুনিষ্ট শুধু দল হিসাবে। তাহার আর তাহা ভাল লাগিতেছে না। ৯টার পর ঘর আসি। বিভার কাছে উষাদিদির সেবার কথা বলি। নিজ যোগ্যতা দিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়। যোগ্য হওয়ার সাধনা দিয়াই নিজ অধিকার আদায় করিতে হয়। ঈর্ষা বিদ্বেষের পথে নয়। সতী স্ত্রী সেবাদ্বারা তাহার সপত্নী ভক্ত স্বামীকে বশ করিতে পারে। দূরে—'থাকিয়াই সেবা-দ্বারা আপন স্থান আদায় করা যায়। ইহাই পুরুষোত্তমের পন্থা।

২৭শে মার্চ

সকালে প্রার্থনার পর বুদ্ধদেব সম্বন্ধে লিখিবার জন্য 'India philosophy' বইটা দেখি। আমি ও প্রতিভা বাহির হই। প্রতিভা দীনেশ রায়ের ওখানে যায়, ৫ টাকা আনে। সতীশ মুখার্জি রোডে রেণুর সঙ্গে দেখা।··· বিভা একজন নূতন গ্রাহক করিয়া টাকা লইয়া ৮টায় আসে। ৯টায় ঘর যাই। তাহার কাছে সুধার কথা, শান্তির কথা বলি। শান্তি সম্বন্ধে উষাদিদির সঙ্গের আলোচনার কথাও বলি।···রাত্রিতে আশ্রমে ফেরার পর সেবানন্দ আসে। হরিপদবাবু পাঠাইয়াছেন আগামী ২০শে চৈত্র বক্তৃতা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবার জন্য; উষাদিদি বলিয়া দেন, তাঁহারা যেন প্রস্তুত থাকেন। বহমান নদীর সাগর আছে, তাই তাহার জনপদের সকল বিষ বুকে লইবার সাহস আছে। বদ্ধ জীবের সাহস নাই পাপীর পাপ নিবার। বর্ত্তমান যুগের মানব বিশ্বের সকল পাপ পরিপাক করিয়া বহিয়া চলিবে। ইহা যে ভাগবতের যুগ। ঠাকুর বলিলেন, ম্লেচ্ছের অন্ন খাইলে যদি অভক্তি হয়, তবে কলির জীবের প্রেম ভক্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। জল পাপকে ডরায় না। সে যে কৃষ্ণ-সাগরে যুক্ত।

২৮শে মার্চ

জাগো তুমি নারায়ণ মহাসমাধি নিদ্রা হইতে। আমি তো পারিতেছি না তোমার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিতে। কোনও সুযোগ তো আমার আজ নাই। আজ আমি রিক্ত হস্তে, ভাঙা বুকে, ভিখারিণী বেশে তোমার সামনে দাঁড়াইয়া। স্বামী, বিশ্বসমস্যার সমাধান-মূর্ত্তি, তুমি, তোমার দেহখানি তো ঐ মহানির্বাণ মঠে কয়েকখানি ইঁটের নীচে আজও বর্ত্তমান! তুমি জাগো, তুমি জাগো। আমাকে কাঙালিনী করিয়া রাখিয়াছ, তাই সেবা করিতে পারিলাম না। ধন-যশ-প্রতিষ্ঠা কিছুই চাহি নাই। চাহিয়াছি তোমার প্রতিষ্ঠা। তোমার উপর খুব অভিমান লাগে। অভিমান করিয়া তোমার পায়ে আসিয়া দেই নাই, চাহ নাই বলিয়া অভিমানে খাওয়াইয়া দেই নাই। আজ দুঃখ হয়। আবার আসিও জীবনে না হয় মরণে।··· বিভা আসে ৪॥০টায়। সমন্বয়ের পরপর্য্যায় প্রবন্ধটা কিছুটা সে পড়ে, আমি ব্যাখ্যা করিয়া দেই। সে ৭টার পর যায়। মাখনবাবু আসে। রেণুর পরীক্ষার খাতার

নম্বরগুলি দেখিয়া দেয়। ২ দিন হইতে আফিসে যাইবার ও আসিবার পথে ঠাকুরের দেওয়া ইষ্টমন্ত্র পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জপ করি। উহাই তো আমার সঙ্গে ঠাকুরের যোগসূত্র, গ্রন্থি-বন্ধন। উহা আমার কত আদরের। সোমবার আবার সাক্ষ্য হইবে।

২১শে মার্চ

সকালে খুব বিহ্বলতার সহিত চোখের জলে ঠাকুরের কাছে বেদনা জানাই। বুকের ভিতরে একটা প্রেরণা ও তাড়না অনুভব করিতেছি তোমাকে ধরার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, কিন্তু সুযোগ যে নাই। কত লোকই তো পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, তাহাদের একজনের ভিতরেই কি এই বুদ্ধি জাগ্রত হয় না যে, এই পত্রিকাটির আদর্শকে কার্য্যাত্মকরূপে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অর্থ সাহায্য করি বা নিজেকে লাগাই। তোমার হাতেই তো সব চাবিকাঠি। আফিস হইয়া মহানির্বাণ মঠে যাই। ঠাকুরের ঘরে গিয়া আত্মনিবেদন করি। আমি তোমার ..., তোমাকে সেবার জন্য ধনজন না দিলে কেন আমাকে... টানিয়া লইয়াছিলে...এ ছবি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তো উহা আমার মনের খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দাও নাই। বরং 'যার তার কাছে যখন তখন বলিও না' বলিয়া দিয়াছিলে। ইহাতে কি তোমার সে সমস্ত স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই? আজ আমাকে এ লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলিয়া রাখিবার অর্থ কি? আমাকে অভিমানের প্রশ্রয় তুমি দিয়াছ। রাগ করিও না। আমার যে তুমি ছাড়া আর কিছু নাই, স্বামিন্। মঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, সুধীর দাশগুপ্ত বসিয়া আছে শিলিগুড়ি টিচার্স কনফারেন্সে সাহিত্য শাখার সভাপতি হইবার নিমন্ত্রণ লইয়া। এরোপ্লেনে যাইতে হইবে। আমি বেণুর কথা বলিলাম। সে না গেলে আমার খুঁটিনাটি সেবার জন্য কষ্ট হইবে। যাহা হয় ঠিক করিয়া পরে আসিবে। ১১ই এপ্রিল যাইতে হইবে। মঠ হইতে আসার সময় সচ্চিদানন্দ আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে ঠাকুরের মঠ সম্বন্ধে কথা হয়। আসক্তির অন্তর্নিহিত রূপ হইতেছে সৃষ্টি করা, উহার superficial রূপ হইতেছে আটকাইয়া যাওয়া। আসক্তি যে গঠনাত্মিকা তাহার লক্ষণ এই যে, তাহা ছড়াইয়া পড়িতে চায়। একটী নারীকে ভালবাসিলেই হয় না, বহু পাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বুদ্ধির কারসাজিতেই মানুষ আটকাইয়া পড়ে। আসক্তি সহজ হইলেই উহা বন্ধন আনে না। আসক্তি স্বরূপতঃ বিস্তরণ। ক্রমে এই আসক্তিই আস্বাদিত হইয়াছিল। সকালে হেমাঙ্গবাবু বেণুর ওখানে গিয়াছিল। মাখনবাবু ১১টার পর আসে। খাতার নম্বরগুলি গণিয়া দেয়। বিরজা আজ আর বৈকালে আসে নাই।

৩০শে মার্চ

সকালে আফিসে যাই, ৯॥০টার মধ্যে ফিরি। ১০টার মধ্যে স্নান আহার করি।...আদালতে যাই ১০॥০টার সময় সাক্ষ্য-গ্রহণ শেষ হয়।...৩টার পর হঠাৎ নীলু ও সুবোধ আসিয়া উপস্থিত।...বিরজা ৮॥০টার পর যায়। ইতিমধ্যে জয়া আসে। শেখরবাবু আসেন ৯টায়।—সে ৭ জনের টাকা দিয়া যায়। তাহার গাড়িতে আমি ও প্রতিভা চলিয়া আসি। আর যে ঠেলিয়া চলিতে পারিতেছি না ঠাকুর। আমার আবেষ্টন গড়িয়া তোল, তোমার পায়ে পড়ি। তোমার প্রতিষ্ঠা কি গড়িয়া তুলিতে পারিব না?

৩১শে মা

সর্বদা আজ একই প্রার্থনা—জাগো যোগসমাধি ম নর-নারায়ণ শ্রীনিত্যগোপাল আমার জীবনে, পরিবার জীবনে, সমাজ জীবনে, বিশ্ব জীবনে। যে সম্বন্ধ তোমা সঙ্গে তুমি স্বীকার করিয়াছিলে, তাহারই দাবীতে আ তোমার সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার উপকরণ দাবী করিতেছি। নীলু পারিবে বলিয়া মনে হইল না। 'দুর্ভেদ্য গৃহ-শৃঙ্খলা' বজায় রাখিয়া কি কেহ বাহির হইতে পারে? যতখানি দাবী নারীর কাছে পুরুষ করিতে জানাইত; শোনা যাইত, তাহার শতগুণ দাবী বর্তমান সমাজ করে। তাহা যথাযথ মানিয়া কি কেহ কোন বাহিরের কাজ করিতে পারে? দিনরাত্রিই নারীর দাবি

পুরুষের সেবা করিতে হইবে। মঠে যাই। ঠাকুরের কাছে আমার দাবী পেশ করি। অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়। সুনীলার ওখানে রাধামাধবের কাছে যাই, ঠাকুরের জন্য কি মিঠাই প্রস্তুত করিল তাহা সুনীলা দেখায়। মঠ হইতে আফিসে আসি, সেখান হইতে ১১টার পর ফিরি।… নীলুর সম্বন্ধে রেণুর সঙ্গে আলোচনা করি। নীলুর আমার দাবির বহন করা হয়ত বিপজ্জনক হইতে পারে। তাই কি ঠাকুর কিছুতেই ইহা ঘটিয়া উঠিতে দিতেছেন না?… একটা ম্যাণ্ডেল কিনিবার জন্য ইহারা পীড়াপিড়ি করে। কিছুই আর ভাল লাগে না। অশন-ভূষণ কিছুই তো জীবনে তেমন গ্রহণ করি নাই, আর কেন? ঠাকুর তো কাশী মিত্রের ঘাটে খাপরের মধ্যেও শুইয়া থাকিতেন? কলুর তেনার মত কাল ছেঁড়া কাপড় পরিতেন। আর কেন? Naked I came, naked I must go— ইহাই আমার ভাল লাগে। তাঁহার সেবা হইল না, আমি সাজিয়া গুজিয়া থাকিব?

১লা এপ্রিল

শ্রীনিত্যগোপালের শুভ আবির্ভাব তিথি। ভোরে প্রার্থনা করি, নিবেদন করি আমার জীবনের সবটুকু তাঁহার শ্রীচরণে। আমার যাহারা—রক্তে ও ভাবে, তাহাদের জন্য বর কামনা করি ও সুধা—নিত্যগোপাল—অতুল ধনের জন্য কাঁদি। রেণু কিছু পরেই আসে ফুলের মালা, ২টা রজনী গন্ধার ডাঁটা, মিষ্টি সিঙ্গারা দুটি পদ্ম লইয়া। ঠাকুরের কথা হয়। ৮টার পর আমি ও রেণু মঠে যাই। যাওয়ার পরই শিশির ও কমলা, মীরা ও নন্দু এখানে আসে, সকলেই মঠে যায়।…নীলু আসিল না।…বিমলা আসে ২টার পর…। ৪॥০ টার পর সভা আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে পূর্ণেন্দু ঘোষের সঙ্গে আলোচনা হয় অনেকটা সময়। বিজ্ঞানানন্দ প্রথমে বলে।…আমার আলোচনা বেশ জমিয়া ছিল। মাঝখানে আবৃত্তি আরম্ভ করে। কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হয়। শ্রোতাদের আগ্রহে আবার পরে বক্তৃতা হয়। বৌদ্ধ-বেদান্তের সমন্বয় করিবার পূর্ণ কৃতিত্ব শ্রীনিত্যগোপালের। শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়ের পূর্ব পর্যায় আর শ্রীনিত্যগোপালে পর পর্যায় দিয়াছেন। ছোট ঘটনাধারা তাঁহার ছেলের কথা, পচা গোবরে ঘুঁটে দেওয়ার কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলি।..

২রা এপ্রিল

সকালে আজ আর গলা ভাঙার জন্য প্রার্থনা করিতে পারি নাই। 'বৌদ্ধ বেদান্ত দর্শন সমন্বয়' প্রবন্ধটী শেষ করি, প্রতিভা নকল করে। আফিসে যাই। সেখান হইতে ৯টার মঠে যাই। সেখানে ট্রাস্টিদের সভা হইতেছিল। চৈতন্যের ওখানে বসি। কৃষ্ণানন্দ বলে দেখিয়াছে যে মঠ ধ্বংসোন্মুখ। আরও নাকি কে কে দেখিয়াছে। সত্যই তাই। কোনও দর্শন যাহাদের নাই, যাহাদের জীবনে নিত্যগোপাল জীবন ও দর্শন নাই, সাধন-ভজনের বালাইও নাই, অথচ ঠাকুর যে গুহ্যতম তত্ত্বের experiment করিয়া গিয়াছেন এবং শিষ্যদের সামনে তাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহার সারমর্ম না বুঝিয়া বাহিরের খোসা লইয়া বিপন্ন হইতেছে, তাহাদের দ্বারা মঠ ধ্বংসোন্মুখ তো বটেই। ঠাকুর, যদি আপনার করিয়া বুকে লইয়াছ, শক্তি দাও তোমার নামের গৌরব, তোমার মঠের গৌরব রক্ষা করিতে। আজও তো বুকের মধ্যে যৌবন রহিয়াছে, গর্জন করিবার বল দাও।… তাহার যাহা খটকা, তাহা আমার কাছে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেই মীমাংসা হইত। তাহার জীবনে যে ব্যর্থতা, সেই ব্যর্থতাকে সার্থকতায় গড়িয়া তুলিতে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন, আমি তাহাই তাহাকে দিয়াছিলাম। একদিন সে বুঝিবে যখন ব্যর্থতার জ্বালা সে সহ্য করিতে পারিবে না। আমি তখনও তাহার জন্য অপেক্ষা করিব। বিমলা ৩টায় ফোন করে। ঊষাদিদির জীবনভর আমার সেবা, তাহার অম্লান হাসির কথা বলি।…

৩রা এপ্রিল

…(নীলুর সঙ্গে) অনেক কথা হয় আমার জীবন সম্বন্ধে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, ঠাকুরের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার সম্বন্ধে।…ঠাকুরের শেষ উপদেশের কথা বলি। তোমরা

এক-দেহ, এক-প্রাণ থাকিব। তাহা না হইলে আমাকে পাইবে না। নর-সমষ্টি তো নারায়ণ। নার অর্থাৎ নরসমূহ যাঁহার অয়ন কিংবা নরসমূহের যিনি অয়ন, তিনিই নারায়ণ। যাহা সত্য, তাহাই তো বাদ দেন।... ঠাকুরের জীবন লিখিতে উঁহারা বলে। জগদীশ পুকুর হইতে জাল দিয়া মাছ ধরিবার রহস্য কেহ তো বোঝে না। কোনও জীবনীতেই কি ইহার উল্লেখ আছে? একজন সন্ন্যাসী এমন করিয়া মাছ খান, ইহা হইতে লিখিতে উঁহাদের সাহস নাই।

৪ঠা এপ্রিল

কাল ও আজ মৌন সহ প্রার্থনা করি। পরে বর্তমান অবস্থায় কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়।... বাহির তাহাকে হইতেই হইবে। অদৃষ্ট লইয়া বসিয়া থাকিলে অদৃষ্ট তাহার জীবনকে ডুবাইবে। কপালের উপর পৌরুষ। অদৃষ্টকে সৃষ্টি করিতে হইবে। এইখানেই পৌরুষ। ভগবানের অনুগত থাকিয়া নিজ পুরুষকার দ্বারা নির্ভয় অদৃষ্টকে গড়িয়া তুলিলেই মানুষ হয় পুরুষোত্তম। অদৃষ্ট-তৌষিক হইলে জীবন ব্যর্থ হইবে। যতখানি আদর যত্ন পুরুষোত্তম-বিধানে মানব নারীর কাছে পাইবার অধিকারী, তাঁহার বেশী লওয়া পুরুষোত্তম-শাস্ত্রে অবৈধ। তাহাতে অপরাধ হয়। পুরুষেরা আজ সেবা পাইয়া spoilt। এক গ্লাস জল ভরিয়া খাইবার সুযোগ তাহাদের নাই। সেবার ছলনায় মেয়েরা জীবনের অনেক কিছু অপচয় করে, সর্বনাশ হয়।...

৫ই এপ্রিল

...স্ত্রীর দাবিও, পুত্রবধূর দাবিও যতখানি একজন পুরুষোত্তম-উপাসকের থাকা উচিত, তাহার বেশী এক পা'ও অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। হিন্দুর পরিবারে মাতৃত্ব একটা মস্ত বড় বন্ধন। সন্তানকেও 'পরকীয়' করিয়া রাখা উচিত।...পাশ্চাত্ত্যে মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ তো পরকীয়। কাজ করিতে হইলে স্বামী-পুত্র লইয়া অত জড়াজড়ি করা চলে না।...তাহাই তো বন্ধন। স্ত্রীর ডাক শুনিলে দুধ উনুনে পুড়িয়া যায়। এমনি না হইলে আর বিপ্লব কি?...

৬ই এপ্রিল

সকালে চুনি নিয়ে 'Thoughts in Current Philosophy হইতে Maya প্রবন্ধটি পড়ি।' আজ আর সকালে আফিসে যাই না। প্রতিভা, তাহার নিকট লিখিত আমার চিঠিগুলির মধ্য হইতে ২.৩ খানা পড়িয়া শুনায়। নিজের অতীতকে বর্তমানে আস্বাদন করিলাম। ইহাও তো আত্ম-আস্বাদন। অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের, বর্তমানের মধ্যে অতীত ভবিষ্যতের, বর্তমানের সঙ্গে বর্তমানের, ভবিষ্যতের মধ্যে অতীত-বর্তমানের আস্বাদনই তো আত্ম-আস্বাদন। প্রকৃতির সমবর্দ্ধিত আত্ম আস্বাদন স্বরূপ মাত্র। ইহা ভাবুকতা, বাস্তব নয়। আজ চাই বাস্তব আত্ম-আস্বাদন। বেণু ১০-টার পর এখানে আসে। সে অনেকগুলি ফোন করে...।...প্রথমে ছিলাম আমি ও উষাদিদি প্রভৃতি। ইহাদের মধ্য দিয়া আসিয়াছে প্রতিভা। প্রতিভা ও আমার মধ্য দিয়া আসিয়াছে বেণু। আজ তো উচ্চল-ভাবকে অবলম্বন করিয়া কাজ অনেকটা দানা বাঁধিয়াছে। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজ তো শুরু হইয়াছে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবে। ১০॥০টার পর শুই, উঠি ৫॥০টার পর। এত একটানা ঘুম শীঘ্র ঘুমাই নাই।

৭ই এপ্রিল

সকালে 'Thoughts in Current Philosophy' হইতে 'Is there a general will' প্রবন্ধ, Intellet and Intuition প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়ি। বেণু মনোরঞ্জন বাবুর ওখানে যায়।...বিকালে তাহার ভাই সহ ৫টার আসে।...ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, প্রকাশানন্দের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উক্তি মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী, অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি শ্লোক, আমার জীবনে রামকৃষ্ণের আলোর কথা, যোগ সাধনার কথা, মুক্তি দর্শনের স্বরূপ কথা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনা বেশ জমে।...সুরেন গুপ্ত

আসে…। আমি যে-কথা বলি, তাহা আর কেহ বলিতে পারে না। সুরেশ ইহা বলিল।…সুধীর দাশ আসে তাহার এক যুবক বন্ধুকে লইয়া। অস্পৃশ্যতা বর্জন, নারী আন্দোলনের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়।…

৮ই এপ্রিল

সকালে 'পুস্তক পরিচয়' শেষ করি, প্রতিভাকে নকল করিতে দেই। বেশ বড় হইয়াছে।…জীবনই তো ব্যাখ্যান। মানুষ যাহা শোনে, যাহা বলে, যাহা দেখে তাহার প্রকৃত অর্থ বোঝে না, তাই উহা তাহার কাছে মায়া।…

৯ই এপ্রিল

সকালে যীশু খৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব আস্বাদন করিতে করিতে প্রার্থনা করি। তিনি আসিয়াছিলেন, আমরাই তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছি। তাঁহার এই আত্মবলি যদি জীব ধারণ করিয়া লইত, তাঁহার resurrection আবার সম্ভব হইত। কেহ কি জীবনে ক্রুশ বহন করিল? ধরণী কি তাঁহার রক্তে স্নান করিয়া পবিত্র হইবে? পিতামাতা সন্তানের দ্বারা crucified, গুরু শিষ্যের দ্বারা, ভগবান ভক্তের দ্বারা। ইহাই বোধহয় ছোটদের কাছ হইতে বড়দের পাওনা।…কি আমার অবস্থা! কাহারও উপর আমার কোনও দাবী নাই, অথচ আমাকে সকলের দাবী অযাচিতভাবে পূরণ করিবার জন্য চলিতে হইবে। আমার লাঞ্ছনা কে ঘুচাইবে।…দুনিয়ার টান সামাল দিতে না পারিলে কি সংসারে সন্ন্যাস বজায় রাখা সম্ভব হইবে? বিমলা ব্রজেন ও বীরেন ব্যানার্জী আসেন। মণি বাগচি (জ্ঞানবাবুর জামাতা) আসে, তাহাকে ২ বৎসরের উজ্জ্বলভারত দেই। 'গিরিধারী' প্রসঙ্গ প্রভৃতি আলোচনা করি। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির দার্শনিক দিক ফুটাইয়া তুলিতে না পারিলে যে তাঁহারা আলমারীতে থাকিবেন, সমাজের প্রয়োজনে আসিবেন না—তাহাও মণি স্বীকার করিল। জ্ঞানবাবুর সম্পর্কে তাহাকে 'বাবা' বলিয়াই সম্বোধন করিলাম, ভাল লাগিল। ৯টায় ফিরি।

১১ই এপ্রিল

…ব্রজেন্দ্র আসে কিছু পরে। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকের ব্যাখ্যা জানিতে চায়। গীতার আত্ম প্রদীপ হইতে অনেকটা অংশ পড়িয়া শোনায় রেণু।…

১২ই এপ্রিল

বৎসর শেষের প্রার্থনা করি। সকল অতীত বর্তমানের মধ্যে সার্থক হইবার জন্য নূতনের পথে পা বাড়াইয়াছে। আজ সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া অতীতের সব হারানো, সব পাওয়াকে পুরুষোত্তম-জারক রসে পরিপাক করিয়া আগাইয়া যাইব। রেণু প্রার্থনায় ছিল। সব অতীত যাহার মধ্যে বর্তমান, তিনিই পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমে কিছুই হারায় নাই। সুধাকেও পাইব, নিত্যগোপালকেও পাইব, নীহারের চলিয়া যাওয়ার অর্থও মিলিবে।…বিমলা ৩।০টার পর ফোন করে।…আমার লেখা পড়িতেছে। সৃষ্টির মূলে যাহা, তাহাকে যে আমি প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তাহা তাহার ভাল লাগিয়াছে। তাহার বিক্ষেপ অনেকটা কমিয়াছে আমার সঙ্গে দেখা ও আলাপ হওয়ার পর। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেই আমার লেখা পাওয়া যায়, অন্য কোথাও তেমন পাওয়া যায় না।…

১৩ই এপ্রিল

সকালে প্রার্থনা করি নববর্ষের সাধনা গ্রহণ করিবার জন্য।…পৃথিবীর সাধনা আজ গ্রহণ করিতে হইবে। পৃথিবী নিজেকে নিজে ২৪ ঘণ্টায় প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ৩৬৫ দিনে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবীর মানুষকেও দুইটি প্রদক্ষিণ যুগপৎ করিতে হইতেছে। সে যদি একান্তভাবে নিজেকে প্রদক্ষিণ করিয়াই চলিতে চায়, সে হইবে বৈষয়িক। তাহার এই বৈষয়িকতা কাটে পুরুষোত্তম-সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করার ভিতর দিয়া। প্রতিটি জীব যুগপৎ আত্মকেন্দ্রিক ও পুরুষোত্তম-সূর্য্যকেন্দ্রিক। এমনই ছন্দে নাচিতে হইবে যাহাতে কাহারও সঙ্গে কাহারও টক্কর না লাগে। রাসমণ্ডলের ছবিই বিশ্বে অনুস্যূত। আজ রাসনৃত্যের সাধনা গ্রহণ করিতে হইবে।…মঠে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসি।…বুকটা দুপুর হইতে

ভারাক্রান্ত। পড়িতে কিছুই পারিলাম না—রামচক্রের কথা হরিদাসী, মণি, প্রফেসরের কাছে বলি।…

১৩ই এপ্রিল

সকালে আজ বাহির হই না। মনটা আদৌ ভাল না। সবই আমার ব্যর্থ হইল মনে হইতেছে। যাহাকে যে মূল্য দিলে তাহা সার্থক হইত, যাহার নোংরামি ঘুচাইয়া ঠাকুর তাহার দিব্যরূপ ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, যাহা আমি পারিলাম বলিয়া একটা সাহস ও নিশ্চিন্তানন্দও আসিয়াছিল, তাহা কি পারিলাম না? সমস্ত দর্শনই কি ভুল? ঠাকুর, আমি শরণাগত। কাহারও অধিকার তো আমি কাড়িয়া লই নাই। সকলের সব অধিকার বজায় রাখিয়া চলিতে চাহিতেছি বলিয়াই তো আমার আজ কিছু নাই। যোগেশ্বরীর বাড়ী করিয়া দিয়াছি, নিজেরাই সে স্থানচ্যুত হইয়াছি। সে তাহারই স্থানে আছে, আমরা আজ আর কেহ নই। ইহাই তো আমার জীবনকথা। উজ্জ্বল ভারতের মালিক আমি নই। যাহারা করিয়াছে, তাহারাই মালিক। কে আমি সরাইয়া দিবার? দরকার হইলে আমিই সরিয়া আসিব। কোনও কিছুর উপর অধিকার না রাখিয়াও সকলের হৃদয়ে থাকিতে পারিব। স্বরাজসেবকসঙ্ঘ ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছিলাম সুরেশের উপর। মালিক আমি কিছুরই হইব না। আমি কাহাকেও সরাইয়া দিব না, আমাকেই সরাইয়া দিবে।…কাহাকেও আমি আমার উপর হইতে অধিকার হইতে বঞ্চিত করি নাই।—বরেন কলেজ হইতে আমাকে 'জুতা' কিনিয়া দিয়া আসিতেছে। আমার জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ইহারা কিনিবার জন্য ব্যগ্র। আমি রাজি হই নাই। আজ রেণু সন্ধ্যার পর কিনিয়া আনিয়াছে। অপেক্ষা করিয়াছিলাম—যদি কিনিয়া দেয়। জুতা কিনিয়া দেওয়াটা তাহার অধিকার ছিল। তাহার অধিকার গেল, আমি তো কাড়িয়া লেই নাই। এমনি আমার অবস্থা। কাহারও অধিকার আমি কাড়িয়া নিব না।…দুপুরের জলটুকু না দিলে রাগ করি ঐ একই মনোবৃত্তি লইয়া। আমার সেবার অধিকারটুকু হইতে তো বঞ্চিত হইল।…কাহাকেও আমি অধিকারচ্যুত করিব না। তাহারা তাহাদের অধিকার ছাড়িয়া না দিলেই বাঁচি।

১৪ই এপ্রিল

…রেণু-প্রতিভা পরস্পর পরস্পরকে 'একত্র' না পাইলে যে কেহই আমাকে পাইবে না—ইহা আমি জোর দিয়া বলি। প্রার্থনার সময় 'জগন্নাথ' 'শ্রীজগন্নাথ' খুব বলি। আমি যতক্ষণ না জগতের বুকে বুক মিলাইতেছি, ততক্ষণ আমি কি করিয়া আশা করিব যে জগন্নাথ আমার বুকে আসিবেন? এখানে যাহারা আমাকে ঘিরিয়া আছেন, তাহারা যতক্ষণ না এক-হৃদয় হইতেছেন, ততদিন আমাকে নিয়া টানাটানির বিরাম চিরতরে হইবে না। মানুষ ভগবানকে স্মরণে ও বিস্মরণে ষোল আনা পাইবে। দুই ভাবে না পাইলে ইহার মধ্যে ফাঁক থাকিয়া যায়, ফাঁকি থাকিয়া যায়, মায়া থাকিয়া যায়, যা-খুশি তা মনে করিয়া পাওয়াকে না-পাওয়ায় পরিণত করে। এই ফাঁক এখানেও আসিয়া পড়িবে যদি না ইহারা পরস্পরের মধ্যে আমাকে পাইয়া আমার পাওয়াকে জমাইয়া না তোলে। ব্যক্তিগত পাওয়া তখনই সত্য, ধন্য, যখন সকলের অন্তরের পাওয়ার মধ্যে নিজ পাওয়া গলাইয়া দিয়া, নূতন করিয়া দ্বিতীয়বার পাওয়া হয়। এই তত্ত্বটাই আজ আলোচিত হয়। রেণু ১২টায় বড় জায়গায় যায়, ফেরে ৪টার পর।… ক্ষিতীশ ও চৈতন্য মঠ হইতে আসে। ঠাকুরের প্রাণ ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। যে 'প্রাণ' লইয়া তিনি মঠ চালাইয়াছেন, সেই মঠ সেই প্রাণ লইয়া চালাইতে হইবে—ইহাই তাঁহার ছিল নির্দেশ। কোথায় সেই প্রাণ? প্রাণ থাকিলে কালিকানন্দ কলেরায় হাসপাতালে মরে, পাড়ার মধ্যে লইয়া গিয়া পোড়ানো হয়? অথচ তাঁহার গুরুদেবেরা বর্তমান! শতবার্ষিকী সামনে। কি করিবে? ব্রজেন আসে, তখন ক্ষিতীশেরা ছিল। মালতী আসে…। সুধাংশু আসে। প্রণতিকে আনিতে বলা হয় আমার টাকা দিয়া যাইতে; আমি কি যাইব? কত দিন আসে নাই! চিদানন্দ আসে, সর্বশেষে শান্তি চট্টোপাধ্যায় আসে অনিল

সমাচারের প্রবন্ধ ছাপা হইল কি না জানিতে।···

১৬ই এপ্রিল

···পাওয়া হইতেই মানুষের যাত্রা ; তাই সেই পাওয়াকে প্রকাশ করা। সত্য যুগ আসিতেছে। ঠাকুর নাকি একদিন বলিয়াছিলেন আমার মত সত্যযুগে প্রচারিত হইবে। কতদূর সে সত্যযুগ? আমার প্রাণ যে তোমার প্রকাশের জন্য ব্যাকুল। চাওয়া পাওয়ার কথা তো ভুলিয়াই গিয়াছি। যাহা পাইতেছি তাহার সার্থকতা আগে করিয়া লই, তাহার পর যাহা হয় আবার চাহিব। শুধু তোমাকে চাহিয়া বেড়াইব—মানুষ আমাকে দেখিয়া তোমাকেই দেখিবে, আমাকে ছুঁইয়া তোমাকে ছুঁইবে, আমাকে পাইয়া তোমাকেই পাইবে, ইহাই আমার বাসনা। জাগো, তুমি আমাতে সকল মন্থন করিয়া জাগো। তোমার শত-বারিধিতে কি আমি ডুবিব? তোমার কথা ও জীবন ছড়াইয়া দিবার সুযোগ করিবে না? সেতু-প্রতিষ্ঠার কথা হয়। দুই হৃদয় এক হইলে সেখানে হৃদয় সম্রাট বিরাজ করিবেন।···দ্বৈত অদ্বৈতের আলোচনা হয়।···সেই যে ভোর ৬।০টায় বেহালা গিয়াছে, আজ আর আসে নাই। ১১টার পর পর্যন্ত উদ্বেগে অপেক্ষা করি। আমার জন্য কাহারও কোন উদ্বেগ নাই। কোনও খবর দিবার প্রয়োজন বোধ ইহাদের নাই। এখানে আর থাকিতে ইচ্ছা হয় না। একটু থাকিবার জায়গা ঠাকুর দিবেন! যদি বাগচী এক পত্র দেয়।...

১৭ই এপ্রিল

ক্রমশঃ

এই সব অন্ধকারে

॥ শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

পেলে কোনো স্বাদ নেই। এর চেয়ে না পাওয়াই ছিল
ঢের ভালো।
এই সব অন্ধকারে অনেক হাঁটার পর নিজেকে চেনার
কী যে প্রয়োজন ছিল? কোনো দূর নক্ষত্রের আলো,
পাহাড়ের নগ্ন চূড়া,—অরণ্যের স্তব্ধতা—এই সব
নির্জন ছায়ায়
রহস্য জাগাতো শুধু—মনে হত বহমান হৃদয়ের স্বাদ
সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত ; কোনো ভোরে পৌঁছায় সেখানে!
কেন ভোর এল তবু, কেন রাত্রি জ্বালালো আলোক,
এ অযথা-অভিসার কেন পেল দিক এই কান্নার মুহূর্ত—
এ আলোর মৃত শব! প্রাপ্তির প্রচ্ছন্ন অভিমানে
হৃদয় হারালো তার স্বাদ-গন্ধ : স্বপ্নের দ্যুলোক!

কী এক পূর্ণের বোধে অভিশপ্ত এই রক্তে
আরোগ্য-চেতনা!

নির্বাণ 'শ্রেয়'র বোধে প্রভাতের 'প্রেয়' তাকে কিছুই দিল না।
হৃদয়ের রঙ মুছে সে এখন সূর্যাস্তের শেষ আয়োজনে
রহস্যের রূপময়! ভুলে গেছে সময়ের অনন্ত অভিযানে
যে আবেগ পথে ছিল—; তীর্থে এসে সেই সব
সুরের আত্মীয়া
এখন ঘুমিয়ে গেছে। সমুদ্রের গভীর স্পন্দনে
এখন কেবল কান্না, যন্ত্রণারা দুলে গেছে যৌবনের মানে।
মুক্তারা পেল না মুক্তি, যন্ত্রণার তাপসী ঝিনুক
কখন যে ডুবে গেল অতল ঢেউয়ের নীচে—যার
আগল না :
পাওয়ার প্রসিদ্ধি তার বুকে কোনো শান্তির শুদ্ধি
আনল না।
সূর্যের যন্ত্রণা তার বুক ভরে বাজালো না
কোনো সুর,—কোনো ফলে দেখল না
অপার্থিব মুখ।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইন্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

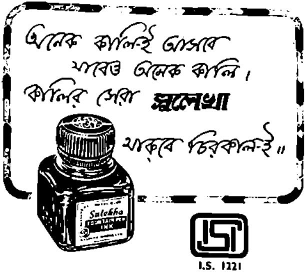
অনেক কালিই আসবে
যাবেও অনেক কালি।
কালির সেরা সুলেখা
থাকবে চিরকাল-ই॥
Sulekha
INK
I.S. 1221

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা · দিল্লী · বোম্বাই · মাদ্রাজ

SW

জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট কিনুন

সঞ্চয় করুন ... আরো বেশী সঞ্চয় করুন—সর্বতোভাবে সঞ্চয় করুন ...

কেবলমাত্র-প্রয়োজনেই কেনাকাটা করুন এবং আপনার সঞ্চয় বিভিন্ন জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনায় লগ্নী করুন। এগুলি শুধু নিরাপদ ও লাভজনক লগ্নীই নয়, দেশগঠন ও প্রতিরক্ষার কাজেও বিশেষ সহায়ক। লগ্নীর সুদ আয়কর মুক্ত

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন

আপনার সঞ্চয় জাতির শক্তি

সূচীপত্র, কার্ত্তিক ১৩৭০

১। প্রার্থনাকালীন জীবন ... ২৮১
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত (৩০)

২। প্যাথেটিক ফ্যালাসি (Pathetic Fallacy) ... ২৮৪
শ্রীমণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়,
এম, এ; বিটি, ডি এসই

৩। রাগে অনুরাগে (কবিতা) ... ২৮৭
শ্রীবিভা সরকার

৪। স্বামী বিবেকানন্দের মহনীয়তা ... ২৮৮
শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ

৫। রবীন্দ্র সঙ্গীত সাধী অমল চৌধুরী ... ২৯১
শ্রীজয়দেব রায়

৬। বাংলাদেশ ও বাঙালী ... ২৯৩
শ্রীভারতী

৭। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫২) ২৯৭

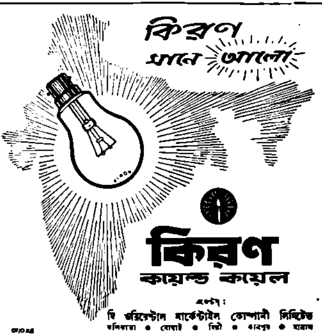

এজেন্ট :
দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোম্পানী লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • কানপুর • মাদ্রাজ

উজ্জ্বলভারত

কার্ত্তিক, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৩০)

তাদের আমি বাজারের মা বলে সম্বোধন করেছি। তারা জেলে যেতে দিল না বলে পা জড়িয়ে ধরেছে—জেলে ঢুকতে দেবে না। অসম্ভব লোক, পুলিশবাহিনী এত লোক দেখে জেলের গেট খোলে না…ছয় মাস পরে ওগো নগরবাসী দেখে যা আমার গৌর এলো ঘরে নিতাই এল ঘরে গান গাইতে গাইতে সহর প্রদক্ষিণ করেছে…ছ'মাস সুতো কেটে কাপড় বুনেছে। নারীকে, স্ত্রীকেও, কোনদিন ভোগ্য বুদ্ধিতে দেখি নি…নিত্যগোপালকে কত বেশ্যা ফুল দিয়েছে, নিত্যগোপাল তাদের কত স্নেহ করেছেন··তারাও তারাপদকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন…'নিত্য যা পাবে তাই নেবে', বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ···। নিত্যগোপাল পচা গোবর ঘেঁটে গেছেন, ঘুঁটে হয়তো আমরা হই নি।···নিত্যগোপাল আমার জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর…। আর কিছু বুঝি না, শুধু তুমি তুমি তুমি··· সারা দিনে এই প্রশ্ন শুধু করি—তুমি খুশী হচ্ছ তো? আমার জ্ঞান কর্ম ভক্তি প্রেমদ্বারা আমি তোমাকে খুশী করেছি তো? নিত্যগোপাল ও আমার খুশীর জন্য চেষ্টা করে যাও।…আমি তোমাদের কথা ভাবব, তোমরা আমার কথা ভাববে। Ethics-এর প্রফেসর বললেন তোমার হাতে একটা রসগোল্লা, আমার হাতে একটি—তোমারটা তুমি খেলে, আমারটা আমি ··এই এক রকম; আর আমারটা তুমি খেলে, তোমারটা আমি …এ আর এক রকম। কোন্‌টা সুন্দর? তুমি যখন দেহ দেখ, তিনি তোমারটা দেখবেন···তোমার দেহের মালিকানা ভুলে যাও···মালিকানা নিজের হাতে রাখলে যম এসে কেড়ে নিয়ে যাবে।···গুরুপূর্ণিমার অধিবাস আর ···অধিবাস মানে অধিকার করে বাস করা···। নিজে
ভাবনা নিয়ে বাস করি, পথ দেখ ···ভক্ত করেন ভগবানে
জপ, ভগবান করেন ভক্তের জপ।···আমি নিত্যগোপালকে
মান দেই, তিনি আমাকে মান দেবেন।···নিত্যগোপালকে
একজন বলেছিলেন, ঠাকুর, তুমি তো ভগবান—তিনি
জবাব দিলেন নেকড়াতে আতর মাখানো থাকলে ছি
নেকড়াতেও গন্ধ হয়—আমি ছিন্ন নেকড়া—ভগবানের গা
মাখানো আছে বলেই আমার গন্ধ···। শ্রীনিত্যগোপাল
বীর্য দিয়াছেন. আমি তাই ধারণ করেছি—দৈব নি
রাখত শরৎকুমারী বসু—বেদান্তকে আমি প্রসব করেছি
পিতা নিত্যগোপাল মাতা পুরুষোত্তমানন্দের মিল
বেদান্ত প্রসূত হয়েছে।···আমাকে পূজা করতে এলো ন
তাঁর পূজা কর···তিনি শ্রীমুখে বলেছেন আমাকে কে
কিছু দিলে আমি তা অস্বীকার করতে পারি না···রাখা
দাসের স্ত্রীর অসুখে কাঁদছেন···এত স্নেহ এত মায়া-
মমতাকে যোগমায়া করে তুলেছেন তিনি মায়া ব্রহ্ম সমন্ব
করে···নিত্যগোপাল, আমার ব্যক্তি বিশ্ব জীবনে তোমা
জয় হোক···রক্তাক্ত ধরা তোমার ডাকে···জগ
নিত্যগোপাল। সব আদর্শ, সব মতবাদকে আজ মিল
হবে—।

২৩, ৬, ১৯৫৬। ওঁ নমো···। আমি প্রাণের ক
বার বার সহস্রবার বলেছি। যে যুগ ভবিষ্যতে আসছে
প্রাণের যুগ—বহু সংঘর্ষ ঝগড়া বিবাদের মধ্য দিয়ে মে
স্তর পার হয়ে এসেছে বিশ্ব; জাতিতে জাতিতে, নিজে
স্বার্থে পরের স্বার্থে, জড়ের স্বার্থে অজড়ের স্বার্থে সং
মনের স্তরের ঘটনা। প্রাণের স্তরে সকলের স্বার্থ এক-
সেখানে দুইজনের ব্যথায় দুইজনে দুইজনকে ব্যাখ্যা করে

ছোলার ডালের দুটো দাল একটা খোসা দিয়ে আটকানো —অর্দ্ধনারীশ্বর—খোসার আবরণ না থাকলে ঐ দুটো দল বাড়তে পারত না। প্রাণতত্ত্বের গতি দুটো—বাইরে থেকে ভেতরে, ভেতর থেকে বাইরে, যেমন রক্তের দুটো গতি—ভিতরের রক্তের বহির্জগতের সঙ্গে যোগ থাকা দরকার—সেইখানে বায়ুর সঙ্গে মিশে মলিন রক্ত শুদ্ধ হয়।…পুরুষোত্তম যাঁরা আসেন তাঁরা দুই দিক দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করেন—আদর্শ দিয়ে আর আবর্তন দিয়ে …বৃন্দাবনে এই দিক দিয়ে কৃষ্ণ আপনার হলেন।… জড়ের ক্ষুধা মিটিয়ে কৃষ্ণ আদর্শ দেন।…গীতার আদর্শ আছে, বন্ধন নেই—আদর্শ দিয়ে তাকে টানলে হবে না—activity method প্রয়োগ করতে হবে। আমার জড় অজড় একই…। পুরুষোত্তম কৃষ্ণে দেহ দেহী নাম নামীর ভেদ নাই। গুরুসেবা কর—নিজের ক্ষুদ্রতা দূর করবার ওটা একটা পথ। সেবাটা কর্ম বলে জড়, কিন্তু একজন ব্যাপকগভীর জীবনের সেবা তাঁরই খুশী ও তৃপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে করা হচ্ছে বলে সেটা অজড়ধর্মী হয়ে পড়ে… গুরুর-জীবন যদি কল্যাণধর্মী হয় তবেই সেটা বাস্তবিক হয়। আদর্শবাদী অজড়ের মধ্যে দিয়ে জড় পায়, জড়-প্রধান লোক জড়ের মধ্য দিয়ে অজড় পায়—নির্বোধ গুহক হনুমান এই খানে দাঁড়িয়ে ব্যাপক পুরুষোত্তমকে পেয়েছিলেন। সেবা জড়ধর্মী, কিন্তু তার মধ্য দিয়েই অজড় এসে গেল—শক্ত চড়িয়েই তাই ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায়।…কোন একটা স্থানে আটকাতে হবে—তাই আদর্শহীন শিশুর জন্য পিতামাতার জড়ীয় আবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।…আমিত্ব গেলেই ভগবান নেমে আসেন। বিল্বমঙ্গল যেদিন চিন্তামণির ধ্যানে লজ্জা ঘৃণা ভয় সব বিসর্জন দিতে পেরেছিল, সেইদিন সেইখান থেকেই ভগবান নামলেন।… যারা খুব জড়বাদী তাদের কাছে আদর্শকে খুব বড় করা উচিত নয়। গুরু সেবার মধ্য দিয়ে আদর্শ পায়।… লোচন দাস ও নরোত্তম—নরোত্তম সেবা করে লোচনদাসকে দীক্ষা দিতে বাধ্য করলেন,-দশরথকে কৈকেয়ী সেবার মধ্য দিয়ে দুর্বল করেছিল।…বড়দের কাছ থেকে আদায় করতে হয় সেবার মধ্য দিয়ে। আমাদের পথ শরণাগত হওয়া—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য শরণাগত হও—তোমার সর্বধর্ম আমি রক্ষা করব। ভগবান শরণাগত ভক্তের অতীতের সব ভার গ্রহণ করেন। ফাঁকি দিয়ে এ পথে চলবে না—তিনি যে দেবেন, তিনি তো নূতন কর্তা স্বীকার করেন না—তাঁকে তুমি কর্তা বানিয়ে দাও—তিনি আবার তোমাকে কর্তা করে দেবেন।…নিজের ভাবনা নিজে ছেড়ে দিয়ে তাঁর ভাবনা ভাব…জড় জড়ই নই—পাবকের বুকে বুকে মিলিয়ে পাবককে ধামিক কর। দেহ যখন দেহ হিসাবেই ব্রহ্ম বস্তু তখন সে দেহের মধ্য দিয়েই ব্রহ্মকে প্রকাশ করা যায়। …দেহ দিয়েই সেবা কর—কিন্তু সরল হও। মহাপ্রভু বলেছিলেন পাপীর উদ্ধার আছে, ভণ্ডের উদ্ধার নেই। মানটা জড় বস্তু—চৈতন্যমিশ্রিত জড় বস্তু নাম দিয়ে গুরু শিষ্যকে পরিশোধিত করেন।—অকপট হও—প্রাণ সাধনার অকপটতাই হল একমাত্র যোগ্যতা।…

২৭, ৭, ৫৬।…বৃন্দাবনে যখন ছিলাম তখন একটা লীলার কথা শুনেছি—ভাগবতেও তার উল্লেখ আছে—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী বৃন্দাবনে যমুনার ওপারে ব্রজগোপীদের সৌভাগ্য পাওয়ার জন্য তপস্যা করছেন। সেখানে আমি গেছি—কুমারদের নিয়ে রান্না করে খেয়েছি…। নারায়ণকে দিয়ে লক্ষ্মীর সাধ মিটল না।—এই ঘটনার ব্যাখ্যা কি? কেন্দ্রীকৃত শক্তি—centralised wealth—হল বৈকুণ্ঠ আর বৃন্দাবন হচ্ছে decentralised wealth-এর স্থান, তাই জন্য লক্ষ্মীর হাতে আবর্তন: যেমন ভারতের টাকা বিলেতে জমত, যেমন গ্রামের ধন কলকাতায় ফেঁপে ওঠে, যেমন কাঙালের টাকা বিড়লার ঘরে জমছে, তেমনি মাটির মানুষের সৌভাগ্য দিনের পর দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত সৌভাগ্য জমা হয়ে যাচ্ছে বৈকুণ্ঠে। বৃন্দাবনে এই সব ধন ভাগ করে দেওয়ার কথা—যে ধন তুমি ভাগ করে না নিচ্ছ সে ধন তোমার বিপদ আনবে।…ঐশ্বর্যের থেকে মাটির দেশে অবতরণ করলেন—নরহরি শ্যাম কৃষ্ণ। অবতরণের দ্বারা ধন অবস্থাটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।… বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী সাধনা করছেন মানে শহর গ্রামে ছড়িয়ে পড়বার জন্য আগ্রহান্বিত। যে পর্যন্ত লক্ষ্মী decentralised না হচ্ছেন সে পর্যন্ত লক্ষ্মী নিরাপদ নন।

…উৎপাদন করবে গ্রাম, আর তুমি শহরে বসে ভোগ করবে ?—হয় না। মাটির মূল্যের সংস্থাপক ভাগবত। …সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ছবি এঁকেছে ভাগবত—বৈকুণ্ঠের সঙ্গে মাটির, ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের, কুলীনের সঙ্গে অকুলীনের 'আইল' (ভেদচিহ্ন) কৃষ্ণ ভেঙে দিয়ে গেছেন। social wealth হচ্ছে বৃন্দাবনের লক্ষ্মী। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী সার্থক হবেন বৃন্দাবনে। নারায়ণ যখন মাটির ঘরে লক্ষ্মী সেই তো গণ তন্ত্র—নারায়ণ তন্ত্রই গণতন্ত্র। নরনারায়ণ আশ্রম কিষণ-সেতু কৃষ্ণের পূজা করে। তার ধনিকের ধন ও শ্রমিকের শ্রম দুই-ই চাই।…ধনিকত্ব শ্রমিকত্ব দুটো মনোবৃত্তি—ধন বা শ্রমের পরিমাণ দিয়ে ধনিকত্ব শ্রমিকত্ব নির্ধারিত হয় না…ধনও সমাজের, শ্রমও সমাজের সম্পদ—কোন একটাই কারো একচেটিয়া নয়। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের প্রাণ-পুরুষ…যে কাম নিয়ে মানুষ বিপদে পড়েছে তার technique দিয়ে গেছেন শ্রীকৃষ্ণ।… কামকে, exploitationকে বৃন্দাবনের প্রেমে গড়ে তোলা যায়।…নরনারায়ণ আশ্রম কোন দলাদলির মধ্যে যাবে না—সে ধনিক শ্রমিক সমাজ সংসারের মধ্যে সমন্বয় আনবে।…সমাজ বলতে ধন ও শ্রম দুই-ই বুঝায়।…ধন ও শ্রমের সামঞ্জস্য স্বধর্ম্ম—এই স্বধর্ম এই গণতন্ত্র আমি বুঝি—আধ্যাত্মিক সোস্যালিজম, সামাজিক সোস্যালিজম সবই আজ প্রয়োজন।…সঙ্ঘ সঙ্ঘ সঙ্ঘ—আমাদের পথ সঙ্ঘ।…প্রাণকে যদি বাঁচাতে হয় তবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, দল গড়তে হবে, কিন্তু কম্যুনিজমের দলে ভুলোবে না।…যজ্ঞ করতে হবে—একে অপরের ভাবনা কর—পরস্পরং ভাবয়ন্ত—প্রেমের দল গড়তে হবে—প্রেম আমাদের সকল কিছুর মূলমন্ত্র…।

২৬-৭-৫৬। …চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণোক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ—

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্মময়॥

—এ দুটো চরণে বর্তমান যুগের সমস্তখানি কথা রয়েছে, এ দুটো বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। বর্তমান যুগের মানুষ এই দুজনেই চাইছে। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত একটি পাতাও নাকি নড়ে না—তাহলে মুসলমান ও ইংরেজদের যাওয়া আসার কি কোন অর্থ নাই ?… এই দুটো আস্বাদন এক জীবনে সমভাবে না থাকলে পূর্ণ জীবন হয় না। ভাগবতে উভাবিতয় চক্রে আত্মানম্ বিশ্বসৃট্ ঈশ্বর। …একদিকে গো অন্যদিকে গোপ, একদিকে ইন্দ্রিয় অন্যদিকে বস্তুজগৎ, একদিকে ভোক্তা অন্যদিকে ভোগ্য, একদিকে দ্রষ্টা অন্যদিকে দৃশ্য।…মূল থেকে নি কেউ—তাই দুটোতে ঝগড়া। জড়ের মূলও যিনি, অজড়ের মূলও তিনি—এই দুটো না মিললে জীবন হয় না—মানুষের জীবনে এই দুটোর সমন্বয়।…এতকাল এই বিরুদ্ধ ধর্মকে কেউ মেলাতে পারে নি—হেগেল একে রকম করে দেখলেন, মার্কস্ আর এক রকম করে—কৃষ্ণ এই দুটোর সমন্বয় করলেন।…জেম্‌স্ জিন্‌স্-এর কথাটি আমার মনে রেখো—complete objectivity can only be regained by treating the observer and the observed as parts of a single system. …দাতা গ্রহীতা যদি দুজন থাকে তবে কিছুতেই মামলার নিষ্পত্তি হয় না—বুদ্ধির ক্ষেত্রে এর মীমাংসা হবে—রেভেন্যু অফিস কোনদিন কি কি মীমাংসা করতে পেরেছে ? · এ সংসারে স্বামী স্ত্রীর ঝগড় কিছুতেই বিধির ক্ষেত্রে মিলবে না, মনিব ভৃত্য… স্বামীর কথা স্ত্রী বোঝে না, প্রজার কথা রাজা বোঝে না …অহং ন নিস্বাৎ—তৎ ত্রজম্। তিনি অন্ন অন্নাদ—আনন্দকে যারা ব্রহ্ম বলে জেনেছেন তাঁদের সম্বন্ধে শ্রুতি লিখেছেন তিনি অন্নবান হন, অন্নাদ হন। অন্নাদ মা প্রচুর অন্ন খেতে পারে যিনি।…

ক্রমশ

প্যাথেটিক্ ফ্যালাসি (Pathetic Fallacy)

॥ শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ; বি টি, ডি এসই ॥

ইংরাজী কাব্যতত্ত্বে "Pathetic Fallacy-র একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই শব্দটি হচ্ছে রাস্কিনের সৃষ্টি। বর্তমানে এটি শুধু কাব্য তত্ত্বেরই জিনিস নয়, এখন এটি একটি বিশিষ্ট অলঙ্কার হিসাবেও পরিগণিত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে Pathos বা felling-এর fallacy বা অনুপপত্তি।

ভাবের আবেগে বা সুখ-দুঃখের বিহ্বলতায় কবিরা কখনও কখনও জগৎটাকে রাঙা চোখে দেখেন। তখন তাঁদের একটা অদ্ভুত ধরণের ভুল হয়, তাঁরা নির্জীব পদার্থকে সজীব প্রাণী হিসাবে দেখেন এবং নির্জীব পদার্থের উপর মানুষের সুখ-দুঃখ প্রীতি-বিরক্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করেন। তাঁদের এই ভাব-বিলাসের ফলে তাঁদের মনে হয় নির্জীব পদার্থগুলিই যেন সজীব প্রাণীদের মত আচরণ করছে। এইটেই হচ্ছে Pathetic Fallacy অলঙ্কারের মূল কথা। এই অলঙ্কারটি সংস্কৃতের "সমাসোক্তি" অলঙ্কারের অনুরূপ। এরই ফলে কবিরা দেখেন তটিনী অভিসারে চলেছে, নেহাই "ঠকা-ঠাই ঠাই" করে কাঁদে, হাতুড়ি ছুটি মাগে, বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে, জলোচ্ছ্বাস রুদ্ধ আবেগে গর্জন করে, ইত্যাদি।

রাস্কিন তাঁর Modern Printers নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এই Pathetic Fallacy-কে কাব্য-তত্ত্বে খুব উচ্চ স্থান দেন নি। তিনি বলেন কবি যখন সুখ-দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়েন, তখন তাঁদের দেখায় ভুল শোনায় ভুল হিসাবের ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক হয় না। সেটা কাব্য হিসাবেও অপাংক্তেয় হয় না। কিন্তু সেই ভুল দেখা বা ভুল শোনার ব্যাপারটাকে একটা বাহ্য অলঙ্কার হিসাবে যত্র তত্র প্রয়োগ করলে খুব অন্যায় হয়। তাতে কাব্যের অপমৃত্যু হয়।

রাস্কিন তাঁর "Of Pathetic Fallacy" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি আরম্ভ করেছেন subjective এবং objective এই দুটি শব্দের বার্থতা নিয়ে। তিনি বলেছেন জগতে কোনও জিনিসই নির্জলা objective বা সম্পূর্ণ subjective হতে পারে না। একটা মিষ্টি জিনিসের মিষ্টতাটা একান্তভাবে তার বস্তুগত ব্যাপার না। মিষ্টতাকে যে অনুভব করবে, তার মধ্যেও এর পরিচয়টা নিহিত আছে। একটা নীল ফুলের নীলত্ব নিছক ফুলের মধ্যেই নিহিত নেই, যার চোখে সেটা নীল বলে মনে হবে, তার উপরেও নির্ভর করছে ঐ ফুলের নীলত্বটা। (§ ১-২)

কাজেই কোনও জিনিসের বর্ণনা করতে হলে subjective objective প্রভৃতি বড় বড় শব্দ ব্যবহার না করে বলা উচিত "এটা এই রকম জিনিস," কিংবা "এটা আমার কাছে এই রকম বলে মনে হয়"—এই পর্যন্ত। এর বেশী আমরা কিছু বলতে পারি না। বন্দুকের বারুদকে যদি আমরা বিস্ফোরণ করতে না পারি, তা হলে বলতে পারি না যে বিস্ফোরণটা subjective, ওটা বারুদের বস্তুগত সত্য নয়, ওটা হচ্ছে কাল্পনিক পদার্থ। (§ ৩) কাজেই একটা জিনিসের সত্য পরিচয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমাদের বলা উচিত "জিনিসটাকে আমার এই রকম মনে হচ্ছে"। তবে এই মনে হওয়াটা ঠিকও হতে পারে, আবার বিরাট সুখ-দুঃখে মাথার গোলমাল হলে সেটা বেঠিকও হতে পারে। দুঃখের আবেগে, বা সুখের বিহ্বলতায়, অথবা ক্রোধের উত্তেজনায় আমাদের দেখার মধ্যে মাঝে মাঝে ভুল হয়। ভাব-বিহ্বল অবস্থায় সত্যিকারের ভুলটা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে। (§ ৪) সেই জন্যই সেই ভুলটা প্রায়ই মিষ্টি লাগে।

"দেবতার গ্রাস" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছেন—

"খল জল ছল ভরা তুলি লেখা ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ"

তখন রবীন্দ্রনাথ ভুল করে জলকে 'খল' বলেছেন, ভুল করেই জলের মধ্যে নর-শিশুর কামনা লক্ষ্য করেছেন। বিজ্ঞানের বিচারে এটা ভুল নিশ্চয়ই। কিন্তু কাব্যের বিচারে এই ভুলটাই মিষ্টি জিনিস। এই ভুলের জন্যই জলটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে, বর্ণনা সার্থক হয়েছে, pathos-টা রসঘন হয়ে উঠেছে।

রাস্কিন বলেন আমরা শিল্পের বিচারের দিক দিয়ে বরাবরই দেখে এসেছি যে অসত্য জিনিসটা কোনও সময়েই সুন্দর বা রসের জিনিস হয় না। তবে কাব্যের দিক দিয়ে অনেক সময় অসত্য দৃষ্টির বিভ্রমগুলিও মাঝে মাঝে সুন্দর বলে মনে হয়। তার কারণ হচ্ছে Pathetic Fallacy অথবা ভাব-বিহ্বলতা জনিত অনুপপত্তি। (§ ৪)

এই অনুপপত্তিটা দু-ভাবে হতে পারে। একটা হচ্ছে মনের বিহ্বলতার জন্য হিসাবের বেঠিক হয়ে যাবার জন্য দেখার ভুল, আর একটা হচ্ছে ইচ্ছা করে কল্পনার বাঁকা চোখ দিয়ে দেখবার জন্য দৃষ্টির ভুল (যাকে রাস্কিন বলেছেন fallacy of willful fancy) (§ ৫)

অনেকের মতে এই দু-রকমের ভুলই কাব্য-সৌন্দর্যের প্রাণ বস্তু। অর্থাৎ pathetic fallacy-টা যে ভাবেই হোক না কেন, সেটা কাব্যের সৌন্দর্য ও সজীবতাকে বাড়িয়ে দেয়। রাস্কিন কিন্তু এই মতবাদটিকে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন ভাবের গভীরতার জন্য মাঝে মাঝে যে সমস্ত দৃষ্টির বিভ্রম হয় সেটা কাব্য বটে, তবে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য, এবং ইচ্ছা-কৃত ভুলটা কাব্যই নয়, সেটা হচ্ছে জ্যাঠামি। (§ ৬)

সাধারণ মানুষ Pathetic Fallacy-কে কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার একটা বিশেষত্ব বলেই মনে করেন। কারণ Pathetic Fallacy-র মধ্যে যে fallacy বা অনুপপত্তি আছে, তার মূলে আছে গভীর ভাব এবং ঐ ভাবজনিত বিহ্বলতা। এই ভাব-বিহ্বলতা বা আবেগের প্রাচুর্যই নাকি Pathetic Fallacy-কে কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ করে তোলে।

কিন্তু রাস্কিন বলেন, শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে ভাব-গভীরতা থাকলেও ভাব-বিহ্বলতা থাকে না। এই বিহ্বলতাটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের লক্ষণ। এই মতবাদের উদাহরণ প্রসঙ্গে তিনি Dante এবং Coleridge এর দুটি উক্তি তুলে দিয়ে দেখিয়েছেন Dante যখন spirit-দের পতন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন তারা পড়ছিল "as dead leaves flutter from a bough", তখন তিনি গাছের পাতাগুলিকে পাতা হিসাবেই দেখিয়েছিলেন। Coleridge যখন অনুরূপ ক্ষেত্রে বর্ণনা করলেন—

"The one red leaf, the last of its clan
That dances as aften dance it can"

তখন তিনি মিথ্যা বর্ণনা করলেন। তাই তাঁর সমাসোক্তি অলঙ্কারটি দান্তের উপমা অলঙ্কারের চেয়ে নিকৃষ্ট-তর জিনিস হয়ে উঠেছে; কারণ দান্তের বর্ণনায় উপমা অলঙ্কারের মধ্যে দৃষ্টির ভুল হয় নি, গাছের পাতাকে পাতা হিসাবেই দেখা হয়েছে, আর কোলরিজের বর্ণনায় মধ্যে মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এতে রসিক মন বিমুখ হয়ে পড়ে। (§ ৬)

এর কারণ আছে। কোলরিজের বর্ণনায় মধ্যে ভাব-নিষ্ঠা নেই, আছে মিথ্যা অলঙ্কারের আস্ফালন; সেটা fallacy বটে, তবে pathetic fallacy বা আবেগ-ধর্ম-পুষ্ট fallacy বা অনুপপত্তি হয় নি, তাই তার স্বাভাবিকত্ব বা সার্থকতা নেই।

যে অবস্থায় Pathetic Fallacy সার্থক অলঙ্কার হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে মনের চরম আবেগের অবস্থা, যখন সুস্থ মস্তিষ্কে কিছু দেখা বা শোনা বা অনুভব করা সম্ভব হয় না, তাই তখন আসে দৃষ্টির বিভ্রম, সিদ্ধান্তের অনুপপত্তি ও অপযুক্তি।

মহৎ-হৃদয়ের কিছুটা মহত্ব না থাকলে এই অনুপপত্তিগুলি আসে না। কারণ যে মানুষ সুখে-দুঃখে কিছুতেই কাতর হয় না, অথচ যে মানুষটা একেবারে ,স্থিতধী মুনি

করিও না, সে নিতান্তই নির্মম হৃদয়হীন মানুষ। সুখে-দুঃখে অভিভূত না হওয়াটাই একটা বাহাদুরির ব্যাপার নয়। তবে সত্যিকারের বাহাদুরির ব্যাপারটা হচ্ছে সেই জাতীয় শিল্পী হওয়া, যারা সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলিকে চরম ভাবেই উপলব্ধি করবে, অথচ এই আবেগের জন্য ঝাপসা চোখেও দেখবে না, বা দিশেহারাও হয়ে পড়বে না, সমস্ত মানুষটি সমগ্র সত্তা নিয়ে লোহার মতই শ্বেত উত্তাপে জ্বল্ জ্বল্ করবে, অথচ লৌহ মানবের মতই দাঁড়িয়ে থাকবে, দুঃখের উত্তাপে বাষ্পীভূত হবে না, যদিও বিগলিত হয় তবুও তার ওজন হ্রাস পাবে না। রাস্কিনের ভাষায় 'The whole man stands as in an iron glow, white-hot, perhaps, but still strong, and in no wise evaporating; even if he melts, losing none of his weight". (§ ৮)

কাজেই শিল্পের বিচারে তিন শ্রেণীর মানুষ আছে। এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে তারা, যারা অনুভব করতে পারে না বলেই দেখা বা শোনায় ভুল করে না, ফলে তারা primrose-কে নিছক primrose হিসাবেই দেখে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে তারা যারা গভীর ভাবেই অনুভব করে এবং এই গভীর অনুভূতিতে অভিভূত হবার জন্যই তাদের চোখে primrose-টা সব সময় primrose হিসাবেই প্রতিভাত হয় না, সেটাকে তাদের ভাবার্ত্ত দৃষ্টিতে কখনও মনে হয় দূর আকাশের তারা, কখনও বা মনে হয় পথ হারানো ছোট্ট একটি মেয়ে। তৃতীয় শ্রেণীতে আছে সেই জাতীয় মানুষ যারা গভীরতম অনুভূতি সত্ত্বেও দেখায় ভুল করে না, বা যাদের দৃষ্টির অনুপপত্তি হয় না।

এই প্রথম শ্রেণীর লোক হচ্ছে ভাবহীন অকবির দল, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে "ভাবার্ত্ত" কবির দল (যাঁরা রাস্কিনের মতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি) আর তৃতীয় দলে আছেন "ভাব শিল্পী" কবির দল (রাস্কিনের মতে এঁরাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কবির দল)। (§ ৮)

এই তিন জাতীয় লোক ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা তীব্রভাবেই অনুভব করেন, কিন্তু বাস্তব জগৎকে ঠিক বাস্তব দৃষ্টিতে না দেখে তাঁরা যেন অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখেন এবং এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির ফলেই ইন্দ্রিয়াতীত জগতের রহস্যের সন্ধান পান। এঁরা হচ্ছেন "কবি" নন, "নবীর" (prophet) দল। (§ ৯)

এই নবী (prophet)-দের কথা আমাদের আলোচ্য নয়। তবে প্রথম শ্রেণীর কবিদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবার আছে। তাঁরা ভাবাবেগে অভিভূত হন বটে, কিন্তু ভাবার্ত্ত হয়ে ভুল-ভ্রান্তি করেন না। তাই অনেক সময় মনে হয় এঁরা বুঝি অনুভূতির উর্দ্ধ স্তরে অবস্থিত নির্জনা মনলোকেই বিহার করেন, এঁদের যেন হৃদয় নেই, আছে শুধু শিল্পী-সত্তা। তাই দেখা যায় তীব্রতম আবেগের মুহূর্ত্তেও মহাকবি দান্তের মধ্যে অনুভূতির বৈকল্য আসে নি। সেই জন্য অনেকে দান্তেকে কঠোর-হৃদয় ব্যক্তি বলে মনে করেছে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি কঠোর হৃদয়ের লোক ছিলেন না। তবে তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর কবি, তাই ভাবের আবেগে তাঁর দৃষ্টির ভ্রম-জনিত অনুপপত্তি হয় নি। (§ ১০)

মনস্তাত্বিক পরিস্থিতির জন্য যে-সব ক্ষেত্রে কবির আবেগ উদ্বেগের সৃষ্টি আছে, সে-সব ক্ষেত্রে রাস্কিন Pathetic Fallacy-কে স্বীকার করতে রাজী আছেন, কিন্তু অযথা শুধু একটা ভঙ্গি হিসাবে তার প্রয়োগকে তিনি সমর্থন করতে পারেন না। যেখানে মনের মধ্যে ঝড় তুফান নেই, চিত্তে বৈকল্য নেই, দুঃখের পাবক গলনে উত্তাপ নেই, সেখানে শুধু শুধু ঠাণ্ডা মাথায় ঐ সমস্ত Pathetic Fallacy জাতীয় অলঙ্কারের প্রয়োগ হচ্ছে একটা নীচ ও ঘৃণ্য কাজ। রাস্কিনের ভাষায় "And there is no greater baseness in literature than the habit of using those metaphorical expressions in cold blood" (§ ১১)

এর পর রাস্কিন হোমারের ইলিয়াড্ কাব্য থেকে এবং একটি বিখ্যাত ব্যালাড্ কবিতা থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখিয়েছেন এই বিখ্যাত কাব্যাংশগুলির মধ্যে তথাকথিত "ভাবের ভাষা" নেই। ব্যালাডে বর্ণিত বালিকাটি অতি সাধারণ গদ্যের ভাষায় কথাবার্ত্তা বলেছে এবং অতি কঠোর ট্রাজিডিকে স্ফটিক খণ্ডের মত স্বচ্ছ ও সংক্ষিপ্ত

আকারে প্রকাশ করেছে। অথচ তার আবেদনটা হয়েছে গভীর এবং একান্ত ভাবেই মর্মস্পর্শী। (§ ১২-১৩)

রাস্কিনের মতে একজন কবির কবিত্বটা নির্ভর করে দুটো জিনিসের উপর। একটা হচ্ছে গভীরভাবে অনুভব করবার শক্তি, আর একটি হচ্ছে সেই অনুভূতিকে নিয়ম-সংযমে বশে রাখবার শক্তি। কবির হৃদয়ে ভাব-গভীরতা এমন কি ভাব-উন্মত্ততা থাকবে ঠিক কথা, কিন্তু তাই বলে কবিকে ভাব-মাতাল হলে চলবে না। তবে এই ভাব-গভীরতাকে বশে রাখবার অন্তত একটা সীমা থাকবে। যে মানুষটা কিছুতেই বিচলিত হবেনা, সে পাশবিকতা অন্যায়। "A poet is great first in proportion to the strength of his passion and then that strength being granted, in proportion to his government of it; there being. however always a point beyond which it would be inhuman and monstrous if he pushed this government........" এই জন্যেই রাস্কিন Old Testament এর prophet দের তীব্র আবেগ-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের অভিব্যক্ত বাণীর সমাসোক্তি অলঙ্কারগুলিকে সমর্থনই জানিয়েছেন। (§ ১৪)

সুতীব্র আবেগ অনুভূতির প্রেরণায় ভাব-নিষ্ঠ কবিদের মুখ দিয়ে যে সমস্ত সমাসোক্তি অলঙ্কারের ভাষা স্বতঃই উৎসারিত হয়ে পড়ে, সেই সমস্ত আলঙ্কারিক ভাষাকে হাট বাজারের দৈনন্দিন কাজ কারবারের প্রয়োজনের মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করাটা অকবিত্বেরই লক্ষণ। অনুভূতি নেই, অথচ ঠাণ্ডা-মাথায় নিষ্প্রাণ হিসাবী কল্পনা দিয়ে সুতীব্র অনুভূতির আবেগময়ী ভাষার অনুকরণটা একটা প্রকাণ্ড অপরাধ। এটা যেন নির্ব্বাপিত লাভার স্রোতকে শুকনো পাতার ধূসরিমা দিয়ে আগুন-রাঙা করে তোলবার মত, কিংবা তুষার কণার আবরণ দিয়ে শ্বেত উত্তাপের শ্বেতত্বের অনুকরণের মতই ব্যর্থ প্রচেষ্টা। "As if we should try to make an old lava stream look red-hot again by covering it with dead leaves or white-hot with hoar-frost". (§ ১৫) এটা শুধু অন্যায়ই নয়, এটা একটা ভণ্ডামি, সত্য এবং প্রকৃতির মুখের ওপর একটা উদ্ধত মিথ্যাবাদ।

Pathetic Fallacy আমরা শুধু তখনই স্বীকার করবো, যখন সেটা সত্যিই pathetic হবে, অর্থাৎ যখন তার মূলে ভাবের গভীরতা থাকবে; আর সেটা যদি না থাকে, তা হলে সেই অলঙ্কারটা শুধুই অক্ষমশক্তির ব্যাপার হবে। ভাবের গভীরতাতেই তার শক্তি, আর ভাবের মিথ্যা অনুকরণে তার দুর্বলতা। "Pathetic fallacy is powerful only so far it is pathetic, feeble so far as it is fallacious". (§ ১৬)

জাগে অনুরাগে

॥ শ্রীবিভা সরকার ॥

চিত্তের গভীর হতে উৎসারিত আলো
সে তোমারই আলো।
আত্মার অমিত মুক্তি দেখায় প্রকাশে
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণের উল্লাসে।
হৃদয়ের চির-চাওয়া জাগে চিরন্তন
ভাঙে তাই মাটির বন্ধন।
লোকোত্তর অভিযাত্রী আনন্দ অসীমা,
ছেড়ে যায় এই মর্ত্ত্য সীমা।

অসীমের পূর্ণলোকে ওঠে সে আকুলি
যায় রুদ্ধদ্বার যায় খুলি।
জীবন-জিজ্ঞাসা ধন্য সে মহাকুমার
ধন্য প্রাণ প্রণমে তোমায়।
পরম অমৃত রসে প্রাণ পাত্র পূর্ণ মোর আজ
ধন্য আমি ওগো রসরাজ!
সুষুপ্ত চৈতন্য মোর চিদানন্দে জাগে
মনরাধা জাগে অনুরাগে!

স্বামী বিবেকানন্দের মহনীয়তা

॥ শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ ॥

অসীম সাহসী স্বামী বিবেকানন্দের তেজঃপূর্ণ অন্তঃকরণ কি প্রকার মহত্ত্বাদে উদ্ভাসিত ছিল তাহা তাঁহার জীবনী পাঠে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মহনীয়তা ছিল বিশাল, সুগভীর ও সহানুভূতি সম্পন্ন। সর্ব্ব বিষয়িনী প্রীতির প্রভাবে তাঁহার হৃদয় সর্ব্ব সময়ে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। বেদান্তের মহান আদর্শ তাঁহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়া কর্মজীবনে সর্ব্বদা প্রীতির নির্ঝর খুলিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। সর্ব্ব জীবে ঈশ্বর-সত্তা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করিতেন বলিয়া মুচি মেথর, ডোম-চণ্ডালকে জাত্যাভিমান ভুলিয়া "আমার ভাই, আমার রক্ত" বলিয়া আলিঙ্গন দিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। নিজেকে তাহাদের হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে তিনি কোন মতেই পারিতেন না। বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত সাধক হিসাবে তিনি তাহাদের সহিত মিশামিশি মিশিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। স্বদেশবাসীর অভাবনীয় দৈন্য, দুর্দশা ও দুর্বিষহ অভাব দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কাতর হৃদয়ে সকলের নিকট স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগভরে আকুল আহ্বান জানাইয়াছেন, অকুণ্ঠ আবেদন দ্বারা সকলের মনে প্রেরণা জাগাইয়াছেন, বজ্রদৃপ্তকণ্ঠে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, বিসদৃশ মনোবৃত্তি ও অহিতকর আচরণ দূর করিতে চাহিয়া কর্মস্রোতে নিজেকে ভাসাইয়াছেন।

তাঁহারই অনুপ্রেরণায় নিরন্নকে আহার দিবার ব্যবস্থা হয়, নিরক্ষরতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে শিষ্যা নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বসিলেন, কারণ এ-দেশে নারীজাতি অধিকতর অসহায়, অনুন্নত।

স্বামীজীর সেবা-ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত? ভক্তি, প্রেম, সহানুভূতি ছিল তাঁহার মহনীয়তার উপাদান, চরিত্রের ভূষণ। দরিদ্র ও বিপন্নের মধ্যে শ্রীভগবানের স্বরূপ দেখিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া তাহাদের নিকট অগ্রসর হইতেন। রুগ্ন, আর্ত্ত, আতুরকে ঔষধ পথ্য ও আহার দিয়া দেব সেবার আনন্দ, তৃপ্তি ও পুণ্য অর্জন করিতেন, অনাথ ও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় ব্যবস্থা দিয়া মানব সেবার ধর্ম্ম পালন করা তাঁহার নীতি ছিল। অপাপবিদ্ধ মনে ত্যাগের গৈরিক পতাকা উড়াইয়া দৈন্য, অজ্ঞতা, দুঃখ ঘুচাইবার প্রয়াসে প্রাণপাত করিয়াছেন —কারণ, ইহাই তাঁহার পরম ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ নীতি, প্রধান আদর্শ। তাঁহার দর্শন বিবেচনা-বোধ, কর্ত্তব্য পালন, সেবা-ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্য কোনভাবে রূপায়িত হয় নাই।

অধ্যাত্ম জনহিতৈষণার মধ্য দিয়া ত্যাগ স্বীকার তাঁহার স্বধর্মপরায়ণ সত্তার সার্থকতা অনির্বচনীয়। তিনি বলিয়াছেন, I see it clear as day-light that you all have infinite power in you! Rouse that up. * * * I don't care for Mukti and all that. My mission is to rouse within you all such ideas ; I am ready to undergo a hundred thousand re-births to train-up a single man.

স্বামীজীর চরিত্রের প্রোজ্জ্বল প্রকাশ উদার নীতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল—গতানুগতিকের মোহাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও কুসংস্কারের নির্মম পাশ তিনি বিমুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজে ব্রাহ্মণ না হইয়াও তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন, ব্রাহ্মণেতর গৃহীভক্তগণকে উপবীত প্রদান করিয়াছেন। আধ্যাত্মসম্পন্ন যোগীবর বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণ প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম জানাতি যঃ সঃ হি ব্রাহ্মণঃ। বেদজ্ঞ বিজ্ঞ পুরুষ জানেন বেদের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকেরাই উপনয়ন গ্রহণে অধিকার আছে। এই সংস্কার অভাবে ইহারা ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পুণ্যদিবস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি

উপলক্ষে তিনি বলিলেন ইঁহারা স্ব স্ব অধিকার অনুসারে ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব গ্রহণ করুন। কালে ইঁহাদের ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিতে হইবে। সেইজন্য স্বামীজীর আদেশে প্রায় ৫০ জন লোক গঙ্গাস্নান করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের চিত্রপট সম্মুখে উপবীত ও গায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। স্বামীজী উপবীত-ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া প্রত্যহ গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে আদেশ দিলেন।

কতকগুলি সামাজিক আচার-ব্যবহার ও দুর্নীতির তিনি বিদ্রোহী ছিলেন, কু-প্রথা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অথচ সাম্যনীতি তাঁহার আদর্শ ছিল বলিয়া তিনি হীনবীর্য্য হিন্দু সমাজকে আত্মসম্বিৎ ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। প্রচলিত প্রথা ভারতীয় বিশিষ্ট সভ্যতা ও হিন্দু শাস্ত্রের বিরোধী বিবেচনা করিয়া প্রসুপ্ত হিন্দু জাতির চেতনা ধৈর্য্য তিতিক্ষা জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বহু শাখা, প্রশাখায় বিভক্ত, অস্পৃশ্যতা-দোষে দুষ্ট হিন্দু-জাতিগুলিকে উপনয়নদ্বারা, দৃঢ় নিবদ্ধ, একীভূত ও সংহত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

তিনি বিশ্বাস করিতেন, বিভিন্ন খণ্ডিত হিন্দু সম্প্রদায় বা জাতিকে একত্রীভূত করিলে প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে উঁহাদের চতুর্ব্বর্ণে পরিণত করা সম্ভবপর হইবে। ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। বিধিমত উপনয়ন সংস্কার নিষ্পন্ন করিলে আত্মজ্ঞানের প্রতি মন ও বিবেক ধাবিত হয়। নিজেকে জানিবার বুঝিবার বাসনা জাগে। সমাজ-জীবনে যথাযোগ্য স্থান ও দায়িত্ব গ্রহণের পথ সুগম হইবে। এই চেষ্টা আত্মচেতনা জাগ্রত করিয়া অভীষ্ট ফল প্রসব করিবে। দীক্ষাগ্রহণ, শিক্ষালাভ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়ের যে সূচনা করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরমযোগী ও ধর্মনেতা স্বামীজীর আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের অনুশীলন কাহিনী অতীব চিত্তাকর্ষক। জপ, ধ্যান প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁহার বিস্ময়কর ও সুগভীর। মননশীলতা ও ধ্যানের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মানসিক শক্তি বিপুলভাবে অর্জন করিয়াছিলেন। ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে পরম পুরুষের চিন্তায় নিমগ্ন থাকা কালে তিনি বাহ্যজ্ঞান বিবর্জিত হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া পড়িতেন। ধ্যান-ধারণা অতি গভীর অবস্থায় চলিয়া গেলে তিনি সমাধিতে উপনীত হইতেন। দেহ তখন খোলস মাত্র, আত্মায় অবস্থিত হইত এই পরম যোগীর সর্ব্বসত্তা। দেহ বা বস্তুগত বাহির শরীর ও আবেষ্টনীর সহিত যখন বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকেনা,—আত্মা তখন চিন্ময় সত্তায় বিলীন হয়। এই অতিপ্রকৃতি অবস্থায় সমাধি লাভ হয়। ইংরাজিতে যাহাকে বলে extra-terrestrial সেই লোকে প্রয়াণ করিলে প্রাণসত্তা আনন্দ লাভ করে, স্ফূর্ত্তি পায়, প্রাণ হয় সৎ-চিৎ-আনন্দময়। ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি তখন সবল হইয়া উঠে। তবে এতাবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয় না পুনরায় আত্মজ্ঞান দেহ-পিঞ্জরে ফিরিয়া আসে। দেহাতীত জ্ঞান কতক্ষণ পর-ব্রহ্মের আস্বাদ বা সাহচর্য্য লাভ করিতে পারে?

ঠাকুর রামকৃষ্ণের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে একবার স্বামীজী অভেদানন্দ মহারাজ, সহোদর ভ্রাতা শ্রদ্ধাস্পদ ৺মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও আর একজনের সহিত গাড়ী করিয়া কাশীপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিতে ছিলেন। তখন ঐ স্থানের পথের পার্শ্বে বাসভবন ছিল না—বন জঙ্গল ও বাগানবাড়ী দৃষ্ট হইত মাত্র। স্বামীজী শিবোহহং বলিয়া অমর সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্যের রচিত নির্ব্বাণের মন্ত্র ইত্যাদি স্তব পাঠ করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন সে ভাবোন্মত্ত মূর্ত্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন। কি যেন একটি লক্ষ্য করিয়া তন্ময় হইয়াছিলেন, দৃষ্টি নিবদ্ধ, বাক্য নিরুদ্ধ, সহচর অতি কষ্টে যথাস্থানে স্থিরভাবে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

হিন্দু শাস্ত্রের মহৎ ভাব-সমূহের ও ভারতীয় দর্শনের সুললিত ব্যাখ্যা যুগপ্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ যে কেবল মাত্র চিকাগো বক্তৃতায় পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি নিউইয়র্কে গিয়া বিভিন্ন স্থানে চিন্তাপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ এই রাজধানীতে গিয়া প্রশ্নোত্তর ক্লাসে জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে

বক্তৃতা দিয়া এমনরূপে তদ্দেশবাসীর হৃদয় জয় করেন যে কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রী তাঁহার নিকট যোগ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। নাতি-বৃহৎ প্রকোষ্ঠটিতে সকলে আচার্যদেবকে ঘিরিয়া পা মুড়িয়া অতি কষ্টে তন্ময়চিত্তে প্রাঞ্জল ও রমণীয় দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলেন। ক্রমে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া উঠিল। রাজযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা থাকিলে, সেদিন পূর্বাহ্নে বহু অধ্যাপক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আসিয়া স্থান সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইতেন। জনপ্রিয়তা এমন বাড়িয়া গেল যে ঐ গৃহের সোপানবলী উৎসাহী শ্রোতৃবর্গের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিত, কোনদিন অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে ধস্তাধস্তি দেখা যাইত। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আগমনে ঐ ভবনের গৃহগুলি পবিত্র হইয়া উঠিত। জুন মাসের মধ্যে আচার্য্য তরুণ বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলি 'রাজযোগ" নাম দিয়া প্রকাশিত হয়। শিক্ষাপ্রদ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ঐ পুস্তক মধ্যে পাঠ করিয়া অমর দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক জেমস্ তাঁহার সহিত দর্শন করিতে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। ঐ গ্রন্থে পাতঞ্জল দর্শনের এক মনোরম ও সুললিত ভাষ্য সন্নিবিষ্ট ছিল। নানা বিষয় আলোচনার পর উভয়ের মধ্যে বেশ প্রেমপূর্ণ বন্ধুতা জন্মে।

চিকাগোর ঐতিহাসিক বক্তা সিদ্ধ পরিব্রাজক ও ধর্মপ্রচারক স্বামীজী মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন (১৮৯৬) মাসে অবিরত চিকাগো, নিউইয়র্ক ও বোষ্টন নগরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সহরগুলিতে বক্তৃতা দেন। নিউ ইংলণ্ডের মধ্যবর্তী 'গ্রীন একারে' এক সম্মিলনে বক্তৃতা করিতে গমন করেন। কতিপয় উৎসাহী ছাত্র বেদান্ত দর্শন শিক্ষা মানসে তাঁহার শরণ লয়েন। ভারতীয় প্রথায় সভাগৃহে বসিবার ব্যবস্থা হয় স্বামীজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ। অক্টোবর মাসে বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটনে তিনি হৃদয়গ্রাহী ভাষণে দর্শন শাস্ত্রের বিবিধ তত্ত্বে সকলকে মুগ্ধ করেন। নিউইয়র্কে একটি পারিবারিক সভায় "ব্রুকলীন নৈতিক সভার" সভাপতি মাননীয় ডাঃ লুইস, জি জেমস্ তাঁহার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া উক্ত নৈতিক সভায় হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দিতে স্বামীজীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তদনুসারে তিনি "পউচ মানসন" নামক সুবৃহৎ ভবনে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দেন, সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রত্যহ উপস্থিত থাকিতেন। এই বক্তৃতাগুলি তাঁহার বেদান্ত প্রচারের এক-প্রকার সূচনা। 'রাজযোগ' প্রকাশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উহার তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

ব্রুকলিন সোসাইটির সদস্যগণ তাঁহার প্রতিভা-প্রসূত বক্তৃতার ফলে হিন্দু আদর্শে জীবন গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। প্রথমে তাঁহার বক্তৃতাগুলির জন্য কিঞ্চিৎ প্রবেশমূল্য নির্দ্ধারিত ছিল, মহানুভবতার প্রেরণায় তিনি সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বিনামূল্যে প্রবেশাধিকারের বিধি প্রবর্ত্তিত করেন। আলোর পথ নিরোধ মহনীয়তার পরিচায়ক।

রবীন্দ্র সঙ্গীত সাথী অক্ষয় চৌধুরী

॥ শ্রীজয়দেব রায় ॥

রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিমণ্ডলে অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র নাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিনি এবং তাঁহার পত্নী যশস্বিনী লেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরাণী ঠাকুরবাড়ীর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অঙ্গীভূত হইয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'ভারতী' পত্রিকার সূত্রে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে উৎসবের অন্ত ছিল না। শরৎকুমারী বলিয়াছেন "নিত্য নিয়মিত গীতবাদ্য বিদ্যালোচনার মত মহোৎসব জন্মোৎসব অন্নপ্রাশন বিবাহ-ব্যাপারও তখন নিত্য কর্মের মধ্যেই ছিল। তা ছাড়া নাট্যাভিনয়, বিদ্বজ্জন-সমাগম, বসন্তোৎসব, এমন কি, হোলিখেলারও বিরাম ছিল না। তেতলায় পরিবারস্থ বধূদিগের মেলা এবং বাগানে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা ছুটাছুটি। তখন ছিল শুধু হাসিখেলা, শুধু মেলামেশা।"

এই হাসিখেলা ও মেলামেশার কর্ণধার ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব অল্প বয়স হইতেই গাঢ় হইয়াছিল, তাঁহার সকল কাজেরই সঙ্গী ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র, সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যোতিরিন্দ্র-জীবন স্মৃতিতে আছে—"ছেলেবেলায় অক্ষয়চন্দ্রকে জ্যোতিবাবুদের বাড়ীর সকলেই 'Poet, Poet' বলিয়া ডাকিতেন। তখন হইতেই তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন এবং জ্যোতিবাবুকে শুনাইতেন। একটু ফাঁক পাইলেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে জ্যোতিবাবুও আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন।"

সঙ্গীতে অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহার অপেক্ষা বেশী ছিল তাঁহার আনন্দ উপভোগ করিবার উদার শক্তি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত জীবনে তাঁহার প্রভাব অল্প নয়। কবি সে কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিয়াছেন—

"বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার সঙ্গী একজন অনুকূল সুহৃদ্ জুটিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম-এ। সে সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি, তেমনি অনুরাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরু ঠাকুর, নিধুবাবু, রামবসু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে-গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনোপ্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ অবৈধ যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন, তাহাকে অজস্র টপাটপ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন। আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইহার অসামান্য উদার ছিল।"

অক্ষয়চন্দ্র বাঁয়া-তবলা সংগতে যথার্থই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"অক্ষয় বাঁয়া-তবলা বাজাইতেও বড় ভালবাসিতেন। আসল যন্ত্রের অভাবে, তিনি সময় সময় টেবিলেই কাজ সারিয়া লইতেন। অনেক সময়ে আমি বেহালা বাজাইতাম, আর অক্ষয় বাঁয়ায় আমার সঙ্গে সঙ্গত করিতেন।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গীত চর্চার সদা সঙ্গী ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। তিনি, অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তিনজনে মিলিয়া বিলাতী পিয়ানোর সুরে বাংলা গান রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সে সময়ে 'আইরিশ মেলডিজে'র সুর ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া আমি যেমনি একটি সুর রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। • • • অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির তত শীঘ্র হইত না। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত।"

এইভাবেই রচিত হইয়াছিল 'বাল্মীকি প্রতিভা'। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অক্ষয়চন্দ্রের কয়েকটি গান আছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথও জানাইয়া গিয়াছেন—"বাল্মীকি প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল-সঙ্গীতের দুই-এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।"

বাল্মীকি-প্রতিভায় এই শ্রেণীর একটি গান হইল—

রাঙাপদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে, তারা।
সুর নর থরথর—ব্রহ্মাণ্ড-বিপ্লব করো,
রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী-পারা।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘুরাও তড়িৎ অসি,
ছুটাও শোণিত স্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।
উরো কালী কপালিনী, মহাকাল-সীমন্তিনী,
লহো জবা পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা।

'মায়ার খেলা'র বিখ্যাত গান 'দেলো, সখি, দে, পরাইয়া গলে'—অক্ষয়চন্দ্রের রচনা বলিয়া অনুমান করা হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের বহু গান আছে। ভারত সঙ্গীত সমাজে অভিনীত 'মানময়ী' গীতিনাট্যে অক্ষয়চন্দ্রের রচিত গান আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-জীবনস্মৃতিতে বলা হয়েছে—"জ্যোতিবাবু সুর রচনা করিতেছিলেন ও অক্ষয়বাবু ক্রমান্বয়ে তাহার সঙ্গে একটির পর একটি গান বাঁধিয়া যাইতেছিলেন। ইঁহারা গানরচনায় একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। এই একদিনকার রচিত গানগুলি হইতেই পরে 'মানময়ী' নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়াছিল।"

রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত প্রেমসঙ্গীত অক্ষয়চন্দ্রের বহু ছিল, কিন্তু সেগুলি অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ইহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।"

এই শ্রেণীর একটি গান—সরফর্দা, মধ্যমান

নিতান্ত না রহিতে পেরে দেখিতে এলাম আপনি,
দেখ আর না দেখ আমায়, দেখিব ও-মুখখানি।
মনে করি আসিব না, এ মুখ আর দেখাব না;
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে কেন যে তাহা নাহি জানি।
এসেছি দিব না ব্যথা তুলিব না কোন কথা
সাধিব না, কাঁদিব না, রব অমনি।
যেথা আছ, সেথাই থাক আর কাছে যাব নাকো
চোখের দেখা দেখব শুধু, দেখেই যাব এখনি।

অক্ষয় চৌধুরী সুরতন্ময় ভাবভোলা হইলেও তাঁহার কণ্ঠে সুর বিশেষ ছিল না বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন—"তাঁর গলায় সুর ছিল না সে-কথা তিনিও জানতেন, অন্যেরা আরো বেশী জানত। কিন্তু তাঁর গাবার জেদ কিছুতেই থামত না। বিশেষ ক'রে বেহাগ রাগিণীতে ছিল তাঁর শখ। চোখ বুজে গাইতেন, যারা শুনত তাদের মুখের ভাব দেখতে পেতেন না। হাতের কাছে আওয়াজওয়ালা কিছু পেলেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে পটাপট শব্দে তাকেই বাঁয়া-তবলার বদলি ক'রে নিতেন।"

তাহাতে কি? অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্র সুর পরিমণ্ডলের অক্ষয় তারকা হইয়া চিরকাল বিরাজ করিবেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সেই বিস্তৃত পরিবেশের কথাও রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই ভুলিতে পারেন নাই—"দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রূপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে একগ্লাস বরফ দেওয়া জল, আর বাটাতে

ছাচিপান। বউঠাকরুণ গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। সূর্যডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।"

বাংলা দেশ ও বাঙালী

॥ শ্রীভারতী ॥

"বাংলা দেশে জন্মিয়াছি বাঙালী নাম ধরি
আমাদের মা সোনার বাংলা তাকেই প্রণাম করি।"

ছেলেবেলায় এ দুটি লাইন ভারী ভালো লাগত, বার বার আউড়াতে ইচ্ছে করত। আজো ভালো লাগে। কেউ যদি এ ভালো লাগাকে সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব বলেন তা হলেও উপায় নেই। কিন্তু নিজের মাকেই যদি ভক্তি ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ আধার বলে ভাবতে না পারা যায় তবে বৃহত্তর জগতকে আপন ভাববার শক্তি মানুষ পাবে কোথা থেকে? জাতীয়তাবোধ যেখানে নেই সেখানে আন্তর্জাতিক ভাবনা কি ফলবান হয়? একের উন্মেষেই তো দ্বিতীয়েরও সূচনা। তাছাড়া 'স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।'—রবীন্দ্রনাথ

বাংলা দেশের কথা ভাবতে গিয়ে একসময়ে মনে হয়েছিল যে এ প্রদেশের সমস্ত কাজকর্মগুলো প্রধানতঃ বাঙালীদেরই প্রাপ্য নয় কেন? সেই ভাবনা অনুযায়ী লেখারও চেষ্টা যখন চলছিল তখন দেখা হল একটি সন্তানবতী হিন্দুস্থানী মেয়ের সঙ্গে। যাদের আমরা সাধারণতঃ ঝি নামে অভিহিত করি মেয়েটি সেই ধরনের কাজ করে। আলাপ করে জানলাম ওর স্বামী বেকার তাই ওকে অসুস্থ শরীরের উপরও কয়েকটা বাড়ীতেই খাটতে হচ্ছে তবুও ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চলছে না। দ্বিধা যেটুকু ছিল কেটে গেল। বুঝলাম স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যারই অন্তর্গত। সর্বমানবিক সমস্যাকে কোনো কোঠায় ভাগ করতে গেলে নিজেদেরই চিত্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়।

আমরা যারা একই জন্মভূমির পীযূষ ধারা পান করে বেড়ে উঠেছি তাদের অন্য কোনো জাতি গোত্র নেই। সুদূর অতীত থেকে বা অদূর কালেও যারা বাংলার বাইরে থেকে এসে এখানেই আমাদের মাতৃদেহের অংশীদার হয়ে বসবাস করছেন তাঁরাও আমাদেরই সহোদর ও সহোদরা। অবশ্য যারা আমাদের শোষণ করে নিজেদের পুষ্ট করতে চান তাদের কথা আলাদা। কিন্তু কথাটা শুধু সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের ফলভোগের মধ্যেই সমাপ্ত হলে কথা ছিল না। বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পদ নিয়েই আজ ভাবনার কারণ ঘটেছে। কবিগুরু বলেছেন—'দেশ মানুষের সৃষ্টি।… মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব, ততই জবাবদিহির দায় বাড়াব; প্রশ্ন উঠবে

প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা দিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি খাল শুকিয়ে জল বদ্ধ হয়ে মরে, মশক যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা তবে তার কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরী নয় দেশ মানুষে তৈরী।'

বিজ্ঞানের এই অসাধারণ ক্রমোন্নতির যুগেও এ অভিযোগ থেকে আমাদের দেশ মুক্ত হল না কেন? দেশের মানুষ নিয়ে আমরা আর গর্ব অনুভব করতে পারি না কেন? অথচ এই জাতিতেই কি একদিন রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু প্রমুখ উজ্জ্বল প্রতিভার আবির্ভাব হয় নি? পরাধীন ভারতকে নবযুগ দানের সংকল্পে নিজেদের সুখ স্বপ্ন জীবনগুলোকে পণ রেখে এই জাতির ছেলেরাই একদিন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অগ্নিযুগের সেই অপূর্ব স্বাক্ষর এমন স্বর্ণাক্ষরে আর কোন্ জাতির ইতিহাসে লেখা আছে? বাঙালীর সেই ঐতিহ্যের ধারা আজো কি অন্তঃস্রোতের মত জাতির জীবনের মধ্যে বইছে না? সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সকলের বরেণ্য সেই বাঙালী মনীষাও কি আজ বিলুপ্ত যাকে লক্ষ করে একদিন গোখলে বলেছিলেন 'আজ বাংলা যা ভাবে সমগ্র ভারত তা পরদিন চিন্তা করে?'

ঐতিহ্য আমাদের বিরাট, কিন্তু পতনও বুঝি আমাদের তেমনই বিরাট। নইলে আজ আমাদের এত দুর্ভাগ্য কেন? কেন আমরা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে মন্দভাগ্য জাতি? আদমসুমারীর রিপোর্ট তো এই সাক্ষ্যই দেয়। তার ফল ধাপে ধাপে এগিয়ে এসে বাঙালীর শালীনতা সজ্জনতা সৎসাহস ও চরিত্রবলকে যেন ক্রমশঃই দমিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? অথচ আমরা এখন স্বাধীন। জনসাধারণ নিজেরাই প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাচ্ছেন। যাঁরা সকলেই বাংলারই সন্তান। আজ তো আমাদের ইতিহাস উজ্জ্বলতর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার বদলে—?

কথা উঠবে, বাইরের চাপ কি আমাদের উপর দিয়ে কম গেল? স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যন্ত্রণাগুলোর কথা ছেড়ে দিলেও দেশ ভাগ, বাস্তুহনন, পুনর্বাসন সমস্যা প্রভৃতি, তাছাড়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোনঠাসা অবস্থা, নিজের দেশেও চাকুরীক্ষেত্রে অবাঙালীদেরই প্রাধান্য, মূলধনের অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের অপ্রাচুর্য ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলোকে অস্বীকার করে লাভ নেই; কিন্তু ভেবে দেখলে কি মনে হয় না যে এসব সমস্যায় অন্ততঃ কিছু কিছু বা কোনো কোনোটার ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের দায়িত্বও কিছুমাত্র কম নয়।

আজ আমাদের পক্ষে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মশোধনের প্রয়োজনই হয়ত সবচেয়ে বেশি। নিজেদের দৈন্যের প্রথম ও প্রধান কারণ আমাদের জাতীয় সংহতির অভাব। —'একথা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে চরিত্রে যে গুণ থাকলে সমবেত হওয়া সহজ হয় আমাদের সে গুণ নেই'। অন্যেরা আমাদের উপর অবিচার করছে বা কর্মক্ষেত্রে আমাদের হটিয়ে দিচ্ছে এর চাইতেও বড় কথা আমরা নিজেরাই এক হয়ে বাঁচতে জানি না। দলীয় উপদলীয় গোষ্ঠী এবং সর্বোপরি স্বকীয় স্বার্থের গণ্ডীঘেরা সংকীর্ণ জীবনের মধ্যে সমগ্র জাতি বা গোটা সমাজটার কথা ভাববার অবকাশ কোথায়? মহৎ মানবিক ধারণা কল্পনাগুলো আজকের বাংলাদেশের মনের আকাশে সত্যিই কি খুব বেশি দেখা যায়? কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙালী সম্ভবতঃ আজো পুরোভাগে কিন্তু সুস্থ সুন্দর জাতি বা ব্যক্তি রচনায় যে বাস্তবানুরাগ, কর্মনিষ্ঠা, সত্যানুরাগ ও ঐক্যবোধের প্রয়োজন বাংলা দেশ সেখানে একান্তভাবেই অনগ্রসর। বাংলার দুর্ভাগ্য, এখানে মতের লড়াই, দলের লড়াই, ধর্মের লড়াই এবং সেই লড়াইয়ে জেতবার কলা-কৌশলের উপরে জোর দেবার নিত্য আয়োজন রয়েছে কিন্তু যাদের কল্যাণের নাম নিয়ে এই লড়াই তারা আজো যে তিমিরে সে তিমিরেই আছে বরঞ্চ আরো তলিয়েই আছে। অবস্থাটা সত্যিই অদ্ভুত।

মনের গভীরে জাতির প্রতি মমত্ববোধ আমাদের কতটা আছে ভগবানই জানেন। কিন্তু এই মমত্ববোধ

যুগোচিত বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে না পারলে শুধু দেশের বন্দনা সংগীত গাইলে আর বক্তৃতা দিলেই কি আমরা বড় হতে পারব? বৃহত্তর বাঙালী সমাজের মধ্যে একটা ঐক্যবোধকে সঞ্জীবিত না করতে পারলে জাতীয় কল্যাণ সম্ভব নয়। আমাদের সমাজ বহু ধরে বিভক্ত। যারা উচ্চ তারা আর্থিক স্বচ্ছলতার শিখরে থেকে বিশেষ বিশেষ বিত্ত শিখরের প্রতিনিধিত্ব করেন মাত্র। নানান্ কম ক্ষতির মধ্যেও এখনো পর্যন্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই দেশের মান মর্যাদা ও শিক্ষা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন; কিন্তু এই চাকুরী-নির্ভর শ্রেণীও বর্তমানে খুব বেশিরকম আর্থিক সংকটে এবং নানান্ দ্বিধা দ্বন্দ্বে জর্জরিত; এ অবস্থায় দেশকে দেবার মত বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সম্পদ তারাই বা পাবেন কোথায়? আর কৃষক শ্রমিক প্রভৃতি দরিদ্র সাধারণ তো চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী দৈহিক ও মানসিক এই দ্বিবিধ খাদ্য থেকেই বঞ্চিত। অথচ এতটা শ্রেণী বৈষম্য সত্ত্বেও এদের সকলেরই জাতিটা বাঙালী। এই বিশাল জাতিকে একত্রিত করতে হলে আমাদের এতাবৎ কালের জাতিভেদ ও আর্থিক অসমতা দিয়ে গড়া বৈষম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের মৌলিক পরিবর্তন হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। কালের পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের চেতনা আজ আর খুব নিষ্ক্রিয় নেই। সেই দীনহীন দাস-সুলভ মনোভাবকে শত চেষ্টাতেও আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না সুতরাং কি শিক্ষাক্ষেত্রে কি বৈষয়িক ক্ষেত্রে এক পংক্তিতে বসে খাওয়াটাতেই উভয় পক্ষেরই সম্মান।

প্রাণ জিনিসটা মরেও মরে না। কোনো কোনো সময়ে তার সৃষ্টিশীলতা থিতিয়ে যায়, বিস্মরণও আসে, কিন্তু পূর্বসূরীদের ধারা ভেতরে ভেতরে কিছু না কিছু কাজ করে চলেই। তাই দেখা যায় ঘোরতর সংকটের দিনে সংকট ত্রাণের তত্ত্ববুদ্ধিতে মানুষ একদিনের অসম্ভবকেও আরেকদিন সম্ভব করে তুলতে এগিয়ে আসে। বাংলার মননক্ষেত্র অনাবাদী নয় সেখানে আমাদের স্মরণীয় আচার্যগণ মানবতাবাদের যে মহান বীজ বোপন করে গেছেন তার থেকে যুগোপযোগী মানবধর্মের ফসল ফলানোও কঠিন নয়।

ঐতিহাসিক নিয়মেই বিপর্যয়ের থেকে নবজন্মের উদ্ভব হয়। আজকে দেহ ও মনকে সুস্থ রাখবার মত পরিবেশ ও উপকরণের অভাবে দেশব্যাপী সমস্ত বাঙালী-চিত্ত আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ। থেকে থেকেই তাই একটা অন্যায় উত্তেজনার পথে সমাধানের মুক্তি খোঁজে। সেই অবরুদ্ধ অথচ উদ্গত প্রাণগুলোকে সংহত ও তাদের চাপা-পড়া সৃষ্টি ক্ষমতাকে সুস্থ পথে চালিত করবার দায়িত্ব নিয়ে সংস্কৃতির নব রূপায়ণের মহান কাজে আত্মনিয়োগ করবার শক্তি শুধু বাঙালী প্রধানদেরই আছে। নেই নেই করেও বুদ্ধিতে ও হৃদয়বত্তায় আজো তাঁরা নগণ্য নন। শুধু চাই সমবেত শক্তি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'র এক জায়গায় লিখেছেন —'সমস্ত দেশটা—এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে সমস্ত বর্ণ-বিভাগকে এক আয়োজনে জড়িত করে এক বিরাট দেহ এক বৃহৎ ব্যক্তিস্বরূপ ধারণ করেছে— সব কিছু মিলে গেছে এক অখণ্ড সাধনার মধ্যে—'

এটা কোনো ইজম্ বা বাদের কথা নয়। স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধে মানুষ অত্যন্ত কঠিনকেও কেমন করে সহজ করে তুলতে পারে এ হচ্ছে তারই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।—সমস্ত দেশকে গড়ে তোলবার জন্যে এইরকম অখণ্ড সাধনাই যদি আজ বাঙালীরও জীবন ব্রত হয় তবে অচিরকালের মধ্যেই মানুষের দুর্গতি দূর হবে এমন আশা করা কি খুব ভুল হবে? দেশের যাঁরা যথার্থ চিন্তাশীল ও শিক্ষিত জন তাঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে এবং কর্মীদের সহায়তায় দেশজুড়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্লাবন আসুক। ক্রমিক পরিকল্পনার সাহায্যে ধারাবাহিক দ্রুত পরিবর্তনের মহৎ সংকল্প নিয়ে তাঁরা যদি দৃঢ়হস্তে হাল ধরেন তবে দেশের চেহারা ফিরে যেতে বাধ্য।

সংস্কৃতি দিয়েই এক একটা জাতি জগৎ সভায় তার সম্মানিত স্থান অধিকার করে। ভারত তথা বাংলার সেই সাংস্কৃতিক গৌরব আজ কতটা অক্ষুণ্ণ আছে? সিনেমা নাটকের অপেক্ষা জাতির বাস্তব জীবন ও তার চারিত্রিক সমৃদ্ধির উপরই সংস্কৃতির প্রকৃত বিকাশ ও

প্রকাশ। সেইখানেই আমরা সবচেয়ে বড় মার খাচ্ছি। পুরনো সমস্ত মূল্যমান ভেঙে গেছে, নীতিবোধ আদর্শ সবকিছু বিপর্যস্ত; পায়ের তলার মাটি খসে খসে পড়ছে, এ কোন্ ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ? বর্তমান শিক্ষাই কি আমাদের এ থেকে বাঁচাতে পারছে বা পারবে? কোথায় সেই সম্প্রীতি ও যুক্তিবোধ, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা? নাগরিক জীবনের ছোট-খাটো কর্তব্যগুলোও বিলুপ্ত। পারিবারিক জীবন সৌন্দর্যহীন এবং মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত। দেশের সর্বব্যাপী জাল, ভেজাল, ঘুষ কালোবাজার অবিরত, ক্ষমতা লোলুপতা প্রভৃতি দুর্বার চাপে গোটা জাতিটাই আজ অসুস্থ। এর থেকে নিষ্কৃতির উপায় কি?

আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ; তার অর্থ কোন ধর্মের সঙ্গেই তার বিরোধ নেই। আর সব ধর্মেরই সার মাত্র একটি কথাই সৎ হও, মহৎ হও, অপরের অনিষ্ট দ্বারা নিজের ইষ্ট-সাধনের মত পাপ কোরো না। অনেক পুরনো বিশ্বাস কালের প্রতিস্রোতে অচল হয়ে যায়ই কিন্তু শাশ্বত সত্য ধর্ম যা তা কখনই বিলুপ্ত হয় না। মানবতার সেই মহান ধর্ম থেকেই আমরা স্খলিত হয়ে পড়েছি। সবচেয়ে বড় ভয় এখানেই।

আজ একই সঙ্গে দুটো কাজে অনন্যচিত্ত হয়ে হস্তক্ষেপ করা দরকার। একদিকে দেশ থেকে অভাব ও দারিদ্র্য দূরীকরণের আপ্রাণ চেষ্টা, অপর দিকে সত্যের প্রতি, মহত্ত্বের প্রতি পুরনো শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনা এবং অসত্য ও দুষ্ট শক্তির প্রতি ঘৃণাকে জাগ্রত করা। নিজের সৎ-বিবেচনা দিয়ে যাতে মানুষ নিজেকে নিজেই শাসন করতে পারে হৃদয় ও বুদ্ধিকে ততখানি সচেতন করে তোলার মত সুশিক্ষার প্রসার। এ ছাড়া জাতিকে বাঁচাবার আর অন্য পথ নেই।

দেশ সকলের। জাতিতেও আমরা সবাই এক। তবুও জানি মত-পার্থক্যের দরুণ প্রচুর বিরোধও আছে। কিন্তু ঘরে যখন আগুন লাগে তখন সে আগুন না নেভালে পুড়ে মরবার ভয় ঘরসুদ্ধ সকলেরই। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততিদের কল্যাণের জন্যই বিরোধগুলোকে আপাততঃ সরিয়ে দিয়ে দেশের মন্ত্রীরা সকলে সমবেত হয়ে এর প্রতিকারে দৃঢ়-সংকল্প না হলে ভবিষ্যৎ সত্যিই ভয়াবহ।

'মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম সমাজধর্ম, লোভ রিপু সবচেয়ে তার বড় হন্তারক। এই যুগে সেই রিপু মানুষের সমাজকে আলোড়িত করে তার সমস্ত বন্ধনকে শিথিল ও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।'—রবীন্দ্রনাথ। আত্ম মর্যাদা রক্ষা এবং আত্মহত্যার থেকে পরিত্রাণ পাবার কামনায়—

'বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান।'

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৩২)

ভোরে সুধাংশু আসে। কিন্তু পরেই তাহাদের সঙ্গে করিয়া ভবরঞ্জন মজুমদারের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাঠের পুল পার হইয়া উত্তর দিকে চেতলা রোডে প্রসন্নময়ী ঘাটে যাই। আধ ঘণ্টার উপর থাকি…বিরজা আসে।… মালতী আসে।…নরনারীর অবাধ মেলামেশা আর আর ঠেকানো যাইবে না। শিখিতে হইবে চলিবার ছন্দ। রেণু যে টাকা পাইয়াছে, তাহা বলি। তাহাদের জন্য একটা প্লান করিবার জন্য আমি ব্যাকুল।

১৮ই এপ্রিল

সকালে প্রার্থনার পর 'সর্বোত্তম নরলীলা' (বৈশাখ মাসের জন্য) লিখিতে আরম্ভ করি। প্রতিভা নকল করে। লেখা শেষ হইতে না হইতেই সুবোধ আসে তাহার জেঠতুত ভগিনী লীলারাণী ও তাহার এক পুত্রসহ। দীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করে। রাণাঘাট ক্যাম্পে থাকে। অতি দুরবস্থা।…দীক্ষা সেই ঠাকুরের মন্ত্র।…মনোরঞ্জন বাবু আসে।…অনেক কথা হয়—বর্তমানের মানুষের কর্ম না করার মনোবৃত্তি, ঘর সংসার গুছাইয়া না করার বিষয় লইয়া। সকলের মূল কারণ আমার মনে হয় জড়বাদের শিক্ষা না পাওয়ায়, জগৎ-মিথ্যাবাদের ফলে যেমন তেমন করিয়া সংসার করার মনোবৃত্তি। আমরা ইহা দূর করিবার জন্যই দিয়াছি।…ব্রাহ্মণ ভোজন! ঠাকুর সেবা কোথায়?—আজ সংযম করিয়াছে। এই সংযমই কি আমি এত কাল শিখাইয়াছি? কোথা হইতে আসিল এই সব সংস্কার! কোথায় আমি! জীবনের কথা মানুষ ভুলিয়া গেল! শুধুই আচার, শুধুই সংস্কার!

১৯শে এপ্রিল

সকালে আরও কিছুটা 'সর্বোত্তম নরলীলা' লিখি।… —স্বেচ্ছায় আমার অভিভাবকত্ব অস্বীকার করিয়াছে।…সে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারিয়াছে। তাহা আমি ঠেকাইতে পারি নাই।…

২০শে এপ্রিল

প্রার্থনার পর 'সর্বোত্তম নরলীলা'র কিছুটা লিখি। প্রেসের কাপী পৌঁছাইয়া যায়। আফিসে যাই। ইহাদিগকে জীবনগত করিয়াই আবেষ্টনকে পরিপাক করিতে চাহিয়াছিলাম। কতদিনতো চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সব অসম্ভবই কি আমার জীবনে সম্ভব হইবে? উষাকিনী কি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে? আমি তাহার জন্য বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছি, সেও তো আমাকে ফেলিয়া খালের বাড়ী পর্যন্ত যাইতে চায় নাই। আমি তো চাই না যে সে এখনও বিষয়ের খুঁটিনাটি লইয়া ব্যস্ত থাকে। তাহার যে কতকগুলি পুত্রকন্যা হইয়াছে, নিজের গর্ভের পুত্রকন্যা ছাড়াও। তাহারাও তো তাহাকে চায়। আমি তাহাকে বিরাট বিশ্বের বুকে দাঁড় করাইয়াছিলাম। সে কি ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারে? সে তো ছিল আমার জীবনের মূলাধার। তাহাকে না পাইলে কি এত রাস্তা আসিতে পারিতাম?

২১শে এপ্রিল

প্রার্থনা করি, নিত্যগোপাল, তুমি আর আমি এক অদ্বৈত মিলনের ভিতর দিয়া নবীন মেদিনী গড়িয়া তুলিব। তুমি আর আমি পথে দাঁড়াইয়া উন্মুক্ত নীল আকাশ তলে সবুজ ধরণীর বুকে। পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি

বন্ধনহীন প্রতিবন্ধনে বদ্ধ তুমি আর আমি, আমি আর তুমি—দুই সখা চলিয়াছি সৃষ্টি করিতে করিতে। শরীর মন ক্লান্ত। প্রার্থনার পর একটু বিশ্রাম করি। ইতিমধ্যে হেমাঙ্গবাবু আসে এক ঝুড়ি ফল ও সন্দেশ লইয়া…। বেণু প্রিয়রঞ্জনবাবুর বাসায় যায়—৭০টী পাতা দেয়…। বিমলাকে ফোন করি। তাহার নিকট দুঃখ যে পাপের ফল নয়, তাহা হইলে সীতা শৈব্যার মত পাপীয়সী স্ত্রীলোক আর নাই, কার্যকারণবিধি (Law of Causation) যে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিতে অচল, কর্ম ও ফলের মাঝে ফাঁক থাকার ফলে ভগবান যে যখন তখন অবতরণ করিতে পারেন ও করেন, অজামিলাদির জীবনে যে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, পুরুষোত্তমের ভিতরেই যে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যাত হয়, যে কোনও মুহূর্তেই যে কুরুক্ষেত্র হয়—গোলাম কাবাৎ—এই সব কথা বলি। অতীতের সু ও কু কেমন করিয়া বর্তমানকে বাধা দেয়, তাহা মধু কৈটভের দৃষ্টান্তদ্বারা উল্লেখ করি। চিত্ত তাহার বিক্ষিপ্ত, কেননা অতীতের গ্লানি সে কিছুতেই বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছে না। শনিবার ২টায় আসিবে।…… জয়া আসে।… আমার স্নান তো পড়িয়া উঠা দরকার। প্রাণ দিয়া কর্ম করিলে অন্নের অভাব হইবে না।…

২২শে এপ্রিল

সকালে প্রার্থনার পর 'সর্বোত্তম নবলীলা' শেষ করিয়া আফিসে যাই। আমার ফাউন্টেন পেনটা বেণুর ওখানে রাখিয়া আসি। ওটা ওরা preserve করিতে চায়। দেখি, আরও কিছুদিন কাজ পাওয়া যায় কি না। ৫টার পর চলিয়া আসি।…কি দুঃখ তাহার মা-বাবার তাহা সে বুঝিল না। শাস্তি তো আমাদেরই দেওয়া হইতেছে।—তাহার সঙ্গে বাড়ীতে নিতেই ভীত। এখানের সব তাহার ব্যবহারে তিক্ত, ওদিকেও…। আমি ও উমাদিদি এখান হইতে চলিয়া যাইব ভাবি। যা কিছু অত্যাচার করার সুযোগ সব আমাদের এখানে থাকার দেই তো সম্ভব হইতেছে।…রাস্তায় নামিলে এ বিপদ পোহাইতে হইবেই। যা-কিছু ঘটে, সবই সেই এক প্রকৃতির ঘটনা। সব ঘটনার ভিতরকার ইঙ্গিত ধরিয়া পথ চলিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। পুরুষ যখন আজ প্রকৃতির মাঝে লয়-নির্বাণ খুঁজিতেছে, তখন প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তরের পুরুষ সত্তাকে খুঁজিয়া বাহির করাই তো আমাদের সাধনা।… নামে কেন রুচি হয় না? নাম-নামী যে এক! তাহা না বুঝিয়া নামকে জপ-ক্রিয়ার ধর্মকারক করিয়া রাখিলে 'নাম' হয় শুধু অক্ষর-সমষ্টি। তখন তাহার রস যায় শুকাইয়া।…

২৩শে এপ্রিল

সকালের প্রার্থনায় বলা হয়—তুমি আমি এক অদ্বৈত মিলনের ভিতর দিয়া এক নূতন মেদিনী সৃষ্টি করিব। প্রলয় পয়োধি জলে বিশ্ব নিমগ্ন। নূতন বেদ ও জীবন লইয়া তুমি আসিয়াছ, আমি তোমারই শক্তি। তোমার আত্মপ্রকাশ হউক।…বিমলা বেণুর সব পাইবার জন্য আসে। ইহারা যেখানে এমন করিয়া পরস্পরের জন্য আকুল, সেইখানেই ইহাদিগকে এবং আমাকে পাই। এই পাওয়াই তো এতদিন চাহিয়াছি। এই পাওয়াই তো নির্মল পাওয়া ইহাই তো (?) -এর পাওয়া, জীব-জগতের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের নিজকে পাওয়া।… ব্রজেন্দ্র আসে।……এর বাড় আগে কহ আর-এর আলোচনা হয় ঠাকুরের কথা তুলিয়া।…

২৪শে এপ্রিল

প্রার্থনার পর আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই। পথে আলোচনা হয়—বিশ্বের সকল ঘটনা তাঁহারই ইঙ্গিত দিতেছে, তাঁহার পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে। সকলেই 'জয় বাবে' বলিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। পুরুষোত্তম আজ বিশ্বকে পরিপাক করিয়া বিশ্বাতীত। পথ তাঁহার সামনের দিকে। তাই ঊর্দ্ধ-অধঃ-দক্ষিণ-বাম-সামনে-পশ্চাৎ সেখানে ভুক্ত অন্নের মত জীর্ণ। প্রতি ঘটনার মধ্যে খুঁজিতে হইবে তাঁহাকে; তাই এখানে ধ্যান ঘটনাকে সঙ্কোচ করিয়া নয়, যতদূর সাধ্য বুঝার সর্ব

ঘটনার নিহিত অর্থটাকে বিশ্লেষণ করিয়া।…চিদানন্দের সঙ্গে 'শতবার্ষিকী' সম্বন্ধে কথা হয়। কিছু না করিয়া কেমনে পারিব?…খাওয়ার পরই যে সাধনা সম্ভব ইহা আলোচিত হয়। ব্রজলীলার মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধদের সমন্বয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান কাম, তাই তিনি বিশ্বের স্থাবর জঙ্গমের প্রাণ। কাম কাম খেলাই কৃষ্ণ-জীবনে ব্যাপ্ত। আর কোন্ জীবনে কাম এমনভাবে অর্থবান হইয়াছে, সার্থক হইয়াছে? কামের ক্ষেত্রে মুক্ত যে, সে-ই তো সত্য মুক্ত। কামের আস্বাদন সার্থক হয় কেবল-কেবলার সঙ্গে। বদ্ধ-বদ্ধের কাম সম্ভোগ নিতান্তই শ্লেষোক্ত। জীবনের পক্ষে তো উহা মরণ নয়। কাম কেন এত আকর্ষণ করে, ব্রজে তাহা আস্বাদিত হইয়াছে। ব্রজধাম তাই রহিয়াছে প্রতি জীবের অন্তরে। সকল আকর্ষণের মূর্ত্তিমান ব্যাখ্যান ব্রজধামের লীলা।…

২৫শে এপ্রিল

…বাড়ী কর, সসম্মানে যাও। যাইতে চাহিলে ধরিয়াও আমি রাখিব না। ভুল করার স্বাধীনতাও আমি দিব। বাবা-মায়ের দুয়ার খোলা রহিল।…ঠাকুরের কাছে ব্যথা নিবেদন করি। কমল আশুবাবুর কাছে যে মনোরমার জন্য দুয়ার খোলা রাখিবার কথা বলিয়াছিল, তাহা আলোচনা করি। আমি কি রাগ করিতে পারি?

২৬শে এপ্রিল

প্রার্থনার পর চাহিয়া দেখি পাশে ব্রজেন (বিরজার ভাই); তাহার পর দেখি রেণু পিছনে বসিয়া। তখনও আমার কান্নার ঝোঁক কাটে নাই, হাত ধরিয়া ঠাকুর ঘর হইতে শোওয়ার ঘরে আসিলাম। আজ অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনই উঁহাদের বাড়ীতে আমার প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে…। বিরজার বাবা কিছু পরেই আসেন। তাহার সঙ্গে এক ঘণ্টা অন্তত কথা হয়। একটা দার্শনিক বিপ্লব না আনিলে যে কিছুতেই বর্ত্তমানের সমস্যাগুলির সমাধান হইবে না, তাহাই আলোচনা করি। নর-নারীর অবাধ মিলনের যুগে ব্রহ্মচর্য্যের কি রূপ হইবে? প্রচলিত ব্রহ্মচর্য কি চলিবে? সে পথ তো জানেন শুধু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।…প্রথমে আসে রাইহরণবাবু, তাহার পর চিত্তগুপ্ত…চিত্তবাবুর আমাদের পত্রিকা খুব ভাল লাগে। Class mass-এর ভেদ যে মানিব, যে ব্যাণ্ডেল স্টেশনে mass, সেই যে আসানসোলে class—এই কথা তাহার খুব ভাল লাগিয়াছে।…

২৭শে এপ্রিল

…প্রতিভা 'সমন্বয়াবতার নিত্যগোপাল লীলামৃত' কিছু পড়ে। তাহার ভিতর আছে—কোন ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুর, আপনার ইষ্ট কি? ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, আমার ইষ্ট তোমরা। ইহাই তো আমি বলিয়া আসিয়াছি। আমি তো ইহাদের ইষ্ট বলিয়াই জানি। ইহাদের পাইলে আমি ঠাকুরকে পাইব। ঠাকুরকে পাইবার জন্যই তো ইহাদের নিয়া এত টানাটানি, এত ভাবনা। বিরজা 'চীনদেশ ও চীনদেশবাসী' নকল করে। পরে রেণু তাহার নিকট আমার লেখা একটি চিঠি (১০ পৃষ্ঠা) পড়ে। আমি যে তাহাদের সম্বন্ধে কি চাই, তাহা তাহার মধ্যে আছে। চিঠিটা ১৩ বৎসর আগের লেখা। আমার এই চাওয়াকে সার্থক করিবার জন্য রেণু প্রাণপণ করিয়াছে। শান্তি চট্টোপাধ্যায় (যতীন দাশগুপ্তের বন্ধু) এক পত্র দেয়। আপত্তিকর এই সংসারের মধ্য দিয়া চলিয়া সংসারের কাঁদা গায়ে মাখিয়াও নির্মল থাকিতে হইবে। সংসারে যখন সাধ করিয়া আসিয়াছি, তখন এখানের সব কিছুই নিতে হইবে। যিনি টানিয়া এতদিন তুলিয়াছেন, আজও তিনিই তুলিবেন।…

২৮শে এপ্রিল

…এ মাসের উজ্জ্বলভারত পাঠ হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ভগবান বুদ্ধ' পাঠ করে রেণু, নীলু পাঠ করে 'বৌদ্ধ বেদান্ত সমন্বয়', বিরজা পাঠ করে 'ছিন্নমূল', প্রতিভা পাঠ করে 'ভগবদ্গীতা'। বাকী অংশ কাল পাঠ হইবে। রোজ এইরূপ পাঠের ব্যবস্থা করা উচিত।…হাবড়া

২০০।২৫০৲ টাকা বিঘা জমি পাওয়া যায়। চিনু খবর জানাইয়াছে। দেখা যাক।···

২৯শে এপ্রিল

সকালে আজ আর আফিসে যাই না।······—র —সম্বন্ধে মনের ভাব ভাল মনে হয় না। তবুও থাকিতে হইবে, হঠাৎ ছাড়া সঙ্গত নয়। রেণু তো আছে। অনেক ঝড়ের মধ্য দিয়া আসিয়াছি, ঝড় তো আমাদের নিত্যসঙ্গী। ঝড়ও আছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তো আছেন। তাড়িলে আর মাতিলে তো চলিবে না। তাঁহার শ্রীচরণতলে স্থির হইয়া থাকিতে হয়।···তাঁহাকে 'ভুঁচরাই' ত্যাগ করিতে বলে। উহা যে জীবনের পক্ষে মহা বন্ধন। এতবড় পিছটান থাকিলে কি জীবন অগ্রসর হয়। জ্ঞানযজ্ঞের সংসার অশুচি?···

৩০শে এপ্রিল

রেণু ও প্রতিভা যদি বিশেষ সতর্ক না হয়, কোন্ পথে বিপদ আসিবে সে সম্বন্ধে যদি তাহারা পূর্বাহ্নে অবহিত না হইতে পারে, তবে বাহিরে কোনও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে যাওয়া বিপজ্জনক হইবে। সেখানে ভাল লোক আসিবে, মন্দ লোকের আসিবার অধিকার থাকিবে। এখানে ছিলাম পারিবারিক জীবন আশ্রয় করিয়া। কিন্তু সে তো হইবে বাহিরের জীবন কেন্দ্র করিয়া। তখন সে ভিড়ের মধ্যে আত্মরক্ষা করিবার যোগ্যতা তো থাকা চাই। এ প্রস্তুতিতে কুলাইবে না। আরও শক্ত, আরও সতর্কতা, আরও দক্ষতা চাই।...পুরুষ ছাড়া মেয়েদের দিয়া কি করিয়া বড় কাজ হইবে সে জিজ্ঞাসা করে। মেয়েরা যদি সত্যসত্যই বোধ আনা প্রাণ ও শক্ত জীবন লইয়া কার্যক্ষেত্রে দাঁড়ায়, পুরুষের অভাব হইবে না। বর্তমান যুগ নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যুগ। স্বামিনীকে সামনে রাখিয়া, তাহার পিছনে থাকিয়া যদি তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলাম। এমন একটা কিছু মেয়েরা করুক, যাহার জন্য পুরুষ তাহার কাছে মাথা নত করিতে পারে, ইহা আমি দেখিতে ও দেখাইতে চাই। ব্রজধামে তাই নারী প্রেমের গুরু। ব্রজলীলার social aspect কি, ইহা ব্রজেন্দ্র প্রশ্ন করে। ব্রজলীলা transitional period-এর লীলা। যতদিন পুরুষ কাপুরুষ, যাহার পদবাচ্য, ততদিন প্রাকৃতিক বিধানেই মেয়েরা ঘর ছাড়িবে, কুলত্যাগিনী হইবে। মেয়েদের এই কুলত্যাগ যদি বিপ্লবমূলক হয়, গঠনাত্মক হয়, পুরুষেরা পুরুষোত্তম হইবে, মেয়েরা পুরুষ-নিরপেক্ষ স্বয়ংমর্যাদা লাভ করিবে। মুক্ত নর ও মুক্ত নারীর অন্যোন্য মর্যাদাময় মিলনে সংসার মধুময় হইবে। বিশ্বে যতদিন কাপুরুষ থাকিবে, ততদিন ব্রজলীলা চলিবেই, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সুস্থ পারিবারিক, সামাজিক জীবন গড়িয়া তোলাই ব্রজলীলার প্রয়োজন। ব্রজেনের প্রশ্ন বেশ।...

২রা মে

আমার সারাক্ষণের প্রার্থনা—ঠাকুরকে জীবনে বহন করিব, আমাকে দেখিয়া মানুষ ঠাকুরকে দেখিবে, আমাকে ছুঁইয়া ঠাকুরকে ছুঁইবে, আমাকে পাইয়া ঠাকুরকে পাইবে। তবে না ঠাকুরের '২১০ বৎসর পর আবার আসিব' কথার সার্থকতা? তিনি কি সেই সময়ের মত এই দেহে বিচরণ করিবেন? সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই কোন দেহে আবিষ্ট হইবেন। আমি তাঁহাকে ধারণ করিবার জন্য প্রাণপণ করিব। তাহা হইলে যাহারা কাছে আছে, তাহারাও ধন্য হইবে। আচ্ছা, কেন, আমার দেহে ঠাকুরের চেহারা মানুষ দেখে কেন? সুরেশ গুপ্তের বাসায় ঠাকুরের ফটো ছিল। ছাত্রগণ বলিত, আমার ফটো। বলদঘাটে যখন ছিলাম, সেই দিকের একজন গুরুভ্রাতা আমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। আমাকে এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'এতদিন পরে ঠাকুরকে দেখিলাম'। কবে সেদিন হইবে যেদিন আমাকে দেখিয়া মানুষ তাঁহাকে দেখিবে? তাঁহার রাতুল চরণের স্পর্শে কি আমি 'নিত্যগোপাল' হইব? নিত্যগোপালোঽহম্। আমার সকল ক্ষুদ্রতাকে ছাপাইয়া ফুটিয়া উঠিবেন তিনি পূর্ণ। সকালে রেণু আসে। ৯টার পর যায়। 'দুঃখের মূল' প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করে।···

৩রা মে

...কোথায় নিত্যগোপাল তুমি? অথচ বর্ত্তমান বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধানমূর্তি বলিয়াই তো তোমাকে মনে হইতেছে।...নিত্যগোপাল, তুমি কি আসিবে না? নিত্যগোপাল শুধু বাহিরের সমস্যাই আনেন নাই, অন্তরের কাম-অকাম প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী বৃত্তিসমূহের সমন্বয়-মূর্তিও তিনি। কেমন করিয়া আমি তোমাকে বিশ্বের সামনে দাঁড় করাইব? ওগো, আমায় বল দাও, বুদ্ধি দাও, শক্তি দাও। তুমি যদি তোমার দেহের ছবি আমার দেহে সংক্রামিত করিলে, তোমার মনের ছবি কি আমার মনে সঞ্চারিত হইবে না? তোমার জীবন কি আমার জীবনকে আত্মসাৎ করিয়া প্রকাশিত হইবে না? তাই কর ঠাকুর, তাই কর। আমি বড় হই, তুমিও বড় হও।...

৬ঠা মে

প্রার্থনা শুধু এই—জীবনে নিত্যগোপাল হইব, আমাকে দেখিয়া তোমাকে দেখিবে, আমাকে ছুঁইয়া তোমাকে ছুঁইবে, আমাকে পাইয়া তোমাকে পাইবে। নিত্য-গোপাল বলিয়া যাইব। তোমার আমার পরম প্রয়োজন আমি জীবন দিয়া সিদ্ধ করিব। তোমার দেহের ছবি আমার জীবনে ফেলিলে, মন-প্রাণের ছবি সঞ্চারিত করিবে না?...'সমন্বয়াবতার' পাঠ হয়। ১০টার পর বীরানন্দ আসে। 'সংধর্ম বিহারে' বুদ্ধপূর্ণিমার উৎসবে যোগদানের নিমন্ত্রণ কার্ড দিয়া যায়। বুদ্ধকে বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে বাদ দেওয়া যায় না, অথচ নেওয়াও সহজ নয়। বুদ্ধ বলেন একত্ব অবিদ্যা, বেদান্ত বলে একত্বই বিদ্যাদর্শন। শ্রীনিত্যগোপাল ছাড়া কে মিলাইবে? এক ও বহুর অতীত যিনি, তিনিই এক ও বহুকে মিলাইতে পারেন। সংখ্যার একও অবিদ্যা, বহুও অবিদ্যা। জীবের একের মধ্যে এক ও বহুর সমন্বয়ই পরা বিদ্যা। নিত্য-গোপাল এই আধার খোঁজই দিয়াছেন। তাই তাঁহার নিকট সকলের আগে প্রেম, তাহার পর নাম, আগে সিদ্ধি তাহার পর সাধনা, আগে ফল তাহার পর ফুল। আজিকার 'সমন্বয়াবতার' পাঠে ইহাই পড়া হয়।...

৭ই মে

ভগবান বুদ্ধ আবার আসিবেন শুনিয়া জাপানের এক-দল মেয়ে নাকি বুদ্ধকে গর্ভে ধারণ করিবার, 'বুদ্ধমাতা' হইবার সংকল্প লইয়া সাধনা করিতেছেন—এইরূপ কথা এক সময়ে শুনিয়াছি। শ্রীনিত্যগোপাল আবার আসিবেন শুনিয়াছি। এতদিন উহা তেমন করিয়া মনের মধ্যে আলোড়ন আনে নাই, এখন কেবলই মনে হইতেছে আমার জীবন দিয়া তাঁহাকে ধারণ করিব, জীবন নবীন নব রূপে তাঁহাকে ধরার বুকে প্রকট করিব। তাহাতেই তো আমার সার্থকতা।...একটি মেয়ের কথা হইল। স্বামীর অত্যাচারে সে ঘরের বাহির হইতে বাধ্য হইয়াছে। স্বামী তাহার দুইটি পুত্রকে কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার পথ কি? ভবিষ্যৎ কি? এইরূপ নানা ভাবে নির্যাতিত বহু মেয়ে পথে দাঁড়াইয়াছে। কমুনিজম অবলম্বনে লক্ষ লক্ষ মেয়ে আজ প্রচলিত সতীত্বের প্রতি আস্থাহীন হইয়া বাহির হইয়াছে। কে ইহাদের ঘরে নিবে? মাধামাতাই শুধু ইহাদের পথ দেখাইতে পারেন। নারী যদি যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সমাজ কি বাঁচিবে? আমার নিত্য-গোপাল ছাড়া কামের এই আবর্ত্ত হইতে কে রক্ষা করিতে সক্ষম?...কামের দিয়া রূপ, কামের রূপংস্বরূপ ফুটাইতে তিনি পারেন, তিনিই শুধু ইহা পারেন। আমি এই স্থানেই এমন এক দল মেয়েকে মাধামাতার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম, যাহারা এই সব মেয়েদের সামনে আদর্শ ধরিতে পারেন। মেয়েরা কি আজও এই ব্রত গ্রহণ করিবে না?

৮ই মে

নিত্যগোপাল, তোমার স্থির দৃষ্টি আমার উপর রহিয়াছে, তাহা অচ্যুত। আমি সংসার চাহিয়াছি, সংসার আমায় চাহে না। কিন্তু তুমি তো তিলের অন্তও দূরে রাখ না। আমিও সর্বদা তোমাকে চাহিব। তোমার দেহের মাঝে আমি ধরা দিব, ডুবিয়া যাইব। আর দূরে দূরে থাকিয়া তোমাকে বেদনা দিব না। তুমি আমি এক হইয়া থাকিব, অদ্বৈত হইয়া থাকিব—দেহে প্রাণে মনে অদ্বৈত। সকালে ভাবনার মধ্য দিয়া শুধু তাঁহার চরণেই

পড়িয়া থাকি।…'সংঘাবতার' পাঠ হয়। প্রথমে রেণু পড়ে, পরে নীলু। ঠাকুর বলিয়াছেন, 'যাকি ঠিক আছে'। ইহা বিশ্বাস করিতে প্রাণপণ করিব। দূরে যতই যাই, তিনি ঠিক আছেন। আমি যদি কখনও ভুলিয়া যাই, ভরসা আছে আমার জন্য তাঁহার সতত স্মরণ আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তিনি আমার আছেন, ঠিকই আছেন, তিনি আমার ভারও বহেন। তাই আমি নিশ্চিন্তে তাঁহার সেবা করিয়া যাইব। আমার বোঝা তো তিনি বহিতেছেন। কিন্তু কতদিন আর তাঁহাকে আমার বোঝা বহিতে দিব? যে বোঝা বহিতে চায়, তাহাকে বোঝা বহিতে দেওয়া সাধারণ ভদ্রতায়ও বাধায় না। আমার যদি এমন শক্তি হইত যে আমার বোঝা তো আমি বহিতামই, তাঁহার বোঝাও বহিতাম! তাঁহার আশীর্ব্বাদেই আমার সবখানি।…

৭ই মে

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব দিন। যেই কালাচাঁদ, সে-ই নিত্যগোপাল, যে নিত্যগোপাল সেই কালাচাঁদ—এ দর্শন বাবাকে কে দিলেন? বাবা তো গৌরাঙ্গকেও ভগবান বলিতেন না, আমার গুরু নিত্যগোপাল তো দূরের। কিন্তু তিনি ইহা বলিয়াছেন। সত্যই কি নিত্যগোপাল জগতের ঠাকুর!…কেন তিনি আমাকে তাঁহার 'দর্শন' দিলেন, তাহা ছড়াইয়া দিবার জন্য বুকভরা বেদনা দিলেন, আর কেনই বা তাহার অফুরন্ত শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী আমাকে করিলেন না? পথ করিয়া দাও ঠাকুর। আমি সব দিক দিয়া শূন্য। তুমি পূর্ণ কর।…নীলু আসে। সমগ্র নারী জাতিকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা দিবার ভার লইতে হইবে তাহাদিগকে, ইহাই আমার কামনা। সকালে 'শ্রী' পত্রিকা হইতে বলাই দেবশর্ম্মার লেখা 'নারী ঘরণী ও শ্রমিক' প্রবন্ধ পড়ি। নারীর বাহির হওয়াটাকে বলাই ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। সে আবার পূর্ব্বের মতই ঘরে ফিরাইয়া আনিবার কথা, প্রতিনিবৃত্তির কথা শুনাইয়াছে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? সম্ভব যদি নয়, তবে ঘরের সঙ্গে কি করিয়া সামঞ্জস্য হইবে? সমাজকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া না তুলিলে ঘর-বাহির কি করিয়া এক হইবে? বর্ত্তমান যুগ এই 'এক' করার কথাই বলিতেছে। সংসারের সুখ শান্তির জন্য নারী—এ কথা সত্য। কিন্তু নারীর সুখ-শান্তির জন্যও তো সংসার? নারী কি তাহা পাইয়াছে? পুরুষ যতদিন তাহাদের পুরুষত্বের দাবী না কমাইতেছে, যতদিন মেয়েরা তাহাদের স্ব স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত না হইতেছে, ততদিন কি শান্তি আসিবে? পুরুষ শুধুই বাহিরের নয়, মেয়েও শুধু অন্তঃপুরচারিকা নয়। সীতা সাবিত্রী শৈব্যা দ্রৌপদী কি ঘরের বাহিরে আসিয়া বিশ্বের বুকে দাঁড়ান নাই? সে সময়ে 'কল' ছিল না। 'কল' আসিয়াছে ঘর ভাঙ্গিবার জন্য, একান্ত ঘরে থাকিবার মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ স্বরূপ। নারীদের জীবনে বাহিরের দাবী সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত হইলে 'কল' আর ঘরের বউকে টানিয়া নিতে পারিবে না, নিজেও ঘরের শান্তি টুটিবে না।… রেণু 'নারী ঘরণী ও শ্রমিক' পাঠ করে, আলোচনা হয়। সংঘাবতারও পাঠ হয়।…

৮ই মে

সকালে প্রার্থনা হয়—তুমি আবার আসিবে বলিয়া গিয়াছ। কিন্তু সে কোন্ রূপে? সে কি আনুমানিক রূপ, না প্রত্যক্ষ রূপ, বর্ত্তমান রূপ? বর্ত্তমান রূপে না আসিলে লক্ষ লক্ষ মানুষ objectively তোমায় কি করিয়া পাইবে, কেমন করিয়া তোমার দেহ অবলম্বনে সকল জাতি এক হইবে? সেই তোমাকে আমি ধারণ করিব—ইহা আমার দুর্জ্জয় লালসা হইলেও আমি ইহাই চাই।…আমি শূন্য হইয়া পূর্ণ তোমাকে ধারণ করিব।…জ্ঞান বিজ্ঞান হইতে 'আক্রোশ-বিদ্বেষ-ঘৃণা' প্রবন্ধটী পড়া ও আলোচনা হয়। বিবেক ও সমাজের সঙ্গে জৈব সংবেগের লড়াই অহরহ চলিতেছে। নির্ব্বাণের স্তর হইতে অনাদি কামের স্তর। সেখানের উপাদান কাম। উহাই জীবের কারণ শরীর। পুরুষোত্তম-দর্শন ব্যতীত বিবেক ও সামাজিক অবদমন-মূলক কৃষ্টির সঙ্গে জৈব সংবেগের সমন্বয় কেহ করে নাই, করিতে পারিতেছেও না। বিবেকের কোন্ রূপ জৈব সংবেগকে পরিপাক করিয়া সার্থক হইয়াছিল, তাহাই

ত্রকে আস্বাদিত হইয়াছে …পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ছাড়া পরস্পরবিরুদ্ধ বিবেক ও কামনাবেগ, বিনয় ও ধৃষ্টতা কেমন করিয়া সমন্বিত হইবে? অথচ ব্রজলীলায় রহিয়াছে পরস্পর বিরুদ্ধের সম ও সার্থক আস্বাদন …

৯-ই মে

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা'—মুক্ত তুমি মুক্ত আমি দুই পাখী একই অসীম আকাশ অসীমের পানে পাশাপাশি পাখা ছোয়াইয়া অনন্ত আকাশে উড়িয়া চলিয়াছি—আবার কখনও এই সংসারের বুকে একই নীড় বাঁধিয়া বুকে বুক মিলাইয়া বাস করিতেছি। একই আকাশ, একই ধরা, একই তুমি-আমি। এই ব্রহ্মবিহারের বিরাম নাই, ইহার উপমা নাই। অনির্বচনীয় এই আনন্দ। এক পাখা মোদ, অপর পাখা প্রমোদ, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্ম-পুচ্ছ না হইলে নীলাকাশে বিহার অসম্ভব। ব্রহ্মই তো 'ছন্দ'। …৬টায় চিদানন্দ এক মোটর নিয়া আসে বুদ্ধমন্দিরে যাইবার জন্য। যাই রেণুর সঙ্গে। ৬৷০টায় সভা হয়। সভাপতি বিধুশেখর শাস্ত্রী। প্রথমে বলেন এস. কে. বিশ্বাস, পরে আমি। বেদান্ত-বৌদ্ধ দর্শন সমন্বয়ের কথা বলি। সভাপতির ইহা মনঃপূত হয় নাই। মতবাদের যে কাটাকাটি ইহাদের মধ্যে আছে, তাহার পাশ কাটাইয়া বলেন, 'মৈত্রী মুদিতা করুণা উপেক্ষা' সব ধর্মেই আছে। ইহা কি শঙ্করাদি মানিতেন না? তবে কেন বৌদ্ধমত খণ্ডন করিলেন? যাহা খণ্ডন করিলেন, আজ তাহারই মণ্ডন প্রয়োজন। সব পাশ কাটাইয়া কাল যাপন থাকিবার নয়। মহা করুণা, মহা মুদিতা, মহা মৈত্রী, মহা উপেক্ষা—এই চারিটী 'ব্রহ্মবিহারের' কথা, 'মানবিহারের' কথা সভাপতি বলেন।…

১০ই মে

ওগো, নবীন সৃষ্টির বীর্যদাতা শ্রীনিত্যগোপাল, আমি সেই বীর্য ধারণ করিব, পোষণ করিব, প্রসব করিব—এই অধিকারে আমি তোমার রাতুল চরণে দাবী করিতেছি। তুমি আমি এক অদ্বৈত—একতনু, একপ্রাণ, একমন, এক বিজ্ঞান, এক আনন্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা বিশ্বের সামনে অপূর্ব সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত তুমি-আমি দাঁড়াইয়া নবীন বিশ্ব সৃষ্টি করিবার উন্মাদ লালসায় .. শরণাগতির লক্ষণ হইতেছে, 'রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ', 'গোপ্তৃত্বে বরণম্'। শ্রীগুরুদেব রক্ষা করিবেন, তিনিই আমার ও আমার সব কিছুর রক্ষক। আমিত্বে কেন্দ্র করিয়া পুত্র-কন্যা বা সংসারের যে আসক্তি তাহা থাকিবে না। থাকিবে গুরুকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বের প্রতি এবং বিশ্বের মধ্য দিয়া আমার সংসারের প্রতি আসক্তি। শ্রীগুরুর স্তরে উঠিয়াই বিশ্বের প্রতি আসক্ত হওয়া সুন্দর।…

১১ই মে

জাগো, জাগো মহাসমাধি নিদ্রা হইতে নিত্যগোপাল। তোমার আমার অদ্বৈত মিলনের মাঝে নবীন বিশ্ব গড়িয়া উঠুক। টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে আফিসে যাই আজই সারদা ঘোষের ডি পি করিবার কথা বলিয়া দিতে। ৯৷০টা পর্যন্ত থাকি। আমার বুকে একটা জ্বালা সদা সর্বদা ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। কবে ঠাকুরকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিব, কেমন করিয়া তাঁহাকে বুকে লইয়া জাগাইয়া যাইব?…ইহারা তো আমার সুখের জন্য কত করে, আমি তো তাহার উপযুক্ত সমাদর করিতে পারিলাম না। ঠাকুর, আমাকে দায়মুক্ত কর; আমার জন্য যা-কিছু করা সব তুমি গ্রহণ করিও, তবেই উহা সার্থক হইবে। আমার জন্য করা আমার গ্রহণ করিতে ভয় হয়, পাছে উহা ভস্মে ঘি ঢালা হয়।…

১২ই মে

দেখা দেও, দেখা দেও সঙ্গোপনে। বড় জ্বালা যে আমার। দিন গেল, আর তো বেশী দেরী নাই। আজিও আসিবে না? সারা দিনে আমার বুকে ধিকি ধিকি কি জ্বালা জ্বলিতেছে।…'দেখা দেও, দেখা দেও' বলিয়া কি আর্তি! সত্যিই তো দেখা না হইলে কি করিব বাঁচিয়া? আমি তো একান্ত চিন্ময় চাই না, চাই মৃন্ময় চিন্ময়ের সমন্বয়।…রেণু আসে ৪৷০টায় পর। সে

১১টার পর বাহির হয়। সে সেফ ডিপোজিট, ক্লিয়ারিং প্রভৃতি স্থানে যায়। ব্রহ্মসূত্রের (১ম খণ্ড) ভূমিকা আজ শেষ হয়। নীলু ঠাকুরের জীবনী হইতে কিছুটা পড়ে।...

১৩ই মে

ব্রহ্মসূত্র পাঠ আরম্ভ হয়। প্রথম হইতে কয়েক লাইন ব্যাখ্যা করিয়া দেই। চারি অধ্যায়—প্রতি অধ্যায়ে চারিটী পাদ। শ্রীনিত্যগোপাল সমগ্র তত্ত্বের ঘন মূর্ত্তি। ভাগবত-ধর্ম প্রভৃতি ব্যাখ্যা করি। ব্রহ্ম-পরমাত্মা প্রভৃতি কেমন করিয়া এক অখণ্ড পুরুষোত্তম জীবনেরই বিভিন্ন আস্বাদন, তাহা বলি।...

১৪ই মে

উন্মুক্ত আকাশে মুক্ত তুমি ও মুক্ত আমি দুই পাখী সোনার বরণ দুই পাখা ছড়াইয়া অনাদি অনন্ত চলিব, শ্রান্ত হইয়া এই সংসার-বৃক্ষে আলিঙ্গন রত থাকিব—ইহাই লীলা-কৈবল্য। ইহাই নিত্য লীলা—'সঞ্চরন্ অসঞ্চরন্ চ'। আকাশে এছাড়া তো চাই নাই।...এ দেশ মাটির পুতুলে চিন্ময়ীর আবাহন করে, অর্চ্চনা করে, অর্চ্চনার শেষে প্রতিমা বিসর্জ্জন করে। আমি কিন্তু চাই রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষে—যাহার মধ্যে জীবন্ত আমি আছে, মন আছে—চিন্ময়ীর অর্চ্চনা। পাইব না কি? মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর আরাধনা সার্থক হইবে না কি? তাই তো প্রার্থনা—ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম মানুষ। মাটি মাটি, তোমায় আমি ভালবাসি, তোমার মর্য্যাদা আমি দিব, তোমার যথামূল্য আমি প্রতিষ্ঠিত করিব, আস্বাদন করিব।...টানের মাঝে গা ভাসাইয়া দিতে হইবে, তবেই সমগ্র রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। এই টানই বেদান্ত। আমি ব্যাখ্যা করি।... রবীন আসে, তাহার সঙ্গে অনেক কথা হয়।...জগন্নাথের মন্দির গায়ে কেন ঐ ছবিগুলি ইহার আলোচনা হয়। জগন্নাথকে ঘিরিয়া আছে কামময় এই জগৎ। কামকে repress করিয়া যে জীবন্ত মানুষ জগন্নাথকে পাওয়া যায় নাই। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। তাই যুগ আসিয়াছে কামকে sublimate করার। কাম-অকাম সমন্বয় তত্ত্ব প্রচার করাই মন্দিরকে ঐভাবে সাজানোর মূল প্রয়োজন। সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে কাম—ইহা বিশ্বজনীন—পশুতে পাখীতে দেবতায় মানবে। কে ইহাকে এড়াইয়া চলিবে? ত্যাগ করিবে? ইহাকে জগন্নাথের ভাবে ভাবিত কর। আত্মারাম হইয়াই রমণ করা সম্ভবপর—রেমে তয়া চাত্মরতঃ আত্মারামোহপি অখণ্ডিতঃ'—ইহাই জগন্নাথ-তত্ত্ব। জগৎ+নাথ=জগন্নাথ।...

১৫ই মে

শ্রীনিত্যগোপাল অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব তাঁহার দর্শন। 'অল্প অখণ্ড পূর্ণ, অধিক অখণ্ড পূর্ণ, পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ'—এই অপূর্ব্ব দর্শন যিনি দিয়া গেলেন, আস্বাদন করিয়া গেলেন, সকলের আস্বাদন করিবার পথ খুলিয়া গেলেন, তিনিই তো ভবিষ্যৎ যুগ-স্রষ্টা। সৃষ্টি করিবার যোগ্যতা যাহার আছে, তিনিই তো ভগবান। তিনি মানুষ ভগবান, তাই তিনি পুরুষোত্তম।...'অল্পও পূর্ণ'—যুগসৃষ্টির কি অপূর্ব্ব বীজ! অল্প ও অধিকের তারতম্য ভাব আর নাই। অল্পের সঙ্গেও পূর্ণের equal and direct relation।...মেট্রোপলিটানের পাবলিসিটি অফিসার ও তাহার বন্ধু শেখর সেন আসেন। কথা-বার্তা হয়। শেখরবাবুর আমার কথা ভাল লাগিয়াছে। বর্ত্তমানে নর-নারীর অবাধ মিলন যখন অনিবার্য্য, তখন ব্রহ্মচর্য্যের কি রূপ হইবে, ধর্ষিতা নারীকে কি করিয়া সসম্মানে ঘরে আনা সম্ভবপর, স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে হিন্দু সমাজেই কি করিয়া পুনর্বিবাহ দেওয়া সম্ভবপর, অস্পৃশ্যদের কি করিয়া সমাজ-জীবনে অঙ্গীকার করা যায় কোন্ দর্শন অবলম্বনে, আলোচনা হয়।

১৬ই মে

ক্রমশঃ

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগনা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩৭০

১। ভক্তিবাদের গূঢ় মর্ম ... ৩০৫
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

২। প্রার্থনাকালীন ভাষণ ... ৩০৮
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত (৩০)

৩। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিলাপকুসুমাঞ্জলি ... ৩১১
শ্রীসন্তোষ কুমার বসু

৪। সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার রূপ (কবিতা) ... ৩১
শ্রীঅমিয় মোহন বসু

৫। অনিঃশেষ (কবিতা) ... ৩২
শ্রীঅরুণ বরণ চক্রবর্তী

৬। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৩১২) ৩২

কিরণ
কয়েল্ড কয়েল

প্রস্তুত:
দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোম্পানী লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • কানপুর • মাদ্রাজ

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬'০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫'০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫'০০	Soul of India Speaks	৫'০০
কর্মবাণী	১'২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১'৫০
শ্রী শ্রীচণ্ডী	২'০০	পকেট গীতা	২'০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২'০০	রাজর্ষি রামমোহন	১'৫০
বীরত্বে বাঙালী	১'৫০	আচার্য জগদীশ	১'৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪'০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১'৫০
বাংলার ঋষি	৩'০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	১'২৫
বাংলার বিদুষী	২'০০	রবীন্দ্রনাথ	১'২৫
বাংলার মনীষী	১'২৫	জীবন গড়া	'৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি.

বিদ্যাসাগর	২'২৫	বঙ্কিমের গল্প	১'২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯'৫০**

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী **:** ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। । গড়িয়াহাট মার্কেট ।

পারিবারিক সুখ, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই

পরিবার-পরিকল্পনা

●

'পরিবার-পরিকল্পনা'র প্রয়োজন—মায়ের স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুর মঙ্গল,
জাতীয় উন্নতি ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য।

●

নিম্নলিখিত কেন্দ্রে গিয়ে **বিনামূল্যে** বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন :—

১। এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩; ২। সোনারপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পোঃ কানালিয়া; ৩। বারুইপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পোঃ বারুইপুর; ৪। সরকারী কুলটী কলোনি (৪ নং) সংলগ্ন রিবার-পরিকল্পনা ক্লিনিক, পোঃ কামড়; ৫। কালিকাপুর প্রসূতি হাসপাতাল, কালিকাপুর, পোঃ সোনারপুর; । বজবজ মিউনিসিপ্যালিটি কেন্দ্র, পোঃ বজবজ; ৭। গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটি কেন্দ্র, ই-৩ সার্কুলার ার্ডেনরীচ রোড, কলিকাতা-২৪; ৮। হালতু ইউনিয়ন মহিলাসমিতি কেন্দ্র, গরফা মেইন রোড, কলিকাতা-৩২; । সাগরদত্ত হাসপাতাল, পোঃ কামারহাটী; ১০। ডাঃ বি এন বসু হাসপাতাল, পোঃ ব্যারাকপুর; ১১। ালিসহর মিউনিসিপ্যালিটি কেন্দ্র, পোঃ হালিসহর; ১২। দমদম মিউনিসিপ্যালিটি কেন্দ্র, পোঃ দমদম; ১৩। রামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, পোঃ আড়িয়াদহ; ১৪। বেঙ্গল ইমিউনিটি কোঃ লিঃ কেন্দ্র, ৪৪ গোপাল লাল ঠাকুর রাড, কলিকাতা-৩৬; ১৫। নিউ ব্যারাকপুর কো-অপারেটিভ কলোনি প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র, পোঃ াজারামপুর; ১৬। বরদাই ভবন পরিবার-পরিকল্পনা কেন্দ্র, শিবাচল (বিরাটী) পোঃ নিমতিতা।

●

'পরিবার-পরিকল্পনা' সম্পর্কে

আপনি সমস্ত কিছু জানুন, অপরকে জানান, নিয়মগুলি ঠিকমত পালন করুন।

WB (P) Ad. D 1729 (79)/FP

উজ্জ্বলভারত

অগ্রহায়ণ, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

ভক্তিবাদের গূঢ় মর্ম

।। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ।।

ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক অশ্রুজলে অভিষেক করিতে করিতে পিতা হিরণ্যকশিপু প্রফুল্ল মনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

প্রহ্লাদানূচ্যতাং তাত স্বধীতং কিঞ্চিদুত্তমম্।
কালেনৈতাবতাযুষ্মন্ যদশিক্ষদ্ গুরোর্ভবান্ ॥ ৭।৫।২২

—'আয়ুষ্মন্ হে তাত প্রহ্লাদ, এতকাল গুরুগৃহে থাকিয়া যাহা কিছু শিখিয়াছ তন্মধ্যে যাহা সু-অধীত, সু-অধিগত, তাহা আমাকে বল।'

ইহার উত্তরে প্রহ্লাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভক্তিবাদের নিগূঢ় মর্ম নিহিত রহিয়াছে, সে মর্ম আর অনুধাবন করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,

'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্। ৭।৫ ২৩-২৪

—বিষ্ণুর শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চ্চন বন্দন দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি যদি পুরুষোত্তম বিষ্ণুতে অর্পণপূর্ব্বক কৃত হয়, আমার মনে হয় তাহাই সু-অধীত।'

এই শ্লোকদ্বয়ের অন্তর্গত 'অর্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিঃ চেৎ নবলক্ষণা ক্রিয়েত' অংশকে অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া শ্রীধর স্বামীপাদ লিখিয়াছেন,—'সা চ অর্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত।' অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন যদি 'অর্পিত' হইয়া 'কৃত' হয় (কৃত হইবার পশ্চাৎ অর্পিত না হয়) তবেই শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিপদবাচ্য হইবে।'

প্রহ্লাদের উক্তির গূঢ় মর্ম অবধারণ করিলে ইহা সুস্পষ্ট হয়, শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি দৈহিক বা মানসিক কর্ম পূর্ব্বে ভগবান বিষ্ণুতে অর্পণ করার পর কৃত হইলে তাহা ভক্তিরূপে পরিণত হইবে। নচেৎ তাহারা কর্মই থাকিয়া যাইবে। যাহা কিছু কর্তৃতন্ত্র, অর্থাৎ কর্ত্তা যাহা করিতে, না-করিতে বা অন্যথা করিতে পারে, তাহাই 'কর্ম'। শ্রবণকীর্ত্তনাদি 'কর্ম'ই থাকিয়া যাইবে, যদি তাহারা বস্তুতন্ত্র বা পুরুষোত্তম-তন্ত্র না হইয়া কর্তৃতন্ত্র হয়। ভক্তিসাধনায় শ্রবণাদি কর্ম প্রথমে ভগবান বিষ্ণুতে অর্পণ করিব, পরে তাঁহার প্রসাদস্বরূপ ঐ কর্ম আমি করিব। যে কর্ম বা জ্ঞানের 'আরম্ভ' ভগবান বিষ্ণু হইতে, তাহাই ভক্তি; আর যাহা-কিছু কর্ম বা জ্ঞানের আরম্ভ জীবের অহম্ হইতে তাহাই কর্ম। 'বস্তুতন্ত্রং ভবেৎ জ্ঞানম্'—শঙ্করবাণী। 'স্বাধীনা ভবেৎ বিষ্ণো'—আচার্য্য শঙ্কর। ভক্তিও ভগবান বিষ্ণুর অধীনা, তোমারও নয়, আমারও নয়। ভক্তি-গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতেই প্রবাহিত হয়।

ইহাই আরও স্পষ্ট করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-তে লিখিয়াছেন:

'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

—'অতএব শ্রীকৃষ্ণনামরূপ লীলা ইন্দ্রিয়দেরদ্বারা গ্রাহ্য নয়। সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতেই নামরূপলীলা স্বয়ং স্ফুরিত হয়েন।'

কর্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ত্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণনামরূপ লীলা দর্শন, শ্রবণ বা মনন করিবে—ইহা কখনও হইবার নয়। ইন্দ্রিয়গণ 'কর্ত্তা' হইয়া ভগবানের নামরূপলীলাকে গ্রহ-ধাতুর 'কর্ম' করিলে নামরূপলীলার অপ্রাকৃতত্ব বিলুপ্ত হইবে। অথচ সকল ভক্তিশাস্ত্র বলিতেছে,

'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধঃ নিত্যমুক্তঃ অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥'

—'শ্রীকৃষ্ণের নাম চিন্তামণি, নামই কৃষ্ণ, নাম চৈতন্যরসবিগ্রহ। নাম পূর্ণ শুদ্ধ ও নিত্য মুক্ত; কেননা নাম-নামী অভিন্ন।'

অতএব নামরূপলীলাকে 'কর্ত্তুঃ ঈপ্সিততমং' কর্ম্মকারকে পরিণত করিলে বস্তুর উপর পরিচ্ছিন্ন 'আমি'-র ছাপ আঁকিয়া দেওয়া হয় বলিয়া উহা কখনও 'চিন্তামণি' হয় না; উহাতে জড়ত্বই আপতিত হয় বলিয়া উহার চিন্ময়ত্ব ও শুদ্ধত্ব মুছিয়া যায়, উহাদের পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত স্বরূপের বাধা ঘটে। পূর্ব্বে নিজের অহম্‌কে ও অহম্পূর্ব্ব কর্ম-বুদ্ধি-মন ও ইন্দ্রিয়কে ভগবান বিষ্ণুতে অর্পণ করা হইলে, সেই অর্পিত অহম্ ও মনবুদ্ধিইন্দ্রিয় যে কর্মে স্ফুরিত হইবে, তাহাই হইবে 'ভক্তি'। এক কথায় ভগবানে মনোময় বুদ্ধিময় ও অহম্ লয়ের পরেই ভক্তির আস্বাদন জমিয়া উঠে। নির্গুণা ভক্তিতে কর্মজ্ঞান হইবে ভক্তির ঘন আস্বাদন। তাই গীতা ঊর্দ্ধমূল হওয়ার কথা বলিয়াছেন। বিশ্বের মূল পুরুষোত্তম; সেই মূল ধরিয়াই বিশ্বে উঠিতে হইবে বা নামিতে হইবে। মূল যদি ঊর্দ্ধে থাকে, তবে তো বিশ্ব মূলের নীচের দিকেই। তাই ভক্তি সাধককে কর্ত্তৃত্ব সাধনার উজান গতিতে যাইতে হয়; বাঁশীর সুরে যমুনা উজানে বহিত। বর্ণাশ্রমের আরম্ভ জীবের অহম্ হইতে; ভক্তি সাধনার আরম্ভ ইহারই উজান গতিতে ভগবান হইতে, 'পুরুষোত্তমোঽহম্' হইতে। বর্ণাশ্রম বিশ্ব হইতে বিশ্বনাথে পৌঁছিবার কথা শুনাইয়াছে, আর ভাগবত শুনাইয়াছেন বিশ্বনাথ হইতে বিশ্বে আসিবার খবর। তাই ভক্তি-সাধনায় ভগবান যেমন সত্য, তাঁহার নামও সত্য, রূপও সত্য, লীলাও সত্য; তাঁহারই নির্গুণ লীলাক্ষেত্র এই বিশ্বও সত্য। দেবগণ কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের এই সত্য স্বরূপের স্তব করিয়াছেন—সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং

সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

ভাগবত ১০।২।২৬

—'হে ভগবন্, আপনি সত্যব্রত। সত্য আপনার লক্ষ্য (end), সত্য আপনার প্রাপ্তিসাধন (means)। আপনি রূপে ও স্বরূপে ত্রিকালে অবাধিত সত্য। আপনি সত্যের যোনি ও সত্যে অবহিত। সৎ ও ত্যৎ (সত্য)-বাচ্য এই ভূতসমূহ সত্য। আপনি এই সত্য ভূতসমূহকে পারমার্থিক সত্যে গড়িয়া তুলিয়াই পর সত্য রূপে অবতীর্ণ। আপনার শরীর সুনৃতা বাণী ও সদ্দর্শনের প্রবর্ত্তক (নিত্য)। আপনি সর্ব্বার্থে সর্ব্বকালে সর্ব্বক্ষেত্রে সত্য, তাই সত্যাত্মক। আমরা আপনার শরণ নিতেছি।'

ভক্তিবাদ কখনও ভগবানকে বিশ্বের ওপারে নির্ব্বাসন করে নাই। ভগবান তাঁহার immanent aspect এই বিশ্বকে 'সর্ব্বতোবৃত্যা' অতিক্রম করিয়া আছেন (অত্যতিষ্ঠৎ)। জগৎ+নাথ=জগন্নাথ। যোগমায়া স্থানীয় সুভদ্রা (+) জগৎ ও নাথকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। পুরুষোত্তমের এই নিগূঢ় তত্ত্বকে লাভ করিতে হইলে ভগবানের সহিত অনন্যভক্তিদ্বারা যুক্ত হইয়া বুদ্ধিলয় বিধান করিতে হয়। 'অনন্যভক্ত্যা তদ্বুদ্ধিঃ বুদ্ধিলয়াৎ অত্যন্তম্'—'অনন্য ভক্তিদ্বারা অত্যন্ত বুদ্ধি লয় হইলে ভক্তিসাধক 'তদ্বুদ্ধি' হন।' তদ্বুদ্ধি হইলেই ভক্ত 'ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ'—গীতা। ভক্তিসাধনায় 'পাওয়া' দ্বিবিধ। প্রথম পাওয়া স্বরূপে, দ্বিতীয় 'পাওয়া' রূপে পাওয়া। দ্বিতীয় 'পাওয়া'কেই 'অভিজ্ঞান' পদদ্বারা ভগবান বুঝাইয়াছেন। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন :

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তম্ যেন মামুপযান্তি তে' ॥ গীতা

—'সততযুক্ত, প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাকারীদের আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত

হন'। বুদ্ধিযোগ উদয়ের পূর্ব্বে সত্ত্বভক্ত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাকারীর 'পাওয়া'কে মহাকবি কালিদাসের কণ্বমুনির আশ্রমে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পরস্পরকে চিনিবার লোকচক্ষুর অন্তরালে পাওয়ার মত বুঝিতে হইবে। বুদ্ধিযোগ লাভের পরের পাওয়াকে তুলনা করা যাইতে পারে সকল বিশ্বের চক্ষুর সামনে দুষ্মন্ত শকুন্তলার দ্বিতীয়বার 'পাওয়ার সঙ্গে'। এই দুইটী 'পাওয়া'র মধ্যে আংটী হারান রূপ একটা অন্তরায় আছে। প্রথম 'পাওয়ার' নাম জ্ঞান। দ্বিতীয়বার পাওয়ার নাম বিজ্ঞান-মন-বুদ্ধির ক্ষেত্রে বাস্তব রূপে 'পাওয়া'। প্রথমের জানা-বস্তুকে পুনরায় 'পাওয়া'র নামই অভিজ্ঞান। 'পূর্ব্বজ্ঞাতস্য জ্ঞানম্ অভিজ্ঞা'—শাণ্ডিল্য সূত্রের স্বপ্নেশ্বর ভাষ্য। শ্রীনিত্যগোপালও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—'এক ব্যক্তি হীরক পাইয়াছে, অথচ সে হীরক চেনে না। সুতরাং সে হীরকের মর্ম্মও বোঝে না। ছদ্মবেশী ভগবান পাইয়াছ, অগ্রে তাঁহাকে চেন তবে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিবে।' ভগবানকে আমরা পাইয়াই আছি; ইহা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ 'পাওয়া'। কিন্তু পাইলেই তো পাওয়া হয় না। অন্ধকারের মাঝে পাওয়া ধনকে চিনিয়া না লইলে, যাচাই করিয়া না লইলে তাহা হাতছাড়া হইয়াই যায়। হীরক চেনে না এমন একটী শিশুকে একটী মোয়া দিয়া তাহার হাত হইতে অনায়াসেই হীরকটী কাড়িয়া নেওয়া যায়। সর্ব্ববিশেষমুক্ত বুদ্ধিসত্ত্বের মধ্যে প্রথমে যাহার পরিচয় পাই, তাঁহাকে জাগ্রতের দেশে মনোবুদ্ধির আলোতে পাওয়ার নামই অভিজ্ঞান। 'পাওয়া' আমার জীবনে 'fact' হইয়াও task হইয়াই আছে। 'spiritual life is at the same time a fact and a task,—Eucken, ভগবানকে পাইয়াই আছি—এই সংবাদ পৌঁছাইয়াছিল অদ্বৈতবাদ; আবার সেই না জানিয়া না বুঝিয়া পাওয়া ধনকে জানিয়া শুনিয়া পাওয়ার খবর দিয়াছে ভক্তিবাদ। অদ্বৈতসাধন পূর্ব্বে না থাকিলে ভক্তিবাদের ভিত্তিভূমি ধ্বসিয়া যায়, আবার ভক্তিবাদ না হইলেও অদ্বৈতবাদ' জীবের জীবনের কোন সার্থকতা থাকে না, উহা অবাস্তব আকাশের কল্পনা হইয়াই ভাববিলাসীর ভক্তিবাদে পরিণত হয়। ভক্তিবাদ ও অদ্বৈতবাদ দুই-ই দুইয়ের পরিপূরক—complementary। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন, 'শিবের প্রতি জীবের আপনার অদ্বৈততা বোধ হইলে শিবের প্রতি জীবের যে ভক্তি হইয়া থাকে আমাদের বিবেচনায় তাহাকেই পরাভক্তি বলা যাইতে পারে।' 'শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ'—শিব না হইয়া কেহ কোন দিন সত্য সত্য শিব পূজা করিতে পারে না, পারিতেছেও না। ইহা শ্রীনিত্যগোপালের বৈপ্লবিক গ্রন্থ 'ভক্তিযোগদর্শন' পাঠ করিলেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। অথচ এতদিন এই অদ্বৈতবাদকে ভক্ত ভীতির চক্ষেই দেখিয়াছেন; অদ্বৈতবাদও ভক্তিকে একান্ত জ্ঞানের সিঁড়িরূপে দেখিয়া ভক্তির মুখশ্রীই মুছিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল শিশুর সঙ্গে মায়ের প্রথম সম্বন্ধকে অদ্বৈত সম্বন্ধই বলিয়াছেন। শিশুদের মাতৃভক্তিকে উজ্জীবিত করিবার জন্য আমরা তাই শুনাই—'দশ মাস দশ দিন ধরিয়া পেটে' যে মা কত কষ্ট করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে ভক্তি করিও। দশ মাস দশ দিন মাতৃগর্ভে থাকার অর্থই হইতেছে আমি একদিন মাতৃগর্ভে মা হইয়া ছিলাম—I was one with my mother—মা হইতে আমার কোনও পৃথক সত্তা ছিল না। মায়ের সঙ্গে সন্তানের এই অদ্বৈতানুভূতি যত স্পষ্ট হইবে, ততই মাতৃভক্তি শুদ্ধা হইবে। ভক্তি অদ্বৈতজ্ঞান পূর্ব্বক হইলেই তাহা হয় নির্গুণা। এই নির্গুণা ভক্তি লাভ করিতে হইলে পূর্ব্বে জ্ঞান-কর্ম্মের চাই অর্পণ—অর্পণের পর কৃতা ভক্তিই নির্গুণা ভক্তি। ইহাই অর্পিতৈব ক্রিয়তের গূঢ় তাৎপর্য্য। ভাগবতগ্রন্থে ভগবান কপিল মাতা দেবহূতিকে এই নির্গুণ ভক্তির কথাই শুনাইয়াছেন। বিশ্বের বুকে আর একটি অবতরণ আজ বাস্তব হইয়া উঠিতেছে। তাহার লক্ষণ দিকে দিকে। মৎ-সম্পাদিত উজ্জ্বলভারত এই নির্গুণ ভক্তির স্বরূপ ও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ কৌশলের খবর দিয়া চলিয়াছে। পুরুষোত্তম জয়যুক্ত হউন। বন্দে মাতরম্।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৩১)

২১-৭-৫৮। ওঁ ...।...কলকাতায় থাকলেও কলকাতায় থাকার সুবিধা আমি নেই নি, সিনেমা দেখি না...। মথুরা ত্যাগ করার পরই কৃষ্ণ মথুরায় এলেন।...আমারও তাই—কলকাতার সভ্যতাকে ছেড়ে গ্রামের সভ্যতা, বৃন্দাবনের সভ্যতাকে গড়ন করার প্রচেষ্টাই আমার...। নাগরিক সভ্যতার প্রয়োজনীয় অংশকে গ্রামীণ সভ্যতার সঙ্গে সমন্বয় করতে নিত্যগোপাল এসেছেন। ১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী এই প্রেরণাতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। বর্তমান যুগ নিত্যগোপালের যুগ···। বাংলার যত মহাপুরুষ আছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম পরিচিত নিত্যগোপাল। তিনি এসেছেন প্রাণ নিয়ে···প্রাণ অপরিচিতই থেকে যায়···। প্রাণ কোথায় থাকে? প্রাণের থাকবার নির্দিষ্ট স্থান নেই—প্রাণ সর্বত্রই আছে। নিত্যগোপাল প্রাণের দৃষ্টিতে জগৎকে দেখবার কথা নিয়ে এসেছেন···বর্তমান যুগ সর্বস্তরীয় যুগ—জড়কেও গ্রহণ করতে হবে, অজড়কেও···। নিত্যগোপালের কোন সংস্কার নেই—সহজ সমন্বয়শীল একখানা জীবন—টিকি মালা গেরুয়া—কোন সংস্কারের মধ্যে নেই। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় পাওয়া যাবে তাঁর জীবনে।··· বুদ্ধ বহু, ক্ষণ প্রকৃতির কথা বলেছেন, শঙ্কর এক সনাতন প্রকৃতির কথা বলেছেন—নিত্যগোপালে এক বহু, ক্ষণ সনাতনের সমন্বয় পাওয়া যাবে। Every development is by breaks, yet makes for continuity—নিত্যগোপালের এই তত্ত্ব নিয়ে অজানার পথে ঝাঁপ দিয়েছি···। এখানে দুই দল—অশ্বিনীনগর বাগুইআটি—আমি কোন দলে নেই—আমি দুই দলকে কোলাকুলি করাব···কলকাতার মানুষকে এইখানে টেনে আনব এ কল্পনা আমার আছে।···আমি সংসারীও নই, তথাকথিত সন্ন্যাসীও নই, কোন সংস্কার আমারও নেই, আমি জীবন্ত মানুষের উপাসক। যারা এখানে এসেছ তারা নূতন করে জীবনকে গড়ে তোল—আমি কোনদিন কাউকে শোষণ করি নি। নিত্যগোপালের তেমন একটা মতবাদ নিয়ে আমি বসে আছি যেখানে সকলে মিলতে পারে।··· বিশ্বকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিত্যগোপাল আমার বুকের মধ্যে দিয়েছেন···১৩।১৪ হাজার বক্তৃতা দিয়েছি—৪।৫ শত গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি—সহস্র মানুষের স্নেহ পেয়েছি—মানুষের সেবা করে সে ঋণ শোধ করতে হবে···আমার কাজ শেষ হয় নি।···আশ্রমে যারা আছ তাদের শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন থাকলে আমার কাজ হবে।'' কর্মজ্ঞান ভক্তির সাগর নিত্যগোপাল। Spiritual life is at the same time a self life and a cosmic life—ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে সমষ্টি জীবনের বিরোধ নাই—কৃষ্ণ সকলের দাবী পূরণ করেছেন···। নবনারায়ণ আশ্রম যেন লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্রাম স্থান হয়। নিত্যগোপাল বর্তমান যুগের dynamo—তিনি এইখান থেকে প্রচারিত হবেন···।

২৮-৮-৬০···। বর্তমান যুগের সাধনা কি হওয়া উচিত গীতায় তার ইঙ্গিত আছে এবং অতীতের সব সাধনা যে ব্যর্থ হয়ে গেছে, ভাগবতে তা-ও আছে।···বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রীতীর্থাভিষেকব্রতদানজপৈঃ। নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥—বিদ্যা তপ প্রাণ-নিরোধ মৈত্রী তীর্থাভিষেক ব্রত দান জপ—কোনটা দ্বারাই অন্তরাত্মা অত্যন্ত শুদ্ধি লাভ করে না, যেমন করে অনন্ত ভগবান হৃদয়স্থ হইলে।

ভগবান স্বয়ং হইলে যেমন হয়, আমি যদি সাধন আরম্ভ করি, তবে তেমন শুদ্ধি হইবে না। শুম্ভ-নিশুম্ভ অযুত বর্ষ তপস্যা করিলেন, কিন্তু জীবত্ব কাটিল না। কেন?—সকলেরই আরম্ভ আমি হইতে—আমির সকল সাধনাই প্রকৃতির সঙ্গে একটা সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে···বাধা দেওয়ার পথে সময় লাগে—অন্তে পাবি মোক্ষধাম।···গীতা সেখানে শরণাগতির সাধনা এনে দেখালেন সুহৃদম্ কর্ত্তুম্··· আমির সাধনার ভাল মন্দের বিচারক আমি। শিশুর ভাল অর্থাৎ শিশু যা ভাল বলে বুঝল, তা মন্দও হয়···আমি-সাধনায় যতই জোর করবে, ততই বাধাও প্রবলতর হবে। নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে উত্তরপাড়া যাইতে অঙ্কের হিসাবে যা লাগে, বাস্তবে তা হয় না। ব্রহ্মসূত্র দ্রষ্টব্য।

জীবনখেলা তুই তামসি করে রে
　　　　ব্রহ্ম-প্রেম-সাগর জলে
সাগর-জলে জাহাজ চলে রে,
　　　　জাহাজ বড় তুফানে ডোবে
কলার ভেলা ডোবে কবে রে।
সেই তরঙ্গের চূড়ায় বসে ভেলা ব্রহ্ম-দোলায় দোলে রে।
দুলতে দুলতে যখন ভেলার পাটে পাটে খসে যায়
তখন সাগর-সঙ্গ লাগায় গায় রে।
　　　　ব্রহ্মপ্রেম সাগর জলে···

কলার ভেলা সাগর জলে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে—তাই সে ডোবে না···যে যত হজম করতে পারে সে তত মুক্ত···কৃষ্ণ সব হজম করেছিলেন।···ভাগবত বলেছে—কলিযুগের লোক মন্দভাগ্য উপদ্রুত···আজ বায়ুবিকার, ক্রোধবিকার, লোভবিকার···সমস্ত বিকৃতি আজ একটা জাতিকে গ্রাস করেছে··অহংকার ত্যাগ কর—শরণাগত হও। তাঁর সঙ্গে আমি চলব তাঁর স্নেহ ভালবাসা নিয়ে সেদিন সাধনা শুরু হবে, সেদিন সিদ্ধি হবে সাধনার আস্বাদন।···তাঁর জীবনে জীবন মিলিয়ে চলাই অনন্তের সাধনা···বাছুরকে দূর্বলে ডাকতে হয় না—মায়ের স্নেহ কোলে পায়—তাকে বরণ করে নেওয়া সাধনা···।

৩০-৮-৬৩।···জীবের স্বভাব আশ্রয়ের ' বিড়ালীর মত। ছানা সে ছোটাছুটি করবে, না চুপ করবে এই দুটো পথ ওর জানা, অন্য কোন তৃতীয় পথের খবর জানে না। মানুষও এমনি। আমার কাছ থেকে জান কি রকম করে পাওয়া যেতে পারে, তা বিড়ালী জা না। শিশুরাও তাই··· বিড়ালী যদি জানত আমার বি প্রভু, আমাকে বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদ তাঁরও—এই তৃতীয় পথ—বিশ্বাস নির্ভরতার পথ।···জীবও তাই সে বিশ্বাস করতে পারে না। সে হয় প্রার্থনা করে ন অসদুপায়ে অর্জন করে। প্রার্থনা করা ভাল, কিন্তু তৃতী পথও আছে—বিশ্বাসের পথ, নির্ভরতার পথ ···আ বাগুইআটি এসেছি, আমি জানতাম না শচীন চক্রবর্তী মত বন্ধু পাওয়া যাবে, কিন্তু আমার গুরু জানতেন।. মানুষ তো বিশ্বাস করতে জানে না, শরণাগতি বিনা—নির্ভ করতে বিশ্বাস করতে পারে না।...সন্তান যা বলে আনন্দ না পায়, পিতামাতা বাবা মা তার শুনতে ত চেয়ে বেশী আনন্দ পান···। তাই ভাগবত বলেন বিশ্ব বিশ্বের ভিতরে তুমি তোমার পথ চেন না—তুমি শ তোমার গুরু দরকার।···আমি কি জানতাম এই জীব সাধারণে এই বাগুইআটি গ্রামে আসব? আমার জীব দেবতা জানতেন।···বিড়ালীর মাত্রাবোধও নেই, সে ত সুবিধামতও পারে না—গুরু জানেন কোথায় যেতে হ কোথায় যেতে হবে না···ইত্যাদি।···শিশু রাস্তায় দৌড় ...সামনে যে ট্রেন আছে তার চোখে তা পড়ে না· তার অভিভাবক তা দেখে···।···অনুগত যে তার বিশ্বের সকল দ্বার উন্মুক্ত।...নিজের বুদ্ধিতে কতা যেতে পারবে?...সমস্ত প্রকৃতি বসে বসে আছে আমাকে গ্রাস করে নেবে, সেই প্রতিষ্ঠিত হবে—যো জাতি সংগ্রামে···। তুমি হজম করতে শেখ—খা চাওয়া পাওয়ার মাত্রা জানতে হবে...চোঁচা খেতে যে মরতে হবে—এটা জীবের ধর্ম। শিবের ধর্ম শিব নির্ভরতা।··· সাগর জলে জাহাজ জল কেটে চলে আর ডোবে—কলার ভেলা ডোবে না—যো যার শরণ লে উ রাখতা উনকো মান...অহংকারী, নত হও, দাস হও জীবন-খেলা তামসি করে ব্রহ্মপ্রেম সাগর জলে.

কলিকাল বিশ্বাস নির্ভরতার যুগ—অহংকারের যুগ নয়—মামেকং শরণং ব্রজ, মামেকং শরণং ব্রজ···। শিবের পথ জীবের পথ এইভাবে পৃথক।···বৌদ্ধদর্শনের শেষ কথা অনাবরণ হও—ব্রহ্মের এক নাম অনাবরণ।···ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ।

৩১, ৭, ৫৬।··এতদিন ভারতবর্ষের প্রচলিত দর্শন শাস্ত্র এই জগৎটাকে মৃত যন্ত্রের সাথে তুলনা দিয়েছে—যেমন কল—স্টীমারের কল, রেলের কল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শাস্ত্রে এ সংসারটা জীবন্ত যন্ত্র—মৃত নয়—এ যুগের শুরুতে আজ বুঝবার দিন এসেছে। মৃত যন্ত্রে অংশ সমগ্রের অঙ্গই—নিজের মধ্যে নিজে সে পূর্ণ নয়—মগ্রের সে সেবক মাত্র। সমগ্রের জন্যই সে বেঁচে থাকে। ন্তু জীবন্ত তা যন্ত্রে নয়।···মানুষের সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক rganic—জীবন্ত। প্রত্যেক মানুষ নিজের মধ্যে নিজে র্ণ—কিন্তু এই পূর্ণতা নিয়েও সে সমগ্রের সঙ্গে বিযুক্ত—হলে তাহার পরিপূর্ণতা ব্যাহত হয়···শরীরের একটা ন কাটিয়া গেলে শরীরের ভিতর হইতেই তাহা জোড়া গে কেননা ইহা জীবন্ত···পাপীর পাপকে নিয়ে টেনা-টানি জীবন্ত যন্ত্রে থাকে না··আগের প্রায়শ্চিত্তবিধানও ীবনটাকে মৃত মনে করারই পরিণতি...জীবন যদি থাকে াহালে ঘা সারতে কদিন লাগে ?···কৃষ্ণ এই জীবনের ন্ত্র—তিনি পাপ নিয়ে বেশী ঘাটাঘাটি করেন না...ধু জীবনের দিক দিয়া আকর্ষণ করিয়া আগাইয়া লন—াপ পিছনে পড়িয়া থাকে—···যত আইনের টানাটানি করে ভালবাসার পথে চল, ভালবাসার ইনজেকশান রে ফিরে চল, দেখবে রোগ সারবে।...জগতে একজনকে র্শ করলে সকলকেই স্পর্শ করা হয়।···বেদে বলছেন—ই বিশ্বটা সেই পরম পুরুষের দেহ।···এক জনের মাথা কলে বণ্টন করে নেয় জীবন্ত যন্ত্রে।···একটা গাছের লমে আলাদা গাছ হয়, কেঁচো পুনরায় পুরো কেঁচো য়। পুরুষসূক্ত স্পষ্ট বলছে—বিশ্বটা তাঁর দেহ—ব্রাহ্মণ মাথা, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু, শূদ্র পা।...পায়ের ব্যথা মাথায়, মাথার ব্যথা পায়ে।··· প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বাধীন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের অন্তর্গত।...এই নরনারায়ণ সঙ্ঘে একজনের সুখে আর একজনে সুখী হও, একজনের দুঃখে আর একজনে দুঃখিত হও। মাথার সঙ্গে পায়ের ঈর্ষা করবার কিছু নাই।···ঈর্ষা অর্থ তুমি তোমার কাজ বুঝে নাও নি—কোন্ কাজটি তোমার জন্য এবং সে কাজও যে অনন্ত এ কথা বুঝে নাও নি।···কেউ কারো অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না—চক্ষুর সেবা চক্ষু করছে, কান তার কাজ করছে, পা আর এক কাজ করছে—কে ছোট কে বড় ?·নারায়ণের পায়ে তুমি অবজ্ঞা করতে পার না, যেদিন থেকে এই অবজ্ঞা ঢুকেছে সেই দিন থেকে সমাজ যান্ত্রিক হয়ে গেছে।··এই জীবনদর্শন নরনারায়ণ আশ্রম রেখে।··

১, ৮, ৫৬।...। নরনারায়ণ আশ্রম কর্ম সম্বন্ধে কি বলছে এবং সে কর্মের আচরণ কি প্রকার হবে আমি আজ তাই বলব। ভাগবতে নরনারায়ণদেব বলেছেন—নৈষ্কর্ম্যলক্ষণধর্ম উবাচ চচার চ।···বদরিকাশ্রমের এক নাম নরনারায়ণ আশ্রম। নরনারায়ণ দেব যে কর্মের যে পদ্ধতি বলে গেছেন ও আচরণ করে গেছেন, এরও তাই। তিনি কর্ম করে ছিলেন। কিন্তু বিষয়ী লোকের কর্ম নয়, সেটা অবিদ্যা। নৈষ্কর্ম্যলক্ষণ কর্ম করবে—এমন করে কর্ম করবে যার ভিতরে আমি ফুটে ওঠে না—আমির কর্ম নৈষ্কর্ম্যলক্ষণ নয়—অর্জুনকে এই কর্ম করতে বলেছিলেন কৃষ্ণ। অর্জুন কৃষ্ণের কর্ম করবেন তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে—যার কর্ম তার সাথে একাত্ম না হয়ে কর্ম করার কথা আমি বলি না।...কেন আসিয়াছি, কোথা আসিয়াছি তা মনে রেখো—আত্মপ্রতারণা করো না, আত্মপ্রতারিত হয়ো না। নরনারায়ণের কর্ম করবে, সমস্ত প্রাণের অকপটতা নিয়ে সত্যি সত্যি বলতে পার কি না দেখ—করিষ্যে বচনং তব।...আরও তিন রকমের কর্ম আছে—

ক্রমশঃ

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিলাপকুসুমাঞ্জলি

॥ শ্রীসন্তোষ কুমার কুণ্ডু ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার পার্ষদ ত্যাগীশ্রেষ্ঠ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর তিরোধানের পর শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামীর সুগভীর প্রণয় ছিল। শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রতি তাঁর গুরুভক্তি ছিল। তিনি রূপের অপ্রকটের পর বিলাপকুসুমাঞ্জলি রচনা করেন।

বিলাপকুসুমাঞ্জলির দুটি কাব্যানুবাদ পাওয়া যায়। একটির লেখক রাধাবল্লভ দাস প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। অপরটি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন বংশীয় কৃষ্ণদাসের রচনা। বর্তমান অনুবাদ রাধাবল্লভ দাসের।

ডাঃ সুকুমার সেনের মতে কবি রাধাবল্লভ দাস (বা রাধাদাস) শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। শ্রীনিবাসের শিষ্যদের মধ্যে তিনজন রাধাবল্লভ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী তিনিই পদকর্ত্তা কেননা রামগোপাল দাস তাঁহার রসকল্পবল্লীতে 'শ্রীরাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর' বলিয়া পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অনুরাগবল্লীতে মনোহর দাস বলেছেন,

'শ্রীরাধাবল্লভদাস রসবাস মহাশয়।
কামদেব মণ্ডলের যুগলতনয় ॥'

শ্রীরাধাবল্লভ দাস নিজে একজন বৈষ্ণব সাধক, বৃন্দাবন গোস্বামীদের অনুমোদিত রাগানুগা ভজন পদ্ধতির গৌড়মণ্ডলের প্রবক্তা শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। সুতরাং তাঁর অনুবাদে মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাগানুগাভজন পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেছেন।

। বিলাপকুসুমাঞ্জলি ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

তথাহি। ত্বং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতা পুরেঽস্মিন্
পুংসঃ পরস্য বদনং ন হি পশ্যসীতি।
বিম্বাধরে ক্ষতমনাগতভর্তৃকায়া
যত্তে ব্যধায়ি কিমুতচ্ছুক-পুঙ্গবেন ॥১॥

অস্যার্থ। শ্রীরতিমঞ্জরি পুছেন শ্রীরূপমঞ্জরি।
ব্রজপুরে খ্যাতা তুমি পতিব্রতা করি ॥
পরপুরুষের মুখ কভু নাহি দেখ।
বিম্বাধরে ক্ষত চিহ্ন দেখি পরতেক ॥
ভর্ত্তা তোমার ঘরে নাই গিয়াছেন গোষ্ঠে।
তবে কেন ক্ষত চিহ্ন দেখি তোমার ওষ্ঠে।
দিব্যক্ষণ লোভে বুঝি শ্রীশুকপুঙ্গব।
আসিয়াছিল তথি চিহ্ন এই সব ।১।

তথাহি। স্থল কমলিনি যুক্তং গর্বিতা কাননেঽস্মিন্
প্রণয়সি বর হাস্যং পুষ্পগুচ্ছচ্ছলেন।
অপি নিখিল—লতাস্তাঃ সৌরভাক্তাঃ স মুঞ্চন্
মৃগয়তি তব মার্গং কৃষ্ণ ভৃঙ্গো যদস্য ।২।

অস্যার্থ। শ্রীরতিমঞ্জরি প্রতি শ্রীরূপমঞ্জরী।
ছলোক্তিতে প্রশ্ন করে করিয়া চাতুরী।
স্থলকমলিনীযুক্ত দেখি এই বনে।
গর্বিতা হইয়াছ তুমি আনন্দিত মনে।
পুষ্পগুচ্ছ ছলে বড় হাস্য কর তুমি।
বুঝিলাম ইহার কারণ সব আমি।
বিকশিত নানা লতা পুষ্পগন্ধ যুক্ত।
তাহি ছাড়ি কৃষ্ণ ভৃঙ্গ ভ্রমেন অবিরত।
তুয়াপথ অন্বেষণ করি ফিরি বনে।
অতএব আনন্দিত হই বড় মনে ।২।

শ্রীল রঘুনাথ দাস যিনি সখীভাবে শ্রীরতিমঞ্জরি ন খ্যাত তিনি তদীয় গুরুদেব শ্রীল রূপ গোস্বামী বা শ্রী মঞ্জরিকে স্মরণ করে একথা বলছেন। গুরু শিষ্য উভ সিদ্ধ দেহ, সুতরাং তাঁদের কৌতুক অলৌকিক স নেই ।১।

স্থল কমলিনী—স্থলপদ্ম। কৃষ্ণ ভৃঙ্গ—কৃষ্ণ বর্ণভৃঙ্গ কৃষ্ণরূপভৃঙ্গ ।২

তথাহি। ব্রজেন্দ্র বসতিস্থলে বিবিধ বল্লবী সঙ্কুলে
ত্বমেব রতিমঞ্জরি প্রচুর পুণ্যপুঞ্জোদয়া।
বিলাস—ভর—বিস্মৃত—প্রণয়ি—মেখলা—মার্গণে
যদদ্য নিজ নাথয়া ব্রজমপি নাথিতা বনম্ ॥৩॥

অনুবাদ। আর যত ব্রজেন্দ্রনগরে কত কত।
বিবিধ বল্লবী গণ আছেন শত শত॥
তুমি সেই সেবা হৈতে বড় ভাগ্যবতী।
প্রচুর পুণ্যপুঞ্জোদয়া করিয়াছ রতি॥
বিলাসের অতিশয় বিস্মৃত হইয়া।
প্রাণেশ্বরী নিজ প্রিয় মেখলা হারাইয়া॥
তাহা অন্বেষিতে তোমা পাঠাইল বনে।
অতএব যাহ তুমি কন্দর কাননে॥৩॥

তথাহি। প্রভুরপি যদুনন্দনো য এষ
প্রিয় যদুনন্দন উন্নতপ্রভাবঃ।
স্বয়মতুলকৃপামৃতাভিষেকং
মম কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রপদ্যে ॥৪॥

অনুবাদ। প্রভু মোর আচার্য্য শ্রীযদুনন্দন।
যদুনন্দন কৃষ্ণ যারে প্রাণধন॥
উন্নত প্রভাব যার নিজ কৃপামৃতে।
অভিষেক অতুল করিয়া রাখিতে॥
সেই গুরু পাদপদ্ম আমার শরণ।
যাঁর কৃপা হৈতে মোর ছুটিল বন্ধন ॥৪॥

তথাহি। যো মাং দুস্তর গেহ নির্জ্জল মহাকূপাদপারক্লমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্র দয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী কৃপারজ্জুভিঃ।
উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণ প্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং
শ্রীদামোদর সাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে ॥৫॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্য চন্দ্র প্রভু মোরে কৃপা করি।
দুস্তর গৃহ নির্জ্জন মহাকূপেতে উদ্ধারি॥
অপার দুঃখের মাঝে আছিনু পড়িয়া।
কৃপারজ্জু দিয়া মোরে আনিল তুলিয়া॥
নিবিড় দয়ার সিন্ধু-স্বভাব ধরিয়া।
নিজপাদপদ্ম নিকট আনিল তুলিয়া॥
শ্রীদামোদর স্বরূপের সঙ্গ দিয়া।
সেই চৈতন্য প্রভু ভজি যার এত দয়া ॥৫॥

তথাহি। বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥৬॥

অনুবাদ। কৃপার সাগর তেহোঁ পরদুঃখে দুঃখী।
সেই সনাতন প্রভু মোরে কৈল সুখী॥
বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস প্রযত্ন করিয়া।
পান করাইল অন্ধ অধম দেখিয়া॥
তাঁর পাদপদ্ম যুগ আশ্রয় যে করি।
যেঁহো শিখাইল মোরে বৈরাগ্যমাধুরী ॥৬॥

তথাহি। অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন
দন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী!
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়-
মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ ॥৭॥

অনুবাদ। অতি উৎকট নিরন্তর বিরহানলে দগ্ধা।
ব্যাকুল হৃদয় কোন দাসী অতি মুগ্ধা॥
হা স্বামিনী শুন ইহ ব্রজ প্রণয়েতে।
গাঢ় আর্তক্রন্দনে বিলাপ করি যে পদ্যেতে ॥৭॥

তথাহি। দেবি দুঃখকুলসাগরোদরে
দূয়মানমতিদুর্গতং জনম্।

যদুনন্দন—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মন্ত্র গুরু।
"দণ্ডচারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ॥
বাসুদেব দত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তিঁহ, হয়েন পুরোহিত॥
অদ্বৈত আচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ।
আচার্য্য আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন॥
—চৈতন্যচরিতামৃত। অন্ত্য। ৬ষ্ঠ

যদুনন্দন—শ্রীকৃষ্ণ।৪

দামোদর স্বরূপ—প্রভুপাদ স্বরূপ দামোদর। মহাপ্রভুর নীলাচলে লীলার অন্তরঙ্গ পার্ষদ।৫

অন্ধ অধম—সদাসৎ বিচারে অক্ষম। অজ্ঞানান্ধ এবং সৎ আচরণে অনিচ্ছুক।৬

হে আমার স্বামিনী, আমি তোমার এক দাসী মাত্র। তোমার অদর্শনজনিত বিরহানলে আমি পীড়িত, ক্রন্দনে কাতর। এজন্য আমি কাব্যের ছন্দে বিলাপ করছি।৭

ত্বং কৃপা-প্রবলনৌকয়াদ্ভুতং
প্রাপয় স্বপদপঙ্কজালয়ম্ ॥৮॥

অন্বার্থ। দুঃখের সমূহ সিন্ধু তাহার ভিতরে।
দূয়মানমতি অতি দুর্গতজন মোরে ॥
তাহা দেখি নিজকৃপা প্রবলনৌকাতে।
দ্রুত উঠাইয়া লেহ পাদপদ্মক্ষেত্রে ॥৮॥

তথাহি। ত্বদলোকন—কালাহি—দংশৈরেব মৃতং জনম্।
ত্বৎপাদাব্জমিলল্লাক্ষাভেষজৈর্দেবি জীবয় ॥৯॥

অন্বার্থ। তুয়া অদর্শন কাল সর্পের দংশনে।
মৃততনু জিয়াও দেখি ঔষধ ক্ষেপনে ॥
তব পাদপদ্ম লাক্ষা পরম ঔষধি।
তাহা দিয়া দাসীকে জিয়াও গুণনিধি ॥৯

তথাপি। দেবি তে চরণপদ্মদাসিকাং
বিপ্রয়োগভরদাবপাবকৈঃ।
দহ্যমানতরকায়বল্লরীং
জীবয় ক্ষণনিরীক্ষণামৃতৈঃ ॥১০॥

অন্বার্থ। তোমার চরণপদ্ম দাসে তোমাবিনে।
বিচ্ছেদাদি দাবানলে পোড়াও দহনে ॥
দহনাল অতিশয় মোর দেহলতা।
ক্ষণ নিরীক্ষণামৃতে জীয়াও সর্বথা ॥১০

তথাহি। এষোহপি কিং সুমুখি তে চরণাম্বুজাত—
রাজৎ পরাগ পটবাস বিভূষণেন।
শোভাং পরামতিতরামহহোত্তমাঙ্গং
বিভ্রদ্ভবিষ্যতি কদা মম সার্থনাম্ ॥১১॥

অন্বার্থ। তুয়া পাদপদ্ম যত সুগন্ধি গন্ধ চূর্ণ।
সুগন্ধি হইবে বাস এই বিভূষণে ॥
পরম শোভাকে মোর মস্তক ধরিব।
তবে তুয়া দাসী নাম সার্থক হইব ॥
অদ্যেতে কি সুমুখি এমন দিন হব।
তুয়াদাসী বলি আমি নাম যে ধরিব ॥১১॥

তথাহি। অমৃতাব্ধি—রসপ্রায়ৈস্তব নূপুর সিঞ্জিতৈঃ।
হা কদা মম কল্যাণি বাধির্যমপনেষ্যতে ॥১২

সুগন্ধিযুক্ত তোমার চরণপদ্ম নিজের উপর ধারণ করে আমার মস্তক কি উত্তমাঙ্গ নাম সার্থক করবে ? ১১

অন্বার্থ। অমৃতাব্ধি রস প্রায় নূপুরের ধ্বনি।
তোমার চরণযুগ্মে সুমধুর শুনি ॥
বহুদিন বধির আছয়ে মোর কর্ণ।
সে মধুর ধ্বনি শুনি হইব প্রসন্ন ॥১২

তথাহি। শশকভৃদভিসারে নেত্রভৃঙ্গাঞ্চলাভ্যাং
দিশি বিদিশি ভয়োদ্ঘূর্ণিতাভ্যাং বনানি।
কুবলয়দলকোষাণ্যেব কৃষ্ণানি যাভ্যাং
কিমু কিল কলনীয়ো দেবি তাভ্যাং
জনোহয়ম্ ॥১৩॥

অন্বার্থ। জ্যোৎস্না অভিসার নেত্রভৃঙ্গ অঞ্চলেতে।
ভয়েতে উদ্ঘূর্ণা চাহি দিগবিদিক্ষিতে ॥
কুবলয় দলকোষ করল অবলয়।
সে নয়নে মোরে কি চাহিবে এক বার ॥১৩॥

তথাহি। যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমললাক্ষা সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ ॥১৪

অন্বার্থ। সেই হৈতে ব্রজমাঝে শ্রীরূপমঞ্জরী।
নয়নগোচর মোর হইল মাধুরী ॥
হে ব্রজেশ্বরী মোরে লোভ হৈল সেই হৈতে।
তুয়াপাদপদ্মলাক্ষা দর্শন করিতে ॥১৪॥

তথাহি। যদা তব সরোবরং সরসভৃঙ্গ সঙ্ঘোল্লসৎ
সরোরুহ কুলোজ্জ্বলং মধুর বারি সম্পূরিতম্।
স্ফুটৎ সরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্ম সাক্ষাদ্বভৌ
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্যে রসে ॥১৫॥

অন্বার্থ। যদবধি দেখিল তোমার সরোবর।
বিকশিত সরোরুহ কুলেতে উজ্জ্বল ॥
সরস সানন্দ ভৃঙ্গ সংঘ উল্লসিত।
সুমধুর নির্মল সলিল সংপূরিত ॥
বিকশিত অম্বুজাক্ষি সেই সরোবর।

হে শ্রীরাধা, জ্যোৎস্না অভিসারের সময় ভয়ের যেথায় আপনার নিজের যে বিঘূর্ণিত নীললোচনের প্রভায় সকলকে নীলপদ্ম সদৃশ করেছিলে সেই নীললোচনের কণিক দৃষ্টিও কি আমার উপর পতিত হবেনা ?১৩

যবধি দেখিল মোর নয়ন গোচর ।।
সেই হৈতে মনে মোর লালসা জন্মিল ।
তুয়া দাস্যরসে মোর মন ডুবি গেল ।।১৫।।

তথাহি । পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে ।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্ ।। ১৬ ।।

অস্যার্থ । তুয়াপদ দাসী বিনে অন্য নাহি চাই ।
কদাচিত কোন কালে অন্য মনে নাই ।।
সখ্যভাব তোমার তাহাকে নমস্কার ।
দাস্যভাব সদা তোমার রহোক আমার ।। ১৬ ।।

তথাহি । অতি সুললিত লাক্ষাশ্লিষ্টসৌভাগ্যমুদ্রা-
ততিভিরধিকতুষ্ট্যা চিহ্নয়িত্বা বাহু ।
নখদলিত হরিদ্রা-গর্ব্বগৌরি প্রিয়াং মে
চরণকমলসেবাং হা কদা দাস্যসি ত্বম্ ।। ১৭ ।।

অস্যার্থ । অতি সুললিত লাক্ষারসযুক্ত করি ।
সৌভাগ্যের মুদ্রাসব অধিক মাধুরী ।।
দুই বাহু চিহ্ন করি অতি তুষ্ট মনে ।
বড় অভিলাষ মাগি তোমার চরণে ।।
নখেতে দলিত হরিদ্রা গর্ব্ব যেন ।
তাহা হৈতে অধিক গৌরাঙ্গি বর্ণ তেন ।।
প্রিয়া মোর তোমার চরণ পদ্ম সেবা ।
কৃপা করি দাস্যসেবা কবে মোরে দিবা ।। ১৭ ।।

তথাহি । প্রণালীং কীলালৈ-র্বহুভিরভিসংক্ষাল্য মধুরৈ-
র্মুদা সংমার্জ্জ্য স্বৈর্বিবৃতকচবৃন্দৈঃ প্রিয়তয়া ।
কদা বাহ্যাগারং বরপরিমলৈর্ধূপনিবহৈ-
র্বিধাস্যে তে দেবি প্রতিদিন মহোবাসিতমহম্ ।
১৮ ।

অস্যার্থ । হাহা দেবী কবে হবে তোমার বাহ্যাগার ।
প্রতিদিন সম্মার্জ্জন করিব তাহার ।।
মধুর সলিল দিয়া প্রণালি প্রক্ষালিব ।
নিজ কেশ বিস্তারিয়া মার্জ্জন করিব ।। ১৮ ।।

তথাহি । প্রাতঃ সুধাংশুমিলিতাং মৃদমত্র যত্না-
দাহৃত্য বাসিত-পয়শ্চ গৃহান্তরে চ ।
পাদাম্বুজে তব কদা জলধারয়া তে
প্রক্ষাল্য ভাবিনি কচৈরিহ মার্জ্জয়ামি ।। ১৯ ।।

অস্যার্থ । হে ভামিনী কবে পাদাম্বুজ দুই তব ।
জলধারা দিয়া তাহা প্রক্ষালন করিব ।।
গৃহান্তরে বসাইয়া নিজ কেশ দিয়া ।
মার্জ্জন করিব তাহা আনন্দ করিয়া ।।
প্রাতঃকালে কর্পূর মিশ্রিত সুবাসিত ।
যত্ন করি আনি জল মৃত্তিকা সহিত ।।
এই সব সেবা দেবি কবে দিবা মোরে ।
সেবা করি বসাইব পুন গৃহান্তরে ।। ১৯ ।।

তথাহি । প্রক্ষাল্য পাদকমলং কৃতদন্তকাষ্ঠাং
স্নানার্থমন্যসদনে ভবতীং নিবিষ্টাম্ ।
অভ্যজ্য গন্ধিতবরৈরিহ তৈলপূরৈঃ
প্রোদ্বর্ত্তয়িষ্যতি কদা কিমু কিঙ্করীয়ম্ ।। ২০ ।।

অস্যার্থ । দন্তকাষ্ঠ করি পুন পাদপ্রক্ষালিয়া ।
গৃহান্তরে বসি পুন স্নান লাগিয়া ।।
অভ্যঙ্গ করিব অঙ্গ গন্ধ তৈল পুরি ।
উদ্বর্ত্তন করিব কবে এ নব কিঙ্করী ।। ২০ ।।

তথাহি । অয়ি বিমল জলানাং গন্ধ-কর্পূর-পুষ্পৈ-
র্জিতবিধুমুখপদ্মে বাসিতানাং ঘটৌঘৈঃ ।
প্রণয়ললিত সখ্যা দীয়মানৈঃ পুরস্তাৎ
তব বরমভিষেকং হা কদাহং করিষ্যে ।। ২১ ।।

অস্যার্থ । গন্ধ কর্পূর পুষ্প দিয়া সুবাসিত করি ।
কলসী কলসী ভরি নির্ম্মল জল ভরি ।।
প্রণয়ে ললিতাদেবীর আগে আনি দিব ।
তবে বর অভিষেক হা কবে করিব ।।
হাহা জিত বিধুমুখি পদ্ম ঠাকুরাণী ।
এ দাসীর অভিলাষ পূর্ণ কর তুমি ।। ২১ ।।

তথাহি । পানীয়ংচীনবস্ত্রৈঃ শশিমুখিশনকৈ-রম্যমুক্তাবটৈ-
র্ধাত্রাদ্ভুৎসার্ধ্য মোদাচ্ছিশি শিশি বিচলৎক্ষৌমীনাঞ্চলাগ্রা
স্রোতোগৌরাঙ্গং দুকূলং তদপরমতুলংচারুনীলং
শিরোগ্রাং-

বাহ্যাগার—বাহিরের ঘর । প্রণালি—নর্দমা ১৮

সর্ব্বাঙ্গেষু প্রযোগাৎ পুলকিত তনুতা
কিং ময়া তে প্রযোজ্যম্ ॥ ২২ ॥

অস্যার্থ। হেম বর্ণে অঙ্গেঅঙ্গে বস্ত্রমুখ অঙ্গে।
সে জল মুছিব তার অতি বড় রঙ্গে ॥
আনন্দেতে দিগে দিগে ফিরাইব আঁখি।
চঞ্চল নয়ন মীন খঞ্জ নিন্দা পাখি ॥
নিতম্ব উপরে রক্ত বস্ত্র পরাইব।
তাহার উপরে চারু নীলবস্ত্র দিব ॥
মস্তক হইতে ঢাকা সর্ব্বাঙ্গে হইব।
প্রমদে পুলক হৈয়া সব নিজ দিব ॥ ২২ ॥

তথাহি। প্রক্ষাল্য পাদকমলং তদনুক্রমেণ
গোষ্ঠেন্দ্র সূনুদয়িতে তব কেশ পাশম্ ॥
হা নর্ম্মদা গ্রথিত সুন্দর সূক্ষ্মমাল্যৈ-
র্বেণীং করিষ্যতি কদা প্রণয়ৈ-র্জনোঽয়ম্ ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থ। হে নন্দ-নন্দন-প্রিয়ে চরণ কমল।
প্রক্ষালন করিব করে দিয়া দিব্য জল ॥
ক্রমেতে তোমার কেশ সংস্কার করিব।
নর্ম্মদা আনিয়া সুন্দর সূক্ষ্ম মালা দিব ॥
তাহাতে রচিব বেনী সুন্দর করিয়া।
প্রণয়েতে এইজন করে করিব ইহা ॥ ২৩ ॥

তথাহি। সুকর্ণযুগমধ্যেনাথ শুভ্রাংশুবক্ত্রে
তিলকমিহ ললাটে দেবি যোজাবিধায়।
মসৃণ ঘুসৃণচর্চ্চামর্পয়িত্বা চ গাত্রে
স্তনযুগমপি গন্ধৈশ্চিত্রিতং কি করিষ্যে ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থ। পূর্ণচন্দ্রমুখে তোমার সুন্দর ললাটেতে।
সুকর্ণ যুগমধ্যে তিলক দিব আনন্দেতে॥
চিক্কন কুম কুমাদি চর্চ্চাতে শ্রীঅঙ্গ চর্চ্চিব।
স্তনযুগে নানাগন্ধে চিত্রিত করিব ॥২৪॥

তথাহি। সিন্দূর রেখা সীমন্তে দেবী রত্নশলাকয়া।
ময়া যা কল্পিতা কিন্তে সালকাহোজ্জ্বলিষ্যতি ॥২৫॥

অস্যার্থ। সিন্দূরের রেখা তুমা সিমন্ত উপরি।
শোভিত করিব রত্ন শলাকাতে করি ॥
আমাতে কল্পিত দিব্য ললাটে সিন্দূর।
অলকা সহিত শোভা হইব প্রচুর ॥২৫॥

তথাহি। হন্ত দেবি তিলকস্য সমন্তঃ-
বিন্দবোঽরুণ সুগন্ধি রসেন।
কৃষ্ণমাদক মহৌষধিমুখ্যা
ধীরহস্তনিহ কিং পরিকল্প্যাঃ ॥২৬॥

অস্যার্থ। যাহা দেখি তিলক বেড়িয়া চারিপাশে।
বিন্দু বিন্দু অরুণ সুগন্ধি রসবাসে ॥
কৃষ্ণমাদকমহৌষধি মুখ্য শোভা।
ধীর হস্তে কল্পনা করিব তার আভা ॥২৬॥

তথাহি। গোষ্ঠেন্দ্র পুত্রমদচিত্ত করীন্দ্ররাজ
বন্ধায় পুষ্পধনুষঃ কিল বন্ধরজ্জোঃ।
কিং কর্ণয়োস্তব বরোরু বরাবতংস-
যুগ্মেন ভূষণমহং সুখিতা করিষ্যে ॥২৭॥

অস্যার্থ। কিবা কর্ণদ্বয় তোমার সুখিতা হইয়া।
বর অবতংস যুগ্ম ভূষণ করিয়া ॥
গোষ্ঠেন্দ্রের পুত্র চিত্ত মত্ত করিবরে।
বন্ধন করিতে কন্দর্পের দুই ডোরে ॥২৭॥

তথাহি। যা তে কঞ্চুলিকত্র সুন্দরি ময়া বক্ষোজয়োরর্পিতা
শ্যামাচ্ছাদনকাম্যয়া কিল ন সা তথ্যেতি
বিজ্ঞাতম্।
কিন্তু স্বামিনি কৃষ্ণ এব সহসা তত্তামবাপ্য স্বয়ং
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং স্বকং নিধিযুগং সন্তোপয়ত্যেব
হি ॥২৮॥

অস্যার্থ। হে সুন্দরি আমার বক্ষোজাতে।
কঞ্চুলি অর্পিল আমি শ্যাম আচ্ছাদিতে ॥
কিন্তু ইহা সত্য নহে আছে ইহার মর্ম্ম।
যে স্বামিনী কৃষ্ণ পাঞা আপনার ধন ॥

নন্দ-নন্দন-প্রিয়ে—শ্রীরাধিকা। নর্ম্মদা...দিব—নর্ম্মদা নাম্নী মালাকার কন্যারচিত সুন্দর মাল্যদ্বারা তোমার কেশ-সংস্কার করবো। ২৩।

কৃষ্ণমাদকমহৌষধি—কৃষ্ণ যাতে আকৃষ্ট হবেন। ২৬

বরাবতংসযুগ্মভূষণ—উত্তম কর্ণভূষণদ্বারা ভূষণ প্রস্তুত করবো। ২৭

প্রাণে হৈতে অধিক সেই নিধি দুই পাইছ।
হঠাৎ কাহে বস্ত্র করি গোপন করিল ॥২৮॥

তথাহি। নানামণিপ্রকরগুম্ফিত চারুপুষ্টা
মুক্তাস্রজস্তব সুবক্ষসি হেম গৌরি।
শ্রান্তা ভুজালস—মুকুন্দ—মৃতুলিকায়াঃ
কিং কল্পয়িষ্যতি জনঃ তব দাসিকেয়ম্ ॥২৯॥

অস্যার্থ। নানা মণিবৃন্দে গাঁথা সুচারু সমানে।
তুয়া সুবক্ষেতে আমি দিব সেই বনে ॥
শ্রমযুক্ত কৃষ্ণের আলিঙ্গ হয় যবে।
বক্ষস্থল মৃতুলিকা আলিঙ্গ করে তবে ॥
এ দাসীর এই অভিলাষ মনে করি।
অভিলাষ পূর্ণ মোরে কর হেম গৌরী ॥২৯॥

তথাহি। মণিচয় খচিতাভিনীলচূড়াবলীভি-
হরিদয়িত কলাবিদ্বন্দিন্দীবরাক্ষি।
অপি বত তব দৌর্দ্বোরযুগলী বঙ্গুলীকৈঃ
ক্ষচিদপি কিল কালে ভূষয়িষ্যামি কিংস্বিৎ ॥৩০॥

অস্যার্থ। নানামণিযুক্ত নীলচূড়ামণিচয়।
তাহাতে ভূষিত হয় কলা রচিয়া ॥
কৃষ্ণের অধিক প্রীতি দেখি শোভা তায়।
তাহে ইন্দীবর নেত্রী এ কৃপা তোমায় ॥
দিব্য রত্ন অঙ্গুরী সব অঙ্গুলীতে দিব।
কোন কালে এ দাসী ভূষিত করিব ॥৩০॥

তথাহি। পাদাম্ভোজে মণিময়তুলাকোটি যুগ্মেন যত্ন-
দত্তার্চ্চিতাঙ্গুল কুলমপি প্রোৎপাদাঙ্গুলীয়ৈঃ।
কাঞ্চীদাম্না কটিতটমিদং প্রেমপীঠং মুরারে
কংসারাতেরতুলমচিরান্মণ্ডয়িষ্যামি কিং তে ॥৩১॥

অস্যার্থ। পাদপদ্মে মণিময় নূপুর যুগল।
অঙ্কিত করিয়া পুন অঙ্গুলী দল কুল ॥
প্রিয়দাম অঙ্গুরী পাশুলি বলি যারে।
পুনরপি ভূষিত করি অঙ্গুলীরে ॥
কাঞ্চীদামে কটিতটে ভূষিত করিব।
কৃষ্ণের প্রেমাসন সেই অতুল হইব ॥৩১॥

তথাহি। ললিতভুজ মৃণালী—কল্পবাহ্বোর্যুগং তে
মুররিপু-মতি-হংসী-ধৈর্য্যবিধ্বংসদক্ষম্।
মণিকুলরচিতাভ্যামঙ্গদাভ্যাং পুরস্তাৎ
প্রমদভরবিনম্রা কল্পয়িষ্যামি কিম্বা ॥৩২॥

অস্যার্থ। অতি সুশোভিত দুই বাহু মৃণালিকা।
কৃষ্ণমতি হংসী ধৈর্য্য করেন ধ্বংসিকা ॥
মণিময় রচিত অঙ্গদ বলয়েতে।
ভূষিত করিব কায় নম্র আনন্দিতে ॥৩২

তথাহি। রাসোৎসবে য ইহ গোকুলচন্দ্র বাহু
স্পর্শেন সৌভগভরং নিতরামবাপ।
গ্রৈবেয়কেণ কিমু তং তব কণ্ঠদেশং
সংপূজয়িষ্যতি পুনঃ সুভগে জনোহয়ম্ ॥৩৩॥

অস্যার্থ। রাসোৎসবে যেই কৃষ্ণবাহুস্পর্শে।
অত্যন্ত সৌভাগ্য পাই অতি সরসে ॥
গ্রীবা আভরণ দিয়া সেই কণ্ঠদেশে।
পূজিত করিব পুন এ দাসী হরিষে ॥৩৩॥

তথাহি। হত্বা প্রদোষরি পুরোদ্ভটশঙ্খচূড়-
নামাং প্রতোষি হলদঃ মধুমঙ্গল।
হস্তেন যঃ সুমুখি কৌস্তভমিত্রমেতং
কিং তে স্যমন্তকমণিং তরলং করিষ্যে ॥৩৪॥

অস্যার্থ। কৃষ্ণচন্দ্র মহাদুষ্ট শঙ্খচূড় মারি।
স্যমন্তক মণি দিল অত্যাদর করি ॥
মধুমঙ্গল হস্তে তুয়া প্রীতির কারণে।
পাঠাইয়া দিল রাম পরম যতনে ॥
কৌস্তভের মিত্র দুই সেই মণিরাজ।
হার মধ্যে পদকের করিব তায় সাজ ॥৩৪॥

কবে আমি কি শ্রীকৃষ্ণের মতিরূপ হংসীর ধৈর্যহারী মনোরম মৃণালসদৃশ তোমার ভুজযুগল মণিময় অঙ্গদ দ্বারা ভূষিত করবো ?৩২

টীকা—দৈত্য শঙ্খচূড় যখন শ্রীরাধিকাকে নিয়ে পলায়ন করছিলেন সে সময় শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে হত্যা করে স্যমন্তক মণি বলরামকে দেন। বলরাম সেটি মধুমঙ্গলের মাধ্যমে শ্রীরাধার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

হরিদয়িত কলাবিদং—শ্রীকৃষ্ণের ছলাকলায় অভিজ্ঞ।৩০
পাশুলী—পায়ের আঙুলের অঙ্গুরী। ৩১

তথাহি। প্রাণবরে পরিবিরাজিত শঙ্খরত্ন-
বিভ্রাজিতেন নবকাঞ্চন ডোরকেণ।
ক্ষীণং স্ফুটত্যথ কৃশোদরি দেহিতীব
বধ্নামি তে তব কৃপাতিশয়েন মধ্যম ॥৩৫

অন্বয়ার্থ। দুই পাশে বিরাজিত স্বর্ণগুচ্ছ ঝুরি।
অতি দীপ্ত মনে করি কাঞ্চনের ডোরী ॥
ক্ষীণ মধ্যদেশ তোমার ভঙ্গ ভয় করি।
সে তোমার বন্ধন করে করিব কৃশোদরী ॥৩৫॥

তথাহি। কনকগুণিতমুচ্চৈর্মৌক্তিকং মৎকরাত্তে
তিলকুসুম বিজেত্রী নাসিকা সা শুভাগ্রম্।
মধুমথনমহালিক্ষোভকং হেমগৌরি
প্রকটতরমরন্দপ্রায়মাধাস্যতে কিম্ ॥৩৬॥

অন্বয়ার্থ। স্বর্ণগুণেযুক্ত শুভ্র মহত মুক্তাফল।
প্রকটতর অতিশয় মরন্দ প্রায় নির্মল ॥
কৃষ্ণমহামত্ত অলি তার ক্ষোভ করি।
মোর হস্ত হৈতে কবে লবে হেম গৌরী ॥৩৬॥

তথাহি। অঙ্গদেন তব বামদোঃ স্থলে
স্বর্ণগৌরি নবরত্নমালিকাম্।
পট্টগুচ্ছ পরিশোভিতামিমা-
মাজ্ঞয়া পরিণয়ামি তে কদা ॥৩৭॥

অন্বয়ার্থ। নবরত্নমালা পট্টথোপা পরে গাঁথা।
অঙ্গদের সহ বামভুজেতে শোভিথা ॥
আজ্ঞাতে তোমার আমি তাথে পরাইব।
হেন দশা স্বর্ণগৌরি কতদিনে হব ॥৩৭॥

তথাহি। কর্ণয়োরুপরিচক্রশলাকে
চঞ্চলাক্ষি নিহিতে ময়কা তে।
ক্ষোভকং নিখিল গোপবধূনাং
চক্রবদ্ভ্রময়তাং মুর শত্রুম্ ॥৩৮॥

অন্বয়ার্থ। কর্ণদ্বয়োপরি তোমার চক্র শলাকা দুই।
ভূষিত করিব কবে চঞ্চলাক্ষি মুঞি ॥
সব গোপবধূগণের ক্ষোভকারী কৃষ্ণ।
তেহোঁচক্রবৎ ভ্রমেণ দেখিবা সতৃষ্ণ ॥৩৮॥

তথাহি। কদা তে মৃগশাবাক্ষি চিবুকে মৃগনাভিনা।
বিন্দুমুদ্ভাসয়িষ্যামি মুকুন্দামোদমন্দিরে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ার্থ। কবে মৃগশাবাক্ষি চিবুকে তোমার।
মৃগমদের বিন্দু দিব কৃষ্ণ মোহিবার ॥
মুকুন্দের আমোদমন্দিরে চিবুকেতে।
কস্তুরির বিন্দুঅতি শোভিত তাহাতে ॥ ৩৯ ॥

তথাহি। দশনাংস্তে কদা রক্তরেখাভিঃ কর্বাণ্যহম্।
দেবি মুক্তাফলানীহ পদ্মরাগগুণৈরিব ॥ ৪০॥

অন্বয়ার্থ। কবে রক্তরেখা দিয়া দশনের পংক্তি।
ভূষিত করিব যাতে কৃষ্ণ অতি প্রীতি ॥
মুক্তাফল মধ্যে যেন পদ্মরাগ গুণা।
অতিশয় শ্বেত-রক্ত শোভার উপমা ॥৪০॥

তথাহি। উৎখাদিরেণ নবচন্দ্রবিরাজিতেন
রাগেণ তে বরসুধাধর বিম্বযুগ্মে।
গাঙ্গেয়গাত্রি ময়কা পরিরঞ্জিতেঽস্মিন্
দংশং বিধাস্যতি হঠাৎ কিমু কৃষ্ণকীরঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ার্থ। বর সুধাযুক্ত তোমার অধর বিম্বযুগ্মে।
কৃষ্ণকীর দংশন করিবে হঠাৎ কাহে ॥
উৎকৃষ্ট খদির রাগে রঞ্জিত করিব।
নূতন কর্পূর গন্ধে গন্ধিত হইব ॥
হেন অধর বিম্বদশে কৃষ্ণ সুখী হৈঞা।
স্বর্ণাঙ্গিত্রে গাঁথি তবে করিব ইহা ॥ ৪১ ॥

তথাহি। যৎ প্রান্তদেশলবলেশবিঘূর্ণিতেন
বদ্ধঃ ক্ষণাদ্ভবতি কৃষ্ণকরীন্দ্রউচ্চৈঃ।
তৎ খঞ্জরীটজয়িনেত্রযুগং কদাহং
সংপূজয়িষ্যতি মন-স্তব কজ্জলেন ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ার্থ। যার অন্ত দেশ লবলেশ বিঘূর্ণনে।
কৃষ্ণ করিবার বশ হয় যার গুণে ॥
সেই খঞ্জরীটজয়ী নয়ন যুগল।
কবে আমি সংপূজিত করিব কজ্জল ॥ ৪২ ॥

তথাহি। যস্যাঙ্করঞ্জিতশিরা-স্তবমানভঙ্গে
গোষ্ঠেন্দ্রসূনুরধিকাং সুষমামুপৈতি।
লাক্ষারসঃ স চ কদা পদয়োরধস্তে
ন্যস্তো ময়াপ্যতিতরাং ছবিমাপ্স্যতীহ ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণকী—কৃষ্ণরূপ শুকপক্ষী। ৪১

অস্যার্থ। হারচিহ্নংভিতসিরমানতম কালে।
গোষ্ঠেন্দ্র নন্দন পরম শোভা বরে ভালে ॥
হেন লাক্ষারস কবে পাদপদ্মে দিব।
অতিশয় শোভা তায় সে পদে ধরিব ॥ ৪৩ ॥

থাহি। কলাবতি নতাংসয়োঃ প্রচুরকামপুঞ্জোজ্জ্বলৎ-
কলানিধি-মুখেন্দুয়োঃ প্রকটরাসসদ্ভাবয়োঃ।
বদদ্ভ্রমরবৃন্দকৈ-র্মধুরমল্লিমালাং মুদা ॥
কদা তব তয়োঃ সমর্পয়তি দেবি দাসীজনঃ ॥ ৪৪ ॥

ার্থ। তুমি কলাবতি কৃষ্ণপুণ্য কলানিধি।
প্রচুর কামপুঞ্জে উজ্জ্বল দৈব বিধি ॥
কৃষ্ণপ্রকট রাসরস সংভাবেতে।
নতস্কন্ধদেশ তোমার কৃষ্ণমুখ দিতে ॥
গুঞ্জৎ ভ্রমর ঝঙ্কার মধুর মল্লিমালা।
কবে সুখে এই দাসী দিব দুঁহা গলা ॥ ৪৪ ॥

থাহি। সূর্য্যায় সূর্য্যমণি নির্ম্মিত বেদি মধ্যে
মুগ্ধাঙ্গি ভাবত ইহালিকুলৈ-র্বৃতায়াঃ।
অর্ঘং সমর্পয়িতুমুৎকধিয়স্তবারাৎ
সজ্জানি কিং সুমুখি দাস্যতি দাসিকেয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

ার্থ। সখিগণ সঙ্গে সূর্য্য পূজিবার তরে।
উৎকণ্ঠিতা হৈয়া যাবে সূর্য্যের মন্দিরে ॥
সূর্য্যমণিনির্ম্মিত সূর্য্যের বেদিমধ্যে।
অর্ঘ দিবে তুমি ভক্তিভাবে নিজ কাজে ॥
তোমার সমীপে দ্রব্য সব দিব।
হে সুমুখি এ দাসীর হেন কি হইব ॥ ৪৫ ॥

াহি। ব্রজপুরপতিরাজ্ঞ্যা আজ্ঞয়া মিষ্টমন্নং
বহুবিধমতিযত্নাৎ স্বেন পক্বং বরোরু।
সপদি নিজ সখীনাং মদ্বিধানাঞ্চ হস্তৈ-
র্মধুমথন নিমিত্তং কি ত্বয়া সন্নিধাপ্যম্ ॥ ৪৬ ॥

ার্থ। মিষ্ট অন্ন বহুবিধ বহু যত্ন করি।
আপনি করিলে পাক যাহা সুমাধুরি ॥
ব্রজপতিরাজ্ঞী আদরি নিজ সখিগণে।
মদ্বিধ দাসীর হস্তে পাঠালে যতনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ নিমিত্তে তুমি সখী দাসীগণে।
পাঠাইবে দিবে করে নিজ সন্নিধানে ॥ ৪৬ ॥

তথাহি। নীতান্ন-মথিলঘাটকটে ললাটিং
প্রীত্যা প্রসাদ মুদিতা ব্রজরাজরাজ্ঞী।
প্রেম্না প্রসূরিব ভবৎকুশলস্য পৃচ্ছাং
অব্যা বিধাস্যতি কদা ময়ি তাবকত্বাৎ ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থ। সব সখি মিলি অন্ন লঞা যাব যবে।
দেখি আনন্দিত হবে নন্দরানী তবে।
আমা সবার ললাটে ললাট প্রীতে দিব।
প্রেমে মত্তপ্রায় তোমার কুশল পুছিব ॥
তোমার যে আমি ইহা জানি নন্দরানী।
অতি স্নেহ করি প্রীত করিব আপনি ॥ ৪৭ ॥

তথাহি। কৃষ্ণবক্ত্র বিধোচ্ছিষ্টং প্রসাদং পরমাদরাৎ।
দত্তং ধনিষ্ঠয়া দেবি কিমানেষ্যামি তেহগ্রতঃ ॥ ৪৮ ॥

অস্যার্থ। কৃষ্ণমুখামধুরোচ্ছিষ্ট পরম আদরে।
ধনিষ্ঠা আনিয়া প্রসাদ দিব তোমার তরে ॥
সেই প্রসাদ আনি তোমার আগে করি দিব।
এ দাসীর অভিলাষ কবে বা পূরিব ॥ ৪৮ ॥

তথাহি। নানাবিধৈরমৃতসাররসায়নৈ-স্তৈঃ
কৃষ্ণপ্রসাদমিলিতৈরিহ ভোজ্যপেয়ৈঃ
হা কুন্দবল্লি ললিতাদি সখীবৃতা ত্বং
যত্নান্ময়া কিমুতরামুপভোজনীয়া ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থ। অমৃতসার রসায়ন নানাবিধ অন্ন।
কৃষ্ণ-প্রসাদযুক্ত ভোজ্যপেয়তে সংপূর্ণ ॥
ললিতাদি সখী সঙ্গে বসিব তবধি।
ভোজন করাইব কবে হে কুন্দবল্লী ॥ ৪৯ ॥

ক্রমশঃ

সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার রূপ

॥ শ্রীঅমিয় মোহন বসু ॥

ভোরে যাই রোজ গঙ্গার ধারে—পথে নাহি হয় ক্লেশ,
শুদ্ধ পথের শীতল বাতাসে জুড়ায় মন ও দেহ।
রাঘব বাবুর বড় বাড়ী ঘেঁসে বাঁ দিকে যে-পথ গেছে
সকলের সাথে সে-পীচের পথ আমিও নিয়েছি বেছে।
পেট্রল-পাম্প পেছনে রাখিয়া পার হই বড় পথ
কে যেন সে-পথে সুর-সাধনায় রোজ করে কসরৎ।
আরো গেলে দেখি একটি বিরাট তেঁতুল গাছের তলে
ব্যায়াম সমিতি—সব সেথায় তরুণেরা দলে দলে।
শরীর গঠন ও বিদ্যা শিক্ষা এ-বয়সে প্রয়োজন,
লাবণ্যে ভরা প্রাণময় ছবি উন্মুখ যৌবন।
এর পরে পাই পূজা-প্রাঙ্গন—দূরে নয় পথ থেকে,
তুলসী যে প্রিয়, বনশ্রী—বুঝি 'ললিত কানন' দেখে।
'শান্তি স্মৃতি'টি চোখে পড়িলেই ব্যথা পাই বড় মনে
ফোটার আগেই গোলাপ কুঁড়িটি ঝরিয়া গিয়েছে বনে।
কত আদরের সে-কিশোর বোন পড়িল কী এক জ্বরে,
মা-বাবার মন এলোমেলো করি হায় সে গিয়াছে স'রে।
আরো চলে গিয়ে পড়ি প্রান্তরে—'সাধুঘাট' সব শেষে
অপরূপ লাগে এ-ধারের ছবি—ডাকে যেন এরা হেসে।
প্রান্তরের যে নীচু জমি তাতে ঘাস ঢেলে লরি লরি
বাস উপযোগী করিতেছে জমি কা'রা যেন ত্বরা করি।
ঘাস্ থেকে দেখা কয়লা কুড়ায় ছেলে মেয়ে গরীবের
আধা ভাগ নেয় নিজেরা তাহারা—আধা থাকে মালিকের।
এ-রকম আরো সে-শিশুরা করে সহায়তা বাপ-মা'র
মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুরা এখানে উল্টো তার।
বরঞ্চ আরো তাহাদেরি লাগি' মা, বাবা খরচ করে
আগে ছিল শুধু ছেলেদের পড়া—আজ যে মেয়েও পড়ে!
মরণ ত আজ মধ্য বিত্তের সবখানে—সব কাজে
মনুষ্যত্ব রহিলেও তা'রা অভাবে হতেছে বাজে।
সন্তান তবু মানুষ করিতে করে তা'রা প্রাণপণ
শিক্ষা ব্যতীত কোন সদ্গুণ নাহি হয় অর্জন।
শিক্ষা না পেলে সে-মানুষ হায় পশুর মতন বাঁচে,
তাই তা'রা দেয় শিক্ষা তাদের—কোলে যারা আসিয়াছে
বুঝেছে তাহারা ধৈর্য রহিলে সব হয় সম্ভব
সু-সন্তানের পিতা মাতা হওয়া সব চেয়ে গৌরব।
উপরে রয়েছে উদার আকাশ—নির্মল নীলাম্বর;
তলায় তাহার গঙ্গার ঢেউ মালা গাঁথা হ'য়ে রয়।
ও-পারে রয়েছে মিল-মালিকের বড় বড় বহু বাড়ী
যাত্রী লইয়া খেয়া-মাঝি দেয় এ-পারে ও-পারে পাড়ি।
বিনা বাধনাতে মাছ ধরে জেলে—এ-দৃশ্যে মনে পড়ে
রাসমণি মাকে—জগতের যিনি কল্যাণ গেছে ক'রে।
সাধনার পথে সাধুদের কাছে নারী নাহি লাগে কাজে
অনেকে এ-কথা বলে' গোলমাল এনেছে নারী সমাজে।
সীতা, সাবিত্রী, শ্রীমা কি কখনো করেছে ধরার ক্ষতি?
নারী হ'তে দূরে সে থাকিতে পারে যে হবে নতুন ব্রতী।
উচ্চ স্তরের সাধকের কাছে নারী নাহি কণ্টক
নারীর শক্তি, প্রেম-মমতায় পুরুষেরা সার্থক।
যে-মহামানব তৃষিত ধরার আর্ত্ত নিনাদ শুনে
এসেছিল দীন পূজারীর বেশে শুভ এক ফাল্গুনে
দেব-মূর্ত্তিতে সে-রামকৃষ্ণ আছে আজ ঘরে ঘরে
আনন্দময়ী নারীই তাঁহাকে প্রথম বরণ করে।
'সাধু ঘাটে' রোজ স্নান করে কত নর নারী দলে দলে
অসুবিধে বড় স্নানার্থীদের ঘাটটি বাঁধা না ব'লে।
বৃদ্ধ বট এক ঘাটের কিনারে—আশপাশটি মনোরম
তাহারি শীতল স্নিগ্ধ ছায়াতে—সাধুদের আশ্রম।
এখানে আসিলে পরাণ জুড়ায় কালো মনে আসে আলো
কেউ যদি এসে ঘাটটি বাঁধাতো—কাজটি হ'ত যে ভালো
গঙ্গা স্নান বা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অনেকে ভাবে
ধর্মের কাজ ইহাতেই হয়—পরকাল ভালো যাবে।

তাই দেখা যায় এদের অনেকে মিথ্যা গর্বে থাকে,
পাকা জ্ঞান কম তাই এই ভ্রম—চলে তা'রা সদা ঝাঁকে।
সজ্জন এবং গুরুকে যা'রা ব্যথা দেয় অকারণে
তা'রা যদি নাম-কীর্তন' করে প্রভু কি কভু তা' শোনে ?
গঙ্গাতে রোজ স্নান্ তাহাদের হ'য়ে যায় না কি বৃথা ?
বৃথা হয় না কি পূজা-আরাধনা—পড়া তাহাদের গীতা ?
ধরণীর প্রতি, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা যদি না থাকে
যে শ্রেণীরই হোক্ ব্যর্থ সে তবে করে যে জীবনটাকে।
জগৎ মিথ্যা—প্রেম অসত্য এ-কথা যে মনে করে
সে কি বসুধার স্রষ্টাকে পায়—বৃথা সে খুঁজিয়া মরে।
তাঁর খেলাতেই যোগ দিতে চলে আসা ও যাবার খেলা !
ভুল যার গেছে সেই শুধু বোঝে ধরা আনন্দ মেলা।
জীবের মাঝারে পায় সে দেবতা—চলে যে শ্রদ্ধা ল'য়ে,
তাহার চোখে যে এক হ'য়ে যায় জীবালয় দেবালয়ে।'
তাহার কাছেই দেখা যায় ঠিক 'হৃদয়ের প্রসারতা।
মনে নির্মলতা, প্রেমে গভীরতা, ব্যবহারে মধুরতা।'
সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার রূপ দেখে সে মুগ্ধ হয়,
সার্থক তার জীবন—তাহারে কোলে নেয় প্রেমময়।
স্নান ক'রে বাড়ী ফিরিবার পথে 'লাল বাড়ী' থেকে জবা
মাঝে মাঝে চেয়ে এনে করিয়াছি মায়ের আসন শোভা।
মাকে সাজাইতে ক'টি ছেলে মেয়ে ফুল দিয়ে যায় মোরে
তাহাদের মাঝে গন্ধ বেশী কৃতী তাকে ভুলিব কী ক'রে ?
নিষ্কলুষ এ উদার শিশুটি প্রশংসারই যে মেয়ে
শান্তি আনিবে এ রকম মেয়ে ভবে দেশ যাবে ছেয়ে।
রাম কৃপালও ফুল দেয় মোরে মিঠে তার ব্যবহার,
কলেজে পড়ে সে—তথাপি শ্রদ্ধা দেবতার প্রতি তার।
প্রায় দেখা যায় তরুণের দল মাতে নিয়ে আজে-বাজে
ভাবে তা'রা—জ্ঞান-ভক্তি কি কভু তরুণ বয়সে সাজে ?
কিন্তু তাহারা মহাপুরুষের উপদেশ যদি পড়ে
তা' হ'লে বুঝিবে—জ্ঞান-ভক্তিতে চলা সার্থক করে।
আসল শিক্ষা ধর্ম শিক্ষা—বিদ্যার সাথে সাথে
জ্ঞান-ভক্তিও লভিতে হইবে—সুখী হওয়া যায় তাতে।

অনিঃশেষ

॥ **শ্রীঅরুণ বরণ চক্রবর্তী** ॥

শেষ। তবু শেষ নয়। শেষের গভীরে অনিঃশেষ
প্রাণের প্রবাহ ধারা চলে ধেয়ে, মহানন্দময়
সুরের ঝংকার তুলে। সূর্যাস্তের সঙ্গীতের রেশ—
জাগে, তাই পূরবীতে বেজে ওঠে নতুন আলোয়।
আপন মাধুরী আর সুরভির গন্ধে ভরে দিয়ে
—নিঃস্বার্থ মায়ের মত আত্মজের দেহ আর মন—
মহাজীবনের সাথে এক হয়ে যায় যে মিলিয়ে—
আপনার বীজ হতে সেই ফুল জাগে অফুরন্ত !

হৃদয় আমার তাই ভীত নয় শেষের আহ্বানে।
মৃত্যুকে দিয়েছি মুক্তি। জীবনের অনন্ত সন্ধানে
প্রমত্ত প্রবাহ আমি। আমার চলার পথে তাই
জীবনের জয়গান ছাড়া আর অন্য গান নাই।
সূর্যাস্তের সুর যবে রাতের গভীরে হবে লীন—
আমিই তো পুনরায় পূরবীতে বাজবো নবীন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৩৩)

ওগো পুরুষোত্তম, অনাদি অনন্তের সকল পুরুষের প্রকৃতি-শোষণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে একদিন ভক্ত জয়দেবের লেখনী মাধ্যমে শুনাইয়া গিয়াছ, 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি মে পদপল্লবমুদারম্'—কি মহান কি মধুর বাণী! পুরুষোত্তম ছাড়া কে এমন গুহ্য তত্ত্ব শুনাইতে পারে? তাই পুরুষোত্তমই বিশ্বস্রষ্টা। ইঁহাই ভবিষ্যৎ বিশ্ব-রচনার মহা মন্ত্র। প্রকৃতি তখনই দিনকা মোহিনী মাতকা বাধিনী, যতক্ষণ পুরুষ নির্লজ্জ ভোক্তা। পুরুষ কৌশল করিয়া ভোক্তা হইয়াছে, নারীও কৌশলে মোহিনী সাজে নিজ [illegible] আদায় করিয়াছে। আজ চতুরে চতুরে চলিতেছে কাড়াকাড়ি। এই বক্র পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি পুরুষ যখন পরস্পরের শরণাগত, তখন দুই-ই যার যা সম্বল তা অপরকে দিয়া নিজ নিজ পূর্ণতা আস্বাদন করিতেছে।...

১৭ই মে

…কালী একান্ত মা হইবেন কেন? তিনি সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত। মা যদি তিনি, স্ত্রী-ও তাহা হইলে তিনিই। কোনও উপাধিই তাঁহার নাই, আবার সব উপাধিই তাঁহাতে সাজে। স্ত্রী স্ত্রীরূপে তিনিই, মা মা রূপেও তিনি। 'পিতামাতাতনয়াত্মা' তিনিই। তবে রমণী রমণীরূপেই বা তিনি নন্ কেন? রমণীকে 'জননী' ভাবিয়া কামজয় করিতে হইবে কেন? এ তো কামিনীভয়ের কাছে পরাজয় শুধু। মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ এই কাম জয়ের উদাহরণ। রমণীকে রমণীরূপে রাখিয়া, রমণ করিয়াই তিনি আত্মারাম।…

১৮ই মে

নিত্যগোপাল, আমি যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলাম, তুমি তখন আমাকে কোলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া কত আদর করিয়াছ,… সমস্ত রাত্রি বুঝি বাতি জ্বালিয়া আমার মুখ দেখিয়াছ। আমি তো জাগি নাই। জাগিয়া দেখি আমার সর্ব্বাঙ্গে তোমার আদরের চিহ্ন, শান্তির প্রলেপ। ঘুমের মাঝে আসিয়াছ, জাগরণের মাঝে আসিবেনা? সকল ইন্দ্রিয় যখন নিদ্রিত তখন আস, আর সকল ইন্দ্রিয় যখন জাগ্রত, তখন আসিবে না? আমার যে বড় কষ্ট ঠাকুর। তোমাকে যে জাগরণের বুকে গড়িয়া তুলিতে চাই-ই। নইলে যে আমার চলিবে না।…১৯৫১এ সাহানগর রোডে যখন আশ্রম ছিল, মা' ঠাকুরুণের এক সন্ন্যাসী শিষ্য উষাঙ্গিণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি সন্ন্যাসী, আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী কেমন করিয়া থাকেন? আমি বলিয়াছিলাম, 'উনি প্রমাণ করিবেন যে স্ত্রীলোক স্বামীর মালাঝোলা কাড়িয়া লন না, আর আমি দেখাইব যে স্ত্রীকে লইয়া সন্ন্যাস করা যায়।' নারী জাতির মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই সন্ন্যাসী হইবার পরও স্ত্রী নিয়া ছিলাম। পুরুষ তাহার স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণের ফলে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, দোষ পড়ে মেয়েদের ঘাড়ে। নারীকে আজ ইহার জবাব দিতে হইবে। নিজ জীবনের মধ্য দিয়া। ৪টার পর আমি রেণু ও নীলু আফিসে যাই।…ব্রহ্মসূত্র পাঠ হয় গতকল্যার অংশই।…

১৯শে মে

মুক্ত তুমি, মুক্ত আমিও মুক্ত হৃদয়াকাশে এই মুক্ত বিচরণ অনাদি অনন্ত কাল চলিয়াছে, চলিবে—পাখা ছড়াইয়া, পাখায় পাখা ছোঁয়াইয়া, তোমার কলগানে

আমার গান মিশাইয়া—ইহা অবিরাম হউক। কখনও বা এই সংসারবুকে বুকে বুক লাগাইয়া বিশ্রাম। এই সকরণ ও বিশ্রাম কি মধুর।…

২০শে মে

প্রলয়পয়োধি জলে নিমগ্ন এক বিশ্ব তোমার অপূর্ব জীবন ও দর্শনের ছাঁচে ঐ যে গড়িয়া উঠিতেছে, নমস্কার তোমাকে, নমস্কার তোমার বিশ্বকে। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি দিয়া মৈথুনের ভিতর দিয়া এই জগৎকে গড়িয়া তুলিব।…সারা জীবন সমগ্র দৃষ্টি লইয়া সকল ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছি। সমগ্র দিয়াছি, সমগ্র চাহিয়াছি। কেহ সমগ্র দিয়াছে কিনা জানিনা। কিন্তু যতই সমগ্রের ভিতর দিয়া বিশেষের ক্ষেত্রে সত্যসংকে পাইতে চাহিয়াছি বিশেষ ও সমগ্রের সমন্বয় করিয়া, তখনই অনেকে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমাকে 'অভিযুক্ত' করিয়াছে। যদি জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার মধ্যে দিয়া একই সমগ্র আস্বাদিত না হয়, তবে বিশেষও মিথ্যা, সমগ্রও মিথ্যা।… যাহা বিষ, তাহাই অমৃত। যাহাকে 'বিষ' বলিয়া মানুষ বর্জন করে, তাহাকে পান করিয়াই মৃত্যুঞ্জয় হইতে হইবে। যাহাকে লইয়া বিরোধ তাহাকে জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া বিরোধের মীমাংসা করিতে হইবে। সারা জীবন ইহা করিতে চাহিয়াছি। ঝগড়া করিয়া দূরে যাইও না, কাছে থাকিয়া, এক হইয়া ঝগড়া কর, মীমাংসা কর। 'কিং তৎ বিষম্ ভাতি সুধোপমম্ স্ত্রী'। নর সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান, নারী সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান, নর-নারীর সম্বন্ধ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান না থাকার ফলে নারী নরের কাছে 'বিষ'। নর-নারীকে জন্মের জীবনে জীবন লাভ করিয়া, পারস্পরিক বোঝা-পড়ার মধ্যে দিয়া প্রাণখোলা অদ্বৈত মিলনের মধ্য দিয়া এই কামের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইবে। যাহাদের মধ্যে ঝগড়া, তাহাদের মধ্যেই রহিয়াছে মীমাংসা। বাহিরে নয়। বাহির হইতে কাহাকেও ডাকিয়া আনিলে ঝগড়া চিরস্থায়ী হয়।…

২১শে মে

স্বরূপে তুমি নিত্যসিদ্ধ, তোমাকে তো স্বরূপে পাইয়াই আছি। এই পাওয়াকে দেহ-মন-প্রাণ দিয়া মন্থন করিয়া 'আমার' করিয়া বিভীষণার পাইবার জন্যই হারাইয়াছি। দেহ-মন-প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিলে তবে আসিবে সব মন্থন করিয়া? ইহাই 'ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'। সকালে অফিসে যাই। ১৩৫০ সন আসি।… উমাদিদীকে আমার বাহির হইবার কথা বলি। সে তো একদিন বক্তৃতাও দিয়াছিল। তাহা কি অতীতের বিষয় হইয়া থাকিবে? তাহাকে সঙ্গে করিয়াই তো বরিশাল ছাড়িয়াছিলাম।

২২শে মে

আমার সকল আবেষ্টন অনুকূল হউক তোমার শ্রীচরণ-স্পর্শে। আমার আপাইতে দেও তোমার আসন রচনা করিবার পথে। আমার কুলের দেবতা, হৃদয়ের ঠাকুর।…-কে রাখিতে না পারার জন্য খুব বেদনা বোধ করি। কিন্তু মোহ তো চলিবে না। তাহাকে জোর করিয়া রাখিলে ভবিষ্যৎ আরও জটিল হইবে, আমাদের মধ্যেই তিক্ততার সৃষ্টি হইবে। বলিয়া দিলাম, 'অন্তর্নিষ্ঠা রাখ বাহে লোক ব্যবহার। অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।' যতখানি আঁঠা দিয়া উহাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলে, একটু আলগা দেও—non-violent non-co-operation।…

…২৩শে মে

আজ শেষ রাত্রিতে এক স্বপ্ন দেখি—একটি কালো মেয়ে আসিয়াছেন, বলিতেছেন, 'আমি তোমার বোন'। কে এই মেয়েটি? যোগমায়া প্রকৃতিকে তো সারাদিন সারাক্ষণ ভাবিতেছি। আসিবেন না কি? সকালে 'ভারতের মাটিতে মার্কসীয় দর্শন (৫) ভূদান যজ্ঞ' (আষাঢ় মাসের জন্য) লিখিতে আরম্ভ করি। প্রায় ১১টায় রেণু আসে। ব্যাপার মিলায়। পরে 'যোগা-যোগ' পড়া আরম্ভ হয়, কিছুটা হয়ও। 'নির্বিশেষ স্বামিত্বের' উপাসনায় কুমুর কি লাঞ্ছনা হইয়াছিল, রমণীর সার্থক না হইলে মাতৃত্ব লইয়াও নারী বিপন্ন হয়, শোষণকারী স্বামীকেই মানিয়া লইতে হয়, রমণীর ও

মানুষ যে একই নারীদেহের দুইটি স্বতঃস্ফূর্ততাহীন আস্বাদন—রবীন্দ্রনাথ 'যোগাযোগে' তাহাই দেখাইয়াছেন।··· দুপুরে—যায় না,—ও যায় না। কি আমি করিব? আবেষ্টন ঠেলিয়া জীবনভর চলিলাম। আবেষ্টন তো তত্ত্বতঃ মানিয়া নিয়াছিলাম। এই আবেষ্টন কি পুরুষোত্তম-সেবার অনুকূলে গড়িয়া উঠিবে না? কি করিয়া তাহা হইলে তোমার আপন বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করিব? পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ১১ বৎসরই বাকি ১১৪ বৎসরের প্রেরণা যোগাইয়াছে। ব্রজধামের বুকে লইয়াই তিনি দুনিয়াকে তাঁহার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। 'রসরাজ' বলিয়াই তিনি আদর্শ general, আদর্শ warrior, diplomat, সমাজ সেবক। অপরা প্রকৃতি তাঁহার জীবনে পরা প্রকৃতিরূপে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ব্রজধামেই।…'যোগাযোগে' বিপ্রদাসের কথা ও জীবন বেশ প্রণিধানযোগ্য।

২৪শে মে

তোমার আমার অদ্বৈত মিলনের মাঝে এই বিশ্ব গড়িয়া উঠুক, ওগো বর্ত্তমান বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান-মূর্ত্তি শ্রীনিতাইগোপাল। অনন্ত তুমি অনন্ত আমি চলিয়াছি, দুই চলিয়াছি অনন্ত পথ বহিয়া অনন্ত পথিকের গলায় গলা মিলাইয়া অনন্তের দিকে সকল সুখ-দুঃখে, সকল হাসি-কান্নায়। ঘর বাঁধিবার অবকাশ নাই। কে আপন, কে পর! জাগো বিশ্বের বুক চিরিয়া মহা সমাধি নিদ্রা হইতে। রেণু সকালেই আসে। 'যোগাযোগ' পাঠ হয়। তাহার আসার পূর্বে 'বৃন্দাবনতত্ত্ব' প্রবন্ধটির অনেকখানি লিখি। ৯।০টার পর যায়। আবার আসে ১০টার পর। 'যোগাযোগ' পাঠ হয়। ৪টার পর আমি প্রতিভা রেণু আফিসে যাই।···নীলুকে এখানে অসুবিধা লইয়া থাকিবার কথা বলা হয়। মীরা ও সুরজিৎ জন্য সে থাকিল না। আমি আর কি করিব? নীলুকে রাখিতে পারিলাম না। বড় দুঃখ বাজিতেছে। যেমন তেমন করিয়া রাখিলে তো রাখার সার্থকতা মিলে না। তিক্ততাই বাড়িতে পারে তাহাতে। সহজভাবে যেদিন রাখিতে পারিবে, সেই দিনের আসাই হইবে সার্থক আসা। নীলু, তোমার অপেক্ষায় থাকিব, তুমি যে আমার অনন্তের যাত্রী।

···২৫শে মে

পুরুষোত্তম, তোমার ব্রজলীলায় তুমি পুরুষ-নিরপেক্ষ প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিলে, 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি মে পদপল্লবমুদারম্' বলে পুরুষের গর্ব্বিত দাম্ভিক স্বাধিকারপ্রমত্ত মস্তক প্রকৃতির শ্রীচরণতলে লোটাইয়া দিলে। তুমি কৃষ্ণ, তুমি স্বামী। কাহারও একটুকু 'কথাও' তুমি অস্বীকার কর নাই। অথচ কাপুরুষ অহরহ তাহাই করিতেছে। তাই না তুমি পুরুষোত্তম। আজ পুরুষতত্ত্ব ও প্রকৃতি-তত্ত্বের সমন্বয়ে এক পুরুষোত্তম-তত্ত্ব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন আসিয়াছে। সকালেই রেণু 'যোগাযোগ' পড়ে।…বিকেলে কুমারী আসে। সে দুনিয়ার কথা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে। সেখানের নৈতিক মেরুদণ্ডও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভিয়েৎনাম 'brothel house'-এর সঙ্গে তুলনা দিল। এইরূপ অবাঞ্ছনীয় অবস্থার মূলে রহিয়াছে তথাকথিত প্রগতিপন্থীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের বিকৃত প্রচেষ্টা। উদ্বাস্তুগণ আজ সর্ব্বতোভাবে ছিন্নমূল। তাহারা না সেখানের, না এখানের। ইহার জন্য দায়ী রাজনৈতিক সুবিধাবাদ। সুবিধাবাদের ফাঁদে পা দিয়া উদ্বাস্তুরা মরিয়াছে।···

২৬শে মে

বাসে প্রবাসে তুমি আমার সখী। 'সখে, যখন যেখানে আছ, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি'···আমার ইহাই বল ভরসা। তুমি আমার জীবনের অর্দ্ধ—কে অর্দ্ধনারীশ্বর। আমার ইহাই ভাবিয়া সুখ, দেখিয়া সুখ তুমি আমার স্বামী। সকালে আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই।···উজ্জ্বল ভারত হইতে 'সর্বোত্তম নবলীলা' প্রবন্ধ পড়া আরম্ভ হয়।···

২৭শে মে

আমার জ্বালা কি জুড়াইবে না? তোমাকে বিশ্বজীবনে গড়িয়া তুলিব—এই লালসা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। পথ দেও, আবেষ্টন পরিপাক করিয়া বিশ্বজীবনে ছড়াইয়া পড়িবার মত, তোমাকে ছড়াইয়া দিবার মত শক্তি দেও, ধনজন দেও। আমি কি জ্বলিয়া জ্বলিয়া ছাই হইয়া যাইব? তোমার জীবন, তোমার দর্শনই তো ধরার তাপ, প্রকৃতির অনাদরের বেদনা দূর করিতে পারে।

২৮শে মে

…অসিদ্ধি যদি আমাদের বুদ্ধি দোষে আসে তখন বেদনা পাই। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাবে যদি জীবনের অগ্রগতি না থাকিত, এতদিনে কোথায় পা কাঁপিয়া পড়িয়া থাকিতাম। তুমি ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে আছ। কত পথিক আসিল চলিয়া গেল, তুমি constant companion, আমার নিত্য সঙ্গী। সকালে আফিসে যাই।…ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে বৎসরের মাপ ধরিলে ১১ বছরের মধ্যে ব্রজের গোবর্ধন ধারণ, কালীয় দমন কারাগারে দেবতাদের স্তব, ব্রহ্ম-মোহন প্রভৃতি লীলারই কি ব্যাখ্যা মিলিবে, বাললীলা তো দূরের?…শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—ইহা ভুলিলে চলিবে কেন? ব্রজলীলাই যে কৃষ্ণের যাবতীয় লীলার ভিত্তিভূমি নয়, তাহাই বা কে বলিবে? বিশ্বে যে কামের প্রেরণা রহিয়াছে তাহার 'অর্থ' কি, বিশ্ব তাহা কোথায় অনুভব করিত যদি ব্রজলীলা না থাকিত? একই আলোর কাছে সাধক ভাগবত পাঠও করে, আবার দলিল জাল ও জালিয়াত করে। দোষ কি আলোর? 'ন্যাড়া-নেড়ী' বলিয়া গাল দিলে ব্রজলীলা কলঙ্কিত হয় না। আর ন্যাড়া-নেড়ীদের সাধনার গূঢ় তাৎপর্যও কি খোলা সহজ না? ইত্যাদি আলোচনা… ধীরেনবাবুর সঙ্গে হয়। মহাভারতের কচ-দেবযানী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কথা হয়।…

২৯শে মে

আমার সকল দেহ প্রাণ মনে তোমায় বহিয়া বেড়াইব—আমাকে দেখিয়া তোমাকে দেখিবে, আমাকে পাইয়া তোমাকে পাইবে। বিশ্বের বুকে তোমার আসন রচনা করিবার পথে যাহা-কিছু করার তুমি করিয়া দেও। সকল বিরোধের মাঝে অবিরোধ তোমার প্রতিষ্ঠা করিব, সকল দ্বন্দ্বের মাঝে সমন্বয় তোমার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিব—ইহাই আমার সারা জীবনের ধ্যান জ্ঞান। তুমি-আমি এক অদ্বৈত। সকালে আফিসে যাই। সুবোধ মুখার্জী আসেন।…(ওদেশে) newspaper আছে, বিক্রেতা নাই। যে যাহার পয়সা রাখিয়া কিনিয়া নিতেছে। কি civic sense! ৯টার পর ফিরি।

৩০শে মে

তোমার আসন ধরার বুকে ধরারই প্রয়োজনে গড়িয়া তোলা ছাড়া আর তো ধ্যান জ্ঞান আমার নাই। সেই কোন্ দিন পথে বাহির হইয়াছি, আজও পথ চলিয়াছি, বিরাম নাই। তুমি কি প্রতিষ্ঠিত হইবে না? তোমার জীবন ও দর্শনের যে বড় প্রয়োজন ছিল মনে হয়। আমায় বল দেও, বুদ্ধি দেও, শক্তি দেও। 'ধনং দেহি, জনং দেহি'। তোমারই সেবার জন্য তোমার কাছে আজ তোমার শক্তি ভিক্ষা মাগিতেছি। সকালে আফিসে যাই আগামী আষাঢ়ের প্রবন্ধগুলি ঠিক করিতে। কালিদাসী সিংহ ও তাহার এক বন্ধু যমুনা দাস (উভয়েই staff nurse) আসে। আমি পুরুষোত্তমকে সামনে রাখিয়া চলিবার কথা বলি।…ভাল লাগার কত তফাৎ মানুষে মানুষে।…যাহা তাঁহার ইচ্ছা তাহাই হইবে। আর ভাবিব না। যাহা পারি করিয়া যাইব। জগৎ তাঁর, প্রতিষ্ঠা তাঁর, শক্তিও তাঁর। আমি তো সেবক মাত্র। সেবকের গর্ব রাখিবার দায়িত্বও তাঁর। আমি যেন সেবায় ত্রুটি না করি।

৩১শে মে

মনের দুঃখে বনে যাইবার অবস্থা আমার। কিন্তু বন ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম এই ধরার বুকে তোমার আসন রচনা করিবার দুষ্ট লালসা লইয়া। দ্বিতীয় বারের বৃন্দাবন ত্যাগ তো ১৯৩০-এর লবণ আইন অমান্য

আন্দোলনে যোগদানের সময় লইয়াই না? বুকের ভিতর সারাদিন একটা বেদনা বাজে। তুমি কি আমার পথ করিয়া দিবে? তোমার প্রয়োজনেই আমি বাঁচিয়া থাকিব। আমার প্রয়োজন তো ফুরাইয়া গিয়াছে। আমাকে দিয়া কার কি প্রয়োজন? আমার একমাত্র প্রয়োজন তুমি। তুমিই আমার ধ্যান জ্ঞান, সুখ শান্তি। এস আমার জীবনে ভবরূপে, সত্যরূপে। সকালে আজ আর অফিসে যাই না। ভাল লাগে না।…শিশুদিগকে বিশ্বজীবন যাপন করার সাধনা প্রথম হইতেই দিতে হইবে। বিশ্বপ্রেমের ছাঁচে নীতিবোধ বদলাইতে হইবে। বিশ্বপ্রেম ও 'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরী করা'—এই নীতি কি করিয়া মিলানো যায়? যাহা তুমি সৃষ্টি কর নাই, কিংবা যাহারও সৃষ্টিতে সহযোগিতা কর নাই, তেমন সৃষ্টির ফল তুমি নিলে তাহাকেই আমরা চুরি বলিব। ইহার সঙ্গে পর আপন বুদ্ধিকে শক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। স্রষ্টার দলাদলি করিবার বুদ্ধি থাকিতে পারে না। দলাদলি করিয়া কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না। সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ করানোই হইতেছে শিশুশিক্ষার মূল প্রয়োজন।… ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়—'বসত বিদায়' কালীঘাটের শ্রীচরণতল হইতে তীর্থযাত্রা'—'হিমালয়ে ঋষিকের সঙ্গে দেখা'।…

১লা জুন

সকল ছোট-র মর্যাদাদাতা তুমি, তুমি তাই পুরুষোত্তম। তুমি বিশ্বপ্রকৃতিকে সাধর্ম্যের অধিকার প্রদান করিয়াছ, তাই তুমি পুরুষোত্তম। এমন করিয়া কে ছোটকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, মান দান করিয়াছে? আমার দেহ প্রাণ মনে তোমার 'আমি' ফুটিয়া উঠিবে, 'নিত্যগোপালোঽহম্' প্রতিষ্ঠিত হইবে। সকালে অফিসে যাই। যে ভার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দেহের উপর আসিয়া বর্তাইয়াছে, তাহার জন্য তাহাকে আরও সতর্ক, আরও অবহিত হইতে হইবে। কাহাকেও তো তেমন করিয়া বাহির হইতে পাইতেছি না।…ঠাকুরের জীবনী—তাঁহার ত্রিদিবানন্দের সঙ্গে কাশীতে দেখা—পাঠ করা হয়।…ব্রহ্মসূত্র পাঠ আরম্ভ করে রেণু। 'অধিকারী নির্ণয়' কিছুটা পড়া হইতে না হইতেই ধীরেনবাবু আসেন।…Change-এর সঙ্গে Eternity কেমন করিয়া সমন্বিত হইবে? Change কি নিজেকে মুছিয়া ফেলিয়া eternity-র সঙ্গে মিলিবে (যাহা শঙ্কর বা বর্তমান যুগে অরবিন্দও প্রকারান্তরে বলিয়াছেন), না change নিজের সঙ্গে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকল change-কে সমন্বিত করিবার দুর্বার লালসা লইয়া eternity-র সঙ্গে সমন্বিত হইবে?…

২রা জুন

তুমি আমি এক অদ্বৈত—ভাবাদ্বৈত ক্রিয়াদ্বৈত দ্রব্যাদ্বৈত—ইহাই আমার ভাবিয়া তৃপ্তি! আর আমি কি ভাবিব? তুমি কি আমাকে তোমার 'স্ব' করিয়া সেখানে প্রকাশিত হইবে না, 'স্বপ্রকাশ' নামের সার্থকতা করিবে না? আমি তোমার 'স্ব' হইব—আমার ইহাই সাধ। ওগো আমার আমি, দিন যে যায়।…ব্রহ্মসূত্র পাঠ হয়—অধিকারী নির্ণয়। পুরুষোত্তম-ভজনে জীব মাত্রই অধিকারী। কিন্তু অধিকারের আস্বাদন করিবার অধিকার সকলের হয় না। এই অধিকার লাভের জন্যই সাধনা। যাহাকে জীব পাইয়াই আছে, তাহাকে ভজনের অধিকারও আছে সকলেরই। 'প্রাণ' স্বীকার করিলে অধিকার সাব্যস্ত হয় সকলেরই। প্রজ্ঞার অধিকার হয় না যার তার যখন তখন। এই জন্যই তো প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সবেরই 'প্রাণ' আছে। প্রাণ-সাধনায় অধিকারী সব। ঠাকুরের জীবনী পাঠ করে প্রতিভা। রেণু পড়ে ব্রহ্মসূত্র।… বিশ্বকে বলি, আসিয়াছ যদি, তবে আমার কণ্ঠে জাগাইয়া দেও, আমাকে বিপদমুক্ত কর।…

৩রা জুন

সদর রাস্তায় কীর্তন হইতেছিল, 'প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরি বল'। বেশ লাগিল। তুমি আসিয়াছিলে যখন আমি নিদ্রাতুর ছিলাম।…নিদ্রায় ক আমার জাগরণে এস। জাগরণেও তুমি আমি এক

অদ্বৈত হই। ইহাই না লীলা।···আমার এখানে যে আসিবে, তাহাকে সর্বক্ষেত্রে যোগ্য হইতে হইবে।···যে 'দর্শন' ঠাকুর আমার ভিতর দিয়া দিতেছেন, তাহাই ভবিষ্যৎ যুগের দর্শন। যে ইহা নিবে, সে-ই পথপ্রদর্শক হইবে। উজ্জলভারতের সম্বন্ধে প্রশংসা সুরেন দাস ও আফিসের পাশের ডাক্তারবাবু বেণুর কাছে করিয়াছে। উজ্জলভারতকে ঠাকুর মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ইহাকে আমাদের সকল শক্তি দিয়া আগাইয়া নিয়া যাওয়া উচিত।···

৬ঠা জুন

জলের মধ্যেই মাছ বাঁচে, মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকিলেই গাছ বাঁচে। ছিনাইয়া আনিয়া 'আমার' করিলে কেহ কি বাঁচিবে,—আমার হওয়া তো দূরে। বিশ্বের বুক হইতে ছিনাইয়া স্বামী স্ত্রী পিতাপুত্র কেহ যেন কাহাকেও পাইতে প্রয়াসী না হয়। বিশ্ব তাহা বরদাস্ত করিবে কেন? বিশ্ব কাহাকেও এতখানি অধিকার দিতে পারে না। কেন দিবে? কে পারিবে আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সব ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে? মাত্রা ছাড়াইয়া কাহাকেও 'আমার' বলিও না, তাহা চলিবে না। মাত্রার মধ্যে থাকিয়া তুমি 'আমার' বলিও। ঠাকুর তুমিই সর্বতশ্চক্ষু। তোমার চোখের সামনেই চিরদিন আছি, চিরদিন থাকিব। সকালে এই আলোচনা প্রতিভার সঙ্গে হয়।···কাহারও সঙ্গে তো—চলিতে পারিতেছে না। কথার মধ্যে বেশ ঝাঁঝ আছে, আক্রমণ থাকে। নিজের মধ্যে ফিরিয়া না আসিলে তো নিজকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে না।···বটে নাকি। কিছুকাল ঠাকুরের সামনে বসি। তখন স্বামিনিষ্ঠ তাঁহার নিজের লেখা কবিতার অনেক পড়িতেছিলেন, ভাল লাগিল। সংসার-বিষের অতটুকুর মধ্যে টের পাইলাম না।···

৭ই জুন

'তোমারি আদেশে এসেছি এ দেশে'—প্রথমবার ২৫ বৎসর বয়সে যখন বৃন্দাবন যাই, তুমিই তো আদেশ দিলে, 'যা, বাংলায় যা, কাজ আছে। ২৫ বৎসর পরে আবার দেখা হবে'। সে ২৫ বছর কি আজও আসে নাই? আমি যে ব্যাকুল তোমার দেবায়তন গড়িয়া সেখানে সকল দেহপ্রাণমন দিয়া সেবার জন্য। তুমি কি গোপন থাকিবে? বর্তমান যুগের সমস্যার সমাধান তুমি ছাড়া কে করিবে? তোমার মত কে সাহসী আছে 'to face nature'? রেণু বাবু, নরেন্দ্র বাবু, টাটাতে···। অক্ষরব্রহ্মের ২য় সূত্র পাঠ আরম্ভ হয়। কিছুটা ব্যাখ্যা হয়। প্রতি মানুষ বা প্রতি বস্তুকে দুই দিক দিয়া দেখিতে হয়—একবার নিজেকে কেন্দ্র করিয়া আবার বিশ্বকে কেন্দ্র করিয়া। দেখাকে বস্তুতন্ত্র করিতে হইলে চাই এই দুই দেখার সমন্বয়। আমি আমার কাছে যাহা, বিশ্বের কাছেও যদি তাহাই না হই তবে আমার দেখা 'বিকল্প' মাত্র। 'পুনর্জন্ম' প্রহসনের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই তত্ত্বই যাদবের মারফত প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুই দেখার সমন্বয় না হওয়ার ফলেই না বিশ্বময় এত লড়াই—কি বর্ণে কি জাতে কি প্রেমে? 'পুরুষোত্তম আমি'র মাঝে 'আমি' সম্বন্ধে আমার দেখা ও বিশ্বের দেখার মিলন হইবে। এই তত্ত্ব রেণু ও প্রতিভার সঙ্গে আলোচিত হয়। এই দুই দেখার সমন্বয়ের ভিতর ফুটিয়া উঠে প্রতি বস্তুর দিব্য রূপ। ইহা creative। আমার দেখা নিতান্তই subjective, barren। বিশ্বের দেখার সঙ্গে সমন্বিত হইলেই উহা হয় creative।...জীবনে আমি সকলকেই মুক্তি দিয়াছি, তাই আমাকেও কেহ বাঁধে নাই। আমি যদি শোষণ না করিয়া থাকি, কেন আমাকে মানুষ শোষণ করিতে পারিবে? আমি সারা জীবন সকল ঝঞ্ঝাটে পিছলাইয়া চলিয়া আসিয়াছি, আটকাইয়া যাই নাই। আমার সামনে সারা বিশ্ব, তাহাকে গড়িয়া তুলিবার দর্শন নিত্যগোপাল আমাকে দিয়াছেন। কোথায় বন্ধন!

৮ই জুন

তোমারই শ্রীচরণে চন্দনবিন্দুর মত লাগিয়া রহিব। কি আছে আমার তুমি ছাড়া? আমার দেহ-প্রাণ-মনে তুমি ফুটিয়া ওঠ। কবে তোমাকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা

করিতে পারিব ? ওগো স্বামী আমার, কুসুম সরোবরে সেই যে বিয়োগ-বিধুরা শ্রীরাধারাণীকে দেখিয়াছিলাম যোগ-মায়ার কোলে, তাহাই তো আমার জীবনে আটকাইয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখখানি আমার জীবনের সম্মুখে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। সকল নিপীড়িত, সকল অবহেলিত, সকল পদদলিতদের বিষাদমাখা মুখের ভিতর দিয়া যে সেই মুখখানিই দেখিতেছি। কবে তাহাদের জীবনে পুরুষোত্তম যোগ স্থাপন করিব, বিয়োগ ব্যথা দূর করিব ? বিশ্বের সকল কান্নার ঘনীভূত রূপই শ্রীরাধা। শ্রীরাধা স্বরূপ, শ্রীরাধা বিশ্বরূপ। স্বরূপে-বিশ্বরূপে তাঁহাকেই চাই। সকল নারীর জীবনে তাঁহারই প্রকাশ আবাহন করিব। তবেই কুসুম সরোবরের সেই স্বপ্নে দেখা সার্থক হইবে। সকালে সাময়িকী 'আমূল ভূমি সংস্কার' লিখিতে আরম্ভ করি, শেষ হয় না।···

৭ই জুন

তুমি মহানির্ব্বাণ, তুমি শরণ। তোমার মাঝে নিভিয়া গিয়া তোমারই নয়নে তোমার বিশ্ব দেখিব, তোমার বুকে, বুক মিলাইয়া তোমার বিশ্ব গড়িয়া তুলিব। স্বামিন্, এই অধিকার আমাকে দেও। এই বিশ্ব যে তোমার মাঝে গড়িয়া উঠিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।···হেমন্ত দাসের সঙ্গে দেখা...বরদাকান্তবাবুর স্মৃতিসভায় যাইতে বলে। রাজি হই।···সভার কাজ আরম্ভ হয়। আমাকে সভাপতি করে। সুরেশ চ্যাটার্জী 'তোমার মহাবিশ্বে' গান গায়। দুর্গামোহনবাবু, কল্যাণ চক্রবর্ত্তী, সুরেশ চ্যাটার্জী ও আরও একজন বলেন। আমি বলি, 'কোন অতীতই মুছিয়া যায় না, ব্রজলীলা কুরুক্ষেত্র সবই আমাদের জীবনে লুকাইয়া রহিয়াছে। বরিশালের বরদাবাবুর আমলের অতীতকে আজ বর্ত্তমানে উপলব্ধি করিবার জন্যই এই সভা। শরণাগত হইলে অতীত বর্ত্তমান হয়। অতীত ভুলিয়া গেলে বর্ত্তমান গড়িয়া উঠিবে কাহার ভিত্তির উপর ? ভবিষ্যৎই বা গড়িয়া উঠিবে কেমন করিয়া ? 'Dolls House' (ইবসেন) পড়িয়া শুনায় বেণু। বেশ বই। Nora স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্বের বন্ধন কাটাইয়া পাতঞ্জল দর্শনের 'পুরুষার্থশূন্যানাং' সূত্রের সার্থকতা আবাহন করিয়াছে। মানুষ স্ত্রী ও মায়ের চেয়েও বড়। মানুষের যে sacred duty নিজের উপর আছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্যই আজ Nora বাঁশীর গানে ঘরছাড়া। রবীন্দ্রনাথের কুমুর চেয়েও Nora বিদ্রোহী। ৯টার পর চলিয়া আসি।···

৮ই জুন

তোমার জীবন ও দর্শনই আমার গর্ব্বের বস্তু, আমি তোমারই গরবে গরবিণী। তোমাকে বুকে লইয়া, সকল জীবনে বহন করিয়া আমি বিশ্ব জয় করিব। তুমি যে বর্ত্তমান বিশ্বের স্রষ্টা তাহা আমি উপলব্ধি করি। তোমার স্রষ্টৃত্ব তোমার সঙ্গে একাত্ম হইয়া আমি গ্রহণ করিব, তোমার সেবা করিব। তোমার স্রষ্টৃত্বের অধিকার লাভ করিবার নামই তো ভক্তি। যাহারা ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কিছু না কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। 'মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ'—ভক্ত তোমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে, সৃষ্টিতেও সাধর্ম্ম্য। নইলে বিশ্বের ভক্তি ? আমিও সৃষ্টি করিব তোমারই অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া। সকালে আফিসে যাই।···ব্রজসূত্রের আমার হাতের লেখাগুলি একত্র জমা হয়। ঐগুলি আমার কি আদরের। কত যত্নেই না উহা রক্ষা করিয়াছি। বাহিরে যাইবার সময় উষাদিদীকে বলিয়া যাইতাম, 'ঘরে আগুন লাগিলে আমার ব্রজসূত্র লইয়া বাহির হইও'। বৃন্দাবনে থাকাকালীন নিতাইবাবু কত যত্নে রৌদ্রে দিয়া রাখিয়াছিলেন। ফিরিবার পর আমাকে আবার দিয়া দেন। আমি তো 'ব্রজসূত্র'কে ঠাকুরের দেহের মত পবিত্র মনে করিতাম। উহা তো তাঁহারই আশীষ।...তাঁহার উপর অভিমান হয়। আবার দুঃখ পাই। যাহা তুমি কর, তাহাই হউক। আমি তোমার—এই মাত্র জানি। বিরহ আসে, স্বপ্নেও আসে। ঠাকুরের জীবনী পাঠ হয়। ধর্ম্মদাসকে দিয়া পত্র লিখাইয়া অনাদিকে আনিয়া কৃপা করিয়াছিলেন, তারাপদ, প্রাণকৃষ্ণকে আশ্রয় দিয়াছেন। 'Dull's House' ব্যাখ্যা করিয়া বেণু বিরক্ত ও

সুধাংশুকে শুনাই। কি অনাদর বহন করিয়া মেয়েরা চলিয়াছে। একদল মেয়ে কি ইহার প্রতিকার করিবার জন্য উন্মাদিনী রাধার মত বাহির হইবে না? মানুষ মা হইতেও বড়, স্ত্রী হইতেও বড়। মানুষের এই মর্যাদা রাখিবার জন্যই তো রাধা জাতি কুলশীল ছাড়া? পুরুষোত্তম এই মান দিলেন।···

৯ই জুন

ওগো বিপ্লবমূর্তি বজ্রদেবতা আমার, তুমি একদিন আমাকে লইয়া বসিয়াছিলে রাজনীতির মাঝে, আমি মানুষের দুয়ারে—নরনারীর কাছে, ঘরের নারী, বাজারের নারীদের সামনে—তোমার বিপ্লবের বাণী ছড়াইয়াছিলাম. তাহা কি অতীত হইয়া থাকিবে? বাস্তব উজ্জলভারত তো আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমরা শুধু সংবাদের বাহকবেশে উপনীত হইয়াছি। আমার প্রাণ যে তোমার পোষণমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজও আবার সেই যজ্ঞের প্রতীক্ষায় আছে। তুমি শঙ্খ, সকল শোষণকে জীর্ণ কর, পোষণের রসে পরিবার-সমাজ পূর্ণ কর। আবার সেইরূপ যজ্ঞের মাঝে তোমার পাখায় পাখা মিলাইয়া তুমি-আমি নর-নারায়ণ মুক্ত স্বপ্নাকাশে বিচরণ করিতে চাই। আমি যে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারি না। ঠাকুর এল। বেণু সকালে আসে। ব্রহ্মযজ্ঞের পাণ্ডুলিপি বাহির করে। ছান্দোগ্য প্রভৃতি নিয়া যায় বাঁধাইবার জন্য, ব্রহ্মযজ্ঞের পাণ্ডুলিপিও। আমার বরিশালের জীবন—যাহা বরিশাল হিস্ট্রীতে বাহির হইয়াছে, যাহা সুধাংশু লিখিয়াছে—কিছুটা পাঠ হয়। আবার তেমন গর্জন করিবার লালসা হয়। অতীতকে বর্তমান করিতে ইচ্ছা হয়। আমার বাবার পূজা তো আজও সমাপন হয় নাই। দার্শনিক বিপ্লব কি আসিবে না?···আবার আমার বরিশালের জীবনী পাঠ হয়। বিবেকা সুধাংশু শোনে। শুনিয়া চোখে জল আসিল—তোমার অনশন, বরিশালের শ্রোতার ইত্যাদি আবার আমাকে পাগল করিতে চায়। আমি আবার ছুটিব।···

১০ই জুন

স্বামী, তোমাকে জীবনে বহন করিয়া বিশ্বময় তোমাকে ছড়াইয়া দিব, সকল শোষণকে পোষণে গড়িয়া তুলিব। বিশ্বের সকল স্তরে পোষণ জমিয়া উঠুক। ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ। বিশ্ব-জীবন মন্থন করিয়া জাগো নারায়ণ মহাসমাধি নিদ্রা হইতে।···

১১ই জুন

পরাভক্তির মাঝে তুমি-আমি অদ্বৈত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় বিধান করিব, তোমার সহযোগিতায় কৃতার্থ হইব—ইহাই তো আমার আকুতি। 'সযুজা' তুমি-আমি প্রতিটি ঘটনায় তুমি-আমি সহযোগী—নিবিড় যোগ, দেহে-প্রাণে মনে সহযোগ, সুষুপ্তিতে সযুজা, স্বপ্নে সযুজা, জাগ্রতে সযুজা, তবে না আমার জ্বালা জুড়াইবে। তোমার সেবায়তন গড়িয়া তুলিব নিজ গর্ভে নিজ জীবনে তাহা ধারণ করিয়া। তবে না আমার সার্থকতা?···

১২ই জুন

ক্রমশঃ

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম সাওইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইন্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উজ্জ্বলভারত

পৌষ, ১৮৮৫ শকাব্দ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে

(১৯৬৩ সালের ৮ই ডিসেম্বর রবিবার নরনারায়ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজনীয় মাতৃমণ্ডলী ও সমবেত সজ্জনবৃন্দ,

একবৎসর পর আজ আমরা আবার নরনারায়ণ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের শুভ আবির্ভাব উৎসবে সমবেত হয়েছি। এবার স্বামীজীর ৮১তম আবির্ভাব তিথি। পবিত্র আশ্রম প্রাঙ্গণে আমাদের দেখে, আমাদের অগোচরে স্বামীজী যে কত আনন্দ, তৃপ্তি পাচ্ছেন তা আমি অন্তরে অনুভব করছি, কারণ আমি স্বচক্ষে দেখেছি তিনি মানুষকে কত ভালবাসতেন। তাঁর আনন্দের কথা স্মরণ করে আমি আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাই এবং তাঁকে বার বার প্রণাম করি।

স্থূলদেহে তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। চাক্ষুষ আমি তাঁকে দেখছি না বটে, কিন্তু তাঁকে স্মরণ করে যখনই চক্ষু মুদ্রিত করি তখনি তাঁর প্রসন্নবদন মুখচ্ছবি আমার মানসপটে উদ্ভাসিত হয়। পাঁচ বৎসরের উপর হ'ল তিনি তাঁর জীবনদেবতা সদগুরু শ্রীনিত্যগোপালের মহিমা কীর্তনকালে বালিগঞ্জের মহানির্বাণ মঠে অপ্রকট হয়েছেন। এতদিন পরে, জানি না কেন, আজ কেবলি মনে পড়ছে ১৯৫৮ সালের ২৯শে মার্চ শনিবার মহানির্বাণ মঠে আহূত শ্রীনিত্যগোপালের ১০৪তম জন্মোৎসবের কথা। স্বামীজী তখন শিল্পমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে কথা কইছেন। প্রণাম করে যখন তাঁর পাশে বসলাম, স্বামীজী মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর যথারীতি সভা আরম্ভ হ'ল। স্বামীজী তাঁর সেই মোহময়ী ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীনিত্যগোপালদেব প্রচারিত সর্বধর্মসমন্বয়তত্ত্ব আলোচনা করলেন। সভাভঙ্গে আবার আমরা যখন মিলিত হলাম, স্বামীজী বললেন আগামী কাল অর্থাৎ ৩০শে মার্চ রবিবার, সভায় যোগ দেবেন, দেখা হয়ত আর নাও হতে পারে।

আশ্চর্যের বিষয় তাঁর কথাই ঠিক হ'ল, স্থূলদেহে আমি আর তাঁকে দেখতে পেলাম না, কারণ কো অনিবার্য কারণে পরের দিনের সভায় আমি যোগ দিতে পারি নি। শুনলাম সেদিনকার ভাষণের শেষভাগে তিনি যেমনি তাঁর জীবনধন শ্রীনিত্যগোপালের না করেছেন, তাঁর পদপ্রান্তে আশ্রয় দেবার জন্য বার বা প্রার্থনা জানিয়েছেন। বক্তৃতা কালেই তিনি কা ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন এবং মঙ্গলবার প্রাতে তাঁ তিরোধান ঘটল। তাই আজও কেবল আপশোষ হ রবিবারের সভায় কেন গেলাম না।

স্বামীজীর জীবনের শেষ ১০।১২ বৎসর তাঁর পদপ্রান্তে বসে উপদেশ গ্রহণ করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমা হয়েছিল। তাঁর ভালবাসা ও স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম। স্বামীজীর কাছে যে আমি কত রকম ভাবে ঋ তা আপনাদের কাছে জানাবার ভাষা আমার নেই, সে ঋ শোধ হবার নয়। সে-সব হারানো দিনের পুরণো স্ম পাছে বিস্মৃতির অতল জলে তলিয়ে যায় তাই আজ তাঁ ৮১তম আবির্ভাব তিথির শুভ অবসরে সেই, সব স্মৃ

কথা নূতন করে স্মরণ করতে এই দুর্বল শরীর নিয়ে নরনারায়ণ আশ্রমে এসেছি, এসেছি শুধু অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে, সমাধিমূলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। স্বাধীনতা সংগ্রামের যারা সৈনিক তাঁদের অনেকের ভাগ্যে স্বাধীন ভারত দেখে যাবার সৌভাগ্য ঘটে নি। এ সুযোগ যাদের হয়েছে স্বামীজী তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। স্বামীজীর সহকর্মীদের অনেকেই আজ রাষ্ট্রের এক এক বিভাগের কর্ণধার হয়েছেন, আর যারা বিফল মনোরথ হয়েছেন তাঁরা ক্ষমতা লাভ করে সাংসারিক জীবন গুছিয়ে নেবার জন্য লড়ালড়ি করছেন। কিন্তু রাজনীতির এই নোংরামির মধ্যে ঢুকতে স্বামীজীর প্রবৃত্তি হ'ল না। সহকর্মীদের দলভুক্ত হয়ে নবলব্ধ রাষ্ট্রশাসনের কিছু ক্ষমতা দখল করে আত্মেন্দ্রিয় ভোগবাসনা তাঁর হ'ল না।

কতদিন আগে কোন্ এক শুভ মুহূর্তে বরিশালের শরৎকুমার ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্যে ইস্তফা দিয়ে ত্যাগনিষ্ঠ সদগুরুর প্রেরণায় মন্ত্রমুগ্ধের মত স্বার্থনিরভিলাষ হয়ে [illegible] তাৎপর্যময়ী দেশের সাধনায় কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন; তাঁর নিষ্কাম কর্মপ্রবাহ জীবনের অন্তিম নিশ্বাস পর্যন্ত চলেছিল। পাটোয়ারী বুদ্ধি নিয়ে যারা সংসার করে তারা বলবে এটা স্বামীজীর বোকামী। কে বোকা আর কে সেয়ানা মহাকালের বিচারে তা নিশ্চয়ই একদিন প্রমাণ হয়ে যাবে। তবে আজ এইটুকু দেখতে পাচ্ছি স্বামীজীর স্মৃতি-তর্পণের উদ্দেশে আমরা কত লোক এখানে সমবেত হয়েছি আর অসহযোগ আন্দোলনের সেই সব নেতা কালগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছেন, স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর মহান আদর্শের ধ্বজা তুলে দেশবাসীর অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন।

অসহযোগ আন্দোলন যুগের বরিশালের বিখ্যাত নেতা ও অসাধারণ বাগ্মী শরৎকুমার ঘোষ আর পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। যখন তিনি সাদা কাপড় পরে দেশোদ্ধার ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তখনকার প্রেরণার কেন্দ্র আর যখন তিনি গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হলেন তখনকার প্রেরণার কেন্দ্র একই—সহজ কথায় তা হচ্ছে ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে মানুষকে ভালবাসা, মানুষের মনুষ্যত্বকে স্ফুরিত করা। আমার আজ বেশ মনে পড়ে একদিন রাসবিহারী এভিনিউ আশ্রম হ'তে উজ্জ্বল ভারত পত্রিকা অফিসে যাবার সময় তিনি বললেন, তোমরা মানুষ হও, মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম। শরৎ ঘোষ গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছেন শুনে গান্ধীজী বলেছিলেন—শরৎবাবু কম সন্ন্যাসী আর কবে ছিলেন। তাঁর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও দিব্যজ্যোতি ছিল। আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাসী হবার পূর্বে তা ধরা পড়েছিল গান্ধীজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

ধূলিমলিন সংসারের রাজনীতিবিদ্ শরৎ ঘোষের সঙ্গে সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দের অপূর্ব সমন্বয়—স্বামীজী একজন সমন্বয়বাদী বিদ্রোহী সন্ন্যাসী। রাজনৈতিক দেশাত্মবুদ্ধির সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্মবুদ্ধির এই সমন্বয় যুগধর্মের পরিপোষক। এই সমন্বয় করতে পারি নি বলেই অসুরদলনী মা দুর্গার পূজা করে আমরা হাজার বছর ধরে পরের দাসত্ব করেছি, পরাধীনতার অশেষ গ্লানি ভোগ করেছি। মহাশক্তি মা দুর্গার আরাধনাকে আমরা একেবারে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে টেনে এনেছি, তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে এনে বাস্তব জগতে অসুরদলনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি নি। খড়্গধারিণী জননীর মহিষাসুর দলনকে কামক্রোধ প্রভৃতি রিপু দলনের রূপক আবরণ দিয়ে তুষ্ট আছি।

ভারতের ধর্ম ভারতকে অভীমন্ত্র শিক্ষা দেয়। যে ধর্ম মানুষকে নির্ভীক করে না সে হীন ধর্ম ভারতের নয়। আমরা অমৃতের সন্তান। কিন্তু ধর্মের বিলাসিতা আজ আমাদের গ্রাস করেছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বামীজী কবে বলেছেন—যেদিন খোল করতাল হরিনামে ইংরেজ seditious বলে ঘোষণা করবে সেদিন বুঝব আত্মার সন্ধান পেয়েছে। ৬০ লক্ষ সন্ন্যাসী বৈরাগী থাকতেও যে দেশ পরের দাসত্ব করে তাদের কি একটা ধর্ম? তা নিছক ক্লীবত্ব। যে ধর্মের সামান্য অনুষ্ঠান করলে ভয় তো দূরের কথা, মহাভয় থেকেও ভক্ত মুক্ত হয়—তারা কি না হাজার বছর ধরে পাঠান মোগল ইংরাজের দাসি

কাটা যায়। যে মন্ত্রে একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্লৈব্যের মহাপঙ্ক থেকে অর্জুনকে টেনে তুলেছিলেন, তারপরে সেই মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে। এই মন্ত্রে দীক্ষা নেবার কথাই স্বামীজী বলেছেন তাঁর হাজার হাজার বক্তৃতায় ও অসংখ্য রচনায়। সারা জীবন ধরে যে আদর্শের কথা স্বামীজী বলতে চেয়েছিলেন তা তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে পেয়েছিলেন তাঁর জীবন-দেবতা শ্রীনিত্যগোপালের কাছে এবং পরোক্ষভাবে পেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে। এই তত্ত্বের ২।১টি বিশেষ কথা আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলোচনা করছি।

স্বামীজীর প্রচারিত তত্ত্বকে আরও সংক্ষেপে এইভাবে বলা যেতে পারে—ঈশ্বর ও জগতের সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী বা হৃদয়ধর্মী সামগ্রিক জীবনবাদ। মানব জীবন একটা সমগ্র বস্তু—এর মধ্যে রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতির কোন পৃথক বিভাগ নেই এবং জীবনকে চালাতে হবে হৃদয় দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে। এই হৃদয় দিয়ে চালানোর অর্থ ছোট বড় সব কিছুর যথা মূল্য, যথা মান মর্যাদা দেওয়া অর্থাৎ কাউকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কাউকে চেপে শোষণ করে মুছে ফেলার চেষ্টা নয়। অধ্যাত্মবাদী ভারত ব্রহ্মের অতি মূল্য দিয়ে জগৎকে ছোট করে দেখেছে, তাই কেবলই পরের হাতে মার খেয়েছে, জগৎকে রক্ষা করতে পারে নি। অপর দিকে জড়বাদী ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য জাতি ব্রহ্মকে অগ্রাহ্য করে জগৎকে বড় করে দেখেছে, তাই সে দেশে আজ এত অশান্তি। জগতে সবকিছু অকল্যাণ, বিবাদ, সংঘর্ষ—সবই এই মাত্রাহীনতার জন্য। ভারত অজড়বাদী, পাশ্চাত্য দেশ জড়বাদী—উভয়ই সমগ্রভাবে অস্বীকার করেছে। ঈশ্বর ও জগৎ—এরা বিপরীত, বিরুদ্ধ—এরা নাকি এক সঙ্গে থাকতে পারে না—অর্থাৎ আমি ঈশ্বরকে ভালবাসব এবং একই সঙ্গে সংসারে সামগ্রিক উন্নতির চেষ্টা করব—এই দুটো নাকি এক সঙ্গে হয় না—হয় ঈশ্বর নিয়ে থাক বনে, নয় সংসারে মন দাও—এক মনকে নিয়ে দু জায়গায় দেওয়া যায় না। পুরুষোত্তমানন্দ বললেন—এ জীবন্ত জিনিষ অখণ্ডতাকে এভাবে খণ্ডিত করা যায় না, বিধাতা এমন ভাগাভাগির সংসার রচনা করেন নি। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। দাঁতে কাঁটা ফুটলে যতক্ষণ না সেটা বের হয় জিভ সমানভাবে খোঁচাতে থাকে, তার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবার জো নেই। সে মনে করলেই পারতো দাঁতে কাঁটা ফুটেছে, দাঁত বুঝুক গে, আমার কি? কিন্তু জীবনবোধ এমনই সামগ্রিক যে জিভের সোয়াস্তিতে থাকবারই উপায় নেই। এই রকম পরস্পর বিপরীত মিলেই জগতের সৃষ্টি। ব্রহ্ম মায়া, সন্ন্যাস সংসার—এদের মধ্যে প্রভেদ আছে সত্য কিন্তু দুই মিলেই সমগ্র সত্তা। এদের মধ্যে একটির উপর অতি মাত্রায় ঝোঁক দিলে স্বাভাবিক নিয়মেই আর একটা বিদ্রোহ শুরু করে। বিপরীতকে অস্বীকার করে পরিপাক করা যায় না। বিরুদ্ধকে পরিপাক করার পথ হ'ল প্রাণের প্রীতির মধ্যে উভয়কে স্বীকার করে তাদের মাত্রা নির্দেশ করা। জগতের যতকিছু অকল্যাণ সব এই মাত্রাহীনতার জন্য। পুরুষোত্তমানন্দ জীবনের সকল অমিলকে মাত্রার ছন্দে গেঁথে দিয়ে এক প্রাণ-মাতানো কথা বলে গেছেন সারা জীবন ধরে।

আমরা দুর্বল জীব—আসক্তি ও বিরক্তির মধ্যে বাস করি। আমরা মনে করি সংসারে বাস করতে গে ভাগবত জীবন যাপনের কোন প্রয়োজন নেই। যদি কেউ একটু ভগবানের প্রয়োজন আছে মনে করে তা হয়। ভগবানকে ডেকে তারা বলে, ওগো দেখো, আ বিয়ে করতে যাচ্ছি, তুমি রক্ষা করো, সব যেন নির্বি সম্পন্ন হয়। ওগো পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, ব্যবসা করত যাচ্ছি—সব যেন সফল হয়। শুধু পাহারা দেবার দা রক্ষা করার দায় ভগবানের। সংসারী শালগ্রাম দি বাটনা বাটতে চায়, নিজে বাটনা বেটে শালগ্রামের সে করে না। আর যারা ঈশ্বরে মন দিয়েছে তারা সংসার ঘৃণা করে। স্বামীজীর প্রবর্তিত সামগ্রিক জীবনবাদে স্তর এই আসক্তি-বিরক্তি, রাগ-দ্বেষের ঊর্ধ্বে। সেইজ বারবার তিনি গীতার এই শ্লোকটির দিকে আমাদের দৃ আকর্ষণ করতেন—

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥২।৬৪

স্বামীজী এই মুক্ত জীবনের অধিকারী ছিলেন এবং সেই জীবনের কথাই আমাদের বলেছেন।

এই দিব্যজীবন লাভের উপায় কি? সাধনার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন—এক দিকে আত্মশক্তি ও পুরুষকার, আর অপর দিকে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন ও শরণাগতি; নারায়ণে আত্মসমর্পণ ও জীবের কল্যাণে কর্ম ও তার সেবা। স্বামীজী ছিলেন নর-নারায়ণ-সেবী, তাই তাঁর আশ্রমের নাম নর-নারায়ণ আশ্রম।

উপসংহারে আমার এই নিবেদন—বাগুইআটী গ্রামে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রম ও উজ্জ্বলভারত পরিচালনার ভার যাঁরা নিয়েছেন, স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবার দৃষ্টান্ত হতে তাঁরা শক্তি লাভ করুন। তাঁদের নিষ্ঠা, ঐকান্তিক চেষ্টা স্বামীজীর আশীর্বাদে বিফল হবে না—আমার স্থির বিশ্বাস। আজ এখানে যাঁরা সমবেত হয়েছেন, এ আশ্রম পরিচালনায় তাঁদেরও এক গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে, কারণ স্বামীজী এই প্রতিষ্ঠান সকলের উপর ন্যস্ত করে গেছেন। আপনাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় স্বামীজীর সমন্বয়ের আদর্শ সফল হোক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুনরায় আমি সদগুরু পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে প্রণতি জানাই। জয় হিন্দ্।

পদচিহ্ন

॥ শ্রীসনাতন মণ্ডল ॥

হে পুরুষোত্তমানন্দ !
তোমার জন্মদিনে
জানাতে এসেছি শুধু
একটি ক্ষুদ্র প্রণাম।
জন্মেছিলে কাঁকষা গ্রামে
মাটির ঘরে
মাটির মানুষের মতো।
বুকে নিয়ে কি কথা ?
জেনেছি জেনেছি
ছোট্ট নয় সে কথা দুটি
'জড়-অজড়' সেতুর মাঝে
কৌটাতে 'এক-বিশ্ব' গোলাপ একটি।
বিশ্বে আজ বড্ড অন্ধকার।
ভাই ভাইয়ের বুকে
ধরেছে পিস্তল—
খুনের রক্তে লাল মাটি !

এখন হে বিশ্বনাগরিক !
তুমি আমাদের মাঝে জাগো,
পদচিহ্ন দেখাও
আলো দাও, আলো দাও।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

ওঁ নমো গুরুমূর্তয়ে ভক্ত-ভগবতে নিত্যগোপালায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায়।

ওঁ আজানুলম্বিতভুজং কনকাবদাতং সঙ্কীর্তনৈক বিভবশিত বঙ্কিমাক্ষম্। বিশ্বপ্রেমঘন নরনারায়ণপেশীব্ বন্দে সমন্বয়গুরুং পুরুষোত্তমানন্দম্।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত বন্ধুগণ,

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের একাশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে আজ তাঁর সমাধিক্ষেত্রে আমরা সকলে সমবেত হয়েছি। তাঁর হয়ে, আশ্রমের হয়ে আপনাদের সকলকে আমি সাদর অভিনন্দন জানাই। আপনাদের সকলের সঙ্গে সমবেত হয়ে এবং ঘটনাচক্রে ইচ্ছা সত্ত্বেও যারা উপস্থিত হতে পারেন নি তাঁদেরও সঙ্গে একাত্ম হয়ে আজ তাঁকে আমাদের সকল সত্তার প্রণাম জানাই; এই সঙ্গেই প্রণাম জানাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জীবনদেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে যাঁর আনন্দ-মূর্তি ঐ মন্দিরে আপনারা দেখতে পাবেন। আপনাদের এই উপস্থিতি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে আনন্দিত করে, আপনারা তাঁর আনন্দ-অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

প্রায় ছয় বৎসর হতে চলল শ্রীমৎ স্বামিজী আমাদের স্থূল দৃষ্টির বাইরে চলে গেছেন। আমরা প্রতি বৎসরই একবার করে মিলিত হচ্ছি, তাঁকে স্মরণও করছি—কিন্তু তাঁকে আমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছি বা ধরতে পেরেছি? তাঁকে, তাঁর কথাকে ব্যাপকে বোঝা খুব সহজ হয় না। তাঁর কথা আমাদের ' চোখে ও কানে নতুন ঠেকে—তাই দুর্বোধ্য লাগে, তাই তাঁর কথা আজও ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। আমরা যে রকম করে দেখে এসেছি শুনে এসেছি শ্রীনিত্যগোপালকে আত্মসাৎ করে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তার থেকে আমাদের বিচারে বলা যেতে পারে একেবারে উল্টো রকম করলেন, বললেন। ভারতবর্ষের লোক আমরা কত সহজেই বুঝি যে সন্ন্যাসী সেই-ই যে সংসারকে পরিত্যাগ করেছে, সংসারের ধন জনের ভাবনা দুশ্চিন্তা নিয়ে যার একটুকু মাথাব্যথা নেই, কামিনী কাঞ্চনকে যে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দূরে রেখেছে ইত্যাদি। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ঠিক এর উল্টো কথা বললেন, উল্টো রকম করলেন। তিনি বললেন, সংসারকে পরিত্যাগ করে আমি সন্ন্যাসী নই, সংসারকে পরিপাক করে সন্ন্যাসী। ভাত যখন আমাদের পেটে অত্যন্ত সহজে হজম হয়ে গিয়ে রসরক্ত সৃষ্টি করে' আমাদের জীবনী শক্তি বাড়িয়ে তোলে, তখন ভাত কি আমাদের কিছু অসুবিধা করে? না আমাদের সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকতেই সহায়তা করে? কিন্তু ভাত যখন আমাদের হজম হয় না! পরিপাক শক্তি যখন একেবারে নষ্ট হয়ে যায় তখন যত সহজপাচ্য অবস্থায় নিয়েই ভাত খাই না কেন, সে পেটে গিয়ে কেবলই জানান দিতে থাকে যে আমি আছি—উদ্বেগের অশান্তির দুঃখের আর অন্ত থাকে না। তেমনি সংসারকে যে পরিপাক করতে পারে, সংসার যার বদ্‌হজম হয় না, তার পক্ষে সংসার কোন অশান্তি উদ্বেগ দুঃখ বা ক্লেশের কারণ হয় না। হজম করার শক্তির উপরই সব কিছু নির্ভর করে। ভাত যেমন কি রকম পরিপাক শক্তির পক্ষে কতটুকু খাওয়া উচিত, কখন কেমন করে খাওয়া উচিত এ সব হিসেব করেই খেতে হয়, তেমনি সংসারকেও কতটুকু গ্রহণ করব, কেমন করে গ্রহণ করব, কখন গ্রহণ করব, এই সব তথ্য ও তত্ত্ব জেনেই গ্রহণ করতে হয়। শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ এই সব কথাই বলেছেন।

তাই সংসার যেমন তাঁর কাছে বন্ধনের কারণ হয় নি, তেমন হয় নি কামিনী কাঞ্চনও, তেমনি হয় নি রাজনীতিও। তিনি বললেন, কামিনী ব্রহ্ম, কাঞ্চন ব্রহ্ম, ধনের জন্য মাথাব্যথা করাও ব্রহ্মকর্ম। এগুলি কি ভারতবাসী আমাদের কানে খুব অদ্ভুত ঠেকে না যতই বস্তুবিজ্ঞান প্রচারিত হোক না কেন? ভারতবর্ষের লোক যারাই ভাল মানুষ হতে চেয়েছে তারা কখনও সংসারের বন্ধনের পারলৌকিক ব্যবস্থা ছাড়া এ জগতের ভালমন্দ সুখদুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় নি। তাদের কথা ছিল আত্মার মুক্তিই শ্রেষ্ঠ মুক্তি—যে-কেউ আত্মার মুক্তি চাও তারা এই সব ঝঞ্ঝাট ব্যাপার থেকে সযত্নে দূরে থেকে বনে বনে কোণে বসে ধ্যান করবে। এই হল ভারতবর্ষের সাধারণ শিক্ষা। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর জীবনদেবতা শ্রীনিত্যগোপালকে অনুসরণ করে বললেন, সংসার শ্রীভগবানের বিশ্রাম স্থল, বিশ্ব শ্রীভগবানের আনন্দ প্রকাশ। কিন্তু সংসার তখনই ভগবানের বিশ্রাম স্থল, কামিনী কাঞ্চন তখনই ব্রহ্ম রূপ প্রকাশ করে, ইন্দ্রিয় তখনই ভগবানকে লাভ করার সহায়ক হয়, যখন সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে আমি এক করে দেখতে পারব—সর্বভূতের সঙ্গে ভেদবুদ্ধি গিয়ে যখন সকলকে নিয়ে সকলের সঙ্গে তালের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আনন্দে থাকতে পারব। ব্যক্তি জীবন, বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে হলে সব কিছু ছেড়েই ভাল হতে হয় বটে। বিশ্বের মানুষকে বাদ দিয়ে পুরুষোত্তমানন্দের কোন ভগবান নেই, সর্ব মানুষের সঙ্গে যেমন তিনি জীবনের সব কিছু ভাগ করে নেবেন, তেমনি মানুষকে একান্তভাবে বাদ দিয়ে আলাদা কোন ভগবানেও তাঁর প্রয়োজন নেই। মানুষ যাতে এই মাটির বুকেই সত্যিকারের মানুষ হতে পারে, সেইজন্য তাঁর ভগবানকে প্রয়োজন। মানুষ হওয়ার চেষ্টা না করে, আমাদের স্বভাব চরিত্র আশা আকাঙ্ক্ষাকে শুদ্ধ হতে শুদ্ধতর করবার চেষ্টা না করে, আমাদের আপনকে, প্রতিবেশীকে সহ্য করবার, ভালবাসার ক্ষমতাকে দিন দিন বাড়িয়ে তুলবার প্রয়াস না করে, দলাদলি ঈর্ষা বিদ্বেষ স্বার্থান্ধতা যেমন তেমনই রেখে কেবল নাম জপ বা বিশেষ আচার অনুষ্ঠান দিয়ে যে আকাশের ভগবান পাওয়ার সাধনা—পুরুষোত্তমানন্দের মতে সে সাধনা জীবনকে ক্রমে জড়িয়ে দেয়, সে ভগবান বাস্তব জীবনকে অস্বীকার ও নিঃপ্রয়োজন জ্ঞান করে না। যা ভারতবর্ষের হয়েছে। ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ জন লোক কোন না কোন সম্প্রদায়ে দীক্ষিত, কিন্তু সেই নাম-জপে তার অহংকার এতটুকু কমে না, তার ফাঁকি দিয়ে ধনাকাঙ্ক্ষার মোহ এতটুকু হ্রাস পায় না, সমস্ত কর্মের পিছনে নিজের পকেট ভর্তি করা বা নিজের নাম প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা এতটুকু দূর হয় না। এ ধর্ম আমাদের দিনে অচল—এ কথাই পুরুষোত্তমানন্দ সমস্ত কথায়, সমস্ত রচনায়, সমস্ত আচরণে বলে গেছেন।

এই রকমভাবে পুরুষোত্তমানন্দ যা বলেন বা করেন, তা আমাদের প্রচলিত ভাবার সাথে মেলে না—এ যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রেও। তাঁর রাজনীতিও তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করেছেন তা আর দশ জনের সঙ্গে মেলে নি—যেজন্য যদিও সহস্র সহস্র বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন এই রাজনীতি ক্ষেত্রেই, শত শত গ্রাম এবং বহু বহু শহর পরিভ্রমণ করেছেন, একেবারে জনসাধারণের সঙ্গেই ছেঁড়া মাদুরে বসে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তিনবার জেলে গেছেন—তবু আর দশজন রাজনৈতিক নেতাকে দেশ যেভাবে মনে রেখেছে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে সেভাবে মনে রাখে নি। তার কারণ রাজনীতিটা তাঁর নেশাও ছিল না, পেশাও ছিল না। তাঁর সামগ্রিক জীবনবাদের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল রাজনীতি। তিনি রাজনীতি করেছেন কেননা সব ক্ষেত্রে স্বাধীন স্বতন্ত্র স্বরাট শোষণহীন জীবন যাপন তাঁর আদর্শ—শোষণ তিনি কোনমতেই কোথাও মেনে চলবেন না—রাজনীতি ক্ষেত্রেও ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ ব্যাহত হয়—তাই তিনি সমগ্র শক্তি, সমস্ত প্রাণ দিয়েই রাজনীতি ক্ষেত্রে নেমেছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের উপর আত্মার শোষণ তিনি মেনে নেন নি, পরিবার সমাজ-জীবনে জাতি কুল অর্থ পাণ্ডিত্য কোনটা দিয়েই একের প্রতি অপরের শোষণ মেনে নেন নি, তাই রাজনীতিক্ষেত্রেও

ইংরেজের শোষণে আধ্যাত্মিক মানুষের প্রয়োজন কি মনে করে চুপ করে থাকেন নি। এই সব অনেক কিছু করেও আজও তিনি যে মানুষের বোধগম্য হয়েছেন, তা নয়। পুরুষোত্তমানন্দ কি বস্তু তা আজও মানুষকে জানান যায় নি। তবু জানি তাঁর কথায় তাঁর জীবনে মানুষের প্রয়োজন আছে—এইখানে তাঁর দেহ সমাহিত, এইখানে তাঁর কথাগুলি মুদ্রিত অমুদ্রিত হয়ে পড়ে আছে—আপনারা আসুন, পড়ে দেখুন তাঁর এই সব কিছুকে মূল্য দিয়ে অথচ কোনটাকেই অতিমূল্য না দেওয়ার চিন্তাধারা, আলোচনা করে দেখুন তাঁর সর্ব মানুষকে নিয়ে সকলের সঙ্গে ভাগ করে সংসারে বর্তমান প্রেমময় সাধারণ জীবন-যাপন করার মধ্যেই ভগবানকে পাওয়ার পথের খবর। ব্যক্তি-জীবন সমাজ-জীবন বিশ্ব-জীবনকে পঙ্গু করে ফেলে, কিংবা একটাকে বাড়িয়ে তুলে আর একটাকে ধ্বংস করে দেয় যে ধর্ম বা আচারনিষ্ঠা, তেমন কোন ধর্ম বা আচার অনুষ্ঠান যে আজকের বিশেষ কোন দেশের মানুষেরই ধর্ম বা জীবনযাপনের নীতি হতে পারবে না, এইটেই ভারতবর্ষের উপনিষদ্ বেদান্ত গীতার মধ্য দিয়ে সর্ব মানুষের কাছে উপস্থিত করাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনব্রত। আজকের মানুষকে—সর্ব দেশের সর্ব জাতির মানুষকে—সুস্থ স্বাভাবিক অথচ সামগ্রিক জীবন যাপন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে একই সঙ্গে ব্যক্তি ও সমষ্টি। এবং এও মনে রাখতে হবে যে কোন দিককে অতিরিক্ত বাড়িয়ে তুলে অন্য দিককে দাবিয়ে দেওয়া চলবে না। এ দুয়ের পরিমিত সামঞ্জস্য আজকের যুগধর্ম। পুরুষোত্তমানন্দের এই সব কথা আজও আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে কেননা আমাদের জীবনযাপন বা চিন্তাধারা সুস্থও নয়, স্বাভাবিকও নয়, সামগ্রিকও নয়। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এরই একটা প্রবণতা এসে গেছে—তাই পুরুষোত্তমানন্দের কথা মানুষ শোনে। তাই দৈন্য ও রিক্ততার মধ্যেও তাঁর এই জীবনবাদ প্রচারকারী তাঁর আশ্রম ও তাঁর পত্রিকা উজ্জ্বলতারত আজও টিকে আছে। যদিও এখন পর্যন্ত এর বিপরীত চিন্তাধারা বা জীবনযাপন খুব প্রবল যে একদল উৎপাদন করবে, আর এক দল শুধু নির্ভার নিজেকেই কঠিন কর্কশ হয়ে তার ফল ভোগ করবে উৎপাদকের যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা না দিয়ে, তথাপি এর মধ্যেই প্রত্যেকেই সমগ্র সমাজের সামগ্রিক উৎপাদনে কম বেশী অংশ গ্রহণ করবে এবং উৎপাদককে তার ন্যায্য মূল্য ও সম্মান দিয়েই জীবন যাপন করবে, এমন মানুষ ও এমন চিন্তাধারাও এসে যাচ্ছে—তাই তো সামগ্রিক জীবনের তত্ত্ব আজ মানুষের ভাল লাগে। মানুষকে অসম্মান করব না, মানুষকে মর্যাদা দেব, ভালবাসব, আমার সুখদুঃখকে সর্ব মানুষের সঙ্গে একই সুরে রক্ষা করতে চেষ্টা করব—এই রকম চিন্তাধারা আগে হোক পরে হোক আসবেই, সমাজের মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দিতেও হবেই। এই চিন্তাধারার দার্শনিক ভিত্তি রচনা করে গেছেন পুরুষোত্তমানন্দ। সর্ব মানুষের থেকে নিজেকে অতিরিক্ত রূপে আলাদা করে ফেললেই অপরকে শোষণ করার আমার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং এই ভেদবুদ্ধিই আসক্তি বিদ্বেষের জনক হয়ে সংসারকে বিকৃত করে তোলে। অন্য দেশের আলোচনা নাই বা করলাম—আমাদের দেশে মানুষে মানুষের বিভেদের জন্য কি একরকমের সৃষ্টি হয়েছিল? গোড়ায় ছিল সংসার মিথ্যা, মায়াময়, বন্ধনের হেতু—অতএব মুক্তির অতিপিপাসা—এর ফলে যা একে সৃষ্টি সুন্দর কল্যাণময় করতে বাধা বৈষয়িকতা এই চিন্তাধারা। অথচ এই মুক্তির অতিপিপাসাতেও ভেদাভেদের বন্দোবস্ত তো ছিল অনেক রকমের। ধর্মের ব্যবধান, কুলের ব্যবধান, শীলের ব্যবধান, জাতির ব্যবধান, অর্থের ব্যবধান, পাণ্ডিত্যের ব্যবধান—নানান রকমের বাধ দিয়ে তো মানুষের সহজ জীবনকে পঙ্গু বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। মুক্তির অতিপিপাসাতেও সকলে মিলে মিশে বাস করবার ব্যবস্থা তো হয় নি। কিন্তু আজ দু দিনের হলেও এ সংসারকে অতিপিপাসা বলে কম মূল্য দিলে হবে না এবং তাকে পুরো মূল্য দেওয়া তখনই সত্য ও সার্থক হয়ে উঠবে যখন বিশ্ব জুড়ে সবাই মিলে মিশে সুখদুঃখকে ভাগ করে নিয়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করেও এক সমিতিবদ্ধ হয়ে বাস করতে পারব। এমনই একটি চিন্তাধারার মধ্যে দৈনন্দিন জীবন বাঁধা পড়েই যাক অনাদি

অনন্ত চিরন্তন জীবনের মধ্যে কিংবা চিরন্তন জীবনের সৌন্দর্য প্রবাহিত হয়ে পড়ে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে। মানুষ হিসেবে পরিচয় দিয়েই বাস করতে হবে আজকের বা আগামী দিনের মানুষকে—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সমস্ত লেখার ও বলার তারই দার্শনিক ভিত্তি।

সর্বসংস্কারমুক্ত এমনই একটা ব্যাপক-গভীর চিন্তাধারার অধিকারী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনের সমস্ত আচরণও ছিল সর্বসংস্কারমুক্ত, ব্যাপক ও গভীর। অত্যন্ত সাদাসিধে সাধারণ জীবন তিনি যাপন করতেন। আহারে বিহারে অশনে ভূষণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ—এটা তাঁর জন্মগত স্বভাব—সন্ন্যাসী হওয়ার আগেও যেমন, পরেও তেমন। সমস্ত রকম প্রয়োজন-বোধই ছিল তাঁর যেমন স্বল্প তেমনি সাধারণ। যা দরিদ্রের আহার তাতেই ছিল তাঁর রুচি—কচু শাক, ঘেঁটে আলু, মূলা তিনি কপি পটলের থেকে বেশী পছন্দ করতেন। কোন কিছু না হলে তাঁর অসুবিধা এমন কিছু তাঁর জীবনে দেখি নি। খাওয়া-দাওয়া চলাফেরায় তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছা রুচি অরুচি দিয়ে তিনি কখনও অপরকে বিরক্ত করতেন না। আর তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে অত্যন্ত অসাধারণ হয়েও যেটা খুব প্রীতিজনক ও রুচিকর ছিল সেটা তাঁর সান্নিধ্য, তাঁর কাছে বসে কথা শোনা। তিনি অত্যন্ত কঠিন তত্ত্বগুলিকে জীবনের বাস্তব রূপরসগন্ধস্পর্শের ক্ষেত্রে এনে এমন সুমধুর ভাবে আলোচনা করতেন যে বুঝতে পারি বা না পারি, মানতে পারি বা না পারি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুনতে ক্লান্তি লাগত না—এ যেমন একক বা দুইচার জনকে নিয়ে শুনলে, তেমনি সহস্র মানুষের সামনে যখন বক্তৃতা দিতেন তখনও শুনলে। কেবল কথা শোনাই নয়, সমস্ত মানুষকে—শিক্ষিত অশিক্ষিত, ছোট বড় নরনারী আবালবৃদ্ধ সকলকে—তিনি এমন প্রাণভরা আহ্বান জানাতেন যে একবারেই মনে হত তিনি আমার পরম আপন জন। প্রত্যেকেই তাঁকে অত্যন্ত আপন জন বলে সহজেই মনে করতে পারত। কিন্তু আপন হওয়াটা তাঁর সবটুকু কথা নয়। তিনি যখন প্রকৃতি পরিবর্তনের দ্বারা তাদেরকে সুন্দরতর হওয়ার পথে, ব্যাপক গভীর জীবন যাপনের পথে ডাক দিতেন, তখন আর তাঁকে কেউ ধরে রাখতে পারত না। মানুষকে তিনি ভালবাসতেন, মানুষের জটিল মনস্তত্ত্বকে যে ভালবাসার পথে সুন্দরতর মহত্তর করে তোলা যায় এবং এইভাবে প্রকৃতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সমাজ-জীবনকে মধুর করে তোলা যায়, এইটেই তিনি সারা জীবন চেষ্টা করে গেছেন। তাই তাঁর সারা জীবনে বহু মানুষ এসেছে, কিন্তু সহজ জীবন যাপনের কষ্টে টিকতে পারে নি। মানুষ মানুষ হিসেবে সম্পূর্ণ হতে চেষ্টা না করে সে আর যাই হোক তাতে তাঁর মন ভরত না—সে বৈজ্ঞানিক হোক, দার্শনিক হোক, আধ্যাত্মিক হোক, সাহিত্যিক হোক, যা কিছু হোক—মানুষ হিসেবে সে সুস্থ মানুষ কি নাএবং সে সমগ্রতার সাধক কি না, কোন এক দিককেই সে শুধু মানে কিনা এইটেই শুধু তাঁর বিচারের বিষয় এবং এই পথে জাগতিক জীবনেও শান্তি ও আনন্দ। অন্য জীবনের কথা যদি কিছু ভাবতে হয় তা-ও লাভ করা যায় এই মানুষ হতে চেষ্টা করার ভিতর দিয়ে। বাস্তব জীবনের ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্ব জীবনকে পঙ্গু করে ফেলে মানুষ যা হতেই চেষ্টা করুক না কেন, তাতে শ্রীমৎ স্বামিজীর আনন্দ বা সমর্থন ছিল না।

যাইহোক, এই রকম একটা সুস্থ সামগ্রিক জীবন-চেতনাকে ভারতবর্ষের গীতা-উপনিষদ বেদান্তের মধ্য দিয়ে স্বামিজী রেখে গেছেন। মানুষের যা আদর্শ হবে তাকে একটা দার্শনিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিদ্বজ্জন সমাজে উপস্থিত করতে হয়, পুরুষোত্তমানন্দ তাই-ই করেছেন। নূতন দিনের নূতন যুগ-চেতনার এই দার্শনিক কাঠামোটির মূলসূত্র তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জীবন-দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের কাছ থেকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই যে-চিন্তাধারা শ্রীনিত্যগোপালের থেকে তিনি পেয়েছিলেন, এর একটা অক্ষরও শ্রীনিত্যগোপাল তাঁকে মুখে বলে দেন নি, আর শ্রীনিত্যগোপাল অনেক বই লিখেছেন বটে তবে সে বইর মধ্যে এই সর্বসমন্বয়ের সামগ্রিক জীবনের তত্ত্ব এমনভাবে লুকিয়ে আছে যে, বের করে নেওয়া খুব সহজ নয়। শ্রীনিত্যগোপাল পুরুষোত্তমানন্দকে শুধু বলেছিলেন, 'তুমি কি জাননা তোমার যখন যা দরকার ভগবান

অন্তর্যামী রূপে তোমাকে তখন তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন'? অন্তরের থেকে নিজ জীবনের মধ্য দিয়েই পুরুষোত্তমানন্দ সব পেয়েছিলেন; তিনি বলছেন 'এমন একটী অক্ষরও লিখিনি যা নিজে উপলব্ধি করি নি'। আর যা তিনি উপলব্ধি করেছেন, তাই তিনি আচরণও করেছেন। তাই এ কথা বলতে ইচ্ছা করে ধর্মে জ্ঞানে ভক্তিতে প্রেমে বিশ্বসেবায় সব দিক দিয়ে নিজেকে যদি উদ্বোধিত করে তুলতে চাই, তাহলে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবন আমাদের প্রেরণা দেবে, পথ দেখাবে। দুটী সভ্যতার সংঘাতে আজও আমরা সত্যি দিশেহারা—ভারতীয় আমরা এক রকম করে ভেবে এসেছি, চলে এসেছি—এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের চলা বলা সবই বদলে গেছে। এখন জিজ্ঞাসা ওঠে কারো কারো মনে যে, আমরা যা ছিলাম সেটাই সত্য ছিল, না যা হয়েছি তা-ই সত্য? অতীতের শেকড় তো ছিঁড়ে ফেলা যাবে না অথচ যা ছিলাম তাই-ই থাকাও চলে না, চলে নি। তাহলে ভারতীয়দের যা সত্য তাকে রক্ষা করেও কেমন করে নূতনকে—নূতন জীবন-চেতনাকে গ্রহণ করা যায় তারই ব্যবস্থা দিয়েছেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ। এই জন্যই তাঁকে আমাদের আজ প্রয়োজন—দ্বন্দ্ব-সমাকীর্ণ আমাদের তাঁকে আজ বড় প্রয়োজন। সমস্ত চিত্তবৃত্তির সুসমঞ্জস প্রকাশেই দ্বন্দ্ব প্রশমনের একমাত্র পথ। পুরুষোত্তমানন্দ একের দ্বারা অপরকে অভিভূত না করায়, ব্যক্তি-জীবনের স্বাতন্ত্র্যকে বাড়াতে গিয়ে পরিবার বা সমষ্টি-জীবনকে ব্যাহত না করার শিক্ষা দিয়ে বর্তমান কালের নরনারীর দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ জীবনে শান্তি দিবার পথ রেখে গেছেন। সুস্থতা, স্বাভাবিকতা, সামগ্রিকতা, জীবনের বৈধর্ম্যকে যথা মান দিয়েও সাম্যতা—পুরুষোত্তমানন্দের কাছ থেকে এইগুলি পাওয়া যাবে। তাই সত্যিই তাঁকে আমাদের প্রয়োজন। অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের আটকে রাখব না—বার বার এই কথাটাই বলতে চেষ্টা করেছি যে যারা আমরা হতে চাই—মানুষ হতে চাই—তারা যেন পুরুষোত্তমানন্দের চিন্তাধারা ভেবে দেখি, পুরুষোত্তমানন্দের জীবনকে ভেবে দেখি। পুরুষোত্তমানন্দের বহুমুখী জীবনের কথা এত অল্প সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়—যে চিন্তাধারায় আমরা মানুষ হিসেবে নিজে পরিচিত হতে পারি, সেই চিন্তাধারাটাই নানাভাবে বলবার চেষ্টা করলাম—কেননা আমরা মানুষ হতে পারি নি বলেই আজকে আমাদের অনেক কিছু সত্বেও দুর্গতি ঘুচল না, এ কথা আপনারা নিশ্চয় জানেন। তাই মানুষ কোন্ চিন্তাধারায় হতে পারি তাই একটু ভেবে দেখলাম।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁর এই সব কথা বেদান্ত, এগারখানা উপনিষদ্ ও গীতার অনবদ্য ভাষ্য রচনা করে রেখে গেছেন। এ ছাড়াও তাঁর অনেক লেখা রয়েছে। এদের মধ্যে বেদান্ত ও সাতখানা উপনিষদ্ মাত্র মুদ্রিত হয়েছে, চারখানা উপনিষদ্ গীতা ও আরও অনেক কিছুই এখনও ছাপা হয় নি। আমি আপনাদের কাছে এই চিন্তাধারাটী ছাপার কাজে সাহায্য করতে আবেদন জানাই। আপনারা জানেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এই গ্রামের মধ্যে মাত্র দুই বৎসর থেকেছিলেন। দার্শনিক গ্রন্থাদি ছাড়াও তিনি যে সব কাজ আরম্ভ করে দিয়ে ছিলেন সেগুলি রক্ষা করা ও বাড়িয়ে তোলার কাজেও আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আপনাদের মধ্যে এসেছিলেন, আপনারা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, এগিয়ে দিন। মানুষের জয় হোক, জয় হোক পুরুষোত্তমানন্দের, জয় হোক শ্রীনিত্যগোপালের।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

।। শ্রীবিষ্ণুপদ রায় ।।

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ, মায়েরা ও বোনেরা—

আজ শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের একাশীতিতম শুভ জন্মোৎসব। এই দিনে তিনি আমাদের এই আলোবাতাসের পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই দিনটি তাই আমাদের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। প্রতি বছর আমরা এই দিনটিতে সমবেত হইয়া তাঁহার জীবন-দর্শন আলোচনা করি।

প্রতিদিন জগতে অসংখ্য মানুষ জন্মিতেছেন আবার কালের সমুদ্রে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছেন। কিন্তু সেই অসংখ্য মানুষের মধ্যে দুই চারিটি মানুষ এমনই ভাবে মানুষের হৃদয়ে আটকাইয়া যাইতেছেন যাহাদের মনুষ্য সমাজ যতদিন পৃথিবীতে থাকিবে ততদিন সেই ভুলিতে পারিবে না। শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী ঠিক তেমনই একজন মানুষ ছিলেন যাহাকে বহুদিন ধরিয়া মনুষ্য সমাজ বুঝিবে ও তাঁহার জীবন-দর্শন-তত্ত্ব আস্বাদন করিবে। শ্রীমৎ স্বামীজী কেমন করিয়া সাধারণ হইয়াও অসাধারণ সেই দিকটি আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীমৎ স্বামীজী প্রথম জীবনে খুব কুনো মানুষ ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে প্রচলিত শাস্ত্রের মতানুসারে চলিতেন, সংসার অসার, নারী নরকের দ্বার, এই সব কথা তাঁহার মনঃপূত না হইলেও প্রথম জীবনে তিনি এই চিন্তাধারার মধ্যেই মানুষ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের সহিত সংযোগ হইবার পর হইতেই তাঁহার জীবন এক নূতন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে। যাহার ফলে সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি রাজনীতির ক্ষেত্র পর্যন্ত বিচরণ করিয়াছেন। যে মানুষ একদিন ভাবিয়াছিলেন সংসার অসার, সেই মানুষই আবার অসারের মধ্যে সার খুঁজিয়া পাইলেন শ্রীনিত্যগোপাল প্রসাদে। স্বামীজীকে বোঝা সহজ নয়, সহজ নয় এই জন্য বলিতেছি যে তিনি বুদ্ধির আওতার অনেক বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। সংস্কারে আচ্ছন্ন আমাদের মন, এই মন দিয়া বিচার করিয়া কি করিয়া তাঁহার নাগাল পাইব! তিনি একাধারে সন্ন্যাসী, গৃহী, রাজনীতিবিদ্, সমাজ-সেবক, ব্রহ্মজ্ঞানী ইত্যাদি। একাধারে তিনি এতগুলি রূপ। তিনি যদি শুধু ভাবুক সন্ন্যাসী হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে বুঝা সহজ হইত,—তিনি যদি শুধু রাজনীতিবিদ হইতেন তাহা হইলেও তাঁহাকে বুঝা যাইত। কিন্তু যে মানুষের মধ্যে এতগুলি বিচিত্র ভাবের একত্রে সমাবেশ রহিয়াছে তাঁহাকে একান্ত কি বলিয়া বিচার করিব। এইখানেই তিনি অনন্য ও অসাধারণ অতীব আধুনিক চিন্তাধারার প্রবর্তক।

অতীতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা দিয়া বর্তমানের জীবন অচল, অতীতের ঐকধর্মী জীবন-দর্শনও আজ অচল হইয়া গিয়াছে, তবুও আমরা সেই অতীতের চিন্তাধারার লেজুড় ধরিয়া চলিতেছি এবং বারবার হোঁচট খাইতেছি। এমনিতর হোঁচট খাইতেছিলেন একদিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধনুর্ধর শ্রীঅর্জুন, কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত সেই বহুরূপী শ্রীকৃষ্ণের পদচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া অতীতের সংস্কার-মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবন-দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণ-জীবন-দর্শন একই জীবন-দর্শন। শ্রীকৃষ্ণ-জীবন-দর্শনে নারী নরকের দ্বার নয়, দাসী নয়,—নারী ব্রহ্মময়ী, পরা-প্রকৃতি, রাণী। শ্রীমৎ স্বামীজী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নারীর ব্রহ্মময়ী রূপ দেখিবার জন্য আকুল আগ্রহে অজস্র কাঁদিয়াছেন, কিন্তু কে তাঁহার কান্না বুঝিবে? দেশ আজ নারী জাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াছেন; অস্পৃশ্যতা বর্জন করিবার আইন পাশ করাইয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রের ও দৃষ্টি-ভঙ্গির রদবদল কি কিছু করিতে পারিয়াছেন? শ্রীমৎ

স্বামীজীকে দেখিয়াছি—তিনি পতিতের জন্য কাঁদিয়াছেন, ছোটর জন্য কাঁদিয়াছেন। তাঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যার মধ্যে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের যে বিরাট ঐক্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা শুধু এখনো শাস্ত্রের মধ্যেই রহিয়া যাইতেছে। অথচ এই জীবন-দর্শন বর্তমান কালের প্রত্যেক মানুষেরই অতীব প্রয়োজন ছিল। শাস্ত্র আছে, তপ-জপ আছে, অথচ মানুষের মধ্যে মানুষের যে আদান-প্রদান সম্বন্ধ তাহা একচুলও নড়িতেছে না। স্বামীজীর উদাত্ত কণ্ঠে শুনিয়াছি, যে তপ জপ মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক নিবিড় করে নাই, যে ধর্ম অন্ন দান করিতে শিখায় নাই, যে ধর্ম ইংরাজের শোষণের বিরুদ্ধে গর্জন করে নাই, যে ধর্ম শুধু ক্লীবের মত বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা গীতার ধর্ম নয়, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম নয়—তাহা ক্লীবের ধর্ম। এই ক্লীবের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সমাজকে এক নূতন ছাঁচে গড়িবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, মানুষকে ও নিজ জীবনকে আমূল পরিবর্তন করিয়াছেন। কেমন করিয়া চলিলে, কেমন করিয়া দেখিলে বিশ্ব গোলোক বৈকুণ্ঠ হয়, কেমন করিয়া দেখিলে ভোগ্যবস্তু ভোগ্যবস্তু থাকিয়াও প্রসাদ হইয়া উঠে, কেমন করিয়া এই সংসারের সমস্ত কিছুর সহিত যোগ রক্ষা করিয়াও মানুষ পুরুষোত্তম মানুষ হইতে পারে, বিশ্বমানব হইতে পারে এ সব তত্ত্ব ও জীবন আমরা প্রত্যক্ষ তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি আর একথা যথার্থ যে তিনি নিজে বিশ্বমানব ছিলেন।

বিশ্বের মানবের সম্মুখে আজ এক বিরাট সমস্যা। সে সমস্যা বিশ্ব যুদ্ধের সমস্যা নয়, আণবিক অস্ত্রের সমস্যা নয়, জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা নয়—সে সমস্যা পারস্পরিক অবিশ্বাসের সমস্যা। আজ গোটা পৃথিবীতে এমনই এক সময় আসিয়াছে যে কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না অথচ পারস্পরিক বিশ্বাস না থাকিলে গোটা পৃথিবীতে কোন কিছুতেই শান্তি আসিতে পারে না। অবিশ্বাসের আগুনে আজ আমরা পরস্পর স্পর্ধী মনোভাব লইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি—শান্তি কোথায়? নাম-জপ, টিকি, দাড়ি, পৈতা কিংবা নির্জনে ধ্যানধারণায়ও শান্তি আজ আর আসে না। শাস্ত্র বলিতেছে ভূমৈব সুখম্—ভূমার মধ্যে শান্তি, সুখ আছে। মানুষ যদি সমস্ত কর্মের মধ্যে ভূমাকে আস্বাদন করিতে পারে এবং প্রতিটি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখিতে পারে তবেই শান্তির নাগাল পাওয়া যাইবে। ভারতবর্ষ বহুদিন ধরিয়া আকাশের ভগবানের ধ্যান করিয়াছে, সংসার ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু এই সহজ কথাটুকু সম্বন্ধে কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে ভগবান আকাশে, গিরি গুহাতেই একমাত্র নাই—তিনি আছেন সমস্ত মানুষের মধ্যে এমন কি সংসারের যাবতীয় কিছুর মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় "বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেবিছে ঈশ্বর"। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় বিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির দিনেও একে অপরকে ভ্রাতৃভাবে আমরা দেখিতে পারিতেছি না। এখনো শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গে কলহ, ছোটতে বড়তে কলহ, হিন্দুতে মুসলমানে কলহ লাগিয়াই আছে। কিন্তু একটু যদি চিন্তা করিতে পারিতাম, উপলব্ধি করিতে পারিতাম তাহা হইলে এই সমস্যাগুলি আর সমস্যাই মনে হইত না। শ্রীমৎ স্বামীজীকে দেখিয়াছি, আমরা যখন একে অপরকে সহ্য করিতে পারি নাই তখন তিনি কেমন অসহায় বালকের মত কাঁদিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে দেখিয়াছি একটা বিরাট বিশ্ব প্রাণের উৎস। শ্রীমৎ স্বামীজী আমাদের আকাশের ভগবানের দিকে তাকাইয়া থাকিতে বলেন নাই, গেরুয়া লইয়া ভাবনাহীন জীবন যাপন করিবার দায়িত্ব দিয়া যান নাই—দিয়া গিয়াছেন তাঁহার বিশ্বের সেবা করিবার অধিকার। এ সেবার দায়িত্ব তিনি সমস্ত মানুষের কাছেই রাখিয়া গিয়াছেন।

আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা। স্বামীজীকে যেদিন প্রথম দেখিয়াছিলাম এবং তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম সেদিন তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই—আজও তাঁহাকে বুঝিতে পারি না। তবু, যতই দিন যাইতেছে ততই মনে হয় তিনি একটু একটু করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। কি দিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইব জানি না। শ্রীমৎ স্বামীজী

আমার গুরু এবং আজ আমার ইষ্টদেবও তিনি। তাঁহার শ্রীচরণ-স্পর্শে নিজেকে ছোট করিয়া ভাবার চিন্তা হইতে মুক্তি পাইয়াছি। স্বামীজীকে দেখিয়াছি তিনি বিশ্বের সমস্ত মানুষকে আপনার করিয়া পাইবার জন্য কেমন ব্যাকুল হইতেন এবং আমাদেরও বর্ণ-জাতি, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকলকেই মনে প্রাণে আপন করিয়া ভাবিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, শুধু উপদেশ নয় ব্যাকুল হইয়াছেন। টিকি, দাঁড়ি, মালাজপের উপর গুরুত্ব তাঁহার কমই ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন এই সব আচার অনুষ্ঠান করিতে গিয়া মানুষ তাহার মূল উদ্দেশ্যকেই হারাইতে বসিয়াছে। ধর্ম পরিণত হইয়াছে যেন প্রাণহীন সংস্কারে। তাই তিনি বর্তমান যুগে জোর দিয়াছেন মন বদলানোর উপর, চরিত্র বদলানোর উপর। যে মানুষ সকল মানুষকে একদেহের দেহে ভাবিতে পারে না, ভাই বলিয়া কাছে টানিতে পারে না, হৃদয়ের ব্যথা হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে পারে না, সে মানুষ যতই বড় হউন না কেন তিনি বর্তমান যুগের জড় পদার্থ বিশেষ, পুরুষোত্তমপথের যাত্রী তিনি নন। আজ স্বামীজী দেহে আমাদের সম্মুখে নাই তবু তিনি আছেন—তত্ত্ব মূর্তিতে তিনি আছেন। আজ বহুধা বিভক্ত সমাজে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। তিনি আমাদের মধ্যে জন্মলাভ করুন, তাঁহার জীবনে জীবন লাভ করিয়া আমরাও তাঁহার মত বিশ্বমানবত্ববোধ লইয়া তাঁহার ধূলির ধরণীর সেবা করিব, আমরাও বিশ্বমানব হইব। সমস্ত জাতি-কুল-শীলের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিশ্বের মানুষকে আপন সহোদর ভাই বলিয়া ভাবিব, ধ্যান করিব। ভূমার ধ্যান করিতে করিতে ভূমা বনিয়া যাইব। ভূমাহীন ভূমির কি আনন্দ? আদর্শহীন বাস্তবের কি মূল্য? গুরুহীন শিষ্যের কি মূল্য? ওগো ভূমার প্রতীক নর-নারায়ণ, আজ তোমার জন্মদিনে তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি। বিশ্বের মানুষ আজ একত্রিত হইবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছে, কিন্তু কোন্ যোগসূত্রে বাঁধিয়া সবাই মিলিবে? আজ যে তোমার দর্শন ও জীবনের বড় প্রয়োজন। তোমার জীবন আমাদের জীবনে অনুস্যূত হউক, তোমার জীবন বিশ্ববাসীর জীবনে দৃঢ়যুক্ত হউক। তোমার জন্ম দিনে আজ তুমি আমাদের দেহ-প্রাণ-মনের শত সহস্র প্রণাম গ্রহণ করো।

ছোট্ট প্রণাম

॥ শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী ॥

আজ এক বৎসর পরে পুনরায় আমরা স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের ৮১ তম জন্মতিথি পালনের জন্য সমবেত হয়েছি। স্বামিজী যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-দর্শনে, আগামী দিনের জন্য তা তিনি সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাঁর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে। জগতে আবহমান কাল থেকে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য রয়েছে ধর্মের মধ্যে, কর্মের মধ্যে, কিন্তু তার মধ্যে যে সমন্বয়ের সূত্রও রয়েছে—এ বলিষ্ঠ চিন্তাধারা এ যুগে একমাত্র শ্রীনিত্যগোপালই উপলব্ধি করেছিলেন আধ্যাত্মিক জগতে। সমন্বয়ের এই সূত্রটী খুঁজে বের করার কৌশল জানাই পুরুষোত্তম সমাজের কাজ। স্বামিজী তার পথ কেটে রেখে গেছেন। স্বামিজীকে আমরা অনেকেই দেখেছি, তাঁর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, বিশেষ করে তাঁর প্রাণ প্রাচুর্যের আকর্ষণে আমরা বিমুগ্ধ। যাঁরা একবার তাঁকে দেখেছেন, তাঁদের পুনরায় তাঁর কাছে না এসে

উপায় ছিল না। আজ আমরা ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে উঠতে পারছি না, সঙ্কীর্ণতার নাগ-পাশে সমাজ-জীবন আজও বন্দী হয়ে আছে, মানুষের প্রাণ আজ শুষ্ক মরুভূমি, সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত—এই বিক্ষুব্ধ সমাজ-জীবনে কি করে ব্যষ্টি-আমিকে বাঁচিয়ে রেখে সমষ্টি-আমি গড়তে হয়, সে কথা বলে গেছেন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ আর শ্রীনিত্যগোপালের বাণী 'I am a cosmopolitan' জগতে দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। সেদিন খুব বেশী দূরে নেই যেদিন সমস্ত মানব বহু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েও একই সমাজ-বৃক্ষ বলে নিজেকে মনে করবে।

স্বামিজী গাঙইহাটিতে দুই বৎসর কাটিয়ে গেছেন। এখানেই তাঁর পবিত্র দেহ সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর চিন্তাধারা বাস্তবে রূপ দেবার ভার তাঁর অনুগামীদের। স্বামিজীর তিরোধানের পরও এ আশ্রমের যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছে, হচ্ছে, তাতে স্বামিজীর জীবন-দর্শনের সফলতা সপ্রমাণিত হচ্ছে। আর যারা স্বামিজীর অনুগামী, অনুরক্ত, শ্রদ্ধাশীল তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত এ আশ্রম তাঁর আদর্শের পীঠস্থান হয়ে উঠুক, আর তাঁর জন্ম-তিথিবাসরে সেই কামনাই করি ধরার ধূলি হোক স্বর্ণধূলি, ধরায় মানুষ হোক শুদ্ধ মানুষ স্বামিজীর এ আকাঙ্ক্ষা সফল হোক। আজ এই দিনে তাঁকে আমার এই ছোট্ট প্রণাম নিবেদন করি। ওঁ হরি ওঁ।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিলাপকুসুমাঞ্জলি

॥ শ্রীসন্তোষ কুমার কুণ্ডু ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তথাহি। পানায় বারি মধুরং নবপাটলাদি—
কর্পূরবাসিততরং তরলাক্ষি দত্ত্বা।
কালে কদা তব ময়াচমনীয়দন্ত—
কাষ্ঠাদিকং প্রণয়তঃ পরমর্পণীয়ম্ ॥৫০॥

অন্বার্থ। পাটলাদি পুষ্প আর কর্পূরবাসিত।
সুমধুর জল দিব পানের নিমিত্ত ॥
আচমন দন্তকাষ্ঠ (দিব) সময়েতে।
সমর্পিব তরলাক্ষি করে প্রণয়েতে ॥ ৫০ ॥

তথাহি। ভোজনস্য সময়ে তব যত্নাৎ
দেবি ধূপনিবহান্ বরগন্ধান্।
বীজনাদ্যমপি সংকণযোগাৎ
হা কদা প্রণয়তঃ প্রণয়ামি ॥ ৫১ ॥

অন্বার্থ। ধূপগন্ধ বীজনাদি ভোজন সময়।
কালযোগ্য সেবা দেবি করিব যতনে ॥ ৫১ ॥

তথাহি। কর্পূরপূরপূরিত নাগবল্লী—
পর্ণাদিপূগপরিকল্পিত বীটিকাং তে।
বক্ত্রাম্বুজে মধুরগাত্রি মুদা কদাহং
প্রোৎফুল্লরোমনিকরৈঃ পরমর্পয়ামি ॥ ৫২ ॥

অন্বার্থ। কর্পূরবাসিত পরিপূর্ণ নাগবল্লীপর্ণা।
গুবাকাদি মিশ্রিত এই বিটিকা সংপূর্ণা ॥
কবে মুখাম্বুজে তোমার সমর্পণ করিব।
প্রফুল্লিত রোমাঞ্চিত আনন্দ হইব ॥ ৫২ ॥

তথাহি। আরাত্রিকেণ ভবতীং কিমু দেবি দেবীং
নির্মঞ্ছয়িষ্যতিতরাং ললিতা প্রমোদাৎ।
অগ্রালয়স্থ নবমঙ্গল গানপুষ্পৈ—
প্রাণার্ব্বুদৈরপি কচৈরপি দাসিকেয়ম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বার্থ। অভিপ্রণয়েতে তোমায় শ্রীললিতা দেবি।
নির্মঞ্ছন করিবেন আরাত্রিতে সেবি ॥
নূতন মঙ্গলদ্রব্য গান আর ছলে।
অস্মসব সখি নির্মিঞ্ছিব কুতুহলে ॥

৫২। নাগবল্লী—তাম্বূল।

৫৩। নির্মঞ্ছন—আরাত্রিক।

এই দাসী প্রাণার্ব্বুদ সহিতে পারে। (কে)
তুয়া বিচ্ছিন্ন কবে করিব হরিষে ॥ ৫৩ ॥

তথাহি। আলীকুলেন ললিতা প্রমুখেন সার্দ্ধং
মানহ্রতী ত্বমিহ নির্ভরনর্ম্মগোষ্ঠীম্।
যৎপালি কল্পিত মনোহর কেলিতল্প—
মাধুর্য্যমিতি কদা শ্রবণেন সেবি ॥ ৫৪ ॥

অস্যার্থ। ললিতাদি সখিসঙ্গে পরম হরিষে।
অতিশয় নর্ম্মগোষ্ঠী হাস পরিহাসে ॥
মনোহর কেলিশয্যা আমাতে কল্পিত।
শ্রবণেতে কবে তাহা করিব তুষিত ॥ ৫৪ ॥

তথাহি। সম্বাহয়িষ্যতি পদৌ তব কিঙ্করীভিঃ
হা রূপমঞ্জরি রসৌ চ করাম্বুজে যে
যস্মিন্ মনোজ্ঞহৃদয়ে সদয়েহনয়োঃ কিং
শ্রীমান্ ভবিষ্যতি তরাং শুভবাসরঃ সঃ ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থ। এই কিঙ্করির কবে হেন দিন হব।
তুয়া পাদপদ্মযুগ সেবন করিব ॥
শ্রীরূপমঞ্জরীরত করাম্বুজ দুই।
সম্বাহন করিব যবে শুভদিন সেই ॥
অতিশয় শ্রীমতি কি হেন দিন হব।
এই মুঞি দাসীর কবে শুভ দিন হব ॥ ৫৫ ॥

তথাহি। তবোদ্গীর্ণং ভোজ্যং সুমুখি কিল কল্লোলসলিল
তথা পাদাম্ভোজামৃতমিহ ময়া ভক্তিলতয়া।
অয়ি প্রেম্ণা সার্দ্ধং প্রণয়িজনবর্গৈর্বহুবিধৈ-
র্মহো লভ্যং কিং প্রচুরতর ভাগ্যোদয়বশৈঃ ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থ। ভক্তিলতা হৈঞা তোমার উচ্ছিষ্ট চর্ব্বিত।
কল্লোল সলিল আর পদাম্বুজামৃত ॥
বহুবিধ সখীজন সঙ্গে কুতূহলে।
কবে বা লভিব ইহা মহাভাগ্যবলে ॥ ৫৬ ॥

তথাহি। ভোজনাবসরে দেহি স্নেহেন স্বমুখাম্বুজাৎ।
মহ্যং স্বগত চিত্তায়ৈ কিং সুধাং প্রদাস্যতি ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থ। ভোজনের অবসরে মোহে স্নেহ করি।
স্বমুখ হইতে সুধা উচ্ছিষ্ট মাধুরি ॥
নিজপাদগত চিত্ত আমার জানিয়া।
কবে মোর মুখে দিবে কিঙ্করী বলিয়া ॥ ৫৭ ॥

তথাহি। অপি বত রসবত্যাঃ সিদ্ধয়ে মাধবস্য
ব্রজপতিপুরমুদ্যৎপ্রেমরোমা ব্রজন্তী।
স্খলিতগতিরুদঞ্চৎ স্বান্তদৌস্থ্যেন কিং মে
কচিদপি নয়নাভ্যাং লপ্স্যসে স্বামিনিত্থম্ ॥ ৫৮ ॥

অস্যার্থ। রোমাঞ্চিত অঙ্গ হৈঞা নন্দের ভুবনে।
কৃষ্ণের পাকসিদ্ধ লাগি করিবে গমনে ॥
উন্মত্ত হইবে তোমার মনের আনন্দ।
স্খলিত হইবে গতি যাবে মন্দ মন্দ ॥
কখন সময়ে হেন হইবে আমার।
দুনয়নে হেন লীলা দেখিব তোমার ॥ ৫৮ ॥

তথাহি। পার্শ্বদ্বয়ে ললিতয়াথ বিশাখয়া চ
স্বাং সর্ব্বতঃ পরিবৃতৈশ্চ সখৈঃ সখীতাম্।
পশ্চান্ময়া বিকৃতগুরুমধ্যভাগাং
কিং রূপমঞ্জরিরিয়ং পথি নেষ্যতীহ ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থ। দুই পাশে ললিতা বিশাখা দুইজনে।
সর্ব্বদিগে বেষ্টিত অন্য সর্ব্ব সখিগণে ॥
পশ্চাতে যাইব আমি তোমার আশ্রয়।
ক্ষীণমধ্যভারে পাছে ধরি সেই ভয় ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তোমার আগে পথে।
নন্দের মন্দিরে লৈঞা যাবে আনন্দিতে ॥ ৫৯ ॥

তথাহি। হম্বারবৈরিহ গবামপি বল্লবানাং
কোলাহলৈর্বিবিধবন্দি কলাবতাং তৈঃ।
সম্রাজতে প্রিয়তয়া ব্রজরাজসূনো—
র্গোবর্দ্ধনাদপি গুরু-র্ব্রজবন্দিতাদ্ যঃ ॥ ৬০ ॥

অস্যার্থ। গো সমূহে হাম্বারব দূরে হৈতে শুনি।
গোপসব কোলাহল করে মহাধ্বনি।
নানাবিধ বন্দীগণ পড়ে কায়বার।
গাননৃত্য সদা হয় বিবিধ প্রকার ॥
ব্রজরাজনন্দনের যাহাতে পিরিত।
নন্দীশ্বর গিরিবর অতি বিরাজিত ॥
ব্রজের বন্দিত হয় গোবর্দ্ধন গিরি।
তাহাতে অধিক গুরু নন্দীশ্বর হরিঃ ॥ ৬০ ॥

৫৫। শ্রীমান্—শোভন।

৫৯। ক্ষীণমধ্যভারে—পয়োধরবশতঃ বক্র কটিদেশ।

তথাহি। প্রাপ্তাং নিজপ্রণয়িনী প্রকরৈঃ পরীতাং
নন্দীশ্বরং ব্রজমহেন্দ্রমহালয়ং তম্।
দূরে নিরীক্ষ্য মুদিতা ত্বরিতং ধনিষ্ঠা
ত্বামানয়িষ্যতি কদা প্রণয়ৈর্মমাগ্রে ॥ ৬১ ॥

অন্তার্থ। চৌদিগে বেষ্টিত নিজ প্রিয় সখীগণে।
প্রাপ্ত হই নন্দীশ্বর নন্দের ভুবনে ॥
দূরে হৈতে দেখি তোমায় ধনিষ্ঠা ত্বরিতে।
আনন্দে লইব কবে আমার আগেতে ॥৬১॥

তথাহি। প্রক্ষাল্য পাদকমলে কুশলে প্রবিষ্টা
নত্বা ব্রজেশমহিষী প্রভৃতির্গুরূস্তাঃ।
হা কুর্ব্বতী রসবতীং রসভাক্ কদা ত্বং
সংমজ্জয়িষ্যসিতরাং সুখসাগরে মাম্ ॥ ৬২ ॥

অন্তার্থ। ব্রজেন্দ্রমহিষী আদি যত গুরুজনে।
নমস্কার করি আগে সবার চরণে ॥
কমল চরণ আগে প্রক্ষালন করি।
রসবতি প্রবিষ্ট হইব রসে ভরি।
এই রূপে নিজ লীলা দর্শন করাইবে।
সুখের সাগরে আমা কবে ডুবাইবে ॥ ৬২ ॥

তথাহি। মাধবায় নতবক্ত্র মাধুরী
ভোজ্য-পেয়-রসসঞ্চয়ং ক্রমাৎ।
ত্বরতী ত্বমিহ রোহিণীকরে
দেবী ফুল্লবদনং কদেক্ষ্যসে ॥ ৬৩ ॥

অন্তার্থ। ভোজ্যাদের সব রস ক্রমেতে করিয়া।
কৃষ্ণের নিমিত্ত সব নতমুখ হৈঞা ॥
রোহিণীর করে দিবে প্রফুল্ল বদনে।
তাহা দেখি কবে মুঞি দেখিব নয়নে ॥ ৬৩ ॥

তথাহি। ভোজনে গুরুসভাসু কথঞ্চি-
ন্মাধবেন নতদৃষ্টি মহোৎকম্।
বীক্ষ্যমাণমিহ তে মুখপদ্মং
মোদয়িষ্যতি কদা মধুরে মাম্ ॥ ৬৪ ॥

অন্তার্থ। গুরু সভায় বসি কৃষ্ণ করেন ভোজন।
ছলে তুয়ামুখপদ্ম করেন দর্শন ॥
নতদৃষ্টি মহোৎকণ্ঠ মুখপদ্ম আভা
কবে মোরে আমোদ করাবে সেই শোভা ॥৬৪॥

তথাহি। অপি বিপিনমটন্তং সৌরভেয়ী কুলানাং
ব্রজনৃপতি কুমারং রক্ষণে দীক্ষিতং তম্।
বিকল মতি জনন্যা লাল্যমানং কদা ত্বং
স্মিতমধুর কপোলং বীক্ষসে ক্ষোভমাণা ॥ ৬৫॥

অন্তার্থ। সুরভীর কুলে হৈঞাছে দীক্ষিত।
বিপিন গমনকালে ব্রজপতিসুত ॥
বিকল জননী লালন করেন শ্রীকৃষ্ণ।
স্মিত মধুর কপোল তোমার দর্শনে সতৃষ্ণ ॥
সেই রূপে কবে তোমা দর্শন করিব।
এই দাসীর হেন দশা কত দিনে হব ॥৬৫॥

তথাহি। গোষ্ঠে শপথ কুতুকাচ্ছপথাদিপূর্ব্বৈঃ
স্নিগ্ধা সুমুখি মাতৃপরার্ধতোঽপি।
হা শ্রীমতি প্রিয়গণৈঃ সহ ভোজ্যমানাং
কিং ত্বাং নিরীক্ষ্য হৃদয়ে মুদমত্র লপ্স্যে। ৬৬।

অন্তার্থ। মাতৃকোটী হৈতে স্নিগ্ধা মাতা যশোমতি।
কৌতুকে দিবেন তেঁহো কত শপতি ॥
ভোজন করাইবে তোমা সখিগণ সঙ্গে।
লজ্জাযুক্ত হৈঞা ভোজন করিবে তুমি রঙ্গে ॥
হে সুমুখি ইহা আমি দর্শন করিব।
আনন্দ হৃদয়ে আমি মহাসুখ পাব ॥৬৬।

তথাহি। আলিঙ্গনেন শিরসঃ পরিচুম্বনেন
স্নেহাবলোকন ভরেণ চ খঞ্জনাক্ষি।
গোষ্ঠেশয়া নববধূমিব লাল্যমানাং
ত্বাং প্রেক্ষ্য কিং হৃদি মহোৎসবমাতনিষ্যে ॥৬৭॥

অন্তার্থ। গোষ্ঠেশ্বরী তোমা নববধূপ্রায় মানি।
লালন করিব বহু স্নেহে ঠাকুরাণী ॥
আলিঙ্গন চুম্বন মস্তকাঘ্রাণ হৈঞা।
স্নেহভাবে অবলোকন মহাসুখী হৈঞা ॥
হেনরূপে তোমা আমি নিরীক্ষণ করি।
হৃদয়ে বাড়িব কবে আনন্দ লহরী ॥৬৭॥

তথাহি। হা রূপমঞ্জরি সখী প্রণয়েন দেবীং
ত্বদ্বাহুদত্ত ভুজবল্লরি মাত্তশাকীম্।

৬২। রসবতি—পাকশালা

৬২। রসে ভরি—ঘর্মাক্ত হয়ে।

পশ্চাদহং কলিতকামতরঙ্গরঙ্গাং
নেষ্যামি কিং হরিবিভূষিত কেলিকুঞ্জম্ ॥৬৮॥

অস্যার্থ। হে রূপ মঞ্জরী সখী তোমার প্রণয়িতা।
তুয়া স্নেহে দিব দেখি নিকুঞ্জ লতা ॥
চঞ্চল দীঘল আঁখী চাহি চারিপানে।
মত্ত মাতঙ্গ গতি করিব গমনে ॥
কামরসে রঞ্জিত অঙ্গ সুশোভন।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি করিব গমন ॥
কৃষ্ণেতে ভূষিত কেলি কুঞ্জে কবে নিব।
হেন দশা এ দাসীর কতদিনে হব ॥৬৮॥

তথাহি। সাকং ত্বয়া সখি নিকুঞ্জগৃহে সরস্যাঃ
স্বস্যাস্তটে কুসুমভাবিত ভূষণেন।
শৃঙ্গারিতং বিদধতী প্রিয়মীশ্বরী সা
হাহা ভবিষ্যতি মদীক্ষণ গোচরঃ কিম্ ॥৬৯॥

অস্যার্থ। রাধাকুণ্ড তটে নিজ কুঞ্জমন্দিরেতে।
হে রূপমঞ্জরি সখি তোমার সহিতে ॥
নানা পুষ্প সুশোভিত নানা ভূষণেতে।
সখীশ্বরীর শৃঙ্গার করিব যতনেতে ॥
সে ঈশ্বরী নয়নগোচর কি হইব।
হাহা এ দাসীর কি এমন দিন হব ॥৬৯॥

তথাহি। শ্রুত্বা বিচক্ষণমুখাদ্ ব্রজরাজসূনোঃ
শাস্তাভিসার সময়ং সুভগেহত্র হৃষ্টা।
সূক্ষ্মাম্বরৈঃ কুসুম সংস্কৃত কর্ণপুর
হারাদিভিশ্চ ভবতীং কিমলঙ্করিষ্যে ॥৭০॥

অস্যার্থ। ব্রজরাজনন্দনের শুভ অভিসার।
শুনি বিচক্ষণ মুখে আনন্দ অপার ॥
নানাফুলে সংস্কৃত কর্ণপুর হার।
সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান নানা অলঙ্কার ॥
সহজে সুভগা তুমি ভূষিত ভূষণে।
কবে অলঙ্কৃত আমি করিব যতনে ॥৭০॥

তথাহি। নানাপুষ্পৈঃ কণিত মধুপৈর্দেবি সংভাবিতাভি-
র্মালাভি স্তদ্গুণ বিলসৎ কাম চিত্রালিভিশ্চ।
রাজদ্বারে সপদি মদনানন্দ দাভিখ্যগেহে
মল্লীজালৈঃ শশিমুখি কদা তল্পমাকল্পয়ামি ॥৭১॥

অস্যার্থ। মদনানন্দদানাম কুঞ্জ গৃহদ্বারে।
নানা পুষ্পবিকশিত ভ্রমর ঝঙ্কারে ॥
তাহাতে গ্রথিত মালা কুসুমে রচিত।
বিলসিত কাম চিত্রাবলিতে শোভিত ॥
কোমল মল্লিকা পুষ্পে কবে শশিমুখি।
কতক্ষণে করিব তল্প হৈঞা মহা সুখি ॥৭১॥

তথাহি। শ্রীরূপমঞ্জরিকরার্চিত পাদপদ্ম
গোষ্ঠেন্দ্র নন্দন ভুজার্পিতমস্তকায়াঃ।
হা মোদতঃ কনকগৌরি পদারবিন্দ—
সম্বাহনানি শনকৈস্তব কিং করিষ্যে ॥৭২॥

অস্যার্থ। শ্রীরূপমঞ্জরী করে অর্চিব চরণে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন করে শির অবলম্বন ॥
সেই পাদপদ্মযুগ অঙ্ক করি।
সম্বাহন করিব কবে তুয়া অনুচরী ॥৭২॥

তথাহি। গোবর্দ্ধনাদ্রি নিকটে মুকুটেন নর্ম-
লীলা-বিদগ্ধশিরসাং মধুসূদনেন।
দানচ্ছলেন ভবতীমবরুধ্যমানাং
দ্রক্ষ্যামি কিং ভ্রুকুটি দর্শিত নেত্রযুগ্মম্ ॥৭৩॥

অস্যার্থ। রসিক মুকুটমণি রসের নাগর।
সব রসে বিদগ্ধ রসের সাগর ॥
দানছল করি তোমা করিব রোধন।
গোবর্দ্ধন গিরিতটে শ্রীমধুসূদন ॥
দর্পতোমার ভ্রুকুটি কুটিল দুনয়ন।
কামপঞ্চশরে তুমি পুরিবে সন্ধান ॥
সে সময়ে নয়নে দেখিব আমি কবে।
এ দাসীর এমন যে দশা কবে হবে ॥ ৭৩ ॥

তথাহি। তব তনুবর গন্ধা সঙ্গিবাতেন চন্দ্রা-
বলিকর কৃতমৈত্রী কেলিতল্পাচ্ছলেন।

৭০। সুভগা—সৌভাগ্যবতী

৭১। তল্প—শয্যা।

৭২। যে সময় শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা করছেন এবং তুমি তাঁর বাহুতে মস্তক স্থাপন করে আছ সে সময় আমি কি আনন্দ চিত্তে তোমার চরণ কমল ধীরে ধীরে সেবা করবো।

মধুরমধুরি মুকুন্দং কুণ্ডতীরে মিলন্তং
মধুপমিব কদাহং বীক্ষ্য দর্পং করিষ্যে ॥ ৭৪ ॥

অস্যার্থ। ভৃঙ্গাঙ্গনাগণ সঙ্গে অলের বাহুতে।
চন্দ্রাবলি কুঞ্জ যদি খেলিবার হেতে ॥
ভ্রমরের প্রায় কৃষ্ণ উঠিয়া বসিব।
তবে আমি কুণ্ড তীরে তোমারে মিলিব।
তাহা দেখি কবে আমি অতি দর্প করি।
অহে মধুমুখি আশা করে অনুচরি ॥ ৭৪ ॥

তথাহি। সামন্তভ্রমদ্ভ্রমরমুকুলবকাবলিনটৈঃ।
সংনমদ্যোতৈর্যদপি বিহগরাবৈরপি পরম্।
সখীবৃন্দৈঃ গীতৈঃ সবদি মধুরে প্রাণপতিনা
কদা ক্রীড়াময়ে শশিমুখি মদং কেলিনিবহম্ ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থ। চৌদিকে উন্মত্ত অলী ফুলের বাহার।
বিকসিত পদ্ম মদমত্তীর বাহার।
সখীগণ সঙ্গে সুমধুর সরোবরে।
প্রাণপতি সঙ্গে তুমি করিবে বিহারে ॥
শুন শশিমুখি সব সে কেলিমাধুরী।
কবে আমি দেখিব নয়ন পূর্ণ করি ॥ ৭৫ ॥

তথাহি। সরোবরসুতটে মধুপগুঞ্জিতকুঞ্জান্তরে
স্ফুটৎ কুসুমসঙ্কুলে বিবিধপুষ্পসংঘৈর্ময়া।
অয়ি প্রতিদিনং কদা তব সরোজ কুমারিকে-
বিধাস্যত ইহ প্রিয়ং মম সুধাধিরাজ্যতা। ৭৬ ॥

অস্যার্থ: সরোবর তটশোভা পরম সুন্দর।
বিকশিত নানা ফুল গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
কুঞ্জমাঝে বিবিধ কুসুম তুলি আনি।
ভূষণ করিব তোমার নাগর আপনি ॥
কবে সুখসিন্ধু মোর বিস্তার হইব।
শ্রীকৃষ্ণ সহিতে তোমা কবে নিরখিব। ৭৬ ॥

তথাহি। ক্রীড়াব্যগ্রে কদাচিৎ সরভসমতিবেগোর্পিতাদৈ-
র্মদোগ্র
নানাপুষ্পোরকুঞ্জাকলনিতবনমধ্যেবিশিষ্ট
প্রণতৈঃ।
লোকক্ষপ্যৈঃ প্রচামানঃ কৃতকচি হরিণোৎকুঞ্জপুঞ্জঃ
স্বদস্যাঃ
আমিস্রাঃ কেশপাশঃ কিমু মম নয়নানন্দ-
মুচ্চৈর্বিধাতা ॥ ৭৭ ॥

অস্যার্থ। সখিগণ কৌতুকেতে প্রফুল্লিত মনে।
অতিবে কেলির লাগি নানা ফুল আনে ॥
কেহ অর্ধবিকশিত নানা পুষ্প তুলি।
আনি কৃষ্ণ করে দেই কেহ কুন্তলাবলি ॥
কেহ নব নব শিখি পিচ্ছ দেই আনি।
লোভকম্পিত কৃষ্ণ বেশ করেন আপনি ॥
কৃষ্ণ রুচি দেখি অতি প্রফুল্লিত মন।
কেশ পাশ দেখি বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ।
হে স্বামিনী কেন তোমার কেশ দেখি।
আত্মানন্দ ভরিত মোর দুই আঁখি ॥ ৭৭ ॥

তথাহি। যাবৎ মদনকেলিবিভ্রমে মত্তয়া সখিভিরেব কৃতা।
তাড়িতং মুখি বীক্ষ্য কিঞ্চিৎ গূঢ়হাস্যবদনা
অঙ্গভূতি ॥ ৭৮ ॥

অস্যার্থ। মাধবের কামকেলি বিভ্রম দেখিয়া
মহামত্ত হৈয়া সব নিজহস্তে লৈঞা ॥
শ্রীকৃষ্ণ তাড়ন তুমি করিবে সুমুখি।
গূঢ়হাস্যবদনা হইব তাহা দেখি ॥ ৭৮ ॥

তথাহি। সুললিত নিজ বাহ্বাশ্লিষ্টগোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ
সুললিততর বাহ্বাশ্লিষ্টনীপাগ্রশাখা।
মধুরমদনগানং তন্বতী তেন সার্দ্ধং
সুবদনমুখি মুদং মে হা কদা দাস্যসি ত্বং ॥ ৭৯ ॥

অস্যার্থ। নিজবাহু দুই তোমার অতি সুললিত।
তাতে আলিঙ্গিত হবে ব্রজপতি সুত।
সুললিত তব বাহু তাতে আলিঙ্গিতা।
নীপবান নতশাখা তাহাতে শোভিতা ॥
মধুরমদনগান কৃষ্ণের সহিতে।
গানিয়া সুমুখি কবে সুখ দিবে চিত্তে ॥ ৭৯ ॥

তথাহি। ক্রিয়া পাশকখেলায়াম্ অক্ষেণ মুরলীং হরেঃ।
কিম্বাং যদি ময়া দেবি গোপয়িষ্যামি তাং কদা।
॥ ৮০ ॥

অস্যার্থ। পাশক খেলাতে কবে কৃষ্ণকে জিনিঞা
মুরলী কেলিয়া দিবে তারে লুকাইঞা ॥

৭৪। কেলিতল্প—বিলাস শয্যা।

তব শশিমুখি কবে মধু উপজিব।
মুরলী পাইঞা আমি গোপন করিব ॥ ৮০ ॥

তথাহি। অয়ি সুমুখি কদাং মালতীকেলিতল্পে
মধুর মধুর গোষ্ঠীং বিভ্রতীং বল্লভেন।
মনসিজসুখদেহস্মিন্মন্দিরে স্মেরগণ্ডাং
সপুলকতনুরেষা ত্বাং কদা বীজয়ামি ॥ ৮১ ॥

অস্যার্থ। মদনসুখদানানন্দকুঞ্জের ভিতরে।
মালতীর কেলিশয্যা তাহার মন্দিরে॥
মধুর মধুর গোষ্ঠী বল্লভ সহিতে।
হাস্যযুক্ত গণ্ডস্থল পুলক সহিতে॥
অনন্দেখি কবে মোর হেন ভাগ্য হব।
বীজন লইঞা কবে বাতাস করিব ॥ ৮১ ॥

তথাহি। আয়াতোদ্যৎ কমলবদনে হন্ত লীলাভিসারাৎ
পথ্যাটোপৈঃ ভ্রমবিলুলিতং দেবি পাদাব্জযুগ্মম্।
স্নেহাৎসম্বাহয়িতুমপি হ্রীপুর[illegible]পাদপদ্মং
নামগ্রাহং নিজজনমিমং হা কদা নোৎস্যসি ত্বম্ ॥
॥ ৮২ ॥

অস্যার্থ। হে কমলমুখি লীলা অভিসার হৈতে।
আসিতে গমন পথ বিক্ষেপ করিতে॥
শ্রীমতি আপন পাদ কমল যুগল।
সম্বাহন লাগি মোরে বলিবে সকল॥
লজ্জাযুক্ত হৈয়া শেষে আনন্দিতপ্রায়।
স্নেহ করি নাম ধরি ডাকিবে আমায়॥
নিজজন আমি হই জানিলে তখন।
কবে পাদসেবায় প্রবেশিবে এইজন ॥ ৮২ ॥

তথাহি। হা নপ্ত্রি রাধে তব সূর্য্যভক্তেঃ
কালঃ সমুৎপন্ন ইতঃ কুতোহসি।
ইতীব রোষান্মুখরা লপন্তী
সুখেন কিং মাং সুখয়িষ্যতীহ ॥৮৩॥

অস্যার্থ। হা নাতিনী রাধিকে তুমি আছ কোথা।
সূর্য্যপূজাকাল সমুৎপন্ন হৈল এথা॥
ক্রোধ করি মুখরা ডাকিবে আসি তোমা।
সুধাপ্রায় সিঞ্চন করিবে কবে আমা ॥৮৩॥

তথাহি। দেবি ভাষিতপীযূষং স্মিতকর্পূরবাসিতম্।
শ্রোত্রাভ্যাং নয়নাভ্যাং তে কিং নু সেবিষ্যতে
ময়া ॥৮৪॥

অস্যার্থ। দেবি রাধি তোমার অমৃত লহরী।
হাস্যকর্পূরে মিশ্রিত সুগন্ধমাধুরী॥
শ্রবণে নয়নে কবে করিব সেবন।
সদাকর সুধামুখি লইনু শরণ ॥৮৪॥

তথাহি। কুসুমচয়ন খেলাং কুর্ব্বতী ত্বং সখীভি
র্বনকুটিল সখীভিঃ প্রাণনাথেন সার্দ্ধম্।
কপট কলহ কেল্যা কাপি রোষেণ ভিন্না
মম মদমতিরেবং ধাস্যসে হ্রস্তে কিম্ ॥৮৫॥

অস্যার্থ। বনের কুটিল সখিগণ করি সঙ্গে।
পুষ্প তোলা খেলা কর প্রাণনাথ সঙ্গে॥
কপট কলহ খেলা যখন করিবে।
রোষে ভিন্ন হৈঞা মোর মোহ বিস্তারিবে ॥৮৫॥

তথাহি। নানাবিধৈঃ [illegible]
সংপ্রার্থিতঃ প্রিয়তমা তব মাধবেন।
তত্রানিকর বিধয়ে সদয়ে মনোজ্ঞং
বাদ্যঃ পতিষ্যতি কদা ললিতাপদাগ্রে ॥৮৬॥

অস্যার্থ। তুয়া মানভঙ্গলাগি শ্রীকৃষ্ণ আমারে।
প্রীতকরি নানাবিধ পাত্র বাদ্য করে॥
অসংখ্য বাদ্যতা শুনি শুনহ সদায়।
বাদ্য হৈঞা পড়িব কবে ললিতার পায় ॥৮৬॥

তথাহি। প্রীত্যা মঙ্গলগীতনৃত্যবিলসদ্বীণাদিবাদ্যোৎসবৈঃ
শুদ্ধানাং পয়সাং ঘটৈর্বহুবিধৈঃ সংবাসিতানাং শুভম্।
বৃন্দারণ্যমহাধিপত্যবিধয়ে যঃ পৌর্ণমাস্যা স্বয়ং
ধীরে সং বিহিতঃ স কিং তব মহাসেকো ময়া
আলক্ষ্যতে ॥৮৭॥

অস্যার্থ। নৃত্যগীতমঙ্গলাদি বিবিধ সাজন।
বীণাদন্দ মৃদঙ্গাদি বিবিধ বাজন॥
নির্ম্মল সুনীর সুবাসিত কুম্ভ ভরি।
বহুবিধ ঘট আনি অভিষেক করি॥
বৃন্দাবনে আধিপত্য সমগ্র করিলে।
পৌর্ণমাসী মহোৎসব করিব আপনে॥
সেই মহোৎসব কবে দর্শন করিব।

মনোহরী ঠাকুরাণী কেন দিন কি হইবে ॥৮৭॥

তথাহি। ভ্রাতা গোষ্ঠভুবঃ মধূৎসবে যেতেন সদাগ্রহং
শ্রীদাম্না কৃপণাং প্রবোধ্য জটিলাং রক্ষাভিধে পর্বণি।
নীতায়াঃ সুখশোকরোদনভরৈ-স্তেনঃস্রবস্থায়াঃ
পরম্।
বাৎসল্যাজ্জনকৌ বিধাস্যত ইতঃ কিং লালনং
স্নেহপ্লুতঃ ॥৮৮॥

অস্যার্থ। রাখিপৌর্ণমাসি মহোৎসব তরে।
ভ্রাতা তোমার শ্রীদাম আসিয়া লৈতে যবে ॥
গোষ্ঠে আনিয়া দিবা জটিলা বুঝিয়া।
যে মধুবনে যেতে তোমা যাব লৈঞা ॥
ঘরে যাঞা সুখশোক রোদনের ভরে।
চুম্বিত হবে তুমি পরম আদরে ॥
জনক-জননী তোমারে অতি বাৎসল্যেতে।
লালন করিবে কবে আমার অগ্রেতে ॥৮৮॥

তথাহি। লজ্জয়ালিপুরতঃ পরতো মাং গহ্বরং গিরিপতের্বত
নীত্বা।
দিব্যগানমপি তৎ স্বরভেদং শিক্ষয়িষ্যসি কদা
সদয়ে ত্বম্ ॥৮৯॥

অস্যার্থ। লজ্জা ছাড়ি সখিগণের সাক্ষাতে লৈতে নারে।
অতএব লইবে গিরি পতির গর্তেরে ॥
দিব্যগান স্বরভেদ মোরে শিখাইবে।
সদয়হৃদয় তুমি কবে দয়া হবে ॥৮৯॥

তথাহি। যাচিতা ললিতয়া কিল দেব্যা লজ্জয়া নতমুখীং
শপথো মাম্।
দেবি দীব্যরসকাব্য কদম্বং পাঠয়িষ্যসি
কদা প্রণয়েন ॥৯০॥

অস্যার্থ। নিশ্চয় ললিতা দেবি যাচিয়া লইব।
শপথেতে নতমুখি লজ্জাতে হইব ॥
দিব্যকাব্যকলা মোরে কবে পড়াইবে।
প্রণয়েতে স্নেহ করি কবে শিখাইবে ॥৯০॥

তথাহি। নিজকুণ্ডতটী কুঞ্জে গুঞ্জদ্ভ্রমরসঙ্কুলে।
দেবি ত্বং কচ্ছপীশিক্ষাং কদা মাং কারয়িষ্যসি ॥৯১॥

অস্যার্থ। নিজকুণ্ডতটী কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জরে।
কবে দেবী বীণা শিক্ষা করাইবে মোরে ॥৯১॥

তথাহি। বিলাসৈস্ত্রুটিতং হারং গুম্ফিতুং দয়িতং কদা।
সখীনাং লজ্জয়া দেবি সংজ্ঞয়া মাং নিদেক্ষ্যসি ॥৯২॥

অস্যার্থ। বিলাসেতে ছিন্ন হার তোমার ত্রুটিবে।
সখির লজ্জাতে কবে মোরে নির্দ্দেশিবে ॥৯২॥

তথাহি। স্বমুখান্মুখে দেবি কদা তাম্বুলচর্ব্বিতম্।
স্নেহাৎ সর্ব্বদিশো বীক্ষ্য সদয়ে মাং প্রদাস্যসি ॥৯৩॥

অস্যার্থ। তাম্বুল চর্ব্বিত কবে স্বমুখ হইতে।
স্নেহেতে সদয়ে দিবে আমার মুখেতে ॥৯৩॥

তথাহি। নিবিড়মদনযুদ্ধে প্রাণনাথেন সার্দ্ধং
দলিত মধুর কাঞ্চী যা ময়াবিষ্কৃতাসীৎ।
শশিমুখি সদয়ে তাং চন্দ্রশালোকথ্যা
স্মরিতমিহ তদর্থং কিং ত্বয়াহং প্রহেয়া ॥৯৪॥

অস্যার্থ। নিবিড় মদন যুদ্ধে প্রাণনাথের সঙ্গে।
বিচ্যুত হইবে প্রিয় কাঞ্চীর রঙ্গে।
সদয়ে খুঁজিতে তাহা মনে স্মৃতি হবে।
ইঙ্গিতে আনিতে তাহা মোরে পাঠাইবে ॥৯৪॥

তথাহি। কেনাপি দোষলবমাত্রলবেন দেবি
সন্তাড়িতাম ইহ বীরবরে রুষোচ্চৈঃ।
রোষেণ তল্ললিতয়া কিল নীয়মানঃ
সংপ্রেক্ষতে কিমু মনাক্ সদয়ং জনোঽহম্ ॥৯৫॥

অস্যার্থ। কোনদোষ লবমাত্রে একদিন মোরে।
তাড়ন করিব ধীর মত্তে ক্রোধ ভরে ॥
ক্রোধ করি ললিতা আনিব তোমার স্থানে
সদয় হইয়া কি চাহিব এই মনে ॥৯৫॥

তথাহি। তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্ ॥৯৬॥

অস্যার্থ। তোমার আমি তোমার আমি আর কারু নই।
তোমা বিনু নাহি জিয়ে নিবেদিয়ে তোই ॥
ইহা জানি দেবি তুমি মোরে কৃপা করি।
নিজপাদপদ্ম নিকট রাখ অনুচরী ॥৯৬॥

তথাহি। স্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়াঃ সদাস্পদম্।

অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতিঃ ॥৯৭॥

অস্যার্থ। শুনহ লোলাক্ষি তুমি নিজ কুণ্ড বটে।
প্রিয়া সহ সদা থাক ইহার নিকটে ॥
এই আমার বাসস্থান এই আমার স্থিতি।
কুণ্ডবিনে অন্যত্রতে নাহি মোর গতি ॥৯৭॥

তথাহি। হে শ্রীসরোবর সদা ত্বয়ি সা মদীশা
প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ
ত্বঞ্চেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতীমাং
হা দর্শয়াশু কৃপয়া মম জীবিতং তাম্ ॥৯৮॥

অস্যার্থ। হে সরোবর সদা ঈশ্বরী তোমাতে।
কামরঙ্গ ক্রীড়া করেন প্রেষ্ঠের সহিতে ॥
তুমি সে প্রিয় যদি হইতে দোঁহাকার।
কৃপা করি দরশন করাহ একবার ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
মদীশ্বরী দরশন করাহ নিজনাথ ॥৯৮॥

তথাহি। ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবী
ত্বমসি সমবয়স্ত্বান্নর্ম্মভূমির্যদস্যাঃ।
ইতি সুমুখি বিশাখে দর্শয়িত্বা মদীশাং
মম বিরহহতায়াঃ প্রাণরক্ষাং কুরুষ ॥৯৯॥

অস্যার্থ। হে সুমুখি বিশাখে তোমার পদ সেবি।
ক্ষণমাত্র তোমার সঙ্গ নাহি ছাড়ে দেবী ॥
তুমি সমবয়া তেঞি হও নর্ম্মস্থান।
বিরহেতে হত মুঞি রক্ষা কর প্রাণ ॥৯৯॥

তথাহি। হা নাথ গোকুল সুধাকর সুপ্রসন্ন
বক্ত্রারবিন্দ মধুরস্মিত হে কৃপার্দ্র।
যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ারাৎ
তত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায় ॥১০০॥

অস্যার্থ। হে গোকুল সুধাকর হাহা রাধানাথ।
সুপ্রসন্ন মুখাম্বুজ মধুর হাস্য সাথ ॥
যেখানে বিহার কর প্রিয়ার সহিতে।
কৃপা করি লেহ মোরে প্রিয় সেবনেতে ॥
অভিপ্রায়েতে প্রিয়া সহ সুখ করে।
সেখানে সে রূপ দোঁহার করে চলে মোরে ॥ ১০০ ॥

তথাহি। লক্ষ্মীর্যদঙ্ঘ্রি কমলস্য নখাঞ্চলস্য
সৌন্দর্যবিন্দুমপি নার্হতি লব্ধুমীশে।
সা ত্বং বিধাস্যসি ন চেন্মম নেত্রদানং
কিং জীবিতেন মম দুঃখদবাগ্নিদেন ॥ ১০১ ॥

অস্যার্থ। লক্ষ্মী যার পাদপদ্ম নখাঞ্চলের রূপ।
বিন্দু পাইবার যোগ্য না হৈল স্বরূপ।
হেন ঠাকুরাণী যদি দয়া না করিবে।
মোর প্রতি শুভ নেত্রে যদি না চাহিবে ॥
তবে মোর কোন কাজ এ ছার জীবনে।
সদাই পোড়য়ে তোহেঁ দুঃখ দাবাগুনে ॥ ১০১ ॥

তথাহি। আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥ ১০২ ॥

অস্যার্থ। অমৃতসিন্ধু আশাভরে গেল এত কাল।
সম্প্রতি এখন যদি না হবে দয়াল।
তুমি যদি কৃপাময়ি কৃপা না করিবে।
কিবা প্রাণে ব্রজেকৃষ্ণ চরণে কি হবে ॥১০২॥

তথাহি। ত্বঞ্চেৎ কৃপাময়ি কৃপাং ময়ি দুঃখিতায়াং
নৈবাতনোরতিতরাং কিমিহ প্রলাপৈঃ।
ত্বৎকুণ্ড মধ্যমপি তদ্ধ্রুবকালমেব
সংসেব্য মানমপি কিংনু করিষ্যতীহ ॥১০৩॥

অস্যার্থ। মুঞি দুঃখ জনে যদি দয়া না হইল।
পাপ বল মোর কোন কার্য্যে আইল ॥
তুয়া কুণ্ডে স্থিতি আর বহুকাল সেবন।
করিলে কি নহিবে তুয়া কৃপার ভাজন ॥১০৩॥

তথাহি। অয়ি প্রণয়শালিনি প্রণয়পুষ্টদাস্যাপ্তয়ে
প্রকামমতিরোদনৈঃ প্রচুর দুঃখ দগ্ধাত্মনা।
বিলাপকুসুমাঞ্জলি র্হৃদি নিধায় পাদাম্বুজে
ময়া বত সমর্পিতস্তব তনোতু তুষ্টিংমনাক্ ॥১০৪॥

অস্যার্থ। প্রণয়শালিনী অয়ি প্রণয়তুষ্টিদাস্যে।
প্রাণের উপায় করি কাম অভিলাষে ॥

৯৭। লোলাক্ষি—চঞ্চলনয়নী

৯৯। নর্ম্মস্থান—কেলিস্থান

তুয়াকুণ্ডে—রাধাকুণ্ডে।১০৩

প্রচুর দুঃখে মগ্ন আত্মা অতি রোদনেতে।
বিলাপ কুসুমাঞ্জলি এই অধিন হৃদয়েতে॥
তুয়া পাদপদ্মে আমি কৈল সমর্পণ।
কৃপাদৃষ্টে তুমি তুষ্টির কারণ॥১০৪॥
শ্রীরূপরঘুনাথদাসগোস্বামীর মন অভিলাষে।
সংস্কৃতে কহিল এই বিলাপ প্রকাশে॥
তার পদে অপরাধ না হয় আমার।
সাষ্টাঙ্গ হইয়া করি কোটি নমস্কার॥
মদীশ্বরী দ্বারিকাপদ সেবা অভিলাষে।
বিলাপকুসুমাঞ্জলি কহে রাধাবল্লভ দাসে॥
ইতি বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তব গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥

মতিভ্রমহৈয়া যদি অক্ষর পড়ি থাকে।
সাধুজনা পাইলে পুন উদ্ধারিবে তাথে॥

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৩২)

(১) সকাম কর্ম—তামস কর্ম; ডাকাতের কর্ম তামস। (২) রাজস কর্ম—অর্থোপার্জনের জন্য কর্ম; ব্যবসা চাকুরী বিত্ত ঐশ্বর্য মান। (৩) সাত্ত্বিককর্ম—কর্তব্যজ্ঞানের কর্ম—এই তিন স্থানেই আমি এবং এই তিন স্থানেই পৃথকভাব আছে। নির্গুণ যে কর্মের কথা নয়নারায়ণ দেব বলেছেন সেখানে তিন রকমের অদ্বৈত সিদ্ধি—ভাবাদ্বৈত ক্রিয়াদ্বৈত দ্রব্যাদ্বৈত। ভাবাদ্বৈততা হচ্ছে সত্তাগত অদ্বৈততা, ক্রিয়াদ্বৈততা হচ্ছে একই কর্ম দুজনার, দ্রব্যাদ্বৈততাতে যা আমার তা সকলে মিলে ভোগ করব—এই ভাবে কাজ করতে হবে। দৃষ্টান্ত—স্বামীর কর্ম স্ত্রীর।…এ সংসার ফাঁকির রাজ্য নয়—নিজের কর্ম দিয়ে অধিকার অর্জিত হয়।…অন্যের ঘরে আগুন দিতে হলে নিজের কপালেই আগুন দেওয়া হয়; নিজের হাতে ধুলো না মেখে অন্যের গায়ে তুমি ধুলো দিতে পারবে না। সংসারে কেউ কাউকে তাড়ায় না—নিজের দোষে মানুষ নিজের অধিকার হারায়। জমিদার গেল কেন, ইংরেজ গেল কেন…কেন মেয়েরা বিদ্রোহ করল, প্রজা ক্ষেপল কেন, নিম্নবর্ণীয়ের মধ্যে আত্মচেতনা কেন জাগ্রত হল? যেহেতু জমিদার শোষণ করেছে, ইংরেজ শোষণ করেছে, মেয়েরা-প্রজা-নিম্নবর্ণী শোষিত হয়েছে।…সত্যি যদি কেউ এসে থাক এসেই থেকো। আজ নয়নারায়ণ আশ্রম যা বলে গেল শত বৎসর পরে বাংলা দেশ এক দিন তা বলবেই—এ আমি বলে গেলাম—নিত্যগোপাল বাহুল্য নয়…আর এক কথা—কর্মের কোন divided responsibility নাই—undivided responsibility—দেশের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী আলাদা—কিন্তু প্রতি কর্মের জন্য প্রত্যেকের দায়িত্ব undivided।…সেখানে কেউ ত্রুটি করলে অন্যে সমালোচনা না করে তা দেখে দেবে। অমুকে দায়ী—এ হয় না—যে কোন ঘটনার জন্য প্রত্যেকে দায়ী।…আমার কাজ নেই বলে আমি একা নই—আমি নিত্যগোপালের স্বপথে চলেছি বলে কেউ আসে না।…প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকের দায়িত্ব স্বীকার করে নেবার মত মনোবৃত্তি তোমাদের হোক। একজনার ভুল অর্থ সমস্ত আশ্রমের ভুল—যেহেতু এটা organic—জীবন্ত যন্ত্র—তাই নিত্যগোপাল বলেছেন পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করবে।…শনিবারের বৈঠকের প্রয়োজন নিজেদের দোষ স্বীকারোক্তির জন্য…।

২, ৮, ৫৬।...আমরা বর্তমান যুগের মানুষেরা অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে গেছি বলে মনে করে থাকি—জ্ঞানে বিজ্ঞানে ঐশ্বর্যে—কিন্তু সর্বত্রই কি এগিয়েছি? পরমহংস দেবের কথা—মাঠে অনেক জল এল,—দাঁড়াল না কেন? দেখা গেল—ইঁদুর বড় এক গর্ত। আমাদেরও তাই—এত জ্ঞান বিজ্ঞান এসে যাওয়া সত্ত্বেও কিছুই দাঁড়াবে না যদি যার উপরে ভারতবর্ষ জোর দিয়ে ছিলেন—বিনয় ও সদাচার—এক কথায় যার নাম শ্রদ্ধা—সেই শ্রদ্ধাকে গোড়ায় রাখা না হয়। নচিকেতার উপর শ্রদ্ধা আবিষ্ট।...সব দেওয়া অর্থ তো ছেলেকেও দিতে হয়।...নচিকেতা তাই বার বারই জিজ্ঞেস করে, আমাকে দেবে কাকে? উত্যক্ত হয়ে পিতা বলল মৃত্যবে দদামি।...যমের কাছ থেকে নচিকেতা ব্রহ্মজ্ঞান আদায় করেছিলেন...গোড়াতে ছিল শ্রদ্ধা।...ভারতবর্ষের ৭০% লোক কোন না কোন সম্প্রদায়ে দীক্ষিত—রামকৃষ্ণ, অনুকূল, জগদ্বন্ধু, রামঠাকুর, নিগমানন্দ...। সব যাচ্ছে কোথায়? মহাপুরুষের তো অন্ত নাই—কিন্তু শিষ্য দেখলে কি চেনা যায়? ধরে নিয়েছে যে জগতের ব্যাপারে চুরীই করি আর অপরকে হিংসাই করি বা যা-তা করি, হরিনাম নিলেই হল।...আমরা কত বড় বড় কথা শিখেছি, উপনিষদের বিক্রী আগেকার দিনের থেকে অনেক বেড়ে গেছে, বুদ্ধ নিয়ে আলোচনার অন্ত নাই—সবই চলছে—তবু তুমি যেই তিমিরে সেই তিমিরে।...যাচ্ছে কোথায়? শ্রদ্ধার অভাব, বিনয়ের অভাব সব মাটি করে দিচ্ছে। পূজ্যাপূজ্য ব্যতিক্রম হলে কোন কল্যাণ লাভ হয় না। সেই মাষ্টারী জীবনের একটা ঘটনা—যমুনায় নৌকায় চলেছি—এক ছাত্র আমার দিকে পা ছড়িয়ে বসে—বললাম, মাস্টারের দিকে পা দিয়ে বসতে নাই। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—আপনি তো আমাদের মাষ্টার নন, আমি অন্য স্কুলের ছাত্র।...উচ্ছৃঙ্খলতা বেয়াদপির মাত্রা এত বেড়ে গেছে যে কোন জ্ঞান বিজ্ঞান এর মধ্য দিয়ে কল্যাণ এনে দিতে পারবে না।...মহাপুরুষেরা মানুষের কাছ থেকে কিল লাথি ঝাঁটা খেয়েও যুগে যুগে অবতীর্ণ হন—মহাপুরুষদের ধৈর্যের আর শেষ নেই।...আবার যে এলে? গতবার মার খেয়েছিলে মনে নেই? হাঁ, মনে আছে। তবে এলে কেন?—স্বভাব দোষে।

পূজ্যাপূজ্য ব্যতিক্রমে আয়ু শ্রী সম্মান মর্যাদা সব নষ্ট হয়—মহাপ্রভু বাসুদেব সার্বভৌমের বাড়ী ভিক্ষা করতে গেছেন—বাসুদেব প্রাণের তৃপ্তি সহকারে নানা ব্যঞ্জনে প্রভুকে খাওয়াচ্ছেন—জামাতা অমোঘ অপমানকর মন্তব্য করল—বাসুদেব ক্রুদ্ধ হয়ে জামাতাকে অভিশাপ দিলেন—অমোঘের কলেরা হল—খবর গেল মহাপ্রভুর কাছে—তিনি এসে অমোঘকে তুলে দিলেন—এই চরিত্র না হলে আর কপালে দুঃখ থাকবে কেন?...শিবানন্দকে বলেছিলেন, তোর গ্রামের কুকুর পর্যন্ত আমার প্রিয়...। গোড়াতে শ্রদ্ধার অভাবের জন্যই এত সাধন সম্পদ পেয়েও বাঙালী আজও দীনই রইল।...বাসুদেব অমোঘকে ক্ষমা করলেন না—মহাপ্রভু তাকে ক্ষমা করে হাত ধরে টেনে তুললেন।...মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনে দেখা গেছে—শুধু আমাদের দেশে নয়—সব দেশেই—আলেকজান্ডার দি-গ্রেট নাকি মাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। মহাপ্রভু এক সময় বলেছিলেন মর্যাদালঙ্ঘন প্রভু না পারেন সহিতে।...পূজনীয়ের সঙ্গে ব্যবহারের সৌষ্ঠব রক্ষা করতে কত সচেতন হওয়া দরকার—বড়রা পারেন বলেই তো বড় হন—নিমাই সন্ন্যাসী হবে—শচীমাতা গঙ্গাদাসকে বললেন নিমাইকে অনুরোধ করতে—কেন সে সন্ন্যাসী হবে। গঙ্গাদাস নিমাইকে শাস্ত্রবাক্য বোঝালেন—মহাপ্রভু দেখলেন তর্ক করে বোঝাতে গেলে পূজ্যাপূজ্য ব্যতিক্রম হবে, হয়তো অপমান করে ফেলব—গঙ্গাদাস তাঁর পিতার বন্ধু—তাই নিমাই গঙ্গাদাস ঠাকুরের সব যুক্তি মেনে নিয়ে বললেন...'কিন্তু প্রাণ টানে কি করি, কি করি। জানি ভুলে রই, ভুলে রহিতে না পারি'—। তর্কের পথে গেলো না—মেনে নিয়ে পরের কথা বল।...কথা বলার ঢং—ধরণ—শেখো—আমার কথা তোমাদের উপর চাপাবো না—কিন্তু ঢং শেখো। প্রেমের মধ্যে যে যুক্তি আছে সে যুক্তি কি যুক্তিমানদের শাস্ত্রে আছে? গঙ্গাদাস নিমাইর পেটে হজম হয়ে গেলেন। এই ভাবে প্রাণ দিয়ে নিজের কথা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।...কথা

দিয়ে তুমি কি বুঝাবে? কথা দিয়ে ভগবান পাওয়া যায় না।...সন্ন্যাসের পরে শচী মায়ের বড় কষ্ট—মায়ের কষ্টে নিমাইয়ের প্রাণ বিগলিত হল। মনে পাঠালেন মাকে, কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন—যবে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন। মা বললেন, তুই যখন যেখানে থাকবি আমি যেন খবর পাই—তিনি বললেন, তুমি যখন যা দেবে আমি গ্রহণ করব।...ভারতীয় আচার শেখ—ক্রূরতা, নোংরামি, double dealing এ সব ভারতীয় আচার নয়। এ যে ঋষির দেশ......

৩, ৮, ৫৬।..শ্রীনিত্যগোপাল বিশ্বের বুকে স্রষ্টার দর্শন নিয়ে এসেছেন। এতদিন দ্রষ্টারা দর্শন দিয়েছিলেন। স্রষ্টার দর্শন সমগ্র, দ্রষ্টার দর্শন আংশিক। যেমন একজন বাড়ীর মালিক একটা প্ল্যান করে বাড়ী করেছেন—মালিক—আত্মা, কর্মচারীর দল দেব, যারা বাস করে—ভূত। আত্মা—দেব—ভূত—সৃষ্টির এই তিনটি পর্যায়...প্ল্যানের স্রষ্টা সমগ্রের খবর রাখেন, বিভিন্ন বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মচারী—তারা দেবতা—তাদের দৃষ্টিও আংশিক দৃষ্টি। আর যারা বাস করে সেই ভূতেরা তো একেবারেই আংশিক দৃষ্টি সম্পন্ন। কিন্তু সে সমগ্রের খবর রাখতে পারে যদি সে কর্তার সঙ্গে একীভূত, একাত্ম হয়। দেবতাদের দৃষ্টি আংশিক বলে দেবতা দেবতাতেও ঝগড়া হয়, দেবতাদের পতনও হয়, আবার তারা স্রষ্টাকে অস্বীকারও করে। যারা ভূত, শুধু বাস করে, তারা এই জন্যই জীব যে তারা কর্তার ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম হয় না।...আমি আশ্রম করেছি, তোমরা যদি আশ্রমী হও তাহলে কেন কলকাতায় ২৫ বৎসর বাস করে এই গ্রামে এলাম, কি নিয়ে এলাম—কি কথা নিয়ে পড়ে আছি, পড়ে থাকব—সে সব আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে বুঝে নাও।...আত্মা আধ্যাত্মিক, দেব আধিদৈবিক, ভূত আধিভৌতিক—এই তিনের সংবাদ রাখতে হবে—না রাখাটাই জীবত্ব।...সংসারে আয় করার মানুষ আর ব্যয় করার মানুষ যদি একেবারে পৃথক হয় তবে সে সংসার ঠেকে না।...ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ এরা সৃষ্টির কর্তা নয়—ভয়াৎ ইন্দ্র তপতি, ভয়াৎ অগ্নি তপতি—কার ভয়ে এরা ভীত? যার সমগ্রের দৃষ্টি আছে...সকলেই নেতা হতে চায়—কিন্তু সমগ্রের দৃষ্টি না থাকলে কর্তা হওয়া যায় না।...কর্তার সঙ্গে স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম না হলে কর্তা হওয়া যায় না।..ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—প্রতি আশ্রমের বা প্রতি কর্তার এই চারটি দিক—আমি বেদান্ত উপনিষদের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণত্বের দিক দিচ্ছি—রাজনীতি করে ক্ষত্রিয়ের কাজ করেছি—উজ্জ্বল ভারত দিয়ে বৈশ্যের কাজ করছি—আর সেবা—এই চার ব্রত নিয়ে নরনারায়ণ আশ্রম চলেছে। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ হতে হলে রীতিমত দীর্ঘদিন সাধন ভজন করে এক একজন সে পদ বা চাকুরী পেয়েছে—সহজে পায় নি। কিন্তু এদেরও চাকুরী যায়।...স্রষ্টার সঙ্গে এক হতে পারলে স্রষ্টৃত্ব অর্জন করা যায়।...পিতার দৃষ্টি সামগ্রিক, পুত্রের আংশিক। যোগ্যতা দিয়ে, সাধনা দিয়ে, শরণাগতির সাধনা দিয়ে জীবও কর্তা হয়। সংসারেও তাই।...অমুক বিভাগ অমুকের—আমার বিভাগ নয়, অতএব আমার কি—এটা ধ্বংস হওয়ার কথা—কিন্তু প্রত্যেকের কাজের জন্য প্রত্যেকে দায়ী এ যদি না হয় আশ্রম চলে না, সৃষ্টিও চলে না—...শিবের দৃষ্টি সামগ্রিক, জীবের দৃষ্টি আংশিক। জীব সাধনা করে শিবত্ব অর্জন করতে পারে—ভগবান এ সৌভাগ্য মানুষকে দিয়েছেন।...জীব জীব থাকতে কর্তা হতে পারবে না—গায়ের জোরে না, ধনের জোরে নয়, চালাকির জোরে নয়—...।

৪, ৮, ৫৬।...ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ উদ্ধবের কাছে কর্ম জ্ঞান ভক্তি-যোগের মধ্যে কোনটা কার পক্ষে উপযোগী তা বলেছেন। জ্ঞানযোগ তাদের যারা সংসারে নির্বিন্ন—কিছুতেই মন লাগে না..., কর্মযোগ তাদের যারা আসক্ত—সংসার আর সংসার এ ছাড়া জানে না..., ভক্তিযোগ তাদের যারা ন নির্বিন্নঃ নাতিসক্তঃ—বিষয়ে বিরক্তিতে একেবারে ছাড়িও নি, আবার অতিশয় আসক্তও নয়...।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫২—

(৩৪)

ওগো, তোমার শ্রীচরণস্পর্শে নূতন বিশ্ব গড়িয়া উঠুক। বর্তমান বিশ্ব সমস্যায় সমস্যায় জর্জরিত। কে এই সব সমস্যার সমাধান দিবে তোমার জীবন ও দর্শন ছাড়া? এতদিন প্রতি ঘটনাকে, প্রতি সমস্যাকে এড়াইয়া, তাহাকে ডিঙ্গাইয়া চাহিয়াছিল সমাধান বা সমাধি, কিন্তু বিশেষের খোঁচায় ব্যাখ্যা তো তাহাতে মিলে নাই, তাই কি আসিয়াছ প্রতি ঘটনাকে, প্রতি সমস্যাকে তাহার তাহার মূল্যে স্বীকার করিয়া, বিশ্বের সঙ্গে তাল রাখিয়া পরিপাক করিয়া সামনে আগাইয়া গিয়া সমাধান করিবার জন্য? এতদিন বিশ্ব করিয়াছে সর্ববিশেষ-বিবর্জিত নির্বিশেষের আরাধনা, আজ করিবে সর্ববিশেষ-সমন্বিত নির্বিশেষের আরাধনা। শঙ্কর চান বিশেষত্ব-বর্জিত নির্বিশেষ প্রকৃতির ওপারে, আর কমুনিজম চান বিশেষত্ব-হীন নির্বিশেষ প্রকৃতির ক্ষেত্রে। দুইয়ের মধ্যেই গোলমাল রহিয়াছে। তুমি জীবন দিয়া সমাধান দেও।…অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সন্ধ্যা আত্মহত্যা করিল। সামনে কোন পথ নাই, অথচ বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছে না। মায়াবাদীদের সাধনাও তো একরূপ আত্মহত্যার সাধনা। তবে তাহা জ্ঞানপূর্বক আত্মহত্যা। তাইতো 'মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী'। প্রকৃতিকে বঞ্চনা দিয়া যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই আত্মার বিষয়। পুরুষোত্তম তাহারই মূর্ত বিগ্রহ।…ঠাকুরের জীবনী কিছুটা পাঠ হয়—কালীর ঘটনা—প্রিয়বাবুর সঙ্গের লীলা। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি হয়। ঠাকুরকে নিয়া কি করিব? ছাপা যে চাই-ই। কিন্তু কে সংগ্রহ করিবে? টাকা কোথায়?

১৩ই জুন

আবার স্থিতিভূমি তুমি, তুমি মঙ্গলময়, তুমি বলিয়াছ, 'ভয় কি, ঠেলে তুলব'—'শরৎ, যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি।' আমি ইহা বিশ্বাস করিব। কিন্তু তামসিক বিশ্বাস যদি আসিয়া যায়, তবে কি তাহাতে জীবনে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা মুছিয়া যাইবে না? তুমি যখন মঙ্গলময়, সর্বময় কর্তা, তখন আমার করিবার কিছুই নাই। এই অবস্থা কি কল্যাণপ্রদ? যত তোমাকে বিশ্বাস করিব, ততই আমি উদ্যমী হইব তোমাকে, তোমার বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার জন্য। বিশ্বাস কি নিষ্ক্রিয় একটা কাব্যমাত্র? বিশ্বাস যদি creative না হয় তবে তাহা ব্যর্থ। তুমি আমার নিশ্চিন্ততার দিক, আমি চিন্তা করিবার দিক। 'জনমন্ ও অন্দন্' এর …গত কল্যকার কাগজে বাহির হইয়াছে বাংলার বাহিরে ৬টী মেয়ে পাহাড়ের উপর হইতে নদীতে ঝাঁপ দিল। তাহারা আত্মহত্যা করিবার জন্য গিয়াছিল। ২টী মেয়ে পায়ে বাঁধিয়া ঝাঁপ দিল। তাহারা ভাসিয়া গেল। অপর ২টী ভিন্ন ভিন্ন ঝাঁপ দিল। তাহারা জলের স্রোতে ভাসিয়া গিয়া বাঁচিল। অপর দুইটীর সাহসে আর কুলাইল না। তাহাদের জীবন নাকি ভারাক্রান্ত। বর্তমান যুগের নারী স্বাধীনতা নাকি তাহারা পাইয়াছে। কিন্তু পুরুষোত্তম এবং তাহার পথের খোঁজ ইহাদের মিলে নাই। তাই এই দুর্গতি। পিছনে তো নেওয়া সম্ভব নয়। সামনে আগাইতে হইবে। তাই সমস্যা জটিল। আত্মহত্যার প্রশ্ন আজ আর ব্যক্তিগত নয়। আত্মহত্যা স্নেহলতাও করিয়াছিল আগুনে পুড়িয়া। এই destructionকে পুরুষোত্তম-দর্শন ছাড়া কে construction এ গড়িবে? ৯টার পর ফিরি।

১৪ই জুন

তুমি-আমি 'মধুর সখ্য'—ইহা ভাবিবার ও জীবনে কাজে লাগাইবার জন্য প্রাণপণ করিব। তুমি ও আমি

সকল ব্যাপারেই সহযোগী সখা। ইহাই জীবের পরম সৌভাগ্য। তুমি এত কাছে আমাকে টানিয়া লইয়াছ যে, তুমি আমাকে তোমার সকল কার্যে সহযোগী করিতে চাহিতেছ। ইহার চেয়ে আমার গর্ব করিবার কি আছে? আমি তোমার সৃষ্টিতে সহযোগী, স্থিতিতে সহযোগী, প্রলয়ে সহযোগী—ইহাই আমার সারা জীবনের ধ্যান জ্ঞান হউক, সাধনা সিদ্ধি হউক।···জিতেনবাবুর (লাহিড়ী) সঙ্গে কথা হয়। অগ্নিসংযোগ না থাকিলে কাঠ যেমন পোড়াইতে পারে না, শক্তি সঞ্চারিত না হইলে মন্ত্রও তেমনি কাজ করে না। জিতেনবাবু অগ্নির খোঁজ করিতেছেন···। তাঁহার কাছে অযাচিত করুণার কথা, আগে পাওয়া পরে সাধনার কথা, পরীক্ষিতের 'বিষ্ণুরাত' নামের তাৎপর্য, আগে ভগবানে অনুরাগ পরে তাঁহার পূজায় অনুরাগ ইত্যাদি আলোচনা করি।···ঠাকুরের ঐশ্বর্যের প্রকাশ ভাল লাগে না। কিন্তু তিনি যে রাম, কৃষ্ণ ও গৌর তাহা তো স্বপ্নে দেখাইয়াছেন। সে স্বপ্ন তাঁহাকে আমি বলিয়াছি। তিনি তাহা মানিয়া লইয়াছেন এবং যার তার কাছে বলিতেও নিষেধ করিয়াছেন।

১৪ই জুন

ওগো, তুমি ছাড়া আমার আর কিছু নাই, আমি তোমার নাম লইয়াই তো জীবনে চলিয়াছি। ওগো দেখা দেও স্বরূপে সর্বরূপে। তোমাকে জীবনে বহন করিব, সকল দেহ-মন-প্রাণ দহন করিয়া সৃষ্টি করিব। আমাকে দেখিয়া তোমাকে দেখিবে, আমাকে ছুঁইয়া তোমাকে ছুঁইবে, তবে না আমার পাওয়ার সাধ মিটিবে? আমি তুমি হইব, তুমি থাকিবে আমার জীবনের সকল স্পন্দনে। তোমার রূপ নাম 'কালীকুমার', আমারও তো তাহা। তোমার রূপের আভাস নাকি আমার দেহে আছে। তোমার জীবনে কি আমি জীবনদান করিব না? 'আরও কাজ' আমার জীবনে না দিলে তোমাকে কি করিয়া বিশ্ব-জীবনে সঞ্চারিত করিব? আমাকে শক্তি দেও, বল দেও, বুদ্ধি দেও। সকালে 'খণ্ড জাতি সম্মেলন' প্রবন্ধ আরম্ভ করি ও কিছুটা লিখি। পরে আফিসে যাই। ১০-টার পর ফিরি। রেণু পোস্টাফিস, ব্যাঙ্ক ও মণিমার ওখানে হইয়া বাসায় ফেরে। পরে 'হিন্দুস্থানে' যায়।...নিত্যপ্রেমানন্দের লেখা ঠাকুরের জীবনীপাঠ আরম্ভ হয়। প্রথমে প্রতিভা, পরে রেণু পড়ে। ঠাকুরের জন্য প্রাণ কেমন করে। কতদিন চলিয়া গিয়াছেন, কোথাও তাঁহার কোন সাড়াশব্দ নাই, তাঁহার সেবায়তন গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না। অথচ দিন তো গেল। সকালে উষাদিদির সঙ্গে কথা হয়। আর সময় নাই বলিয়া সে-ও দেরী না করিয়া কাজ করিতে বলিল। একটী স্থান করিবার উপর জোর দিল। আগের মত দৌড়াদৌড়ি করিয়া আলোচনা করা তো শরীরে কুলাইবে না। এখনও বসিয়া আলোচনা করার সুযোগ আছে। সে বলিল, 'আমি তো পা বাড়াইয়াই আছি। এখানে আছি, তাই যাহা কিছু করি। আমিও তো বাঁচি।..

১৬ই জুন

ওগো, তুমি যদি ইহাদের মতে গুপ্তাবতার, ছন্নঃ কলৌ, তবে কেন মঠ করিলে, এত লেখা লিখিয়া গেলে, শিষ্য করিলে? একা আসিয়াছিলে, একা গেলেই তো সর্বতোভাবে গোপন থাকা সম্ভব হইত। এ আবার কি রকম 'গোপন' থাকা? আসলে তুমি চির প্রকাশ স্বপ্রকাশ। তুমি যান্ত্রিক চিন্তার কাছেই 'গোপনে' থাক, যেখানে প্রাণ-প্রজ্ঞা সমন্বয়, সেখানেই তো তোমার মহান প্রকাশ। তুমি 'যোগমায়া সমাবৃত' বলিয়াই 'নাহং প্রকাশম্'! তুমি নিজ লেখার আড়ালে ঠিকই আছ। কেননা ঐরূপ এলোমেলো লেখা পড়িয়া কেহ তোমাকে খুঁজিয়া পাইবে না, আমাদের দেখিয়াও কেহ তোমাকে চিনিবে না, তোমার সম্প্রদায় গড়ার নমুনা দেখিয়াও কেহ তোমাকে চিনিবে না। তোমাকে দেখিয়াই শুধু তোমাকে চিনিতে পারা যায়, কিছুকে দিয়াই তোমাকে চেনা যাইবে না, তুমি স্বয়ং। কিন্তু আমার কাছে তো তুমি ধরা দিয়াছ। কেন দিলে? এই রূপে কি তোমাকে প্রকাশ করিতে পারিব না? যোগমায়া, যোগমায়া আমায় কৃপা কর। আফিস হইয়া মঠে যাই। ঠাকুরের সামনে একটু বসি প্রাণের কথা শুনাইয়া আসি। জ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে কথা ক্ষিতীশ অনেক সময় ছিল। যে-বিশেষ, কথা লইয়

নিত্যগোপাল আসিয়াছেন যে কথা আর কেহ বলিতে পারে নাই, যে কথার মধ্যে সকলের সব কথার সমন্বয় আছে তাহা হইতেছে—জড়াজড় সম্বন্ধ, নিত্যানিত্য সম্বন্ধ। পাওয়া হইতে মানুষের যাত্রা শুরু, সেই পাওয়াকে জীবনে আস্বাদন করাই সাধনা। নিত্যগোপালের কথা 'আমাদের বিবেচনায় অগ্রে ভগবানে অনুরাগ হইলে তবে তাঁহার পূজাতে অনুরাগ আসে' ইত্যাদির আলোচনা হয়। ১০টার পর ফিরি। আপিসে যাই। ১১টার পর আশ্রমে ফিরি। উমাদিদির সঙ্গে আবার ইহার আলোচনা হয়। প্রতিভার সন্দেশ। হেমাঙ্গবাবু আসে স্টীল ওয়ার্কের চিঠি লইয়া···। রেণু হিন্দুস্থানের ব্লক লইয়া, লোকসেবকের কাজ সারিয়া আশুবাবুর ওখানে আমার ব্রহ্মচর্য্যের পাণ্ডুলিপি দিয়া ৪টার পর ফেরে। আমরা ৪টার পর আফিসে যাই, রেণু তাহার পরে আসে। আমার বরিশালের জীবনীর কিছু পাঠ হয়। ঠাকুরের জীবনী (শরদানন্দের) কিছু পাঠ হয়।···আমার বড় দুঃখ সব ঠাকুরের দেবায়তন গড়িয়া উঠিতেছে না বলিয়া। নচেৎ আমি যাহা পাইয়াছি, তাহাতে দুঃখ একটুকুও নাই। কি ছিলাম, কি হইতে পারিতাম, আর কি হইয়াছি, আমি কি তাহা বুঝি না?

১৭ই জুন

তুমি মহানির্ব্বাণমূরতি; আমি নিভিয়া যাইব, তুমি জ্বলিয়া উঠিবে, আমি ঘুমাইয়া পড়িব, তুমি জাগিয়া রহিবে, আমি মুছিয়া যাইব তুমি ফুটিয়া উঠিবে। তুমি আমাকে আত্মসাৎ কর, আমি তুমি হইয়া যাই। তুমিই থাক, আমার জীবনের মধ্য দিয়া আবার প্রকট হইবে না? তোমাকে কি আবার বিশ্ব দেখিবে না? ওগো, তুমি আবার এস; আসিবে তো বলিয়া গিয়াছ। কবে আবার আসিবে? ৮টার পর হাঁটিয়া বঙ্কিম হালদার ষ্ট্রীটে যাই। রেণু চার্টার্ড বিল্ডিং-এ যায়। এইচ্. কে. ঘোষের সঙ্গে অনেক কথা হয়।...তিনি উজ্জ্বলভারত সম্বন্ধে এক পৃষ্ঠা নোট দিয়াছেন, খুব ভাল নোট; বজ্রধবাবু বলিয়াছেন—পত্রিকা প্রথম শ্রেণীর। রেণু এখানে আসে ২টার পর।...পুরুষোত্তম কাহারও একটা কাণা কড়িও নেন না সেখানে একটা মোহর না রাখিয়া। সত্যার মৃত্যু মোটেই ব্যক্তিগত নয়। সত্যার মৃত্যু একটা আহ্বান তাহার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে তরুণীদের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য। এই আহ্বান সার্থক করিতে পারিলেই সত্যার মুক্তি। ব্রজেনের কাছে ইহাই বলিলাম। 'কর্ম্মফল' বলিয়া ইহাকে চাপা দিলে চলিবে না। প্রতি কর্ম্মের পশ্চাতে যে ইঙ্গিত বিশ্বপ্রকৃতির আছে, তাহা ধরিতে পারাই মোহর লাভ। ঘটনা ঘটনা হিসাবে কাণাকড়ি ছাড়া আর কি?...

১৮ই জুন

তুমি আমি 'সযুজা সখায়া'—তোমার যোগে আমি যোগী, আমার যোগে তুমি যোগী, তুমি-আমি একই প্রেম যোগে যোগী। বিশ্ব যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতেছে, তুমি আজিও আসিবে না? তুমিই সকল সমস্যার সমাধান মূর্ত্তি। কেমন করিয়া তোমাকে আমি ছড়াইয়া দিব? তুমি সব কিছুকেই তো এক নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছ। তোমার অদ্বৈত শঙ্করের হইয়াও তাহার 'অধিক', তোমার বিশিষ্টাদ্বৈত রামানুজের হইয়াও তাহা হইতে 'অধিক'—এমন করিয়া তোমার জড়, তোমার অজড় তত্ত্ব কে বলিবে? আমার সোনার ঠাকুর, আমার মানিক, তুমি এস, তুমি ছাড়া আমি কেমন করিয়া চলিব? সকালে দীনেশ রায়ের বাসায় যাই তাহাকে দেখিবার জন্য।··· সেখান হইতে আফিসে যাই। আমি ও রেণু ৮টায় বাহির হই। রেণু পোস্টাফিস, মলিনার ওখানে, আশুবাবুর আফিস হইয়া বিমলার ওখানে ১২।০টায় যায়।...তাহাকে নিয়া আসে।···শুচিতাই সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। মানুষ বাহিরে যত শুচির বাড়াবাড়ি করে, ততই ভিতরে ভিতরে অশুচি জমিয়া উঠে, অশুচির সংস্কার শক্ত হয়, বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। পুরুষোত্তম যাহার জীবনের ব্রত, সে কেমন করিয়া শুচি অশুচির বন্ধে ডুবিয়া থাকিবে? স্বাভাবিক হইতে বলি। অস্পৃশ্যটীতে ভাত খাইতে বলি। রেণু বিমলাকে তাহার ভাইয়ের বাসায় দিয়া আসে। ব্রজেন আসে। বর্ণাশ্রম-শাসিত সমাজের বুকে পুরুষোত্তম আনিয়াছিলেন ভাগবত ধর্ম। কিন্তু বর্ণাশ্রমীরা Beecham's Pill-ওয়ালার মত বর্ণাশ্রমের উচ্চ নীচ

বেদের সমর্থন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রচার করিয়াছে। কৃষ্ণ-জীবনে কোনও বর্ণকৌলীন্য, আশ্রম-কৌলীন্য, কর্ম-কৌলীন্যের স্থান নাই। আজ কৃষ্ণ-জীবনকে আশ্রয় করিয়াই নূতন করিয়া সমাজ গড়িতে হইবে। 'উজ্জ্বল-ভারতে'র প্রচেষ্টা ইহাই। ব্যাপার লাগানো চলিতে থাকে। ঠাকুরের জীবনী আজ একটু পড়া হয়। ৯টার পর আমরা আসি।…

১৯শে জুন

ঠাকুর, আমি এমনভাবে তোমার হইয়া যাইব যে আমাকে পাইয়া মানুষ তোমাকেই পাইবে, আমাকে দেখিয়া তোমাকেই দেখিবে। তুমি রবে, আমি রব না, আমি নিভিয়া যাইব তুমি জ্বলিয়া উঠিবে, আমি মুছিয়া যাইব তুমি ফুটিয়া উঠিবে। আমাকে এমনটী করিয়া লও। 'অন্যোহসৌ অন্যোহহম্'—ইহা আমি তোমার সঙ্গে তোমার বিশ্বের সঙ্গে সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি-আমি-বিশ্ব অনন্ত—ইহাই আমার ধ্যান জ্ঞান। তোমার আমার অদ্বৈত মিলনের মাঝে বিশ্ব নূতন হইয়া গড়িয়া উঠুক।…

২০শে জুন

সকল প্রগতির ঘনমূর্তি শ্রীরাধা; আমার দেহ-প্রাণ-মন সকল রাধাভাবে গড়িয়া উঠুক, প্রগতির জমাট-বাঁধা রূপ হউক। আমি ঝড়ের মত ছুটিব। আমার ছুটিবার সাধ তো মিটে নাই। আবার আমি প্লাবন আনিব। একদিন তো দেখাইয়াছিলে, কি এক মহাপ্লাবনে তুমি আমাকে জড়াইয়া নৃত্য করিতেছ। কবে সেই দিন আসিবে? বেদনা-জর্জরিত বিশ্ব যে তোমাকে ডাকিতেছে। এস এস, নিত্যগোপাল বিশ্বসংসারে সমাধানমূর্তি তুমি, তুমিই শুধু। তুমি জড়াজড় সমন্বয়-মূর্তি, নিত্যানিত্যসমন্বয়-মূর্তি, চৈতন্য-অচৈতন্যসমন্বয়মূর্তি, জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়মূর্তি। সকালে আফিসে যাই। ৯টার পর আমি ও রেণু বাহির হই। রেণু Shuttleworth-এর দেওয়া চিঠি লইয়া দেখা করিতে যায়। ২ জায়গায় দেখা হয়। অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন এবং বর্ষশেষের জন্য পায়, লাল কালিতে ছাপিতে হইবে। এখানে ফেরে ২টার পর। ৪টার পর নলিনার ওখানে যায়। আমি ও প্রতিভা আফিসে যাই। ৯টার পর আফিস হইতে ফেরার পথে দীনেশ বাবুকে দেখিয়া আসি।…একটী কথা আজ সারা দিন মনে হইয়াছে। ভগবান মানুষকে চলিবার পথে এমন সুযোগ দেন, যাহাতে সে মোটামুটি কিছুর জন্যই অপেক্ষা না করিয়া পারে, ভগবানকেই অস্বীকার করিতে পারে। ভগবান কোনও বাধ্যবাধকতা দিয়া জীবকে আটকাইয়া রাখেন না। তিনি 'মুক্তস্বভাব' বলিয়াই এইরূপ পারেন। আমিও তো সকলকে সকল সুযোগ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে আমাকে অস্বীকার করিতে পারে। এইখানেই তো আমার সার্থকতা। কাহারও উপর বাহির হইতে অধিকার দাবী করিবার মত বাহিরের দিক হইতে কিছুই করি নাই বলা চলে। আমাকে অস্বীকার করিলেই পারে। স্বীকার করা না করা তাহাদের উপর নির্ভর। আমি তো সেবা করিয়া চলিয়া গেলাম। স্বীকার করিতে পারিলে ধন্য হইবে। কোনও অভিসন্ধি আমার ছিল না কাহারও সঙ্গে কোনও ব্যবহারের মধ্যে। ঠাকুরের সেবায় বিশ্বের সেবায় লাগাইব—এই ছিল আমার লোভ।…

২১শে জুন

শ্রীরাধা, মূর্তিমতী উদ্দাম জীবনপ্রবাহ, তুমি ছুটিয়া চলিয়াছ কৃষ্ণসাগর পানে দুকূল প্লাবিয়া জাতি-কুল-শীলের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া। আমিও তোমার সঙ্গিনী হইব পরাণ পুত্তলী রাধারাণী, দিনমণি আমার। তুমি শ্রীনিত্যগোপালচন্দ্রে আজ ধরণীতে প্রকট।…রেণু ৮-২৫-এর ট্রেনে ঢাকুরিয়া যায়। লালবিহারীবাবুর টাকা আনে। নির্ম্মলবাবু দোকানে দিয়া যাইবে। সেখান হইতে ঘটকবাবুর বাসা হইয়া সরোজ মাইতির ওখানে যায়। ১১।০টায় বাসায় ফেরে।…সন্ধ্যার পর মাখনবাবু ও তাঁহার জামাতা আসে। রাজপুরে খুড়োবাবুর জায়গার পাশে আর একটী জায়গা আমাদের জন্য দেখিয়াছে। কাল সেখানে আমি ও রেণু তাহার সঙ্গে ১০টায় যাইব স্থির হইল।…আমাকে অস্বীকার করিবার মত সকল সুযোগই আমি দিয়াছি এই হিসাবে আমি সার্থক। আমার মত গণতান্ত্রিক কেহ নাই। অধিকার আমি বিস্তার করি নাই। শুধু ভালবাসা বহন করিয়াছি। চাই আর একটু আদর, একটু মি

ব্যবহার। আর কিছু না। ২টার পর ফিরি।…

২২শে জুন

বিশ্বমানবের মহামিলন ক্ষেত্র রচিত হইবে তোমারই পাদপদ্মে, শ্রীক্ষেত্র রচিত হইবে, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র রচিত হইবে—ব্রাহ্মণ' কায়স্থ মুচি ডোম সকলে জাতি-কুল-শীল ভুলিয়া তোমার সঙ্গে আজ পথে বাহির হইয়াছে। ঘর তো জাতি লইয়া, কুল লইয়া, তাই তুমি পথে বাহির হইয়াছ উন্মুক্ত আকাশতলে উন্মুক্ত শ্যামলা ধরণীর বুকে সকলকে ঘর ছাড়াইয়া। সকলে তোমার অগ্রগতির জন্য রথরশ্মি ধরিবে, তুমি বিশ্বকে শ্রীক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবে। কাল রথযাত্রা। ধন্য ধন্য। জগৎ+নাথ=জগন্নাথ।… অন্নপূর্ণ হাউ …জায়গা হল না।… সহজে যদি হয়, তবেই আবার হইতে পারে। কে করিবে? লোক কোথায়? মুকুলবাবু করিয়া দিলে হইতে পারে। টাকা সংগ্রহও যদি সহজে হয়, তবেই হইতে পারিবে। ১৬৫০ টাকা তো আপনা আপনিই একরূপ না চাহিতেই আসিয়াছে। বাকিটাও আসিবে। আমার মত, তোমার প্রচার কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার জন্য যদি জায়গার দরকার থাকে, করিয়া দাও। কি আর আমি বলিব? ৪।০টায় আফিসে ফিরি।…

২৩শে জুন

জগৎ+নাথ=জগন্নাথ, 'It is as true to say that God creates the world as the world creates God'। সকালে আফিসে যাই না। শ্রাবণের জন্য 'খণ্ডজাতি সম্মেলন' প্রবন্ধটা কিছুটা লিখি। রেণু আসে…। কমলা আসে…। এত পয়সা খরচ না করার কথা বলি। দৌড়াদৌড়ি বন্ধ করিয়া নাক মুখ বন্ধ করিয়া ঠাকুরের নাম নিয়া নিজের পড়াশুনা করিতে বলি। আমার কাছে আসিয়াছে ২ বৎসরেরও উপর, কিছুই তো করিল না।…সপ্তাহে ২ দিনও এখানে আসিয়া ক্লাশ III-র পড়া দেখিয়া যাইতে বলি। রেণু 'যোগাযোগ' প্রবন্ধ লেখে। ১১টার পর যায়, আবার আসে ২টার পর। আমি ও রেণু ৪টার পর আফিসে যাই। বড় রৌদ্রে ফাল্গুন হইতে আষাঢ় পর্যন্ত পত্রিকা দেওয়া হয়। জ্যৈষ্ঠ ছিল না, দেওয়া হয় নাই। আমার বই পড়িবার আগ্রহ নাই। কি আর করিব? বিভা সরকার আসে।…আজকাল কার মেয়েদের জটিল সমস্যার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিত, কিন্তু আজ তাহা থামিয়াছে।… পুরুষেরা যে অন্নদিতের মধুসূদনই তাহাদের sugar-coating সরাইয়া দিলে।… বিশ্বরূপ জীবন না পাইলে জুড়াইবে কি করিয়া?…

২৪শে জুন

তুমি-আমি ব্রজের পথ বাহিয়া চলিয়াছি—এ পথে এখনও তো পথিক আনাগোনা সুরু করে নাই। তোমার কথা আমি শুনি, আমার কথা তুমি শোন। বুকে বুক মিলাইয়া, প্রতি অঙ্গে প্রতি অঙ্গ মিলাইয়া চলিতে থাকিব, যতদিন না অনন্ত পথিক আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়। এত বড় বিরাট বিশ্বে কি একাকিত্ব—তুমি আর আমি। আর কেহ আসে নাই। বুক বাঁধিয়া চলিয়াছি, একদিন আসিবে, এই বিশ্ব শ্রীক্ষেত্ররূপে গড়িয়া উঠিবে। সকালে আফিসে যাই 'এক জাতীয়তা' (খণ্ড জাতি সম্মেলন) প্রবন্ধ শেষ করার পর। আমি ও রেণু ৯টার পর বাহির হই। রেণু Shuttleworth-এর চিঠি লইয়া দেখা করিতে যায়। ১টায় ফেরে। হেমাঙ্গবাবু আসেন, ৩টার পর। রেণু এখানেই আসে। ৪টার পর আমি ও রেণু আফিসে যাই। বিভা আসে না। আমরা দুইটী প্রাণী রেণু ও আমি বসিয়া। অথচ যে দর্শন আমরা ছড়াইতেছি, তাহা বর্তমান যুগেরই দর্শন, কানেও লাগে শুনি। কিন্তু কেহ তো ছুটিয়া আসে না। কি অবসাদ মানুষের জীবনে! এ্যাসেম্ব্লীতে এ কি চলিতেছে? দুই পক্ষই সমান। শুচিতা শালীনতা বোধ কি ইহাদের আসিবে না? দেশ-সেবার লেশও যদি থাকিত, তবে এইরূপ হালকা, বীভৎস আচরণ কি সম্ভব হইত? ইহার মধ্যে কি দেশ-সেবার কোন স্থান আছে? ঠাকুর রক্ষা কর। এই প্রলয়ের মাঝে কি করিয়া পুরুষোত্তম-দর্শন ছড়াইব? এই দুঃখই তো রহিয়া গেল। অথচ বর্তমান সময়ে যেমন এই দর্শনের প্রয়োজন ছিল, এমন বোধহয় কোনও দিন ছিল না। চলিতে হইবে এই মাত্র জানি। দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে নিজেদের কথা

লইয়া যদি অস্বচ্ছন্দ স্রোত আসে। রেণু আমার প্রবন্ধটা নকল করিয়া দেয়। ৯টার পর রেণু আমাকে আগাইয়া দিয়া যায়। রেণুর অভিভাবকগণ এ কথাটা কেন বোঝে না যে, রেণুর জায়গায় কেহ আসিবে না বা থাকিবে না যদি না রেণু তাহাদেরই একজন হয় কিম্বা রেণু তাহাদের মধ্যে হারাইয়া গিয়া তাহারাই বনিয়া যায়। নিজের জায়গাতেই মানুষ থাকিতে পারে। রেণুর জায়গায় কেন উন্মাদিনী থাকিবে তাহার পুত্রদের স্থান ত্যাগ করিয়া? ইহাদের বুদ্ধির দৈন্য দেখিয়া দুঃখ হয়। রেণুর প্রাণ ঐরূপ আছে বলিয়াই আমরা যাইতে পারি।

২১শে জুন

তুমি আমি অনন্ত; আমার তুমি, তুমিই আমি। সারাজীবন আমার ইহা ভাবিয়াই সুখ। তুমি আমার অভিন্ন-হৃদয়, আমিও তোমার অভিন্ন-হৃদয়—ইহা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে মন চায় না। হৃদয়ের মাঝে তুমি আমি যুক্ত। কেবল তুমি ও কেবল আমার লীলাবৈচিত্র্য রস-আস্বাদন জনমে জনমে চলিবে—ইহাই আমার লালসা। তুমি আমি সর্বতোভাবে অপৃথক হইব, তবে না আমার ও তোমার সার্থকতা? কে আমি তুমি ছাড়া? তুমিই বা কে আমি ছাড়া, বিশ্ব ছাড়া? আমার সকল জীবন ছাপাইয়া তুমি স্বপ্রকাশিত হও। সকালে 'সুদর্শন' পত্রিকার জন্য 'গোপমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ' প্রবন্ধ লিখি। রেণুর নিকট দিয়া আসি নকল করিবার জন্য। সকালে আফিসে যাই। ৯টার পর বাহির হই। রেণু যায় কলিকাতা Shuttleworth-এর চিঠি লইয়া। ১টার পর ফেরে। এখানে ২।০টার পর। ২॥০টায় কমলা আসে কিছু বই ও তাহার ইংরেজী পুস্তক লইয়া। তাহাকে পড়াই। 'The cat sat on a mat'—কোথায় বেদান্ত পড়াইব না পড়িতেছি 'The cat sat on a mat'। বেশ আমার জীবন! আমার বেদান্ত ইহাই। মেয়েটি সর্বতোভাবে অসহায়। যদি কিছু করিয়া দিতে পারি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার। উন্মাদিনীকেও একদিন গওয়া সেড়াইয়া পড়াইয়াছিলাম। তবে সে ছিল যৌবনে। আর আজ? প্রায় ৭০ বৎসর বয়স। তবুও মানুষের সেবা করিয়া যাইব, তা যত ছোটই হউক না কেন। আমার আবার ছোট বড় কি? সত্যই আমি নিজেই ছোট, আমার আবার বড় কাজ আসিবে কোথা হইতে? ছোটই আমার ব্রহ্ম। আমি ছোট ব্রহ্মের সেবা করিয়াই যাইব। 'The cat sat on a mat' বলিয়া রেণুর সঙ্গে হাসাহাসি করিয়াছি। একটা জীবনকে কত কি করিতে হয়। একটি অসহায় মানুষকে লইয়া আজ এই পড়াইতেছি। পারিতেছি যে তৃপ্তির সহিত ইহাতেই আনন্দ। সবই তো উঁহার কাজ। কাজের আবার তারতম্য কি? আমি ও রেণু ৪।০টার পর আফিসে যাই।...৯টার পর ফিরি, রেণু দিয়া যায়।---

২৮শে জুন

শ্রীরাধা আমার পরাণপুত্তলী; মূর্তিমতী জীবন-প্রবাহ মুক্ত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে উন্মাদিনীরূপে দুকূল প্লাবিয়া কৃষ্ণসাগর সকাশে। দিদিমণি, ওগো আমার আমি আমিও যাইব সকল উপাধি বর্জন করিয়া তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়া চল। তোমাকেই তো আমার আমি বলিয়া দেখিতেছিলাম। আমি কি তুমি বলিয়া যাইব না? তুমিই আমার সত্য আমি। আমি তুমিময় হইব - জীবনে আমার ইহাই একমাত্র কামনা। তুমি পরাপ্রকৃতি, পরা শক্তি, যোগমায়া। শ্রীরাধা শ্রীরাধা আমার জীবন স্বরূপা। সকালে আফিসে যাই। আমি ১০টার পর চলিয়া আসি ...ঠাকুরের জীবনী কিছুটা পাঠ হয়। ধীরেনবাবুর কাছে মহাভারতের কথা শুনি—ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্মকথা স্বয়ম্বর, কুম্ভকার বাড়ীতে কৃষ্ণসহ তাহাদের অবস্থান রাত্রিতে তাহাদের শয়নের ব্যবস্থা, কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি। কর্ণ বীর অথচ উদ্ধত, অর্জুন বীর অথচ শরণাগত। কর্ণের বীরত্ব তাই ব্যর্থ, আর অর্জুনের বীরত্ব সার্থক। একটি লইয়া দুইজন যে ভাবে ব্যবহার করিলেন তাহাতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ৮।০টার পর ধীরেনবাবু ও অন্য যায়। আমি ৯টার পর আসি। রেণু আজও পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। রাত্রিতে ২বার উঠি—একবার ১টায়, আবার ৩টায়। প্রস্রাবের অবস্থা সুবিধা নয়। কাল প্রতিভার এক পোষ্টকার্ড আসিয়াছে, 'গোপবাবু ৫টা

নিরাপদে পৌঁছিয়াছে।

২৭শে জুন

তুমি যদি গুপ্তাবতার, তবে অবতার হইলে কেন? না আসিয়া গোপনে থাকিলেই তো হইত। আসিয়া না আসার আড়ালে থাকার হেতু কি? তুমি প্রাণস্বরূপ, তাই তুমি গোপন। প্রজ্ঞাবাদী যাহারা তাহাদের কাছেই তুমি গুপ্ত। প্রাণ চিরদিনই প্রজ্ঞার কাছে গোপন। আত্মাও তো দেহের মাঝে গুপ্ত। মানুষ ভালবাসে ঐশ্বর্য, সহজ জীবন তো কেহ চায় না, তাই তোমাকে দেখিয়াও কেহ দেখে নাই। তুমি ছিলে নিত্যগোপী। প্রাণসাধকের কাছে তুমি নিত্যপ্রকাশ। তোমার ঐশ্বর্য, তোমার সমাধিকে disease বলিয়া গিয়াছে, সমাধির গর্ব ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছ। ওগো জীবন, তুমি আমার হও, আমিও তোমার হইব। তুমি আমি এক সহজ জীবন, নিত্যশুদ্ধ, বিশ্বের আড়ালে লীলারস আস্বাদন করিয়া চলিয়াছি। সকালে আফিসে যাই। ১০টায় চলিয়া আসি। রেণু ধ্যাত···২টায় এখানে আসে।···সকলের সব আছে, আমার কিছুই নাই। আমার দেহের শক্তিও তো আজ আর আমার নয়। সকলেই বিদায় নিতে চাহিতেছে। বেশ, আমি 'কেবল' হইব। ···৯টার পর রেণু আশ্রম পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া যায়।

২৮শে জুন

বিশ্বের বুকে তুমি সাধনার সেই দ্বারটী খুলিয়া দিতে আসিয়াছ, যেখানে মানুষ তোমাকে পাইয়া তাহার সত্তা চৈতন্য আনন্দের পথে যাত্রা করে—'যং বাচা অনভ্যুদিতম্ যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে।' তোমার সত্তা চৈতন্য আনন্দ নিংড়াইয়াই তো বিশ্বের জন্ম। বিশ্ব ও তুমি তাই অদ্বৈত। বিশ্বের পাওয়ার অর্থ কি? বাপ-মার রক্ত নিংড়ানো ধনই তো সন্তান। সন্তানের পশ্চাতের সত্তা তো বাপ-মা। মাকে পাওয়ার অর্থ কি? অখণ্ডের মাঝে যাহাকে পাইয়াই আছি, খণ্ড হইয়া যাওয়ার পর যাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না-পাওয়ার একটা অবস্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত পুনরায় জ্ঞানে অখণ্ড আস্বাদনই মাকে পাওয়া। অপরের পাওয়া ভাবে পাওয়া; ইহা দ্বারা পরের না-পাওয়াকে ভাবিত রসিত করাই তো সাধনার মূল রহস্য। ঠাকুর তোমার ভক্তিযোগ দর্শনে 'ভগবান কাহাকেও আপনার শরণাগত করিলে তাহার ভক্তিযোগ বিষয়িনী সাধনার অপেক্ষা করিতে হয় না—এই উক্তি এই ভাবে সার্থক হইয়াছে। তুমি হইয়াই তোমাকে পাইব, আস্বাদন করিব ও বিশ্বের বুকে ছড়াইয়া দিব। সকালে আফিসে যাই। ৯টার পর আসি।··· জিতেনবাবু (লাহিড়ী) বড় ছেলেদের ফেলিয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এড়াইয়া গেলেই যে এড়ানো যায় না, বেগবশতঃ যে বৈরাগ্য হয় না, বীরের মত সংসারের বুকে দাঁড়াইয়া তাহাকে পরিপাক করিতে চেষ্টা করিলেই যে ঠাকুরের আশীর্বাদ মিলিবে—ইহা বলি। সাহায্যদাতা সন্তানদের অপেক্ষা না করিয়া খরচপত্র চালাইয়া গেলেই হয়তো তাহাদের বুদ্ধি বদলাইবে।...৭টার পর সন্তোষ মাইতি আসে। তাহার সহিত ১ঘণ্টা কথা হয়। উজ্জ্বল-ভারতের আদর্শের কথা হয়। বর্তমান সমস্যা সমাধানের আলোচনা হয়। ৯টার পূর্বে বাহির হই। রেণু মোড় পর্যন্ত আসে।···

২৯শে জুন

ঠাকুর, আমার মাটির মানুষ নরনারায়ণ নিত্যগোপাল, তোমার প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। এতদিন অঙ্গের এই কান্নার আদর তো তুমি চিন্ময়রূপে কর নাই এইবার মাটির দেহ ধারণ করিয়া স্থূলরূপে সকল কান্নার মাধুর্য আস্বাদন করিলে, ধরার জ্বালা জুড়াইল। সকল অঙ্গ নিংড়াইয়া তুমি আত্মরূপে প্রকট হইলে। প্রতি অঙ্গের কান্না প্রতি অঙ্গের পরশেই থামিতে পারে। সকল অঙ্গের কান্না সার্থক করিয়াই তুমি সর্ব্ব সমন্বয়মূর্তি। যত সাধনা এতদিন ছিল, তাহা হয় কর্মেন্দ্রিয়ের কান্না, নয় তো জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কান্না, নয় তো বা emotion-এর কান্না থামাইবার সাধনা ছিল। এমন করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের কান্না থামাইবার উপযোগী সমগ্র সাধনার খবর কে দিয়াছে, নিত্যগোপাল তুমি ছাড়া? তাই তোমাকে চেনা বড় কষ্ট। আমাকেও তো সেই জন্য কেহ এক অঙ্গের সাধনা ধারা ধরিতে পারে নাই, পারিবেও না। সর্বাঙ্গের সাধনা

লইয়া আসিলে সর্বাঙ্গ দিয়াই আমাকে পাইবে। সকালে অফিসে যাই। ১০টার পর আসি।…যতদিন না তোমাকে শক্ত করিয়া ধরিতেছেন, ততদিন এখানের মর্ম বুঝিয়া উঠা অসম্ভব হইবে। ৪টার পর অফিসে যাই।… ৭॥টার (রাত) রেণু নিরঞ্জন এখানে যায় কেমন আছে জানিবার জন্য। কেহ না আসিলেও আমার কিছুদিন অন্তত: খবর নেওয়া নানা কারণে শক্ত। আমি সব সময়েই ভবিষ্যতে সকলের আসিবার পথ উন্মুক্ত রাখি, যাহাতে তাহারা সসম্মানে আসিতে পারে। আমাকে ছাড়াই সব চেয়ে সহজ। কেননা আমি তো কাহাকেও কোন বিশেষ এক অঙ্গ বা দুই অঙ্গ দিয়া বাঁধিয়া রাখি নাই। সর্বাঙ্গের বাঁধন আর বন্ধন না-থাকা একই কথা। কোনও এক অঙ্গের যোগ আমার কাহারও সঙ্গে নাই। আমি দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া মন দিয়া বিজ্ঞান ও আনন্দ দিয়া সকলের সঙ্গে যুক্ত হইতে চাই, সকলকে পাইতে চাই। তাই মানুষ আসিতে পারে না। সংসারের মানুষ এক অঙ্গ দিয়া বা দুই অঙ্গ দিয়া চায় ও পায়, তাই সেখানের বন্ধন শক্ত। যিনি সর্বোপাধিযুক্ত, তিনিই সর্বোপাধিমুক্ত। ৯টার পর রেণু আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়।…যেখানে ভালবাসা একাঙ্গীণ, সর্বাঙ্গীণ নয়, সেখানেই বন্ধন সৃষ্টি করে।

৩০শে জুন

১৭ই আষাঢ় রেণুর জন্মদিন। রেণু, তোমার জন্মদিনে প্রার্থনা, তুমি তোমার সকল অঙ্গ দিয়া নিত্যগোপালকে গড়িয়া তোল। সার্থক হও। নিত্যগোপালের অধিষ্ঠানক্ষেত্ররূপে গড়িয়া ওঠ। নিত্যগোপালগৃহিণী হও। আমার স্নেহ আদর ও আশীর্বাদ তোমাকে আবরণ করিয়া রহিল। ১।৭।১৯৫২। আজ প্রার্থনার সময় 'নরনারায়ণ' নামই জপ করি—তুমি নররূপী নারায়ণ, নর এবং নারায়ণ। তুমি মাটির মানুষ, মাটির সকল দাবীকে পূর্ণ করিয়া। তোমার অবতরণ ক্ষেত্রই শ্রীক্ষেত্র। রেণু ৮টার একটু পূর্বে আসে। আমি ২টাকা দেই ঠাকুরের কাছে রসগোল্লা ভোগ দিবার জন্য রেণুর জন্ম উপলক্ষে। তাহার জন্ম নিত্যগোপাল রূপে গড়িয়া উঠুক। ৮॥টায় যায়। মাখনবাবু আসিয়াছিল। ২টার পর আবার আসে। ৪॥টার পর অফিসে যাই।…প্রতিভা বাগবেড়িয়া হইতে আসে ৭॥-টার পর। সুপ্রভের পত্র পাই। গোপার আবার জ্বর হইয়াছে।…।…প্রতিভা রেণু প্রভৃতি যদি আমার সঙ্গে না যুক্ত হইত, আমার বাঁচিয়া থাকার কি কোনও অর্থ থাকিত? কেমন করিয়া আমি দিন কাটাইতাম তাই ভাবি। ঠাকুর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ইহাদের দিয়া। আমি তো ইহাদের উপর ভর করিয়াই আজ আছি। কে আমার কথা বলিত? আজ যে আমি মানুষের মধ্যে বাঁচিয়া আছি, শুধু তো ইহাদের জন্যই। না হইলে কোন্ অতলে ডুবিয়া যাইতাম। ইহারাই আজ আমার সর্বস্ব হন। ঠাকুর ইহাদের কল্যাণ করুন। সুদর্শন পত্রিকাতে একটী প্রবন্ধ (গোপণমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ) পাঠানো হইয়াছিল সোমবার।…

১লা জুলাই

ঠাকুর, সারাজীবন তো অনিশ্চিতের মাঝে ঝাঁপ দিয়া অনিশ্চিতের পথে নিশ্চিতের সন্ধান পাইয়াছি। তুমি হাতে ধরিয়া সব তুলিয়া ধরিয়াছ, সামনে যাহা কিছু নিশ্চিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠাদান তুমি একদিন করিয়াছিলেন, সারা বাংলার পথ এক দিনেই তুমি চিনাইয়া দিয়াছিলেন সেই বরিশাল কনফারেন্সের বক্তৃতার ভিতর দিয়া। বসত বাটের জায়গা তুমি আনিয়া হাজির করিয়াছিল। আমি তো অনিশ্চিতের পথ বহিয়াই চলিতেছিলাম। এই সেইটি রাখিবার মত স্থান ও সেখান হইতে তোমার জীবন দর্শন জমাইয়া তুলিবার মত একটু স্থান কি তুমি আনিতে পার না? তোমার জড়াজড় সমস্যা ছাড়া এই প্রলয় পয়োধি জলে নিয়া সংসার বাঁচিবে কেমন করিয়া? সর্বত্র যে চরম দুর্নীতি। রক্ষা কর, রক্ষা কর। কাহারও সঙ্গে যে মিশিতে পারিতেছি না, একাই কি থাকিব? মানুষ কি পাইব না?

ক্রমশঃ

সাময়িকী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব ঃ বিগত কার্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ৮১-তম জন্ম-দিবস ছিল। ঐ উপলক্ষে ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৭০, ৮ই ডিসেম্বর রবিবার শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের সমাধি-স্থান নরনারায়ণ আশ্রমে আশ্রম-দেবতা শ্রীনিত্যগোপালের পূজা হয়, অঞ্জলি দেওয়া হয়, প্রায় ৬০০ লোক প্রসাদ গ্রহণ করেন, বিকেল ৫-টায় অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভায় আশ্রম-সম্পাদিকা সকলকে সাদর আহ্বান জানাইয়া পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-দর্শন ও সর্বসাধারণের জন্য তাঁহার জীবন-তত্বের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রদ্ধেয় অনাদি নাথ সিংহ মহাশয় শ্রীমৎ স্বামিজীর রাজনৈতিক কার্যাবলী উল্লেখ করিয়া এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। শ্রীরমনীমোহন সরকার কিছু বলিয়া এক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, এবং শ্রীবিষ্ণুপদ রায় স্বামিজীর জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। রমণীবাবু বলেন ১৯১৮ সালে তিনি একদিন স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবান সম্বন্ধে আপনি আমাকে একটা স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন? স্বামিজী বলিয়া ছিলেন, 'আপনি কি আপনার 'আমি'কে চেনেন? আপনি বলেন 'আমি', রাম বলে 'আমি', শ্যাম বলে 'আমি'—এমনি সকলেই 'আমি' বলেন। এই 'আমি' দেহের সর্বত্রই আছে—'আমি' এক নিরাকার চৈতন্য শক্তি। সব প্রাণীর মধ্যেই এই নিরাকার 'আমি' বর্তমান। যাহা কিছু জগতে আছে সকলের দ্বারাই কোন না কোন কার্য সম্পন্ন হইতেছে। বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে, বায়ু সব প্রাণীকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। সুতরাং বায়ুর মধ্যেও 'আমি' রহিয়াছে। এইরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া এক বিরাট 'আমি' রহিয়াছে। এই বিশ্বব্যাপী নিরাকার বিরাট 'আমি'ই ভগবান'। রমণীবাবু বলিলেন তাঁহার একটা বহুদিনের কঠিন সমস্যার সমাধান হইল। সভাপতি মহাশয় স্বামিজীর সহিত তাঁহার দীর্ঘ দিনের পরিচয়ের কথা জানাইয়া তাঁহার জীবন ও দর্শন আলোচনা করেন। সভার পর শ্রীকানাইলাল গুহ ও তাঁহার সহযোগীবৃন্দ রূপাভিসার পালা কীর্তন গান করেন।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে সর্ব সাধারণের বা বিশেষের প্রয়োজন কি? সত্তর আশী বৎসর আগে শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছিলেন, 'ভবিষ্যতে জগতে সমস্ত জাতি এক জাতি হইবে। সমস্ত জাতি এক ধর্ম মানিবে। তখন ধর্ম সম্বন্ধে কাহারো প্রতি কাহারো বিদ্বেষ থাকিবে না', কিছুদিন আগে কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিলেন, 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি,' আর রবীন্দ্রনাথ তো কতই লিখিয়াছেন। কিন্তু এই যে একত্বের ধারণাটি বিশ্বে আসিতে চাহিতেছে, এ আশা তখনই বাস্তব হইতে পারিবে যখন ইহাকে দার্শনিকভাবে প্রমাণ করা যাইবে। মানুষে মানুষে কত প্রভেদ—শিক্ষায় দীক্ষায়, স্বভাবে চরিত্রে, কুলে শীলে, অর্থে, পাণ্ডিত্যে, কত কিছুতে। তাহাদের একত্ব কি করিয়া সম্ভব? অথচ এ সব প্রভেদের জন্যই আর আর মানুষকে ঘৃণায় দূরে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য করিয়া রাখা যাইতে পারে না। তাহলে কি করা যায়? ধারণার ধারাটি বদল করিতে হইবে। প্রভেদ বা বৈচিত্র্যই বিচ্ছেদের কারণ নয় এইটে বোঝা দরকার। প্রভেদ বা বৈচিত্র্য সৃষ্টির মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ সত্য কিন্তু ইহাদের একটাকে বড় বলিয়া অধিক সম্মান দেওয়া ও আর এটাকে হেয় বলিয়া কম সম্মান দেওয়া ঘটিয়াছিল মানুষের যে বুদ্ধিতে—সেই বুদ্ধিই বিচ্ছেদের কারণ হইয়াছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদটা বর্ণগত তথা গুণগত। যে গুণগুলি মানুষের মধ্যে রহিয়াছে তাহাদের তিনটী নামে ভাগ করা হইয়াছে—সাত্বিক,

রাজস, তামস। এই তিনটীর মধ্যে ভগবান পার্থক্য রাখিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনটীর কোনটা বড় ও অধিক সম্মানার্হ, অপর কোনটা হেয় ও ঘৃণার্হ—এ ব্যবস্থা'টা ভগবানের নয়—ইহা মানুষের কলঙ্কিনী বুদ্ধির। মানুষই বিভেদের স্রষ্টা, ভগবান বৈচিত্র্যের স্রষ্টা ছিলেন মাত্র। সাত্ত্বিকতা শ্রেষ্ঠ—সাত্ত্বিকতার গায়ে এ ছাপটা মানুষ দিয়া লইল, আর তাহাই অপর মানুষেরা যুগ যুগ ধরিয়া মানিয়া লইল আর সেই সঙ্গে মানিয়া লইল মানুষে মানুষে ভেদ-বাদ। সাত্ত্বিকগুণ শ্রেষ্ঠ, তমোগুণ নিকৃষ্ট—কে বলিল? এ কথা যে সত্য নয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রতিটি গুণেরই তার যথাস্থানে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে যাহা আর কাহারও নাই, অথচ এই স্বাতন্ত্র্য লইয়াও অপর গুণগুলির সঙ্গে সে সমন্বিত। এমন করিয়াই সৃষ্টি রচিত। ইহাদের একটিকে বড় অপরটিকে ছোট করিবার তো প্রয়োজন নাই, উহা তো ভগবানের বিধান নয়। মানুষে মানুষে বিভেদ দূর করার আগে এই গুণগত বৈষম্য-বোধ দূর করিতে হইবে। শুধু সাত্ত্বিকতা দিয়া তো সৃষ্টি হয় নাই, সব গুণগুলি মিলিয়া মিশিয়াই সৃষ্টি বজায় রাখিয়াছে, ইহাতে বড় ছোট উঁচু নীচুর নাই—যাহার যাহা ধর্ম। এ কথাগুলি স্বীকার করিয়া লইতে পারিলে তবেই মানুষে মানুষে পার্থক্য সত্ত্বেও বড় ছোটর অলঙ্ঘ্য প্রাচীর যে ভগবান সৃষ্টি করেন নাই—ইহা মানিতে পারিব। মানুষ কৃষ্ণবর্ণও বটে, শ্বেতবর্ণও বটে—মানুষ অধ্যয়ন অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের কর্মও করে বটে, ঝাড় দেওয়া জুতা সেলাই, শ্মশান রক্ষা প্রভৃতি মুচি মেথর মুদ্দাফরাসের কাজও করে বটে—কিন্তু ইহাদের মধ্যে বংশ দ্বারা অথবা কর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ছাপ মারিবার ধৃষ্টতা মানুষ তখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবে যখন প্রতিটি গুণকর্মকে যাহার যথাস্থানে তাহাকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় স্বীকার করিতে পারিবে। তমোগুণও সৃষ্টি রক্ষার পক্ষে সত্ত্বগুণের মতই সমান অপরিহার্য্য একথা প্রাণ খুলিয়া স্বীকার না করিলে তমোগুণের কাজ যাহারা করে তাহাদের স্বীকার করিবে কেন? পুরুষোত্তমানন্দ প্রতি গুণকে তাহার যথামূল্যে

মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন—এইখানে পুরুষোত্তমানন্দকে আমাদের প্রয়োজন। মানুষে মানুষে ভেদ নাই—আজ অনেকেই যে একথা বলিতেছে, তাহা কালের ধাক্কা লইয়া ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিদ্বজ্জন সমাজে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারিবে না, যদি গোড়ায় এই দার্শনিক পরিবর্তন আনিয়া না লই। যাহা বেশ কিছুদিন ধরিয়া নানাভাবে নানা মানুষের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে চাহিতেছিল ও চাহিতেছে পুরুষোত্তমানন্দ তাহারই দার্শনিক ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন। গুণে গুণে কোন বা শ্রেষ্ঠতা নিকৃষ্টতা বজায় রাখিয়া কোনমতেই মানুষে মানুষে মিলনের বাণী সার্থক হইবে না—এইখানে পুরুষোত্তমানন্দকে আমাদের প্রয়োজন। মানুষে মানুষে মিলনের প্রতি আগ্রহশীল মানুষকে আমরা পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত বেদান্ত উপনিষদ গীতার ভাষ্য ব্যাখ্যা ও তাঁহার অন্যান্য রচনা পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

সভ্যতার বিবর্তনের একটা ধারা আছে—সে ধারাটিকে বুঝিতে হইবে। অতি আধুনিককালে মানুষকে যে মানুষ হিসাবে দেখিতে হইবে, সমস্ত বিশ্ব যে এক পরিবার ইহারই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ঘোর তমসাচ্ছন্ন দিনে বিবেকানন্দ প্রথম ডাক দিয়া গিয়াছিলেন সেদিনের আবেষ্টনে সেই ডাক দেওয়াই অনেকখানি কথা। তারপর মানুষ যখন একটু সচেতন হইল, জগৎ জীবন বিশ্ব কি বস্তু একটু ভাবিবার ক্ষমতা অর্জন করিল, তখন কি ভাবে ভাবিতে হইবে তাহার পথ দেখাইবেন শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ। কাজেই মানুষে মানুষে মিলিতে হইবে এ কথা বলার পর মিলিবার পথের চিন্তাগত বাধা দূর করিয়া নূতন পথের দর্শন দিয়া গেলেন নিত্যগোপাল পুরুষোত্তমানন্দ। তাই তাঁহাদের আজ আমাদের প্রয়োজন। এইজন্য পুরুষোত্তমানন্দকে স্মরণ করি, তাঁর কথা আলোচনা করি, তাঁহাকে আমাদের ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম নিবেদন করি। বর্তমানের দ্বন্দ্ব সংঘাতে মানুষ তাহার জীবনের স্থিতি হারাইয়া ফেলিয়াছে, পুরুষোত্তমানন্দ যথে সমাধান দিয়া মানুষকে স্থিতি দান করিবেন—তাই তাঁহা

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks	৫·০০
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা	২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
বীরত্বে বাঙালী	১·৭০	আচার্য জগদীশ	১·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ	১·১৫
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া	·৭৫

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

বিদ্যাসাগর	১·২৫	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

প্রয়োগমূলক নূতন ধরনের ইংরেজী-বাংলা অভিধান **ব্যবহারিক শব্দকোষ** ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী **:** ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ । । গড়িয়াহাট মার্কেট ।

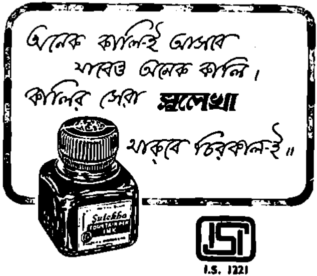
অনেক কালি-ই আসবে
যাবেও অনেক কালি।
কালির সেরা সুলেখা
থাকবে চিরকাল-ই॥
Sulekha
I.S. 1221

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা · দিল্লী · বোম্বাই · মাদ্রাজ

কৃষ্ণকে কৃষির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, কৃষিহীন কৃষ্ণের উপলব্ধিও তেমনি অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে—

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely the exploitation of man by man.'

'Occasional Speeches'—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে সে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজও পাবেন নীচের বইগুলিতে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের
মুদ্রিত :

১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	১।০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮৲
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৬৲
২।	ঈশোপনিষৎ	২৲
৩।	কেনোপনিষৎ	১৲
৪।	কঠোপনিষৎ	৩৲
৫।	শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে	১।০
৬।	স্বরাজের পূর্বক্ষণ	।০
৭।	গীতাচতুষ্টী	/০
৮।	উজ্জলভারত (পুস্তিকা)	।০
৯।	ঐতরেয়োপনিষৎ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	১৸০
১০।	শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ	২৸০

: পাণ্ডুলিপি :

১। মুণ্ডকোপনিষৎ
২। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা
৩। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
৪। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
৫। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৬। প্রশ্নোপনিষৎ
৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৮। স্বহস্তে লিখিত দশ বৎসরের ডায়েরী
৯। অগণিত পত্রাবলী
১০। বিভিন্ন অভিভাষণ

শ্রীমতী প্রতিভা রায়ের

১।	নারী-প্রগতির মর্মকথা	১।০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শিষ্য নিত্যগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা	।/০

শ্রীমতী রেণু মিত্রের

১।	দয়াময়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	৸/০
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	২৲
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৩৲
৪।	রবীন্দ্র-হৃদয়	৫৲
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪৲
৬।	শরৎ-মাধুরী (যন্ত্রস্থ)	

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন নম্বর ৫৭-২৫৪০
গ্রাম : বাগুইআটি পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা

Regd. No. C 23 Phone No. 57-2540 UJJWALBHARAT

SHREE HANUMAN FOUNDRIES LTD.

GOVERNMENT AND RAILWAY CONTRACTORS, ENGINEERS, FOUNDERS, STEEL REROLLERS, BUILDERS, STRUCTURAL FABRICATORS

LIGHT AND HEAVY FERROUS CASTINGS/ROLLED LIGHT-SECTIONS AND RAILWAY PERMANENT-WAY MATERIALS.

Associated Concerns :

SHREE BAIDYANATH IRON & STEEL CO. LTD.
Wagon Builders, Founders, Manufacturers of Pig Iron and Steel Castings, Engineers, Government and Railway Contractors.

AGARWALLA PROPERTIES LTD.
Owners of Real Estate.

THE LAKSHMI PRINTING WORKS LTD.
Printers and Publishers—Artistic Job a speciality.

Head Office
AGARWALLA MANSIONS
370, Upper Chitpore Road,
Calcutta 6.
Phone : 33 6422 (4 lines)

Branch Office :
25-H CONNAUGHT CIRCUS
NEW DELHI.
Phone : 40317

প্রতি সংখ্যা ৪৪ ন. প. বার্ষিক পাঁচ টাকা

Cover Printed by : Narayan Printing Works. 95, Narkeldanga North Road, Cal-11